এপিক সমগ্র

বনফুল



এপিক সমগ্র

এপিক সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

বনফুল

সম্পাদনা

ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়

মডেল পাবলিশিং হাউস

Epic Samagra Vol-II
by
Banaphool

Edited by
Dr. Nisith Mukhopadhyay

প্রচ্ছদ ❑ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

■ *মডেল পাবলিশিং হাউস*-এর পক্ষে ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩ থেকে *জয়দেব ঘোষ* কর্তৃক প্রকাশিত, *মডেল কম্পিউটার সেন্টার* ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩ কর্তৃক অক্ষর বিন্যাস এবং *ইউনিক ইন্ডিয়া প্রিন্টোগ্রাফিক্স*, ৩০জি, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত ■

ISBN 81-7616-052-2

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

বনফুলের 'এপিক সমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে 'জঙ্গম' উপন্যাসের বাকী অংশ (চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়) ছাড়াও 'স্থাবর' এবং 'প্রথম গরল' উপন্যাস দুটি অন্তর্ভুক্ত হল। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 'জঙ্গম' 'স্থাবর' ও 'ডানা'কে কেন এপিকধর্মী উপন্যাস বলা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বলবার চেষ্টা করেছি মহাকাব্যসুলভ একটি বিশাল— আয়তন পটভূমি আছে বলেই উক্ত গ্রন্থগুলিকে এপিকধর্মী বলে অভিহিত করা যায়। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে 'প্রথম গরল' নামক একটি ছোট উপন্যাসকে কেন এর অন্তর্ভুক্ত করা হল। আসলে 'প্রথম গরল' স্বতন্ত্র উপন্যাস হলেও এটিকে 'স্থাবর' উপন্যাসেরই একটি অনুসারী অংশ হিসাবে গ্রহণ করা ভাল। কারণ সেই একই আদিম মানবগোষ্ঠী বা মানব সমাজ এর বিষয়বস্তু। তবে স্থাবরের মতো একাধিক জন্মান্তরের কাহিনী নয়— একটি মাত্র জন্মের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। 'স্থাবর' যুগের তুলনায় এই উপন্যাসের যুগ অনেকটাই অগ্রবর্তী। স্থাবরের 'অমর আত্মা'ই এই উপন্যাসে আর একবার উপস্থিত হয়ে সেই অগ্রবর্তী যুগের কাহিনী বলেছে।

'প্রথম গরল' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কুসংস্কার ও দৈব শক্তিতে বিশ্বাসী এই আদিম মানুষের জীবনে যেমন প্রথম সভ্যতার আলো দেখা গিয়েছিল তেমনি এই যুগেই প্রথম জন্ম নেয় মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী 'বিষয়' নামক বিষ। উপন্যাসের নায়ক গল্প-কথক টালা বলেছে "আমাদের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি করিবার বাসনা যখন জাগিবে তখনই আমাদের ধ্বংসের বীজ আমরা বপন করিব। .... বিষয় করিলেই সেই বিষয় হরণ করিবার জন্য চোর ডাকাত আসিবে। বিষয়ের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ হইবে। .... বিষয় বিষ, বিষয় গরল।" অর্থাৎ এই যুগেই মানুষ প্রথম পান করল সভ্যতার 'প্রথম গরল'।

আদিম গুহাবাসী মানুষ জন্ম জন্মান্তরের ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কেমন ভাবে সভ্যতার প্রথম ধাপে পা রাখল তার আনুপর্বিক ইতিহাস জানতে হলে 'স্থাবর' উপন্যাসের সঙ্গে 'প্রথম গরল'ও পাঠ করতে হবে। সেই কারণেই এই উপন্যাসটিকে আমরা এই খণ্ডে যুক্ত করেছি।

মডেল পাবলিশিং-এর প্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়দেব ঘোষ এই খণ্ড প্রকাশে যে তৎপরতা দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আশাকরি তাঁর উদ্যোগে তৃতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

ড. নিশীথ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

চাঁপাডাঙা, হুগলি।

জঙ্গম

চতুর্থ অধ্যায় ❑ পঞ্চম অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

এক

সাহিত্যিক জীবন! ইহার নাম সাহিত্যিক জীবন? 'সংস্কারক' আপিসের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া প্রুফ সংশোধন করিতে করিতে শঙ্কর মনে মনে নিজের সাহিত্যিক জীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া যাহা অনুভব করিল, তাহা গৌরবজনক নহে। সাহিত্যিক মানে কেরানি? সাধারণ কেরানির মত সেও দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়া পরের ফরমাশ অনুযায়ী কলম পিষিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। গোটা দুই বাজে উপন্যাস, চলনসই কয়েকটি গল্প এবং চানাচুর-মার্কা কয়েকটি কবিতা লেখা ছাড়া আর কি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে সে! ভাল লেখা দূরে থাক, ভাল বই পড়িবার তো অবসর পায় নাই। চাকরি বজায় রাখিতেই সমস্ত শক্তি ও সময় চলিয়া যাইতেছে। 'সংস্কারক'-সম্পাদকের শুচিবায়ুগ্রস্ত মনের রুচি অনুযায়ী লেখা নির্বাচন করিতে এবং সেই দুর্বল রচনাগুলিকে যথাসম্ভব নির্ভুল করিয়া মাসের ঠিক পয়লা তারিখে প্রকাশ করিতেই তাহার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, নিঃসন্তান সম্পাদক মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন ভাগিনেয় নিলয়কুমারকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাহার যে কোনো রচনাকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-মর্যাদা দিয়া ছাপিতে হয়, তাহার বন্ধুদের অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যিক চালিয়াতি নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইহাই তাহার বর্তমান চাকরি এবং ইহাই তাহার সাহিত্যচর্চা। অথচ এই চাকরি বজায় রাখিবার জন্য কত কৌশল, কত প্রচেষ্টা! ডাক্তার মুখার্জির সুপারিশে প্রুফ-রিডার হইয়া মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সে 'সংস্কারক' আপিসে ঢুকিয়াছিল, তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যে নিজের দক্ষতাগুণেই হউক বা ডাক্তার মুখার্জির গোপন সুপারিশ বলেই হউক, তাহার পদোন্নতি ঘটিয়াছে। সে এখন প্রুফ-রিডার নয়, সহকারী সম্পাদক। দুই বৎসর পূর্বে হীরালাল মজুমদারের সহকারী হইবার কল্পনা তাহার পক্ষে কল্পনা-বিলাস হইত, কিন্তু এখন সেই সহকারী-পদ পাইয়া অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছে, কিছু হইল না, কিছু হইল না, সময়টা বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। মনে হইতেছে, অহরহ মনে হইতেছে, কিন্তু চাকরি ছাড়িবার উপায় নাই। কলিকাতা শহরে অর্থই একমাত্র বল। মাস শেষ হইলে অন্ততপক্ষে দেড় শত টাকা চাই-ই। চাকরি ছাড়া চলিবে না বরং চাকরিটি যাহাতে আরও পাকা হয় সে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করিতেছে। আপিসে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে চণ্ডীচরণ দস্তিদার, নিলয়কুমারের বন্ধু। অনেকে বলেন নিলয়কুমারের চর। মামার আপিসের সমস্ত হালচালের সম্পূর্ণ খবর রাখিবার জন্যই নাকি নিলয়বাবু চণ্ডীচরণবাবুকে আপিসে ঢুকাইয়াছেন। তিনি আপিসে আসিয়াই একটি দল পাকাইয়াছেন। দলটি শঙ্করকে শত্রুপক্ষীয় বলিয়া মনে করে। মনে করে, শঙ্কর হীরালালবাবুর গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়। শঙ্করের আশঙ্কা, এই চণ্ডীচরণবাবুর চক্রান্তেই হয়ত তাহার একদিন চাকরি যাইবে। কারণ, কাগজে-কলমে হীরালালবাবু মালিক হইলেও আসল মালিক নিলয়কুমার। তাই নিলয়কুমারকে তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্কর ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু বাহিরে ব্যগ্র হইতেছে। আজই তো সমস্ত দিন ধরিয়া সে সদ্যবিবাহিত নিলয়কুমারের জন্য সস্তায় একটি বাড়ি ঠিক করিয়া আসিল। নিলয়কুমার

নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া মাতুলের বাড়িতে থাকিতে চান না। এতদিন মাতুলের কাছেই ছিলেন। কিন্তু বিবাহ করিবামাত্র তাঁহার আত্মসম্মানবোধ সম্ভবত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি অন্য বাসায় উঠিয়া যাইতে চান, হীরালালবাবুও নাকি ইহাতে মত দিয়াছেন। চণ্ডীচরণবাবু ও নিলয়বাবু নিজেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ভদ্রপল্লীতে সস্তায় বাড়ি আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না, আজ শঙ্কর বাড়িটি খুঁজিয়া দিয়া চণ্ডীচরণ দস্তিদারের উপর টেক্কা দিয়াছে। নিলয়কুমার এবং তৎপত্নী রেণুকা যদি সুপ্রসন্ন থাকেন, শঙ্করের চাকরি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হীরালালবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, নিজে কিছু দেখিতে পারেন না। নিলয়কুমার অফিস-ডিরেক্টর হিসাবে মোটা মাসোহারা লইয়া আপিসের সর্বময় কর্তা। ইহাকে সন্তুষ্ট না করিলে চাকরি থাকিবে না।

নিলয়কুমার উপর-চালাক-গোছের লোক। হঠাৎ কথাবার্তা শুনিলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বোঝা যায়, ভিতরে কোনো শাঁস নাই। শঙ্কর ইহা জানে, কিন্তু ভুলিয়াও কখনও তাহা প্রকাশ করে না, বরং আচারে-ব্যবহারে এমন একটা সশ্রদ্ধ ভাব দেখায় যে, সে যেন নিলয়কুমারের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। বাড়ি খুঁজিয়া দিয়া শঙ্কর তাঁহাকে আজ আরও খুশি করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, রেণুকাদেবীর একটি অতিসাধারণ কবিতার এমন উচ্ছ্বসিত অনর্গল প্রশংসা করিয়াছে যে, নিজের আচরণে সে নিজেই বিস্ময়বোধ করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে এ কি করিতেছে? ইহাই কি সাহিত্য-চর্চা? সহসা তাহার মন আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! সহসা মনে হইল, বিবাহ করিয়া এমনভাবে জড়াইয়া না পড়িলে হয়ত তাহার এ অধঃপতন ঘটিত না, অতিশয় যুক্তিহীনভাবে সহসা অমিয়ার উপর রাগ হইল, আবার তখনই মনে হইল— না, না, সে বেচারির দোষ কি? তাহাকে সে-ই তো নিজে যাচিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়া সম্ভবত তাহারই প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বের ঘটনা শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সমস্ত চিত্রটা মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর, হাওড়ার পুল খোলা, রাত্রেই গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতা ফিরিতে হইবে। সঙ্গীরা সবাই মাতাল, একজন রাস্তায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া একজন মাঝির ঘুম ভাঙাইল, বেশি পয়সার লোভে সে তাহাদের গঙ্গা পাড় করিয়া দিতে রাজীও হইল। কিন্তু গঙ্গার এমন অবস্থা যে ডিঙি তীর পর্যন্ত আসিতে পারে না। শঙ্কর সঙ্গীদের প্রত্যেককে কাঁধে করিয়া নৌকায় তুলিল। গঙ্গার জলে বিষ্ঠা ভাসিতেছে, চতুর্দিকে কর্দম ও আবর্জনা। সমস্ত অতিক্রম করিয়া শঙ্কর সঙ্গীদের লইয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল; হু-হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিয়াছে, ওপারে কলকাতা শহরের আলো-আঁধারির রহস্য, রগের শিরাগুলো দপদপ করিতেছে, হুইস্কির নেশাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নৃত্যপরা তন্বীর যৌবনমাদকতায় কল্পনা আবিষ্ট— মেয়েটার নাম কি ছিল? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর খানিকক্ষণ ভাবিল কিন্তু মনে করিতে পারিল না।

'উড়িষ্যার বনে জঙ্গলে'র পর ইঞ্চি তিনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কোনো কবিতা-টবিতা থাকে তো দিন।

প্রিন্টার শীতলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শঙ্কর রেণুকাদেবীর কবিতাটা দিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। এ ধরনের কবিতা তো প্রতি মাসেই ছাপিতে হয়, রেণুকাদেবীরটা ছাপিতেই বা দোষ কী? ছাপিলে তাহার লাভ বই ক্ষতি নাই। ছন্দ মিল সবই তো ঠিক আছে, ভাবটিও বেশ উদাস-করা উদাস-করা গোছের। মন্দ কি? শীতলবাবু চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর নিজের আচরণে নিজেই অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

দুই

'ক্ষত্রিয়' অবশ্য এখনও জীবিত আছে।

কিন্তু কোনোক্রমে। কোনো আয় তো হয় না, মাঘের পত্রিকা [redacted] হির হয়, তাও ভাল লেখা জোটে না। 'ক্ষত্রিয়ে'র পুরাতন দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে [redacted] ইরিগেশন বিভাগে বড় চাকরি করিতেছেন, জ্যো[redacted]র্ময়বাবু একটা ইংরেজি দৈনিক প [redacted]-এডিটার, সুরেন সোম শিক্ষকতা উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন, কিছুদিন পূর্বে ব[redacted]সর লইয়া দেশে গিয়াছেন, সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটা ভারি ওজনের উম্বুটগোছের প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ছবি রায় একাধিকবার প্রেমে পড়িয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া ক্রমবর্ধমান পরিবার লইয়া একটা আশঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে; পরিচিত কেহ তাহাকে দেখিলেই সরিয়া পড়ে, কারণ দেখা হইলেই সে ধার চায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করে নাই, শুষ্ক রুক্ষ কেশভার ও উদভ্রান্ত দৃষ্টি লইয়া সে শঙ্করের কাছে মাঝে মাঝে আসে এবং শেলি, ব্রাউনিং, কিটস আওড়াইয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া শঙ্করকে বিব্রত করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে রোমান্টিক ধরনের প্রবন্ধ বা কবিতাও লিখিয়া আনে 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার জন্য। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার আরও দুইজন লেখক জুটিয়াছেন, একজন ডাক্তার মুখার্জি এবং আর একজন লোকনাথ ঘোষাল। ডাক্তার মুখার্জির এমন কলমের জোর আছে, তাহা শঙ্কর ইতিপূর্বে জানিত না। লোকনাথ ঘোষাল লোকটিও অদ্ভুত প্রকৃতির। এমন একনিষ্ঠ সাহিত্যিক শঙ্কর আর দেখে নাই। সাহিত্যই তাঁহার জীবনের ধ্যান জ্ঞান, সাহিত্য ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না, আর কিছু জানিতে চান না। বেহারের এক পল্লীগ্রামে তিনি স্কুল-মাস্টারি করেন এবং মাস্টারি করিবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাহিত্য সাধনায় ব্যয় করেন। তাঁহার সাহিত্য সাধনা ঠুনকো শৌখিন ব্যাপার নয়, জীবনের মর্মমূলে সে সাধনা রসপরিবেশন করে, আলো বাতাসের মত তাহা তাঁহার নিকট সত্য ও প্রয়োজনীয়। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদকরূপে লোকনাথবাবুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছে। আলাপ করিয়া শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার মুখার্জি এবং লোকনাথবাবুর লেখায় 'ক্ষত্রিয়' সত্যই সমৃদ্ধ। শঙ্করের আশা, তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সত্যই একদা আদর্শ সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত হইবে, তাই এত অসুবিধার মধ্যেও সে 'ক্ষত্রিয়'কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখনও সে আদর্শ বহু দূরে, এখনও কেবল নিন্দা এবং গালাগালি দিয়াই কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে হয়। গালাগালির বিষয়ও সেই এক, প্রতিভাহীন বামনদের স্পর্ধিত চন্দ্রলোলুপতা। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মুখার্জি দিল্লি হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, শঙ্কর তাহাই পড়িতেছিল। ডাক্তার মুখার্জি আজকাল দিল্লিতে, কারণ তাঁহার একমাত্র পুত্র দিল্লিতেই চাকরি করেন।

ডাক্তার মুখার্জি লিখিতেছেন—

শঙ্কর,

আধুনিক লেখকদের ওপর তুমি চটেছ। আমি তোমার চেয়ে বেশিদিন বাংলা-দেশে বাস করেছি, আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি, তাই চটবার কারণ পাচ্ছি না।

সেকালে রবিবাবুর নাম করলে ঢিল খেতে হত; আমাদের প্রাণ বাঁচানো দায় ছিল। রবিবাবুর ছন্দ নেই, মিল নেই, গাম্ভীর্য নেই, ভাষার মাধুর্য নেই— এই রকম কত দোষ যে দেখতে পেয়েছিল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা তা বলবার নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে রবিবাবুর ভাষাকে চেস্ট বাংলায় রূপান্তরিত করবার জন্যে নম্বর

দেওয়া হত।

এখন সেদিন গে[illegible] রবিবাবু নাকচ হয়েছেন পিচের গন্ধ আর পেট্রলের গন্ধ কবিতায় ঢোকাননি ব'লে।

সেকালে টিকি [illegible]কর মধ্যে ম্যাগ্নেটিজিম ইলেকট্রিসিটি, বিধবার অলঙ্কারের স্বর্ণে উত্তেজকতাড়িত এ[illegible] চোখের দুষ্ট ম্যাগ্নেটিজম নিয়ে বড় বড় প্রবন্ধ বেরত। এর জন্যে অনেকেরই ফিজিক্স[illegible] দরকার হয়নি, এমন কী যাঁরা ফিজিক্স চর্চা করতেন, তাঁরাও ওই রকম বক্তৃতা দিতে[illegible] কেউ।

সেকালে গল্প বেরুত— ডাকাতরা বৃক্ষকোটরে প্রবেশ করলে, আর ডিটেকটিভ মাইক্রোস্কোপ লাগিয়ে তাদের ধরে ফেললে।

একালে ইলেক্ট্রিসিটির বদলে এসেছে ফ্রয়েডিজ্‌ম আর সাইকোলজি। এখন মা চুমু খেলে বেবির মুখ লাল হয়ে ওঠে, মামা ভাগনীর রিপ্রেশন তাড়াবার জন্যে বক্তৃতা করে। সেকালে যাঁরা মামি-কাকিকে কাশী পাঠাতেন তাঁদের একমাত্র বিষয় ছিল সতীত্ব। একালে সতীত্ব নেই। যুবারা সেক্সের বিজ্ঞাপন পড়া (অনেক সময় আবার সেটা কন্টিনেন্টাল নভেল বা সিনেমার মারফত) আর রতিবিলাস খাওয়ার অবসরে রাস্তায় মেয়েদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের ঘুমন্ত মুঠোয় টাকা গুঁজে দিয়ে চলে আসছে। সেকালের প্রবলেম ছিল ক-খ জানা মেয়ের হাতে স্বামীর লাঞ্ছনা। এখনকার প্রবলেম হয়েছে লেবারের দুঃখ। যেখানে ভিক্ষা পেলেই পেট ভরে খেতে পাওয়া যায়, যেখানে অতি অধমেরও কাকা দাদা প্রভৃতি আশ্রয়স্থল আছে— সেখানকার লেবার প্রবলেম কি মর্মান্তিক!

এক খামচা লঙ্কাবাটা বা একটা পেঁয়াজ দিয়ে যারা এক থালা ভাত খায়, তাদের পাড়ায় যেতে হয় ডিমের খোলা মাড়িয়ে! গিয়ে দেখতে হয় দরমার দেওয়ালে খবরের কাগজের ওয়াল-পেপার আর বালিশের তলায়— দি ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড।

সেকাল আর একাল পাশাপাশি বসিয়ে দেখ, ইউক্লিডের ফোর্থ থিয়োরেমের মত মিলে যাবে।

এখনকার অধঃপতনে দুঃখ বা রাগ হতে গেলে প্রি-সাপোজ করতে হয় যে, এর আগে এক সময় এর চেয়ে ভাল কিছু ছিল।

সেকালে দেখেছিলুম, একজন মহাত্মা ভদ্র কুলবধূর নাম করে কেচ্ছা করলেন আর চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়ে গেল। শেষে তাঁর জেল হল। কিন্তু যেদিন জেল থেকে বেরলেন, কলেজের ছেলেরা মাথায় করে তাঁকে নিয়ে এল। একালে দেখি সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স মুভমেন্টে দলে দলে লোক জেলে যাচ্ছে, নিজেদের ডিফেন্ড করছে না। জেলে গিয়ে কিন্তু মালিশের তেল বা পানের চুন কম হলে আকাশফাটা আর্তনাদ করছে, আর হরলিক্‌স মিল্ক না পেলে হাঙ্গারস্ট্রাইক করছে। সেকালের সাহিত্য বা পলিটিক্স যা ছিল, একালেও ঠিক তাই আছে, বাইরের চেহারাটায় একটু অদলবদল হয়েছে মাত্র। দাণ্ডি মার্চ বা সল্ট রোডের সাব্‌লাইম বা রিডিকুলাস কারোর কল্পনা উদ্বুদ্ধ করল না। বিহার ভূমিকম্প কারোর কাব্যের খোরাক জোগাল না। এবার অতীতের দিকে চেয়ে দেখি— সিরাজ এবং ইংরেজ যখন বঙ্গদেশের বুকে সমুদ্রমন্থন করছিল, তখন বই বেরিয়েছিল— রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত। কি আর বলি। তোমরা সবাই ভাল?

ইতি শুভার্থী।

নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার মুখার্জির পত্রখানা পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইয়া গেল। তাঁহার ঠিক এই রূপ সে এতদিন দেখে নাই। আধুনিকনামা এই অপদার্থ লোকগুলোর সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গিই যেন

বদলাইয়া গেল। ইহারা যে এই পরাধীন দেশের সনাতন মনে[illegible] নব রূপ, তাহা এতদিন তাহার ধারণাতে আসে নাই। সহসা তাহার মনে হইল [illegible] তাহাদেরই লভুক্ত নয়, না হয় তাহার ধরনটা একটু ভিন্ন রকমের। সে 'ক্ষত্রিয়' পত্রি[illegible]র রচনাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ কি সত্যই সাহিত্যিক ব্যঙ্গ? [illegible]মাত্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কি নাই? আধুনিক লেখকদের হঠাৎ জনপ্রিয়তা কি তাহার চি[illegible] করিয়া তোলে নাই? এই ঈর্ষা এবং এই ঈর্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মহত্ত্বের অভিনয় ক[illegible]ীন জাতির মজ্জাগত প্রবৃত্তি নয়? যে পরাধীনতার প্রকোপে এই আধুনিকেরা নকলনবি[illegible] পরাধীনতার প্রকোপে সেও ঈর্ষাক্লিষ্ট নকল সংস্কারক। কিন্তু না না ... সহসা শঙ্করের যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। নিজেকে এতটা হীন সে ভাবিতে পারিল না। ঈর্ষা? ঈর্ষার জন্যই সে এত সব করিয়াছে? আর একটা কথা তাহার মনে হইল। উহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তো তাহার বাধে নাই। একই হোটেলে একই ধরনের আহার্য ও মদ্য সেবন করিয়া একই বারবনিতার বাড়িতে রাত্রি কাটাইতে তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই; এমন কী যাহাদের সঙ্গে এই সূত্রে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার উগ্রতাটা যেন অনেকটা কম হইয়া আসিয়াছে। মানসিক শুচিতাই যদি তাহার ব্যঙ্গের কারণ হইত, তাহা হইলে সে ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিতে পারিত কি? কিন্তু না না, কোথায় যেন ভুল হইয়াছে— সাহিত্যিক বিরোধের সহিত সামাজিক প্রীতি-অপ্রীতির কোনোও সম্পর্ক নাই। তাহার নিকটতম বন্ধুর রচিত সাহিত্যও তাহার বিচারের মানদণ্ডে হীন হইতে পারে এবং তাহা লইয়া নিষ্ঠুরতম ব্যঙ্গ করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সে স্বস্তি পাইল এবং পুনরায় মনোযোগ সহকারে প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকারই প্রুফ সে দেখিতেছিল। ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল— নয়টা বাজিয়া গিয়াছে; একটু পরেই আপিসের জন্য উঠিতে হইবে। একজন বেয়ারা প্রবেশ করিয়া একটা চিঠি দিয়া গেল। শৈলর চিঠি, শৈল ডাকিয়াছে।

তিন

আপিসে ভণ্টু আসিয়া হাজির।

এখনও প্রুফ লদকাচ্ছিস? ওঠ।

কেন, কী করতে হবে?

লবস্টারিং।

সে আবার কী?

লবস্টার মানে জানিস না? গলদা চিংড়ি। ইটিং আপিসে ঢুকব আজ, এখন না কিনলে তো পাওয়াই যাবে না। ওঠ।

এটা শেষ করে দিই, থাম্, মেশিন না হলে বসে থাকবে। তা ছাড়া এখন আমার ঢের কাজ বাকি— বাজারে যাওয়ার সময় নেই, বস।

ভণ্টু মুখ সুচালো করিয়া তাহার দিকে একবার তাকাইল এবং চেয়ার টানিয়া বসিল।

হঠাৎ গলদা চিংড়ি খাবার শখ কেন?

বিয়ে করে সিংকিং আপিস খুলছি।

অর্থাৎ—

দরাঞ্চে ব্যাপার।

কি রকম?

বিড়ডিকারের নাকে [redacted]র-ফ্রাইং গন্ধ এনটারিং আপিস খুলেছে।

শঙ্কর কোনো মন্তব্য না[redacted]য়া স্মিতমুখে প্রুফই দেখিতে লাগিল। ভণ্টু বলিয়া চলিল, বুঝতে পারলি না তো? পারবার [redacted] নয়, বুঝিয়ে বলি তা হলে শোন্। আমার মাইনে যদিও একটু বেড়েছে— কিন্তু চাল র[redacted] আমি, বিড়ডিকারকে সেই সাবেক চালে নৌকোর হালটিতে বসিয়ে রেখেছি। প্রাচীন[redacted]য়ের ডাল, পোস্ত আর মৌরলামাছের বাসি টক, প্লাস একটা জাবদা গোছের ভেজি[redacted]লের তরকারি— এই মামুলি ফর্মুলা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন বিড়ডিকারের নাকে চিংড়িমাছ ভাজার গন্ধ ঢুকল।

পাশের বাড়ি থেকে?

না, দোতলা থেকে। বিড়ডিকার দোতলায় উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখল, ঘরে খিল বন্ধ করে ইন্দুমতি স্টোভে লবস্টার ফ্রাই করছে। তাও মাত্র দু'টি— একটি বোধ হয় নিজের জন্যে, আর একটি আমার জন্যে।

শঙ্কর হাসিয়া ভণ্টুর পানে চাহিয়া আবার প্রুফে মন দিল।

ভণ্টু বলিল, বোঝ, ভাল ক'রে তলিয়ে বুঝে দেখ ব্যাপারটা।

এতে আর বোঝবার কী আছে।

ঝিকে দিয়ে লুকিয়ে চিংড়িমাছ আনিয়ে গোপনে ইটিং আপিস খুলছে— বোঝবার কিচ্ছু নেই?

যাঃ।

তুই দেখছি বিড়ডিকারেরও এক কাঠি ওপরে গেলি। বিড়্ডিকারও প্রথমে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

শঙ্কর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

বিড়ডিকারের যা স্বভাব, দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। বলছে ও বড়লোকের মেয়ে, যা-তা জিনিস কি রোজ রোজ মুখে রোচে বেচারির, তোমারই কিপ্টেমির জন্যে এসব হচ্ছে, আজ বেশি করে গলদা চিংড়ি আনাও, সবাই মিলে খাওয়া যাক।

একটু থামিয়া ভণ্টু পুনরায় বলিল, বোঝ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল।

এখনও ধার শোধ করে উঠতে পারিনি, দাদার আবার জ্বর হচ্ছে, ডাক্তাররা বলছে ফের চেঞ্জে পাঠাতে।

শঙ্কর আবার হাসিল।

মুচকি মুচকি হাসছিস যে বড়? মরিয়া হয়ে উঠেছি আজ, লবস্টারের চরম করে ছাড়ব আমি। ওঠ।

আমি এখন উঠতে পারব না, অনেক কাজ বাকি আছে আমার। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল, চণ্ডীচরণ দস্তিদার শ্যেনচক্ষু মেলে চেয়ে আছে, কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

ভণ্টু মুখ সুচালো করিয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তা হলে রাত্রে যেও এবং ওইখানেই ইটিং আপিস খুলো। কটি লবস্টার খাবে তুমি।

গোটা চারেক।

বলিস কি রে?

ভণ্টু উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললাম, মৃন্ময়কেও বলে যাই। ক্যান্ডেলকে নিয়ে কিন্তু মস্ত মুশকিলে পড়েছি ভাই; ও আপিসের কাজ একদম কিচ্ছু করে না, অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে [illegible]। এমন থক্‌বকিয়ে গেল কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

কেন, কী করে?

কিচ্ছু করে না। কিছু বললেই ফ্যালফ্যাল করে লুকিং আপিস[illegible]খালি। ও কী রে, তুই আবার আংটি লদ্‌কালি কবে? দেখি দেখি, এ যে দামি খুজ্‌লু।

আমার নয়, অপরের।

ফের মোল্লা জুটিয়েছিস নাকি?

না।

আমি চললাম, আর দেরি করলে পাওয়া যাবে না।

ভন্টু চলিয়া গেল।

আংটির কথা উঠিতে শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল, কুমার পলাশকান্তি আজ যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহাকে একটি গল্প লিখিয়া দিতে হইবে। এই জমিদারপুত্রটির সাহিত্য-বাই চাগিয়েছে। নিজের কোনোও প্রতিভা নাই, অপরের দ্বারা গল্প লিখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করেন এবং ভাল কাগজে ভাল লোক দিয়া ভাল সমালোচনা লিখাইয়া লইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বলা বাহুল্য, সবই টাকার জোরে। এই দামি হীরার আংটিটা তাঁহারই। শঙ্কর শখ করিয়া আঙুলে পরিয়াছিল, তিনি আর খুলিয়া লন নাই। বলিয়াছিলেন, ব্যস্ত কী, বেশ মানাইয়াছে, থাক না, পরে লইলেই হইবে। 'সংস্কারক' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদককে, বিশেষত 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার উগ্র সমালোচককে খুশি করিয়া রাখিতে তিনি ব্যগ্র। একটি গল্প লিখিয়া দেওয়ার জন্য তিনি শঙ্করকে দুইশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। একটি উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারিলে হাজার টাকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কুমার পলাশকান্তি লক্ষ্মীর দৌলতে সরস্বতীর দরবারেও আসর জমাইতে চাহেন। এককালে রেসের শখ ছিল, এখন সাহিত্যের শখ হইয়াছে।

ভন্টু চলিয়া যাইবার পর শঙ্কর আরও খানিকক্ষণ প্রুফ দেখিল কিন্তু হঠাৎ একটা 'ফোন' আসাতে তাহাকে উঠিয়া পড়িতে হইল।

ফোনে চুনচুন্ বলিল, আসবেন একবার? যদি আপনার অসুবিধে না হয়, আমি মনুমেন্টের কাছে থাকব।

শঙ্করের মনে হইল, অবিলম্বে যাওয়া দরকার। ড্রয়ার টানিয়া আপিসেরই কয়েকটা টাকা সে পকেটে পুরিয়া লইল এবং অতিশয় উত্তেজনাভরে বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল, আরও দুই স্থানে যাইতে হইবে। প্রথম শৈলর বাসায়, দ্বিতীয় আস্‌মি-দার্‌জির পিতা নিবারণবাবুর কাছে। কুমার পলাশকান্তি যদিও আজ যাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে আজ যাওয়া হইবে না, সময় নাই। চুনচুন্, শৈল এবং নিবারণবাবু সারিয়া ভন্টুর বাসায় পৌঁছিতে এমনিই অনেক রাত হইয়া যাইবে।

অমিয়ার মুখখানা মনে একবার উঁকি দিয়া গেল। পথে হঠাৎ পলাশকান্তিরই সহিত দেখা। তিনি তাঁহার মূল্যবান মোটরখানি নিঃশব্দে থামাইয়া জানালা দিয়া গলা বাড়াইলেন। কুমার পলাশকান্তি (বন্ধু ও পারিষদবর্গ তাঁহাকে আদর করিয়া 'কুমার' বলিয়া ডাকেন, সত্যই তিনি নহেন) এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা নারীসুলভ কমনীয়তা এবং সেই ধরনের দীপ্তি বিদ্যমান, যাহার মূল কারণ প্রতিভা নহে, আর্থিক সচ্ছলতা এবং অভিজাত-সমাজ-সঙ্গ। প্রিয়দর্শন ব্যক্তি তিনি।

শঙ্করবাবু, আমার কাছেই যাচ্ছেন নাকি?

না, জরুরি দরকারে আর এক জায়গায় যেতে হচ্ছে। আপনার কাছে কাল যাব।

আমার গল্পের কত দূর?

অর্ধেকের ওপর হয়ে গেছে।

আচম্বিতে শঙ্করের মুখ দিয়া মিথ্যাই বাহির হইয়া পড়িল।

মুহূর্তকাল নীরবতার পর পলাশকান্তি বলিলেন, আজ কাগজ পড়েছেন?

না।

অচিনবাবুর দশ বছর জেল হয়ে গেল। আজ রায় বেরিয়েছে।

সংবাদটার জন্য শঙ্কর প্রস্তুত ছিল না। সহসা তাহার মনে বহুদিন আগেকার একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিল। অচিনবাবুর সহিত সে একবার ওই বৃদ্ধ ম্যানেজারটার নিকট গিয়াছিল টাকার চেষ্টায়। অচিনবাবু বলিয়াছিলেন যে, বুড়োকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে অনায়াসেই হাজারখানেক টাকা ধার পাওয়া যাইতে পারে, বেশি সন্তুষ্ট করিতে পারিলে সুদ পর্যন্ত লাগিবে না। তিনি টাকা দিতে রাজি হইয়াছিলেন; কিন্তু পরিবর্তে যে প্রস্তাবে শঙ্করকে রাজি হইতে বলিয়াছিলেন, শঙ্কর তাহা পারে নাই।

পলাশকান্তি বলিলেন, সমস্ত ডিটেল্‌স আজ কাগজে বেরিয়েছে, পড়ে দেখবেন; উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। ওই ম্যানেজারটা সাঙ্ঘাতিক লোক ছিল মশাই। আর সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে এই যে, লোকটা অনেকদিন থেকে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তার কামনা মরেনি।

শঙ্করের নিকট ইহা নতুন খবর নহে। তবু সে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, তাই নাকি?

এই যে কাগজে বেরিয়েছে, দেখুন না, সৌদামিনী আর তার মেয়ে সাক্ষী দিচ্ছে, কাগজখানা আপনি রাখুন, আমার পড়া হয়ে গেছে।

শঙ্কর কাগজখানা লইয়া দেখিতে লাগিল। সমস্ত খবরই বাহির হইয়াছিল। অচিনবাবু বৃদ্ধ ম্যানেজারকে যে চিঠিখানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া খগেশ্বর অচিনবাবুর কন্যাকেই ভুলাইয়া আনিয়া ম্যানেজারের কবলে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া অচিনবাবু ম্যানেজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। পলাশকান্তি বলিলেন, আমার এ গাড়িখানা অচিনবাবুই কিনে দিয়েছিলেন, তখন কে জানত যে ভদ্রলোক এমন ধারা—

কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া শঙ্কর বলিল, ভদ্রলোকের ওয়ারিশ কেউ নেই?

না, অথচ টাকার কুমির। একটা উইল নাকি করে গেছেন, এখন তা কোর্টের জিম্মায়।

ও।

এ রকম নরপিশাচ দেখা যায় না। মশাই, কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। কাগজে একটা ফর্দ দিয়েছে দেখেছেন? সি আই ডি বেচারিদেরও কম খাটতে হয়নি। লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।

একটু থামিয়া পলাশকান্তি পুনরায় বলিলেন, এতে হয়ত উপন্যাসের খোরাকও পাবেন আপনি। এই নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে দিন না আমাকে, দেবেন? বেশ সাইকোলজিকাল-গোছের একটা—

আচ্ছা পড়ে দেখব। এখন একটু তাড়া আছে, চলি।

আচ্ছা।

কাগজটা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর পলাশকান্তির নিকট বিদায় লইল। অচিনবাবুর কথাই

ভাবিতে ভাবিতে সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। মোটরের দালাল অচিনবাবু! কতটুকুই বা তাহার সঙ্গে পরিচয় ছিল? লোকটার জীবনে যে এত জটিলতা এবং তাহার পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত জেলে, তাহাই বা কে জানিত! সহসা শঙ্করের মনে হইল, কাহার সহিতই বা তাহার এতদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর পরিচয় আছে? কাহার জীবনের সম্পূর্ণ রহস্য সে জানে? এমনকি, নিজের বিষয়েও তাহার জ্ঞান কতটুকু? এই প্রসঙ্গেই তাহার মনে পড়িল যে, যদিও তাহার মনের মধ্যে একটা নারীমাংসলোলুপ পশু বাস করে, কিন্তু কই, সেদিন ম্যানেজারের প্রস্তাবে সে তো সম্মত হইতে পারে নাই? পশুটার মাংসলোলুপতা হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল কী করিয়া? .. অচিনবাবুর সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। রিনির জন্মদিনে মিষ্টিদিদি আলাপ করাইয়া দিয়াছেন। কোথায় রিনি! তাহার ডাক্তার স্বামীকে লইয়া সে হয়ত সুখেই আছে। শঙ্করের কথা হয়ত তাহার মনেই পড়ে না। কোথায় রিনি, কোথায় অচিনবাবু, কোথায় মিষ্টিদিদি! জীবনে একদিন যাহারা কত বড় ছিল, আজ তাহাদের কথা মনেও পড়ে না। বেলার মুখখানিও মনের মধ্যে ভাসিয়া আসিল— গ্রীবা বাঁকাইয়া অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ভ্রূভঙ্গিভরা হাসি হাসিতেছে। একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে না।

চার

ট্রাম হইতে নামিয়াই শঙ্কর দেখিতে পাইল, চুনচুন্ মাঠে ঘাসের ওপর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। শঙ্কর মিসেস স্যানিয়ালের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু চুনচুন্‌কে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যতদিন সে অব্যবস্থিত ছিল, ততদিনই সে চুনচুনের সহিত দেখা করে নাই। কিন্তু 'সংস্কারক' আপিসে চাকরি হওয়ামাত্র সে মিসেস স্যানিয়ালের দৃষ্টি এড়াইয়া চুনচুনের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। কলিকাতার শহর এবং বর্তমান যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার কল্যাণে তাহা অসম্ভব হয় নাই। চুনচুনের অবস্থা এখনও ঠিক পূর্ববৎ। এখনও সে ঠিক আগের মতই মিসেস স্যানিয়েলের নিষ্পাপ গৃহস্থালিতে মিসেস স্যানিয়ালের উপদেশাবলী; মিসেস স্যানিয়ালের পুত্রদ্বয়ের অনুকম্পা, মিসেস স্যানিয়ালের বৃদ্ধ দেবর পীতাম্বরবাবুর নিষ্পলক দৃষ্টি সহ্য করিয়া নীরবে বাস করিতেছে, এতটুকু বিদ্রোহ করে নাই। আজকাল শঙ্করের সহিত তাহার সম্পর্ক অনেকটা গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের ন্যায়। শঙ্কর তাহাকে বই দেয়, সে তাহা পড়িয়া ফেরত দেয়। ফেরত দেওয়ার সময় পঠিত পুস্তক লইয়া হয়ত মাঝে মাঝে আলোচনাও হয়। এই আলোচনায় একজন গ্রন্থকার অদৃশ্যভাবে বর্তমান থাকিলেও সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনায়াসে ইহা এতদিনে তাহাদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙক্ষা-আকুতিময় আলাপে পরিণত হইতে পারিত, শঙ্করের সেদিকে প্রবণতাও যে কিছু কম তাহা নহে, কিন্তু চুনচুন্ মেয়েটি সত্যই অদ্ভুত। সে কোনোদিন কোনো আচরণ দ্বারা ইহার সম্ভাবনাকে পর্যন্ত প্রশ্রয় দেয় নাই। একটা সুন্দর শুভ্র ফুলে খানিকটা কালি ঢালিয়া দেওয়ার চেষ্টা যেমন সুস্থ সহজ মানুষ করে না, তেমনই শঙ্করও চুনচুনের সহিত কোনোদিন প্রেমালাপ করিবার চেষ্টা করে নাই। শঙ্করের মনে হয়, চুনচুন্‌ও তাহাদের সম্পর্কটাকে বোধহয় এই একই মনোভাব লইয়া দেখে— যদিও কী যে তাহার মনোভাব শঙ্কর তাহা বুঝিতে পারে না! ইহার রহস্যময়তা তাহাকে অনুসন্ধিৎসু করে কিন্তু বাহিরে শঙ্কর শোভন সংযত ভাবটা বজায় না রাখিয়া পারে না। তাহার মনে হয়, এই দুর্ভেদ্য আবরণ একদিন স্বাভাবিক নিয়মে খসিয়া পড়িবেই; কিন্তু কী করিয়া কখন কাহার জন্য যে পড়িবে, তাহা তাহার কল্পনাতীত। শঙ্কর যখনই চুনচুনের সহিত দেখা করিতে আসে, সঙ্গে

করিয়া কিছু টাকা আনে। চুনচুনের ফোন আসিলেই তাহার মনে হয়, নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়িয়াছে, মিসেস স্যানিয়াল হয়ত তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, কিংবা হয়ত নিজেই সে উত্ত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারেই সে গিয়া হতাশ হয়। স্মিত নম্র হাসি হাসিয়া চুনচুন্ বই ফেরত দেয়, কিংবা হয়ত কোনো দুর্বোধ্য অংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করে, কিংবা অমনই একটা কিছু। নাটকীয় কোনো কিছু ঘটে না। অথচ শঙ্করের মনে হয়, ভিতরে ভিতর মেয়েটি না জানি কোন্ রহস্যময় লোকের অধিবাসিনী, সঙ্গোপনে কী যেন ভাবিতেছে, কিন্তু এসবের কোনো বাহ্যিক প্রমাণ শঙ্কর কোনোদিন পায় নাই। কালো রঙ, ছিপছিপে গড়ন, স্বপ্নময় চোখ, এতদিন আলাপ, মেয়েটি শঙ্করকে কল্পনায় আকৃষ্ট করিতেছে, অথচ কাছে আসিলে ইহার সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মোহ যেন ফুরাইয়া যায়।

কী খবর?

খবর আছে একটা, আমি কলেজে ভর্তি হব, কোন্ কলেজ ভাল বলুন দিকি— বেথুন, না ডায়োসেশন?

শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

এতদিন পরে হঠাৎ কলেজে পড়ার শখ?

শখ অনেকদিন থেকেই ছিল, খরচ জুটছিল না।

এখন জুটল কোথা থেকে?

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে— অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইল— চুনচুন্ বলিল, পীতাম্বরবাবু দেবেন।

পীতাম্বরবাবু? হঠাৎ তাঁর এত দয়া?

চুনচুন্ এ কথার জবাব দিল না। ক্ষণকাল নীরবতার পর পুনরায় প্রশ্ন করিল, কোন্ কলেজটা ভাল, বলুন না?

তা পীতাম্বরবাবুই ঠিক করে দেবেন?

পীতাম্বরবাবু নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানেন না, তিনি আমাকেই ঠিক করতে বলেছেন।

মিসেস স্যানিয়াল তো আছেন।

তিনি বেথুন কলেজের পক্ষপাতী। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে বেথুন কলেজে যদি আমার আপত্তি থাকে, তা হলে আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি বাধা দেবেন না।

ওঃ।

ক্ষণকাল নীরবতার পর চুনচুন্ পুনরায় জিজ্ঞাস করিল, কোন্ কলেজটা ভাল?

এখন ঠিক বলতে পারছি না, খোঁজ নিয়ে কাল বলব।

বেশ। চলুন, অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

এ কথাটুকু ফোনে বললেই পারতে।

আপনি অবসর দিলেন কই, আপনাকে আসতে বলে তখনই ভাবলাম— ফোনেই জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আপনি তখন কেটে দিয়েছেন।

উভয়েই নীরবে পাশাপাশি খানিকক্ষণ হাঁটিল। চুনচুন একটু পরে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি কাজ ক্ষতি করে এসেছেন বুঝি? আমি—

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, অকৃত্রিম কুণ্ঠাভরে চুনচুন্ যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে।

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না।

নীরবে খানিকক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর শঙ্কর প্রশ্ন করিল, 'চোখের বালি' কেমন লাগছে?

খুব ভাল লাগছে না।

লাগছে না?

আমি বুঝতে পারছি না বোধ হয়।

সহসা শঙ্করের মনে হইল, হয়ত ইহার রসবোধ নাই এবং সেইজন্যই বোধ হয় ইহার জীবনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। হয়ত—

হর্ন দিতে দিতে একটা ট্যাক্সি আগাইয়া আসিল। শঙ্করের চিন্তাধারা ভিন্ন পথ ধরিল।

চল, তোমাকে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিই।

চলুন।

ট্যাক্সিতে উভয়ে চড়িয়া বসিল।

পাঁচ

শঙ্কর যখন শৈলর বাসায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ড্রইংরুমে ঢুকিতেই মিস্টার এল কে বোসের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি নিখুঁত সাহেবি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন। শঙ্করকে দেখিয়া থামিলেন এবং ফেল্টের টুপিটি মাথা হইতে ঈষৎ আলগা করিয়া শঙ্করকে অভিবাদন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, হঠাৎ পথ ভুলে না কি?

শঙ্কর একটু মৃদু হাসিল।

বহুদিন আপনার দেখা নেই, আগে যা-ও বা আসতেন, খ্যাতিলাভ করার পর থেকে তো একেবারে বর্জন করেছেন আমাদের। আজ হঠাৎ কী মনে করে?

শৈল ডেকে পাঠিয়েছে।

সো সিলি অব হার। আপনার মত 'বিজি' লোককে ডেকে পাঠানো!

শঙ্কর পুনরায় হাসিল, মিস্টার বোসও হাসিলেন। তাহার পর পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস বাহির করিয়া শঙ্করের সামনে সেটি খুলিয়া ধরিলেন, আমরা আর বেশি দিন এখানে নেই, বদলির খবর এসেছে।

কোথা যাচ্ছেন?

এলাহাবাদ।

শঙ্কর একটি সিগার তুলিয়া লইল, মিস্টার বোস একটি চকচকে সিগারেট লাইটার বাহির করিয়া সেটি ধরাইয়া দিলেন, নিজেও একটি ধরাইলেন। এক্স্‌কিউজ মি, আমাকে বেরুতে হচ্ছে ক্লাবে; ব্রিজ টুর্নামেন্টে জয়েন করেছি, আজ আমার খেলার দিন, উইল্‌সনের সঙ্গে খেলতে হবে, সে সোজা লোক নয়, সুতরাং একটু—

অর্থপূর্ণ একটা মুচকি হাসি হাসিয়া মিস্টার বোস অসম্পূর্ণ বাক্যটাকে পূর্ণতা দান করিলেন। তাহার পর দাঁতে সিগারেট চাপিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অন্তরঙ্গের মত আন্তরিক সহৃদয়তার সহিতই প্রশ্ন করিলেন, শুধু খ্যাতিই হচ্ছে না, পকেটে কিছু আসছে? দ্যাট ইজ হোয়াট ম্যাটার্স ইন দি লং রান, ইউ নো—

শঙ্কর কিছু না বলিয়া আর একটু হাসিল। মিস্টার বোস হাতঘড়ি দেখিলেন। তাহার পর ঘরের কোণে গিয়া ছড়ি রাখিবার র‍্যাক হইতে একটি ছড়ি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, হেঁটেই যাওয়া যাক। শঙ্করের পানে চাহিয়া হাসিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বিশেষ কোনো ভঙ্গিভরে

গেলেন না, কিন্তু তবু শঙ্করের মনে এই অনুভূতিটুকু জাগাইয়া দিয়া গেলেন যে, তিনি পদব্রজে ক্লাবে গমন করিয়া একটা অসাধ্যসাধনই বুঝি-বা করিলেন। শঙ্করের কেন এরূপ মনে হইল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত বলিতে পারিত না, কিন্তু তাহার মনে হইল।

শঙ্কর ভিতরে ঢুকিয়া নিচে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। নিচের দালানে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব বিমর্ষভাবে জ্বলিতেছে, চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে ভাব। কী করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং বলিল মাঈজি উপরে আছেন। উপরে উঠিতে উঠিতে তাহার নিজেরই কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল। সত্যিই শৈলর কথা আজকাল মনেই পড়ে না।

শৈল দালানেই ছিল, পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল। কোনো প্রশ্ন করিল না।

তুই এসব কী করছিস?

শৈল তবু উত্তর দিল না। কাঁচি দিয়া কি কাটিতেছিল, নীরবে তাহাই কাটিতে লাগিল।

শৈল দালানে ছোটখাট একটি দর্জির দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল যেন। কাঁচি, কল, ফিতা, ফ্রিল, ছিট, প্যাটার্ন— চতুর্দিকে ছড়ানো। শঙ্কর নিকটের চেয়ারটায় বসিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেল। সবই ছোট ছেলের জামা, একেবারে শিশুর গায়ের।

এত জামা করছিস কার জন্যে, তোর দাইয়ের কটা ছেলেমেয়ে—

কেন, দাই ছাড়া আর কারও ছেলেমেয়ে হতে নেই?

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, যদিও পা-কল, তবু শৈল হাত দিয়া ঘুরাইয়া সেলাই করিতেছে। আরও লক্ষ্য করিল, শৈলর মুখে একটা পাণ্ডুর সুন্দর শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতৃত্বের পূর্বাভাস। শঙ্কর বুঝিল, কিন্তু কিছু বলিল না। শৈলও নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ আজ ডেকে পাঠিয়েছিস কেন?

শৈল কিছু বলিল না, সেলাই থামাইয়া উঠিয়া গেল। মিনিট কয়েক পরে ঘর হইতে একটা খাতা আনিয়া বলিল, এই নাও।

কী এ?

শঙ্কর খাতাখানা চিনিতে পারিয়াছিল, তবু প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তোমার কবিতার খাতাখানা ফিরিয়ে দিলুম।

শঙ্কর খাতাখানা হাতে লইয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, কী যে বলিবে সহসা ভাবিয়া পাইল না। শৈল আবার কলে আসিয়া বসিল এবং নীরবে সেলাই করিতে লাগিল। শঙ্কর শৈলর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিল; তাহার মনে হইল শৈল যেন বড় বেশি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, মুখখানা যেন শ্বেতপাথরের তৈরি, চুনির দুলটা আলোকবিদ্ধ একবিন্দু রক্তের মত কাঁপিতেছে।

এতদিন পরে খাতাখানা ফিরিয়ে দেওয়ার মানে?

ও খাতা রাখবার আর আমার অধিকার নেই।

শৈল কল ছাড়িয়া আবার উঠিল এবং ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। পর মুহূর্তেই কপাটটা একটু খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল, আমার কিছু বলবার নেই শঙ্করদা, তুমি আর তোমার সময় নষ্ট করে বসে থেকো না, তোমার অনেক কাজ। আমার শরীরটা ভাল নেই, একটু শুই আমি, বড় ক্লান্ত লাগছে।

আবার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। শৈল তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। সেই শৈল। একবার তাহার মনে হইল, শৈলকে ডাকে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ডাকিয়া কী হইবে? দুই-চারিটা মৌখিক মিষ্ট বচনে আর কতকাল তাহাকে ভুলাইবে সে? এ ভণ্ডামির প্রয়োজনই বা কী?

শঙ্কর নামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কাগজ পোড়া গন্ধ পাইয়া শৈল তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দেখিল, কবিতার খাতাখানা সিগারের আগুনে পুড়িতেছে। অন্যমনস্ক শঙ্কর খাতাখানার উপর জ্বলন্ত সিগারটা নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ছয়

মৃন্ময়ের বাসায় থাকিবার সময় আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবুর সহিত শঙ্করের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইহার ফলে নিবারণবাবু যেন বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ভন্টুর ব্যবহারে নিবারণব মর্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বাপেক্ষা আহত হইয়াছিলেন তিনি ভন্টুর অন্তর্ধানে। সেই হইতে ভন্টু আর নিবারণবাবুর বাসায় পদার্পণ করে নাই। ভন্টুর লজ্জা করিত।

প্রতিবেশী হিসাবে কিছুদিন বাস করিয়া শঙ্কর ভন্টুর স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যেই শঙ্করের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে নিবারণবাবু শুধু আকৃষ্ট নন, বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্কর মুকুজ্জেমশাইয়ের স্নেহভাজন, শঙ্কর নিজে চাকরি না লইয়া মৃন্ময়কে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে, শঙ্কর বিদ্বান একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, সর্বোপরি সে ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে — এই সকল ধারণা থাকাতে নিবারণবাবু শঙ্করের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজকাল কোনোরূপ বিপদে পড়িলে শঙ্করের কথাই তাঁহার সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁহার চিররুগ্ন স্ত্রীর কী সেবাটাই না শঙ্করবাবু করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত বাঁচেন নাই কিন্তু লোকটির যে পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন তাহা কোনোদিন ভুলিবার নয়।

শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিতেই নিবারণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আসুন শঙ্করবাবু, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি, দোকানে বেরইনি এখনও।

গলির মধ্যে নিবারণবাবুর চায়ের দোকানটি এখনও ঠিক আছে, প্রত্যহ তিনি সেখানে গিয়া বসেন।

কেন, ব্যাপার কী?

আস্‌মির খোঁজ পাওয়া গেছে, মুকুজ্জেমশাই ধুবড়ি থেকে এই চিঠি লিখেছেন দেখুন।

শঙ্কর পত্রখানি লইয়া পড়িয়া দেখিল। অনেক অনুসন্ধানের পর মুকুজ্জেমশাই ধুবড়িতে আস্‌মি এবং মাস্টারকে অবিষ্কার করিয়াছেন। আই বি ডিপার্টমেন্টের একজন পরিচিত পদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় এ কার্য সফল হইয়াছে। মুকুজ্জেমশাই কেবল তাহাদের আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের দুজনের বিবাহও দিয়াছেন। লিখিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়াই সর্বাপেক্ষা সমীচীন। পাছে নিবারণবাবু কোনোরূপ আপত্তি তোলেন, তাই তাঁহাকে এ কথা জানানো হয় নাই। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মাস্টারের একটি চাকরিও তিনি চা-বাগানে জুটাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পরিচিত একটি ম্যানেজারের সহিত দেখা হইয়া যায়, তিনি অবিলম্বে মাস্টারকে তাঁহার অধীনে ভর্তি করিয়া লইয়াছেন, মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। নিবারণবাবু যেন বিবাহব্যাপারে ক্ষুব্ধ না হন, কপিলবাবু (অর্থাৎ মাস্টার) কুলীন না হইলেও তাঁহার স্বজাতি এবং মোটের উপর লোক মন্দ নয়। মানুষ

দেবতা নয়, তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করিতে হইবে বৈকি।

শঙ্কর পত্রখানি পাঠ করিয়া নিবারণবাবুকে ফেরত দিল।

বুঝলেন, কদিন থেকে আমার ডান চোখের ওপর পাতাটা ক্রমাগত নাচছিল।

শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিল, ভালই তো হয়েছে।

ভাল। একে ভাল বলেন আপনি। ওই নচ্ছারটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে, এ কথা ভাবতেও যে গা শিউরে ওঠে মশাই।

যাক, সে তো যা হওয়ার হয়ে গেছে, এইবার তাদের আসতে লিখুন।

আসতে লিখব? আমি? নিবারণ শর্মা সে বান্দাই নয়। ওদের আর মুখদর্শন করব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, বুঝলেন, মুখদর্শন করব না। ওই কালসাপকে আবার নেমন্তন্ন!

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর নয়। এখন আপনাকে যে জন্যে ডেকেছি, তাই বলুন। তাদের কোনো খবর পেলেন?

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল।

না, এখনও তারা খবর দেয়নি, আমি খোঁজ করব কাল।

করবেন দয়া করে একটু। মেয়েটার একটা গতি করে আমি সোজা কাশী চলে যাই মশাই, আর পারি না।

যে পাত্রটি সেদিন দার্জিকে দেখিয়া গিয়াছিল— (শঙ্করই তাহাকে যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল) সে দার্জিকে পছন্দ করে নাই। শঙ্কর ইহা জানিত, কিন্তু রূঢ় সত্যটা সে বলিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি উঠি এখন, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।

কাল খবরটা নেবেন?

নেব।

মাঝে একদিন আর এক ছোকরা দেখে গেল, তার পছন্দ হয়নি।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিবারণবাবু বলিলেন, পছন্দ হলেও তার সঙ্গে আমি দিতুম না, ঠোঁটে ধবল, তিন কুলে কেউ নেই।

ও, তাই নাকি?

আর বলেন কেন? যত ব্যাটা কদর্য লোফার শ্বশুরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার চেষ্টায় আছে।

শঙ্কর একটু হাসিল।

আমি আজ যাই, তাড়া আছে।

আসুন, আপনার নানা কাজ, আমার কথাটা মনে রাখবেন।

আচ্ছা। শঙ্কর বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তা হইতে শুনিতে পাইল, নিবারণবাবু বলিয়া উঠিলেন, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

সাত

ভণ্টুর বাসায় যখন শঙ্কর গিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। মাহিনা বাড়াতে ভণ্টুর দৈন্যদশা অনেকটা ঘুচিয়াছিল। মুখে সে যা-ই বলুক, চাল সে বদলাইয়াছে। আগে

বাড়িতে ঢুকিলেই ময়লা বিছানা, ছেঁড়া মাদুর, দড়ির আলনায় স্তূপীকৃত মলিন জামাকাপড়, দালানের কোণে ভাঙা তক্তপোশ প্রভৃতিতে যে দারিদ্র্য প্রকট হইয়া থাকিত, এখন তাহা আর নাই। বাড়িতে এখন বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিয়াছে। সে বাড়িও এখন নাই, ভণ্টু বাড়ি বদলাইয়াছে, বেশ ভদ্রগোছের দ্বিতল একটি বাড়ি। দ্বিতলের ছোট দুইখানি ঘর লইয়া ভণ্টু থাকে, একটি শুইবার বসিবার ঘর— অপরটি বাথরুম। বাথরুম না হইলে ইন্দুমতীর চলে না। একতলার শ্রেষ্ঠ ঘরখানি অবশ্যই বাকু লইয়াছেন। ঢুকতেই প্রথমে বাকুর ঘর।

ঢুকিয়াই শঙ্কর বাকুর দরাজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, উপদেবতা নন। তা হ'লে বাঁচা গেল। কিন্তু অবিশ্বাস কর না, ওঁরা আছেন।

বউদিদির সহিতই হইতেছিল। বউদিদি ঘরের মেঝেতে পান সাজিতে সাজিতে শ্বশুরের সহিত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে দিতে গল্প করিতেছিলেন। ঘাড় নাড়িয়া যখন কুলাইতেছিল না, তখন উঠিয়া গিয়া শ্বশুরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছিলেন। বধির বাকু তাহা না হইলে কিছুই শুনিতে পান না। শঙ্করকে দেখিয়া বউদিদি একমুখ হাসিয়া সংবর্ধনা করিলেন।

এস, বড় রাত করলে কিন্তু। ঠাকুরপো বোধ হয় তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। মৃন্ময় ঠাকুরপোও আসেনি এখনও।

ভুতের গল্প হচ্ছিল না কি?

বউদিদি হাসিলেন।

ভণ্টুর অসুখ করেছিল কি না, তার পথ্যের দিন ঠাকুরপোর আপিসের এক বন্ধু কিছু জ্যান্ত কইমাছ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছগুলো দালানের কোণটায় ঢালা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা মাছ কখন যে লাফাতে লাফাতে গিয়ে ওর পুরনো বড় তোরঙ্গটার পেছনে গিয়ে ঢুকেছিল, তা আমরা কেউ টেরও পাইনি। ক্রমে সে মাছ মরে পচে বাড়িময় দুর্গন্ধ, ঠাকুরপো চারিদিকে ফিনাইল ছেটাচ্ছে, কিছুতেই গন্ধ যায় না। বাবা বললেন, পত্রপাঠ এ বাড়ি বদলাও, নিশ্চয় কোনো উপদেবতা আশ্রয় করেছে। আজ ঘর ধোয়া হচ্ছিল, তোরঙ্গটা সরাতে গিয়ে সেই পচা মাছ বেরল।

বউদিদি হাসিতে লাগিলেন।

শঙ্কর বলিল, যত আজগুবি কাণ্ড আপনাদের, এ যুগে ভূত আছে না কি?

বউদিদি উঠিয়া বাকুর কানে চুপিচুপি বলিলেন, শঙ্কর ঠাকুরপো ভূতটুতে একদম বিশ্বাস করে না, বলছে, আপনাদের যত সব আজগুবি কাণ্ড।

বাকু তামাক খাইতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গড়গড়ার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি নলটি মুখ হইতে নামাইয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল শঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর নল দিয়াই সামনের মোড়াটা দেখাইয়া বলিলেন, বস। তোমরা আজকালকার ছোকরারা, দুপাতা ইংরেজি পড়ে কিছুই তো মানতে চাও না। একটা গল্প বলি শোন।

বৃদ্ধ গড়গড়ায় একটা মধ্যম গোছের টান দিয়া শুরু করিলেন, শোন। তখন আমি ঝরিয়া কলিয়ারিতে কন্ট্রাক্টারি করি। ঠিক দুপুরবেলা, বোশেখ মাস, ঝাঁঝাঁ করছে রোদ্দুর চারিদিকে, কোল রেজিং হচ্ছে, আমি শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখলুম, ভণ্টুর গর্ভধারিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে টকটকে লালপেড়ে কাপড়, মাথায় চওড়া সিঁদুর। আমি অবাক হয়ে গেলুম, এখানে এল কী করে, কথা কইতে যাব, মিলিয়ে গেল।

বাকু গড়গড়ায় টান দিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

খানিকক্ষণ পরে টেলিগ্রাম পেলুম, মারা গেছে। তোমার সায়েন্স কী বলে?

কোথায় ছিলেন তিনি?

দেশের বাড়িতে, দুশো মাইল দূরে।

শঙ্কর কী বলিবে, চুপ করিয়া রহিল। বউদিদি বহুবার শ্রুত এই কাহিনীটি আর একবার শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে পানের খিলিগুলিতে লবঙ্গ গাঁথিতে লাগিলেন। এই হাসি বাকু যদি দেখিতে পান, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি খিলিগুলি মুড়িয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তুমি বস, আমি ঠাকুরপোকে ডেকে দিই।

বাকু গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ তাম্রকূট চর্চা করিয়া প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিলেন।

বউটিকে নিয়ে এস একদিন, দেখি।

তাহার পর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, মিলিয়ে দেখেছিলে?

শঙ্কর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল।

ঠিক মিলে গেছে তো? জানি, মিলবেই।

শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। বাকুর বদ্ধ ধারণা, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মুখ এক ছাঁচের হইবেই। ভণ্টুর বিবাহের পরও বাকু শঙ্করকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছেন, লক্ষ্য করে দেখ তুমি, ভণ্টুর আর নতুন বউমার মুখের 'কাট্' হুবহু এক রকম, হতেই হবে যে। ভণ্টুর গর্ভধারিণীর ফটোগ্রাফ আছে, আমার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ— নাক মুখ চোখ গড়ন সমস্ত এক রকম। শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াছিল, কারণ প্রতিবাদ করা বৃথা। বাকু এ বিষয়ে এমন গোঁড়া যে, যদি কোনো স্বামী-স্ত্রীর মুখ এক রকম না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ধারণা, স্বামী-স্ত্রী নয়, কোনোরূপ গোলমাল আছে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পও তিনি করেন। একবার ট্রেনে যাইতে যাইতে তিনি নাকি একটি বেখাপ্পা দম্পতি দেখিয়াছিলেন। স্বামীর মুখ গোলাকার, কিন্তু স্ত্রীর সোজা লম্বা। বাকুর ঘোরতর খটকা লাগে। দুই-চারি স্টেশন পরেই খটকা ভাঙিল, পুলিশ আসিয়া হাজির হইল, ছোকরা আর একজনের স্ত্রীকে লইয়া সরিতেছে।

মৃন্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল।

বউদিদি আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো তোমাদের ওপরেই যেতে বললে। তোমরা ওপরে বসগে, আমি গরম-টরম করি ততক্ষণ।

বাকু দরাজ গলায় আদেশ করিলেন, বউমা, এ কলকেটায় আর কিছু নেই, তুমি আর একটা কলকে ঠিক করে দিয়ে যাও।

মৃন্ময় ও শঙ্কর ওপরে উঠিয়া যাইতেছিল। শঙ্করের বগলে একটা পুলিন্দা ছিল, শঙ্কর তাহা যথাসম্ভব সঙ্গোপনেই রাখিয়াছিল, তবু তাহা বউদিদির দৃষ্টি এড়াইল না।

বগলে ওটা কী, শঙ্কর ঠাকুরপো?

শাড়ি একখানা।

অমিয়ার জন্যে কিনলে বুঝি?

শঙ্কর কেবল মুচকি হাসিয়াই উত্তর দিল।

মৃন্ময়ও হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার হাসিটা কেমন যেন প্রাণবন্ত হইল না বরং মুখখানা যেন আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। হাসিকে শাড়ি কিনিয়া দেওয়ার ঘটনাটা তাহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিল বোধ হয়। ঘটনাটা অনেক দিনের হইলেও সে ভোলে নাই।

শঙ্কর ও মৃন্ময় উপরে উঠিয়া গেল।

ভণ্টু বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দুমতী ঘরের এক কোণে বসিয়া উলের কী যেন একটা বুনিতেছিল। শঙ্কর ও মৃন্ময় প্রবেশ করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও আধুনিক কায়দা অনুযায়ী নমস্কার করিল।

আসুন।

ঘরে খানকয়েক মোড়া ছিল, শঙ্কর ও মৃন্ময় উপবেশন করিল। ভণ্টু বিছানায় উপুড় হইয়াই রহিল এবং বলিল, শঙ্কর, তুই এসে আমার কোমরটার ওপর চড়ে বস্‌ত।

কেন, কী হল কোমরে?

জখম হয়েছে।

ইন্দুমতী মুখ টিপিয়া হাসিল এবং বলিল, আমি যাই নিচে, দেখি গে, দিদি কী করছেন!

ভণ্টু উঠিয়া বসিল এবং বলিল, লব্‌স্টারমেধ যজ্ঞের হোতাকে আর খুঁজলে লাভ কী তিনি একাই একশো।

ইন্দুমতী বলিল, চা করে আনব?

শঙ্কর বলিল, এখন আর চা খেয়ে কী হবে? আপনি বসুন।

ভণ্টু মুখ সুচালো করিয়া বলিল, ওঁকে অত সমীহ করে লাভ কী? উনি একটি চামাটু, লুকিয়ে চিংড়িমাছ ভাজা খেতে চান।

ইন্দুমতী বড় বড় চোখ দুইটি ভণ্টুর মুখের ওপর স্থাপন করিয়া বলিল, তুমি সবাইকে ওই কথা বলে বেড়াচ্ছ বুঝি?

ভণ্টু গলার ভিতর হইতে গোঁক-গোঁক শব্দ করিল।

মৃন্ময় ভণ্টুর সান্নিধ্যে কখনও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, হয়ত সে এই নিমন্ত্রণেও আসিত না, কিন্তু ভণ্টুকে এড়াইয়া চলা এখন তাহার পক্ষে অশোভন, ভণ্টু এখন তাহার উপরওয়ালা কেরানি। শঙ্করের পকেট হইতে কুমার পলাশকান্তির দেওয়া খবরের কাগজটা দেখা যাইতেছিল। মৃন্ময়ের তাহা চোখে পড়িতে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

আজকের কাগজ নাকি ওটা?

হ্যাঁ।

দিন তো, দেখাই হয়নি আজকের কাগজ।

কাগজখানা লইয়া সে এক ধারে সরিয়া বসিয়া পড়িতে শুরু করিয়া দিল।

শঙ্কর ইন্দুমতীকে বলিল, ভণ্টুর কথা বিশ্বাস করি না আমরা। বসুন আপনি।

অনুযোগ-ভরা সুরে ইন্দুমতী বলিল, দেখুন তো কাণ্ড, শণ্টু নণ্টু ওরা দু'জনে রোজই আমাকে বলত, কাকীমা, গলদাচিংড়ি ভাজা খাব, পয়সা দাও, দোকানে কেমন ভাজা হচ্ছে গরম, গরম। আমি তাদের বললুম, দোকানের ভাজা খাবার দরকার কী? গলদাচিংড়ি তোরা কিনে আন, আমি স্টোভে লুকিয়ে ভেজে দেব তোদের দুপুরে।

লুকিয়ে কেন?

ফন্তি মিনুর যে আবার পেট ভাল নয়, দেখতে পেলে কাঁদবে।

ভণ্টু মন্তব্য করিল, থিফ কোথাকার!

নিজেদের খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই বল, আমার নামে দোষ দেওয়া কেন শুধু শুধু?

অভিমানভরে ঠোঁট ফুলাইয়া ইন্দুমতী বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর একটু হাসিল এবং বলিল, বেচারিকে রাগালি শুধু শুধু?

ভণ্টু পুনরায় গোঁক-গোঁক করিরা শব্দ করিল। বিছানার উপর একটা রেজিস্টার্ড খাম পড়িয়া ছিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কী রে?

পানউলির পরামর্শে কানা করালীকে একটা রেজিস্টার্ড চিঠি লিখেছিলাম, চিঠিখানা ফিরে এসেছে।

সত্যি, কী করা যায় বল তো? আমি তো উইলের কথা মাকে কিছু বলিনি।

বলবার দরকার কী?

বাবার অত টাকা মাঠে মারা যাবে?

ব্যাঙ্ক মাঠ নয়!

কানা করালী যদি না ফেরে?

টাকাটা সুদে বাড়ুক না। তুই হাত দিলেই তো সব উড়ে যাবে, তোর হাত তো জাদুকরের হাত।

তবু একটা কিছু—

বছর কয়েক ঢোক গিলে বসে থাক এখন। পরে কোনো উকিলের পরামর্শ নিলেই হবে।

সেই কাকটা আছে এখনও?

সেটা ডাইং আপিস খুলেছে। পানউলি আর একটা এনে পুষেছে। ওর ধারণা, করালী ফিরে এসে যদি কাক দেখতে না পায় খুন করে ফেলবে ওকে।

বলিস কী?

লদ্‌লদে ব্যাপার। পানউলি শবরীফাইং।

সহসা মৃন্ময় চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি?

মনে হইল কেহ যেন তাহার মাথায় ডাঙশ মারিয়াছে।

কী?

এই দেখুন স্বর্ণলতার নাম রয়েছে।

ম্যানেজারের কবলে অচিনবাবুর সহায়তায় যে সব নারী কবলিত হইয়াছিল, কাগজে পুলিশ [illegible] যে ফর্দটা বাহির করিয়াছে, শঙ্কর দেখিল, তাহাতে সত্যই স্বর্ণলতার নাম রহিয়াছে। মৃন্ময় বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি বিহ্বল, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে।

আট

গম্ভীর, অন্ধকার রাত্রি।

বিনিদ্র শঙ্কর একা বিছানায় শুইয়া আছে। অতিশয় দ্রুত ছন্দে আজ সন্ধ্যা হইতে যে যে ঘটনাগুলি তাহার মানসপটে রেখাপাত করিয়া গেল, তাহাদেরই কথা সে ভাবিতেছিল। অচিনবাবু, [illegible], [illegible]বাবু, শৈল, মৃন্ময়, ভণ্টু, পলাশকান্তি, ম্যানেজার, কপিলবাবু, আস্‌মি, [illegible] — সকলেই একই জীবনের বিকাশ, অথচ প্রত্যেকেই কত বিভিন্ন। সে গত কয়েকদিন হইতে কাব্যরচনার উপযোগী বিষয় খুঁজিতেছিল, এই তো এত বিষয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তো নতুন বস্তুর পরিচয় মিলিতেছে, ইহাদের কয়েকটিকে একত্র করিয়া গাঁথিলেই তো কাব্য, প্রত্যেক জীবনের হাসি-কান্না, হতাশা-বৈরাগ্য, প্রকৃতির পীড়ন এবং সেই পীড়ন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস, ইহাই মানব জীবন এবং ইহাই মানব জীবনের কাব্য।

সমস্ত অন্তর দিয়া জীবনের সত্যকে অনুভব করিতে হইবে, কল্পনার বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত করিয়া তাহাকে বাণীলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সার্থকভাবে ইহা করিতে পারিলেই তো কাব্য হইল। মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিতে হইবে। সহসা কবি লোকনাথের কথাগুলি শঙ্করের স্মরণ হইল। তিনি সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন, কল্পনার ভঙ্গিতে ও রসসৃষ্টির আদর্শে লেখকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। আরও থাকা চাই বাস্তব সংসার ও সমাজের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, সৎ-অসৎ উচ্চনীচ সকলকেই অন্তরের মধ্যে স্থান দিয়া মানব জীবনের বিচিত্র বিকাশ হিসাবে দেখিতে হইবে। তাহাদের মহত্ত্ব-ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, তাহাদের জীবনচরিতের অন্তরালে অজ্ঞাত সেই প্রাণশক্তির দুর্জ্ঞেয় পিপাসার সন্ধান করিতে হইবে, যে পিপাসা নানা জনকে নানা পথে লইয়া যাইতেছে। ছোট খাঁচায় বড় পাখির পাখা ঝাপটানির যে রক্তারক্তি— মনুষ্য জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি, প্রকৃতিশাসিত মানুষের দুর্দশা, মূঢ় প্রবৃত্তি ও অমৃতের আকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের দ্বন্দ্বই কাব্যলোকের আলো-ছায়া।

... সহসা অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং ঘুমের ঘোরে শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল। রঙিন শাড়িখানি পাইয়া আজ সে ভারি খুশি হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অমিয়াকে মনে করিয়া শঙ্কর শাড়িখানা কিনে নাই, শাড়িখানা দেখিয়াই অমিয়ার কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল। নানারূপ ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সে অমিয়ার দিকে মন দিতে পারে না। মনে হয়, তাহার প্রতি সে অবিচার করিতেছে, বাহিরের ঐশ্বর্য দিয়া তাই সে অমিয়াকে ভুলাইতে চায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয়, সত্যই কি অমিয়া ভোলে? ভোলে কি না তাহা শঙ্কর জানে না, কিন্তু ইহা সে জানে যে, অমিয়া কখনও বিচলিত হয় না, তাহার আচরণ সম্বন্ধে কখনও কোনো প্রশ্ন করে না। শঙ্করের মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কখনও কোনো সন্দেহ তাহার মনে জাগে না, স্বামীর সম্বন্ধে কোনোরূপ হীন ধারণা পোষণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। নীরবে শান্তমুখে সে পত্নীর কর্তব্য করিয়া যায়। শঙ্কর নিজে কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বইকি। যুবতী পত্নীকে কোন্ যুবক স্বামী ভাল না বাসে।

নয়

শঙ্করের মা দেশে থাকেন। শঙ্করের অনুরোধ সত্ত্বেও শঙ্করের নিকট আসিয়া তিনি থাকিতে রাজি হন নাই! নানা অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি পল্লীগ্রামে থাকিতে চান। স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া তাঁহার স্মৃতি ধ্যান করিবার জন্য নয়, তাঁহাকে দেখিয়া ঠিক তাহা মনে হয় না, বরং মনে হয় যে, বিধবা হইয়া তিনি যেন সুস্থতরই হইয়াছেন। অম্বিকাবাবুর প্রখর প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহার মনের স্বাস্থ্য যেন বিকল হইয়াছিল, চাপমুক্ত হইয়া তিনি যেন সুস্থ বোধ করিতেছেন। তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন পল্লীপ্রীতির জন্যও নয়। অবশ্য নিরীহ প্রকৃতির মানুষ তিনি, নিজের পূজা আহ্নিক লইয়া অনাড়ম্বর নিরুপদ্রব পল্লীজীবন যাপন করা কষ্টকর নয় তাঁহার পক্ষে। কিন্তু এজন্যও তিনি পল্লীগ্রামে থাকেন না। একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া দেশে থাকার হেতু অন্য। তিনি দেশে থাকেন শঙ্করের জন্যই। দূর হইতেই তিনি পুত্রের মহিমাচ্ছটা নীরবে উপভোগ করেন, নিকটে আসিয়া তাহাতে ছায়াপাত করিতে তাঁহার বড় শঙ্কা হয়, নিকটে আসিলে তাঁহার দুর্ভাগ্যের ছায়া পাছে পুত্রকেও স্পর্শ করে। তাঁহার অন্য কোনো প্রকার পাগলামি নাই, কিন্তু তাঁহার এই একটা বদ্ধ ধারণা যে, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবে তাহার

ধ্বংস অনিবার্য। তাঁহার এক পুত্র গিয়াছে, স্বামী গিয়াছে, তাঁহার ধারণা তাঁহার সংস্পর্শে ছিল বলিয়াই গিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে তিনি শঙ্করের নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছেন।

কালীঘাটে একটা মানত ছিল, তাহাই শোধ করিতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া শঙ্করের কাছে কয়েকদিন ছিলেন। অমিয়া যদিও তাঁহার কাছে ইতিপূর্বে কিছুকাল ছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে তখন তেমন ভাল করিয়া দেখেন নাই। রঙিন-কাপড়-পরা নতমুখী বধূটি তখন তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত করে নাই! এই কয়দিনে অমিয়াকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে কেমন যেন একটা অনুকম্পামিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়াছে। অমিয়া শঙ্করের বধূ বলিয়া নয়, অমিয়া শঙ্করের অনুপযুক্ত বলিয়া অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। কিন্তু কিছু বলেন নাই। যখন তাঁহার মত্ততা থাকে না, তখন তিনি অতিশয় নীরব প্রকৃতির লোক, নিজেকে লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন এবং প্রায় অধিকাংশ সময় ঠাকুরঘরেই কাটান। অমিয়াকে তিনি লক্ষ্য করিলেন, একটা অনুকম্পামিশ্রিত স্নেহও জাগিল, ইচ্ছা হইল যে তাহাকে বকিয়া বকিয়া সংশোধন করিয়া শঙ্করের উপযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু তাহা হইলে শঙ্করের কাছে থাকিতে হইবে, তাহা অসম্ভব। তিনি মানত শোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ট্রেনে চড়িয়া শঙ্করকে শুধু মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বৌটাকে দেখিস একটু, সব সময়ে নিজেকে নিয়ে থাকলেই চলে?

ট্রেন চলিয়া গেল। হঠাৎ শঙ্করের মনে হইল, মা এ কথা বলিলেন কেন? ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মায়ের কথাটা সে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল। কোনো নিগূঢ় অর্থ আছে নাকি? পর মুহূর্তে হুইলারের স্টলের পুস্তকসম্ভার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সব ভুলিয়া সে সেই দিকেই আগাইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে কয়েকখানা বই কিনিয়া সে বাড়ি ফিরিল। ভাল বই দেখিলে সে লোভ সামলাইতে পারে না, ধার করিয়াও কিনিয়া ফেলে। জানে, সব বই সে পড়িবে না, পড়িবার সময় নাই, তবু কেনে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে থামিয়া গেল, চোখে পড়িল, দোতলার জানালায় অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখের একটা পাশ, কবরীর খানিকটা অংশ, রঙিন শাড়ির বিস্রস্ত প্রান্তটুকু, আর কিছু নয়— অমিয়ার এ রূপ সে তো কখনও দেখে নাই! মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

দশ

অনেকদিন পরে শঙ্কর একা মাঠে গিয়া বসিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া সে নিজের অতীত জীবনটার পর্যালোচনা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, যাহা তাহার কাম্য, তাহার সন্ধান মিলিয়াছে কি? সারা জীবন সে কী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিবার আকাঙক্ষা ছিল, সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলুক— এই কামনায় তাহার চিত্ত সতত উন্মুখ হইয়া থাকিত। বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া সে সাধ তাহার মিটিয়াছিল। আজও তাহার সহপাঠীরা এবং শিক্ষকেরা ভালছেলেত্ব লইয়া সগর্বে আলোচনা করেন। পরীক্ষায় প্রথম হইবার আকাঙক্ষা কিন্তু অন্তরে চিরস্থায়ী হইল না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার পরই তাহার মনে দেশসেবা করিবার আগ্রহ জাগিল, মনে হইল, ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হইয়া, বন্যাদুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবাশুশ্রুষা করিয়া, চরকা চালাইয়া, খদ্দর পরিধান করিয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানোই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। অনন্যকর্ম হইয়া কিছুকাল এ কর্তব্য সে পালনও করিয়াছিল, কিন্তু যেই খবর বাহির হইল যে, সে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পাইয়াছে, অমনই তাহার মত

বদলাইয়া গেল, অমনই অবলীলাক্রমে সে কলেজে ভরতি হইয়া বিদেশি ভাষায় বিজ্ঞান পড়িতে লাগিল। শুধু পিতার আদেশেই নয়, তাহার নিজেরও মত বদলাইয়াছিল বইকি। চরকা ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কিন্তু সে বুঝিয়াছিল যে, কিছুই হইতেছে না, দেশের লোকের সত্যকার কোনো উপকারই সে করিতে পারিতেছে না, কেবল হুজুগে মাতিয়া হইহই করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। ক্রমশ সে বুঝিয়াছিল যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাধনাই প্রকৃত দেশসেবা, বৈজ্ঞানিক যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নতি না করিয়া চরকা চালাইতে গেলে দেশের প্রকৃত অগ্রগতি হইবে না। একটা নতুন আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যেন সে আই এসসি এবং বি এসসি পাস করিয়া ফেলিল। তাহার এই ব্রহ্মচর্য এবং বিজ্ঞান সাধনার আদর্শ মফস্বলে অটুট ছিল, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সুরমা, রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, বেলা, শৈল, মুক্তোরা আসিয়া তাহার মনে যে আলোড়ন তুলিল, তাহাতে তাহার পূর্ব জীবনের আশা-আকাঙক্ষা, সাধ-স্বপ্ন আদর্শ-কর্তব্যের সমস্ত মানদণ্ড উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিপর্যস্ত হইয়া গেল। মনে হইল, জীবনকে উপভোগ করাই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য, চার্বাক দর্শনই শ্রেষ্ঠ দর্শন। কিন্তু সে দর্শন অনুসরণ করিয়াই বা লাভ কী হইল, কত রামী বামী ক্ষেন্তী, কত বীণা আশা রাধা, কত মিষ্টিদিদি তেতোদিদি আসিল এবং গেল— সকলের নামও মনে নাই কিন্তু কী হইল? জীবনকে উপভোগ করা হইল কি? পীবরবক্ষ, চটুল চাহনি, লাস্য-হাস্য, ভাব-ভঙ্গি কিছুরই তো অভাব ছিল না; তবু মনে এখনও অতৃপ্তি কেন? কেন মনে হইতেছে, জীবনটা বৃথায় গেল? জীবনকে সে তো কম উপভোগ করে নাই। কিন্তু এখন আর ওসব কিছুই ভাল লাগিতেছে না। চুনচুন্ কল্পনাকে অধিকার করিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও আর তেমন মাদকতা নাই। চুনচুনের নিকট হইতে আহ্বান আসিলে সে উত্তেজিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহার কাছে গেলেই সে উত্তেজনা নির্বাপিত হইয়া যায়, মনে হয়, ভ্রাতা ভগিনীর নিকট আসিয়াছে।

যে-বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সে একদিন চরকা-নীতিকে উপহাস করিয়াছিল, সে বিজ্ঞানও তাহাকে বেশিদিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে নাই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অনিবার্য প্রভাবকে অস্বীকার সে করে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া কোনোরূপ প্রগতি যে অসম্ভব তাহা সে জানে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়াই যে করিতে হইবে, ইহাও সর্বতোভাবে সে স্বীকার করে, তবু সে বিজ্ঞানচর্চা ত্যাগ করিয়াছে। সুযোগ পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। কেন? সহসা তাহার মনে হইল, আমাদের চিন্তার সহিত আমাদের কার্যের কি সত্যই কোনো যোগ আছে? চিন্তা করিয়া যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই কি আমরা সব সময়ে করি? কোন্ সময়ে কি করি? তাহার মনে হইল, চিন্তা করা শিক্ষিত মনের বিলাস মাত্র, আমাদের কার্যের সহিত তাহার ক্বচিৎ সম্পর্ক থাকে। আমরা যাহা করি, তাহা চিন্তাপ্রণোদিত হইয়া করি না, নিজের সুখের জন্য করি। সে সুখের পিপাসা অন্তরের যে অন্ধকার কন্দর হইতে উৎসারিত হয়, তাহার সন্ধান আজও আমরা পাই নাই। চিন্তা করিয়া সৎ-অসৎ ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিতের একটা আদর্শ আমরা খাড়া করি বটে, কিন্তু তদনুসারে আমরা চলি না, আমরা চলি নিজেদের আন্তরিক প্রেরণায়। সে প্রেরণার সহিত যদি কেতাদুরস্ত নীতির মিল থাকে ভালই, যদি না থাকে তাহা হইলেও আমরা নিরস্ত হই না, যাহা করিবার আমরা ঠিক করিয়া যাই, কোনো অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তি তখন যেন আমাদের উপর ভর করিয়া আমাদের নীতিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

এই শক্তিই তাহাকে হয়ত বিজ্ঞানের পথ হইতে সাহিত্যের পথে আনিয়াছে, সুগম সুপরিচিত পথ হইতে টানিয়া দুর্গম অপরিচিত পথে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই শক্তির প্রভাব স্বীকার

করিয়াও কিন্তু আর একটা যুক্তির মোহ হইতে শঙ্কর কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল যে, দেশের মনে বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করা যদি সত্যিই প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যস্থতাতেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্যই সে বিজ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত বাহন। বিজ্ঞানকে সম্যকরূপে গ্রহণ করিবার মত সুস্থ মনোবৃত্তিও দেশের সাহিত্যই গঠন করিবে। তাই সাহিত্যের পথকেই সে জীবনের পথ রূপে বাছিয়া লইয়াছে, এই পথ ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে।

হঠাৎ যেন আর একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ছাত্রজীবনে স্কুলের হেডপণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্য তাহার মনে যে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, 'আনন্দমঠ' পাঠ করিয়া যে দেশকে সে জননী-জন্মভূমি বলিয়া জানিয়াছিল, সেই দেশাত্মবোধই তাহাকে জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে এতদিন পরিচালিত করিয়াছে, তাহার সকল কর্মে প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা— রবীন্দ্রনাথের এ সঙ্কল্পকে সে-ই তো মূর্ত করিবে। সাহিত্যের পথই তাহার পথ, এই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। কিন্তু ইহার নাম কি সাহিত্য-পথে চলা? 'সংস্কারক' আপিসে চাকরি করা মানে কি সাহিত্য-চর্চা? শঙ্করের রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। 'নারীস্তোত্র' নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিল, মজুমদার মহাশয় তাহা 'সংস্কারক' পত্রিকায় ছাপিতে নিষেধ করিয়াছেন। সে নিজে সহকারী-সম্পাদক, অনায়াসেই সে লেখাটা তাঁহাকে না দেখাইয়াও ছাপিতে পারিত। কিন্তু অদ্যাবধি সে কোনোও লেখা সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে ছাপে নাই, সম্পাদক মহাশয়ও এ যাবৎ তাহার কোনোও লেখায় আপত্তি প্রকাশ করেন নাই, আজ হঠাৎ 'নারীস্তোত্র' কবিতাটা তাঁহার খারাপ লাগিয়া গেল? অশ্লীল? কী এমন অশ্লীলতা আছে উহাতে? 'শৃঙ্গার', 'স্তন', 'স্বচ্ছবসনা', 'নীবিবন্ধ' প্রভৃতি কয়েকটা কথায় দাগ দিয়া তিনি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কোন ভাল কবির কবিতাতে এসব কথা নাই? কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এমনকি রবীন্দ্রনাথও—। শঙ্করের হাসি পাইল। ওই বেরসিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হীরালাল মজুমদারের নির্দেশ অনুসারে কাব্যরচনা করিতে হইবে নাকি? চণ্ডীচরণ দস্তিদারের কথা মনে পড়িল। ওই লোকটি হয়ত হীরালালবাবুর হৃদয় হরণ করিতে পারিবে। কাব্যরস-বিবর্জিত খাঁটি কর্মক্ষম ব্যক্তি। কম কথা বলেন। ঠিক সময়ে— কখনও কখনও ঠিক সময়ের পূর্বেও— আপিসে আসেন এবং রাত্রি দশটা পর্যন্ত মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যান। নিলয়কুমারের সহকারী হিসাবে বহাল হইয়াছেন, 'সংস্কারক' পত্রিকার ব্যবসায়ের দিকটা দেখাই না কি তাঁহার একমাত্র কার্য। শঙ্করের কিন্তু সন্দেহ হয়, নীরবে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করাই তাঁহার প্রধান কার্য। সর্বদাই যেন একটা মুখোশ পরিয়া আছেন। একটি বাজে কথা বলেন না, রসিকতা করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করা যায় না। চণ্ডীচরণ অতীত জীবনে পড়াশুনার বিশেষ ধার ধারেন নাই, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত নাকি পড়িয়াছিলেন এবং তাহার জোরেই নাকি তিনি কুড়ি বৎসর পূর্বে কোনো সওদাগরি অফিসের কেরানিগিরি জোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছয়মাস পূর্বে তাঁহার কেরানিজীবন শেষ হইয়াছে; কিন্তু সামর্থ্য এবং চাকুরিস্পৃহা এখনও শেষ হয় নাই বলিয়া পুনরায় তিনি কাজে লাগিয়াছেন। এই ইতিহাসটুকু শঙ্কর জানিত, আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে যে, চণ্ডীচরণ শুধু কেরানিমাত্র নহেন, তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকও। অর্থাৎ সাহিত্যের দরবারে তাঁহারও কিঞ্চিৎ দাবি আছে। তাহার প্রত্নতত্ত্বও আবার এমন বিষয়ে, যে সম্বন্ধে শঙ্করের কোনোও জ্ঞান নাই। প্রাচীন মিশর তাঁহার বিষয়। সবজান্তা নিলয়কুমার নাকি ইজিপ্টোলজির একজন সমঝদার, তিনি চণ্ডীচরণকে খুব উৎসাহিত করিতেছেন। খবরটা শুনিয়া অবধি শঙ্করের মনে একটা অস্বস্তি জাগিয়াছে, তাহার মনে

হইতেছে, হয়তো এই দাবির জোরেই চণ্ডীচরণবাবু একদিন তাহাকে পদচ্যুত করাইয়া নিজেই 'সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদক হইয়া বসিবেন এবং ভিতরে ভিতরে হয়ত তাহারই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

অনেক রাত্রে শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, মৃন্ময়ের স্ত্রী হাসি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। যাহা শুনিল, তাহাকে সে অবাক হইয়া গেল। মৃন্ময় আপিসের টাকা ভাঙিয়া ধরা পড়িয়াছে। সে নাকি এখন জেলে। অতিশয় শান্ত কণ্ঠে হাসি সংবাদটি দিল। বিস্ময়ে শঙ্করের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃন্ময় চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু ইহার সম্ভাব্যতা লইয়া বিচার করিবার সময় নাই, শঙ্করেব মনে হইল, অবিলম্বে কিছু একটা করা প্রয়োজন!

আপনি বসুন, আমি ভন্টুর কাছে যাই। দেখি, কত দূর কী করা যেতে পারে। হয়ত কোথাও কোনো ভুল হয়েছে—

কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। ভন্টুবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন, কিছু হবে না। কিছু ভুলও হয়নি, উনি নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছেন, টাকাও ফেরত দিতে রাজি নন। ওঁর জেল হবেই।

কত টাকা?

দশ হাজার।

দশ হাজার! এত টাকা কী করে পেলে?

অফিসের সিন্দুকে ছিল, ক্যাশিয়ারের টেবিল থেকে চাবিটা সরিয়ে টাকাটা নিয়েছেন।

টাকাটা কোথায়?

হাসি চুপ করিয়া রহিল।

সহসা তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা টপটপ করিয়া ঝরিয়া গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিনিদ্র শঙ্কর একটা বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। ভাবিতেছিল, কী করিয়া এই নূতন সমস্যাটির সমাধান করিবে। মৃন্ময়ের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, হাসিই সমস্যা। হাসির আপনজন কেহ নাই। মৃন্ময়ই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে পরিবারে তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছে, সেখানে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। সংবাদ পাইলে মুকুজ্জেমশাই অবশ্য আসিবেন, ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিবেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত একটা ব্যবস্থাও করিবেন। কিন্তু হাসির তাহা ইচ্ছা নয়। হাসি শঙ্করকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছে, মুকুজ্জেমশাইকে যেন খবর না দেওয়া হয়। তিনি তাহার যে উপকার করিয়াছেন সে ঋণই জীবনে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না, ঋণের বোঝা আর সে বাড়াইতে চাহে না। কিন্তু সে যে ঠিক কী করিতে চায় তাহাও এখন পর্যন্ত খুলিয়া বলে নাই।

তুমি এখনও ঘুমোওনি?

অমিয়া শঙ্করকে জড়াইয়া ধরিল।

না। হাসিকে নিয়ে কী করা যায় তাই ভাবছি।

আমাদের কাছেই থাক্, কী আর করবে।

আমাদের কাছেই থাকবে?

আমাদের কাছে এসেছে যখন, কোথায় আর যাবে, যেতে বলাটা কী ভাল দেখায়?

তা বটে। তা হলে থাক্।

শঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইল। অমিয়া তাহার চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া চুল কুরিয়া দিতে লাগিল।

ঘুমোও তুমি।

ঘুমুচ্ছি।

শঙ্করের কিন্তু ঘুম আসিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমিয়া না হইয়া যদি অপর কোনো মেয়ে হইত, তাহা হইলে হাসির অভ্যাগমে সে শঙ্কিত হইয়া পড়িত। হাসি সুন্দরী এবং যুবতী। অমিয়ার মনে কিন্তু এতটুকু শঙ্কা নাই। শঙ্কর সম্বন্ধে সে এত নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় যে শঙ্কর তাহার আচরণে অবাক হইয়া যায়। মাঝে মাঝে তাহার সন্দেহ হয় যে, অমিয়া বোধ হয় অতিশয় নির্বোধ। আবার মনে হয়, কই, বুদ্ধিহীনতার আর কোনোও লক্ষণ তো সে দেখিতে পায় না। কেবল এই বিষয়েই— যে বিষয়ে নারীবুদ্ধি সর্বাপেক্ষা প্রখর সে বিষয়েই সে নির্বোধ।

এগারো

তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। শঙ্কর নিচের ঘরটায় বসিয়া 'কাব্যে বাস্তবতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বাস্তব' কথাটা যে অর্থে লইয়া বাস্তববাদীদের বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টি দিয়া দেখিলে উপহাসযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু উপহাসিত সমালোচকদের পক্ষ লইয়া নানা উদাহরণ দিয়া শঙ্কর ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল যে, সমালোচকগণ কাব্যে যে বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বস্তু নহে। সে বস্তুর সংজ্ঞা ভিন্ন। কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থই কাব্যবস্তু হইতে পারে না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকজনের মর্মগ্রাহ্য হয়। যে সব সমালোচক কাব্যে বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সেই বস্তুরই সন্ধান করিয়াছেন যাহা রসিকচিত্তগ্রাহী। কাব্যলোকের কুসুম এবং উদ্ভিদবিদ্যার কুসুমে আকাশ-পাতাল তফাত—ইহা যে নিয়মে সত্য বিদেশাগত অবাস্তবতা অথবা অতিবাস্তবতা সেই একই নিয়মে এই সমালোচকগণ কর্তৃক অবাস্তব-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে যাহা 'অকাব্য', তাহাই কাব্যবিচারে অবাস্তব, কারণ কাব্যের বস্তু তাহাতে নাই।

শঙ্কর আছ নাকি ভাই?

দ্বার ঠেলিয়া দাড়িতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অপ্রত্যাশিতভাবে ভণ্টুর মেজকাকা প্রবেশ করিলেন।

এ কি, আপনি কবে এলেন?

কঠিন বন্ধন ভাই, বুঝলে, মায়ার বন্ধন কঠিন বন্ধন।

বসুন।

উপবেশন করিয়া মুক্তানন্দ পুনরায় বলিলেন, রঙিন চশমাটা নাকে এমন এঁটে বসেছে যে, খোলা দুষ্কর।

কবে এলেন?

এলাম মানে। গেলুম কবে?

শঙ্কর স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিল, মুক্তানন্দ এখন প্রতি কথারই দার্শনিক জবাব দিবেন।

তোমরা যেতে দিচ্ছ কই ভাই, বার বার যাচ্ছি আর ফিরে আসছি।

কাল ভন্টুর সঙ্গে দেখা হল, সে তো কিছু বললে না।

আমি বিনোদের বাসাতেই উঠেছি। মানে ভন্টুর কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না।

মিটিমিটি চাহিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। তাহার পর যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, সেইজন্যই তো তোমার ঠিকানা জোগাড় করে এই ভোরে তোমার কাছে আসা। তুমি একটা উপায় বাতলে দাও ভাই।

কিসের উপায়?

ভন্টুর কাছে যাওয়ার।

কেন, ভন্টুর কাছে যাবার বাধাটা কী?

ওই দেখ, তুমি বুদ্ধিমান লোক হয়ে বুঝতে পারছ না বাধাটা কী? আমি সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহীর বাড়িতে যেতে এমনিতেই তো কত বাধা, তার উপর ভন্টু নিজের ভাইপো, মোটা মাইনের চাকরি করে শুনেছি, বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে করেছে। গেলেই ভাববে, ওই রে বাবাজি কোনো মতলবে এসেছে নিশ্চয়। আজকাল সন্ন্যাসী দেখলেই লোকে ভাবে, ব্যাটার কোনো মতলব আছে।

মুক্তানন্দ চক্ষু বুজিয়া দাড়িতে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। শঙ্কর হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সহসা চক্ষু খুলিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, আমি একটা উপায় ভেবে এসেছি, তুমি যদি রাজি হও।

বলুন।

তোমাকে একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে। বলতে হবে যে, আমার সঙ্গে রাস্তায় তোমার হঠাৎ দেখা, তুমি যেন জোর করে আমাকে ভন্টুর কাছে নিয়ে এসেছ।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, বেশ। বিকেলে আসবেন তা হলে, এখন ব্যস্ত আছি একটু।

ইহাতে মুক্তানন্দ একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। উঠিয়া বলিলেন, বিকেলে? আচ্ছা, তাই আসব। লেখক হিসেবে তোমার নামডাক খুব শুনছি। আনন্দের কথা, তোমার নামডাক হবে না তো কার হবে? লিখছ নাকি কিছু এখন?

শঙ্কর চুপ করিয়া রইল। মুক্তানন্দ একবার ঝুঁকিয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

লেখ তোমাকে আর বিরক্ত করব না তা হলে।

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, সবই মায়া, কিছুই কিছু নয়— বলিয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্করের মনে পড়িল আজ বৈকালে হাসির জন্য একবার প্রফেসর গুপ্তের নিকটও যাইতে হইবে। প্রবন্ধটা এখনই শেষ করা প্রয়োজন। লিখিতে যাইবে, নিপু আসিয়া প্রবেশ করিল। হিরণদার আড্ডায় নিপুর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছিল। হিরণদার আড্ডার অধিকাংশ সভ্যের সহিত এখন আর দেখাই হয় না, কেবল নিপু আর ছবি টিকিয়া আছে। নিপুও সাহিত্য রসিক। সে নাকি গোপনে সাহিত্য রচনাও করে, কিন্তু কাহাকেও তাহা দেখায় না। সহসা সকলকে তাক লাগাইয়া প্রভাত সূর্যের মত অনিবার্য দীপ্তিতে একদিন বঙ্গসাহিত্য-গগনকে উদ্ভাসিত করিয়া সে সমুদিত হইবে— ইহাই তাহার আকাঙক্ষা। এখন অন্ধকারে তাহার তপস্যা চলিতেছে। দরিদ্রের সন্তান। এখনও বিবাহ করে নাই। আত্মীয়-স্বজন কেহই তাহাকে তাহার বিদ্যা অথবা সাহিত্য সাধনার জন্য শ্রদ্ধা করে না। সে বেকার, অসামাজিক। একমাত্র শঙ্করই তাহাকে আমল দেয়, তাই সে শঙ্করের কাছে আসে। কিন্তু শঙ্করের কাছে আসিয়াও সে স্বস্তি পায় না। মনটা কেমন যেন বিষাইয়া উঠে!

কিছু লিখছ নাকি।

শঙ্কর যাহা লিখিয়াছিল দেখাইল।

কিছু হয়নি। তুমি যা লিখেছ, তা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছেন—

ঠিক এমনি করে কোথায় বলেছেন?

নিপু কয়েকটা প্রবন্ধের নাম করিল। শঙ্কর তাহার একটাও পড়ে নাই। পড়িবে কখন? চাকরি করিতেই সমস্ত সময় চলিয়া যায়।

ছেঁড়া জামার পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া নিপু বলিল, ধারটা শোধ করতে এসেছি। কেরানিগিরি জুটছে একটা।

তাই নাকি, শুনি নি তো?

তথাপি ইহা সত্য।

নিপু হাসিল। তাহার হাসির মধ্যে কেমন যেন একটা চাপা ঈর্ষা চকমক করিয়া উঠিল।

চলি এখন।

শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর প্রবন্ধটা কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বারো

প্রফেসর গুপ্ত একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। পত্নী সুলেখা তাঁহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধু লক্ষ্য নয়, গতি প্রতিরোধ করিতেও তিনি উদ্যত। পুত্রকন্যাকে লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন, স্বামীর প্রতি এমন করিয়া মনোযোগ দেওয়ার অবসর, এমন কি প্রবৃত্তিও তাঁহার এতদিন ছিল না। স্বামীকে অবশ্য তিনি চিনিতেন। বেলার সহিত তাঁহার সম্পর্কটা চোখের সম্মুখেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা রুচি, এবং এম. এ. ডিগ্রি সত্ত্বেও এইজন্য তাঁহাকে নিতান্ত সেকেলে ধরনের অহিফেনও গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহার মনের অন্য অবলম্বন ছিল— পুত্র-কন্যা। কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পুত্রটি মারা গিয়াছে। আর সন্তান নাই, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজেই তিনি অধিক সন্তানের জননীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, অন্য কোনো বন্ধকও নাই, স্বামীই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

তিনি নিজে যদিও স্বামীকে চিনিতেন, কিন্তু পাঁচজনের কাছে যাহা বলিয়া বেড়াইতেন তাহা ঠিক বিপরীত। পরিচিত মহলে আকারে ইঙ্গিতে তিনি এতদিন এই কথাই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, স্বামী তাঁহার দেবচরিত্র ব্যক্তি, কাব্য লইয়া থাকেন এবং তাঁহার পত্নী-প্রীতি অনন্যসাধারণ। তাঁহার ধারণা ছিল যে লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করে, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কেহই তাঁহার কথা বিশ্বাস করে না, করিবার ভান করে মাত্র। আসল কথাটা সকলেই জানে। এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে স্বকর্ণে সেদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছেন— একটা ঘরে মিষ্টিদিদির সহিত তাঁহার স্বামীর নাম জড়াইয়া একদল মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। মিষ্টিদিদি নাকি তাঁহার স্বামীকে ফেলিয়া কোনো এক মুসলমান যুবকের সহিত কাশ্মীর-ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহার মেয়ের বয়সী মেয়েরা ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেছে। প্রফেসর গুপ্ত সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁহার আলাদা বাসাটিতে চলিয়া যান, আজও যাইতেছিলেন, সুলেখা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কোথায় যাচ্ছ?

প্রফেসর গুপ্ত একটু বিস্মিত হইলেন। এ রকম প্রশ্ন সুলেখা সাধারণত করেন না।

যেখানে রোজ যাই।

কোথায়?

প্রফেসার গুপ্ত দাঁড়াইয়া পড়িলেন, রিমলেস চশমাটা একবার ঠিক করিয়া লইলেন। জবাবদিহি করতে হবে না কি?

হবে।

সুলেখার গলার স্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিল, তাহা করুণ বা কোমল কিছু নহে, তাহা আগুন। একটু ইতস্তত করিয়া প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, হঠাৎ আজকে এ সবের মানে?

মানে, সন্ধ্যের পর তুমি আর কোথাও বেরতে পারবে না, যদি কোথাও যাও আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

বিয়ের সময় এরকম কোনো শর্ত ছিল বলে তো মনে পড়ছে না।

ছিল বইকি, তুমি আমাকে সুখে রাখতে বাধ্য।

ও। আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

সুলেখার দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রফেসর গুপ্ত তাঁহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, দেখ, কেউ কাউকে সুখী করতে পারে না, নিজে সুখী হতে হয়। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে জীবনে তুমি কখনও সুখী হতে পারবে না। আমি অবশ্য চেষ্টা করব।

আমাকে সুখীই যদি না করতে পারবে, তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন?

ঠিক ওই একই প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারি, কিন্তু তা আমি করব না। আমার উত্তর, সমাজে থাকতে গেলে একটা বিয়ে করা প্রয়োজন, তাই করেছি। ভেবেছিলাম—। যাক সে কথা।

কী ভেবেছিলে?

এখন বলতে হবে সেটা?

বলই না শুনি।

ভেবেছিলাম, তুমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়েছ, তখন তোমার সঙ্গে আমার মনের খানিকটা মিল হবে। এখন দেখছি, সেটা মহা ভুল। পরীক্ষা পাস করলেই মিল হয় না।

তুমি কি মিল হওয়ার মতো লোক?

সেটা তো নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। তোমার সঙ্গে মিল হচ্ছে না, এইটুকু শুধু বলতে পারি। যতদূর দেখছি, উচ্চশিক্ষা তোমার দেহকে রুগ্ন, বিগত-যৌবন এবং মনকে অহঙ্কারী করেছে, আর কিছুই করেনি। সাধারণ মেয়ের মতই তুমি বিলাসী, লোভী, স্বার্থপর। ডিগ্রিটা তোমার নতুন প্যাটার্নের আর্মলেট বা নেকলেসের মত আর পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার আর একটা অলঙ্কার মাত্র, ওতে তোমার মনের কোনোও উন্নতি হয়নি। তোমার কাছে যে কালচার আশা করেছিলাম, তা তোমার নেই।

আমার কালচার আছে কী নেই, সেই বিচার তোমাকে করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি—

প্রফেসর গুপ্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমার সঙ্গে কেবল কাব্য আলোচনা করবে, এই আশা করেই আমাকে বিয়ে করেছিলে নাকি? তা যদি করে থাক, তা হলে হতাশ হওয়ার কারণ আছে। তোমার মত কাব্য-রোগ আমার নেই, স্বীকার করছি।

প্রফেসর গুপ্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, আমার যেসব পুরুষ বন্ধু আছে, তাদের কারও কাব্য-রোগ নেই কিন্তু তবু তাদের মনের সঙ্গে আমার মনের সুর ঠিক মেলে। দেখ, এসব কথা তর্ক করে বোঝানো যায় না।

আসল কথাটা চাপা দিচ্ছ কেন? আমি পুরুষ বন্ধুদের কথা বলছি না, মেয়ে বন্ধুদের কথা বলছি। যাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে তুমি কাঙালের মত ঘুরে বেড়াও, তারা কি আমার চেয়ে বেশি কাব্য-রসিকা?

তা কেন হবে?

তা হলে যাও কেন?

সব কথা কি খোলাখুলি আলোচনা করা যায়?

গোপন তো আর কিছুই নেই, সবাই তো সব কথা জেনে ফেলেছে। আমি জানতে চাই, আমাকে বার বার এমন অপমান কেন করবে তুমি?

আমার তো মনে পড়ছে না, জ্ঞাতসারে কখনও তোমাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছি। আমি বরং বরাবর বাঁচিয়েই চলেছি তোমাকে। তুমিই বরং অফিং-টাফিং খেয়ে আমাকে অপদস্থ করেছ।

আমি কী সাধে আফিং খেয়েছিলাম? বাধ্য হয়ে খেয়েছিলাম।

আমিও যা করছি, বাধ্য হয়েই করছি।

বাধ্য হয়ে করছ! তাই নাকি? কিরকম?

সুলেখার চোখের দৃষ্টি ব্যঙ্গশাণিত হইয়া উঠিল।

প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, তবে শোন। আমার মনের একটা অবলম্বন চাই। তুমি তা হতে পারনি। তুমি, শুধু তুমি নয়, তোমাদের অনেকেই দুয়ের বার হয়ে গেছ। কাব্যলোকের প্রিয়া কিংবা গৃহলোকের লক্ষ্মী কোনোটাই তোমরা হতে পারনি। সেকালের মত তুমি 'পতি পরম গুরু' এই কথা বিশ্বাস করে যদি আমার ঘরের লক্ষ্মী হতে পারতে, তা হলে হয়তো—

ঘরের লক্ষ্মী মানে?

মানে সেই মেয়ে, যে আমার সুখের জন্য সর্বতোভাবে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছে, যে শুধু আমার শয্যাসঙ্গিনী নয় আমার সর্বপ্রকার তৃপ্তি বিধায়িনী, যে আমার জন্যে নিজের হাতে রান্না করে, আমি কী কী ভালবাসি তার খোঁজ রেখে তদনুসারে চলে, আমি যাতে অসুখী হই কখনও এমন কাজ না করে, আমি অসুস্থ হলে যে দিবারাত্র আমার সেবা করে, আমার পিকদানি বা কমোড পরিষ্কার করেও যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, আমার পুত্রকন্যার জননী হয়ে যে নিজেকে বিব্রতা মনে করে না, গর্বিত হয়, নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েও যে আমাকে সুখী করবার জন্যে সতত উন্মুখ—

অর্থাৎ যে তোমার দাসী—

শুধু দাসী নয়, সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে দাসী। এরকম দাসীর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই, কোনো পুরুষেরই নেই বোধ হয়। এরা দাসী নয়, এরাই লক্ষ্মী, এরাই রানী। কিন্তু এখন তোমরা পুরুষের দাসত্ব করতে চাও না, সে ক্ষমতাই নেই তোমাদের, এখন তোমরা চাও স্বাধীনতা।

চাই তো।

বেশ, স্বাধীন হও, আমাকেও স্বাধীন হতে দাও।

আমি যদি তোমার মত স্বাধীন হই, তা হলে কি ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে?

ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যাবে কি না, এই ভেবে যারা কাজ করে, তারা স্বাধীনচিত্ত নয়, তারা সুবিধাবাদী। তোমাদের স্বাধীনতার মানে কি জান? তোমাদের স্বাধীনতার মানে, স্বামীর অর্থে শাড়ি, গাড়ি, গয়না কিনে ভদ্রতার মুখোশ পরে সমাজের পাঁচজনের কাছে ফ্লারিশ করে বেড়ানো। ঠাকুর রান্না করুক, চাকর বিছানা করুক, বেয়ারা ফরমাশ খাটুক, বয় হাতে হাতে সব

জিনিস এগিয়ে দিক, দাই বোতল খাইয়ে ছেলে মানুষ করুক, স্বামী রাশি রাশি টাকা রোজগার করে তোমার পদানত হয়ে থাকুক, তোমার সুবিধার জন্যে সবাই সব করুক, কেবল তুমি নিজে কুটোটি নাড়বে না। এই হল তোমার আদর্শ স্বাধীনতা। মাঝে মাঝে রান্না সেলাই, অবশ্য তোমরা যে না কর তা নয় কিন্তু তা সৌখিন রান্না সেলাই তাতে গৃহস্থের কোনোও উপকার হয় না, তারও একমাত্র উদ্দেশ্য ফ্লারিশ করা; এত স্বার্থপর তোমরা যে, মা হতে রাজি হও না, পাছে ফিগার খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে।

আমাদের সবই খারাপ বুঝলাম, কিন্তু যাদের পিছনে পিছনে তুমি ঘুরে বেড়াও, তারা কিসে আমাদের চেয়ে ভাল? তাদের কী আছে?

রূপ আছে, যৌবন আছে। পুরুষের কাছে এগুলোও কম লোভনীয় জিনিস নয়। তোমার তাও নেই। দেহের খোরাক, মনের খোরাক— কিছুই জোগাতে পার না, কী লোভে থাকব তোমার কাছে?

সুলেখা হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন।

মিষ্টিদিদির যৌবন আছে নাকি?

যৌবন না থাক একটা মাদকতা আছে, যা তোমার নেই। আসল কথা কী জান? আমরা মুগ্ধ হতে চাই। রূপ, যৌবন, প্রেম, প্রেমের অভিনয়, সেবা, রান্না, আত্মত্যাগ— যা হোক একটা নিয়ে আমরা মেতে থাকতে চাই। তুমি আমাকে কী দিয়েছ? তোমার সঙ্গে আমার অতি স্থূল টাকাকড়ির সম্পর্ক এবং সে সম্পর্ক আশা করি কড়ায় ক্রান্তিতে ঠিক আছে।

মিষ্টিদিদিও তো তোমাকে আর আমল দিচ্ছে না শুনছি। এক মুসলমান ছোঁড়ার সঙ্গে চলে গেছে—

এক মিষ্টিদিদি গেছে, আর এক মিষ্টিদিদি আসবে। পৃথিবীতে মিষ্টিদিদিদের অভাব ঘটবে না কখনও।

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু এসেছেন।

শঙ্কর অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, বাহিরে কেহ ছিল না বলিয়া এতক্ষণ সংবাদ পাঠাইতে পারে নাই। শয়নকক্ষের ঠিক পাশের ঘরই বাহিরের ঘর। শঙ্কর সব শুনিয়াছিল।

কী খবর?

প্রফেসর গুপ্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর হাসির জন্য আসিয়াছিল। হাসি কোনো বোর্ডিংয়ে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে চায়। বাড়িতে নিজের চেষ্টায় সে ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত পড়িয়াছে, এখন স্কুলে ভর্তি হইতে চায়। প্রফেসর গুপ্তের সাহায্যে তাহাকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেই শঙ্কর আসিয়াছে। প্রফেসর গুপ্ত এ কার্য যত সহজে ও সুষ্ঠুরূপে পারিবেন, অপরে তাহা পারিবে না। শিক্ষয়িত্রী মহলে প্রফেসর গুপ্তের খাতির আছে, তাহা ছাড়া তিনি নিজেও শিক্ষা বিভাগের লোক, কোন্ স্কুলটা ভালো তাহা হয়ত ঠিকমত বাছিয়া দিতে পারিবেন।

সব শুনিয়া প্রফেসর গুপ্ত বলিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ আছে কোনো? আমি তো যতদূর দেখেছি, লেখাপড়া-জানা মেয়েরা ঠিক খাপ খাচ্ছে না সমাজের সঙ্গে।

লেখাপড়া-জানা ছেলেরাই কি খাপ খাচ্ছে? আপনি খেয়েছেন?

প্রফেসর গুপ্ত স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, পুরুষেরা বেখাপ্পা হলে ততটা এসে যায় না। মেয়েরা বেখাপ্পা হলে বড় মুশকিল।

আমার তো ধারণা, মেয়েরা কিছুতেই বেখাপ্পা হয় না। ওদের প্রকৃতি জলের মত, যে পাত্রেই রাখুন ঠিক সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে।

করবে, যদি ওদের শিক্ষা দিয়ে বদলে না দাও। শিক্ষা পেলেই জল জমে বরফ হয়ে যায়।

একটু উত্তাপ পেলে কিন্তু গলে যায় আবার। জল কতক্ষণ বরফ হয়ে থাকবে বলুন।

কিন্তু আমরা উত্তাপ দিই কী করে, বল? আমাদের নিজেদেরই যে উত্তাপ প্রয়োজন, আমরা নিজেরাই যে বরফ হয়ে গেছি— বিলিতি রেফ্রিজারেটারে ঢুকে।

ওদেরও আপনারাই ঢুকিয়েছেন। একটা কথা ভেবে দেখছেন না কেন, ওরা প্রাণপণে আমাদের মনের মত হওয়ারই তো চেষ্টা করছে। যখন যা বলেছেন, তখনই তাই করেছে। ন' বছরে গৌরীদান করতেন যখন, তখনও ওরা আপত্তি করে নি। চিতায় পুড়িয়ে মারতেন যখন তখনও বেচারিরা দলে দলে পুড়ে মরেছে। যখন পালকি করে নিয়ে গেছেন পালকি করে গেছে, যখন হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন হেঁটেই গেছে। ও বেচারিদের দোষ কী? আজ আপনারা চাইছেন, ওরা স্কুলে কলেজে পড়ুক, নাচগান শিখুক— ওরা প্রাণপণে তাই করছে। কাল যদি আপনাদের চাহিদা বদলায়, ওদেরও রূপ বদলাবে।

সব ঠিক। কিন্তু আমি সমাজ-সংস্কারক নই, আমি সামান্য মানুষ, যে ক'দিন বাঁচি একটু সুখে থাকতে চাই। I am fed up with the present lot. I would like to have—

প্রফেসর গুপ্ত কথাটা শেষ করিলেন না, একটু থামিয়া বলিলেন, মেয়েটির নাম কী বললে? হাসি? আচ্ছা, আজ আমি ফোনে কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে রাখব, তুমি কাল এস। তোমার সাহিত্যচর্চা কেমন চলছে? তোমার 'জীবন-পথে' বইখানা তত ভাল লাগেনি আমার কিন্তু। বড় পানসে।

ভাল হবে কী ক'রে বলুন, চাকরি করতে করতে সাহিত্যচর্চা করা যায় না।

তার কোনো মানে নাই। উনুনের ভেতর পুড়লেও আগুন আগুনই থাকে, ওসব লেম এক্সকিউজ।

শঙ্কর মৃচকি হাসিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে খুব দমিয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল, 'জীবন-পথে' বইটা পড়িয়া প্রফেসর গুপ্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন।

তুমি বসবে, না যাবে এখুনি?

আমাকে যেতে হবে।

চল তা হলে, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সুলেখা পাশের ঘরে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তের

আমাকে চিনতে পারেন?

কই মনে পড়ছে না—

চিবুকের ডান দিকে কালো তিলটা দেখেও মনে পড়ছে না?

শঙ্করের সহসা মনে পড়িল। সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমার সম্বন্ধে অত কথা আপনি জানলেন কী করে?

কল্পনা করেছি।

সবটা কিন্তু অলীক কল্পনা বলে মনে হয় না।

অলীক কে বললে? কল্পনাতেই সত্য বলে অনুভব করেছি বলেই লিখেছি।

আমার সম্বন্ধে ওই সব অনুভব করেছেন সত্যি সত্যি?

করেছি বলেই তো লিখেছি।

আমার সব কথা জানেন?

জানি বৈকি।

ত্রিশ বছরের একটা মেয়েব মনে সংসার সম্বন্ধে অতখানি বৈরাগ্য এসেছিল হঠাৎ? ডাক্তারকে পেলাম না বলেই ক্ষিদে চলে যাবে? পোলাও পেলাম না বলে ভাত খাওয়াও বন্ধ করে দেব?

পোলাও না পেলে মনের যে ভাবটা হওয়া স্বাভাবিক, তাই আমি লিখেছি। ভাত খাওয়ার খবর দেওয়া আমার বিষয়ের বাইরে।

বুভুক্ষাই যখন আপনার বিষয়, তখন ও-খবরটা বাদ দিলে চলবে কেন?

ওই নোংরা খবরটা দেওয়ার দরকার কী?

ইচ্ছে করলেই তো আপনারা নোংরাকেও সুন্দর ক'রে তুলতে পারেন। স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চ'লে আসার খবরটাও কম নোংরা নয় কিছু।

মেয়েটি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, জানেন? ডাক্তারকে পাইনি বলে দুঃখ হয়েছিল অবশ্য আমার; কিন্তু তা বলে তার কম্পাউন্ডারটিকে ছাড়তে পারিনি আমি। পরের সংস্করণে যোগ করে দেবেন খবরটা। আরও রিয়ালিস্টিক হবে।

শঙ্করের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। আশেপাশে চাহিয়া দেখিল। সত্যই স্বপ্ন তাহা হইলে! অদ্ভুত স্বপ্ন: তাহার 'পান্থনিবাস' পুস্তকের নায়িকা যমুনা স্বপ্নে দেখা দিয়া গেল।

আশ্চর্য!

চোদ্দ

বিনিদ্র নয়নে হাসি একা শুইয়া ছিল।

কাঁদিতেছিল না, ভাবিতেছিল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা নয়, দুর্মতির কথা ভাবিতেছিল। স্বর্ণলতার চিঠিগুলি আবিষ্কার করিবার পর মৃন্ময়কে সে কত অপমানই না করিয়াছে। মৃন্ময় কিন্তু সে অপমান গায়ে মাখে নাই। অসংলগ্ন ভাষায় অসহায়ভাবে কেবল তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, ইহা তাহার কর্তব্য, তাহা হইতে সে যদি বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে হাসিই বা তাহার ওপর নির্ভর করিবে কোন্ ভরসায়? মৃন্ময় এত কথা এমনভাবে গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু বার বার এই কথাই বলিয়াছে। হাসি বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে চাহে নাই। ঈর্ষার কৃষ্ণধূমে তাহার আকাশ-বাতাস তখন অস্বচ্ছ হইয়াছিল।

আমাকে অনুমতি দাও তুমি।

মৃন্ময়ের কথাগুলি এখনও তাহার কানে বাজিতেছে।

আমাকে সত্যিই যদি ভালবেসে থাক, সত্যিই যদি শ্রদ্ধা করতে চাও আমার মনুষ্যত্বকে খর্ব করো না। এই ঘৃণিত পশুজীবন থেকে অব্যাহতি পেতে দাও আমাকে।

মৃন্ময়ের মুখখানা মনে পড়িল। প্রশস্ত উন্নত ললাট, রক্তাভ গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাসা। ক্ষণিকের জন্য হাসি যেন এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিল।

চিন্ময়ের কথাও মনে পড়িল।

সেও আর ফিরিবে না। সহসা হাসি উঠিয়া বসিল। আলুলায়িত কুন্তল দুই হাত দিয়া ঠিক

করিতে করিতে আবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, তোমার সহধর্মিণী হইবার যোগ্যতা আমি লাভ করিবই। আমি যত ছোট ছিলাম, সত্যই তত ছোট আমি নই।

আলো জ্বালিয়া সে মৃন্ময়কে চিঠি লিখিতে বসিল। এ চিঠি মৃন্ময় কোনোদিন পাইবে না জানিয়াও লিখিতে বসিল। আজ সে সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিয়াছিল, কেন মৃন্ময় স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিত।

পনের

হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মুকুজ্জেমশাই বলিলেন, তুমি এটা ঠিক জান তো যে, সে বাড়িতে বড়সড় বিবাহযোগ্যা আর কোনো মেয়ে নাই?

না।

মেয়েটির নাম সেলিমা?

হ্যাঁ।

বাড়ির ঠিক পিছনেই পুকুর আছে?

ঠিক পিছনেই।

সামনে পাশাপাশি দুটো আমগাছ?

হ্যাঁ।

ব্যস, আর কিছু দরকার নেই, ঠিক দেখে আসব আমি। তোমার যাওয়ার দরকার নেই, আমি নিজেই চিনে বার করতে পারব। তোমার হবু শ্বশুরের নাম আলিজান— ঠিক মনে থাকবে আমার। তুমি যাও।

মুকুজ্জেমশাই আর একবার সহাস্য দৃষ্টি রমজানের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

পাশেই কাজিগ্রাম, সেখানে তোমার পিসির কাছে চলে যাও তুমি।

আচ্ছা।

একটু অনিচ্ছা সহকারেই যেন রমজান রাজি হইল।

উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

কিছু দূর গিয়া একটা গোলমাল শোনা গেল। দেখা গেল, একজন লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটা আসিয়া পড়িল।

পালান শিগ্‌গির, একটা পাগল একটা লাঠি নিয়ে সকলের মাথা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে, দু'জন খুন হয়ে গেছে। ওদিকে যাবেন না, পালান।

সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল, কোনো প্রশ্ন করিবার অবসর দিল না।

মুকুজ্জেমশাই মুচকি হাসিয়া রমজানের দিকে চাহিলেন।

রমজান বলিল, চলুন, এই গলিটার ভেতরে ঢুকে পড়ি।

আগে থাকতেই? এই লোকটাই পাগল কি না তার ঠিক কী? একটু এগিয়ে দেখাই যাক না!

মুকুজ্জেমশাই গলিতে ঢুকিলেন না, থামিলেনও না, যেমন চলিতেছিলেন চলিতে লাগিলেন। বাধ্য হইয়া রমজানকে অনুসরণ করিতে হইল। একটু পরে সত্যই কিন্তু পাগলকে দেখা গেল, মোটা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সগর্জনে ছুটিয়া আসিতেছে। দৈত্যের মত চেহারা, ভীষণদর্শন। রমজান তাড়াতাড়ি পাশের একটা দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িল। আশপাশের কপাট জানালা সব নিমেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। মুকুজ্জেমশাই রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, কোথাও পালাইবার চেষ্টা করিলেন না। পাগলটাও এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। সেও

মুকুজ্জেমশাইয়ের সামনে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রক্তচক্ষু মেলিয়া ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ হেঁট হইয়া প্রণাম করিল এবং যেমন আসিয়াছিল তেমনই আবার লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

রমজান দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। মুকুজ্জেমশাই হাসিয়া বলিলেন, তোমার বউ বিপত্তারিণী হবে বোঝা যাচ্ছে। এতবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। লাঠিটা মাথায় বসিয়ে দিলেই হয়েছিল আর কী!

রমজান অবাক হইয়া গিয়াছিল।

ও-রকম করলে কেন বলুন তো?

তবে আর পাগল বলেছে কেন?

আপনি দাওয়ায় উঠলেন না কেন?

ফুরসত পেলাম কই, এসে পড়ল যে! তা ছাড়া পালালেই যে সব সময় নিস্তার পাওয়া যায় তা ভেব না। সিঙ্গাপুরে একবার একটা মাতাল গোরা পিস্তল নিয়ে রাস্তায়—

গল্প করিতে করিতে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন।

আস্‌মিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর মুকুজ্জেমশাই কিছুদিন মনোরমার খোঁজ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পান নাই। এখন তিনি রমজানের হবু বধূকে দেখিতে চলিয়াছেন। রমজানকে তিনি বড় স্নেহ করেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া রমজান এখন একটি ভাল চাকরি পাইয়াছে। রমজানের বাপের সহিতই মুকুজ্জেমশাইয়ের বহুকাল হইতে হৃদ্যতা, রমজানের পড়ার খরচও মুকুজ্জেমশাই কিছুকাল চালাইয়াছেন। একথা অবশ্য রমজান অথবা রমজানের বাবা জানে না, তাহারা জানে যে, মুকুজ্জেমশাইয়ের কোনো ধনী বন্ধু মুকুজ্জেমশাইয়ের অনুরোধে এই সাহায্যটুকু করিয়াছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে মুকুজ্জেমশাই দুই দিন আগে রমজানের বাড়ি গিয়াছিলেন। গিয়া শুনিলেন, আলিজানের কন্যা সেলিমার সহিত রমজানের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে। গোঁড়া মুসলমান সমাজে নাকি মেয়ে-দেখানোর প্রথা নাই। ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়া রমজানের গোঁড়ামি ঘুচিয়াছে, প্রথা কিন্তু বদলায় নাই। রমজানের মুখ দেখিয়াই মুকুজ্জেমশাই বুঝিলেন, রমজান মনে মনে ক্ষুব্ধ। রমজানের বাবাকে লুকাইয়া তাই উভয়ে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। মুকুজ্জেমশাই ঠিক করিয়াছেন আলিজানের বাড়ির পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে, তাহারই ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন করিয়া সেলিমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন। সমস্ত দিনের মধ্যে সে নিশ্চয়ই দুই একবার ঘাটে আসিবে। রমজানেরও মুকুজ্জেমশাইয়ের সহিত যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে জানাজানি হইয়া যায়— এই ভয়ে মুকুজ্জেমশাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন। রমজান সুতরাং মুকুজ্জেমশাইকে শ্বশুরবাড়ির গ্রামের রাস্তাটা দেখাইয়া দিয়া কাজিগ্রামে পিসির বাড়িতে চলিয়া যাইবে। আলিজানের বাড়ি রেল স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ। কাঁচা রাস্তা, হাঁটিয়া যাইতে হইবে, বৈশাখের দারুণ দ্বিপ্রহর। মুকুজ্জেমশাই কিন্তু দমিবার লোক নহেন।

ষোল

চুনচুন্ বেথুন কলেজে ভর্তি হইয়াছে, হাসিও বেথুন স্কুলে ভর্তি হইয়া গেল। চুনচুনের খরচ পীতাম্বরবাবু দিবেন, হাসি নিজের খরচ নিজেই চালাইবে। দুইটা ব্যাপারই শঙ্করকে বিস্মিত

করিয়াছে। মনে মনে সে একটু আহতও হইয়াছে। যদিও তাহার নিজের আয় যৎসামান্য—চুনচুন্ কিংবা হাসির পড়ার ব্যয়ভার অংশত বহন করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য, তথাপি তাহা যদি বাধ্য হইয়া তাহাকে করিতে হইত, তাহা হইলে সে যেন মনে মনে তৃপ্তি লাভ করিত। দুইটি জটিল ব্যাপারেই এমন সহজ সমাধানে সে একটুও খুশি হয় নাই। কিন্তু এ অস্বস্তি যে কিসের জন্য, তাহাও সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। চুনচুন্ কিংবা হাসির কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া অবশেষে তাহাদের প্রেমাস্পদ হওয়ার বাসনা তাহার আর নাই, তাহার মনের সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। বস্তুত নারী বলিয়াই যে তাহাদের সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সমুৎসুক এ কথা সত্য নহে, উহারা নারী না হইয়া পুরুষ হইলেও সে এই অস্বস্তি ভোগ করিত। অবহিতচিত্তে আত্মবিশ্লেষণ করিলে সে বুঝিতে পারিত যে, বাহাদুরি দেখাইবার দুই-দুইটা সুযোগ এমনভাবে হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতেই সে অস্বস্তি ভোগ করিতেছে। কিন্তু এই মনস্তত্ত্ব লইয়া বেশিক্ষণ সময়ক্ষেপ করিবার মত সময় সে পাইল না, লোকনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন।

কবি লোকনাথ ঘোষালের সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কী একটা ছুটিতে তিনি কয়েকদিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। গৃহিণীর নিকট কলিকাতা আসিবার কয়েকটি গুরুতর কারণ অবশ্য তিনি দেখাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিবার তাঁহার একমাত্র কারণ শঙ্কর। কন্যার জন্য পাত্র অথবা নিজের গণ্ডমালার জন্য চিকিৎসক অন্বেষণ করা তাঁহার অজুহাত মাত্র। সাহিত্যিক ছাড়া জগতে আপনার বলিতে তাঁহার কেহ নাই, থাকিলেও তাহাদের তিনি গ্রাহ্য করেন না। কন্যার পাত্র অথবা গণ্ডমালার চিকিৎসক জুটিবার হইলে ঠিক সময়ে আসিয়া জুটিয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস, এ সবের জন্য ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। পৃথিবীতে মনুষ্যপদবাচ্য সভ্য ব্যক্তির যাহা লইয়া সত্যই ব্যস্ত হওয়া উচিত, তাহার নাম সাহিত্য। সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার প্রিয়, অসাহিত্যিক মাত্রেই তাঁহার শত্রু। লোকনাথ সুদর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো রঙ, খর্বাকৃতি কদমছাঁট চুল, আরক্ত চক্ষু, চোখের কোণে পিঁচুটি। চোখে মুখে একটা দর্প প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও পরিস্ফুট।

কিছুদিন পূর্বে শঙ্কর কয়েকটি সনেট লিখিয়াছিল। বিভিন্ন মাসিকপত্রে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। লোকনাথবাবু তাহার প্রত্যেকটি পড়িয়াছিলেন। যে সব লেখকের সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎমাত্রও আশা পোষণ করেন, তাহাদের কোনো লেখা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। সনেট লইয়াই আলোচনা চলিতেছে।

লোকনাথবাবু সাধারণত মৃদু হাসিয়া আস্তে আস্তে কথা বলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আপনার সনেটগুলি গীতিকবিতা হিসেবে উৎকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সনেট হয়নি।

শঙ্কর সবিস্ময়ে বলিল, সনেটে কি একজাতীয় গীতিকবিতা নয়?

কিন্তু গীতিকবিতা মাত্রেই সনেটে নয়।

লোকনাথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার চোখে একটি দীপ্তি প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। শঙ্কর বুঝিতে পারিল, তাঁহার মনে আবেগ আসিয়াছে। সে চুপ করিয়া রহিল।

না, গীতিকবিতা মাত্রেই সনেটে নয়, দুধ মানে যেমন ক্ষীর নয়। বুঝুন ব্যাপারটা ভাল করে, লিরিকের সমস্ত উপকরণই ওতে থাকবে, অথচ স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট থাকা চাই।

শঙ্কর বলিল, তার মানে, সনেট কোনো রকম বাহুল্য থাকবে না, এই তো বলতে চান?

যে কোনো রস রচনাতেই বাহুল্য বর্জনীয় কেবল সনেটেরই বিশেষত্ব নয় তা। সনেটের ব্যাপারটা কী জানেন?

লোকনাথবাবু খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন রসেটি বলেছেন,

A sonnet is a moment's monument

Memorial from the soul's Eternity

To one dead deathless hour—

এই হল সনেটের পরিচয়। অন্যান্য লিরিক কবিতার মত সনেটে আবেগ থাকা চাই, গভীরতা থাকা চাই, গভীর রসবোধের পরিচয় থাকা চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই একটা বিশিষ্ট বাঁধন, কেন্দ্রীভূত ঘনীভূত একটা জিনিস, যাতে বাঁধন সত্ত্বেও অথবা বাঁধনের জন্যেই একটা চমৎকার রসরূপ ফুটে ওঠে। সেইজন্যেই যে কোনো লিরিক ভাবকেই সনেটের রূপ দেওয়া যায় না।

ও।

লোকনাথবাবু বলিলেন, সুতরাং বুঝতে পারছেন আপনার ওগুলো সনেট হয়নি।

বুঝতে পারছি।

শঙ্কর কিন্তু বুঝিতে পারে নাই। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে লোকনাথবাবুকে কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, তাই কোনোরূপ প্রতিবাদ করিল না; করিলেই তাঁহার সহিত হৃদ্যতা আর থাকিবে না।

লোকনাথবাবু বলিয়া চলিলেন, অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত গভীর ভাবধারা একটা বিশিষ্ট শৃঙ্খলিত হয়েও, অর্থাৎ ছন্দমিলের বিশিষ্ট বন্ধনে বন্দী হয়েও যখন রসোত্তীর্ণ হবে তখনই তাকে সনেট বলব। আগেই বলছি, তাই যদি হয়, তা হলেই বুঝতে পারছেন, যে কোনোও ভাব সনেটের উপযোগী নয়। অর্থাৎ মিলবন্ধনের কৃত্রিমতা এবং ভাবোচ্ছ্বাসের অকৃত্রিমতা যেখানে স্বাভাবিক প্রবণতাবশত রসকেন্দ্রে ঘনীভূত হচ্ছে—

একই ভাবকে নানা ভাষায় নানা কথায় বারম্বার রূপান্তরিত করিয়া বক্তৃতা করা লোকনাথবাবুর স্বভাব। আজ কিন্তু বক্তৃতায় বাধা পড়িল, অপূর্বকৃষ্ণ পালিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ বা প্রসাধনে কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে পূর্বে ভীত লুব্ধ যে অনিশ্চয়তা ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া লোকটিকে সকলের নিকট খেলো করিয়া তুলিত, তাহা এখন আর নাই। তাঁহার হাবভাবে বেশ একটা সপ্রতিভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ ভঙ্গিভরে নমস্কার করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাকে ঠিক এ সময়ে বাড়িতে পাব ভাবিনি, যদিও এ সময় ঠিক অফিস আওয়ার নয়, তবু, মানে—

লোকনাথ উঠিয়া পড়িলেন। বক্তৃতায় বাধা পড়িলে তিনি আর বসেন না। বলিয়া গেলেন, সন্ধ্যাবেলা আবার তিনি আসিবেন এবং যদি পান কয়েকটি বিখ্যাত সনেটও জোগাড় করিয়া আনিবেন।

আমি আরও আগেই আসতাম, কিন্তু মোড়ে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই—, অথচ—

ব্যাপারটা কী খুলেই বলুন না? বসুন।

বিখ্যাত শক্তিমান লোকের সম্মুখে বসিতে পাইলে অবিখ্যাত অশক্ত ব্যক্তি যেমন কাঁচুমাচু হইয়া পড়ে, অপূর্বকৃষ্ণ সেই নীতি অনুযায়ী অতিশয় সসঙ্কোচে শঙ্করের নির্দিষ্ট আসনটিতে উপবেশন করিলেন।

একটি অনুগ্রহ আমাকে করতে হবে।

বলুন।

আমার বিয়ে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে, মানে যদিও এটা আমার দুঃসাহস, তবু অনেক দিনের পরিচয়ের জোরে—

এর সঙ্গে প্রিয়বাবুর উকিল জগদীশ সেনের সম্পর্ক কী?

এর সঙ্গে কোনোও সম্পর্ক নেই, মানে, তাঁর সঙ্গে মোড়ে দেখা হওয়াতেই দেরি হয়ে গেল। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে দেখলে বিয়ের চেয়ে সেটাও কম ইম্‌পরট্যান্ট নয়, কিন্তু—

কেন, হয়েছে কী?

অপূর্বকৃষ্ণের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

শোনেননি? প্রিয়নাথ মল্লিক এক কাণ্ড করে বসেছেন যে! কাগজে বেরিয়েছে তো খবরটা।

আমি পড়িনি। প্রিয়নাথ মল্লিক কে?

বেলা মল্লিকের দাদাকে এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? মানে, আমি একস্‌পেক্ট করেছিলাম— যদিও অবশ্য আপনার—

কী হয়েছে তাঁর?

অপূর্বকৃষ্ণ ক্ষণকাল থামিয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন। বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, খবরটা শঙ্করকে বলা সমীচীন হইবে কি না! কিন্তু ব্যাপারটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে মনে পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার দ্বিধা বিদূরিত হইল।

কী হয়েছে প্রিয়বাবুর?

তিনি এক অদ্ভুত রগচটা মেজাজের লোক, মানে, তা না হলে আপিসের মধ্যে অমন ক'রে প্রফুল্লবাবুকে— তা ছাড়া ভদ্রলোকের দোষও এমন কিছু—

কী করেছেন প্রফুল্লবাবুকে?

রুল পেটা করেছেন।

কেন, হঠাৎ?

হ্যাঁ, হঠাৎই। প্রফুল্লবাবুর দোষ ছিল না তত, তিনি এমনিই ঠাট্টার ছলে, ঠিক ঠাট্টার ছলেও নয়— ভালভাবেই কথাটা বলেছিলেন অথচ প্রিয়বাবু, মানে বোধ হয়—

শঙ্কর অধীর হইয়া উঠিতেছিল, আশ্চর্য স্বভাব ভদ্রলোকের! কিছুতেই কোনোও কথা সোজা করিয়া বলিতে পারেন না।

কী কথা বলেছিলেন?

আমরা সকলেই জানতাম, অর্থাৎ আমার অন্তত তাই ধারণা ছিল যে, বেলাদেবীর ওই সব কাণ্ড কারখানার ফলে প্রিয়বাবু আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়েদেরই ওপর চটা। তাই প্রফুল্লবাবু তাঁকে খুশি করবেন ভেবে— অবশ্য তিনি যে খুশি হবেনই একথা প্রফুল্লবাবুর ইম্যাজিন করাটা একটু, মানে, ফার্‌-ফেচেড বলতে পারেন, কিন্তু—

কী বলেছিলেন তিনি?

তেমন কিছু নয়, এই একটু, মানে, ভাষাটা অবশ্য একটু ইয়ে গোছের মানে, অশ্লীলই বলতে হবে, কিন্তু প্রিয়বাবু ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে ওভারলুক করতে পারতেন।

এর জন্যে রুল-পেটা করলেন তিনি প্রফুল্লবাবুকে?

সে এক ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড, ভদ্রলোক মাথা ফেটে অজ্ঞান; পুলিস কেস—

কী বললেন তাঁর উকিল?

খুব বেশি আশা দিলেন না— দেওয়া শক্ত, মানে—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়নাথ মল্লিকের মুখখানা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

আমার বিয়েতে যাবেন তো? আপনি এরকম নিমন্ত্রণ রোজই পান নিশ্চয়, তবু যদি দয়া করে—

হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব।

সেই জন্যই চিঠি না পাঠিয়ে পার্‌সোনাল্লি এলাম, জানি, আপনি বিজি লোক, অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেও হয়ত—

যাব।

জায়গাটা চিৎপুরের গলি, এই চিঠিতেই ঠিকানা দেওয়া আছে।

সুদৃশ্য কার্ডে ছাপানো নিমন্ত্রণ লিপিটি অপূর্বকৃষ্ণ বাহির করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া নাক মুখ মুছিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, লোকে বসতে পেলেই, মানে প্রোভার্বটা জানা আছে নিশ্চয়ই আপনার—। এবং হাসিলেন।

লোকনাথবাবুর নিরন্ধ্র সমালোচনার পর অপূর্বলকৃষ্ণ পালিতের তোষামোদ শঙ্করের বড় ভাল লাগিতেছিল। সে প্রসন্ন দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, আবার কী?

কাঁচুমাচু মুখ করিয়া অপূর্বকৃষ্ণ বলিলেন, শুধু আমার নয়, মীনুরও অনুরোধ— দয়া করে একটি কবিতা যদি লিখে দেন। বেশি বড় নয়, একটি সনেট শুধু, সেদিন কী একটা কাগজে আপনার সনেট একখানা পড়লাম, ওয়ান্ডারফুল— সিমপ্লি ওয়ান্ডারফুল।

শঙ্করের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

দেবেন লিখে?

আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে।

অপূর্বকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর সহসা তাহার মনে হইল, এ কী শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে তাহার। অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের প্রশংসার জন্য সে লালায়িত।

পিওন চিঠি দিয়া গেল। আর একটি বিবাহের নিমন্ত্রণ পড়িয়া শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল। চুনচুনের সহিত পীতাম্বরবাবুর বিবাহ!

বিস্মিত হইল, কিন্তু ইহা লইয়া তাহার অন্তরে তেমন আলোড়ন জাগিল না। তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া লোকনাথবাবুর কথাগুলিই কেবল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছিল— আপনার ওগুলো সনেট হয়নি।

সতেরো

শঙ্কর সবিস্ময়ে চণ্ডীচরণ দস্তিদারের বিদ্যাবত্তার কথা চিন্তা করিতে করিতে আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। লোকটাকে সে এতদিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ মাসে 'সংস্কারকে'র জন্য যে প্রবন্ধটি তিনি দিয়াছেন, যাহার প্রুফ সে এইমাত্র সংশোধন করিয়া ফিরিতেছে, তাহা পড়িবার পর লোকটির প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট না হইয়া পারা যায় না। 'প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা' প্রবন্ধের নাম। কিন্তু দুইটি নয়, অনেক জ্ঞাতব্য কথাই তিনি লিখিয়াছিলেন। আর যাহারই থাক শঙ্করের অন্তত এসব কিছুই জানা ছিল না। আবিসিনিয়ার পর্বতকন্দর হইতে নীল নদের উৎপত্তিবৃত্তান্ত, নিম্ন-মিশরের সহিত ব-অক্ষরের সাদৃশ্য, পেলুশিয়ান কেনোপিকের উদ্ভব, প্রাচীন ইজ্‌রেলাইটস্‌দের কাহিনী, জোসেফের ইতিবৃত্ত, ফারাওদের পূর্ববর্তী রাখাল রাজগণের ইতিহাস, হিলিওপোলিস, ফিনিক্স সম্বন্ধে তথ্য, আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর অতীত মহিমা— শঙ্কর সত্যই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে এসব কিছুই জানিত না, অথচ চণ্ডীচরণ দস্তিদার—

আমাকে চিনতে পারেন দাদা?

একটি রোগা লম্বাগোছের যুবক প্রণাম করিয়া শঙ্করের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক শীর্ণ চেহারা দেখিলেই মনে হয়, তাহার শরীরের সমস্ত রস কে যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে, অস্থি এবং চর্ম ছাড়া দেহে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। শঙ্কর চিনিতে পারিল না।

আমি আপনার মামাতো ভাই নিত্যানন্দ।

ও।

উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আপনার পড়ার খরচ বন্ধ করে পিসেমশাই আমাকেই এম এ.পড়ার খরচ দিয়েছিলেন।

ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমাকে সেই কোন্ ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম, তাই চিনতে পারছি না। কোথায় আছ, এখন কী করছ?

কিছুই করছি না।

কতদিন এম এ পাস করেছ।

পাস করতে পারিনি। বার তিনেক চেষ্টা করেও পারিনি। করলেও বা কী হত বলুন?

হাসিল। এবড়ো-খেবড়ো পানের ছোপ-ধরা বিশ্রী দাঁতগুলো বাহির হইয়া পড়িতেই নিত্যানন্দের স্বরূপ যেন উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

কোথায় আছ এখানে?

দেশ থেকে আজই এসেছি, একজন ফ্রেন্ডের বাড়িতে উঠেছি।

আমার বাসায় এস, ঠিকানাটা হচ্ছে—

ঠিকানা জানি। আপনার ঠিকানা কে না জানে, আপনি আজকাল বিখ্যাত লোক।

তারপর হাসিয়া বলিল, কাল যাব। এখন অন্য জায়গায় কাজ আছে একটু। বউদি এখানেই আছেন তো?

আছেন।

নিত্যানন্দ চলিয়া গেল।

শঙ্কর তাহার প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার আপন মামাতো ভাই, অথচ কত অপরিচিত!

আঠারো

ভণ্টু আপিস হইতে ফিরিতেছিল। আজ তাহার অনেক পূর্বেই ফেরা উচিত ছিল, কিন্তু কাজ সারিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। কাজ কী একটা যে, তাড়াতাড়ি শেষ হইবে? মৃন্ময়ের জেল হওয়ার পর হইতে কাজের চাপ আরও বাড়িয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি নিজে দেখিয়া ক্যাশ মিলাইয়া সমস্ত টাকা জমা দিয়া তবে তাহার ছুটি। ইন্দু কেমন আছে কে জানে? ইন্দুমতী আসন্নপ্রসবা, ক্রমাগত ভুগিতেছে। আজ সকালে বার দুই বমি করিয়া চোখ উল্টাইয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিল যে, পট করিয়া চল্লিশটি টাকা খসিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়িতে যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই ডাকিতে হইল, তিনি নাকি উহার নাড়ি এবং ধাত ভাল বুঝেন। তাঁহার ফি বত্রিশ টাকা এবং যে সকল ঔষধ পথ্য তিনি ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, তাহার দামও আট টাকা। মুখটি বুজিয়া দিতে হইল। তিনি বলিয়া গেলেন যে, প্রসবের পূর্বে প্রসূতির যেসব পরিচর্যা প্রয়োজন, তাহার কিছুই করা হইতেছে না। আসন্নপ্রসবার যে পরিমাণ দুধ, ফল খাওয়া উচিত, যতটা বিশ্রাম এবং ব্যায়াম করা দরকার, তাহার কিছুই হয় নাই। সত্যই হয় নাই। কী করিয়া হইবে? সংসারের নানাবিধ খরচ। দাদা আবার চেঞ্জে গিয়াছেন, তাঁহাকে খরচ পাঠাইতে

হয়; দাদার ছেলেরা স্কুলে পড়িতেছে, তাহাদের সব খরচ দিতে হয়, বাবু অহিফেন এবং দুধের মাত্রা বাড়াইয়াছেন; বাবাজি আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহার জন্য খাঁটি গব্যঘৃত কিনিতে হইতেছে। ইহার উপর প্রসূতি পরিচর্যার খরচ কী করিয়া জুটাইবে সে। তাহার মাহিনা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সংসার খরচ তদপেক্ষা ঢের বেশি বাড়িয়াছে। ইন্দু এ বেলা কেমন আছে, কে জানে? একবার ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা করিয়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু ইন্দুর এ বেলার খবরটা না জানিয়া যাওয়া বৃথা। হঠাৎ ভন্টুর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, বাইকের ব্রেকটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে নামিয়া পড়িল। এ কি কাণ্ড। এ তো স্বপ্নেও ভাবে নাই।

বল হরি হরিবোল—

করালীচরণ বক্সি মড়া বহিয়া লইয়া যাইতেছেন। করালীচরণ বক্সি। কাহার মড়া? করালীচরণ দ্রাবিড় হইতে ফিরিয়াছেন নাকি? কবে? ভন্টু কিছুই তো জানে না। সে গত ছয় মাস করালীচরণের কোনো খোঁজই রাখে নাই। অবসরও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নাই। দুই বৎসর পূর্বে সে হয়ত আগাইয়া গিয়া কুশল প্রশ্ন করিত, এমন কী তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়া সমস্ত রাত কাটাইয়া আসিতেও হয়ত তাহার বাধিত না, আজ কিন্তু এসব করিবার কল্পনাও সে করিল না, পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল। বরং এই চিন্তাই মনে উদিত হইল, চাম্‌লদ আমাকে দেখিতে পায় নাই তো!

উনিশ

অনেক রাত্রে চিৎপুর রোড দিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। এমন আনন্দময় উন্মাদনা তাহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। তাহার দেহের প্রতি শিরায়-উপশিরায় যেন সুরা তরঙ্গিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল, লোকনাথ ঘোষালের বিচারই কি ঠিক। প্রফেসর গুপ্তের শুচিবায়ুগ্রস্ত সাহিত্য রুচিই কি সাহিত্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড? তাহার মনের অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে সে হয়ত জ্ঞাতসারে সচেতন ছিল না, থাকিলে লোকনাথ ঘোষাল অথবা প্রফেসর গুপ্তের রসবোধে সন্দিহান হইতে সে হয়ত ইতস্তত করিত। কিন্তু অবিমিশ্র প্রশংসার মদিরায় তাহার সমস্ত চিত্ত বিহ্বল, লোকনাথ ঘোষাল, প্রফেসর গুপ্ত সব তখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। অপূর্বকৃষ্ণ পালিতের বিবাহ বাসরে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ভক্ত পাঠিকার সহিত দেখা হইয়া যাইবে, ইহা কে কল্পনা করিয়াছিল। কুমারী নীরা বসাক সত্যই তাহাকে অবাক করিয়া দিয়াছে। সে তাহার সমস্ত লেখা শুধু যে পড়িয়াছে তাহা নয়, যত্ন সহকারে বারংবার পড়িয়াছে। তাহার কবিতা তো বটেই, কিছু কিছু গদ্যও তাহার কণ্ঠস্থ, অনায়াসে মুখস্থ বলিয়া গেল। 'জীবন-পথে' পুস্তকের নীহার তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, 'উদ্বন্ধন' গল্পের নায়িকার দুঃখে সে অশ্রুপাত করিয়াছে, 'নাম না-জানা' গল্পের সূক্ষ্ম রসে সে অভিভূত। তাহার রুচি তুচ্ছ করিবার মত নয়। টল্‌স্টয়-গোর্কি-পড়া মেয়ে। তাহার রসবোধ নাই- এ কথা বলা চলে না। অতিশয় দক্ষতার সহিত সে 'পান্থনিবাসে'র যমুনা-চরিত্র বিশ্লেষণ করিল, তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সমন্বয় দেখাইল। শঙ্কর সত্যই অবাক হইয়া গিয়াছে। কুমারী নীরা বসাকের মুখখানা বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। মেয়েটি দেখিতে কুৎসিত। সামনের দাঁতগুলি বড় বড়, গায়ের রঙ কালো, সামনের চুলগুলি প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটিতেও তেমন কিছু সৌন্দর্য নাই। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা করিতে করিতে সে যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সমস্ত কদর্যতাকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহার চোখে মুখে যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা দেহাতীত এবং সত্যই

অনবদ্য। শঙ্করকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। শঙ্করের জীবনে অনেক নারী আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন মেয়ে শঙ্কর আর দেখে নাই। অধিকাংশ নারীর দেহটাই সর্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু নীরা বসাক রূপের অভাব সত্ত্বেও মনকে আকর্ষণ করে। সে যে নারী, এ কথাটাই মনে থাকে না। এ কোথায় ছিল এতদিন? এই প্রসঙ্গে চুনচুনের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। চুনচুনেরও সাহিত্যপ্রীতি আছে, কিন্তু তাহা এত বেশি নীরব যে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। চুনচুনেরও আজ বিবাহ হইয়া গেল। শঙ্কর যায় নাই, তাহার প্রবৃত্তিও হয় নাই। চুনচুন যে স্বেচ্ছায় পীতাম্বরবাবুকে বিবাহ করিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। এই লোভী লোমশ বৃদ্ধটার মধ্যে সে কী এমন দেখিতে পাইল? যদি কোনোদিন চুনচুনের সঙ্গে নির্জনে দেখা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে, পীতাম্বরবাবুর মাধুর্যটা কোথায়? হয়ত কিছু আছে, যাহা শঙ্করের অনধিগম্য। সহসা শঙ্করের মনে হইল, চুনচুনের সহিত এতদিনের পরিচয়, অথচ তাহার সম্বন্ধে সে কত কম জানে। যতীন হাজরার শোচনীয় মৃত্যুর রাত্রিটা মনে পড়িল। — সেই গভীর রাত্রে গোপনে খিল খুলিয়া দেওয়া! সেদিনও চুনচুন যেমন রহস্যময়ী ছিল, আজও তেমনই রহস্যময়ী আছে। তাহার অন্তরলোকের দ্বার আজও শঙ্কর খুলিতে পারে নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল, খুলিবার প্রয়োজনটাই বা কী? সকলের অন্তরলোকের খবর যে তাহাকে রাখিতেই হইবে, এমনই বা কী কথা আছে? সিগারেট বাহির করিবার জন্য সে পকেটে হাত পুরিল। হাত পুরিতেই বিবাহের প্রীতি উপহারখানা হাতে ঠেকিল। একটা ল্যাম্প পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া বহুবার পঠিত সনেটটা সে আবার পড়িল। চমৎকার করিয়া ছাপাইয়াছে। অপূর্ববাবুর রুচিটা যে সুমার্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। অপূর্বকৃষ্ণের উপর শঙ্করের বরাবরই বিতৃষ্ণা; আজ এ উপলক্ষে বিতৃষ্ণাটা যেন অনেক কমিয়া গেল। মনে হইল, তাহার উপর এতদিন সে অকারণে অবিচার করিয়াছে। তাহার উপর রুষ্ট হইয়া থাকিবার ন্যায়সঙ্গত কোনো কারণ তো নাই। কৃতবিদ্য মার্জিতরুচি ভদ্রলোক, অতিশয় নিরীহ, কাহারও সাতে-পাঁচে থাকিতে চান না, কাহারও উপকার ভিন্ন অপকার করেন না, সঙ্গীত বিষয়ে সত্যই গুণী। নারীজাতির সম্বন্ধে অবশ্য কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে দুর্বলতা কাহার নাই? বউটিও বেশ হইয়াছে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। মেয়েটি কিছুকাল পূর্বে অপূর্বকৃষ্ণেরই ছাত্রী ছিলেন। গরিব ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে অপূর্বকৃষ্ণের সহায়তাতেই নাকি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছেন, গান বাজনাও শিখিয়াছেন। হয়ত উহারা সুখেই থাকিবে।

কিছুদূরে গিয়াই শঙ্কর কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণের কথা ভুলিয়াই গেল। পকেট হইতে সনেটটা বাহির করিয়া আর একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়াইয়া আবার সেটা পড়িতে লাগিল। সকলেই কবিতাটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ বিডন স্ট্রিটে ঢুকিয়া পড়িল। বিডন স্ট্রিটের একটা গলিতেই লোকনাথবাবু থাকেন।

রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, তবু লোকনাথবাবু জাগিয়াই ছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে বিরাট একটা প্রবন্ধ লিখিবেন, বহুদিন হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। মফস্বলে সব বই পাওয়া যায় না বলিয়া লিখিতে পারেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া লাইব্রেরি হইতে পুরাতন মাসিক ও নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় অংশগুলি টুকিয়া লইতেছিলেন। শঙ্করের ডাকে কপাট খুলিয়া দিলেন এবং এত রাত্রে শঙ্করকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

এত রাত্রে কী মনে করে?

একটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম আপনি কী করছেন দেখে যাই।

আসুন আসুন। আমি বঙ্কিমকে নিয়ে পড়েছি। বঙ্কিম আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পুরোধা, অথচ তাঁর সম্বন্ধে ভাল করে কোনো আলোচনাই হয়নি এখনও। আমি ভাবছি, আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি করে যাব। বঙ্কিমের ভাষার লিপিচাতুর্য প্রথমে দেখাতে চাই, বুঝলেন। বঙ্কিমের ভাষাটা—

বঙ্কিম-আলোচনা শুরু হইয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে শঙ্কর বাড়ি ফিরিল। বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিল বটে, কিন্তু মন তাহার অপ্রসন্ন। লোকনাথবাবু সনেটটির প্রশংসা তো করেনই নাই, বরং ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কবিতা লইয়া এ রকম খেলা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অমিয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। পাশে থালায় পরটা ঢাকা দেওয়া। শঙ্করের ডাকে অপ্রতিভমুখে সে উঠিয়া বসিল। শঙ্করও অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যে আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ ছিল, এ কথা সে অমিয়াকে বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

যাই, পরটাগুলো গরম করি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছ কী করে, যা মশা!

মশারির ভেতর আলো ঢোকে না। এখানে শুয়ে শুয়ে পড়ছিলাম।

তাহার পর মিটিমিটি চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, তোমারই বই পড়ছিলাম একখানা।

কোন্‌টা?

'পান্থনিবাস' খানা।

কেমন লাগল?

বেশ।

শঙ্কর কোটটা খুলিয়া চেয়ারে রাখিল।

আবার ওখানে রাখছ? আলনা রয়েছে তা হলে কেন। অমিয়া কোটটা তুলিয়া যথাস্থানে রাখিল। তাহার পর পাশের ঘর হইতে একটা কাপড় আনিয়া বলিল, কাপড়টাও ছেড়ে ফেল, সমস্তটা দিন ওই এক কাপড়ে রয়েছ।

কাপড় ছাড়া হইয়া গেলে অমিয়া বলিল, হাত পা মুখ ধোবে না? বারান্দার কোণে জল গামছা সব ঠিক করে রেখেছি।

শঙ্কর হাত মুখ ধুইয়া আসিল।

'পান্থনিবাস' খানা ভাল লাগল তা হলে তোমার?

হ্যাঁ, বেশ তো। তবে—

আবার তবে কি—

আমি সব বুঝতে পারিনি ভাল। আমার বিদ্যের দৌড় আর কতদূর!

কোন্‌খানটা বুঝতে পারনি?

ওই যমুনাকে। ও-রকম মেয়ে আছে নাকি? কী বিচ্ছিরি কাণ্ড, ও রকম করে নাকি কেউ?

করে বইকি।

রাম রাম।

যমুনা মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নানা বিপদ-আপদের মধ্যে পড়িয়া অবশেষে নার্স হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে এবং কালক্রমে একজন ডাক্তারের প্রেমে পড়িয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রেমই একমাত্র কাম্য ধন। কিন্তু উক্ত ডাক্তার যখন তাহার প্রণয়-ফাঁদে ধরা দিল না, তখন যমুনার মনে হইল, কিছুই নয়, পৃথিবীটা একটা পান্থনিবাস মাত্র।

ইহাই 'পান্থনিবাসে'র গল্প। এ সম্বন্ধে শঙ্কর নীরা বসাকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছে, লোকনাথ ঘোষালের চুলচেরা সমালোচনাও শুনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, অমিয়াকেও এই গল্পের আর্ট সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু অমিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তোমার গাল-বালিশ করেছি আজ, দেখবে? এক দিকে টকটকে লাল শালু আর এক দিকে কালো সাটিন— এই দেখ। ভাল হয়নি? আমার ইচ্ছে ছিল, এ দিকটা নীল রঙের দিয়ে—

বেশ হয়েছে। পরটা গরম কর।

এই করি। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? পাবে না, সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছ। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

লোকনাথবাবুর কাছে।

আবার সনেটের কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

কুড়ি

অপরাহ্ন।

'সংস্কারক' আপিসে শঙ্কর যথারীতি প্রুফ দেখিতেছিল। একটি নয়-দশ বৎসরের বালক সসঙ্কোচে প্রবেশ করিল।

শঙ্করবাবু কোথায়?

আমি শঙ্কর। কেন?

বালক একটি চিঠি দিল। ছবির চিঠি। ক্ষুদ্র পত্র—

ভাই শঙ্কর,

তিন দিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। শয্যাসঙ্গিনীও সঙ্গ নিয়েছেন। ঝি পলাতকা। সুতরাং বুঝতেই পারছ। তোমাকে লিখছি, কারণ তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই লেখবার নেই। কেউ ঠিক বুঝবেও না। সময় নষ্ট করে তোমাকে আসতে বলছি না, কিন্তু যখন হয় একবার এস ভাই। এটি আমার বড় ছেলে। যদি অসম্ভব না হয়, এর হাতে এক টাকা না পার, গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিও অন্তত। কাল থেকে সকলের অনাহার চলছে।

পত্রপাঠ শঙ্কর বালকের দিকে চাহিল। ফরসা রঙ, শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মলিন বেশবাস। পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দেখিল, একটি মাত্র টাকাই আছে। এই নাও! বাবাকে বলো, একটু পরেই যাচ্ছি আমি।

বালক চলিয়া গেল। প্রুফটা শেষ করিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। চণ্ডীচরণবাবুর নিকট গিয়া বলিল, গোটা দশেক টাকা আমার এখনই চাই।

চণ্ডীচরণ বিনা বাক্য ব্যয়ে শঙ্করের নামে খরচ লিখিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল যে, সে আপিসের নিকট হইতে প্রায় দেড় শত টাকার ওপর ধার করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি একটু বেরচ্ছি, বুঝলেন? ছবির খুব অসুখ।

চণ্ডীচরণবাবু চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, 'হ্যাঁ'-'না' কোনোও জবাব দিলেন না। শঙ্করের মনে হইল, চণ্ডীচরণবাবুর কাছে সে বৃথা জবাবদিহি করিতে গেল কেন? নিজের উপরই এজন্য সে চটিয়া গেল এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং যেমন তাহার স্বভাব, অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে লাগিল। সহসা বেথুন কলেজের গেটের সম্মুখে চুনচুনের সহিত দেখা। চুনচুন্ ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করকে দেখিয়া চুনচুন্ মাথার কাপড়টা একটু

টানিয়া দিল, একটি অতি ক্ষীণ মৃদু হাস্যরেখা অধরপ্রান্তে ফুটিল কী ফুটিল না বোঝাও গেল না। শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। না দাঁড়াইয়া উপায় ছিল না, কিন্তু কী বলিবে, সহসা সে ভাবিয়া পাইল না। চুনচুনই কথা কহিল।

অনেক দিন পরে দেখা হল। আজই ভাবছিলাম, আপনাকে ফোন করব। সন্ধের দিকে আপনার কবে অবসর আছে বলুন তো?

কেন?

উনি বলছিলেন, একদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে।

আমার অবসর নেই।

চুনচুন্ ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শঙ্করের মনে হইল, দৃশ্যটা শোভন হইতেছে না। বেশিক্ষণ অবশ্য এভাবে থাকিতে হইবে না, অদূরে চুনচুনের ট্রাম দেখা যাইতেছে।

বলিল, আচ্ছা, চলি তবে আমি।

আপনি মিছিমিছি রাগ করে আছেন।

কি করে বুঝলে, রাগ করে আছি?

চুনচুন্ চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্করও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোমার মত মেয়ে যখন পীতাম্বরবাবুর মত লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করে, তখন রাগ হয় না, আশ্চর্য লাগে, একটু দুঃখও হয়।

আমার মতন সাধারণ একজন মেয়েকে আপনি অতবড় করে দেখছেন কেন, বুঝতে পারছি না।

পীতাম্বরবাবুর কী আছে যে, তাকে বিয়ে করলে তুমি?

টাকা।

শঙ্কর ভাল করিয়া চুনচুনের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। না, ব্যঙ্গ নয়, উহাই তাহার মনের কথা। অবাক হইয়া গেল।

টাকা! টাকার জন্য তুমি বিয়ে করেছে?

শঙ্করের মুক্তোকে মনে পড়িল।

চুনচুন্ উত্তর দিল না, সম্মুখেই দেওয়ালটার পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। শঙ্করের, কী জানি কেন, হঠাৎ যতীন হাজরার মুখটাও মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ কথাগুলিও।

যতীনবাবুকে নিশ্চয় তুমি টাকার জন্যে বিয়ে করনি?

টাকার জন্যেই করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় ঠকিয়েছিলেন, তাঁর সত্যি কিছু ছিল না।

টাকার জন্যেই বিয়ে করেছিলে তাঁকে?

মনে করুন, করেছিলাম। তাতেই বা লজ্জা পাবার কী আছে? টাকা না হলে সংসার চলে না, আমাদের মত মেয়ের— যার না আছে রূপ, না আছে গুণ— বিয়ে করা ছাড়া ভদ্রভাবে টাকা সংগ্রহের আর কি উপায় আছে, বলুন?

তোমার সম্বন্ধে ঠিক এ ধারণা ছিল না আমার।

কী ধারণা ছিল?

আমার ধারণা ছিল, একটা উচ্চ আদর্শের জন্য তুমি অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করতে পার।

আদর্শ বজায় রাখবার মত সঙ্গতি নেই আমার। শুধু আমার কেন অনেকেরই নেই। এই দেখুন না, আপনার মত লোককেও টাকার জন্যে তুচ্ছ একটা চাকরি করতে হচ্ছে। ওকাজ কি আপনার উপযুক্ত? কিন্তু উপায় কী বলুন, সংসারে টাকাটা দরকার যে।

ট্রাম আসিয়া পড়িল।
আমি যাচ্ছি। আসবেন একদিন।
ট্রাম চলিয়া গেল।

একুশ

শঙ্কর কিছুদিন পূর্বে 'হাতুড়ি' নাম দিয়া একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিল। আধুনিক কাব্য হিসাবে পুস্তকটি অনেকের প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সম্পর্কে ডাক্তার মুখার্জির একটি পত্র আসিয়াছে, শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহা পড়িতেছিল।

শঙ্কর,

বল্‌শেভিজম্‌ নিয়ে কবিতা লিখে তুমিও আধুনিক হবার চেষ্টা করছ দেখে কষ্ট হল। অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছ নিশ্চয়। বাংলা দেশে সমঝদার জোটা একটা দুর্বিপাক। এই সমঝদারের গুঁতোয় সত্যেন্দ্র দত্ত 'বাঙালী পল্টন' আর শরৎ চাটুজ্জে বোধ হয় 'শেষপ্রশ্ন' লেখেন। রবীন্দ্রনাথও আত্মরক্ষা করতে পারেননি। তোমার লেখা যে সব জায়গায় খারাপ হয়েছে তা বলছি না, কিন্তু পপুলার এবং আধুনিক হওয়ার 'আপ্রাণ' প্রয়াস রসিকের নিকট হাস্যকর। নিন্দা শুনতে যদি ভালবাস, তবলা বাঁধা হওয়ার আগে গান আরম্ভ করে লম্বকর্ণ শ্রোতাদের তাক লাগাবার প্রবৃত্তি যদি কম থাকে তো তোমার উচিত আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ হাতুড়ির ঠকঠক সহ্য করা। কারণ আমার বিশ্বাস, তোমার অন্য সমঝদারেরা একটু আধটু বেসুরে বিক্ষুব্ধ হন না এবং তুমিই সেই কুসংসর্গে পড়ে বেসুরে সুর-সাধনা আরম্ভ করেছ। কিন্তু এ আমি করছি কি? নাঃ—

চিঠিতে আর কাব্য সমালোচনা করব না। লিখতে লিখতে হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব হ'ল। শাস্ত্রের উপদেশ— এখন বনং ব্রজেৎ। বনে যেতে হয়নি, চারিদিকে আপনা-আপনি বন গজিয়ে উঠল। কালো চুল সাদা হল, সাদা দাঁত কালো হল, স্বচ্ছ চোখের মণি ঝাপসা হয়ে এল ক্রমশ। যে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসর কাটালুম, সে তার রূপ বদলে ফেলল। পুরনো যা ছিল তা আর হাতের কাছে নেই, নতুন যা এল তাকে চিনি না। সব বদলে গেল, বদলাল না শুধু 'সোহং দেবদত্ত'—এই জ্ঞান। তাই মাঝে মাঝে হঠাৎ বক্তৃতা করে ফেলি। তারপর চমকে থেমে গিয়ে হাতড়ে দেখি, আশে পাশে কেউ নেই। অতএব বক্তৃতা করব না। যদি কখনও দেখা হয়, আমার কথা বোঝাবার চেষ্টা করব। ইতি—

শুভার্থী
নীলমাধব মুখোপাধ্যায়

বাইশ

ছবির এবং ছবির স্ত্রীর টাইফয়েড হইয়াছে।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা জাগিয়া বসিয়া আছে। শঙ্কর ছাড়া ইহাদের দেখিবার কেহ নাই। শঙ্করই ডাক্তার ডাকিয়াছে, ঔষধপত্র আনিতেছে, বেশি বাড়াবাড়ি হইলে রাত্রি জাগিয়া সেবাও করিতেছে। সমস্ত খরচও তাহারই, ছবি কপর্দকহীন। ধার বাড়িতেছে। সেজন্য শঙ্কর ক্ষুব্ধ নয়, তাহার প্রধান ক্ষোভ— লিখিবার সময় পাইতেছে না। রাত্রিটুকুই লিখিবার সময়, কিন্তু ছবিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া যায় না। ছবির স্ত্রীও শয্যাগত। এ বাড়ির কেহই

সুস্থ নয়। সাতটি সন্তান—কাহার সর্দি, কাহারও চোখ উঠিয়াছে, কাহারও সর্বাঙ্গে পাঁচড়া, একজনের হাঁপানি—অনাহারক্লিষ্ট রুক্ষ শীর্ণ সকলেই। দারিদ্র্যের ঠিক এই মূর্তি বড় করুণ। যাহারা সমাজে সোজাসুজি গরীব বলিয়া পরিচিত, তাহাদের দীনতা এমন মর্মান্তিক নয়। কারণ তাহা প্রত্যাশিত সরল দীনতা। ইহা শুধু দীনতা নয়, ইহা দীনতা এবং দীনতাকে অপটুভাবে ঢাকিবার ব্যর্থপ্রয়াস বলিয়া অতিশয় করুণ। পচা জিনিসকে সুদৃশ্য আবরণ দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয় ইহা তাহাই। তোশকের ছিটটি সুন্দর সুরুচির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু সেই সুরুচির মর্যদা রক্ষা করিতে গিয়া দ্বিতীয় তোশক প্রস্তুত করানো সম্ভবপর হয় নাই। এখন তাহা মলমূত্রে ভিজিয়া উঠিয়াছে; বাড়িতে দ্বিতীয় তোশক নাই, মলিন অংশটুকু কাপড় চাপা দেওয়া আছে, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে। এমনই সব জিনিসেই। যে কাপটি দিয়া ঔষধপত্র খাওয়ানো হইতেছে, তাহা এককালে সুদৃশ্য ছিল, কিন্তু এখন তাহা হাতলহীন, ফাটা, ফাটার ফাঁকে ময়লা জমিয়া আছে। স্ত্রীর হাতে চুড়ি ঝকমক করিতেছে, কিন্তু একটিও স্বর্ণের নহে, সমস্ত গিলটি করা।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, শঙ্কর একা বসিয়া ভাবিতেছিল। লেখকেরা কাগজ কলম লইয়াই যে সর্বদা লেখে তা নয়, তাহারা মনে মনে লিখে। নূতনতম এক কাব্য-নীহারিকা তাহার মনের আকাশে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছিল।

ছবি প্রলাপ বকিতে লাগিল— ব্রাউনিংয়ের কবিতা। অসুখে পড়িয়াও বেচারি কবিতা ভোলে নাই। সহসা শঙ্করের মনে হইল, এত সাহিত্যরস পান করিয়াও তাহার এই দুর্দশা কেন? সব দিক দিয়াই সে তো অমানুষ। মনে প্রশ্ন জাগিল, সাহিত্য দিয়া সত্যই কি কাহারও উপকার করা যায়? অন্ধকারে আলেয়ার পিছনে অথবা ঊষর মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া যাহারা পথ হারাইয়া ফেলে, সেও তাহাদেরই মত একটা মিথ্যা আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে না তো?

তেইশ

ইন্দু সামলাইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারে নাই। ইন্দুর মুখে ভণ্টু শুনিল যে, এই সময়ে তাহার নাকি একটা কঠিন ফাঁড়াও আছে। ভণ্টু আর স্থির থাকিতে পারিল না, করালীচরণের উদ্দেশ্যে বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। ঝামাপুকুরের গলিতে ঢুকিয়া সে দেখিতে পাইল, পানওয়ালীর দোকানটা খোলা নাই। খোলা থাকিলে সুবিধা হইত, তাহার নিকট হইতে করালীচরণের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। এতদিন পরে দেখা, বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিলে চাম্‌লদ হয়ত ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। যা লোক, কিছুই বলা যায় না। ভণ্টুর সাংসারিক অবস্থা যখন মন্দ ছিল, তখন সে করালীচরণকে অতিশয় ভয় ও সমীহ করিয়া চলিত। এখনও অবশ্য তাহার মনের ঠিক সে ভাব নাই, তবুও করালীচরণের সম্মুখীন হইতে সে কেমন যেন ইতস্তত করিতেছিল। ইন্দুমতীর ফাঁড়ার খবরটা কর্ণগোচর না হইলে সে হয়ত আসিতই না।

সে ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছিল, তাহার কারণ, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। সে করালীচরণকে কথা দিয়েছিল যে, তাহার বাসার তত্ত্বাবধান করিবে; কিন্তু সে বহুকাল এদিকে আসে নাই। করালীচরণের কুড়িটা টাকাও তাহার কাছে আছে। আছে মানে, পাওনা আছে। সঙ্গে নাই।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চাহিয়া অবশেষে ভণ্টু আগাইয়া গেল। দেখিল, দরজা বন্ধ। ঠেলিবামাত্র কিন্তু খুলিয়া গেল।

কে?

ভণ্টু সবিস্ময়ে দেখিল, করালীচরণ টেবিলটাকে ঘরের এক কোণে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বোতলের মুখে মোমবাতি জ্বলিতেছে, টেবিলের একধারে একগাদা বই স্তূপীকৃত করা আছে। করালীচরণ ঝুঁকিয়া কী যেন করিতেছিলেন, শব্দ পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছেন।

আমি ভণ্টু।

করালীচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এক চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। চিবুকটা একবার কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভণ্টু? ভণ্টু কে?

ভণ্টু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাই নারায়ণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এগিয়ে আসুন না, মুখখানা দেখি একবার। ভণ্টু তাঁহার কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

তবু একটু আগাইয়া গেল।

ভণ্টুর মুখের উপর এক চক্ষুর দৃষ্টি আরও ক্ষণকাল নিবদ্ধ রাখিয়া করালীচরণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে শঙ্কা ও ক্রোধ যুগপৎ ঘনাইয়া উঠিল।

ও, আপনি। বসুন।

এইবার ভণ্টু বুঝিতে পারিল, কেন সে করালীচরণের কথা বুঝিতে পারিতেছিল না। করালীচরণের দাঁত নাই, সমস্ত মুখটাই যেন তুবড়াইয়া গিয়াছে।

ভণ্টু প্রশস্ত চৌকিটির এক ধারে উপবেশন করিল।

কিছু মনে করবেন না, নামটা আপনার মনে ছিল না। আপনি যদি শেক্সপিয়াব, মিলটন, ডারবিন, ফ্যারাডে বা ওদের মত কেউ হতেন, তা হলে হয়ত থাকত।

একটু থামিয়া অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, বাই নারায়ণ! বিড়বিড় করিয়া আরও খানিকটা কী বললেন ভণ্টু বুঝিতে পারিল না। সে মনে মনে স্বগতোক্তি করিল, চাম্‌লদ ভীম জালে ফেলবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে দেখছি।

প্রকাশ্যে বলিল, আমার নতুন বাসার ঠিকানা পানউলী জানত। আপনি যদি একটু খবর—

আমি যখন এলাম, তখন ঠিকানা বলবার মত অবস্থা ছিল না পানউলীর। সে তখন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছিল এই চৌকিতে পড়ে পড়ে। মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার লোক ছিল না কাছে।

করালীচরণ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ভণ্টু কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না। করালী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার বলিয়া উঠিলেন, বেশ হয়েছে, বেশ্যা মাগীর কাছে আসবে কে?

চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল। এক চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি পুনরায় তিনি ভণ্টুর মুখের ওপর নিবদ্ধ করিলেন। ভণ্টুর মনে হইল, যেন তাহার কপালে কেহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

ভণ্টু বিস্ময় প্রকাশের ভান করিয়া বলিল, পানউলির কাছে কেউ ছিল না?

বিব্রত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া কোনওক্রমে প্রশ্নটা করিল।

মোস্তাক ছিল, কিন্তু মোস্তাক তখন একপাল কুকুরবাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত। চৌকির অপর প্রান্তে পুঞ্জীভূত অন্ধকারটা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল।

না না, তুমি ঘুমোও, তোমার কোনোও দোষ দিচ্ছি না। তুমি ঠিকই করেছিলে। একটা মর-মর বুড়ি বেশ্যার মুখে দু ফোঁটা জল দেওয়ার চেয়ে কচি কাঁচি কুকুরবাচ্চা ঘাঁটা ঢের বেশি আর্টিস্টিক। তুমি একজন আর্টিস্ট। ঘুমোও তুমি, উঠ না।

মোস্তাক গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, উঠিল না।

ভন্টু চুপ করিয়াই রহিল, এই পরিবর্তিত করালীচরণ বঙ্কিকে কোনোও কথা বলিতে তাহার সাহসেই কুলাইতেছিল না। অথচ একদিন ইহার সহিত তাহার কত হৃদ্যতাই ছিল। অনেকদিন আগেকার একটা ছবি ভন্টুর মনে পড়িল! নৈহাটি স্টেশনে বসন্ত রোগাক্রান্ত ভিড়-পরিবৃত অসহায় করালীচরণের ছবিটা। কত অসহায়; ভন্টুই দয়াপরবশ হইয়া সেদিন তাহাকে তুলিয়া আনিয়া হাসপাতালে দিয়া আসিয়াছিল। অথচ ইহারই সহিত এখন কথা কহিতে সাহসে কুলাইতেছে না। তাহার মনে হইতে লাগিল, চেহারা বদলাইয়া যায় হয়ত। যাহার গোঁফদাড়ি ছিল না, সে যদি বহুকাল পরে একমুখ গোঁফদাড়ি লইয়া হাজির হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত পূর্বেকার সহজ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। করালীচরণের দন্তহীন তোবড়ানো মুখের পানে চাহিয়া ভন্টু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

করালীচরণই কথা কহিলেন, আচ্ছা ভন্টুবাবু, কল্পনা বলে কোনো বালাই আছে আপনার মধ্যে?

আজ্ঞে?

আপনি কল্পনা করতে পারেন?

একটু একটু পারি হয়ত।

পারেন? কল্পনা করতে পারেন, একটা কঙ্কালসার কদাকার বুড়ি বেশ্যা অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে, তার মৃত্যুর সময়ে মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার লোক কেউ কাছে নেই। কদাকার মুখ ভাল করে দেখেছেন কখনও? গালের হাড় উঁচু কপালের শিরা বার-করা, বড় বড় দাঁত, তাতে আবার মিশি লাগানো—

করালীচরণ হয়ত বর্ণনাটা আরও ফলাও করিয়া করিতেন, কিন্তু কুঁই-কুঁই করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। মোস্তাক তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং নিঃশব্দে ঘরের কোণে আলমারির পাশটায় গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোনোদিকে না চাহিয়া রোদ্যমান বাচ্চাগুলিকে বগলদাবা করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মা-টা আবার বোধ হয় পালিয়েছে। বাই নারায়ণ!

করালীচরণের চিবুক কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইল।

ভন্টু ভাবিতেছিল, কোনো ছুতায় এই ভীম জাল ছিন্ন করিয়া এইবার পলায়ন করা উচিত। কোষ্ঠীগণনা করাইবার আশা সে বহুপূর্বেই বিসর্জন দিয়াছিল। আর একদিন আসা যাইবে। আজ চাম্‌লদ বিরক্তি-মাউন্টেনের তুঙ্গে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে।

হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে করালীচরণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, দেখেছেন কখনও কদাকার মুখ? শুধু কদাকার নয়, তৃষিত, মুমূর্ষু, যে তার কুৎসিত হাসি ও কদর্য কটাক্ষ দিয়ে আজীবন লোক ভোলাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু একজনকেও ভোলাতে পারেনি, একটা লোক তার আপন হয়নি, তার মৃত্যুকালে কেউ কাছে আসেনি—দেখেছেন এ রকম কখনও।

মানে, অবশ্য তাকে—

মিছে কথা বলবেন না, আমি জানি আপনি দেখেননি, আমিও দেখিনি। চোখ থাকলেই দেখা যায় না, চোখের সামনে থাকলেও না।

পানউলীর কথা বলছেন তো?

ঠিক ধরেছেন। তা হলে শুধু আমার চোখে নয়, আপনার চোখেও সে কুচ্ছিৎ ছিল। বাই নারায়ণ, পৃথিবীতে কেউ ভাল চোখেও দেখত না মাগীকে।

মরিচা-ধরা একটা টিনের কৌটা খুলিয়া করালীচরণ একটি আধপোড়া বিড়ি বাহির করিলেন এবং সেটি মোমবাতির শিখায় ধরাইয়া লইয়া নীরবে টানিতে লাগিলেন। তাহার পর সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভালোই হল, চলে যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

ঠিক করিনি এখনও।

কবে যাবেন?

তাও ঠিক করিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

করালীচরণই পুনরায় কথা কহিলেন, আজ হঠাৎ এলেন যে, কোনো দরকার ছিল নিশ্চয়?

একটি কোষ্ঠী দেখাতে এনেছিলাম।

গণনা করা আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। ও-শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। 'জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ব্যর্থতা' নাম দিয়ে একখানা বই লিখছি, এই দেখুন।

একটা খাতা তুলিয়া দেখাইলেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই?

না।

করালীচরণের চক্ষুটা দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

আপনি দ্রাবিড় থেকে ফিরলেন কবে?

করালীচরণ গুম হইয়া রহিলেন।

হাত থেকে জন্মতারিখ বার করতে পারে, এ রকম জ্যোতিষী কলকাতায় বেশি নেই। আপনি যদি—

চুপ করুন।

অপ্রত্যাশিত ধমক খাইয়া ভন্টু থামিয়া গেল।

করালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, কোষ্ঠি-ফুষ্ঠি দেখে কচু হয়। ওসব ছিঁড়ে কুচিকুচি করে নর্দমায় ফেলে দিন গে যান। সব মিথ্যে, বাজে, রাবিশ—

করালীচরণ প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন। টেবিলের বইগুলি দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতে দিতে রুদ্ধ আক্রোশে তর্জন করিতে লাগিলেন, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যের স্তূপ সব, জঞ্জাল—

ভন্টু ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

কী করছেন আপনি, বক্সি মশাই?

বকবক করবেন না, বাড়ি যান।

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে?

একটি কথা শুধু জানতে চাই, যদি দয়া করে বলেন।

না, বলব না।

তাহার পর কী মনে করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কী বলুন?

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আপনার অবিশ্বাস হল কেন?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবার কেন আছে নাকি?

না, এতদিন যাতে আপনার অগাধ বিশ্বাস ছিল, যা আরও ভাল করে শেখবার জন্যে আপনি দ্রাবিড় গেলেন, আজ হঠাৎ—

কালীচরণ বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

করালীচরণের চোখ-মুখ এমন হইয়া উঠিল যে, ভণ্টু আর ঘরের ভিতর থাকা সমীচীন মনে করিল না, সভয়ে বাহির হইয়া গেল। করালীচরণ দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভণ্টু বাহিরে আসিয়া দেখিল, মোস্তাক একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে একটা কালো কুক্কুরীকে জোর করিয়া চাপিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছে, বাচ্চাগুলি মহানন্দে স্তন্যপান করিতেছে। ভণ্টু ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বাইকে চড়িয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। অপমানে তাহার কানের দুই পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। করালী যে তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা তাহার স্বপ্নাতীত ছিল।

কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া করালীচরণ দ্বারে কান লাগাইয়া রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাগ নয়, তাঁহার ভয় হইতেছিল। ভণ্টু হয়ত যাইবে না, এখনই হয়ত ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্যটি জোর করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইবে। কিছুতেই তিনি হয়ত বাধা দিতে পারিবেন না। দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠী হইতে নিজের জন্মতারিখ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসংশয়রূপে জানিয়াছেন যে, তাঁহার মা বেশ্যা ছিলেন। এই নিদারুণ কথা পৃথিবীতে আর কেহ জানিবে না। না, আর দেরি করা নয়, এখনই কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। এখনই হয়তো ভণ্টুবাবু একদল চেনা লোক লইয়া হাজির হইবে। ভণ্টুকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহার নাম মোটেই তিনি বিস্মৃত হন নাই, তাহারই আগমন-আশঙ্কায় অতি ভয়ে ভয়ে দিনপাত করিতেছিলেন। বাড়িটা বিক্রয় করিবার জন্যই কলিকাতায় আসা। নিদারুণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সে ব্যাপার তো আজ চুকিয়া গেল। আর দেরি করিয়া কী হইবে? করালীচরণ হাতের কাছে যাহা পাইলেন, একটা পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, মোস্তাকও চলিয়া গিয়াছে। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন।

এই ট্যাক্সি!

ছুটন্ত ট্যাক্সিটা থামিতেই করালীচরণ তাহাতে চড়িয়া বলিলেন, হাওড়া জলদি।

হাওড়ায় পৌঁছাইয়া দেখিলেন একখানা ট্রেন ছাড়িতেছে। বিনা টিকিটেই তাহাতে চড়িয়া বসিলেন।

চব্বিশ

দিন কয়েক পরে ভণ্টুর মনে পড়িয়া গেল, শঙ্করের বাবার উইলটা তো করালীচরণের কাছে আছে। শঙ্করকে খবর দিয়া উইলটা অবিলম্বে উদ্ধার করিয়া আনা প্রয়োজন। তাহার নিজের আর করালীচরণের বাসায় যাইতে সাহস হইতেছিল না, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। লোকটার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকটা বিদ্বান হইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অভদ্র। ভণ্টু এখন আর সে ভণ্টু নাই। আপিসে তাহার পদোন্নতি হইয়াছে, নিম্নতম কেরানি তাহাকে দুইবেলা ঝুঁকিয়া নমস্কার করে। যেখানে-সেখানে যখন-তখন আগেকার মত অদ্ভুত বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়া সে আর ভাঁড়ামি করে না। তাহার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হাজার হোক সে একটা ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু জুলফিদার-কন্যা ইন্দুমতীর স্বামী। করালীচরণের সেদিনকার অপমানটা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। উইলটা কিন্তু উদ্ধার করিতে হইবে যেমন

করিয়াই হোক। শঙ্করকে অন্তত খবরটা দেওয়া দরকার। ইন্দুর জন্য এক বাক্স ওভালটিন-বিস্কুটও কিনিয়া আনা দরকার। ভণ্টু বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শঙ্করের বাড়ির দরজায় নামিয়া ভণ্টু খানিকক্ষণ বাইকের ঘণ্টা বাজাইল। শুধু ভণ্টু নয়, অনেকেরই ধারণা বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া বাইকের ঘণ্টা বা মোটরের হর্ন বাজালেই বাড়ির ভিতর হইতে লোকজন ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে; ডাকিবার প্রয়োজন নাই। অনেকে বাহির হইয়া আসেও। শঙ্কর আসিল না কারণ শঙ্কর বাড়িতে ছিল না। ভণ্টুকে অবশেষে বাইকটি দেওয়ালে ঠেসাইয়া বারান্দার ওপর উঠিয়া কড়া নাড়িতে হইল। অমিয়া দ্বিতল হইতে জানালা ফাঁক করিয়া দেখিল এবং নিত্যানন্দকে মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভণ্টুবাবু এসেছেন।

নিত্যানন্দ কয়েকদিন হইতে শঙ্করের বাসায় আসিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর ছবির বাসা হইতে ফেরে নাই।

দাদা বাড়ি নেই। নিত্যানন্দই গলা বাড়াইয়া বলিল।

কোথা গেছে, কখন ফিরবে?

ঠিক জানি না। যদি কিছু বলবার থাকে বলে যান।

সে অপরকে বললে চলবে না, তাকেই বলতে হবে। আচ্ছা আমি পরে আসব।

ভণ্টু চলিয়া গেল।

নিত্যনন্দ অমিয়াকে বলিল, কী যে একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে দাদা সময় নষ্ট করছেন! ক্রমাগত লোক এসে ফিরে যাচ্ছে।

অমিয়া শুধু একটু হাসিল।

কিছু ভাল লাগছে না একটু চা কর দিকি বউদি।

করি।

•

ওভালটিন-বিস্কুট কিনিয়া ভণ্টুর মনে হইল, ঝামাপুকুরটা একবার ঘুরিয়া গেলে হয়। ভিতরে না ঢুকিলেই হইল, বাহির হইতে চাম্‌লদের হালচালটা দেখিয়া যাইতে ক্ষতি কী? করালীচরণের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া কিন্তু ভণ্টুকে বাইকে হইতে নামিতে হইল। বাড়িতে তালা বন্ধ, সম্মুখে 'টু লেট' ঝুলিতেছে। মোড়ের পানের দোকানটা খোলা আছে বটে, কিন্তু সেখানে পানউলী নাই— ছোকরা গোছের আর একজন বসিয়া পান বেচিতেছে। তাহারই নিকট ভণ্টু সংবাদ পাইল, দোকানটা পানউলীর নিজস্ব ছিল না। অপরের দোকানে সে চাকুরি করিত, কিছুদিন পূর্বে অসুখ হওয়াতে দোকানের মালিক তাহাকে ছাড়াইয়া দেয়। তখন পানউলী করালীচরণের বাসাতেই আশ্রয় লইয়াছিল। করালীচরণ যেদিন আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিনই তাহার মৃত্যু হয়। করালীচরণ প্রসঙ্গে ছোকরাটি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অমন লোক হয় না বাবু, বুঝলেন, কী ধুমধাম করে ছাদ্দটা করলে পানউলীর! লোকজন কাঙাল গরিব কত যে খাওয়ালে। পানউলী মরে যাওয়াতে হাউহাউ করে সে কি কান্না মশাই, যেন আপনার লোক মরেছে কেউ, নিজে কাঁধে করে নিয়ে গেল,— লোক ছিল বটে।

তাহার নিকটই ভণ্টু শুনিল করালীচরণ বাড়ি বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না।

পঁচিশ

ছবির শ্বাস উঠিয়াছে। পাশের ঘরে তাহার স্ত্রী কাদম্বিনীও অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছে। ছবির শিয়রে শঙ্কর জাগিয়া বসিয়া আছে, কাদম্বিনীর কাছে আছেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা হরিনাথবাবু।

ছেলেমেয়েদের অন্য একটি বাসায় সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ছবির শ্বশুর হরিনাথবাবু কলিকাতার বাহিরে থাকেন, ইহাদের অসুখের সংবাদ শুনিয়া সপরিবারে আসিয়া অন্য একটি বাসায় উঠিয়াছেন। ছবির ছেলেমেয়েরা সেই বাসায় গিয়াছে। হরিনাথবাবু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। আবক্ষ পাকা দাড়ি, কম কথা বলেন, উচিত কথা বলেন এবং যেটুকু বলেন বেশ গুছাইয়া বলেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস হয় না। হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, সুতরাং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে। শঙ্করের বার বার মনে হইতেছিল যে, বোধ হয় দারিদ্র্যের জন্য হরিনাথবাবু অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলেন— সে নিজে প্রয়োজন হইলে টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু স্বল্পভাষ এবং মুখভাবে একটা নিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কর জোর করিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। তাঁহার মতেই মত দিতে হইয়াছে। হরিনাথবাবুই ছবির আপন লোক, শঙ্কর ছবির কে? শঙ্কর এ কয়দিন বাড়ি যায় নাই, দিবারাত্র কেবল ছবিকে লইয়াই আছে। তাহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছে, এ বিপদে ছবিকে ফেলিয়া যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। ছবির যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, শঙ্করের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। তাহার শ্বশুর আসিয়াছে, এই অজুহাতে অজ্ঞান অবস্থায় এখন তাই তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। বিনা বেতনে এমন একজন সহৃদয় একনিষ্ঠ নার্স পাইয়া হরিনাথবাবুও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হরিনাথবাবুর সহিত ব্রাহ্ম নিলয়কুমারের ধর্মগত যোগাযোগ থাকাতে আপিসের ছুটিও সহজেই মিলিয়াছিল।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। মুমূর্ষু ছবির শিয়রে বসিয়া বসিয়া শঙ্কর ছবির কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, ছবির সহিত তাহার পরিচয় কতটুকু? তাহার পূর্বজীবনের কতটুকু সে জানে, উত্তর-জীবনের কতটুকু বা জানিবে? ছবির সাহিত্যপ্রীতি আছে, তাহারও আছে। পরিচয়ের সূত্র মাত্র এইটুকু। মনে পড়িল, ছবির সহিত তাহার দেখাও খুব যে ঘন ঘন হইত তাহা নহে, ক্বচিৎ কখনও হইত। মাঝে মাঝে আসিয়া টাকা ধার চাহিত, হয়তবা কখনও কোনোও দিন মদ খাইয়া ঈষৎ মত্ত অবস্থায় আসিত, শেলি কিট্‌স ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করিতে করিতে উত্তেজনার আবেগে টেবিল চেয়ার উল্টাইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিত, কখনও বা নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংসারের নিত্য-উদীয়মান অভাবের তালিকা দেখাইয়া পরামর্শ চাহিত এবং পর মুহূর্তেই আবার নিম্নকণ্ঠে জানাইত যে, রামবাগানে একটি মেয়ের গান শুনিয়া সে তাহার প্রেমে পড়িয়াছে— মাইরি বলছি, অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল গানের জন্যে। তাহার মনের শিল্পবোধ ছিল, সৌন্দর্যের প্রতি পিপাসা ছিল এবং সেইজন্যই বোধ হয় তাহাকে এত ভাল লাগিত। শুধু তাই কি? সুখদুঃখ-নিষ্পিষ্ট মানুষটাকেও কী কম ভাল লাগিত। ছবির অতীত জীবনের যে ঘটনাগুলির খবর শঙ্কর জানিত, ছায়াছবির মত সেগুলি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। খামখেয়ালী দুশ্চরিত্র মাতালটার এইবার শ্বাস উঠিয়াছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হইয়া যাইবে। লোকটা সাহিত্যিক ছিল। পরাধীন দেশের শৌখিন সাহিত্যিক। কবিতা আওড়াইত, মদ খাইত, প্রেমে পড়িত! আস্পর্ধা কম নয়।

সহসা শঙ্করের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এ কী অকালমৃত্যু। প্রতিভার এ কি শোচনীয় অপচয়! এই ছবি কী না হইতে পারিত!... শ্বাস উঠিয়াছে। কী কষ্ট, কী নিদারুণ কষ্ট। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সমস্ত পেশীগুলি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, চতুর্দিকে বাতাসের অভাব নাই, কিন্তু তাহার ব্যায়ত আনন, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, নীল ওষ্ঠাধর, ঘর্মাক্ত কলেবর, আর্ত ম্লানায়মান দৃষ্টি যেন সমস্বরে বলিতেছে— পাইলাম না, আকাশভরা এত বাতাস, আমি কিন্তু এতটুকু পাইলাম না।

কপাট ঠেলিয়া পাশের ঘর হইতে হরিনাথবাবু আসিলেন, আসিয়া সন্তর্পণে কপাটটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

কী রকম বুঝছেন?

যাহা বুঝিতেছিল, তাহা কি ব্যক্ত করা যায়? শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হরিনাথবাবু ক্ষণকাল ছবির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার হাতে পিতলের তৈয়ারী প্রকাণ্ড ভারী 'ওঁ'।

ওটা কী হবে?

ওটা ওর বুকের ওপর রেখে দেব। আমরা আর কী করতে পারি বলুন— সবই তাঁর ইচ্ছা।

একে বেচারার এই শ্বাসকষ্ট, তাহার উপর বুকে এই ভারি জিনিসটা চাপাইয়া দিতে হইবে! কিন্তু সে বাধা দিতে পারিল না বরং তাড়াতাড়ি বুকের চাদরটা সরাইয়া দিল। হরিনাথবাবু বুকের উপর পিতলনির্মিত 'ওঁ'টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন এবং বাহির হইতে সন্তর্পণে কপাটটি ভেজাইয়া দিলেন।

ছাব্বিশ

নিপু আসিয়াছিল। কয়েকদিন পূর্বে আসিয়া সে শঙ্করকে স্বরচিত একখানি উপন্যাস দিয়া গিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল। নিপুই বক্তা।

নিপু বলিতেছিল, আমি চাই না যে, তুমি আমার লেখাটার প্রশংসা কর। প্রশংসা পেতে ইচ্ছে করলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাই আমি পেতে পারতাম। গবু সেবার যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল, তখন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল লেখাটা, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে—

গবু কে?

গবুকে চেন না! ওরাই তো কামিং লাইট! 'মজদুর-দর্পণ' বলে একখানা কাগজও করেছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—রবিবাবু এর গোড়ার দিকটা শুনেছিলেন, ভালই বলেছিলেন শুনলাম। ইচ্ছে করলে তাঁর প্রশংসা পেতে পারতাম, কিন্তু ওসবে রুচি নেই আমার। তোমাকেও প্রশংসার জন্যে দিইনি, আমি এটা তোমাকে দিয়েছি নতুন যুগের নতুন সাহিত্যের নমুনা হিসেবে। আমি উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছি, নতুন যুগের নতুন সাহিত্যের রূপ কী— মানে নবতম রূপ কী— হয়ত হঠাৎ বেখাপ্পা বেসুরো মনে হবে তোমার— আমি জিনিসটা দেখাতে পেরেছি কি না, তাও জানি না। ভাল করে পড়ে তবে সমালোচনা কর। মাঝখানটায় একটু হয়ত জটিল বলে মনে হবে— মার্কসিজম সোজা জিনিস নয়। কত দূর পড়েছ?

সবটা পড়িনি এখনও।

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল।

না না, তাড়াতাড়ি পড়বার দরকার নেই, আমি এত তাড়াতাড়ি ছাপতামও না— বঙ্গদেশের সাহিত্য সমাজে স্থান পাওয়ার লোভ আমার মোটে নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে স্থান হয়ে গেল দেখছি। বিশ্বেশ্বরবাবুকে পড়তে দিয়েছিলাম, তাঁর প্রেস আছে একরকম জোর করেই ছাপিয়ে ফেললেন। ছাপার ভুলও বিস্তর থেকে গেছে— এ দেশের যেমন পাঠক-সমাজ, তেমনই ছাপাখানা—

ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তিক্ত হাসি হাসিতে হাসিতে নিপুর কথার বলার একটা বিশেষ ধরন

আছে। কথা শোনারও বৈশিষ্ট্য আছে তাহার। অপরে যখন কথা বলে, তখন সে মুখে একটা হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকে, বক্তার দিকে নয়। শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নিপুর চোখের দৃষ্টিতে খ্যাতিলোলুপতা এবং তাহা গোপন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস। গায়ে আধ-ময়লা টুইলের শার্ট, পায়ে বার্নিশহীন গ্রিসিয়ান স্লিপার, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখময় ব্রণ ও মুখভাবে বুভুক্ষার চিহ্ন। বেরসিক অশিক্ষিত জনতার প্রতি অসীম অবজ্ঞার ভান, অথচ বই ছাপাইয়া তাহাদেরই দ্বারস্থ হইবার আকুল আগ্রহ। দ্বারস্থ হইয়াও নিজের স্পর্ধিত গর্বটাকে আস্ফালন করিবার হাস্যকর আড়ম্বর। সবই মানাইয়া যাইত, যদি প্রতিভা থাকিত। কিন্তু হায় হায়, সেই বস্তুটিরই একান্ত অভাব। তাই কেবল নানা কৌশলে, নানা ছুতায়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বত্র হুল ফুটাইয়া, কালি ছিটাইয়া, সকলকে ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া পরোক্ষে-অপরোক্ষে নিজের নকল নূতনত্বের ঢাকটা পিটাইবার এই অদম্য অভিযান। কিন্তু ঢাকটাতেও ফাটা বীভৎস বিকট আওয়াজ বাহির হইতেছে। সুর যে জমিতেছে না তাহা ইহারা জানে, তাই ইহাদের বুলি— আমরা বেসুরের সাধক, আমরা বিদ্রোহী, আমরা উল্টা কথা বলি, আমাদের এই নতুন ঢঙের অভিনব মর্যাদা, পুরাতনপন্থী তোমরা বুঝিবে না। কিন্তু ইহা যে ইহাদের আসর-জমানো মৌখিক বুলিমাত্র, মনের কথা নয়, তাহার প্রমাণ ইহারা বই লিখিয়া সর্বাগ্রে সেটি পুরাতনপন্থীদেরই হাতে তুলিয়া দেয় এবং তাহাদের প্রশংসাবাক্য শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

এ শ্রেণীর অনেক লেখকের সংস্পর্শে শঙ্করকে আসিতে হইয়াছে, কিন্তু 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সমঝদার হিরণদার বন্ধু নিপুদাও যে এই দলের তাহা শঙ্কর জানিত না, কল্পনাও করে নাই। নিপুদার সাহিত্যিক বুদ্ধির প্রতি তাহার আস্থা ছিল। তাহার ধারণা ছিল, নিপুদা গোপনে গোপনে একটা বিরাট কিছুর সাধনা করিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার তপস্যা চলিতেছে। বাংলা ভাষার ইতিহাস অথবা অভিধান অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা সুসম্পন্ন করিয়া তিনি একদিন তাক লাগাইয়া দিবেন। নিপুদা যে শেষে এই কমিউনিস্টিক কসরত দেখাইবেন তাহা শঙ্কর প্রত্যাশা করে নাই। কমিউনিজম লইয়া প্রবন্ধ সহ্য হয়, কাল্পনিক কাব্যও হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের, বিশেষত বঙ্গদেশের বাস্তবজীবন মনে করিয়া উপন্যাস অসহ্য। যেন কতকগুলি বল্‌শেভিক মতবাদ মনুষ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে এবং অবশেষে মার্কস-লেনিনের জয়গান করিয়া ক্যাপিট্যালিজ্‌মকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নিপুদার উপন্যাসে মহারাজা মেথর সব সমান। মন্দির মসজিদ কিছু নাই, চর্তুদিকে কেবল জনগণ পরিচালিত অসংখ্য ফ্যাক্টরি। সিনেমা এবং লাউডস্পিকারে এন্তার শিক্ষা বিতরণ চলিতেছে। লাঙলের বদলে ট্রাক্টার, ধর্মের বদলে কর্ম, বিবাহের বদলে প্রেম এবং সন্তান। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিংশ শতাব্দীর রামহীন রামরাজত্ব শুরু হইয়া গিয়াছে। যে আদর্শ নিপুদা খাড়া করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় নয়, কারণ সে আদর্শ মার্কস-লেনিনের প্রতিভায় প্রদীপ্ত। নিপুদার তাহাতে কোনোও কৃতিত্ব নাই। নিপুদার যাহা নিজস্ব কৃতিত্ব— এই জগদ্দল উপন্যাসখানি— তাহা একেবারে রাবিশ। তাহার একটি চরিত্র জীবন্ত নয়, তাহাতে এতটুকু কবিত্ব নাই, জীবনদর্শন নাই, কল্পনার প্রসার নাই। আছে কেবল বল্‌শেভিজম।

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার, শঙ্করকে ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। যে 'ক্ষত্রিয়' কাগজের আদর্শ ছিল অ-সাহিত্যকে তাড়না করা, সেই 'ক্ষত্রিয়' কাগজেরই পৃষ্ঠায় ইহার প্রশংসা করিতে হইবে। উপায় নাই। হিরণদার বন্ধু নিপুদা। তাহার সম্বন্ধে সত্য কথা বলা চলিবে না। বলিলেও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে হইবে। তিক্ত সত্যটাকে প্রশংসার মিষ্ট প্রলেপে ঢাকিয়া দিতে হইবে।

সাতাশ

নীরা বসাক ও তাহার বান্ধবী কুন্তলা মুখোপাধ্যায় হাস্যপরিহাস সহকারে যে আলাপে ব্যাপৃত ছিল তাহাকে ঠিক সাহিত্যালাপ বলা যায় না, যদিও আলাপের মূল বিষয় একজন উদীয়মান সাহিত্যিক— শঙ্করসেবক রায়।

নীরার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত, কুন্তলা গম্ভীর।

সেদিন সামান্য একটু প্রশংসা করা মাত্র লোকটা এমন গদগদ হয়ে পড়ল যে, মনে হল, সার্টিফিকেট কেন, লোকটাকে দিয়ে ঘানি পর্যন্ত টানিয়ে নেওয়া যায়। তার ওই ট্র্যাশ বইখানার এমন বাগিয়ে প্রশংসা করেছিলাম আমি যে আমার নিজেরই তাক লেগে গিয়েছিল।

সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিস?

প্রথম দিনই কি সার্টিফিকেট চাওয়া যায়? জমিটা তৈরি করে রেখেছি, এইবার বীজ ছড়ালেই গাছ গজাবে।

নীরা বসাকের চোখ মুখ পুনরায় হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুন্তলা বলিল, আমার কিন্তু লোকটিকে অত বোকা বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এও আমার মনে হয় না যে, সত্যি সত্যি তুমি ওর লেখাকে ট্র্যাশ বলে মনে কর।

কী তোমার মনে হয় শুনি?

আমার মনে হয়, শঙ্করবাবুর লেখা সত্যি সত্যি তোমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু যেহেতু আমার ভাল লাগে না এবং যেহেতু কুমার পলাশকান্তি আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা প্রকাশ করছেন, সেই হেতু তুমি আমার মন রেখে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথাগুলো বলছ।

নীরা বসাকের সমস্ত মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলাইয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, আচ্ছা, কি তুই কুন্ত!

কুন্তলার গাম্ভীর্য এতটুকু বিচলিত হইল না। সে বাতায়ন-পথে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একফালি রোদ বাঁ গালে পড়িয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে— টানা টানা চোখ দুইটি যেন আবেশবিহ্বল হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্যের পানে চাহিয়া চাহিয়া নীরা বসাকের সমস্ত অন্তঃকরণ সহসা যেন বিষাইয়া উঠিল। এ মেয়েটার সহিত কিছুতেই পারা গেল না। স্কুলে কলেজে এতদিন একসঙ্গে কাটিল, কিছুতেই কোনোও বিষয়ে ইহাকে আঁটিয়া উঠা গেল না। কুন্তলা যদি অহঙ্কারী হইত, তাহা হইলে সেই ছুতায় ইহার সহিত মনোমালিন্য করা চলিত। কিন্তু সে মোটেই অহঙ্কারী নয়। রূপে, গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, বংশগরিমায়— সর্ববিষয়ে সে অনেক বড় অথচ তাহার নীচতা নাই, আত্মম্ভরিতা নাই, আস্ফালন নাই। আর নীরা বসাক? তাহার রূপ নাই, গুণ নাই। অর্থাভাবেই তাহার এম. এ. পড়াটা হইল না, অথচ কুন্তলা স্বচ্ছন্দে এম. এ পড়িতেছে। কুন্তলার প্রেমের জন্য কুমার পলাশকান্তির মত লোক উন্মুখ, আর সে অনিল সান্যালকেও ভুলাইতে পারিতেছে না। তাহার সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি চললাম। কুমার পলাশকান্তিকে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই।

আমি বলেছি। কিন্তু আমার বলায় তোমার অনিলবাবুর চাকরি হবে না।

এই কথা শুনিবামাত্র নীরা বসাকের মনের মেঘ কাটিয়া যেন আলো ঝলমল করিয়া উঠিল।

সে আবার বসিয়া পড়িল।

তুই বলেছিস? হবে না কী করে বুঝলি?

কুমার পলাশকান্তিকে আমি বিদেয় ক'রে দিয়েছি— ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'রিফিউজ' করেছি।

নীরা যেন নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কুমার পলাশকান্তিকে কুন্তলা প্রত্যাখান করিয়াছে, যে পলাশকান্তিকে গাঁথিবার জন্য শত শত সভা ছিপ সর্বদা সমুদ্যত, যাহার করুণাকণা লাভ করিবার জন্য, যাহার দামি মোটরে একবার চড়িবার জন্য অভিজাতবংশীয় যুবতী কন্যারা লালায়িত, তাহাকে কুন্তলা বিদায় করিয়া দিয়াছে!

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, কেন, কি হ'ল হঠাৎ?

হবে আবার কি! তুই কি আশা করেছিলি, আমি ওকে বিয়ে করব?

করেছিলুম বইকি।

করেছিলি? আমার সম্বন্ধে তোর ধারণা এত হীন, তা জানা ছিল না?

কেন, বিয়ে করতে আপত্তিটা কি?

আমি অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে, হস্টেলে থেকে না হয় এম. এ. পড়ছি, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছি, হেসে কথা কইছি— তা ব'লে যাকে তাকে বিয়ে করব।

কুমার পলাশকান্তি যে-সে লোক নয়।

ও তো একটা বেনে। ওর স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। টাকা ছাড়া আর কি আছে ওর? সে টাকাও আবার স্বোপার্জিত নয়।

তুই কাকে বিয়ে করবি তা হলে?

আমার বাবা মা পছন্দ করে যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করবেন, তাঁকে। তাঁরা অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণকেই পছন্দ করবেন আশা করি।

ও বাবা, এত লেখাপড়া শিখেও তোর এখন এত জাতবিচার আছে, তা তো জানতাম না!

জাত যখন আছে তখন তা মানতেই হয়। সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকলেও বাবলাগাছকে আমগাছের মর্যাদা দিতে পরি না।

সেকালে কুলীনরা একশো, দুশো বিয়ে করত শুনেছি, তোর বাবা যদি সে রকম কোনও এক কুলীনকে পছন্দ করেন, বিয়ে করবি তুই?

নীরার দৃষ্টি সকৌতুকে নাচিতে লাগিল।

কুন্তলা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল।

সে রকম কুলীন আজকাল দুষ্প্রাপ্য। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে, সে রকম কোনও কুলীনের হাতে বাবা আমাকে সম্প্রদান করবেন ঠিক করেছেন, তা হলেও আমি আপত্তি করব না। বিবাহ সামাজিক ধর্ম, ওতে নিজের মত চালাতে যাওয়া অন্যায়।

ওরকম স্বামীকে ভক্তি করতে পারবি?

ভক্তি করতে পারা না-পারা নিজেব ক্ষমতা-অক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। পাথরের নুড়ি, কদাকার বিগ্রহ— এসবকেও তো লোকে ভক্তি করতে পারছে।

নীরা বুঝিল, তর্ক করা বৃথা। কুন্তলাকে সে তর্কে হারাইতে পারিবে না। তাহাকে সে কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই আজও পারিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কুন্তলা বলিল, এক স্বামীর এক স্ত্রী হওয়া আজকালকার রেওয়াজ, কিন্তু আমার মনে হয় ওটা দারিদ্র্যের চিহ্ন। সত্যি সত্যি যদি কোনোও পুরুষ একাধিক

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ মনোরঞ্জন করতে পারে, তা হলে মানতেই হবে সে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষ-প্রবর। সে শ্রদ্ধেয়, হেয় নয়। একটিমাত্র স্ত্রী নিয়ে ন্যাতাজোবড়া হয়ে যারা প্রতিপদে হিমশিম খেতে খেতে নাকে কেঁদে মরে, তারা অসমর্থ কাপুষের দল, ওই একটিমাত্র স্ত্রীকেও তারা সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারে না— তারা কৃপার পাত্র।

আগেকার ওই কুলীনরা কী তা হলে—

আগেকার কুলীনেরা কি ছিলেন, তর্কের বিষয় তা নয়। যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, সে হেয়, না, শ্রদ্ধেয়— তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

মুসলমানদের হারেম তোর মতে তা হলে ভাল?

সভ্যসমাজে আজকাল যা হচ্ছে তার চেয়ে ঢের ভাল। আজকালকার সভ্যসমাজের মেয়েরা সেজে-গুজে রূপ-যৌবন দুলিয়ে হাটে-বাজারে সস্তা পণ্যসামগ্রীর মত নিজেদের যাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। কাক, কোকিল, ময়না, শালিক সবাই একবার করে ঠুকরে যাচ্ছে। বাদশার হারেমে, আর যাই থাক এ দুর্দশা নেই। সেখানে একশো থাক্‌, দুশো থাক্‌, প্রত্যেকেই বেগম, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, প্রত্যেকের কাছেই বাদশা আসেন— হয়ত বছরে একবার, কিন্তু সেই একেবারের মহিমাই এত যথেষ্ট যে তার স্বপ্নে বাকি বছরটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। একাধিক বারও তুমি বাদশাহকে আকর্ষণ করতে পার, যদি তোমার নিজের গুণ থাকে। সত্যিকার গুণের কদর হারেমে বাদশার কাছেই হয়। বাদশা বুভুক্ষু দরিদ্র নয় যে, যা পাবে, নির্বিচারে হ্যাংলার মত গিলে ফেলবে। বাদশা সমঝদার, সূক্ষ্ম রসের রসিক, তার কাছে ফাঁকি চলে না, মেকি চলে না—

বাবা বাবা। থাম্‌, এত বাজে বকতেও পারিস।

নীরা হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যি চললি নাকি?

হ্যাঁ।

অনিল সাণ্ডেলকে এত ভাল লেগেছে যে, বিয়ে না করলে আর চলছে না? ও যে তোর চেয়ে ছোট।

বিয়ে করব কে বললে। কুমার পলাশকান্তি যদি ওকে প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নেন, তা হলে—মানে, মিসেস স্যানিয়েল বড় কষ্টে পড়েছেন আজকাল— তা ছাড়াও—

বুঝেছি।

কুন্তলার গম্ভীর মুখে হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নীরা বসাক ছেলেমানুষের মত কিল তুলিয়া বলিল, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। তাহার পর কণ্ঠস্বরে যতটা আন্তরিকতা ফোটানো সম্ভব, তাহা ফুটাইয়া বলিল, পাগল নাকি, আমি বিয়ে করব এই অনিলটাকে, কি যে ভাবিস তোরা আমাকে!

কুন্তলা কিছু বলিল না, শুধু একটু হসিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায়?

হচ্ছে।

আমি যাই তা হলে। শঙ্করবাবুর কাছে যেতে হবে একবার।

সত্যই যেন কুন্তলার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে এমনই একটা মুখভাব করিয়া নীরা বাহির হইয়া গেল। সে নিজে জানে যে, অনিল সান্যালের একটা চাকরি যদি সত্যই জুটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করিবে। বেকার অবস্থায় মায়ের আদেশের বিরুদ্ধে যাইবার সাহস

তাহার নাই। নীরাকে সে ভালবাসিয়াছে, নীরাকে সে বিবাহ করিবে, কিন্তু তৎপূর্বে একটা চাকরি পাওয়া দরকার। আই এ ফেল অনিলের কিছুতেই চাকরি জুটিতেছে না। কুমার পলাশকান্তি মাসিক একশত টাকা বেতনে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখিবেন বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। নীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, এই চাকরিটা অনিলের যাতে হয়। শঙ্করের সার্টিফিকেট এবং কুন্তলার সুপারিশ কুমাব পলাশকান্তির নিকট মূল্যবান, তাই বেচারা এত ছুটাছুটি করিতেছে। সে নিজেও বেকার। ইচ্ছা করিলে একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি অবশ্য সে যোগাড় করিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাই তাহার হয় না। সে সংসারী হইতে চায়, নীড় বাঁধিতে চায়। চাকরি করিবার প্রবৃত্তিই তাহার নাই। ভগবান তাহার রূপ দেন নাই, যৌবনও বিগতপ্রায়। পাত্র খুঁজিয়া তাহার বিবাহ দিবে এমন কোনো অভিভাবকও তাহার নাই। তাহাকে নিজেই খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে অনেক খুঁজিয়াছে, অনেক ছলনা, অনেক অভিনয় করিয়াছে— কেহই তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই, এক এই ছাড়া। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা— চাকরি না জুটিলে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। নীরা, যেমন করিয়া হোক, তাহার চাকরি জুটাইয়া দিবে। অনিলকে সে কিছুতেই হাতছাড়া করিবে না। বিবাহ হইয়া গেলে লোকে যদি নিন্দা করে করুক, কুন্তলা যদি টিটকারি দেয় দিক, সে গ্রাহ্য করিবে না। এখন কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা করে, কুন্তলার কাছেও লজ্জা করে। আহা, অনিলের চাকরিটা যদি হইয়া যায়। নীরার সমস্ত দেহমন যে পিপাসায় হাহাকার করিতেছে, কুন্তলা তাহার কতটুকু বোঝে।

নীরা দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল।

আঠাশ

সকাল হইতে শুরু হইয়াছে। বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, আর কত বাকি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই। করিলেই লোকনাথ ঘোষালের আত্মসম্মান আহত হইবে। আহতপুচ্ছ গোক্ষুরকে বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু আহত-সম্মান লোকনাথকে সহ্য করা কঠিন। তাহা ছাড়া ভালও লাগিতেছে, তাই শঙ্কর নিবিষ্টচিত্তে সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি শ্রবণ করিতেছে। সুদীর্ঘ হইলেও প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। অমিয়ার কথা স্মরণ করিয়া এবং নিজের নানাবিধ কাজের কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও অবহিত মুগ্ধ চিত্তেই সে প্রবন্ধ শুনিতেছে এবং ভাবিতেছে, এই সুপণ্ডিত ও সুরসিক ব্যক্তিটিকে কেহ চিনিল না কেন? 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় শঙ্কর ইহার মূল্যবান প্রবন্ধ আজকাল বাহির করিতেছে, কিন্তু পাঠকসমাজে তেমন কোনো সাড়া পড়ে নাই তো। দুই-চারিজন বিদগ্ধ ব্যক্তি প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাই লোকনাথ ঘোষালের নাম দেখিলেই পাতা উল্টাইয়া যায়। অথচ .... দ্বার ঠেলিয়া একজন যুবক আসিয়া প্রবেশ করিল। যুবককে দেখিয়া শঙ্কর একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। লোকনাথবাবুর সম্মুখে ভদ্রলোক না আসিলেই যেন ভাল হইত। কিন্তু আর উপায় নেই। স্মিতমুখে আহ্বান করিতে হইল। যুবক প্রশ্ন করিল, আপনি যাচ্ছেন তো তা হলে?

আপনাদের সভা কবে?

আগামী মঙ্গলবার।

সেদিন আমার ছুটি নেই।

কবে যেতে পারবেন বলুন, সেই রকমই ব্যবস্থা করব আমরা।

রবিবারের আগে আমার অবসর নেই।

বেশ, তাই হবে। রবিবারেই একেবারে 'কার' নিয়ে আসব তা হলে। সভা পাঁচটায় হবে, বারোটা নাগাদ আসব, এতদূর যেতেও তো হবে।

বেশ, তাই আসবেন।

নমস্কারান্তে যুবক চলিয়া গেল।

লোকনাথবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিসের সভা?

কোন্নগরে একটা সাহিত্য সভা হবে, তাতেই আমাকে সভাপতি করতে চান ওঁরা।

ও।

লোকনাথ ঘোষালের মুখে কিসের যেন একটা ছায়া সহসা ঘনাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলিলেন না। তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, আজ উঠি। এটুকু আর একদিন হবে, বেলা অনেক হয়েছে আজ।

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পক্ষে আর বসিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে কী যেন একটা মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। জীবনে সাহিত্য ছাড়া তিনি আর কিছুই চাহেন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। ইহার জন্য সংসার, সমাজ, পাপ, পুণ্য, পরলোক, আত্মা,—এমনকি ভগবান পর্যন্ত তিনি তুচ্ছ করিয়াছেন, সাহিত্য ছাড়া আর কোনও কিছুতেই তাঁহার আস্থা নেই, আর কোনও বিষয়ে তিনি আনন্দ পান না। এই সাহিত্যের মধ্যেই তিনি জীবন রহস্যের যে লীলাময় দেবতাকে, রসমূর্ত যে সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন, আজীবন বাণীসাধনায় আত্মহারা হইয়া তাহারই মহিমা কীর্তন তিনি করিয়াছেন। কিন্তু কই, তাঁহার কথা তো কেউ শুনিল না। কোনো সাহিত্যসভা হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল না তো! নাবালক শঙ্করের কথা সকলে শুনিতে চায়, অথচ তাঁহাকে সকলে এড়াইয়া চলে-— অধিকাংশ লোক চেনেই না। এই ছোকরা তো তাঁহাকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করিল না! এই দেশে, এই সমাজে, আত্মীয়স্বজনপরিত্যক্ত হইয়া কাহার জন্য কিসের জন্য তিনি এই দুরূহ তপশ্চর্যা করিতেছেন? কেহই তো তাঁহার কথা শোনে না, জোর করিয়া শুনাইলেও শুনিতে চায় না। প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে শঙ্করের অস্বস্তি তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। শঙ্করও স্থিরভাবে তাঁহার লেখা শুনিতে অপারগ। তবে এসব কেন—কেন—কেন?

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়া লোকনাথ ঘোষাল কলিকাতার ফুটপাথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। হাতে বিরাট প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি—চোখে বিদ্যুৎদ্দীপ্তি।

লোকনাথবাবুর আকস্মিক অন্তর্ধানে শঙ্কর একটু হাসিল। লোকনাথবাবুর ব্যথা যে কোথায়, তাহা তাহার অবিদিত নাই; কিন্তু সে ব্যথা দূর করা তাহার সাধ্যাতীত। কিছুক্ষণ শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। আগে অনেকবার মনে হইয়াছে, আবার মনে হইল, যে নিষ্ঠা সহকারে সাহিত্যসেবা করা উচিত, সে নিষ্ঠা তাহার নাই—সে আদর্শভ্রষ্ট হইতেছে। মনে হইল, লোকনাথ ঘোষালই নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক— সে পল্লবগ্রাহী সুবিধাবাদী ব্যবসাদার। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়িল, অমিয়া তাহার অপেক্ষায় এখনও অভুক্ত বসিয়া আছে। উঠিতে যাইবে, এমন সময় আর এক বাধা— নীরা বসাক আসিয়া প্রবেশ করিল। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মাথার সামনের কেশবিরল অংশের অবিন্যস্ত চুলগুলা হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, আসতে পারি?

আসুন।

মুখমণ্ডলে শ্রদ্ধার আভাস বিচ্ছুরিত করিতে করিতে চেয়ার টানিয়া নীরা বসিল।

এ সময় হঠাৎ?

না এসে পারলাম না। এ মাসের 'সংস্কারে' 'অভ্যুদয়' কবিতাটির জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বসুন।

কী চমৎকারই লিখেছেন! সত্যি, আপনিই আধুনিক যুগের যুগপ্রবর্তক কবি।

নীরা বসাকের চোখের দৃষ্টিতে ভক্তি শ্রদ্ধা যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। শঙ্কর অমিয়ার কথা ভুলিয়া গেল। কণ্ঠস্বরে একটু আবদারের আমেজ মাখাইয়া নীরা আবার বলিল, কি করে আপনি এমন লেখেন বলুন না, অবাক লাগে, সত্যি!

শঙ্কর স্মিতমুখে বসিয়া রহিল— প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনটাই করা শোভন নয়।

নীরা 'অভ্যুদয়' কবিতার খানিকটা আবৃত্তি করিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিল, এসব কি করে লিখেছেন আপনি! এ যে আগুন!

ওই ধরনের আর একটা কবিতা লিখেছি কাল।

একটু শুনতে পাই না?— সাগ্রহ মিনতি-ভরা কণ্ঠে নীরা অনুরোধ জানাইল।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ড্রয়ার টানিয়া শঙ্কর কবিতাটি বাহির করিল এবং পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ কবিতা। শেষ হইয়া যাইবার পর নীরার মুখ দিয়া খানিকক্ষণ কোনোও বাক্যস্ফূর্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে মৃদুকণ্ঠে কেবল নিঃসৃত হইল— চমৎকার! খনিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আচ্ছা, এবার উঠি তা হলে নমস্কার।

নমস্কার।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনেছি, কুমার পলাশকান্তির সঙ্গে আলাপ আছে আপনার।

আছে।

যদি দয়া করে তা হলে একটা কাজ করেন, একটি দরিদ্র পরিবারে বড় উপকার হয়।

কী, বলুন?

আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া শঙ্কর বলিল, আমিও ওদের ভাল করে চিনি। অনিল অখিলকে পড়াবার জন্যে মিসেস স্যানিয়েলের বাড়িতে আমি ছিলাম যে কিছুদিন।

নীরা সব জানিত, তবু বিস্ময়ের ভান করিল।

ওমা, তাই নাকি! তা হলে দিন একটা চিঠি।

আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু কুমার পলাশকান্তিব একটি অনুরোধ আমি রাখিনি, তিনি যদি আমারটা না রাখেন?

ঠিক দুই দিন পূর্বে কুমার পলাশকান্তির তাগাদায় অস্থির হইয়া শঙ্কর অবশেষে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে, সে গল্প লিখিয়া দিতে পারিবে না, কুমার তাহাকে যেন ক্ষমা করেন, তাহার মোটেই সময় নাই। সে ব্যস্ততার দোহাই দিয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে গল্প লিখিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না, বিবেকে বাধিতেছিল. সঙ্গে সঙ্গে আংটিটাও ফেরত দেওযাতে প্রত্যাখ্যানটা একটু রূঢ়ই হইয়াছে। এত কথা সে অবশ্য নীরাকে বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দিতে পারবেন না তা হলে?

সম্ভব হলে দিতাম।

নীরা বসাকের সমস্ত সপ্রতিভতা যেন দপ করিয়া নিবিয়া গেল।

সে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঊনত্রিশ

পরদিন একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি লইয়া শঙ্কর কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিতেছিল তাহার কেবলই ভয় হইতেছিল, তিনি যদি বাড়িতে না থাকেন— সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় প্রায়ই তিনি বাহির হইয়া যান। নীরা বসাকের বিবর্ণ ম্লান মুখচ্ছবি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত কাহিনী সে শুনিয়াছিল। কুন্তলার কাছে গোপন করিলেও শঙ্করের কাছে নীরা কিছুই গোপন করে নাই। কুন্তলা ঠিকই ধরিয়াছিল, নীরা সত্যই শঙ্করের ভক্ত। লেখা পড়িয়াই সে শঙ্করকে এত ভক্তি করিত যে, তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার রচনার ভিতর দিয়া সে যে সহৃদয় ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার নিকট অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে নাই।

শঙ্কর দ্রুতপদে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একটা কাপড়ের দোকানে চোখ পড়িতে সে একটু বিস্মিত হইয়া গেল। প্রফেসর গুপ্ত ও সুলেখা কাপড় কিনিতেছেন— একটি চমৎকার শাড়ির পাট খুলিয়া উভয়ে সেটি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সুলেখার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছে না যে, স্বামীর সহিত তাঁহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব আছে। অত অপমানের পরও সুলেখা ঠিক আগেকার মতই স্বামীর ঘর করিতেছেন, বিদ্রোহ করিয়া গৃহত্যাগ করেন নাই। হয়ত তাঁহারই আদরে আবদারে বিগলিত হইয়া প্রফেসর গুপ্ত তাঁহারই জন্য শাড়ি কিনিতে আসিয়াছেন। প্রফেসর গুপ্তের চরিত্র যে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার নিজেরই একটি ছাত্রীর সহিত তাঁহার নাম জড়াইয়া প্রফেসর-মহলে যে কানাঘুষা চলিতেছে, তাহা শঙ্কর শুনিয়াছে। সুলেখাও হয়তো শুনিয়াছেন। সুলেখার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে আর একবার চাহিয়া শঙ্কর আগাইয়া গেল। একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল, ইহাই জীবন।

অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া শঙ্কর জীবনের আর একটি ছবি দেখিতে পাইল না। আস্‌মি-দার্জির পিতা নিবারণবাবু শঙ্করকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাশের গলিতে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিলেন। তিনি বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলেন। কাঁকড়া, ভেটকিমাছ, মাটন প্রভৃতি নানারূপ সুখাদ্য তিনি কিনিয়াছেন। আস্‌মি-সহ পলাতক মাস্টার ফিরিয়াছেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নয়, নিবারণবাবুর আহ্বানে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া শুধু চিঠি নয়, তিনি টেলিগ্রাম পর্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের কাছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহাকে অন্ধকার গলিটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে হইল।

অনিলের চাকরি জুটাইয়া দিবার জন্য শঙ্কর উর্ধ্বশ্বাসে কুমার পলাশকান্তির বাড়ির উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল।

ত্রিশ

আস্‌মিকে লইয়া তবলাবাদক মাস্টার কপিলবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিবারণবাবুর অন্তরের কথা নিবারণবাবুই সম্যক্‌রূপে জানেন, বাহিরে তাহার যতটুকু প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহা পরিচিতমহলে কিঞ্চিৎ বিস্ময়েরই উদ্রেক করিয়াছে। আস্‌মি ও মাস্টারকে ঘিরিয়া নিবারণ-গৃহে প্রতিদিন একটা না একটা ছোট বড় উৎসব লাগিয়াই আছে। নিবারণ যে ইহাদের বিরুদ্ধে পুলিসে নালিশ করিয়াছিলেন, অথবা কখনও ইহাদের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া

উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বর্তমান আচরণ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। দার্জির আচরণ ঠিক পূর্ববৎ আছে। দার্জি সর্বদা স্বল্পভাষিণী, সর্বদা কর্তব্যপরায়ণা। সে সহসা মিষ্ট কথায় গলিয়াও পড়ে না, রুষ্ট কথায় ফোঁস করিয়াও উঠে না। যাহা তাহার ভাগ্যে জোটে, তাহাই সে মানিয়া লয়। অদৃষ্টকে শান্ত মুখে মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অনাড়ম্বর জীবনযাপন-কৌশল সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। মনে হয়, তাহার যেন কোনো অভাব-বোধই নাই। থাকিবে কী করিয়া? যে আনন্দের অভাব জীবনকে শুষ্ক করিয়া দেয়, সে আনন্দ তাহার প্রচুর পরিমাণে আছে। সে শিল্পী। সূচিশিল্পে সে তন্ময় হইয়া থাকে, বাবাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। আর কী চাই? তাহার বিশ্বাস, সে ছাড়া তাহার বাবাকে আর কেহ চেনে না, বোঝে না, আস্‌মি আসার পর হইতে সে সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছে— কখন শঙ্করবাবু হঠাৎ আসিয়া পড়েন। শঙ্করবাবুর নিকট নিবারণবাবু আস্‌মি ও কপিলবাবুর সম্বন্ধে যেমন গর্জন করিয়াছিলেন, তাহা দার্জির অবিদিত। তাই তাহার সর্বদা ভয় হয়, শঙ্করবাবু এখন যদি আসিয়া পড়েন, কী ভাবিবেন। বাহিরের কোনোও লোকের নিকট তাহার বাবা অপমানিত বা অপ্রস্তুত হইলে তাহার বড় কষ্ট হয়। এই একটি জিনিসই তাহার পক্ষে সত্য সত্যই কষ্টদায়ক। অথচ বাবা এমন সব কাণ্ড করিয়া বসেন। সেদিনও একটি লোককে তিনি তাহার বিবাহের জন্য কী খোশামোদই না করিতেছিলেন— সে পাশের ঘর হইতে স্বকর্ণে শুনিয়াছে। কী দরকার তাহার বিবাহ করিবার? সে বাবাকে বলিয়া দিয়াছে যে, তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতে হইবে না। সে বিবাহ করিবে না। আস্‌মি বিবাহ করিয়াছে, সেও যদি বিবাহ করে, তাহার অসহায় বাবাকে দেখিবে কে? না, সে বিবাহ করিবে না।

সেলাইয়ের ফোঁড় তুলিতে তুলিতে সে ভাবিতেছিল, শঙ্করবাবুর নিকট কী করিয়া বাবার মান বাঁচানো যায়। সহসা তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিয়া ফেলিল, শঙ্করবাবু যদি আসেনই, তাঁহাকে আগেই আড়ালে ডাকিয়া সে বলিয়া দিবে যে, বাবার নয়, তাহারই আগ্রহাতিশয্যে আস্‌মিরা আসিয়াছে। তাহারই অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাবা তাহাদের আসিতে লিখিয়াছিলেন এবং তাহারই মুখ চাহিয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ব্যাপারটার সমাধান করিয়া তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, হেঁট হইয়া সেলাইয়ের বাক্সের ভিতর উড্ডীয়মান শুকপক্ষীর পালকের উপযোগী সবুজ রঙের সূতা অন্বেষণে সে ব্যাপৃত হইল।

আস্‌মি, মাস্টার ও নিবারণবাবু আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়াছেন। দার্জি যায় নাই। সে কোথাও যায় না। নিস্তব্ধ দুপুরে একা বসিয়া সেলাই করিতেই তাহার ভাল লাগে।

করালীচরণের আকস্মিক অভ্যাগম ও অন্তর্ধানে ভন্টু শঙ্করের বাবার উইল সম্বন্ধে প্রথমে হঠাৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পরে ততটা উদ্বিগ্ন সে আর রহিল না। প্রথম কারণ— শঙ্করের নাগাল সে পাইল না, শঙ্কর বাড়িতেই থাকিত না, মুমূর্ষু ছবিকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত। দ্বিতীয় কারণ, ইন্দুমতী, ইন্দুমতীর বাবা, বাবাজি ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী এবং আপিসের কাজকর্ম তাহাকে এমন ব্যাপৃত করিয়া রাখিল যে, শঙ্করের কথা তাহার আর মনেই রহিল না। অন্তর এবং বহির্লোকের নানা ঘটনাপরম্পরা এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহাকে উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হয়—ঘূর্ণাবর্ত।

ইন্দুমতী বড়লোকের মেয়ে, চিরকাল সুখে মানুষ হইয়াছে, বাপের বাড়িতে সর্বদা তাহার সহিত ঝি চাকর ঘুরিত। সম্প্রতি সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে, ঝি-চাকরের সংখ্যা দ্বিগুণিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভন্টু একটি চাকর ছাড়াইয়া দিয়াছে অর্থাৎ দিতে বাধ্য হইয়াছে। অসুস্থ বেতনহীন দাদার চেঞ্জের খরচ, শন্টু-নন্টুর পড়ার খরচ, বিশাল বাড়িভাড়া,

এতগুলি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন, ঔষধপত্র, লোক-লৌকিকতা— এসব তো আছেই, তাহার ওপর চাপিয়াছে বাবাজির গব্যঘৃত আলোচাল এবং বাকুর দুধ ও ঔষধ। বাকু অসুস্থ, তাঁহার শোথ হইয়াছে, কবিরাজি চিকিৎসা চলিতেছে। কবিরাজ মহাশয় অন্য পথ্য নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ভণ্টুকে চাকর ছাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। ইন্দুমতীকেই সদ্যপ্রসূত শিশুর কাঁথা কাপড় স্বহস্তে কাচিতে হইতেছে। ইন্দুমতী অবশ্য কাচিতে আপত্তি করে নাই, হাসিমুখেই সে সব করিতেছে; কিন্তু ওই হাসির অন্তরালেই কী যেন একটা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইতেছে, যাহাতে বাবাজি ক্রুদ্ধ, বউদিদি ভীত এবং ভণ্টু উতলা হইয়া পড়িয়াছে। বউদিদির অসংখ্য কাজ। তিনি উঠেন ভোর পাঁচটায়, শুইতে যান রাত্রি এগারোটায় কিংবা তাহারও পরে— ইহার মধ্যেও সময় করিয়া ইন্দুমতীর কাঁথা কাপড় কাচিয়া দিতে তিনি রাজি আছেন; কিন্তু ইন্দু কিছুতেই তাহা করিতে দিবে না, নিজেই কাচিবে। তাহার গোঁ দেখিয়া বউদিদি হাসেন, একটু ভয়ও পান— বড়লোকের মেয়ে মনে মনে না জানি কী ভাবিতেছে!

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাবাজি একদিন আপিস-গমনোন্মুখ ভণ্টুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন তোর কী চোখ নেই? দেখতে পাস না? মেয়েটা খেটে খেটে ম'ল যে!

ভণ্টু একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, কী আর এমন খাটছে ও! বউদি ওর চেয়ে ঢের বেশি খাটেন।

একটা মহিষের পক্ষে যা সহজ, বুলবুলির পক্ষে তা সহজ নয়! তুমি বিবাহ করেছ একটি বুলবুলিকে, তাকে দিয়ে ঘানি টানালে চলবে কেন বাপু?

ভণ্টু চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটিল।

বাবাজি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তবু খুব করছে। খুব—

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, একটি কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার— জীবাত্মাকে কষ্ট দিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হতে হয়। ও না হয় গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগে কর্মফলবশত তোমার স্ত্রী হয়েছে, তাই ব'লেই যে তাকে নির্যাতন করতে হবে, এ একটা কোনো যুক্তি নয়।

গত কয়েক দিন হইতে ভণ্টুর মনেও ঠিক এই কথাগুলি জাগিতেছিল, হঠাৎ বাবাজির মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া বাবাজির প্রতি সহসা তাহার যেন একটু শ্রদ্ধাই হইল।

বলিল, কি করব, আপনিই বলে দিন।

আমি কি বলব বল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার কাছে তুমিও যা, তোমার দাদা বিষ্ণুও তাই। উভয়েরই মঙ্গল আমি কামনা করি, কিন্তু তাই বলে যা ন্যায্য বলে বুঝেছি, মনে-প্রাণে যেটা সত্য বলে অনুভব করছি, তা যদি না বলি, তা হলে বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হবে আমাকে। তাই বলছি, বউমাকে কষ্ট দিও না।

আমি কি ইচ্ছে ক'রে কষ্ট দিচ্ছি?

তোমার দাদাকে চিঠি লেখ, কাজে এসে জয়েন করুক। সে সমুদ্রের ধারে বসে বসে সিনারি দেখবে আর তুমি তার সংসার ঘাড়ে নিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অবিচার করবে, এটা তো ন্যায্য কথা নয়।

ভণ্টু চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজি তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, পাঁকে যে পড়বে, তা আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার। আমি কতকাল ধরে আশা করেছিলাম যে, তোমাকে সঙ্গী করে নিয়ে কোনোও তীর্থস্থানে বাকি জীবনটা নাম-জপ করে কাটিয়ে দেব। ও ছাড়া আর কি করবার আছে.

বল? সংসারে এসে তাঁর মহিমাই যদি না কীর্তন করতে পারলাম, শূয়োরের মত পাঁকে নাক থুবড়েই যদি মানব-জীবনটা কাটিয়ে দিতে হল, তা হলে আর হল কি? কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই, তুমি ফট ক'রে বিয়ে করে বসলে, এইবার মজাটা বোঝ।

ভণ্টু সহসা সচেতন হইল— বাবাজি যে পথে এইবার তাঁহার চিন্তাধারাকে চালিত করিয়াছেন সে পথ অন্তহীন। তাহার আপিসের বেলা হইয়া যাইতেছে। সে বাইকে সওয়ার হইয়া পড়িল। তাহার আজ অনেক কাজ। আপিসের অনেকগুলি ফাইল ক্লিয়ার করিতে হইবে, খোকার জন্য সোয়েটার কিনতে হইবে, বাকুর জন্য কবিরাজের বাড়ি যাইতে হইবে, একজন স্বর্ণকারের নিকট ইন্দুর জন্য একটি হালফ্যাশানের হার গড়াইতে দিয়াছে, তাহাকে একবার গিয়া চুমরাইতে হইবে, কারণ তাহাকে এখন নগদ টাকা সে দিতে পারিবে না। হার হইলে আবার এক ফ্যাসাদ আছে, বউদিদি ও বাকুর নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইবে যে, হারটা তাহার শ্বশুর দিয়াছেন। হঠাৎ ভণ্টুর মনে হইল, এত সব চাতুরির, কী প্রয়োজন, সে তো কোনো অন্যায় কার্য করিতেছে না! বাবাজির কথাগুলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

বত্রিশ

হাসি অপেক্ষা করিতেছে।

পড়াশোনায় সে ক্লাসের মেয়েদের ও শিক্ষয়িত্রীদের তাক লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ধারণাই ছিল না যে, একজন গৃহস্থ-ঘরের বউ হঠাৎ স্কুলে ভর্তি হইয়া অতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে। গৃহস্থালির নানা কাজকর্মের অবসরে নিশ্চয়ই সে পড়াশোনার চর্চা রাখিয়াছিল, তাহা না হইলে হঠাৎ এতটা উৎকর্ষ লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহার যে হাতের লেখা একদিন প্রবাসী মৃন্ময়কে চিঠি লিখিবার জন্য চিন্ময়ের সহায়তায় শুরু করিয়াছিল, যে হাতের লেখার জন্য মৃন্ময়ের চাকরি গিয়াছিল, যে হাতের লেখায় সে আজও মৃন্ময়কে প্রত্যহ পত্র লেখে, সর্বাপেক্ষা সেই হাতের লেখাই সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। সত্যই মুক্তার মত লেখা। পড়াশোনায় কোনোও বিষয়ে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। অথচ ব্যবহারে সে অতিশয় অনাড়ম্বর ও সপ্রতিভ। অহঙ্কারী নয়, গম্ভীর ন: স্বামী চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে বলিয়া বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ সর্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। অতিশয় সহজভাবে সে সকলের সঙ্গে মেশে, হা:সে, কথা কয়। কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা নাই, সকলেই তাহাকে ভালবাসে। অনেকেই বিস্মিত হয়। যাহার স্বামী জেলে, সে কি করিয়া এমন সহজভাবে থাকে, যেন কিছুই হয় নাই। হাসি নিজেই মাঝে মাঝে নিজেকে চিনিতে পারে না, নিজের এই বিবর্তন দেখিয়া নিজেই সে বিস্মিত হইয়া যায়। বাল্যকালে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া যখন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ হইতেছিল তখন সে সঙ্কোচে মরিয়া থাকিত, কুঞ্জেমশাইয়ের চেষ্টায় যখন মৃন্ময়ের সহিত তাহা: বিবাহ হইল সে যেন বাঁচিয়া উঠিল— রাজপুত্রের স্পর্শে যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল— ভীরু নয়ন তুলিয়া সে দেখিল, দেবতা দাঁড়াইয়া আছে, যে দেবতা তাহারই আর কাহারও নয়। তারপর দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে আপন মহিমায় বিকশিত হইয়া আপন অধিকারে প্রমত্ত হইয়া ভীরু রাজকন্যা রাজেন্দ্রাণী হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সহসা আবির্ভূত নেপথ্যবাসিনী মৃত স্বর্ণলতার প্রেতাত্মা ও তাহার বিস্ময়কর ইতিহাস— আকস্মিক নিদারুণ প্রহারে তাহার সুখ-প্রসাদ নিমেষে যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে অবলুণ্ঠিত হইল, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। যাহাকে ঘিরিয়া তাহার হৃদয়ের শতদল বিকশিত

হইয়াছিল, তাহাকেই ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত করিল, ক্রোধে ঈর্ষায় সমস্ত অন্তর পুড়িয়া গেল, মনে হইল, এই বুঝি শেষ, সমস্ত মহিমার উপর অন্ধকারের যবনিকা নামিল। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার নূতন জ্যোতি দেখা দিয়াছে। সহসা সে মৃন্ময়কে—চিন্ময়ের অগ্রজ মৃন্ময়কে, নূতন রূপে নূতন মহিমায় আবিষ্কার করিয়াছে।

সমস্ত অন্তর দিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। অপেক্ষা করিতেছিল, কবে তাহার পরম গৌরব ও চরম সর্বনাশের সংবাদ বহন করিয়া তাহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিবসটি আসিবে, যেদিন সে বুঝিতে পারিবে যে জীবনের প্রদীপটি জ্বলিল কি না।

দ্বারপথে শব্দ হইল।

হাসি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলে, সুচারু প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে একখানা কাগজ।

কী সুচারু?

সুচারু কোনোও কথা বলিতে পারিল না। অথচ সে খবরটা দিতেই আসিয়াছিল, কিন্তু হাসিকে দেখিয়া তার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ওটা কি আজকের কাগজ?

হ্যাঁ।

দেখি।

কাগজ দেখিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরার রক্তধারা যেন হিমানী-স্রোতে রূপান্তরিত হইল। প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। মৃন্ময়ের তপস্যা সফল হইয়াছে, এতদিনে ধর্ষিতা স্বর্ণলতার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিল, মৃন্ময় জেলে নৃশংসভাবে অচিনবাবুকে হত্যা করিয়াছে। হাসির মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ জ্বলিল।

তেত্রিশ

সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর বিহ্বল হইয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মধ্যে যে এ সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা কে জানিত। আমরা মানুষকে কতটুকু চিনি।

পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মৃন্ময়ের মুখখানাই বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। গত কয়েক দিন নীরা বসাক ও অনিল তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। অনিল সান্যালের উপর সে প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু নীরার সংস্পর্শে আসিয়া সে অপ্রসন্নতা কাটিয়া গিয়াছিল। To know all is to forgive all. সমস্ত শুনিবার পর আর রাগ করিয়া থাকা চলে না। কী করিলে ইহারা সুখী হইবে, এই চিন্তায় তাহার মনকে অধিকার করিয়া তাহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল। সহসা ইহাদের অবলুপ্ত করিয়া মৃন্ময় ও হাসি আসিয়া দাঁড়াইল। নীরা বসাক ও অনিলের সহিত তাহার যে সম্পর্ক, মৃন্ময় ও হাসির সহিতও তাহাই। এখন কিন্তু মনে হইতে লাগিল, উহারা তাহার বেশি আপনার। উহাদের সহিত বেশি আত্মীয়তা অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত অজ্ঞাতসারে গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

... হঠাৎ, এক কোণে একগাদা পুরাতন মাসিকপত্র নজরে পড়িল—নাম 'বান্ধব'। কৌতূহল হইল। উবু হইয়া বসিয়া সে উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইল, একটি প্রবন্ধের নাম 'প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা'—সহসা কে যেন তাহাকে চাবুক মারিল।

চণ্ডীচরণ দস্তিদার চোর। ইহারই ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতা লইয়া সে সভায় সভায় গর্ব করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সমস্ত উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন শিথিল শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিয়া অমিয়ার নিকট শুনিল, তাহার মামাতো ভাই নিত্যানন্দ টাকা লইয়া বাজার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল, মদ খাইয়া ফিরিয়াছে, পাশের ঘরে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর এমন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল যে, চুপ করিয়া চাহিয়াই রহিল। তাহার পর হঠাৎ যেন তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। সক্রোধে পাশের ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। উলঙ্গ নিত্যানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। শঙ্করের মনে পড়িল, সেও তো কিছুদিন আগে মদ খাইত। কিছু বলিল না, সন্তর্পণে ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গভীর রাত্রি।

শঙ্কর লেখনী-হস্তে একা জাগিয়া আছে, পাশের ঘরে অমিয়া ঘুমাইতেছে। চতুর্দিকে নিবিড় নীরবতা তাহাকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, সে একটি কথাও লিখিতে পারিতেছে না, লেখনী-হস্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে হইতেছে, গভীর রাত্রির নিবিড় নীরবতার মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যাহা নীরব বলিয়াই উপেক্ষণীয় নহে; মনে হইতেছে, অদৃশ্য অসংখ্য চক্ষু যেন নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, নামহীন নির্দেশহীন অগণ্য অনুভূতিপুঞ্জ আশে পাশে ঊর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে যেন স্পন্দিত হইঁতেছে, ধরণীর ধূলিকণা ও মহাকাশের নীহারিকাপুঞ্জ শ্রুতি-অগম্য যে বিরাট ছন্দে ছন্দিত, অন্ধকারে তাহার কিছু আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে, অন্ধকার অবলুপ্ত সৃষ্টি অদৃশ্য অন্তরলোকে নব রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে, নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর আত্মা স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া জ্যোতির্ময় আকাশলোকে যাত্রা করিয়াছে, অস্ফুট হাসি-কান্নার অসংখ্য অমূর্ত তরঙ্গ নিঃশব্দে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—নির্বাক শঙ্কর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে।

পাশের ঘরে চুড়ির শব্দ হইল। সহসা সমস্ত মায়ালোক যেন মিলাইয়া গেল। সে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিল। মনে হইল অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল; তাহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস-পতনের শব্দও যেন শোনা গেল। খোলা জানালা দিয়া একটা দমকা বাতাস ঢুকিল, টেবিল হইতে একটা কাগজ উড়িয়া গেল। শঙ্কর তুলিয়া দেখিল, বাড়িভাড়ার বিল। দুই মাসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছে।

শঙ্কর লেখনী লইয়া আবার লিখিবার উদ্যোগ করিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, কি লেখা যায়? অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল— কিছুই লেখা গেল না। কি লিখিবে? গতানুগতিক নিয়ম বজায় রাখিয়া কতকগুলা চটুল কথার জাল বুনিয়া যাইবে? এতদিন তো ইহাই করিয়াছে, সাহিত্য-সেবার ছুতায় মনিহারি দোকান সাজাইয়া লোক ভুলাইয়াছে। জীবনের কোন্ নিগূঢ় রহস্য তাহার কবিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে? সাহিত্যের ভিতর দিয়া জীবনের কি আদর্শ সে দেশের লোকের সম্মুখে ধরিতে চায়? সে আদর্শের পথে সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? সে আদর্শের জন্য সে কতটা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে? সে তো এতকাল কেবল লোকের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্যের নামে অনুষ্ঠিত যত সব বাজে সভার সভাপতিত্ব করিয়া হাততালি মালা এবং প্রশংসা কুড়াইয়া অতি সস্তা মেকি জিনিসের বেসাতি করিয়াছে মাত্র।

মৃন্ময়ের কথা মনে পড়িল। আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া সে অবলীলাক্রমে ফাঁসিকাঠে উঠিয়াছে। তাহার টাকা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল জেলে গিয়া অচিনবাবুর নাগাল পাওয়া। আদর্শের জন্য মৃন্ময় স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিল। সে পারিবে কি?

চৌত্রিশ

অনিল ও নীরা বসাক, মৃন্ময় ও হাসিকে লইয়া শঙ্করের কয়েক দিন বেশ কাটিয়া গেল, অর্থাৎ এ কয়দিন উহাদের লইয়া শঙ্কর নিজেকে বেশ ভুলিয়া রহিল। ইহার পূর্বে ভুলিয়াছিল ছবিকে লইয়া। সহসা সে আবিষ্কার করিল, কোনো কিছু লইয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকিবার উপলক্ষ পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়, তা সে উপলক্ষ যতই না কেন তুচ্ছ হউক। বস্তুত, কিছুদিন হইতে এই উপলক্ষই সে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে লোকনাথবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণ করে, নিপুদার সহিত সোৎসাহে কমিউনিজম-বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেয়, যেখানে সেখানে সভাপতিত্ব করিতে ছুটিয়া যায় কেবল অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার জন্য। যে প্রশ্নটা কিছুদিন হইতে বারংবার তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, যে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় তাহার সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, যে প্রশ্নের সদুত্তর সে কিছুতেই নিজেকে দিতে পারিতেছে না—সেই দুরূহ প্রশ্নটাকে এড়াইবার জন্যই সে বাহিরের একটা-কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিতে চায়। লোকনাথবাবুর প্রবন্ধ মনোহারী, নিপুদার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিয়া আনন্দ আছে, নীরা বসাকের প্রশংসা মাদকতাময়, সাহিত্য সভার হাততালি শিরা-উপশিরায় উন্মাদনা সঞ্চার করে—সবই ঠিক; কিন্তু কেবল ওই সব কারণেই সে যে উহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহা ঠিক নয়। সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া বাহিরের ভিড়ে আত্মগোপন করিতে চায়, নিজের মনের অনিবার্য প্রশ্নটাকে বাহিরের কোলাহলে নীরব করিয়া দিতে চায়। তাহার একা থাকিতে ভয় করে।

অনিলের চাকরি হইয়া গিয়াছে। তিন আইন অনুসারে নীরা বসাকের সহিত তাহার বিবাহও হইয়া গেল। উপস্থিত হাতে উত্তেজক কোনো কাজ নাই। এ মাসে 'সংস্কারক' পত্রিকার কাজও যাহা ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে, আপিস হইতে শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নটি সহসা শতমূর্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার নাম কি সাহিত্য সাধনা? আর যদি সত্যই সে সাধনা করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেই বা কাহার কতটুকু উপকার করিতে পারে? বড় জোর তাহা কতকগুলি প্রকৃষ্টমনা ব্যক্তির মানসিক বিলাসের উপকরণ যোগাইবে। কিন্তু তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা করা। দেশের উন্নতিকল্পেই একদা তুমি চরকা ঘাড়ে করিয়াছিলে, চরকা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান পড়িতে গিয়াছিলে, বিজ্ঞান ছাড়িয়া এখন সাহিত্যসেবা করিতেছ। ইহাই কি সেই সাহিত্য সেবার নমুনা? তোমার ও-সাহিত্য কয়টা খাজনা-পীড়িত কৃষকের দুঃখমোচন করিবে, কয়জন নিরন্নকে আহার যোগাইবে, কয়জন রোগীর ঔষধ-পথ্যের সংস্থান করিবে, কয়জন অশিক্ষিত ব্যক্তির সুশিক্ষার সহায়ক হইবে, কয়জন দুঃখীকে সুখী করিবে? তুমি বলিতেছ, আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক দুঃখ মোচনই উহার উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, বলিতে পার, তোমার এ সাহিত্য দেশের কয়জনের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? ইহা কয়জনের আত্মগোচর হইতে পারে? যে দেশের শতকরা পাঁচজনের শুধু অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে, সে দেশের কয়জন সাহিত্যরস পান করিতে সক্ষম? যাহারা সক্ষম, তাহারাও কি তোমার ও-সাহিত্যের ভাষা বোঝে? ও-সাহিত্যের ভাববিলাসের সহিত কি তাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে? দেশসেবার অজুহাতে তুমি যাহা করিতেছে, তাহা আত্মরতি মাত্র। তুমি এবং তোমার মত ভাববিলাসী কয়েকজন পরস্পর আত্মপ্রশংসা করিবার অছিলায় মিথ্যা মায়ালোক সৃজন করিয়াছে, তাহার সহিত দেশের জনসাধারণের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহাদের ছোটলোক বল, তাহারা তাড়ির আড্ডায় বসিয়া যাহা করে, তোমারও তোমাদের সাহিত্যসভায়

বসিয়া তদপেক্ষা মহত্তর কিছু কর না। তাহাদেরও উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন, তোমাদেরও উদ্দেশ্য তাই। চিত্তবিনোদন করিতে বসিয়া তাহারাও গালাগালি মারামারি চিৎকার করে, ভিন্ন ভাষায় তোমরাও তাহাই কর। ইহার সহিত দেশের অথবা দশের কোনো সম্পর্ক নাই— ইহা নিতান্তই তোমাদের গোষ্ঠীগত ব্যাপার। যাহারা তোমাদের গোষ্ঠীর লোক— সাহিত্যসম্পৃক্ত হওয়াতে তাহারাই বা কি এমন মহত্তর ব্যক্তি হইয়াছে? তাহাদের জীবনের কতটা আধ্যাত্মিক সুখসাধন করিয়াছ? কতটা দুঃখমোচন সম্ভব হইয়াছে? তোমাদের সকলেই তো দুঃখী। শুধু তাই নয়, সাধারণ সামাজিক মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে অধিকাংশই পাপিষ্ঠ নরাধম। ছবি, প্রফেসর গুপ্ত, লোকনাথ ঘোষাল, নিলয়কুমার, নীরা বসাক, নিপুদা, চণ্ডীচরণ দস্তিদার, হীরালাল মজুমদার, সে নিজে, অর্থাৎ সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট যাহারা, তাহারা একজনও কি মনুষ্য-হিসাবে শ্রদ্ধেয়? তবে? যে কয়জনকে সে জীবনে সত্যসত্যই শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছে, তাহাদের কাহারও তো সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সহসা তাহার স্কুলের হেডপণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্যকে মনে পড়িল। তিনি, মুকুজ্জেমশাই, বেলা মল্লিক, ভণ্টুর বউদি, মৃন্ময়, হাসি, তাহার নিজের বাবা— ইহারা কেহই সাহিত্যের স্রষ্টা বা সমঝদার হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহেন।

বহুদিন পূর্বে গ্রামে গ্রামে চরকা ও খদ্দর প্রচার করিতে করিতে তাহার যেমন মনে হইয়াছিল যে সে ভুল পথে চলিতেছে, তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে যে যেমন উপলব্ধি করিয়াছিল যে বিজ্ঞানের পথ তাহার পথ নহে— সাহিত্যের পথে চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়, সাহিত্যের পথেই সে দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিবে, আজও তেমনই আবার অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল, দেশের দুঃখ ঘুচাইব— ইহাই যদি তাহার জীবনের আদর্শ হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের পথও ভুল পথ। অন্যান্য নানারূপ বিলাসের মত ইহাও একরূপ বিলাস।

আরে! কে, শঙ্কর নাকি।

চলন্ত ট্রাম হইতে যে ব্যক্তিটি নামিল, তাহাকে সে এ সময়ে এখানে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই। উৎপল বম্বে হইতে কবে আসিল?

পাঁয়ত্রিশ

শঙ্করের উচ্ছ্বাসহীন প্রশংসা নিপুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। নিপু বুঝিয়াছিল, ওই কয় ছত্র মামুলি সমালোচনার মূল্য কি এবং অর্থ কি। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে মনে মনে জ্বলিতেছিল। সে জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল যখন দৈনিক কাগজগুলি শঙ্করের গুণগান করিয়া সাড়ম্বরে তাহার অভিভাষণটি বাহির করিল। অভিভাষণে যাহা ছিল, তাহা সুরুচিসঙ্গত সাহিত্যিক আলোচনা। শাশ্বত সাহিত্যের লক্ষণগুলির বিচার এবং বাংলা সাহিত্যে তাহাদের প্রকাশ লইয়া আনন্দ অথবা অভাব লইয়া দুঃখ। নিরপেক্ষ যে কোনো সাহিত্যিকের নিকট অভিভাষণটি নিঃসন্দেহে উপাদেয়; কিন্তু নিপুর মনে হইল, উহা তৃতীয় শ্রেণীর চর্বিতচর্বণ। উহাতে নতুন কথা কী আছে? মানবের ইতিহাসে যে নবযুগ সূচিত হইতেছে, রুশ দেশের জার প্রপীড়িত জনসাধারণ সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য বিদ্রোহ করিয়া পুরাতন বিধিবিধান উল্টাইয়া দিয়া যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, শঙ্করের অভিভাষণে তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। সুতরাং উহা বাজে। শাশ্বত সাহিত্যের সনাতন বুলি অনেকবার অনেক লোকের নিকট শোনা গিয়াছে, উহা শুনিবার আর প্রবৃত্তি নাই। মানবের অগ্রগতির, মানবের আধুনিকতম

প্রতিভার নব জয়যাত্রার বাণী যদি শুনাইতে পারে, তবেই তাহা শ্রাব্য; রুশ দেশের সহিত আমাদের দেশের মিল আছে। রুশ দেশ কৃষিপ্রধান, আমাদের দেশও কৃষিপ্রধান। তাহারও একদিন ঠিক আমাদেরই মত দুর্দশাপন্ন ছিল। আমাদেরই মত নিরক্ষর, আমাদেরই মত রোগে অনাহারে জীর্ণ, ঋণভারে করভারে প্রপীড়িত। আমাদেরই মত তাহারা ধীরে ধীরে লয় পাইতেছিল, যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, আমাদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে সেই মন্ত্রের ধ্বনি যে কবির বীণায় ঝঙ্কৃত হইবে, সে-ই নবযুগের কবি।

ঠোঁট বাঁকাইয়া নিপু যাহাদের নিকট বক্তৃতা করিতেছিল, তাহারা সকলেই তরুণ-বয়স্ক, সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রিধারী এবং রুশসাহিত্যে কৃতবিদ্য। প্রায় সকলেই বেকার, সকলেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সকলেরই নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা এত অত্যুচ্চ যে, সে উচ্চতার নিকট হিমালয়ও হীন হইয়া যায়, সকলেই স্বদেশহিতৈষী এবং সকলেরই ধারণা, যাহা করিলে স্বদেশের হিত হয় তাহা কেবল তাহাদেরই জানা আছে, অপরের নয়। দেশের নিকট যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত, স্বদেশের মুক্তির জন্য যাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন— ইহাদের মতে, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিহীন। নতুন প্রেরণার খবর রাখেন না। এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ির জয়গান করিয়া বেড়ান। তাঁহারা অধিকাংশই ক্যাপিটালিস্ট অথবা পেটি-বুর্জোয়া। তাঁহারা যাহা করিতেছেন অথবা বলিতেছেন, তাহা ক্যাপিটালিজ্‌মগন্ধী, তাহাতে সমগ্র দেশের উপকার হইবে না, তাহা মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, শ্রমিকদের অথবা কৃষকদের নয়।

তাই ইহারা নতুন করিয়া দেশকে গঠন করিতে চায়। সাহিত্য যেহেতু লোকশিক্ষার প্রধান বাহন এবং সংবাদপত্র যেহেতু জনমত গঠন করে সেই হেতু ইহাদের সকলেই প্রায় সাহিত্য অথবা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে ব্যগ্র। ইহাদের নিজেদের সাহিত্য পত্রিকা আছে, যদিও তাহার প্রচার খুব কম, কারণ লোকে যে রসের লোভে সাহিত্য-পত্রিকা কেনে, ইহাদের পত্রিকা সে রসে বঞ্চিত। ইহাদের পত্রিকা 'থিওরি' প্রচার করে, কিন্তু তাহা সাহিত্য হইয়া উঠে না। নিপুর যুগান্তকারী উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা নিপুকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছে। যে নিপুকে আত্মীয়স্বজন কেহই কোনো দিন আমল দেয় নাই, হিরণদার 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সম্পর্কে আসিয়াও যে কিছুতেই নিজেকে পাদপ্রদীপের সম্মুখীন করিতে পারে নাই (কোথাকার অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্কর আসিয়া সেখানে আসর জমাইয়া বসিল), সেই নিপু নিজেকে সহসা একটা দলের শীর্ষভাগে দেখিয়া মনে মনে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিল, যাহা তাহার প্রকৃত মনোভাবের বিপরীত। ভাবটা এই যে, আঃ, তোমরা আমাকে এ কী বিপদে ফেলিলে! আমি তো এসব চাই না, আমি চাই নির্জনে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিয়া মন্ত্রের সাধনা করিতে। আমি সামান্য কেরানি বটে, কিন্তু আমি তপস্বী।

শঙ্কর সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিল, লোকনাথবাবুর মত একটা জ্ঞানী লোক শঙ্করবাবুর পিছনে আছেন বলেই ওঁর সাহিত্য-সমাজে যা কিছু প্রতিপত্তি। আর একজন বলিল, কাল কিন্তু লোকনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি দেখলাম, শঙ্করের উপর একটু চটেছেন, বেশ একটু অপ্রসন্ন মনে হল।

তাই নাকি?

সংবাদটাকে নিপু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

তা হলে চল না, লোকনাথবাবুকে দিয়েই শঙ্করের অভিভাষণের একটা স্কেদিং সমালোচনা লেখানো যাক্। কন্টকেনৈব কন্টকম্—

একজন ভক্ত বলিল, লোকনাথবাবু কি আপনার মত লিখতে পারবেন?

আমি নিজের নাম দিয়ে ওটা আর লিখতে চাই না।

সদলবলে সকলে লোকনাথবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল। লোকনাথবাবু বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, নিপুকে দেখিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, শঙ্করবাবুর অভিভাষণটা পড়েছেন? চমৎকার হয়েছে। আমি যাচ্ছি তাকে অভিনন্দন জানাতে, এতটা আমি আশা করিনি।

নিপুকে হতাশ হইতে হইল। সদলবলে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যাবেন আপনি?

না। আমার অন্য কাজ আছে একটু এখন।

আমি চললাম তবে।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শঙ্করের অভিভাষণ পড়িয়া সাহিত্যপ্রেমিক লোকনাথ ঘোষালের মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল।

নিপু সেই ছোকরাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ওঁরা সবাই পেটি-বুর্জোয়া। আমাদের সঙ্গে ওঁদের সুর কিছুতেই মিলতে পারে না।

ঠিক হইল, অভিভাষণের স্কেদিং সমালোচনা নিপুই লিখিবে, কিন্তু বেনামীতে। স্কেদিং সমালোচনাটা লিখিতে বসিয়া নিপু কিন্তু প্রথমটা একটু বিপদে পড়িল। শঙ্করের অভিভাষণটা পুনরায় আগাগোড়া পড়িয়া তাহার মনে হইল, কিসের বিরুদ্ধে সে সমালোচনা করিবে? শঙ্কর যাহা লিখিয়াছে, তাহা এতই যুক্তিযুক্ত, তাহার ভাষা এতই জোরালো এবং ভঙ্গি এমনই চিত্তাকর্ষক যে, তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে ভদ্র অন্তঃকরণ স্বভাবতই একটু সঙ্কুচিত হয়, হাজার হোক, সে একদিন 'ক্ষত্রিয়'-দলের একজন সমঝদার সভ্য ছিল তো, সাহিত্যস্রষ্টা না হইলেও অন্তরের অন্তস্তলে সে সুসাহিত্যের রসগ্রাহী, মুখে তাহা স্বীকার করুক আর না করুক।

অনেকক্ষণ সে কলম হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবন্ধ ত্যাগ করিয়া তাহার চিন্তা অতীতে ফিরিয়া গেল। হিরণদাকে মনে পড়িল। বড়লোকের খামখেয়ালি ছেলে হিরণদা, পিতার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া নানারূপ খেয়াল চরিতার্থ করিতে হঠাৎ একদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, এবং তাহারা (সে নিজেও তাহাদের মধ্যে একজন) ওই উচ্ছৃঙ্খল বড়লোকের ছেলেটার তোষামোদ করিবার জন্য বিদূষকবেশে তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছিল। সমঝদার হিসেবে ততটা নয়, যতটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায়। হিরণদা দিলদরিয়া লোক ছিলেন। কখনও কাহাকেও এক টুকরো রুটি ছুঁড়িয়া দিয়া, কখনও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া, এমনকি কখনও কাহারও মদের খরচ জোগাইয়া তিনি তাহাদের অনেককে মাঝে মাঝে অনুগৃহীত করিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন শঙ্করকে। কারণ, শঙ্করই সর্বাপেক্ষা বেশি পদলেহী ছিল। লেখার ব্যাপারে যতটা না হোক, লেহন-ব্যাপারে সে সত্যই একজন বড় আর্টিস্ট। বেশি কথা বলিয়াও সর্বাপেক্ষা বেশি খোশামোদ করিতে পারে, তাহার গালাগালির মধ্যেও খোশামোদ প্রচ্ছন্ন থাকে। শাঁসালো ব্যক্তির খোশামোদ করাই তাহার পেশা, ইদানীং শঙ্কর যেসব পুস্তক অথবা প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিল, তাহা নিপুর মনে পড়িতে লাগিল। প্রত্যেকটি সমালোচনায় খোশামোদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, এমনকি যাহাদের পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করিয়াছে, তাহাদেরও এক অদ্ভুত উপায়ে খোশামোদই করিয়াছে, তাহাদের অন্তরঙ্গ হিতৈষী সাজিয়া কটুভাষণের অন্তরালেই তাহাদের তুষ্টিবিধান করিতে চাহিয়াছে। নিপুর

বইটার যে এই ছদ্ম-প্রশংসা করিয়াছে, ইহা তাহার ওই হীন মনোবৃত্তিরই পরিচয়। ভালই যদি না লাগিয়াছিল, সোজা ভাষায় গালাগালি দিলেই পারিত, তাহাতে বরং ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত। কিন্তু এ কি!

সহসা নিপুর মনে হইল, ইহাই পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, ইহারা ক্ষমতাবানের খোশামোদ করিয়া অক্ষমের উপর তাহার প্রতিশোধ লয়। খোশামোদ করিতে পারে না বলিয়া নিপুর এই দুর্দশা।

সহসা তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল।

সে লিখিতে শুরু করিল।

ছত্রিশ

উৎপল ও সুরমার সহিত অনেক দিন পরে দেখা হইয়া শঙ্কর যেন তাহার পূর্বজীবনের স্বাদ খানিকটা ফিরিয়া পাইল, যে পূর্বজীবনে সুরমার সান্নিধ্যে তাহার মনে প্রথম রঙ ধরিয়াছিল, রিনিকে ঘিরিয়া প্রথম প্রণয়ের উদ্বোধন হইয়াছিল, মিষ্টিদিদির মাদকতায় প্রথম পদস্খলন ঘটিয়াছিল, কলিকাতা শহরের প্রথম স্পর্শে যে জীবন মাধুর্য-আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেই পূর্বজীবনের অনুভূতি তাহার মনে আজ আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল স্মিতমুখী সুরমাকে দেখিয়া। আজ যেন শঙ্কর নতুন করিয়া আবার উপলব্ধি করিল, বিংশ শতাব্দীর যে প্রকাশ আমরা নারী-প্রগতিতে কামনা করি, যে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখিয়া আমরা আমাদের মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাই, তাহা যেন শোভনভাবে সার্থক হইয়াছে সুরমা-চরিত্রে। সুরমা সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনীর কন্যা, ধনীর বধূ। কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোনোরূপ উগ্রতা নাই, তাহা অতিশয় বিনম্র ও সুমধুর। কথায় বার্তায়, আকারে ইঙ্গিতে সে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয় না যে, অধুনা-প্রকাশিত বিদেশি পুস্তক সে সর্বদাই পড়িয়া থাকে অথবা তাহাদের চারখানা মোটরকার আছে। অথচ অতিবিনয়ের অভিনয়ও তাহার নাই। তাহার এই সহজ সপ্রতিভ সুমার্জিত রূপ শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে, তাহাতে কোনোরূপ আড়ষ্টতাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, সংযম আছে। সে পরপুরুষের সঙ্গে মেশে, আলাপ করে, হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দেয়; কিন্তু তাহার চরিত্রে কোথায় কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা কিছুতেই শোভনতার সীমারেখা অতিক্রম করে না। শঙ্করের কবিতা উপন্যাস গল্প লইয়া সে অনেক আলোচনা করিল। নীরা বসাকের মত সোচ্ছ্বাসে নয়, নিপুদার মত অবজ্ঞাভরেও নয়, যাহা বলিল, সবিনয় শ্রদ্ধাসহকারেই বলিল। তাহাতে বাচালতা নাই, নিজের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা নাই, কিন্তু আন্তরিকতা আছে। সব লেখার প্রশংসা করিল না, কিন্তু যেগুলির অপ্রশংসা করিল, তাহা অন্তরকে ব্যথিত করে না; কারণ তাহা ঠিক নিন্দা নয়, তাহা যেন 'আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই,' অথবা 'আমার রুচি একটু আলাদা রকমের' জাতীয় মন্তব্য।

উৎপলের বয়স কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু মন বদলায় নাই। সে এখনও ঠিক তেমনই খামখেয়ালি আছে। আগের মতই এখনও সে নতুন কিছু করিবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। দুই বৎসর কাগজ চালাইয়া শঙ্করের মত সেও নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, সাহিত্য-ব্যবসা ভদ্রলোকের কর্ম নহে। এ দেশে ভদ্রভাবে সাহিত্য-ব্যবসা করিতে গেলে দেশটাকে সর্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে হইবে। জমি প্রস্তুত না করিয়া বীজ বপন করা মুর্খতারই নামান্তর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি করে জমি প্রস্তুত করবে তুমি?

শিক্ষা দিয়ে।

কোথায়. কাকে শিক্ষা দেবে?

ও, তুই বুঝি শুনিসনি, আমি আমাদের গ্রামের জমিদারিটা কিনে ফেলেছি? সেখানেই ভাবছি—

কিনে ফেলেছিস? রাজবল্লভবাবুরা কোথা গেলেন?

কলকাতা চলে এসেছেন বোধ হয়। আজকাল অধিকাংশ জমিদারই তো কলকাতায় চলে আসছেন। পাড়াগাঁ আর ভাল লাগছে না তাঁদের।

কী করে কিনলি তুই?

কেনারামবাবুর মারফত।

শঙ্কর এবং উৎপল এক গ্রামেরই ছেলে। উৎপল গ্রামের জমিদার হইয়াছে। সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

উৎপল সোৎসাহে বলিতে লাগিল, রাজবল্লভবাবুর জমিদারি শুধু আমাদের গ্রামখানি নিয়েই নয়. পাশাপাশি দশখানা গ্রাম আছে। আমি ভাবছি সমস্তটা নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি— সব রকমের যাতে উন্নতি হয়. তার চেষ্টা করার ইচ্ছে আছে।

অনেক টাকার দরকার তাতে।

অনেক টাকা আমার আছে। শ্বশুরমশাই যে টাকা আমায় দিয়েছিলেন, তার খানিকটা অবশ্য আমি জার্নালিজম করতে গিয়ে নষ্ট করেছি— খুব বেশি অবশ্য নয়, হাজার দশেক; কিন্তু বাকিটা শ্বশুরমশাইয়ের পরামর্শগত ব্যবসাতে খাটিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। টাকার জন্যে আটকাবে না, তা ছাড়া আমি হয়ত প্রথমে একখানা গ্রাম নিয়ে আরম্ভ করব, কেনারামবাবুকে আমার প্ল্যান লিখেও পাঠিয়েছি।

তিনি—

শঙ্কর একটু হাসিল।

তিনি ছাড়া গ্রামে আর তো কোনো বুদ্ধিমান লোকই দেখতে পাই না। তাঁকে দিয়ে যে চলবে না, তা বুঝতে পারছি, ভাল লোকের চেষ্টাতেও আছি; দেখি যদি—

সহসা উৎপল থামিয়া গেল। খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে সোৎসাহে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তুই যাবি? তোকে বলতে ভয় করে। তোর আত্মসম্মান যে রকম প্রখর, হয়ত হঠাৎ চ'টে উঠবি। চল্ না, দুজনে মিলে নিজেদেব গ্রামটার উন্নতি করা যাক। তোর কথার সুরে মনে হচ্ছে আমার মতন তোরও ভুল ভেঙেছে। সাহিত্য-টাহিত্য করে কিছু হবে না এখন এ দেশের। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।

তুই কী তোর অধীনে চাকরি নিয়ে যেতে বলছিস আমাকে?

তা ঠিক বলছি না, আমি তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবেও থাকতে পার। জ্যাঠামশাই যা রেখে গেছেন, তাতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া উচিত।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। বাবার উইলের কথা সে উৎপলকে বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল করালীচরণকে। করালীচরণের আগমন ও নির্গমন বার্তা সে জানিত না। ভন্টুর সহিত তাহার দেখাই হয় নাই। এই সূত্রে তাহার মনে পড়িল, ভন্টুর বউদিদি কাল আপিসে ভন্টুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি একবার তাহার সাক্ষাৎ চান। কাল নানা গোলমালে যাওয়া হয় নাই। সময় করিয়া একবার যাইতেই হইবে। শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠছিস? আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখিস একটু।

আচ্ছা।

সাঁইত্রিশ

উপন্যাসে যাহা লিখিলে সমালোচকরা নাসা কুঞ্চিত করিয়া মনে করেন যে, আর্ট ক্ষুণ্ণ হইল, লেখক যেন নিজের সুবিধার জন্য জোর করিয়া ঘটনাটা এই স্থানে ঘটাইয়া দিলেন; জীবনে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সময় সত্য সত্যই তাহা ঘটে। শঙ্করের জীবনে ইতিপূর্বে এ রকম একাধিকবার ঘটিয়াছে, আবার ঘটিল।

শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার বাবার উইলের কথাই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, ফুটপাথের একধারে মোস্তাক বসিয়া আছে। তাহার বগলে একগাদা কাগজ, এক কানে জবাফুল, অন্য কানে বিড়ি, নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া শাঁকালু ভক্ষণ করিতেছে। মোস্তাককে দেখিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল। হয়ত করালীচরণের খবর এ বলিতে পারে। অন্তত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

মোস্তাক, কী হচ্ছে এখানে?

মোস্তাক শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করিল। বগল হইতে কাগজের গাদা ফুটপাথের ওপর পড়িয়া গেল।

আহা, তোমার সব পড়ে গেল যে। দাঁড়াও তুলে দিচ্ছি।

তুলিয়া দিতে গিয়া কিন্তু যাহা তাহার হাতে পড়িল, তাহা যে এখানে এভাবে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তাহার বাবার উইল এবং করালীচরণকে লেখা তাঁহার সেই চিঠিখানা।

এ তুমি কোথা থেকে পেলে?

মোস্তাক তাহার কর্তব্য সমাপন করিয়া পুনরায় শাঁকালুতে মন দিয়াছিল। কোনো জবাব দিল না।

বক্সি মশাই কি ফিরেছেন?

এই কথায় মোস্তাক হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া দিল।

আমি এই কাগজ দুখানা নিয়ে যাই, কেমন?

মোস্তাক আপত্তি করিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শঙ্কর ভণ্টুর বাড়ি যাইতেছিল, হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া ঝামাপুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইল, করালীচরণের খোঁজটা লইয়া যাওয়াই ভাল।

গলিটা ধোঁয়ায় ধূলায় আচ্ছন্ন। পানের দোকানের সামনে একজন কাবুলিওয়ালা একজন পাওনাদারকে লাঞ্ছিত করিতেছে, কয়েকজন লোক দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ঋণগ্রস্ত লোকটার দুর্দশা দেখিতেছে। কাবুলিওয়ালার টকটকে লাল মখমলের জরি বসানো ওয়েস্ট কোটটা স্বল্পালোকেই চকচক করিতেছে। তাহার অন্তরের লোলুপতা নিষ্ঠুরতা যেন উহাতেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে শঙ্কর দেখিতে পাইল, করালীচরণের বাসার সম্মুখে আলো জ্বলিতেছে, কে যেন দাঁড়াইয়াও আছে। কাছে গিয়া দেখিল করালীচরণ নয়, একটি বারবনিতা, সাজসজ্জা করিয়া খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করিতেছে। শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখটা চেনা চেনা বলিয়া মনে হইতেছে। হ্যাঁ, চেনাই তো! এ যে ঊষা— মুক্তোর প্রতিবেশিনী ঊষা। কেরানিবাগান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানেই ঘরভাড়া করিয়াছে নাকি? করালীচরণ কোথায় গেল?

আসুন বাবু, অনেকদিন পরে যে, পথ ভুলে নাকি?

ঊষাও শঙ্করকে চিনিতে পারিয়াছিল, একমুখ হাসিয়া সংবর্ধনা করিল, শঙ্কর কিন্তু আর

দাঁড়াইল না, দাঁড়াইতে পারিল না। সেই উষার হাসি আজ এত বীভৎস।

শঙ্কর প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

আটত্রিশ

বউদিদি ঘরে খিল দিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছিলেন। অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছিলেন, তুমি আর দেরি করো না, তাড়াতাড়ি চলে এসে কাজে জয়েন কর। সংসারে খরচ দিন দিন বাড়ছে। ঠাকুরপো এত খরচা একা আর চালাতে পারছে না। কাল তার শ্বশুর এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরপোকে নাকি বলেছেন যে, তিনি না হয় মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করবেন, যতদিন না তুমি চেঞ্জ থেকে ফিরে আস। ঠাকুরপো একটু দোনামোনা করছিল, আমি কিন্তু তাতে মত দিলাম না। কুটুমের কাছ থেকে এ ভাবে টাকা নেওয়াটা কি ভাল দেখায়! কিন্তু এটাও ঠিক যে ঠাকুরপো বেচারা একা আর পেরে উঠছে না। তুমি আর ওখানে থেক না, চলে এস। এখানেই নিয়ম করে থাকলে শরীর সেরে যাবে। নন্টুরও কদিন থেকে রোজ জ্বর আসছে সন্ধেবেলা, কুইনিন খেয়ে গেল না, ডাক্তারবাবু বলেছেন, ওরও নাকি বুকের দোষ জন্মাচ্ছে। ভগবান কপালে কী যে লিখেছেন, জানি না।

বউদি!

বউদিদি তাড়াতাড়ি কলম নামাইয়া খাতার তলায় চিঠিটা চাপা দিলেন, গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া লইলেন, তাহার পর খিল খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

শঙ্কর ঠাকুরপো নাকি? এস, এত রাত্রে যে?

নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। ভণ্টু ঘুমিয়েছে নাকি?

সে শ্বশুর-বাড়ি গেছে ইন্দুকে নিয়ে, জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে।

ও। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো?

বস, বলছি, দালানেই এস।

বাকুর ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে তাকাইয়া শঙ্কর বলিল, বাকুও আজ বড্ড শিগগির শুয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

ওঁর শরীরটা খুব খারাপ। শোথটা কিছুতেই কমছে না।

অন্য সময় হইলে হয়ত শঙ্কর বাকুর অসুখের বিষয়ে দুই-চারিটি প্রশ্ন করিত। এখন কিন্তু তাহার মনের অবস্থা এরূপ যে, এ সম্বন্ধে সে কিছুই বলিল না। মোক্তাকের নিকট হইতে বাবার উইলের যে নকলটা সে পাইয়াছিল, তাহা সে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বাবার আসল উইলটা দেশে দেরাজের মধ্যে আছে। উইলের কোনো সাক্ষী নাই, উইল রেজিস্টারি করা নাই। সেটাকেও অবলুপ্ত করিয়া দিলে উইলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতেই পারিবে না। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছিল, কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলেই কি উইল নষ্ট হইয়া যায়? আইনত যাহাই হউক, ধর্মত বাবার বিষয় সে কি লইতে পারে? বাবা তো তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই। সে যদি কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে অমিয়াই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে, সে নয়— ইহাই তাহার বাবার অন্তিম ইচ্ছা।

বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

শঙ্করকে একটি মোড়া আগাইয়া দিয়া বউদিদি নিজে একখানি আসন টানিয়া বসিলেন। শঙ্কর হঠাৎ যেন বউদিদি ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হইল। মোড়াতে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে

বলিল, বাবাজি কোথায়?

তিনি আজ চলে গেছেন।

চলে গেছেন। কোথায় গেলেন?

তা জানি না। ঠাকুরপোর সঙ্গে আজ সকালে বাইরের ঘরে বসে অনেকক্ষণ কী যে কথা হ'ল, তাও জানি না। ঠাকুরপো আপিস চলে যাবার পর উনিও নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন দেখলাম।

কী লেখা আছে তাতে?

মুচকি হাসিয়া বউদিদি বলিলেন, মাত্র একটি লাইন— আমার আর ভাল লাগছে না, চললাম।

বউদিদি চুপ করিয়া গেলেন। একটা বিষাদের ম্লান ছায়ায় তাঁহার হাসি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বউদিদি বলিলেন, ঠাকুরপোকে একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে তুমি? তুমিই যদি পার, আমি তো বলে বলে হার মেনেছি।

কী কথা?

ইন্দুকে নিয়ে ও আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকুক। এমন করে আমাদের সব্বাইকে নিয়ে ও আর পেরে উঠছে না। ওর মুখের পানে চাইলে কষ্ট হয় আমার। আজকাল জলখাবার খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের সবাইকে জড়িয়ে কষ্ট পাবার কী দরকার ওর? উনি এসে কাজে জয়েন করুন, তা হলেই আমাদের এক রকম করে চলে যাবে। আমার কথায় ও মোটে কান দেয় না।

শঙ্কর ইহাও প্রত্যাশা করে নাই। ভণ্টুকে ও বউদিদিকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিতে সে অভ্যস্ত নহে। বউদিদি এ কী বলিতেছেন!

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কেন, কী, হ'ল কি?

বউদিদি সবিস্তারে সব বলিতে লাগিলেন। ইন্দু অথবা ভণ্টু কাহারও দোষ দিলেন না, কিন্তু অবস্থা যাহা সত্যই দাঁড়াইয়াছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

উনচল্লিশ

শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, লেটার বক্সের ভিতর একখানা মাসিক-পত্রিকা রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল 'মজদুর-দর্পণ'। উল্টাইতেই চোখে পড়িল, তাহার সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কে কী লিখিল? নিরতিশয় ক্লান্তি সত্ত্বেও সে নিচের ঘরে বসিয়া সাগ্রহে প্রবন্ধটি পড়িতে শুরু করিয়া দিল, নিজের সম্বন্ধে এত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধে কে কি লিখিয়াছে, তাহা অবিলম্বে জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। পড়িতে পড়িতে কিন্তু তাহার সমস্ত মন ক্ষোভে গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য নাম দেওয়া থাকিলেও নিপুদার লেখা চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই ঈর্ষা-তিক্ত যুক্তি, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ছলে সকলকে হীন করিয়া দিবার এই প্রয়াস, সহজ ভাবকে দুর্বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার এই বক্র ভঙ্গি— নিপুদা ছাড়া আর

কাহারও হইতে পারে না। সে যেন মানসপটে নিপুদার মুখখানা দেখিতে পাইল। গালের হাড় উঁচু, চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা, গালে কপালে মেচেতার দাগ, ঠোঁট বাঁকাইয়া কথা বলিবার ভঙ্গি। গ্রন্থকীট লোকটা জীবনে কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে 'মজদুর'দের উদ্ধার করিবার ছুতোয় যেখানে-সেখানে নিজেকে জাহির করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া শঙ্কর ঘাড় ফিরাইল। অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তুমি এত রাত করে ফিরলে?

কেন, কী হয়েছে?

নিতাই ঠাকুরপো—

অমিয়া আর বলিতে পারিল না, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। মেঝের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট শঙ্করের কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কী করেছে নিতাই?

অনেক জেরার পর শঙ্কর জানিতে পারিল, চাকরটা সন্ধ্যার সময় ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অমিয়া বাড়িতে একা ছিল। নিতাই কোথা হইতে মদ খাইয়া আসিয়া হঠাৎ তাহাকে পিছন দিক হইতে জাপটাইয়া ধরে। অনেক ধস্তাধস্তির পর নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে পাশের ঘরে খিল দিয়ে বসিয়া ছিল। নিতাই টেবিলের ড্রয়ার হইতে চাবির রিং লইয়া আলমারি খুলিয়া তাহার গয়নার বাক্সটা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শঙ্কর হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। সাহিত্যের স্বপ্ন তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর সে থাকিতে পারিবে না।

চল্লিশ

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে উৎপলের সহিত দেখা করিল। বলিল যে, সে তাহার সহিত গ্রামেই ফিরিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছে। পল্লী উন্নয়ন-প্রচেষ্টাতে সে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটি শর্তে।

শর্তটা কী?

আমি তোমার অধীনে চাকরি করব।

বেশ, আমার কোনোও আপত্তি নেই তাতে। একজন ভাল লোক তো আমি খুঁজছিই।

কিন্তু আসল শর্তটা হচ্ছে, কথাটা গোপন রাখতে হবে। তুমি এবং আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানবে না।

তা হলেই তো মুশকিলে ফেললে দেখছি। তৃতীয় একটি ব্যক্তির নিকট আমি ইতিপূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তার কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখব না।

উৎপল মুচকি হাসিল।

সুরমা। ওর কাছে আমি সব বলি, এমন কী নিজের দুষ্কৃতি পর্যন্ত। তবে ও একটি লোহার সিন্দুকবিশেষ। একবার যা প্রবেশ করবে তা আর সহজে বেরবে না। যদি ইচ্ছে কর, ওকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার।

শঙ্কর ক্ষণকাল ভাবিল। তাহার পর বলিল বেশ। এইবার আমি উঠি তা হলে, ওই ঠিক রইল।

মাইনে কত নেবে, তা বললে না?

সে তুমি ঠিক কর। যা দেবে, তাতেই আমি রাজি। তবে আর একটা কথা আছে, সেটাও বলে রাখা ভাল। মাইনে আমি কম নিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কাজে তুমি যখন-তখন বাধা দিতে পারবে না। তা হলে কিন্তু বনবে না ভাই।

উৎপল হাসিয়া বলিল, বাধা দিতে হলে যে উদ্যম প্রয়োজন, তা যদি আমার থাকত, তা হলে আমি অন্য লোক খুঁজতাম না, নিজেই সব করতাম। সুতরাং সে বিষয়েও তুমি নির্ভয় থাকতে পার।

একচল্লিশ

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ছাড়িতেছিল।

জিনিসপত্র-সহ অমিয়াকে একটা গাড়িতে চড়াইয়া দিয়া শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছিল। গতকল্য উৎপল সপরিবারে চলিয়া গিয়াছে, আজ সে যাইতেছে। সকলের সঙ্গেই তাহার প্রায় দেখা হইয়াছে, কেবল ভণ্টুর সঙ্গে হয় নাই। বউদিদি ভণ্টুকে যাহা বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনুক্ত রহিয়াছে। কাল ভণ্টুকে তাহার আপিসে ফোন করিয়া জানাইয়াছে যে, সে বোধ হয় চিরদিনের মত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, বাড়িতে গিয়া তাহার সহিত দেখা হয় নাই, বউদিদিকেও সে বলিয়া আসে নাই যে, হঠাৎ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সে গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে, কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল, বলিতে পারিল না। অথচ ইহাই বলিতে সে গিয়াছিল। ভণ্টু যদি স্টেশনে আসিয়া তাহার সহিত দেখা না করে, তাহা হইলে হয়ত আর দেখাই হইবে না। আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে তাহার সঙ্গে। শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ভণ্টুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সিগারেট পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল, কিন্তু ভণ্টু আসিল না। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে চুনচুন্ আসিয়া হাজির হইল। চুনচুনের সহিতও সে দেখা করিয়া আসে নাই। শঙ্কর প্রত্যাশা করিতে লাগিল যে, চুনচুন্ই আসিয়া প্রথমে কথা কহিবে, কিন্তু চুনচুন্ সেসব কিছুই করিল না। অন্য দিকে চাহিতে চাহিতে, যেন সে শঙ্করকে দেখিতেই পায় নাই এমনই ভাবে, প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গেল। শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ডাকিল। মনে হইল, চুনচুন্ যেন ডাকটাও শুনিতে পাইল না। সামনের প্ল্যাটফর্মে আর একটা প্রায়-খালি প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল, বোধ হয় কোনো লোকাল ট্রেন, তাহারই একটা কামরায় গিয়া চুনচুন্ উঠিয়া পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, হয়ত কোথাও যাইবে, আমাকে দেখিতে পাইল না। আগাইয়া গিয়া আলাপ করিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় ভণ্টুর ভাইপো শম্ভু আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভণ্টু কোথায়?

কাকা এখানে আসবেন বলেই বেরিয়েছিলেন বাইকে করে। রাস্তায় হঠাৎ একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি পড়ে গেছেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে খবরটা দিতে।

খুব বেশি লেগেছে নাকি?

পায়ের হাড় ভেঙে গেছে.

ও!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাওয়ার সময় তার সঙ্গে আর দেখাটা হল না দেখছি। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি গিয়েই চিঠি লিখব, কেমন থাকে খবরটাও দিও আমাকে।

আচ্ছা।

প্রণাম করিয়া শন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর হাতঘড়িটা একবার দেখিল ট্রেন ছাড়িতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। অমিয়াকে বলিল, তুমি বস, আমি আসছি। শঙ্কর দ্রুতপদে চলিয়া গেল। স্টেশনে সকলের ব্যবহারের জন্য যে ফোন আছে, তাহারই সহায়তায় মেডিকেল কলেজ ইমারজেন্সি রুমের একটি ডাক্তারের সহিত সে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

ভণ্টু নামে আমার একজন বন্ধু এখুনি বাইক থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে আপনাদের ওখানে গেছে। তাকে যদি দয়া করে একটু বলে দেন যে, শঙ্করবাবু ফোন করেছিলেন। নিতান্ত দরকারে আমাকে আজ চলে যেতে হচ্ছে, জিনিসপত্র সব ট্রেনে তুলে দিয়েছি। তা না হলে আমি এখনি তাকে দেখতে যেতাম। বলে দিন যে, আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ফোন করছি। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি যদি বলে দেন, বড় ভাল হয়। মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে? ও, আচ্ছা, উঠলে বলবেন। আচ্ছা থ্যাঙ্কস।

ফোনটা করিয়া শঙ্কর যেন খানিকটা তৃপ্তিলাভ করিল। কিছু করিতে না পারিয়া সে যেন অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই শঙ্কর একরূপ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে চুনচুন দাঁড়াইয়া আছে। শঙ্কর কিছু বলিবার পূর্বেই সে হেঁট হইয়া শঙ্করকে প্রণাম করিল। ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে, আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী খবর তোমার? ভাল আছ তো?

চুনচুন্ স্মিতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না, ট্রেন চলিয়া গেল।

বিয়াল্লিশ

গ্রামে যখন শঙ্কর পৌঁছিল, তখন প্রভাত হইতেছে। সে পূর্বে কোনো খবর দেয় নাই। সব জিনিসপত্র লইয়া এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল কেন, তাহা শঙ্করের মা বুঝিতে পরিলেন না। সবিস্ময়ে শুষ্কমুখে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তুই হঠাৎ এসে পড়লি যে?

শহর আর ভাল লাগছে না, তোমার কাছেই থাকব এবার ঠিক করেছি।

আমার কাছে থাকবি?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা তিনি আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমি রাক্ষসী, তোর ভাইকে খেয়েছি, বাপকে খেয়েছি, তোকেও খেয়ে ফেলব। পালা, পালা, পালা আমার কাছ থেকে।

সেইদিন রাত্রেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আবার পাগল হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, এখানে ঠিক সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়, রাঁচি পাঠানো উচিত।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

এক

চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

প্রভাত হইতেছে, বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে। শঙ্করের ঘুম এখনও ভাঙে নাই, কিন্তু দুই বৎসরের শিশুকন্যাটির ঘুম ভাঙিয়াছে এবং সে বুকের উপর চড়িয়া চোখের ভিতর ছোট ছোট আঙুল ঢুকাইয়া ডাকিতেছে, বাবা ওত, ও বাবা, ওত।

শঙ্কর হাসিয়া চোখ খুলিল। অমিয়া আগেই উঠিয়া রান্নাঘরে আঁচ দিতে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিল। মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, মেয়ের বেলায় হাসা হচ্ছে, আর আমি ওঠাতে গেলে ধমক খেয়ে মরি।

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া চোখ বুজিয়া আবার পাশ ফিরিল।

পাশ ফিরে শুচ্ছো যে, তোমার আজ ছবিগঞ্জে যাবার কথা নয়?

মনে আছে।

কন্যা ডাকিল, বাবা, ওত।

শঙ্কর উঠিয়া বসিল। সত্যই তাহার অনেক কাজ, শুইয়া থাকিলে চলিবে না। ছবিগঞ্জে আজ একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা। তা ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে। বাহিরের ঘরে হয়ত ইতিমধ্যেই জনসমাগম হইয়াছে। কন্যা গলা জড়াইয়া গালে গাল রাখিয়া শুইল। অমিয়া চা করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

ছাড়, এবার আমাকে উঠতে হবে।

না।

ভারি আদুরে দুষ্টু হয়েছ তুমি।

তুমি দুত্তু!

আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্করের মনে হইল, এমনভাবে তাহাকে আর কেহ বোধ হয় কখনও বাঁধে নাই। জীবনে অনেকের বাহুপাশে সে বাঁধা পড়িয়াছে, কিন্তু এ নিগড়ের নিকট সেসব অকিঞ্চিৎকর। তাহারই নিজের অন্তরের নিগূঢ় কামনা, যাহা বারংবার বহু নরনারীকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পারে নাই, তাহাই যেন তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল, বাহিরের ঘরে কেনারামবাবু কয়েকজন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন।

চল, যাচ্ছি। একে নাও।

না, দাব না।

যাও লক্ষ্মীটি।

না—না—না।

জোর করিয়া চাকরের কোলে তাহাকে দিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে কেনারাম চক্রবর্তীর সঙ্গে আসিয়াছিল ফরিদ এবং কারু। উভয়েরই উদ্দেশ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করা। কেনারাম চক্রবর্তী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি, সুপারিশ

করিতে আসিয়াছেন। উৎপলের এবং কয়েকজন বর্ধিষ্ণু প্রজার টাকায় গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। গভর্নমেন্টও কিছু টাকা তাহাতে দিয়াছে, ঋণস্বরূপই দিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য, মহাজনদের হাত হইতে গরিব প্রজাদের রক্ষা করা। গরিব প্রজারা মহাজনদের নিকট হইতে অতিশয় চড়া সুদে টাকা কর্জ করিয়া সর্বস্বান্ত হয়। এই ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দেয় এবং ফসল উঠিলে কিস্তিতে কিস্তিতে তাহা শোধ করিয়া লয়। কেনারাম চক্রবর্তীর কর্তব্য, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা মারা না পড়ে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, ঋণপ্রার্থীর বিষয়সম্পত্তি এমন আছে কি না, যাহা হইতে টাকা উদ্ধার হইতে পারে এবং লোকটা বিশ্বাসযোগ্য কি না; টাকা লইয়া সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না। কেনারামবাবু ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের নায়েব, এ অঞ্চলে সমস্ত প্রজার প্রকৃত অবস্থা তাঁহার জানিবার কথা, সুতরাং তাঁহাকেই সেক্রেটারি করা হইয়াছে। শঙ্কর অবশ্য সর্বময় কর্তা। তাহার অনুমতি ছাড়া কিছুই হইবে না, ইহা কেনারামবাবুর সম্মতিক্রমেই উৎপল নির্ধারিত করিয়াছে।

কেনারাম চক্রবর্তী যদিও সারাজীবন নায়েবি করিয়া কাটাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে নায়েব বলিয়া মনে হয় না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া মনে হয়। হাব-ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদে কথায় বার্তায় তাঁহার যে মার্জিত রূপটি বিচ্ছুরিত হয়, তাহা সম্ভ্রম উদ্রেককারী। তাঁহার ঢিলা-হাতা এন্ডির পাঞ্জাবি, ধবধবে সাদা বাঁধানো দাঁত, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে বুদ্ধিদীপ্ত গাম্ভীর্য, অতি-আধুনিক বুকনি-সমন্বিত আলাপ— সমস্ত মিলিয়া এমন একটা সুষ্ঠু প্রকাশ যে ভিতরের আসল মানুষটিকে চিনিতে দেরি লাগে, অনেক সময় চেনাই যায় না। কেনারামবাবু শঙ্করের পিতৃবন্ধু, সুতরাং শঙ্কর তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। উৎপলও দূর হইতে তাঁহাকে যতটা তুচ্ছ করিয়াছিল, নিকটে আসিয়া দেখিল, তিনি ততটা উপেক্ষণীয় নহেন। এমন কি এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার এই পল্লী-উন্নয়ন চেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং একটা বড় বিভাগের শীর্ষদেশে তাঁহাকে স্থাপন করিতে সে ইতস্তত করিল না। কেনারামবাবু এ ব্যাপারে প্রথমে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কর্ম লইতে স্বীকৃতই হন নাই। তাঁহার ভাবটা ছিল, তোমরা ছেলে-ছোকরার দল, দেশের কাজ করিতে চাহিতেছে, এ তো বেশ ভাল কথা, তোমরা নিজেদের নিয়মে, নিজেদের বুদ্ধি অনুসারেই চল না— আমাদের মত বুড়োকে আবার ওসবের মধ্যে টানিতে চাও কেন? উৎপলের অনুরোধেই তিনি যেন অবশেষে খানিকটা অনিচ্ছা সহকারে এবং খানিকটা আবদারের খাতিরে শঙ্করের অধীনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি হইতে রাজি হইয়াছেন।

শঙ্কর বাহিরে আসিতেই কেনারামবাবু বলিলেন, দুটো গরিব প্রজাকে টাকা ধার দিতে হবে, তারা এসেছে, তোমার যা জিজ্ঞেস করবার করতে পার।

আমি আর কী জিজ্ঞেস করব? আপনি যখন এনেছেন—

কেনারামবাবু স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার এটা কর্তব্য বলেই বলছি।

আমি কি আর আপনার চেয়ে ভাল বুঝি? কত টাকা চায়?

প্রত্যেকেই চায় হাজার খানেক করে। দেবে কি না ভেবে দেখ। ফরিদের দশ বিঘে জমি আছে, কারুর আছে আট বিঘে। এ ছাড়া বাস্তুভিটেও আছে অবশ্য দুজনের।

বেশ তো, আপনি যদি ভাল বোঝেন—

ভালমন্দ বোঝবার ভার তোমার, তুমিই ফাইনাল অথরিটি—

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। কেনারামবাবুও চুপ করিয়া রহিলেন। কেবল তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে কৌতুকপূর্ণ একটা নীরব হাস্য যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। চতুর দাবা খেলোয়াড় চাল আগাইয়া দিয়া যেমনভাবে বিপক্ষের মুখের দিকে চায়, অনেকটা তেমনিভাবেই তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, বেশ তো দেওয়া যাক। গরিব প্রজাদের উপকারের জন্যেই তো ব্যাঙ্ক।

কথাটা লুফিয়া লইয়া কেনারাম বলিলেন, উপকার কথাটাই যদি ব্যবহার করছ, তা হলে বেশি কড়াক্কড়ি করাটা অনুচিত। করলে তোমাদের সঙ্গে নেকিরামের অথবা রাজীববাবুর কোনো তফাত থাকে না।

তা তো বটেই। প্রজাদের উপকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে টাকাটা যাতে মারা না যায়, সেটা যথাসম্ভব দেখতে হবে।

সে তো একশোবার। তবে 'যথাসম্ভব' কথাটা মনে রেখ। নেকিরাম রাজীববাবুর টাকাও মারা যায়, এমনকি কাবুলিওয়ালারাও সব সময়ে টাকা আদায় করতে পারে না, তাই ওদের সুদ অত চড়া—

আপনি যদি ভাল মনে করেন, ওদের টাকা দিন না, আমার আপত্তি নেই।

বেশ।

পকেট হইতে কেনারামবাবু একটি ছাপান অনুমতি পত্র বাহির করিলেন।

সই করে দাও তা হলে।

শঙ্কর সই করিয়া দিল। কেনারামবাবু উঠিয়া পড়িলেন, শঙ্কর উঠিয়া তাঁহার সহিত বারান্দা পর্যন্ত আসিল। বারান্দায় ফরিদ ও কারু জোড়হস্তে বসিয়াছিল। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। উভয়ের মধ্যে কিন্তু কোনো তফাত নাই। উভয়েরই অনাহারক্লিষ্ট মূর্তি, পরিধানে শতছিন্ন মলিন বসন, উভয়েরই দৃষ্টি ম্লান ভীতচকিত, উভয়েই ঋণে জর্জরিত, রোগে জীর্ণ, নানা অভাবে নিষ্পিষ্ট দরিদ্র চাষী।

দুই

আহারাদির পর শঙ্কর ছবিগঞ্জের দিকে গরুর গাড়ি চাপিয়া রওনা হইল। সেখানে মুকুন্দরাম পোদ্দারের বৈঠকখানায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। মুকুন্দরাম একজন ধনী মহাজন, ছবিগঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নতুন জমিদার উৎপলের এই সকল জনহিতকর কার্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন, শঙ্করের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল। ছবিগঞ্জে কিছুদিন পূর্বে যে নতুন পাঠশালাটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ঘরটিও তিনি দিয়াছেন। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে একটি বালিকা বিদ্যালয় করিবার সহায়তাও তিনি করিবেন।

কলকাতা পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া সে কলকাতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে, বইকি। দশটি পাঠশালা, একটি বালিকা বিদ্যালয়, গোটা দুই দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র চাষীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে নতুন ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছে, পুরাতন কূপগুলির সংস্কার-সাধন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সহজ-প্রতিষেধ্য সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতির জন্যও চেষ্টার ক্রুটি নাই।

এই শেষোক্ত কার্য দুইটির ভার সে নিপুদাকে দিয়াছে। মাস ছয়েক পূর্বে নিপুদা নিজে নিতান্ত

দুরবস্থার সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়া শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল যে, আত্মীয়স্বজন কাহারও সহিত তাহার বনিতেছে না। কাকা-কাকির অনুগ্রহপ্রদত্ত অন্ন এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত উপদেশ আর সে হজম করিতে পারিতেছে না। যে কেরানিগিরি সে কিছুকাল পূর্বে জোগাড় করিয়াছিল, তাহাতে সে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। টিকিয়া থাকিতে পারিলে হয়ত জীবনের শেষে মাসিক পঁচাত্তর টাকার গ্রেডে উন্নীত হইতে পারিত; কিন্তু তাহার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ হীনতা স্বীকার করিতে হইত তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে চাকুরি গিয়াছে। প্রাইভেট টিউশনি করিয়া কিছুদিন চলিয়াছিল, একটি ভাল ছাত্রও জুটিয়াছিল। ছাত্রের অভিভাবকেরাও ভদ্রলোক ছিলেন অর্থাৎ সামান্য কারণে প্রাইভেট টিউটবকে কড়া কথা শুনাইয়া কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। বেতনও ভাল দিতেন। কিন্তু সে চাকরি বেশিদিন রহিল না, কারণ ছাত্রটি একবারেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিয়া ফেলিল। আরও দুই-এক স্থানে টিউশনি জুটিয়াছিল। অভিভাবকদের অভদ্রতা অথবা অতিশয় কম বেতন অথবা ছাত্রের ধৈর্যচ্যুতিকর নিবুর্দ্ধিতা— একটা না একটা কারণের জন্য তাহাকে সে সব ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শূন্য বখরাদার হইয়া অর্থাৎ নিজের পরিশ্রম এবং বুদ্ধি ক্যাপিট্যালস্বরূপ দান করিয়া সে একজন বন্ধুর সহিত ব্যবসায়ে যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে ব্যবসাটি ফেল করিযাছে। এইসব বর্ণনা করিয়া অবশেষে সে লিখিয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দেশে এমন সময়ে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কিছুতেই ভদ্রভাবে এক মুঠো অন্ন জুটিতেছে না, অথচ সে কাজ করিতে প্রস্তুত, তাহার বুদ্ধির অভাব নাই, বিদ্যাও যৎকিঞ্চিৎ আছে। সোবিয়েট রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এমন দুর্দশা নিশ্চয়ই হইত না। সাহিত্য-পথেও সে চেষ্টা কম করে নাই। ইংরেজি বাংলা কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়া সে নামজাদা সম্পাদকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে। কিন্তু কোথাও সেগুলি ছাপা হয় নাই। সর্বত্রই একটা না একটা দল নিজের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কিছুতেই বাহিরের লোককে সেখানে ঢুকিতে দিবে না। যদিও বা অতিকষ্টে কোথাও প্রবেশাধিকার মেলে, প্রবন্ধের ন্যায্য পারিশ্রমিক মিলিবে না। 'মজদুর-দর্পণ' কাগজের এমন আয় নাই যে, বেশি মূল্য দিয়া তাহার প্রবন্ধ কিনিতে পারে। কাকা-কাকির সংস্রব সে ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং এখন হয় অনাহারে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া তাহাকে মরিতে হইবে। শঙ্কর নাকি তাহার এক উদার বন্ধুর অর্থে পল্লী-উন্নয়ন করিতেছে, সে যদি তাহাকে কোনো একটি.. ইত্যাদি।

শঙ্করের সহিত নিপুদা যদিও ভাল ব্যবহার করে নাই, তবু শঙ্কর তাহাকে আহ্বান করিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও স্যানিটেশনের কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। নিজেও সে একদিন অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, এ অবস্থায় দুঃখটা যে কত গভীর ও শোচনীয়, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। যে হিরণদার অনুগ্রহে সে উদ্ধারলাভ করিয়াছিল, সেই হিরণদারই বন্ধু নিপুদা। চক্ষুলজ্জাবশতই শঙ্কর প্রত্যাখান করিতে পারে নাই। উৎপলও আপত্তি করে নাই। কোনোও বিষয়ে সে আপত্তি করে না। সে টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত, শঙ্করকেই সে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ মালিক করিয়া দিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সে কেবল হিসাব-নিকাশ লইবে, কার্য কতদূর অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে শঙ্কর যা ভাল বোঝে করুক, সে কোনো কথা বলিবে না।

বালিকা বিদ্যালয়টির জন্য শঙ্কর কলিকাতা হইতে হাসিকে আনাইয়াছে। সাধারণত সেই সব শিক্ষিতা মহিলারা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীপদে বহাল হন, যাঁহারা কুরূপের জন্য অথবা অর্থাভাবে সমাজে স্বামী সংগ্রহ করিতে পারেন না। হতাশ প্রণয়িনীও মাঝে মাঝে আসিয়া জোটেন। শঙ্করের ধারণা, শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ইঁহারা বঞ্চিত ক্ষুধিত, ইঁহাদের সমস্ত মনপ্রাণ

পড়িয়া থাকে সেই সব ভোগৈশ্বর্যের দিকে যাহা তাঁহারা পান নাই, অথচ যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের বৈরাগ্যও জন্মে নাই। মাতৃত্বই নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি। তাহা লাভ না করিলে চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। তাই হাসিকে সে আনিয়াছে। হাসির শুধু যে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা আছে তাহাই নয়, স্বামী-চরিত্রের বৃহৎ আদর্শের সংস্পর্শে আসাতে সে অভিজ্ঞতা মহত্ত্বপূর্ণ। তাহার নারীমনের অবলম্বনস্বরূপ একটি পুত্রও আছে। হাসি প্রথমে আসিতে চায় নাই। অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে সে আনিয়াছে এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

গরুর গাড়ি চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে চাষের জমি। দূরে দূরে চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া লাঙল চষিতেছে। কত দরিদ্র অথচ কত মহৎ উহারা! উহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া শঙ্কর মনে-প্রাণে ইহাই বুঝিয়াছে যে, মানব-চরিত্রে যেসব গুণকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি, তাহা উহাদের চরিত্রেই প্রচুর পরিমাণে আছে। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের 'চরিত্র' বলিয়া এমন কোনো কিছু নাই, যাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়। যাহা আছে, তাহা স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল একটা হীনধরনের চতুরতা মাত্র। এই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সত্যই বড় দুর্দশাপন্ন। ইহারা ভাল করিয়া ভোগও করিতে পারে না, ত্যাগও করিতে পারে না। ইহারা আর পাঁচজনকে দেখাইয়া ভোগের একটা অভিনয় করে মাত্র, এবং সেই লেফাপা বজায় রাখিবার জন্য আজীবন প্রাণপণ করে। সত্যকার ত্যাগের নাম শুনিলে ইহারা ভয় পায়। তবে ত্যাগের অভিনয় করিয়াও অনেক সময় লেফাপা বজায় রাখিতে হয়, সে রকম ত্যাগ ইহারা করে মাঝে মাঝে। কিন্তু মুখোশ কিছুদিন পরেই খসিয়া যায় এবং তখন ইহাদের কদর্য স্বরূপ দেখিয়া সকলে আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

সহসা তাহার মনে হইল, এই সব লইয়া একটা উপন্যাস লিখিলে কেমন হয়? ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদারে'র মত উপন্যাস সে কি লিখিতে পারে না? না, সময় নাই, তাহার অনেক কাজ। অনেক কাজ সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মন সাহিত্যবিমুখ হয় নাই। সাহিত্যকে সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু, তাহাকে ত্যাগ করিবে কী করিয়া? সময় পাইলে, এমনকি সময় নষ্ট করিয়া এখনও সে সাহিত্যচর্চা করে। ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এখনও সে মাঝে মাঝে লেখে বইকি, সাময়িক পত্রিকাদিতে সেসব প্রকাশিতও হয়। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সঙ্গে অবশ্য এখন তাহার পূর্বের সে সম্বন্ধ নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সে লোকনাথবাবুকে দান করিয়া দিয়াছে। লোকনাথ স্বেচ্ছায় যাচিয়া স্বয়ং সে ভার লইয়াছেন। সে পত্রিকার কাজ এখন-- লোকনাথবাবুরই সাহিত্যিক মতামত লিপিবদ্ধ করা। বাহিরের কোনো লেখকের নিকট তিনি লেখা ভিক্ষা করেন না, বিজ্ঞাপনদাতাগণের মুখ চাহিয়া আত্মমর্যাদা নষ্ট করেন না, কোনো বড়লোকের খাতিরে নিজের সাহিত্যবুদ্ধিকে একচুলও বিচলিত করেন না! তাঁহার সারস্বতসাধনার ত্রিসীমানায় তিনি লক্ষ্মী অথবা লক্ষ্মীর বাহনদের সামান্য ছায়াপাতও সহ্য করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং 'ক্ষত্রিয়' কাগজের চাহিদা নাই। বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত হইয়া স্টলে স্টলে তাহা খরিদ্দারের আশায় মাসে মাসে পথ চাহিয়াও থাকে না। তাহা মাঝে মাঝে বাহির হয়। ঠিক মাসে মাসে নয়, সাহিত্য-রসিকদের নিকট বিনামূল্যে বিতরিত হয়। লোকনাথ ঘোষালের অর্থ-সামর্থ্য কতটা তাহা শঙ্কর ঠিক জানে না। শুধু জানে যে, তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকরা সাধারণত দরিদ্র, লোকনাথবাবু কী করিয়া যে নিজ ব্যয়ে 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইয়া বিতরণ করেন, তাহা ভাবিয়া শঙ্কর বিস্মিত হয়। তাঁহাকে চিঠিতে এ সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেন নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় শঙ্কর এখনও মাঝে মাঝে লেখে, কিন্তু সে লেখা লোকনাথ ঘোষালের অনুমোদন লাভ করিলে তবে প্রকাশিত হয়। বাজে

লেখা লোকনাথ ঘোষাল ছাপে না, শঙ্করের অনেক লেখা তিনি ফেরত দিয়াছেন। লোকনাথ ঘোষালকে শঙ্কর একটি বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তাহার পল্লী উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করিবার জন্যও আমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি নিজের যে মাইনর স্কুলে এতদিন কাটাইয়াছেন, প্রথম যৌবনে চেষ্টা চরিত্র করিয়া যাহা তিনি নিজেই একদিন স্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্কুল ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইবেন না।

'সংস্কারক' পত্রিকাতেও শঙ্কর মাঝে মাঝে লেখে। এ পত্রিকাটিও হস্তান্তরিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আজকাল হীরালাল মজুমদার অথবা নিলয়কুমার নাই, কুমার পলাশকান্তিই বর্তমান স্বত্বাধিকারী। অর্থাৎ অনিল এবং নীরাই বর্তমান 'সংস্কারক' পত্রিকার কর্ণধার। কুমার পলাশকান্তির উপন্যাস, অনিল সান্যালের বৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক সামাজিক প্রবন্ধ এবং নীরার গল্প কবিতাই এখন 'সংস্কারকে'র অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতেছে। নিলয়কুমারের কবিপত্নী রেণুকাদেবীও 'সংস্কারক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই প্রেমের কবিতা লেখেন এবং তাহা 'সংস্কারকে'র প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়। নীরার অনুরোধে শঙ্করও মাঝে মাঝে লেখে।

হীরালাল মজুমদারের 'সংস্কারক' কী করিয়া কুমার পলাশকান্তির হইয়া গেল, সে ইতিহাস বড় করুণ। একদা ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যভাষণের জন্য, সততা ও সাহিত্যিক নিষ্ঠার জন্য 'সংস্কারক' পত্রিকার যে সুনাম ছিল, সেই সুনামের সুবিধা লইয়া ভাগিনেয় নিলয়কুমার বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিতে করিতে পত্রিকাখানিকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিলেন যে তাহার গৌরবময় অগ্রগতি আর সম্ভব ছিল না। ভাল পত্রিকায় ভাল লেখকমাত্রেই লিখিতে চায়। আরও প্রলোভন ছিল 'সংস্কারকে'র বিজ্ঞাপনে লেখা থাকিত— ভাল লেখা সমুচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং রচনানির্বাচনে সাহিত্যিক মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোনো প্রকার মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় না। এই উচ্চাদর্শে উৎসাহিত হইয়া অনেক ভাল লেখক তাঁহাদের রচনা 'সংস্কারক' পত্রিকায় প্রেরণ করিলেন। ক্রমশ কিন্তু এই কথাটাই সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বিজ্ঞাপনে যাহাই লেখা থাক্, লেখার মূল্য সহজে কেহ পাইবেন না এবং লেখার মূল্য লইয়া বেশি কড়াকড়ি করিলে সে লেখা ছাপা হইবে না। ইহাও বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, 'সাহিত্যিক মানদণ্ড'ও বিজ্ঞাপনের বুলি মাত্র, চালিয়াত নিলয়কুমারের স্বকীয় মানদণ্ডই আসল মাপকাঠি এবং সে মাপকাঠির স্থূল কথা— অর্থ, মানে, সেই অর্থ যাহা দিয়া মোটর কেনা যায় অথবা ঋণ শোধ হয়। পত্রিকার কর্মচারীগণ সময়ে বেতন পাইতেন না। শুধু লেখক এবং কর্মচারীগণই নয়, একটা পত্রিকার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্যান্য যেসব ব্যক্তি জড়িত থাকেন, তাঁহারাও 'সংস্কারকে'র সুনামে আস্থা স্থাপন করিয়া শেষ পর্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। কাগজওয়ালা, টাইপ সরবরাহকারী, কালির দোকানদার, ব্লক প্রস্তুতকারক— কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, 'সংস্কারক' পত্রিকার টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাদের আদালত পর্যন্ত ছুটিতে হইবে। হীরালাল মজুমদার সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে গেলে তিনি সত্য কথাই বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছুই দেখতে পারি না, আপনারা নিলয়ের কাছে যান, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। নিলয়ের কাছে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, গিয়াছিলেনও। কিন্তু সাহেবি প্রকৃতির নিলয়কুমারের দেখা পাওয়াই শক্ত তিনি প্রায় সর্বদাই 'নট অ্যাট হোম'। অনেক হাঁটাহাঁটির পর দৈবাৎ তাঁহার দর্শন মিলিলে টাকার পরিবর্তে তিনি তারিখ দিতেন এবং প্রায়ই সে তারিখের মর্যাদা রক্ষা করিতেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলে আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কুমার পলাশকান্তি উদ্ধার না করিলে হয়ত 'সংস্কারক' পত্রিকা অবলুপ্ত হইয়া যাইত। কুমার

পলাশকান্তির এবম্বিধ হিতৈষণা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। যদিও দুষ্টলোকে রটাইয়াছে যে, সাহিত্য-প্রীতিবশত ততটা নহে, যতটা নিলয়কুমারের পত্নী রেণুকার জন্যই তিনি নাকি এই জনহিতকর কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। রেণুকার ন্যায় জনৈকা বিদূষী কবি অর্থাভাবে কষ্ট পাইবেন, তাহা পলাশকান্তির ন্যায় মহাপ্রাণ নাকি সহ্য করিতে অক্ষম। পাওনাদারদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া 'সংস্কারক' পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব কিনিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, হীরালাল মজুমদার এবং নিলয়কুমারকে মাসে মাসে মাসোহারাও দিয়া থাকেন। রেণুকাদেবীর মধ্যে তিনি অসাধারণ কবি প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে নাকি 'পুশ' করিতেছেন।

দেখিয়ে হুজুর।

গাড়োয়ান মুশাই হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল। গাড়িটাও হঠাৎ একটু একপেশে হইয়া পড়িল।

কী?

বয়েলকো বদমাশি।

শঙ্কর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বাঁ ধারের কালো গরুটা জোয়াল খুলিয়া ফেলিয়া রাস্তার পাশ হইতে দুর্বা ছিঁড়িয়া খাইতে শুরু করিয়াছে। ডান ধারের সাদা গরুটা বোকার মত দাঁড়াইয়া আছে।

কহাথা না?

তাই তো।

গরু জোড়া সম্প্রতি কেনা হইয়াছে। মুশাই গাড়োয়ান কয়েকদিন হইতে শঙ্করকে বলিতেছে, যে ইহাদের জোড় ঠিক মিলে নাই। কালো গরুটা বেশি চালাক এবং বেশি পেটুক, সাদাটা কিঞ্চিৎ নির্বোধ এবং স্বল্পাহারী। মুশাইয়ের অভিপ্রায় এবং উপদেশ, কালো গরুটাকে বিক্রয় করিয়া তাহার স্থানে মুশাইয়ের বাদামি রঙের গরুটাকে নিযুক্ত করা। কারণ মুশাইয়ের মতে তাহার এই বাদামি গরুটির স্বভাবও উক্ত সাদা গরুটিরই অনুরূপ; বেশি চালাকি নাই এবং খুব কম খায়। বাবু যদি অনুমতি করেন, মুশাই বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহার জোড়াটা মরিয়া গিয়াছে, একটা গরু লইয়া সে আর কী করিবে, তাহা ছাড়া তাহার ক্ষেত এখন চষিবেই বা কে, ছেলেটা তো কলে চাকরি লইয়া চলিয়া গেল, গরুটা বেচিয়াই ফেলিতে হইবে। হাটে লইয়া গেলে ভাল দামেই সে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বাবু যদি কেনেন, তাহা হইলে সে— ইত্যাদি।

বেচ দিজিয়ে শালেকো।

কালো গরুটাকে জোয়ালে বাঁধিতে বাঁধিতে মুশাই পুনরায় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিল।

এখন তাড়াতাড়ি নে, ছবিগঞ্জে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে দেখছি। অনেক কাজ সেখানে আমার।

হো গিয়া।

গরুটাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া মুশাই তড়াক করিয়া স্বস্থানে উঠিয়া বসিল এবং দ্রুতবেগে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। শঙ্কর মুশাইয়ের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দিয়া তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ফ্যাক্টরিতে তাহার পুত্র বিযুনের চাকরি করিয়া দিয়াছে; তবু তাহার অভাব মেটে না। তাহার এই গো-চরিত্র বিশ্লেষণের মূলে যে অর্থাভাব, তাহা শঙ্করের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, কেন, এত অভাব কেন, ইহাদের? আর কী করিলে ইহাদের দুঃখ দূর হয়?

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা হীরাপুর গ্রামে ঢুকিল।

হীরাপুরে নিমাই ঘটক থাকে। হীরাপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত সে।

গ্রামেরই ছেলে, আই. এ. ফেল করিয়া বসিয়াছিল, শঙ্কর তাহাকে স্কুলের হেডপণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। হেডপণ্ডিতি করবার যোগ্যতা ছেলেটির নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ঠিক ওই জন্যই যে শঙ্কর তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে তাহা নয়, আসল কারণ, শঙ্কর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আকর্ষণের প্রধান কারণ রূপ। রূপ জিনিসটার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে, স্ত্রী-পুরুষ ফল-পুষ্প জন্তু-জানোয়ার আকাশ-সমুদ্র যেখানেই তাহার আবির্ভাব ঘটুক না, তাহা মানুষকে মুগ্ধ করে। রূপ দেখিয়াই শঙ্কর প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পর আরও মুগ্ধ হইয়াছে তাহার সাহিত্য প্রীতি এবং সাহিত্য বিষয়ে চিন্তার অভিনবত্ব দেখিয়া। শঙ্কর আজকাল যাহা কিছু লেখে, তাহা সর্বাগ্রে নিমাই ঘটকের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার অভিমত গ্রাহ্য করে। নিমাই '.৮৯ সাহিত্যস্রষ্টা নয় বটে, কিন্তু উঁচুদরের রসিক সমঝদার— অন্তত শঙ্করের তাহাই বিশ্বাস।

হীরাপুর গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্করের মনে পড়িল, তাহার 'জাতীয় সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটা ঘটকের কাছে অনেকদিন পড়িয়া আছে। প্রবন্ধটি লিখিবার অব্যবহিত পরেই ঘটকের সহিত দেখা হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি পড়িবে বলিয়া লইয়া গিয়াছিল, এখনও ফেরত দেয় নাই। যদিও ছবিগঞ্জে তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন, তবু সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল। প্রবন্ধটি নিমাই ঘটকের কেমন লাগিযাছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে সাহিত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সাহিত্য তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনের প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে যে ভাবনা তাহার অন্তরতম সত্তাকে আচ্ছন্ন করিযা রহিয়াছে, তাহা সাহিত্য ভাবনা। ওই ভাবনাই সে সর্বদা করিতেছে, উহা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনায় তাহার সুখ নাই। ইহার জন্য তাহার কর্তব্যকর্মে ত্রুটি ঘটিতেছে ইহা সে বোঝে। সেবার যে কাঁটাপোখর গ্রামের স্কুলটা গবর্নমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইল না, তাহার কারণ সে সময়মত স্কুল ইনস্পেক্টরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তোয়াজ করিতে পারে নাই। দেখা করিতে না পারার কারণ, সে তখন প্রকাণ্ড একটা কবিতা লইয়া এমন তন্ময় হইয়া ছিল যে, ইনস্পেক্টরের কথা তাহার মনে ছিল না। অনুরূপ ঘটনা আরও কতবার ঘটিয়াছে। আজও ছবিগঞ্জে যাইবার পথে সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল।

নিমাই ঘটক বাড়িতেই ছিল।

স্মিতহাস্যে নিমাই তাহাকে সম্বর্ধনা করিল। নিমাইয়ের দোহারা চেহারা, বর্ণ যে খুব টকটকে ফর্সা তাহা নয়. কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চোখ-মুখের গড়নে, মৃদু হাস্যে এমন একটা রূপ আছে, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। নিমাইয়েব একমাত্র পার্থিব বন্ধন ছিলেন মা, তিনি বছরখানেক পূর্বে মারা গিয়াছেন। এখন নিমাই একা। নিজেই রাঁধিয়া খায়, ঘরে একটি গাই আছে, সেটির পরিচর্যা করে, নিজের কাজকর্ম নিজেই করিয়া লয়। তাহার খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরটি বেশ পরিষ্কার করিয়া নিকানো, তকতকে ঝকঝকে। কোঁচার খুটটি গায়ে দিয়া নিমাই বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া ছিল, শঙ্করের গাড়ি থামিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আসুন, স্কুল আজ বন্ধ।

স্কুল দেখতে আসিনি, তোমার কাছে এসেছি।

নিমাই তাড়াতাড়ি একটি কম্বলের আসন বিছাইয়া দিল। শঙ্কর উপবেশন করিরা চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল নিমাইয়ের মত নিমাইয়ের ঘরটিরও বেশ একটি নিরাভরণ সৌন্দর্য আছে। চমকপ্রদ নয়, কিন্তু দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একটি অতি সাধারণ চৌকি এবং বই রাখিবার শেল্‌ফ ছাড়া ঘরে অন্য কোনো প্রকার আসবাব নাই, তাহার সামান্য কাপড় জামা দড়ির আলনাতে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। শেল্‌ফগুলি কেরোসিন কাঠের, প্রত্যেকটিতে বই ঠাসা,

প্রত্যেকটি বই মলাট দেওয়া।

ছবিগঞ্জে মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি যাচ্ছি। ভাবলাম, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি, একবার দেখে যাই। একটু স্বার্থও যে নেই তা নয়, আমার সেই প্রবন্ধটা—

হ্যাঁ, আমার পড়া হয়ে গেছে।

উঠিয়া একটি খাতার ভিতর হইতে একটি লম্বা খাম বাহির করিল এবং খামের ভিতর হইতে প্রবন্ধটি বাহির করিয়া শঙ্করকে দিল। বেশ যত্নসহকারেই প্রবন্ধটি রাখিয়াছিল, বোঝা গেল।

কোনো বক্তব্য আছে এ সম্বন্ধে?

আমার বেশ ভালই লেগেছে। তবে—

স্মিতমুখে নিমাই চুপ করিয়া গেল।

তবে কী?

কেবল একটু, মানে—

অত ইতস্তত করবার দরকার কী বলেই ফেল না।

সাহিত্যের পূর্বে কোনোরকম বিশেষণ বসাতে আমার যেন কেমন একটু লাগে। এমন কি জাতীয় স্বদেশি— এই সব বিশেষণও।

প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে যখন এক-একটি করে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তখন অস্বীকার করি কি করে বল?

আমার অবশ্য বেশি বিদ্যে নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রত্যেক সাহিত্যেরই আসল বৈশিষ্ট্য— তা চিরন্তন মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহৃদয় আলোচনা, কোনো বিশেষ দেশের মানুষের নয়।

তা ঠিকই। ঠিকই বলেছ তুমি! কিন্তু প্রত্যেক দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূলত এক হলেও বাইরে সে সবের প্রকাশ দেশে দেশে একটু ভিন্ন নয়? এই যেমন ধর, আমাদের দেশের একজন নারী আর পাশ্চাত্ত্য দেশের একজন নারী। উভয়েই নারী বটে কিন্তু একজনের কালো রূপ, মাথায় খোঁপা, পায়ে আলতা, পরনে শাড়ি, নাকে নাকছাবি, মুখে পান, চোখের কালো তারায় সভয় সলজ্জ দৃষ্টি, আর একজনের ধপধপে সাদা রঙ, মাথার চুল ছাঁটা, পায়ে জুতো, পরনে স্কার্ট, নাকে পাউডারের গুঁড়ো, ঠোঁটে লিপস্টিক, চোখের নীল তারায় নির্ভয় কৌতূহল দৃষ্টি। দু'জনেরই মন বিশ্লেষণ করলে উভয় ক্ষেত্রেই হয়ত চিরন্তনী নারীকে দেখা যাবে, কিন্তু দু'জনের বাইরের রূপ আলাদা। সাহিত্যেরও তেমনই একটি বাইরের রূপ আছে। তা ছাড়া, যে মানুষ সাহিত্যের প্রধান উপাদান, সেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ সব দেশে সমান নয়, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার রূপ নানা দেশে নানা রকম, তাই—

আপনি বাংলা জাতীয় সাহিত্যের এমন কি রূপ দেখতে পেয়েছেন, যা অন্য দেশের সাহিত্যে নেই? আপনি মধুর রসের কথা বলেছেন, তা কি অন্য সাহিত্যে বিরল?

মধুর রস আমাদের সাহিত্যের বিশেষ রস। ওইটেই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা বীররস চাই না, অদ্ভুত রস চাই না, বীভৎস রস চাই না— যদি মধুর রসও তার সঙ্গে সঙ্গে না থাকে। ওই মধুর রসটাই আমরা ভালবাসি। বৈষ্ণব ধর্মে যে মাধুর্য একদিন আপামর ভদ্র সকলের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাই এখনও আমাদের সাহিত্যের মূল সুর। শুধু রাধা-কৃষ্ণ নয়, যশোদা-গোপাল, সুবল-কানাই, বৃন্দা-চন্দ্রাবলী, এমন কী জটিলা-কুটিলা-আয়ান ঘোষও আমাদের প্রিয় মানবপ্রেমের নানা রস রূপের সাধনাতেই আমরা তন্ময়। ও ছাড়া আমরা আর

কিছুতেই আনন্দ পাই না। কালীর মতন ভীষণাও আমাদের আদরে আবদারে বিগলিতা, মহাদেবের মতন সন্ন্যাসীকেও আমরা জামাই সাজিয়েছি, দুর্গার যে রূপে আমরা মুগ্ধ তা তাঁর মহিষমর্দিনী রূপ নয়, তা তাঁর কন্যা রূপ। দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে। মধুর রস-সমুদ্রেই সোনার তরী ভাসিয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি, রাবণকে রিয়ালিস্টিক রাক্ষস-রূপ দিলে মাইকেলের কাব্য এতটা আদর পেত কি না সন্দেহ। রাবণ শুধু যে মানুষ তা নয়, সে রীতিমত বাঙালি—

নিমাই হাসিয়া বলিল, কিন্তু এত সব উদাহরণ আপনার প্রবন্ধে দেননি—

উদাহরণ না দিলেও যা বলেছি, তাতে—। আচ্ছা, উদাহরণ দিয়ে দেব— বড় হয়ে যাবে বলে দিইনি।

সহসা এই রস-আলোচনার মাঝে একটা বেসুর বাজিল। মলিন বসন পরিহিত জীর্ণ-শীর্ণ একটা লোক আসিয়া শঙ্করকে সেলাম করে দাঁড়াইল।

এ আবার কে?

নিমাই ঘটক চিনিল। গ্রামেরই একজন কৃষক। উহাদের পল্লীতে শঙ্করের ব্যবস্থাতেই কিছুদিন পূর্বে একটি ইঁদারা প্রস্তুত করান হইয়াছিল; কিন্তু ইঁদারাটি ইহারই মধ্যে অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে, পুনরায় সংস্কার করা প্রয়োজন।

কতদিন আগে ইঁদারা হয়েছিল?

মাস ছয়েক আগে।

পাকা ইঁদারা?

হাঁ।

ছমাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল কী করে? হয়েছে কী?

বাঁধানো পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়ে যাচ্ছে।

এ রকম হবার মানে?

মানে যে কী, তাহা নিমাই ঘটক জানিত, কিন্তু সে কিছু বলিল না। সে নির্বিবাদী লোক, কাহারও নামে লাগানো তাহার স্বভাব নয়। সে চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র চাষাও সভয়ে করজোড়ে চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করব। মাটির পাড় দিয়েই বাঁধিয়ে দেওয়া যাবে আপাতত। তোমরা কিছু চাঁদা তুলতে পার যদি, ভাল হয়। আমরা তো একবার করে দিয়েছি, মেরামতটা অন্তত তোমাদের নিজেদের করা উচিত। আরও কয়েক জায়গা থেকে ইঁদারা ভাঙার খবর এসেছে, আমরা আর কত করি, বল?

চাষা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বাঙালি না হইলেও বাংলা বোঝে। পুরুষানুক্রমে হাতজোড় করিয়া থাকাই তাহাদের অভ্যাস। বহু কটূক্তি, বহু উপহাস, বহু প্রহার, বহু অত্যাচার সত্ত্বেও তাহারা হাতজোড় করিয়া থাকে। উহা করা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় তাহাদের নাই।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা যাও তুমি, আমি ব্যবস্থা করব।

খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। শঙ্কর পকেট হইতে ডায়েরি বাহির করিয়া ইঁদারার কথাটা লিখিয়া লইল।

ইহার পর রস সাহিত্যের আলোচনা আর জমিল না।

শঙ্কর উঠিবার উপক্রম করিল।

আমাকে এক গ্লাস জল দাও দিকি, খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।

নিমাই উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ছোট একখানি চকচকে কাঁসার রেকাবিতে চারটি গুড়ের বাতাসা ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিল।

এ আবার কেন?

ঈষৎ হাসিয়া নিমাই বলিল, কুন্তলাদি বলেছেন, শুধু জল কাউকে দিতে নেই।

কুন্তলাদিদিটি কে?

আমাদের হরিদার স্ত্রী। কুন্তলাদির কথা শোনেননি?

খুব শুনেছি। তাঁর শিষ্য হয়েছ নাকি?

স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, শিষ্য না হয়ে উপায় নেই। বড় ভাল লাগে তাঁকে, সত্যিই ভক্তি হয়।

কেন, কী দেখলে তাঁর মধ্যে?

তিনি সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ., অথচ তাঁর জীবন এত সরল অনাড়ম্বর যে এমন আর আমি দেখিনি, কল্পনাও করিনি।

উৎপলের স্ত্রী সুরমাও খুব সরল অনাড়ম্বর, সেও লেখাপড়া কিছু কম জানে না।

তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, তাঁর কথা ছেড়ে দিন।

কেন, বড়লোক বলে অপরাধটা কী হল?

অপরাধ নয়। বড়লোকের পক্ষে অহমিকাটা ত্যাগ করা সহজ. কিন্তু দরিদ্রের অহমিকা ত্যাগ করা সত্যিই বড় শক্ত। কারণ ওইটুকু অবলম্বন করেই দরিদ্রেরা মাথা উঁচু করে থাকে। আমার মনে হয়, কুন্তলাদির সেইটুকুও বোধ হয় নেই। অথচ তাঁর যা গুণ, তাতে অহঙ্কারী হলে বেমানান হত না।

কী গুণ? এম এ. ডিগ্রিটা?

তা তো আছেই। কিন্তু ডিগ্রি সত্ত্বেও তিনি সংসারের সব কাজ হাসিমুখে করেন— রাঁধেন. বাসন মাজেন, বড়ি দেন, চরকা কাটেন, পিসিমার সেবা করেন, আবার ওর মধ্যে একটু লেখাপড়াও করেন।

তা যদি হয়, তা হলে তো—

সত্যিই অদ্ভুত। আলাপ নেই আপনার সঙ্গে?

আলাপ করতে সাহস করিনি।

নিমাই আবার খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চলুন একদিন আমার সঙ্গে। তাঁর পর্দা নেই, আর হরিদাকে তো চেনেনই।

আচ্ছা, পরে দেখা যাবে, এখন চলি।

শঙ্কর আর দেরি করিল না, ছবিগঞ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

তিন

ছবিগঞ্জের মুকুন্দ পোদ্দার একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন। বেশ বিস্তৃত তেজারতি কারবার আছে। দরিদ্র বিপন্ন চাষীদের চড়া সুদে টাকা দেওয়াই তাঁহার ব্যবসা। উৎপল ও শঙ্করের এই সব জনহিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার সহানুভূতি না থাকিবারই কথা, কিন্তু বাহির হইতে মনে হয়, তিনি যেন এসব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মনোভাবটি— সম্ভবত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই— তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে

ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। মুখে তিনি অতিবিনয়ী। শঙ্করের সহিত দেখা হইবামাত্র গদগদ স্বাগত-সম্ভাষণের আতিশয্যে তাহাকে অস্থির করিয়া তোলেন কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যাহা ব্যক্ত করে, তাহা মোটেই সম্মানজ্ঞাপক নহে। সে দৃষ্টিকে ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়: থাম্ ব্যাটা, তোকে দেখাচ্ছি! দেশ উদ্ধার করতে এসেছেন, ইস্, ভারি আমার লায়েক!

যদি ইহাই মুকুন্দ পোদ্দারের মনের কথা হয়, তাহা হইলে বাহিরের আচরণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায় এ কথা যাঁহারা ভাবিবেন তাঁহারা মুকুন্দ পোদ্দার জাতীয় লোকদের সম্যকরূপে চেনেন না। চিনিলে ইহা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিত না যে, ইহাদের মনের কথার সহিত বাহিরের আচরণের প্রায়ই গরমিল থাকে। শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য সৎ অসৎ কোনো প্রকার কার্য করিতেই ইঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এ ক্ষেত্রে মুকুন্দ পোদ্দারের মনোভাব অনেকটা এই রকম— ও, তোমরা মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া আমাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিবে ভাবিয়াছ। দেখা যাক্, কে কাহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে। টাকা আমারও কিছু কম নাই। টাকা দিয়া স্কুল পাঠশালা আমিও করিয়া দিব। তোমরাই যে উদারতার অভিনয় করিয়া সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করিবে— আর আমি পিছনে পড়িয়া থাকিব, তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। দেখাই যাক না, তোমাদের দৌড়টা কতদূর।

মুকুন্দ পোদ্দার নাতিস্থূল পুষ্টকান্তি ব্যক্তি। বেশ কুচকুচে কালো রঙ, মাথায় এককালে ঢেউ-খেলানো অ্যালবার্ট টেরি ছিল, এখন টাক পড়িয়াছে। গলায় সোনার হার, বাহুমূলে সোনার তাবিজ, অনামিকায় নীলা বসানো সোনার আংটি, এমন কি সামনের কয়েকটি দাঁতেও সোনা লাগানো।

শঙ্কর যখন ছবিগঞ্জে পৌঁছিল, তখন প্রায় অপরাহ্ন। মুকুন্দ তাকিয়া ঠেস দিয়া নিত্যসঙ্গী কাঠের বাক্সটির নিকট বসিয়া ছিলেন। শঙ্করকে দেখিবামাত্র সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করিলেন।

আসুন দেবতা আসুন আসুন, সকাল থেকে আপনার কথাই ভাবছি বসে বসে। ওরে, গোবরাকে খবর দে— বল্, বাবু এসেছেন, চা-টা আনুক।

আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

এমন আর কী দেরি হয়েছে দেবতা! আপনারা পাঁচ কাজের মানুষ, আমাদের মত নিষ্কর্মা তো নন— হে হে হে হে— পাঁচ জায়গায় ঘুরতে গেলে দেরি একটু-আধটু হয়েই থাকে।

মুকুন্দর দৃষ্টিতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, মুখে বিনীত হাস্য।

আপনাদের পাঠশালা কেমন চলছে, বলুন?

চলছে। ভালই চলছে— বলতে হবে, গতকাল গুটি দশেক ছাত্তর জুটেছিল, না হে ভজহরি?

পাশের ঘর হইতে ভজহরি উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ তা জুটেছিল।

মাত্র দশজন?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

এতেই অবাক হচ্ছেন দেবতা। আমার বিবেচনায় ওই দশজনই যথেষ্ট আপাতক— ওই শেষ পর্যন্ত টেকে কি না দেখুন।

এখানে এত কম ছেলে হবার কারণ কী, অন্য অন্য গ্রামে তো এত কম হয়নি?

এটা যে চাষার গ্রাম দেবতা, এ বেটা ছাতুখোর চাষারা লেখাপড়ার মর্ম কী বুঝবে বলুন? বলে কী জানেন? বলে যে, ছেলেকে যদি পাঠশালায় পাঠাই, তা হলে আমাদের গরু চরাবে কে? এই যাদের মতিগতি, তাদের আর কতদূর কী হবে বলুন?

মুকুন্দ পোদ্দারের মুখে হাসি এবং চোখে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল।

তবু চেষ্টা করতে হবে বইকি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই— চেষ্টা করব বইকি— চেষ্টা তো করছিই! নাইট স্কুল খোলবার ঘর সব সাফ সুতরো করিয়ে রেখেছি। মাস্টারের জন্যে একটা মোড়া, ছাত্তরদের জন্যে মাদুর শতরঞ্জি— সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। কথা দিয়েছি যখন, তখন সে কথার নড়চড় করব না। আসুন না, দেখবেন।

এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কথাবার্তায় বাধা পড়িয়া গেল। পিছনের বারান্দায় কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিল। শোনা গেল, আরে মোলো, রোতা কাহে?

কাঁদছে নাকি মাগী? এতো আচ্ছা এক ফৈজত হল দেখছি!

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া মুকুন্দ বলিলেন, গরিব চাষাদের উদ্ধার করবার জন্যে আপনারা ব্যাঙ্ক খুললেন, কিন্তু এ ব্যাটারা আমাদের পাছ ছাড়বে না। আমাদের সুদ বেশি, সোনা রূপা বন্ধকী না রেখে আমরা ধার দিই না, তবু আমাদের ছাড়বে না। ওদের যত বুঝিয়ে বলি— তুম লোগকা উদ্ধারকা বাস্তে উৎপলবাবু ব্যাঙ্ক খুলা হ্যায়, হুঁয়াই যাও। কিছুতে যাবে না।

মুকুন্দ পোদ্দারের চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুনের হল্কা ছুটতে লাগিল।

যায় না কেন?

যাবে কী করে? আপনারা তো জমিজরাত না থাকলে টাকা দেবেন না। এ মাগীর না আছে জমি, না আছে জরাত। জন খেটে খায়।

স্বামী নেই?

স্বামীটিকে পূর্বেই খেয়েছেন। সেদিকে সৌভাগ্যবতী। একটি কাঠ-ব্যাটা ছিল, তিনি বিয়ে করে বউ নিয়ে সরেছেন শহরে।

কাঠ-ব্যাটা কী?

সৎছেলে। এতদিন এ দেশে আছেন, কাঠ-ব্যাটা কাকে বলে জানেন না, অথচ আপনারা এ দেশ উদ্ধার করতে চান!

শঙ্কর একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মনের কথা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে মুকুন্দও ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি পাকা লোক, তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনারা তো সেদিন এসেছেন, আপনাদের আর কী দোষ দোব! আমি সারা জীবনটাই এ অঞ্চলে কাটালাম, 'খাবুনি' কাকে বলে আমিই জানতাম না। সেদিন শিখলাম ভজহরির কাছে। ছট পরবের সময় ওরা ময়দা আর চালের গুঁড়ি দিয়ে 'ঠেকুয়া' তৈরি করে, তাকে বলে 'খাবুনি'! জানতেন?

শঙ্করকে স্বীকার করতে হইল যে, সে জানিত না। ভজহরি আবার পাশের ঘরে রোরুদ্যমানা রমণীটিকে সান্ত্বনা দিল, রোও মৎ, রোকে কি হোগা? জেবর জোগাড় কর, তব রুপিয়া মিলেগা।

জেবর কথাটা শঙ্কর জানিত, জেবর মানে গহনা। জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্য ও টাকা চায়?

একটা ন্যাংনেওে ছেলে আছে, তার বিয়ে দেবে। সেইজন্যে হাঁসুলিটি বাঁধা দিয়ে টাকা নেওয়ার জন্যে দমাদ্দমি করছে। এদের উদ্ধার করা কি সহজ আপনি ভেবেছেন? হারামজাদিরা বিয়ে দেওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হয় কেন তাও তো বুঝি না। বিয়ে দিলেই তো ছেলে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ওর কাঠ-ব্যাটা বেশ ছিল এতদিন, আমারই এখানে খাটত-খুটত। যেই গওনা করে বউটি নিয়ে এসেছে— বাস্, অমনই উধাও। গওনা মানে বোঝেন তো? দ্বিরাগমন। হাঁসুলিটা

ওজন করে দেখেছ ভজহরি?

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, বিশ ভরি সাড়ে ন' আনা।

গোটা দশেক টাকার বেশি দেওয়া যায় না। মাসে টাকা পিছু দু'আনা করে সুদ দিতে হবে।

ভজহরি বলিল, সুদ দিতে ও রাজি আছে, কিন্তু কুড়িটা টাকা চায়।

চাইলেই কি দেওয়া যায়? আমার পোষানো চাই তো!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুকুন্দ বলিলেন, টাকায় তিন আনা করে সুদ দিতে রাজি আছে?

আছে।

তা হলে দাও। কিন্তু তিন মাস যদি সুদ না দেয়, তা হলে হাঁসুলি আর ফেরত পাবে না। বাকি টাকাটা খেটে শোধ করতে হবে। রাজি যদি হয় দাও— ছাড়বে না যখন। উপায় কি?

বুঝা?

ভজহরি তাহার নিজস্ব হিন্দিতে মেয়েটিকে মুকুন্দর প্রস্তাব বুঝাইতে শুরু করিল।

মুকুন্দ বলিল, চলুন। আমরা ততক্ষণ ঘরটা দেখে আসি। একটা লণ্ঠন দরকার হবে, সেটা এখনও জোগাড় হয়ে ওঠেনি। আপাতক্ তেলের ডিব্‌রিই জ্বলুক একটা— অ্যাঁ, কি বলেন আপনি?

লণ্ঠন আমি কালই পাঠিয়ে দেব।

মহত্ত্ব-দ্বন্দ্বে পরাজিত হওয়ার লোক মুকুন্দ নন।

পাঠিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। এতই যখন করতে পেরেছি, একটা লণ্ঠনও দিতে পারব! ও ভজহরি, লণ্ঠন একটা চাই, বুঝলে।

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল, যে আজ্ঞে।

উভয়ে উঠিয়া নৈশ বিদ্যালয়ের ঘরটি দেখিতে গেলেন।

চার

কয়েক দিন পরে শঙ্কর মুরারিপুর নামে আর এক গ্রাম হইতে ফিরিতেছিল। সেখানে শঙ্করের স্থাপিত ডিসপেনসারির নতুন ডাক্তারবাবুটির সহিত স্থানীয় কয়েকজন বেহারির মনোমালিন্য হইয়াছিল! বেহারিদের ইচ্ছা ছিল, একজন বেহারিই নিযুক্ত করা। বাঙালি ডাক্তারবাবুটির সহিত নানা ছুতায় তাই তাহারা কলহ করিতেছে। ডাক্তারবাবুটিও কলহপ্রবণ এবং রোগীদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত সুতরাং কিছুতেই নিজেকে তাহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। মুরারিপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছে। শঙ্কর তাহারই তদন্ত করিতে গিয়াছিল। সাময়িকভাবে মিটমাট হইয়া গেল বটে। আসল সমস্যার সমাধান হইল না।

... রাত্রি হইয়াছে! শুক্লা অষ্টমীর চন্দ্র পশ্চিমদিগন্তে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছে দুই-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রও জ্বলিতেছে। চক্রবালরেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মত দেখাইতেছে, মেঠো সুরে কোথায় যেন একটা বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে। মুশাই নীরবে গাড়ি হাঁকাইতেছে। শঙ্কর ভাবিতেছে।

ভাবিতেছে, এই বেহারে তাঁহার এবং উৎপলের বাবা বহুকাল পূর্বে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। বেহারই তাঁহাদের জন্মভূমি এবং তাহারও নানা দেশ ঘুরিয়া অবশেষে বেহারে

আসিয়াই পুনরায় নিজেদের জীবন আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কি বাংলা দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত ছিল? অনেক হিতৈষী তাহাকে এবং উৎপলকে উপদেশ দিয়াছিলেন, দেশের উপকার করিতে হইলে বাংলা দেশের উপকার কর গিয়া। এ দেশে জনহিতকর কিছু করা ভস্মে ঘি ঢালার মতই নিরর্থক। বেহারের প্রতি শহরে শহরে, প্রতি গ্রামে গ্রামে খোঁজ করিয়া দেখ, যেখানেই বাঙালি গিয়াছে, সেখানেই তাহারা কিছু না কিছু জনহিতকর কার্য করিয়াছে। কিন্তু বেহারিরা কি তজন্য বাঙালিদের প্রতি কৃতজ্ঞ? মোটেই না। 'বাঙালি-বেহারি ফিলিং' নামক বিষটি ক্রমশ উগ্রতর হইয়া বরং প্রবাসী বাঙালিদের জীবন দিন দিন দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতে আরও তুলিবে। সুতরাং এখানে নতুন করিয়া জীবন পত্তন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শঙ্কর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-বেহারি, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য প্রভৃতি নানা বিভাগে জাতিকে বিভক্ত করিয়া খণ্ড-কলহ করিলে আমাদের কোনো দিনই মঙ্গল নাই। যাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে প্রাণে বুঝিয়াছি তাহাকে কেন প্রশ্রয় দিব? বেহারে বাঙালি-বেহারি 'ফিলিং' আছে বলিয়াই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির কর্তব্য সেই ফিলিং-সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা। তল্পি-তলপা গুটাইয়া প্রস্থান করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না, কাপুরুষতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। প্রতিশোধ বাসনায় যদি বঙ্গদেশ হইতে বেহারি বিদূরিত করিবার আন্দোলন করা যায়, তাহাতে এই 'ফিলিং' বৃদ্ধিই পাইবে, কমিবে না। ভাবিয়া দেখা উচিত, কি করিয়া এই 'ফিলিং' দূর করা যায়। ইহার উত্তর, ভালবাসিয়া। তুমি যদি সত্যই ইহাদের ভালবাসিতে পার, তাহা হইলে 'এ ফিলিং' আর থাকিবে না। উপকার করিলেই লোক কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবে। ইহা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ বটে কিন্তু মানুষ সব সময় নীতিশাস্ত্র মানিয়া চলে না। সে মানিয়া চলে নিজের হৃদয়কে। সেই হৃদয় যদি জয় করিতে পার, তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে। হৃদয় জয় করিবার মন্ত্র ধর্মনীতি নহে, রাজনীতি নহে, ভালবাসা। এই 'ফিলিং' প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বিবেচ্য। এই ফিলিং কাহাদের মধ্যে? চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাহারাই এই বিষ চতুর্দিকে ছড়াইতেছে। আমরা বাঙালিরা, যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা কেহ চাকরি করিব না, তাহা হইলে বোধ হয় আপাতত অবিলম্বে এ সমস্যার মূল ছিন্ন হয়। চাকরি জীবিকা অর্জনের একটা উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়, প্রশস্ত উপায় তো নয়ই। মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, সিন্ধি, কচ্ছি, গুজরাটি— ইহারা তো নানা প্রদেশে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছে। বেহারি-মাড়োয়ারি অথবা বেহারি-কচ্ছি 'ফিলিং' তো কোথাও হয় নাই। চাকর হইবার জন্য সে সব তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালি-বেহারি রাজদরবারে ভিড় করে, এই ফিলিং তাহাদের মধ্যে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, চাকুরি না করিলে বাঙালির ছেলে করিবে কী? চাকরি ছাড়া আর কোন্ কর্ম করিবার তাহারা উপযুক্ত? তাহা ছাড়া, অন্যায়ভাবে (এমনকি কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় বিশেষ করিয়া) তাহারা চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইবে কেন? চাকরির সপক্ষে তাঁহাদের আরও যুক্তি আছে। তাঁহারা মনে করেন, চাকরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না এবং ক্রমশ নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে। এমন কী তাঁহারা এ আশঙ্কাও করেন যে আমাদের সাহিত্য, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, সংস্কার নাকি সমস্তই বিনষ্ট হইবে, যদি আমাদের চাকরি না থাকে।

বাঙালি-সন্তান চাকরি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার কাজ করিতে অপারগ, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা হয় এবং সম্ভবত সে কথা সত্যও নহে। জীবিকা অর্জনের ভিন্ন পন্থায় এখনও তাহারা চলিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সে সব পথে চলিবার জন্য যে ধরনের চরিত্র প্রয়োজন

বর্তমানে হয়ত তাহাদের সে চরিত্র নাই। কিন্তু সেজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। কেরানিগিরির করিবার মত চরিত্রও যে বাঙালির ছিল না, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ মিলিবে। সাধনার দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট কেরানি হইবার যোগত্যা লাভ করিয়াছে। সাধনা করিলে আবার তাহারাই উৎকৃষ্ট বণিক অথবা চাষী হইবে, তাহাতে সন্দেহ কী! বণিক অথবা চাষীর কাজ যে ঘৃণ্য নয় বরং দাসত্ব অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক, এই সুস্থ মনোবৃত্তি শুধু ছেলেদের নয় ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যেও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যস্ত হইলে চলিবে না, হয়ত দুই এক পুরুষকেই এজন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ইহাই একমাত্র সদুপায়। বাঙালির ছেলে চাকরি ছাড়া আর কিছু করিতে পারিবে না অতএব চাকরি লাভ করিবার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা সহ্য কর, সকলের সঙ্গে কলহ কর, নানাপ্রকার জাল জুয়াচুরির আশ্রয় লও— এ মনোভাব মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাঙালির ছেলে অন্যায়ভাবে চাকরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে? সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পার, কিন্তু চাকরি ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইবার অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করিতে অক্ষম— একথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হও। বরং অন্য ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের সামর্থ্য যদি তোমার থাকে, তাহা হইলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের আন্দোলন সফল হইবার আশা আছে। হীনমনোবৃত্তি চাকরের কোনো আন্দোলনকেই কেহ কখনও গ্রাহ্য করে না। যাঁহারা এই অন্যায়কে মূলধন করিয়া আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছেন, তাঁহারা শক্তিকেই খাতির করেন, অন্য কিছুকে নয়। সুতরাং স্বদেশবাসীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া শক্তিসংগ্রহে মন দাও। হয়ত স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথেও ভবিষ্যতে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সে বিঘ্নও শক্তির সহায়তাতেই উৎপাটন করিতে হইবে। কিন্তু সে সব দূর ভবিষ্যতের কথা। এখন আমদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করা। পারতপক্ষে চাকরি আমরা করিব না--- এই প্রতিজ্ঞা করিলে স্বতঃই শক্তি আসিবে। এই সুস্থ সবল মনোভাবই আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। যাঁহারা মনে করেন যে চাকরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আজকাল সমাজে অর্থেরই প্রতিপত্তি, চাকুরেদের নয়। যে কালচার লোপ হইবার ভয়ে তাঁহারা অস্থির, সেই সোফা-সেট মোটর-রেডিও-সমন্বিত পোশাক পরিচ্ছদ-সর্বস্ব ঝুটা কালচার আমাদের কালচার নয়। ওই বিদেশি বস্তু সত্যই যদি লোপ পায়, তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। ওই বাহ্যিক কালচার আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াই আমরা আমাদের আন্তরিক কালচার হারাইয়া বসিয়াছি। আতিথেয়তা, দয়া, উদারতা, আন্তরিকতা, বিনয়, শিক্ষা, সাধনা, গুণের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিকতা প্রভৃতি যে সব মহৎ গুণাবলী আমাদের ভারতীয় কালচারের অঙ্গ, তাহা কি এই চাকরিপ্রার্থী অথবা চাকরিজীবি সম্প্রদায়ের আছে? স্বার্থ ছাড়া আর কী বোঝেন তাঁহারা? তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ৭৪ বলিয়া সকলেই স্বার্থপর। যাঁহারা চাকরি করেন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা অধীনতা-দুষ্ট বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। আমাদের চাকরি না থাকিলে আমাদের সাহিত্য পর্যন্ত নষ্ট হইবে, এমন আশঙ্কাও অনেকে করেন। সাহিত্য প্রতিভাবান গুণীদের সৃষ্টি। প্রতিভাবান ব্যক্তি কখন সমাজের কোন্ স্তরে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যই অনেক সময় বহু প্রতিভাবানের প্রতিভাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিভাকে লালন করা অবশ্য সমাজের কর্তব্য। কিন্তু চাকরিজীবীরা কি আমাদের দেশের প্রতিভাবানদের সত্যই লালন করেন?

কয়জন চাকুরিয়া বই কিনিয়া পড়েন? কয়জনের সামর্থ্য আছে? কয়জনের বুদ্ধি আছে? বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কয়জন স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন?

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট ছিলেন অথবা রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া বাঙালির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এই গর্বে তির্যকপথে আপন অহঙ্কারের রসদ সংগ্রহ করা ছাড়া চাকুরিয়া বাঙালি বাংলা সাহিত্যের সহিত আর কিভাবে যে সম্পৃক্ত, তাহা শঙ্করের বুদ্ধির অগম্য।

বেহারের উপর রাগ করিয়া যাঁহারা বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের কি ধারণা যে বাংলা দেশে চাকরি অফুরন্ত? সেখানেও তো হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। সেখানেও তো চাকরির জন্য লাঠালাঠি ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং অবশেষে অপমান। না, চাকরির মোহ পরিত্যাগ না করিলে বাঙালির মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষের যে প্রদেশেই সে থাকুক, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই মানুষের মত যদি থাকিতে পারে, তবে আর কোনো সমস্যাই আপাতত থাকিবে না। এতদিন সে যেখানে গিয়াছে, চাকুরিয়া-বেশে গিয়াছে, শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে হাকিমি চালে হুকুম চালাইয়াছে, লোকে তাহাদের ভয় করিয়াছে, কিন্তু ভালবাসে নাই। তাহারা যে উপকার করিয়াছে, সে উপকারকেও কেহ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ভালবাসা না থাকিলে কিছুই হৃদয়গ্রাহ্য হয় না।

শঙ্করের নটবর ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। লোকটা পাশ করা ডাক্তারও নয়। চরিত্রে অনেক দোষ আছে। মদ খায়, চরিত্র খারাপ। চরিত্রহীনতার জন্য বহুবার বহুস্থানে লাঞ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু সকলে তাহাকে ভালবাসে। আপামর ভদ্র সকলেই তাহার প্রিয়, কেহ তাহার পর নয়। এই ভালবাসার জোর যে কতখানি, তাহা সেবার নির্বাচনদ্বন্দ্বে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিপত্তিশালী 'ফিলিং'-ওয়ালা অনেক বেহারি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাহারা চেষ্টাও কম করে নাই, কিন্তু নটবর ডাক্তারের সহিত কেহ পারিল না। নটবর ডাক্তার দাঁড়াইয়াছেন, এ কথা প্রচারিত হইবামাত্র সকলে তাঁহাকে ভোট দিতে উদ্যত হইল। কয়েকজন বেহারি বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্করকে অবশেষে গিয়া অনেক তোষামোদ করিয়া নটবরকে এই দ্বন্দ্ব হইতে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছে। উইথড্র না করিলে সে-ই নির্বাচিত হইত। কই, বেহারি-বাঙালি 'ফিলিং' তো নটবরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই!

সহসা মুশাই কথা কহিল।

বিশঠো রুপিয়াকা বড়া জরুরৎ পড়লো ছে—

কি জরুরৎ?

মুশাই চুপ করিয়া রহিল।

কিসের জরুরত রে?

মুশাই এবারও কোনো উত্তর দিল না, জিহ্বা ও তালু সহযোগে টকটক শব্দ করিতে করিতে গরু হাঁকাইতে লাগিল।

শঙ্কর বুঝিল, প্রকৃত কারণটা বলিতে মুশাই রাজি নয়, বিশ্বাসযোগ্য একটা মিথ্যাও সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই চুপ করিয়া আছে।

শঙ্করও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, তোকে নিয়ে তো মহা মুশকিল দেখছি, রোজ রোজ টাকা পাব কোথায়?

মুশাই নিরুত্তর। সে জানে, বাবু টাকা দিবেই এবং শঙ্করও জানে যে টাকা যখন চাহিয়াছে তখন না দিয়া উপায় নাই, দিতেই হইবে। না দিলেই কামাই করিতে শুরু করিবে। হঠাৎ এমন আত্মগোপন করিবে যে, কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যাইবে না। একবার তো অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে যে অশ্বত্থ গাছটাকে সকলে উপদেবতার আশ্রয়স্থল ভাবিয়া ভয় করে, সেই গাছটারই মগডালে মুশাই উঠিয়া বসিয়াছিল, সেইখানেই নাকি দিবারাত্রি

বসিয়া থাকিত, কেবল রাত্রে যখন তাহার বউ যমুনিয়া তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইত, তখনই সে একবার খাইবার জন্য নামিত। যমুনিয়াকে খোশামোদ করিয়াই শঙ্কর তাহার নাগাল পাইয়াছিল। মুশাইয়ের সহিত সম্পর্ক এরূপ যে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। মুশাই না থাকিলে তাহার কাজকর্ম সব অচল, সে-ই তাহার দক্ষিণহস্ত। নিরক্ষর হইলে কী হয়, এমন তাহার বুদ্ধি এবং শঙ্করের পছন্দ-অপছন্দ সে এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছে যে শিক্ষিত কোনো ভদ্রলোকের পক্ষেও তাহার স্থান পূরণ করা অসম্ভব। সে একাধারে গাড়োয়ান, খানসামা, পাচক, ম্যানেজার এবং হিতৈষী। তা ছাড়া শঙ্করকে সে ছেলেবেলায় খেলাইয়াছিল, অর্থাৎ তাহার রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য ছিল, কোলে করিয়া বেড়াইত। তখন বয়স বোধ হয় বছর দশেক ছিল এবং শঙ্কর ছিল বছর খানেকের। এখন উভয়ের বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু সম্পর্ক বদলায় নাই। এখনও সে যেন শঙ্করের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য এবং শঙ্কর যেন দুরন্ত দামাল শিশু।

গাড়ি আসিয়া বাড়ির নিকট থামিল।

অমিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। খুকি ঘুমাইয়াছে।

ভাগ্যে আজ তোমার আসতে দেরি হ'ল, আমি এইমাত্র রান্নাঘর থেকে আসছি।

এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলে! কেন?

খুকিকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে তরকারিটা পুড়ে গিয়েছিল। বড্ড বায়নাদার হয়েছে বাপু, কিছুতে কি ঘুমতে চায়! চাপড়ে চাপড়ে হাত ব্যথা হয়ে যাবে, তবু ঘুমাবে না। চাপড়ানো বন্ধ করলেই বলবে, চাপলাও।

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

এই তাহার ঘর। এখানে বাঙালি-বেহারি সমস্যা নাই, দেশোদ্ধারের দুশ্চিন্তা নাই! এখানে আছে কেবল অমিয়া এবং তাহার কন্যা। কোনো উগ্রতা নাই, কোনো উন্মাদনা নাই, কোনো অভিনবত্ব নাই। ইহাই তাহার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়-নীড়, বাহিরের সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করে, সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়া পরিচর্যা করে, সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করে। খিল লাগাইয়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেল। বাহিরের পৃথিবী তাহার কলরব-কোলাহল লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, ভিতরে রহিল সহজ সরল অনাড়ম্বর শান্তি। সহসা তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। মা বাঁচিতে কেমন আছেন কে জানে।

পাঁচ

ঝুম্‌মর আসিয়া বসিয়া ছিল।

ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে হাঁকিতেছিল, এ খোখিদিদি—

অমিয়া পূজার ঘরে ছিল, জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, ঝুমর, আজ যে মানুষের ভাষায় কথা কইছ বড়?

ঝাপসা কণ্ঠে ঝুম্‌মর উত্তর দিল, গল্‌লা বঝি গেলছে মাইজি।

অর্থাৎ গলা ধরিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে সে তাহার স্বাভাবিক নিয়ম অনুয়ায়ী কুকুর, বিড়াল, মহিষ, মুরগি— না হয় অন্য কোনো প্রকার জানোয়ারের ডাক ডাকিয়া তাহার আগমন বার্তা ঘোষণা করিত। আজ তাহার গলা ধরিয়া গিয়াছে বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেছে না। মুখ দেখিয়া মনে হইল, এজন্য যেন সে লজ্জিত।

ঝুম্‌মর ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করে। বেঁটে লোকটি, ছোট মুখখানি। পাতলা একজোড়া গোঁফ তৈলাভাবে রুক্ষ। থুতনির কাছে কাঁচা-পাকা ছাগলদাড়ি, তাহাও তৈলাভাবে শ্রীহীন। গালের লোলচর্মে বলিরেখা। ছোট ছোট চক্ষু দুইটি কোটরগত এবং পীতাভ। একটি পা কাটা। নিজেই এখান-ওখান হইতে কাঠের টুকরা, চামড়ার বেল্ট প্রভৃতি জোগাড় করিয়া লইয়া একটি কাঠের পা বানাইয়া লইয়াছে। তাহারই উপর ভর দিয়া একটি লাঠির সাহায্যে সে চলা ফেরা করে। মাথায় একটি টিনের বাটি— সম্ভবত কোকোজেমের খালি টিন, টুপির মত করিয়া পরিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সংক্ষেপে নিজের জীবনের যে পরিচয় দেয়, তাহা এই :

দক্ষিণে তাহার বাড়ি। সেইখানেই এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে সে চাষবাসের কাজ করিত। লাঙল চষিত, 'কামৌনি' 'দৌনি' সব করিত। তাহার বিবাহও হইয়াছিল। তিনটি পুত্র আছে। একটি বেশ সাবালক আর দুইটি ছোট ছোট। প্রভুর জন্য কাষ্ঠসংগ্রহার্থে সে একদিন একটা বড় গাছে ওঠে। সেখান হইতে পা ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া তাহার পা-টি ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রভু অবশ্য তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন, নিজের গরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট খারাপ, পা কিছুতেই বাঁচিল না। হাঁটুর ওপর হইতে কাটিয়া না দিলে, ডাক্তারবাবু বলিলেন, তাহার প্রাণও নাকি বাঁচিত না। পা-টি সুতরাং কাটিয়া ফেলিতে হইল। কাটা পা লইয়া চাষের কাজ চলে না, সুতরাং ন্যায্যভাবেই প্রভু তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। খঞ্জ বেকার স্বামীর সহিত থাকা নিরর্থক বুঝিয়া স্ত্রীও আর একটি সমর্থ লোকের সহিত 'চুমানা' করিল। তাহার এই আচরণকেও ঝুম্‌মর অন্যায় বলিয়া মনে করে না। প্রভুর নিকট ঋণ করিয়া সে জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবাহ দিয়াছিল, পুত্র খাটিয়া সে ঋণ শোধ করিতেছে। নাবালক ছেলে দুইটি তাহার সঙ্গেই আছে। স্ত্রী তাহাদের নাকি বড় মারধর করে, তাই তাহারা পালাইয়া আসিয়াছে। তাহারাও ভিক্ষা করে, তাহাদেরও সে জানোয়ারের ডাক ডাকিতে শিখাইতেছে। ভাগ্যে ছেলেবেলায় একজন ওস্তাদের কাছে এই বিদ্যাটা শিখিয়াছিল, তাই বাবু-ভেইয়াদের মনোরঞ্জন করিয়া কোনোরূপে দিন গুজরান করিতেছে। অমনি ভিক্ষা চাহিলে রোজ রোজ লোকে দিবে কেন? অন্নসংস্থানের এই উপায়টিও সম্প্রতি কিন্তু বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা বসিয়া গিয়াছে।

ঝুম্‌মর অমিয়ার একজন পোষ্য। প্রায়ই আসে। অমিয়ার আর একজন পোষ্যও আছে— সুরদাস। সে জন্মান্ধ। ভজন গায়। দাইটিও কিছুদিন হইতে চারিটি ছেলেমেয়ে লইয়া অমিয়ার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাসখানেক হইতে ক্রমাগত আমাশয়ে ভুগিতেছে। ভুগিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। কাজ করিতে পারে না। অমিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাড়াইয়া দিলে চারিটি শিশু-সহ রোগে অন্নাভাবে হয়ত রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। স্বামীটা, পাগল, কোথায় কখন থাকে ঠিক নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হয়, খিড়কির দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীর উপর তম্বী করে। ভাবার্থ : খবরদার, যেন সে কোনোক্রমে বেচাল না হয়, সতীত্বই আসল ধর্ম, ইজ্জৎ যেন ষোল আনা বজায় থাকে ইত্যাদি। ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া চুমাও খায়। আবার কোথায় উধাও হইয়া যায়। এককালে শঙ্করের বাবার গাড়ি-ঘোড়া ছিল, এখন সে সব কিছু নাই, আস্তাবলটা খালি পড়িয়া আছে। তাহাতেই দাইটা সন্তান-সন্ততি লইয়া থাকে।

এতগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া অমিয়া এতটুকু বিরক্ত নয়। শঙ্কর সাহিত্য লইয়া যখন মাতিয়া ছিল, তখন অমিয়া যথাসাধ্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সেই সাহিত্যেরই রসগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহার মনে হইত, সাহিত্যরসিক না হইতে পারিলে শঙ্করের

মন পাওয়া যাইবে না। কিন্তু রস যে সে না পাইত তাহা নয়, কিন্তু তাহা তাহার প্রাণ-মনকে তেমন নাড়া দিত না। অনেকটা যেন কর্তব্যবোধেই সে শঙ্করের এবং সমসাময়িক লেখক-লেখিকাদের রচনার সহিত পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করিত। এখন সে সব দিন গিয়াছে। শঙ্কর মাতিয়াছে পল্লী উন্নয়ন লইয়া। গরিব দুঃখীদের কিসে ভাল হয়, ইহাই এখন তাহার ধ্যান-জ্ঞান। অমিয়াও তাই যথাসাধ্য গরিব-দুঃখীদের দুঃখমোচন করিবার চেষ্টা করে। তাহার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু, ততটুকুই করে। স্বামীকে সুখী করাই তাহার উদ্দেশ্য। সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা এসব করিয়া ঢের বেশি আনন্দও পায়। আনন্দের আর একটা গোপন কারণও আছে। কলিকাতায় শঙ্কর যেমন ছিল, এখানে আসিয়া আর তেমনটি নাই। তাহার স্বভাব অনেক বদলাইয়াছে। মুখে অবশ্য সে শঙ্করকে কখনও কিছু বলে না। কলিকাতায় যখন সে মদ খাইয়া অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরিত, তখনও যেমন সে নীরব ছিল এখনও তেমনই নীরব আছে। কিন্তু সে সব বোঝে। শঙ্কর তাহাকে যতটা নির্বোধ মনে করে, ঠিক ততটা নির্বোধ সে নয়। উৎপলবাবুর স্ত্রী সুরমার মত হয়ত সে বিদূষী নয়, কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে তাহার মন কখনও ভুল করে না। শঙ্কর যখন কুপথে যায়, তখন সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ না পাইলেও তাহার অন্তর্যামী মন যেমন আসল সত্যটি বুঝিতে পারে, কুপথ হইতে সুপথে যখন ফিরিয়া আসে তখনও তেমনই পারে। কিছুই তাহার মনের অগোচরে থাকে না। কলিকাতায় শঙ্কর যখন বিপথগামী হইয়াছিল, তখন তাহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি, কিন্তু খুব বেশি বিচলিত সে হয় নাই। তাহার কারণ, শঙ্করের মহত্ত্বের প্রতি তাহার গভীর আস্থা ছিল। সে জানিত, সোনাতে কখনও কলঙ্ক লাগিবে না। সাময়িকভাবে একটু ছাই বা ধুলা যদি লাগেও, তাহা যথাকালে আপনি উঠিয়া যাইবে। উহা লইয়া বেশি হইচই করিলে সুবর্ণ অধিকারীর সুবর্ণ-চরিত্রে জ্ঞানের অভাবই সূচিত করে। এখন আবার স্বর্ণের স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সব দীন. দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ দিয়া তাহার স্বামীর স্বাভাবিক মহত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সব দীন-দরিদ্রের সে-ও সেবা করিতে উৎসুক। তাহার এই মনোভাব যদিও কলিকাতায় সাহিত্যচর্চা করিবার মত শুষ্ক কর্তব্যবোধ মাত্রই নয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের প্রেরণার মত আবেগপূর্ণও নয়। অমিয়ার প্রধান লক্ষ্য— শঙ্কর, অন্য কিছু নয়।

খোখিদিদি— এ খোখিদিদি—আব—

দাততি।

খোকিদিদি উঠানে বাঘা কুকুরটার ঘাড়ে চড়িয়া তাহার কান মোচড়াইতেছিল। বলিষ্ঠ বাঘা অস্ফুট কুঁ-কুঁ শব্দ করিতে করিতে তাহার এই স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। ঝুমুমরের প্রতি খোখিদিদির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে সে নিস্তার পাইয়া বাঁচিল। দাত্তি— বলিয়া খোকিদিদি প্রবীণ গিন্নীর মত ঝুমুমরের দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া তাহার হুঁশ হইল যে, রিক্তহস্তে যাওয়ার তো কোনো অর্থ হয় না। তখন সে ফিরিয়া মাকে ডাকিল।

মা, ঝুম্‌মু— তাল দাও।

যাচ্ছি।

অমিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটু তাড়াতাড়িই আসিল, তাহার ভয়— পাচ্ছে খুকি ঝুম্‌মরকে ছুঁইয়া ফেলে। মেয়ের তো সকলের সঙ্গে ভাব, এখনই হয়ত উহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

বাঘাকে ছুঁয়েছ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া খুকি বলিল, না।

'হাঁ'কে খুকি 'না' বলে।

তবে দাঁড়াও, গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিই মাথায়।

অমিয়া পুনরায় পূজার ঘরে ঢুকিল এবং গঙ্গাজল আনিয়া মেয়ের মাথায় ছিটাইয়া দিল।

গঙ্গা— গঙ্গা— গঙ্গা।

খুকি মাথা পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া বলিল, গগ্ গা গগ্ গা— এবং হাসিল।

সর্দিতে নাক বন্ধ, 'গঙ্গা' উচ্চারণ হয় না।

আলো দাও।

জলের ছিটা চোখে মুখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চমৎকার লাগে।

না, আর দিতে হবে না।

তাহার পর ঝুম্মরের দিকে ফিরিয়া অমিয়া বলিল, তুই আর চাল নিয়ে কী করবি? দুপুরে বরং ছেলে দুটোকে নিয়ে এখানেই খাস।

ঝুম্মর সেলাম করিল। তাহার পর সসঙ্কোচে হাসিয়া ধরা-গলায় পুনরায় আবেদন জানাইল, এক টুকরা পাঁওরোটি মিলতিয়ে মাঈজি, রাতিসে ভুখলো ছি—

গ্রামের দুইটি বেকার বাঙালি যুবককে উৎসাহিত করিয়া শঙ্কর এখানে একটি বেকারি স্থাপন করাইয়াছে। শঙ্কর সেখান হইতে রোজ পাঁউরুটি লয়। ঝুম্মর শঙ্করেরই উচ্ছিষ্ট পাঁউরুটি মাঝে মাঝে দুই-এক টুকরা খাইয়া দেখিয়াছে। চমৎকার খাইতে। একটু চা দিয়া ভিজাইয়া লইলে তো আরও চমৎকার, চিবাইতে হয় না, ভিজিবামাত্র নরম তুলতুল করে।

গরিব মানুষের আবার পাঁউরুটি খাওয়ার শখ কেন রোজ রোজ? মুড়ি খাও না চারটি।

ঝুম্মর একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

খুকি বলিল, পালুটি কাবে? পালুটি? দিত্তি। খুকি ভাঁড়ারঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মিট-সেফে কোথায় পাঁউরুটি থাকে, তাহা তাহার অজানা নাই।

বাবা বাবা, মেয়ের কর্ত্তাত্তির জ্বালায় গেলাম!

মেয়ের পিছু পিছু অমিয়াও ভাঁড়ারঘরে ঢুকিল এবং ঝুম্মরের জন্য এক টুকরা রুটি তাহার হাতে দিল।

আলগোছে দিও, ছুঁয়ো না যেন।

আত্তো।

শঙ্কর এতক্ষণ বাহিরের ঘরে নানাবিধ লোকপরিবৃত হইয়া নানারূপ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিল। একটু ফাঁক পাইয়া সে ভিতরে আসিল একটু চায়ের আশায়। পূজা সারিয়া অমিয়া এই সময় একটু চা পান করে, শঙ্করও প্রায়ই এ সুযোগ ছাড়ে না। আসিবামাত্র খুকু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—

মানে— কোলে কর। কোলে তুলিয়া লইতে হইল।

তোমার চা খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

না। এস না।

হামরো এক জরা দিও মাঈজি।

মুখপোড়ার পাঁউরুটি চাই, চা-ও চাই। সুখ আর ধরছে না!

হাসিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া অমিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

গল্লা বঝি গেলছে মাইজি।

হাসপাতাল থেকে ওষুধ নাওগে যাও না। তোমাদের জন্যে তো হাসপাতাল করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝুম্‌মর বলিল যে হাসপাতালে সে গিয়াছিল, তাহার গলায় কী একটা ঔষধ তাহারা লাগাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু কোনো উপকারই হয় নাই, বরং আরও বেশি বসিয়া গিয়াছে।

অমিয়া শঙ্করকে বলিল, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুটি তেমন সুবিধের নয়। হয় কিছু জানে না, নয়, গরিবদের ভাল করে দেখে না। আমাদের দাইটার আমাশা তো মাসখানেক থেকে কিছুতেই সারছে না, অথচ রোজ ওষুধ খাচ্ছে।

কী করি বল, শিক্ষিত লোক দেখেই তো রাখা হয়েছে। এখুনি বেরুব একবার, তখন খোঁজ করব।

ঝুম্‌মরকে বলিল, চা পিকে হামরা সাথ তুম চলো, দাবাকা ইন্‌তিজাম কর দেঙ্গে।

শঙ্কর হিন্দি ভাল জানে না। হিন্দি, ভাঙা উর্দু, মোচড়ানো বাংলা প্রভৃতি মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় যা-হোক করিয়া কাজ চালাইয়া লয়।

'ইন্‌তিজাম' শব্দটা ঝুম্‌মর ভাল বুঝিল না, কিন্তু শঙ্করের কথার সারমর্ম বুঝিতে তাহার বিঘ্ন হইল না। সে বসিয়া রহিল।

ঝুম্‌মরকে সঙ্গে লইয়া শঙ্কর হাসপাতালে গিয়া দেখিল, সেখানে অনেক রোগী ভিড় করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু নাই। তিনি উৎপলকে দেখিতে গিয়াছেন। উৎপলের নাকি পরশু হইতে শরীর খারাপ। শঙ্করও তিন-চারদিন উৎপলের খবর পায় নাই, উৎপলের বাড়িতে যায় নাই। সে ঝুম্‌মরকে হাসপাতালে বসাইয়া উৎপলের বাড়ি চলিয়া গেল।

ছয়

নিজের বাড়ির সম্মুখের প্রশস্ত গোলাপ বাগানে দাঁড়াইয়া উৎপল কয়েকটি সদ্য ক্রীত মূল্যবান গোলাপ চারার বিষয়ে মালীকে উপদেশ দিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

তোর কথাই ভাবছিলাম। এত লোকের এত উপকার করে বেড়াচ্ছ, আমার একটু কর না।

হয়েছে কী তোর?

সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ, ওধারের স্নো কুইনটার কী দশা, এদিকে এভারেস্টও যায়-যায়, ডিউক অব ওয়েলিংটন পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে।

শঙ্করকে ভ্রুকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া উৎপল বলিল, অমন ভ্রুকুটি করবার দরকার নেই, খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়--- উই ভার্সাস wc। তামাকের জল দিয়ে দিয়ে পরিশ্রান্ত হয়েছি, তোমার যদি কিছু জানা থাকে বল।

সহসা থামিয়া বলিল, অনেকক্ষণ সিগারেট খাওনি মনে হচ্ছে।

পকেট হইতে সোনার সিগারেট কেস বাহির করিয়া উৎপল সেটি শঙ্করের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া শঙ্কর বলিল, তোকে তখুনি বলেছিলাম, ওই প্রমথ ডাক্তারকে রেখো না, লোকটা বড় বেশি কথা বলে আর একের নম্বর ফাঁকিবাজ।

কেন, কী করেছে?

এখনই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বহু রোগী বসে আছে, অথচ তার পাত্তা নেই। হাসপাতালে বলে এসেছে যে, তোমার নাকি অসুখ, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ। তোমার যে কিছু হয় নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

উৎপল অপ্রতিভ হইল।

I stand rebuked, আমিই ডেকে পাঠিয়েছি— ভদ্রলোক এখানেই আছেন।

কী হয়েছে তোর?— শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

চলতি ভাষায় সর্দি, ডাক্তারি ভাষায় ইনফ্লুয়েঞ্জা।

এতেই এত ভয়?

ভয় অসুখকে নয়, সুরমাকে। আয়, ভেতরে আয়।

ভিতরের সুবিস্তৃত দালানে প্রমথ ডাক্তার ও বীরু খানসামা ছিল। প্রমথ ডাক্তার বীরু খানসামার অন্তরে সম্ভ্রম উদ্রেক করিবার মানসেই সম্ভবত তাহাকে সবিস্তারে বুঝাইতেছিলেন, ব্রঙ্কাইটিস-কেট্‌ল কীভাবে ব্যবহার করিতে হয়, ফুটবাথ দিতে হইলে জলের উত্তাপ ঠিক কতটা হওয়া প্রয়োজন, অ্যাস্‌পিরিন নামক ঔষধের ডোজ কী, দোষ কী কী, অ্যাস্‌পিরিন না দিয়া তিনি ভেরামন কেন ব্যবহার করিতেছেন, উৎপলের চিকিৎসার জন্য কী কী 'প্রিকশান' তিনি লইবেন। এমন সময় উৎপল ও শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। বীরু পাশের দরজা দিয়া সুট করিয়া সরিয়া পড়িল, প্রমথ ডাক্তার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এটা কী?

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

ওটা হচ্ছে স্যার ব্রঙ্কাটিস-কেট্‌ল। বেশি কাশি হলে কিংবা লাংসে কোনো অ্যান্টিসেপ্‌টিক দিতে হলে আমরা এটা ব্যবহার করি।

বুক খোলা জামা গায়ে মালকোঁচা মারা প্রমথ ডাক্তার বেশ সপ্রতিভ ব্যক্তি।

উৎপল প্রমথ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি হাসপাতাল ফেলে চলে এসেছেন, শঙ্করের কাছে আমাকে বকুনি খেতে হল।

হাসপাতালে আপনি গিয়েছিলেন নাকি স্যার, কোনো দরকার ছিল?

একটা রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম।

ও, চলুন, যাচ্ছি। কী রোগী?

ঝুম্‌মরকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর কাশি কিছুতেই সারছে না, গলাটা ভেঙে আছে, ও-ই বেচারির উপজীবিকা—

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন।

ঝুম্‌মর? কই চিনতে পারছি না।

ওই যে কাঠের পা পরে বেড়ায়, সব রকম জানোয়ারের ডাক ডাকে—

বুঝেছি। ওর গলায় তো রোজ থ্রোট-পেন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্যার, মেন্ডেল্‌স পিগমেন্ট দিচ্ছি—

কমছে না কিন্তু।

গলার ভেতরটা একবার 'এক্সপ্লোর' করা দরকার। করিই বা কী করে? আমাদের ল্যারিংগোস্কোপ যে নেই।

উৎপল এতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সবিস্ময়ে ব্রঙ্কাইটিস-কেট্‌লটাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এটা কি আমার জন্যই এনেছেন?

হ্যাঁ, স্যার।

হাসপাতাল থেকে?

হ্যাঁ, স্যার। রাত্রে যদি কোনো ফিট অব কাফ-টাফ হয়, দরকার লাগতে পারে।

উৎপলকে নীরব দেখিয়া এবং তাহার নীরবতার কারণ অনুমান করিয়া লইয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলবে, ব্র্যান্ড নিউ আছে।

আছে নাকি? আচ্ছা। আপনি আপনার প্রেস্‌ক্রিপশন ডিরেকশন সব লিখে রেখে যান।

সারটেন্‌লি।

ডাক্তারবাবু পটাৎ করে বুক পকেট হইতে ফাউন্টেন পেন বাহির করিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল, ল্যারিংগোস্কোপ আনা যদি দরকার মনে করেন, আনিয়ে নিন না। বলেন তো আজই অর্ডার প্লেস করে দি।

প্রমথ ডাক্তার লিখিতে লিখিতে উত্তর দিলেন, দিন।

আয়, ওপরে আয়।

উৎপল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

যাচ্ছি।

প্রমথ ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া শঙ্কর বলিল, ঝুম্‌ম্‌রটাকে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি তা হলে গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

সারটেন্‌লি। একটা গার্গারিস্‌মা দিয়ে দেখি আজ। পরে না হয় লিংটাস দেব, যদি না কমে।

উৎপল ওপরে উঠিয়া গিয়াছিল, শঙ্করও অনুসরণ করিল। ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন ও ডিরেকশন লিখিতে লাগিলেন।

সুরমা স্পিরিট-স্টোভে দুধ গরম করিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইতেই উৎপল সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার জন্যে শঙ্করের কাছে বকুনি খেতে হল।

সুরমা কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে চাহিল ও স্পিরিট-স্টোভ হইতে দুধটা নামাইয়া নিপুণভাবে একটি সুদৃশ্য পেয়ালায় ঢালিল। এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না, এবং নীরবে বাহির হইয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া উৎপল বলিল, দশটা বাজল।

তা হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। দুধ গরম করে কাপে ঢালা হয়ে গেছে যখন—

পাশের ঘরের একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল।

ওই শোন। এখন সমস্যা ওইটি গলাধঃকরণ করতে হবে। কী মুশকিল!

ক্ষিধে না থাকলে জোর করে খাওয়াবে নাকি?

ওই তো মজা, জোর করে না কখনও। ঠিক সময়ে দুধটি গরম করে পাশে রেখে যাবে, হয়ত একবার বলবে— খাও। যদি না খাও, কিছু বলবে না, মুখও যে ভার করে থাকবে তা নয় কিন্তু কেমন যেন সর্বদা মনে হতে থাকবে, নেপথ্যে ও চটেছে। সে এক ভারি অস্বস্তি, তার চেয়ে খাওয়াই ভাল।

এ সময়ে রোজ দুধ খাস নাকি?

তোমার ওই ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তারের বাক্য সুরমার কাছে বেদব্যাক্য।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র উৎপল থামিয়া গেল এবং নিতান্ত ভালমানুষের মত মুখ-চোখ করিয়া বলিল, শঙ্করকে বলছিলাম, সুরমা হয়ত তোমাকে কফি না খাইয়ে ছাড়বে না।

কফির কথা বলতেই গিয়েছিলাম।

শঙ্কর বলিল, আমাকে কিন্তু এখনই উঠতে হবে। বেশি দেরি করতে পারব না।

উৎপল গম্ভীর মুখে সুরমার দিকে চাহিয়া ছদ্ম আদেশের ভঙ্গিতে বলিল, না, দেরি করিয়ে দিও না, দেশের কাজে বাধা দেওয়া অন্যায়! একেই তো তুমি সকালবেলা ডাক্তারকে ডেকে গরিবদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছ।

আমরা গরিব নই বলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাব নাকি?

এই বলিয়া সুরমা কোণ হইতে একটি চৌকো ফ্রেম বাহির করিল স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া অর্ধ-সমাপ্ত কার্পেটের আসনটিতে মন দিল।

কেন, আপনারা তো চরণবাবুকে ডাকতেন। তিনি ডাক্তারও ভাল, লোকও ভাল, কারও চাকরি করেন না, তিনিই তো বেশ ছিলেন, তাঁকে ছাড়লেন কেন?

তাঁকেই তো ডাকতে পাঠিয়েছিলাম, তিনি এলেন কই? তাঁকে পাওয়া শক্ত। পরশু বললেন, দুটোর সময় যাব। কাল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে বঁকুকে পাঠালাম সাইকেল করে। তিনি বললেন, আমার এখনও কয়েকটা গরিব রোগী দেখতে বাকি আছে, তাদের দেখে তবে যাব। আমরা যেন বড়লোক হয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

সুরমা কার্পেটের আসন বুনিতে শুরু করিয়া দিল। উৎপল দুধের কাপটা তুলিয়া এক চুমুক পান করিয়া নীরবে আবার তাহা নামাইয়া রাখিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়া গেল। আসনের ফুলগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, বাঃ, আসন তো বেশ চমৎকার হচ্ছে আপনার!

উৎপল বলিল, তা হচ্ছে কিন্তু ওতে তোমার বা আমার কোনো লাভ নেই।

কেন?

আমরা পাব না। প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতের বসবার জন্যে একটি করে দান করবেন উনি ঠিক করেছেন।

বেশ ভালই তো।

ও! কুন্তলাদেবীর সঙ্গে তোমারও আলাপ হয়েছে নাকি?

না। তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

তিনিই এই সদিচ্ছাটি ওঁর অন্তরে, তোমরা সাহিত্যিকেরা যাকে বল উদ্বুদ্ধ, তাই করেছেন। তোমারও সহানুভূতি দেখে মনে হচ্ছে যে হয়ত তোমার সঙ্গেও—

না, আলাপ হয়নি; কিন্তু আলাপ করতে হবে। ওঁর সম্বন্ধে যা শুনি, তাতে মনে হয় চেষ্টা করলে ওঁকে হয়ত আমাদের কাজে লাগাতে পারা যায়।

সুরমা আপনার মনে বুনিতেছিল। এই কথায় বলিল, আপনাদের এই ধরনের পল্লীসংস্কার ওর পছন্দসই নয়।

তাই নাকি? বলেছিলেন কিছু?

একদিন কথা হয়েছিল, তাতেই আভাসে বুঝলাম।

'আভাস' কথাটা শুনিয়া উৎপল ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় দুধের কাপটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিল।

আভাসে বুঝেছেন মানে?

এ নিয়ে তর্ক করলে হয়ত ওর মনের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যেত, কিন্তু তা আর আমি করিনি। কী হবে বাজে তর্ক ক'রে ওর সঙ্গে?

বিশেষত হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই যখন বেশি।

উৎপল ফোড়ন কাটিল।

ইহাতে সুরমা চটিল না, মুচকি হাসিয়া বলিল, তাও ঠিক। ভয় করে ওর সঙ্গে তর্ক করতে।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খুব মুখরা নাকি?

না। খুব কম কথা বলে। দারুণ সংস্কৃত জানে বলে ভয় হয়।

উৎপল দুধের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিল এবং বলিল, সুরমার কাছে ওঁর সঠিক চিত্রটি পাবে না।

কেন? শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

দু'জনে বন্ধুত্ব হয়েছে।

সুরমা হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

উৎপল বলিল, পাশের ঘর থেকে সেদিন আমি যতদূর আন্দাজ করেছিলাম, তাতে ওঁর সম্বন্ধে একটি উপমাই আমার মনে হয়েছিল, সুরমা যদি রাগ না করে বলতে পারি।

সুরমা সহাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল! কোনো প্রকার মন্তব্য করিল না!

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, কী উপমা, শুনিই না?

কামান। কামানও বেশি কথা বলে না, কিন্তু যখন বলে, তখন একেবারে কন্‌ভিন্‌সিং।

কফির সরঞ্জাম লইয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং ছোট একটি টেবিলে সেগুলি রাখিয়া টেবিলটি আগাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আর কিছু খাবেন?

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

না।

সহসা শঙ্করের অনাহারক্লিষ্ট ঝুম্‌মরের কথা মনে পড়িল। সে হয়ত তাহার অপেক্ষায় এখনও হাসপাতালে বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবু এবার তাহাকে ঠিকমত ঔষধ দিয়াছেন কি না কে জানে!

সাত

প্রমথ ডাক্তার বেশ কর্মিতকর্মা ব্যক্তি। বছর তিনেকের মধ্যে উৎপলদের এই প্রাইভেট ডাক্তারখানাটিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজের বেশ একটি 'ফিল্ড' 'ক্রিয়েট' করিয়া লইয়াছেন। যে সম্প্রদায় ডাক্তারের মধ্যে কেবল চিকিৎসাই নয়, ধূর্ত ফন্দিবাজ বন্ধু কামনা করেন (যিনি আইনজ্ঞ অথচ নিরঙ্কুশ), সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমথ ডাক্তার বেশ পসার জমাইতে পারিয়াছেন। মিথ্যা সার্টিফিকেট লিখিয়া, দারোগাকে তোয়াজ করিয়া, জেলার গভর্নমেন্ট অফিসারদের সহিত ভাব-সাব রাখিয়া, উৎপল এবং শঙ্করকে তোষামোদ করিয়া তিনি নিজের আসনটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঞ্জেক্‌শন বিশারদ বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁহার একটা বিশেষ খ্যাতি হইয়াছে। 'জক্‌শন' দিয়ে তিনি বহু দুঃসাধ্য ব্যাধি নাকি সারাইয়াছেন।

গুলাব সিং আসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি শহর হইতে ইঞ্জেকশনের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া ফিরিয়াছেন। গোঁফ চুমরাইতে সালঙ্কারে নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন।

হড়বড়মে থে হুজুর, ভুখভি লগা থা, হালওয়াইকো কহা— জলদি করো ভাই। উ ভুজতে চলা, ম্যঁায় খাতে চলে। কুছ দেরমে খেয়াল পড়া ই তো গলতি কাম কর রহেঁ হেঁ, ই শালা তো কাচ্চা পুড়ি খিলা রহা হ্যা। খেয়াল হোনেকা সাথহি খানা বন্দ কর দিয়া— মগর তবভি ভোগনা পড়া ডাক্‌টারবাবু।

ক্যা হুয়া?

কাচ্চা আঁটা পেটমে লসক্ গিয়া।

লসক্ গিয়া?

লসক্ গিয়া। দো রোজ দস্ত নহি উতরা বাই তক ভি গায়েব— ঠসম্ঠোস। এক ডাক্টারকো বোলায়েঁ। উ আ কর এক সুই দিহিন, এক পুরিয়া দিহিন, পাঁচ রুপিয়া ফিস লেহিন। নেহি উতরা। দুসরা এক ডক্টার বোলায়েঁ ইস ডক্টারনে দো সুই দিহিন, এক শিশির দাবাই দিহিন, ফিস লিহিন আট রুপিয়া। কুছ নেই হুয়া। পেট বেশি ফুলা দিহিস। ম্যাঁয় আর দেরি নেহি কিয়া, তড়াক শহর চলে গ্যয়ে। ডাক্টার চৌধুরিকো বোলায়েঁ। ডাক্টার চৌধুরি আচ্ছাসে তয়েসে দেখিন্, পেটমে যন্তর বৈঠাইন, বাঁমে ফিতা লপ্টাকে প্রিসার দেখিন, প্রিসার জামিন কিহিন,— পাঁচ রুপিয়া ফিস দেনে পড়া প্রিসার জামিন-কা বাস্তে। দেখ শুন কর ডাক্টর চৌধুরি কহিন, দেখো ভাই, ইসকা দো তরেকা জকশন হ্যা মেরা পাস। এক বড়া, এক ছোটা। বড়া জকশন দেনেসে চার ঘন্টাকা অন্দর পাখানা উতর যায়ে গা, ছোটামো দো রোজ লাগে গা। বড় জকশনকা কিমৎ ষোলা রুপেয়া, ছোটাকা পাঁচ রুপেয়া, অব তুমহারা ক্যা খাঁইস কহো? ম্যাঁয় কহা, বড় জকশনই দিজিয়ে হুজুর, জান যা রহা হ্যায়। ইয়া বড় এক জকশন চুতড়মে ঘোঁৎ দিহিন, আউর মিশ্‌রিকে লায়েক এক দাবা ছ চামমচ লেকে গরম পানিমে ঘোরকে পিলা দিহিন। জহরকা লায়েক তিতা। মগর হাঁ—

উদ্ভাসিত মুখে গুলাব সিং চুপ করিলেন।

হো গিয়া?

একদম সাফ— দোহি ঘণ্টে মে।

ইহা শুনিয়া প্রমথ ডাক্তার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করত মাথা নাড়িয়া ভাঙা হিন্দিতে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার ঠিক ঔষধ নির্বাচন করিয়া যদি জকশন দেন ফল তো হইবেই।

বেশক।

গুলাব সিং গোঁফ চুমরাইয়া অতঃপর তাঁহার আগমনের কারণটি ব্যক্ত করিলে।

আজ হুজুর মেরা ঘর পর তশরিপ লাইয়ে।

কাহে?

মেরা জানাকো এক জকশন দেনা পড়ে গা।

ক্যা হুয়া উনকো?

উ যব চলতি ফিরতি হ্যায়, তব তো ঠিক হ্যায়, কোই তকলিফ নহি। মগর যবহি উ বাচ্চেকো গোদমে লে কর বৈঠি, যব তক সিধা রহি, তব তক তো ঠিক রহি, মগর যবহি দুধ পিলানা কো লিয়ে সামনেহ ঝুকি, কচ—

গুলাম সিং কোমরে হাত দিয়া দেখাইয়া দিলেন কচ করিয়া ব্যথাটা কোথায় লাগে।

এক ঘণ্টা বাদ আওয়েঙ্গে।

একঠো কড়া জকশন দেনে পড়ে গা।

আচ্ছা।

বাত তব পাক্কা?

পাক্কা।

পাক্কা কথা করিয়া গুলাব সিংহের মনে হইল, দর্শনীটা অগ্রিম দিয়া দিলে ব্যাপারটা আরও পাকা হইয়া যাইবে। ন্যায্য খরচ করিতে তিনি কোনো কালেই পশ্চাৎপদ নহেন। ট্যাঁক হইতে

ডাক্তারবাবুর দক্ষিণাটি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং জোড় হস্তে কহিলেন, উঠা লিয়া যায় হুজুর।

ডাক্তারবাবু টাকা চারিটি লইয়া নমস্কার করিলেন। গুলাব সিংও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু একাই থাকেন, পরিবার দেশে। কিছুক্ষণ পূর্বেই কল সারিয়া ফিরিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ছিলেন। ভাবিলেন, এক চটকা ঘুমাইয়া লইয়া তাহার পর গুলাব সিংহের স্ত্রীকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়া আসিবেন। ইঞ্জেকশন একটা দিতেই হইবে, না দিলে গুলাব সিংহের তৃপ্তি হইবে না। ঘুমাইতে যাইবেন, এমন সময় শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তারবাবু, বিরজু মরে গেল নাকি?

বিরজু কে? কী হয়েছে?

আপনি কিছু জানেন না? বিরজু কাঠ কাটছিল, হঠাৎ কুড়ুলটা ফসকে তার পায়ে লাগে। রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিল না দেখে তাকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম যে।

কতক্ষণ আগে?

তা প্রায় ঘণ্টা দুই হবে।

আমি ছিলাম না। কলে বাইরে গিয়েছিলাম।

লোকটা বিনা চিকিৎসাতেই মল তা হলে?

না আমাদের কম্পাউন্ডার খুব এক্সপার্ট লোক, যা করবার করেছে ঠিক, চলুন দেখি, কী ব্যাপার।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল বিরজুর মৃতদেহের পাশে বসিয়া তাহার যুবতী স্ত্রী বুকফাটা হাহাকার করিতেছে। এক্সপার্ট কম্পাউন্ডারবাবু যথাসাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিরজু মারা গিয়াছে। কম্পাউন্ডারবাবুর যথাসাধ্য যে কতদূর তাহা ডাক্তারবাবুর অবিদিত ছিল না অবশ্য, কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন, সবই তো করা হয়েছে দেখছি, সিরাম একটা দিলে ভাল হত অবশ্য, কিন্তু তা তো আমাদের হাসপাতালে নেই।

শঙ্কর এসব কিছুই শুনিতেছিল না। ওই শোকার্ত বিধবাটার গগনবিদারী ক্রন্দনে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, আহা, অমন জোয়ান লোকটা অপঘাতে মারা গেল। ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিতেছিলেন, কিছুই শঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। হঠাৎ তাহার কানে গেল, আমাদের একটা বড় সিরিঞ্জ পর্যন্ত নেই স্যার, গ্লুকোজ-টুকোজ দিতে এমন অসুবিধে হয়— টেন সি সি সিরিঞ্জ দিয়ে, মানে বার বার খুলে খুলে দিলে—

শঙ্কর বলিল, কী কী জিনিস আপনাদের দরকার, তা তো আপনারাই ঠিক করে দেন, আমরা টাকা দিয়েই খালাস। যা যা দরকার তা তো আপনাকেই আনাতে হবে।

সারটেন্‌লি। দিয়েছিলামও, কিন্তু সিবিল সার্জন ঘচাঘচ কেটে দিলে সব, এমনকি অ্যাক্রিফ্লেবিন পর্যন্ত কেটে দিয়েছে স্যার।

টাকা আমরা দিচ্ছি, সিভিল সার্জন কেটে দেওয়ার কে?

প্রমথ ডাক্তার হাত উল্টাইয়া এমন একটা সহাস্য মুখভাব করিলেন, যাহার অর্থ ওই তো। আর বলেন কেন! ও লোকগুলোর সব জায়গাতেই ফফরদালালি করা স্বভাব।

আমি ভাবছি—

কথাটা বলিয়াই শঙ্কর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেল।

কি ভাবছেন?

ভাবছি ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করতে না পারলে হাসপাতালের কাজ ভাল

হওয়া সম্ভব নয়।

সারটেন্‌লি। কিন্তু তা হলেই মাইনেও বেশি দিতে হবে, পঁচাত্তর টাকায় কুলোবে না।

কত টাকা হলে কুলোয়?

অন্তত শ' পাঁচেক।

শ' পাঁচেক!

মৃদু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, তার কমে কী করে হয়, বলুন?

অত আমাদের বাজেটে কুলোনো শক্ত।

সারটেন্‌লি। বাজেট নিয়েই যত গোলমাল। সিভিল সার্জন যে ঘচঘচ কেটে দেন, তাঁরও অজুহাত ওই বাজেট। আপনারা ওযুধ-পত্তরের জন্যে যত টাকা দেন—

আচ্ছা, চললাম।

হঠাৎ শঙ্কর হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর কম্পাউন্ডারের দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এ সব কবি-টবি নিয়ে চলাই দুষ্কর বাবা।

কম্পাউন্ডার একটু হাসিল।

ডাক্তারবাবু ডাক্তারখানায় আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিলেন না, গুলাব সিংহের স্ত্রীকে ইঞ্জেকশন দিতে যাইতে হইবে। ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন বা ওই জাতীয় কিছু একটা দিতেই হবে! লোকটা ডবল ফি দিয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার অপেক্ষায় একটি লোক এক হাঁড়ি দই, কিছু ভাল চিঁড়া এবং কয়েক ছড়া চমৎকার রম্ভা লইয়া বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল এবং দেহাতি হিন্দি ভাষায় যাহা নিবেদন করিল, তাহার সারমর্ম এই. গুলাব সিংহের পত্নী ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাইয়া এই ভেটগুলি উপহার পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ডবল ফি-ও পাঠাইয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া ইঞ্জেকশন দিবার জন্য না আসেন, কারণ তিনি কিছুতেই ইঞ্জেকশন লইবেন না। স্বামী কিন্তু নাছোড়, তাই তিনি লুকাইয়া ডাক্তারবাবুকে এই অনুরোধটি জানাইতেছেন. ডাক্তারবাবু যেন টাল-বেটাল করিয়া কোনো রকমে ব্যাপারটা গোলমাল করিয়া দেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে ভেটসহ ফিসটি হস্তগত করিয়া বাম গুম্ফপ্রান্তে মৃদু মৃদু তা দিতে দিতে সমস্ত ব্যাপারটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, মাঈজিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিও। ইঞ্জেকশন আমি দিব না। কিন্তু গুলাব সিংহকে ফাঁকি দিবার জন্য ইঞ্জেকশন দিওয়ার একটা অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহার গায়ে সুচ ফুটাইব না, কিন্তু মাঈজিকে এমন একটা ভাব করিতে হইবে যেন ফুটাইলাম। এইরূপ না করিলে গুলাব সিং হয়ত অন্য ডাক্তার ডাকিবে এবং সে ডাক্তার হয়ত মাঈজির এ অনুরোধ না-ও রক্ষা করিতে পারেন।

এই বার্তা লইয়া লোকটি প্রসন্ন মনে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবুও অনুগমন করিলেন।

আট

বাড়ি ফিরিয়া শঙ্কর দেখিল, স্যুট-পরিহিত একটি তরুণকান্তি যুবক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। পদশব্দ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শঙ্করকে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল, মুখভাবে

বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। শঙ্করও কম অবাক হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো বাক্যবিনিময় হইবার পূর্বেই যুবকটি পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া শঙ্করের হাতে দিল এবং বলিল, আমি এই কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করছি। আপনার হাতে অনেকগুলো ডাক্তারখানা, আমাদের যদি অর্ডার দেন, ভারি উপকৃত হব। হাসপাতালের জন্যে আমাদের স্পেশাল রেট আছে, এই দেখুন—

হেঁট হইয়া চামড়ার ব্যাগ হইতে কাগজপত্র বাহির করিতে লাগিল। শঙ্কর সবিস্ময়ে চুপ করিয়া ছিল, তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। নিজের চক্ষুকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ চেহারা তো ভুল হইবার নয়। যুবকটি খুব সরলভাবে নিজের কাগজপত্র দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু একবারও সে শঙ্করের চোখের দিকে চাহে নাই। নিজের কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কথাবার্তা চালাইতেছিল। ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছিল, প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পারিলে সে যেন বাঁচে। শঙ্কর একটিও কথা বলে নাই, কেবল সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া যুবকটি একগোছা কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া .লিল, ড.ক্তারবাবুদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গেও একটু দেখা করে যেতে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন আমাদের কথা। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

কোথায় যাবেন?

স্টেশনে।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর অবশেষে বলিল, কিছু যদি মনে না করেন, একটা প্রশ্ন আপনাকে করব।

কী, বলুন?

বেলা মল্লিক বলে কি আপনার কোনো যমজ ভগিনী ছিলেন?

ভ্রূভঙ্গিসহকারে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া যুবক বলিল, না। আচ্ছা, আমি এখন চলি।

বারান্দার নিচেই বাইক ছিল। দ্রুতপদে নামিয়া যুবক তাহাতে চাপিয়া বসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিস্মিত শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বেলা মল্লিককে চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। বেলা মল্লিক? বেলা অবশেষে তাহার নারীত্বকেই অবলুপ্ত করিয়া দিল। প্রাক্-জীবনের একঝাঁক স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বেশিক্ষণ কিন্তু সেসব লইয়া বসিয়া থাকিতে সে পারিল না।

বাবা, তল, তা তানদা, হত্তে।

খুকি আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহার পর আসিল স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরি এবং বলিল দশ পাউন্ড কুইনিন অবিলম্বে দরকার। সেদিন তো অত কুইনিন দিল, আবার কুইনিন চাই! শঙ্করের সন্দেহ হইল, কুইনিন বোধ হয় চুরি হইতেছে। কিন্তু ভদ্রসন্তানকে সে কথা ব যায় না। তাহা ছাড়া অমিয়ার সহিত উহার বন্ধুত্ব হইয়াছে। শঙ্কর কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল, কাল আসবেন।

নয়

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে।

নিজের ঘরে ঝকঝকে পিতলের পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া নিবিষ্টমনে চরকা কাটিতে কাটিতে হাসি পুত্রটিকে কবিতা মুখস্ত করাইতেছিল। হাসির পরিধানে শুভ্র খদ্দরের থান,

মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো অলঙ্কার নাই, চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখর জ্যোতি। সে যেন ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে। জ্বালা যে কেন, তাহা সে নিজেও জানে না। যাহা উচিত, যাহা বিবেকসম্মত, সমস্তই সে করিতেছে, তবু সমস্ত অন্তর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল।

ছেলেটি ঠিক বাপের মত হইয়াছে। মৃন্ময়ই যেন শিশুরূপে আবার তার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তেমনই ধপধপে রঙ, তেমনই লাল চুল, তেমনই চোখ-মুখ— সব। হাসি তাহার নাম রাখিয়াছে, তুমি।

কই, বলছ না, বল আবার।—

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি।'

দুই-একবার ভুল করিয়া 'তুমি' অবশেষে ঠিক করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিল। চরকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাসি বলিয়া চলিল—

'সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বান্দার কোলে কাজি দিল তুলে
বান্দার এক ছেলে।
কহিল, ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।'

এই ভাবে রোজ চলে। হাসি সকালে রাঁধে, নিজে পড়ে, ছেলেকে পড়ায়, মৃন্ময়ের একটা ছবি সম্মুখে রাখিয়া ফুল-চন্দন দিয়া পুজাও করে। দুপুরে স্কুল। বৈকালে ছেলের সঙ্গে থাকে। তাহার সহিত খেলাও করে। বাহিরে কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। এমন কী শঙ্করও যে তাহার নিকট বার বার আসে, ইহাও সে পছন্দ করে না। ইহাই তাহার বর্তমান জীবন। নিঃসঙ্গ এবং কর্তব্যময়।

দশ

ব্যাঙ্কে আজ ধার লইবার দিন। অসম্ভব ভিড় হইয়াছে। কেবল সহি করিতে করিতেই শঙ্কর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কাহার ধার পাওয়া উচিত, কাহার উচিত নয়, কাহার ধার শোধ করিবার সংস্থান আছে, কাহার নাই, এসব বিচার করিতে গেলে শুধু যে বিলম্ব হইয়া যায় তাহা নয়, কেনারাম চক্রবর্তীকেও অসন্তুষ্ট করিতে হয়। তিনি যাহাকে যাহাকে সুপারিশ করিয়াছেন, শঙ্কর তাহারই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেছে। কেনারামবাবু অবশ্য প্রত্যেক দরখাস্তেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন যে, শঙ্কর নিজে ভাল করিয়া খোঁজখবর করিয়া যদি ধার দেওয়া নিরাপদ মনে করে, তবেই যেন ধার দেয়। কিন্তু তাহা শঙ্করের পক্ষে করা অসম্ভব। সে নির্বিচারে সহি করিয়া চলিয়াছে। মাথা-পিছু টাকা অবশ্য বেশি নয়, কেহ দশ, কেহ বিশ, কেহ পঁচিশ, কিন্তু মাথা অনেকগুলি, প্রায় দুই শত। ইহাদের প্রত্যেকের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর লওয়া শঙ্করের সাধ্যাতীত।

কাল ছট পরব। প্রত্যেকেরই টাকার দরকার এবং টাকার দরকার পড়িলে ধার করা ছাড়া অন্য কোনো সদুপায় ইহাদের জানা নাই। উৎপলও বলিয়াছে, পরবের সময় কাহাকেও যেন

নিরাশ করা না হয়। আদেশের ভঙ্গিতে বলে নাই, অনুরোধ করিয়াছে।

সকলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। পথে হঠাৎ নেকিরাম মাড়োয়ারির সহিত দেখা হইল।

রাম রাম, সোংকরবাবু, রাম রাম। হাঁ, খুব কিয়া আপ দোনো, সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে।

হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত অদ্ভুত ভাষায় নেকিরাম দন্ত বিকশিত করিয়া সোল্লাসে উৎপলের এবং শঙ্করের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গরিব লোক সব কাঁহাসে রুপিয়া লানবে। হামি লোক তো সব চোষ লিয়া। আপনেরা খুব করলেন। সামনে ছট পরব, কাঁহাসে রুপিয়া মিলবে বেচারাদের। খুব কিয়া, যশ হো গিয়া, সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে, বা বা বা বা বা।

খানিকক্ষণ এই জাতীয় বক্তৃতার পর 'রাম রাম' করিয়া নেকিরাম পাশের গলিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। শঙ্কর মনে মনে বেশ একটু পুলকিত হইল। নেকিরাম কাপড়ের দোকান ছাড়া মহাজনি কারবারও করে। এই ছট পরবের মরসুমে গরিব চাষীদের বেশ চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ কিছু বাণিজ্য করিত, এবার বেচারার সে গুড়ে বালি পড়িল। সত্যই ইহারা গরিবদের রক্ত শোষণ করে। নিজের মুখেই আবার বলা হইতেছে, হামি লোগ সব চোষ লিয়া। ইহারা না গেলে দেশের উন্নতি নাই। নিপু ঠিকই বলে। এই ক্যাপিট্যালিস্টরাই দেশের শত্রু, ইহাদের সর্বগ্রাসী লোভ দেশের সর্বস্বই গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। অথচ ইহাদের বাদ দিয়া চলিবারও উপায় নাই। অর্থবানদের অর্থেই দেশের যত কিছু সৎকার্য হয়। ধনীদের বদান্যতাতেই গরিবদের উপকারের আশা। ক্যাপিট্যালিস্ট উৎপল যদি টাকা না দিত, তাহা হইলে তো এসব কিছুই হইত না। কমিউনিস্টদেব মতে, এই উৎপলই কিন্তু উচ্ছেদযোগ্য। অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর যখন বাড়ি পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অমিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতেছিল। কমিউনিস্টদের মতে ভক্তিপরায়ণা অমিয়াও উপহাসাস্পদ!

প্রণতা অমিয়ার পাশে খুকিও হেঁট হইয়া বলিতেছে, নমো--- নমো।

নিকার-বোকার পরানো থাকাতে ভাল করিয়া হেঁট হইতে পারিতেছে না, কিন্তু বেচারার চেষ্টার ত্রুটি নাই। কুঁতাইয়া কুঁতাইয়া যথাসম্ভব পিঠ বাঁকাইয়া চোখ-মুখ লাল করিয়া মাথাটা নত করিয়াছে।

শঙ্করের পদধ্বনি শুনিয়া তাহার প্রণাম করা ঘুচিয়া গেল। ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, তে? মানে, কে?

তাহার পর শঙ্করকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহার হাঁটু দুইটি জাপটাইয়া ধরিয়া উদ্ভাসিত মুখে বলিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর বলিল, কিচ্ছু হল না।

কিত্তু ওলো না?

না।

খুকি পুনরায় চেষ্টা করিল। চোখ বড় বড় করিয়া দুইবার আবৃত্তি করিল, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে, ভম্ ভম্ ভম্ ভম্ বাদে।

শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া বলিল, কিচ্ছু হচ্ছে না।

আজ সকালে নিমাই আসিয়াছিল এবং সে খুকিকে ভারতচন্দ্রের ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে লেখা দুই লাইন কবিতা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

খুকি কেবল শিখিয়াছে— 'ভম্ ভম্ ভম্ বাদে' এবং তাহাই সমস্ত দিন যখন তখন আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। কোলে উঠিয়াই খুকি শঙ্করের বুক পকেটে হাত চালাইয়া সিগারেট কেস ও ফাউন্টেন পেনটি হস্তগত করিয়া ফেলিল এবং সতৃষ্ণ নয়নে হাতঘড়িটার পানে চাহিল। বাবার এই জিনিসগুলির ওপর তাহার টান সবচেয়ে বেশি। চকচকে সেলুলয়েডের পুতুল অথবা দম-দেওয়া মোটরের উপর তাহার তাদৃশ মমতা নাই, প্রথম প্রথম যে মোহ ছিল, এখন আর তাহাও নাই। মোটরের চাবিও খারাপ হইয়া গিয়াছে, পুতুলটাও খুব সুস্থ নয়। বাঘা কুকুরটা চিবাইয়া তাহার একটা পা শেষ করিয়া দিয়াছে এবং দুইটি জিনিসই বারান্দার কোণে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। খুকুর টান বাবার এই জিনিসগুলির প্রতি। সিগারেট হোল্ডারটা তো দখলই করিয়া লইয়াছিল, এখন অবশ্য সেটা হারাইয়া গিয়াছে, তাহার কথাও মনে নাই।

দাও, ওগুলো দাও।

খুকি মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিল।

দাও তো, লক্ষ্মী। ও বাবা, তোমার কী সুন্দর কোট হয়েছে দেখি দেখি?

কোটের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেই কোট সম্বন্ধে তাহার সত্য মতামত সে অকপটে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

কোত কুলে দাও।

অমিয়ার জেদাজেদিতেই ওগুলো পরিতে হয়। কোট-পাজামা পরিয়া থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা করে না।

বাবা, কুলে দাও।

আবো নুনু, ইধার আবো—

উঠানের অন্ধকার কোণ হইতে কে কথা কহিয়া উঠিল। খুকি সঙ্গে সঙ্গে কোল হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর।

যমুনিয়া নাকি?

অমিয়া ভাড়ার ঘরে ধুনা দিতেছিল, বাহির হইয়া বলিল, আবার কে, কাল ছুট, টাকা দাও।

মুশাই গাড়োয়ানের বউ যমুনিয়া।

এখুনি তো মুশাই কুড়ি টাকা ধার নিয়ে গেল!

ওকরসে একো পয়সা কি হামরো মিলতে। পঁদ্‌র রুপিয়া লেতেই নেকি মাড়বারিয়া আর পাঁচ রুপিয়া লেতেই ওহি মুসহরনি ছৌড়ি।

কি রকম? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

যমুনিয়া সবিস্তারে যাহা বর্ণনা করিল, তাহাতে শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। নেকি মাড়োয়ারি, রাজীব দত্ত এবং মুকুন্দ— এ অঞ্চলের এই তিন মহাজন নাকি তাহাদের সমস্ত খাতকদের ডাকাইয়া শাসাইয়াছেন যে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি সকলে তাহাদের ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ না করে, তাহা হইলে প্রত্যেকের নামে নালিশ করা হইবে এবং বন্ধকি জিনিস কাহাকেও আর ফেরত দেওয়া হইবে না। সত্যই নালিশ করিলে আদালতের বিচারে কী হইবে তাহা যদিও ঠিক জানা নাই, কিন্তু নালিশের নামেই গরিব লোকেরা ভয় পায়। তাহারা ভাল করিয়াই জানে যে, যাহার প্রচুর অর্থ আছে, আদালতে শেষ পর্যন্ত তাহারই জয় হয়। তাহারা আজ সকলে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছে, উহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত। সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করিলে

ছটের জন্য আবার তাহারা নতুন ঋণ পাইবে এ আশ্বাসও মহাজনেরা দিয়াছে। কিন্তু যমুনিয়া অত চড়া সুদে আর টাকা ধার করিতে পারিবে না, কারণ বন্ধক দেওয়ার মত আর তাহার কিছুই নাই। তাহার যাহা কিছু ছিল, সব উহাদের গর্ভেই গিয়াছে। যমুনিয়া মলিন বস্ত্রাঞ্চল চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুশাই আজকাল তাহাকে দেখে না, আজকাল রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত যায় না, ওই মুসহরনি ছুঁড়িটার কাছে পড়িয়া থাকে, ছুঁড়ি তাহার স্বামীকে 'গুণ' করিয়াছে। ও মানুষ নয় ডাইনি। তাহার পর সহসা চক্ষু হইতে বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া শঙ্করের দিকে সে আগাইয়া গেল এবং একটু ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোঁহি তো রুপিয়া দে দে করিকে ওকর এইসন হালত করলি।

ছট করবি তুই কার জন্যে?

ওকরে বাস্তে।

ওই স্বামীর মঙ্গলার্থেই সে উপবাস করিয়া ছটপূজা করিবে।

ক'টাকা চাই?

দশঠো।

শঙ্কর বিনা বাক্যব্যয়ে দশটা টাকা বাহির করিয়া দিল।

অমিয়া কিছু বলিল না, মুচকি হাসিল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন আনন্দে গর্বে ভরিয়া উঠিল। পূর্বে শঙ্করের যথেচ্ছ খরচ দেখিয়া তাহার কষ্ট হইত, এখন আর হয় না। এই লোকটির মনের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া চলিতে পারিলেই আনন্দ পাওয়া যায়, ইহা সে বুঝিয়াছে।

যমুনিয়া চলিয়া গেল না। টাকাটা খুঁটে বাঁধিয়া খুকিকে কোলে লইয়া হিন্দি ছড়া বলিতে বলিতে ঘুম পাড়াইতে লাগিল, চানু মামু চানু মামু, আরে আবো বারে আবো, নদীয়া কিনারে আবো, সোনাকা কাটোবামে দুধু ভাতু নেনে আবো।

শঙ্কর বাহিরের আরাম-কেদারাটায় অন্ধকারে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহাদের ব্যাঙ্কের এতগুলো টাকা ওই রক্তশোষক মহাজনদের সিন্দুকে গিয়া ঢুকিল; গরিব প্রজারা এক পয়সা পাইল না!

সব কোই ধন্ ধন্ বোলছে। খুব কিয়ে আপলোগ!— নেকি মাড়োয়ারির বিকশিতদন্ত মুখচ্ছবিটা তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল।

এগারো

অন্ধকার রাত্রি চতুর্দিক নির্জন। নিপু আপন ঘরে বসিয়া একমনে ডায়েরি লিখিতেছিল—

একটা কালো কুক্কুরী আমার অস্থি-মাংস চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছে। স্নায়ুশিরা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর-মন আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার নাই, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না, কিছুতেই সে আমাকে শান্তি দিবে না। অর্থ, সামর্থ্য, ভয়-প্রদর্শন, যুক্তি— সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। কিছুতেই তাহার মন পাইতেছি না। কুক্কুরী, ঘৃণিতা কুক্কুরী, কালো, কুৎসিত, কদর্য কিন্তু তবু, ওঃ — না, নিজেকে সম্বরণ করিতে হইবে, এ জ্বালাময় অপমান আর সহ্য করিতে পারি না, আর সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কেন? কেন আত্মসম্বরণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিতেছে? এ দুর্বলতার অর্থ কী? অর্থ সেই সনাতন সংস্কার, মনের সেই অন্ধ গোঁড়ামি, যাহা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া নিষেধকে মানে, যাহা প্রত্যক্ষ যুক্তিকে বিদলিত করিয়া অযৌক্তিক মানস-বিলাসে আত্মহারা হয়, যাহা কাল্পনিক পরলোকের বিশ্বাসে অতি বাস্তব

ইহলোককে তুচ্ছ করে। না, এ দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সকলকে বায়োলজির মূল তত্ত্ব শিখাইতে হইবে। যে বায়োলজি জীবধর্মের স্থূল রূপটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, যাহা জীবকে জীব হিসাবে গণ্য করে— সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতার কুয়াশা সৃষ্টি করিয়া যাহা জীবনের বৃহৎ সত্য আবৃত করিয়া ফেলে না। আগে জীবন, তাহার পর জীবনদর্শন। বলশেভিক রাশিয়া সহজ সুস্থ যৌনমিলনের সমস্ত কৃত্রিম বাধা দূর করিয়া দিয়াছে। সে দেশে ভালবাসা ছাড়া আর কোনো নিগড় নাই। ও-মেয়েটো কি আমাকে ভালবাসে না? হয়ত বাসে, কিন্তু বাসিলেও প্রকাশ্যত তাহা স্বীকার করিতে পারে না, সমাজের নিষ্ঠুর আইন আছে। সে পারিলেও আমি পারি না, আমার একটা ঝুটা আত্মসম্মানের বুর্জোয়া মুখোশ আছে, আমি কিছুতেই প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে পারি না যে, আমি একটা নীচজাতীয়া অস্পৃশ্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। বলশেভিক রাশিয়ায় হয়ত এই অবৈজ্ঞানিক চক্ষুলজ্জা থাকিত না, হয়ত ওই মেয়েটাও ওই নাকবসা সর্বাঙ্গে ঘা লোকটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হইত না, হয়ত—

চিন্তা-স্রোত সহসা বাধা পড়িল। অদূরে হাড়ি টোলায় একটা কলরব উঠিল। মনে হইল, যেন মারামারি বাধিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি কলম রাখিয়া ডায়েরি বন্ধ করিয়া ফেলিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ শুনিল, তাহার পর আলোটি কমাইয়া বালিশের তলা হইতে টর্চটি লইয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল। অস্পৃশ্যতা নিবারণ, অস্পৃশ্যদের উন্নতিসাধন তাহার কাজ, অস্পৃশ্যদের মধ্যেই তাই সে বাসা বাঁধিয়াছে। একেবারে ঠিক মধ্যে নয়, কাছাকাছি। হাড়ি পাড়ার একটু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাহার পরিচ্ছন্ন ছোট বাসাটি। উৎপলই বাসাটি করাইয়া দিয়াছে। অস্পৃশ্য বালক-বালিকাদের পাঠশালাটি এই বাসারই প্রশস্ত বারান্দায় রোজ বসে। নিপুই তাহাদের পড়ায়, ইহাদের কাছে সে 'গুরুজি' বলিয়া পরিচিত। টর্চ ফেলিতে ফেলিতে অন্ধকারে নিপু আগাইয়া গেল। অকুস্থলে পৌঁছিয়া তাহাকে কিন্তু গতিবেগ সম্বরণ করিতে হইল। আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। এ কি কাণ্ড: সুরা উন্মত্ত একদল হাড়ি অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করিতেছে। ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া মুশকিল। ভিড়ের ভিতর হইতে একটা আর্তনাদও উঠিতেছে— ভিতরে কে যেন কাহাকে প্রহার করিতেছে। নিকটেই ধূমাঙ্কিত একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা না জ্বলিলেও ক্ষতি ছিল না। একটু দূরে দাঁড়াইয়া নিপু ইতস্তত করিতে লাগিল। কী করা যায়? কিছু একটা অবিলম্বেই করা উচিত। আর্তনাদটা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কী যে ঠিক হইতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন। সকলেই অসংলগ্ন ভাষায় চিৎকার করিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না, কেহই থামিবেও না। উহাদের ভিতর গিয়া হাতাহাতি করিতে পারিলে তবে হয়ত উহাদের থামানো যায় কিন্তু তাহা করা নিপুর পক্ষে অসম্ভব। সে দূর হইতেই দুই একবার টর্চ ফেলিয়া 'এই এই, কিয়া হুয়া' জাতীয় দুই-একটা উক্তি করিল কিন্তু কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ভিড়ের ভিতরে আর্তনাদটা প্রবলতর হইয়া উঠিল। কেহ কাহাকেও খুন করিয়া ফেলিতেছে না তো। অসম্ভব নয়। নিপুর স্মরণ হইল, জারের যুগে রাশিয়ান শ্রমিকরা ভডকা পান করিয়া আপনজনকে হত্যা করিয়া ফেলিতেছে, এই কাহিনী সে বহুবার পুস্তকে পাঠ করিয়াছে। আরও একটু আগাইয়া গিয়া সে আর একবার টর্চ ফেলিল। এবার সে দেখিতে পাইল এবং যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মোটা কালো একটা হাড়িনী একটা রোগা ছোঁড়ার বুকের উপর বসিয়া তাহার চুলের ঝুঁটি মুঠি করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চড়াইতেছে এবং ক্রুদ্ধ কর্কশকণ্ঠে বলিতেছে, এইসে এইসে, এইসে—। ছোঁড়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে—

মোটা হাড়িনী শুধু মোটা নয়, মোটা এবং কালো। তাহার রুক্ষ চুল আলুলায়িত, কাপড় ছিন্নভিন্ন, মুখে অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষা। আর একবার টর্চ ফেলিয়া নিপু ইহাকে চিনিতে পারিল। এই মাগীই তো (মাগী কথাটাই তাহার মনে হইল) চুপড়ি, কুলো, মোড়া বুনিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দিনের আলোকে নিপু ইহাকে অনেকবার দেখিয়াছে। তখন তো ইহার বেশ শান্তশিষ্ট সলজ্জ মূর্তি, মুখের আধখানা ঘোমটা দিয়া ঢাকা থাকে, ভদ্রলোক দেখিলে একটু তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ফিসফিস করিয়া কথা বলে। সেই ব্যক্তির এখন এই মূর্তি এবং প্রতাপ। ছোঁড়াটা নিদারুণ চিৎকার করিতেছে। নিপু আর একবার ক্ষীণভাবে চেষ্টা করিল, আরে, এই, কিয়া করতা হ্যায় তুমলোগ? ছোড়ো, ছোড়ো, উঠো।

মহিষমর্দিনী তাহার কথায় দৃকপাত করিল না। কিন্তু বার বার টর্চের আলো ফেলাতে ভিড়ের অন্য দুই-একজন যে বিচলিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ মিলিল। একটা রোগা লম্বা গোছের হাড়ি আগাইয়া আসিয়া আদেশের ভঙ্গিতে বলিল, কোওন হ্যায় রে?

নিপু আমতা আমতা করিয়া বলিল, আরে শুনো— শুনো—

ভা-গো শালা।

একটা বুড়ো আগাইয়া আসিল। তাহারও পা টলিতেছে, কিন্তু সে একেবারে সম্বিৎ হারায় নাই। নিপুকে সে চিনিতে পারিল। আরে শালা চুপ র, গুরুজি আইলো ছে। সেলাম গুরুজি।

তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ইহার প্রত্যুত্তরে খুব একটা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিল, গোলি মারো গুরুজিকো।

চতুর্থ একজন জড়িত কণ্ঠে মন্তব্য করিল, গুরুজি ফুলশরিয়াকা পিছোমে পড়লো ছে—

ইহাতে পঞ্চম একজন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মোটা কালো হাড়িনীটা ছোঁড়াটাকে সমানে মারিয়া চলিয়াছে। কাহারও সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন অতিশয় স্বাভাবিক এবং সঙ্গত একটা ব্যাপার ঘটিতেছে, বিচলিত হইবার কিছু নাই। কেবল সেই বুড়াটা একবার মাত্র বলিল, হে গে, আব ছোড়ি দে, ঢের ভেলো।

নিপু নির্বাক হইয়া ভাবিতেছিল, এখন কী করা যায়। বাইক করিয়া একবার অবিলম্বে থানায় গিয়া খবর দেওয়া উচিত, না শঙ্করের কাছে যাওয়া উচিত! এমনভাবে চলিতে তো—

অপ্রত্যাশিতভাবে কিন্তু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। নটবর ডাক্তার সহসা অশ্বপৃষ্ঠে ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইয়া গেলেন এবং ঘোড়ার লাগাম টানিয়া প্রশ্ন করিলেন, এতনা হাল্লা কাহে রে?

মন্ত্রবলে সমস্ত যেন ঠিক হইয়া গেল। যে যেখানে ছিল, সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নটবর ডাক্তারকে সেলাম করিল। মোটা হাড়িনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিজের প্রায় উলঙ্গ কলেবরকে লুকাইবার জন্য কুঁড়ে ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। ছোঁড়াটা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছোঁড়া অপর কেহ নয়, উহারই তৃতীয় পক্ষের স্বামী, ন্যায়সঙ্গতভাবেই মার খাইতেছিল। ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়াটাকে বেড়ার খুঁটায় বাঁধিলেন এবং সহাস্যমুখে উহাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইলেন।

তাড়ি, তাড়ি, খালি তাড়ি। শালা লোগ তাড়ি পিতে পিতেই জাহান্নমমে যাগা। দেখে কৈইসে তাড়ি, লে আও।

ইতিমধ্যে একজন ঘরের ভিতর হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া আনিয়াছিল। নটবর ডাক্তার তাহার উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। সসম্ভ্রমে একজন মাটির খুরিতে ভরিয়া তাড়ি আগাইয়া দিল। ডাক্তারবাবু একবার শুঁকিয়া দেখিলেন, তাহার পর এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন।

ছি ছি ছি ছি, যেত্তা রদ্দি মাল পিতে হো শালে লোগ। যাও, পাঁচ বোতল আচ্ছা মাল লে আও।

পকেট হইতে পাঁচটা টাকা ঝনাৎ করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া একজন বলিল, কালালি কি আভি খুললো হোতৈ?

যা করকে বোলো— ডাক্‌টারবাবু মাংতে হেঁ।

একজন টিপ্পনী কাটিল, ওকর বাপ দেতেই!

যাহার বাড়িতে ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন, সে ব্যক্তি ঔষধের বাক্স মাথায় লইয়া পিছু পিছু আসিতেছিল, সে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে নটবর ডাক্তার আদেশ করিলেন, তুম আগু বঢ়ো, হাম আতে হেঁ।

লোকটি তাড়ির আড্ডায় ডাক্তারবাবুকে সমাসীন দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস করিল না। এমনিতে ডাক্তারবাবু কোনো না কোনো সময়ে গিয়া ঠিক পৌঁছিবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিলে বাঁকিয়া বসিতে পারেন এবং একবার বাঁকিয়া বসিলে নটবর ডাক্তারকে সিধা করা শক্ত। কিছু না বলিয়া সে ব্যক্তি নীরবে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ নিপুকে লক্ষ্য করেন নাই। নিপুর সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল না, মুখ চিনিতেন, কিন্তু স্বল্পালোকে তাহাও চিনিতে পারিলেন না।

কোনো হ্যায়।

আমি।

নিপু আগাইয়া আসিল।

ও, মাস্টারমশাই! কী বিপদ! আসুন আসুন। আর একঠো মোড়া লে আও। আসুন। চলবে নাকি এক-আধ পাত্তর?

আজ্ঞে না, আমি ওসব 'টাচ' করি না।

টাচ করেন না? ও। আপনিই না untouchability দূর করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন? বসতে তো দোষ নেই, বসুন না।

আর একটা মোড়া আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু নিপু বসিল না। হাড়িদের তাড়ির আড্ডায় বসিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নটবরের উপরে তাহার রাগও হইল। কোথায় ইহাদের সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করিবে, না, আরও পাঁচ বোতল আনিতে দিল! শঙ্করকে বলিয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

আমার একটু কাজ আছে, চললাম— এখন আর বসব না।

বাসায় আসিয়া বাইক করিয়া সে শঙ্করের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল! শঙ্কর কিন্তু তখন দ্বিতলে বসিয়া কবিতার ছন্দ মিলাইতেছিল। চাকরের মুখে নিপুদার আগমনবার্তা শুনিয়া পুলকিত হইল না।

বল গিয়ে, বাবু শুয়ে পড়েছেন, এখন দেখা হবে না।

নিপু চাকরের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতলের আলোকিত বাতায়নটার দিকে একবার চাহিয়া আবার বাইকে সওয়ার হইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত রাত্রে ছয় মাইল রাস্তা বাইক করিয়া আসিলাম, শঙ্কর তাহার সহিত দেখা পর্যন্ত করিল না। এ কিছু নয়, টাকার গরম। ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির লক্ষণ। উৎপল আসিলে তাহাকে শঙ্কর এমনভাবে ফিরাইয়া দিতে পারিত কি?

নির্জন মাঠের ভিতর দিয়া নিপু বাইক করিয়া চলিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিতেছে, কি একটা অজানা ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত। নিপুর মনে কিন্তু এতটুকু আনন্দ নাই। মাতাল

হাড়িগুলা পর্যন্ত তাহাকে উপহাস করিল, অথচ তাহাদের মঙ্গলের জন্য সে কি না করিতেছে! নটবর ডাক্তারটারও স্পর্ধা কম নয়, তাহাকে এই স্থানে বসিয়া তাড়ি খাইতে অনুরোধ করিতেছিল! ছোটলোকগুলোকে মদ ঘুষ দিয়া তাহাদের দলপতি সাজিয়াছে। স্কাউন্ড্রেল। আবার তাহার মনে, হইল, ক্যাপিটালিজম— ক্যাপিট্যালিজমের এই আর এক রূপ, ইহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি নাই।

বারো

ছট পরব লাগিয়াছে।

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ রঙিন কাপড় পরিয়া নদী তীরে চলিয়াছে। হলুদ এবং গোলাপি রঙের প্রাধান্যই বেশি। গরিব লোকেরা সাধারণ কাপড়ই রাঙাইয়া লইয়াছে। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাহাদের কেউ কেউ রেশম পরিয়াছে। বেশিরভাগই স্ত্রীলোক, শাড়ি এবং ওড়নারই আধিক্য। যাহার যেটুকু জুটিয়াছে, তাহাতেই সে বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হইয়াছে। সকলেরই মুখে একটা শান্ত সৌম্য নিষ্ঠার ভাব। যাহারা 'ছট' করে, তাহারা সকলেই উপবাসী থাকে, প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় ভগবানের নিকট মানত করিয়া আন্তরিক নিষ্ঠাভরেই সেই মানত শোধ করিতে চায়।

ছট পরবের নিয়ম অনেক। কালীপূজার পর হইতে ছয় দিন নিয়ম করিয়া থাকিতে হয়। কালীঠাকুরের ভাসানের পর পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া নতুন হাঁড়িতে পাক করিয়া প্রথম তিন দিন খুব শুদ্ধাচারে নিরামিষ আহারাদি করা নিয়ম, কোনোদিন কদ্দুভাত, কোনোদিন মটর-ডাল ভাত। চতুর্থ দিন 'খর্ণা', অর্থাৎ সেই দিনই আসল পূজার আরম্ভ। উঠানেই পূজা হয়। কাঁচা মাটির সরায় ও হাঁড়িতে পূজার উপকরণ সজ্জিত করাই বিধি, পোড়া মাটির বাসন চলে না। কাঁচা মাটির বাসনগুলিকে সিন্দুর দিয়া অলঙ্কৃত করিয়া তাহাতে ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি প্রভৃতি রাখা থাকে। একটি বাসনে কাঁচা দুধে পাঁচ রকম ফলের রস দিয়া পঞ্চামৃত তৈরি হয়, আর একটি পাত্রে দুধে আলোচাল সিদ্ধ করিয়া পূর্ব হইতেই 'আরোয়াইন' প্রস্তুত কবা থাকে। যে ছট করিবে পূজা করিয়া এক নিঃশ্বাসে যতটা পারে ততটা দুধ পান করিয়া লয়। দুগ্ধ পান করিবার সময় যদি কেহ 'টোকে' অর্থাৎ নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেয় কিংবা যদি কোনো রকম শব্দ হইয়া বা গোলমাল হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর খাওয়া হয় না। ছটের প্রথম দিন হইতেই 'সুপে' অর্থাৎ কুলাতে নানারূপ ফল সাজাইতে হয়, যাহার যেমন সামর্থ্য সে সেইরূপ করে। বড়লোকেরা দেয় আঙুর আপেল কিসমিস— গরিবেরা দেয় পেয়ারা খেজুর আতা নারিকেল। ইহা ছাড়া সকলকেই দিতে হয় 'খাবুনি' আটা এবং ঘি দিয়া প্রস্তুত পিষ্টকজাতীয় একরূপ খাবার। চতুর্থ দিন সকালে এক নিঃশ্বাসে দুগ্ধ-পান, রাত্রে 'আরোয়াইন'। পঞ্চম দিন উপবাস। ডালায় 'সুপ' সাজাইয়া সেটি মাথায় লইয়া একবার সকালে, একবার বিকালে, নদীতীরে যাইতে হয়, আকাশের দিকে হাত তুলিয়া সূর্যপূজা করিতে হয়। পঞ্চম দিন অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসের পর ষষ্ঠ দিনে নদীতীরে গিয়া সূর্যপূজা করিয়া তবে উপবাস ভঙ্গ করিতে হয়। ছট পরবে এ দেশের জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস। সকলেই জানে, নিষ্ঠাভরে করিলে নিশ্চয়ই দেবতা মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। উপবাস ছাড়াও কেহ কেহ আবার কঠোরতর মানত করে। নিজের বাড়ি হইতে নদীর তীর পর্যন্ত হয়ত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে যায়। এই কৃচ্ছ্রসাধনই তাহার মানত। কেহ হয়ত ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে। এই দীনতা স্বীকারই তাহার মানতের অঙ্গ।

একবার মানত করিয়া ফেলিলে তাহা শোধ করিতেই হয়। মানত করিয়া যদি কেহ অসুস্থতাবশত তাহা পালন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হইয়া অপর কাহাকেও তাহা করিয়া দিতে হয়। করিয়া দিবার লোকাভাবও হয় না। ছট বড় জাগ্রত দেবতা, কোনো অনিয়ম সহ্য করেন না। দাইয়ের স্বামীটা যে পাগল হইয়া গিয়াছে, মুশাইয়ের মামার সর্বাঙ্গে যে ধবল হইয়াছে, সকলের বিশ্বাস ছটপূজায় অনিয়ম করাই নাকি সে সবের আসল কারণ। একজন নাকি উপবাসের সময় লুকাইয়া খাইয়াছিল, আর একজনের নাকি 'সুপে' পা ঠেকিয়া গিয়াছিল, সেই পদপৃষ্ট 'সুপ' লইয়াই সে নাকি দেবতার পূজা চড়াইয়াছিল, তাই এই শাস্তি।

ডালা মাথায় লইয়া দলে দলে নরনারী চলিয়াছে। যে একটু অবস্থাপন্ন সে সঙ্গে বাজনাও লইয়াছে। বাজনা অবশ্য বিশেষ কিছু নয়। একটা ঢোল, একটা কাঁসি এবং একটা সানাই। কিন্তু উহাতেই উৎসব জমিয়া উঠিয়াছে।

শঙ্কর বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুইয়া এই জনস্রোত দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল আমরা এতদিন ইহাদের ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, ইহাদের পূজা-পার্বণকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়াছি। কিন্তু এই যে দলে দলে নরনারী উপবাস করিয়া প্রিয়জনের কল্যাণ কামনায় দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইতে চলিয়াছে, তাহা কি সত্যই উপহাস করিবার মতই জিনিস? নব বৎসরে ছাপানো-হরফে ডাকযোগে 'শুভকামনা' জানান অপেক্ষা কি ইহা বেশি হাস্যকর। ইহাদের মত আন্তরিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাস কি আমাদের আছে? আছে বইকি। আমরা ইংরেজি অক্ষরে লেখা অথবা বিদেশি-মুখনিঃসৃত যে কোনো অসম্ভব তথ্য নির্বিচারে বিশ্বাস করি! নাসা কুঞ্চিত করি কেবল দেশি জিনিসের বেলায়। কিরোর 'বুক অব নাম্বার্স' আমরা অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত পড়ি, আমাদের যত অবিশ্বাস দেশি গণকঠাকুরকে। ফ্রি-ম্যাশনের আংটি পরিতে আমাদের আপত্তি নাই, মাদুলি পরিলেই যত আপত্তি। উপবীতগুচ্ছ গলায় ঝুলাইয়া রাখা অযৌক্তিক মনে করি, টাই ঝুলাইবার বেলায় কিন্তু যুক্তির কথা মনে পড়ে না, বারংবার মনে হয়, নটটা ঠিকমত হইয়াছে কি না, রঙটা ঠিক ম্যাচ করিয়াছে কি না! রাশিয়ার সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র লইয়া আমরা উন্মত্ত, কিন্তু হিন্দু সভ্যতার যে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীতি আছে, তাহা প্রণিধান করিবার মত ধৈর্য আমাদের নাই। উদ্দীপ্ত হইলেই শঙ্করের পান করিবার বাসনা হয়। চেয়ারে শুইয়াই হাঁকিল, অমিয়া।

অমিয়া একটু দিবানিদ্রা উপভোগ করিবে বলিয়া শুইয়াছিল, সবে বেচারির তন্দ্রাটি আসিয়াছিল, উঠিয়া আসিতে হইল।

কী?

একটু চা কর না।

অমিয়া চলিয়া গেল।

সহসা শঙ্করের চোখে পড়িল, ডালা মাথায় করিয়া যমুনিয়া যাইতেছে। তাহার পিছু পিছু ভালমানুষের মত মুশাইও চলিয়াছে। যমুনিয়া মাতৃমূর্তি। মুশাই যেন দুষ্টু অবাধ্য ছেলে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ভালমানুষ সাজিয়া কর্তব্য পালন করিতেছে। মুশাই একবার আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিয়া হাসিল।

শঙ্করের সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে মুগ্ধনেত্রে বসিয়া ছট পরবের শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

অমিয়া চা আনিল।

এইবার খাতা-কলম চাই নাকি?

চাই। অমিয়া গনগন করিয়া বলিল, খালি ফরমাশের ওপর ফরমাশ! ভাবলুম, একটু ঘুমব—

খুকি ঘুমিয়েছে?

তাকে যদুয়া ছটের মেলা দেখাতে নিয়ে গেছে।

অমিয়া খাতা ও ফাউন্টেন-পেন দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শঙ্কর আবার ডাকিল।

সিগারেট দেশলাই।

বাবা-বাবা!

শঙ্কর যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, অমিয়াকে ফরমাশে ফরমাশে অস্থির করিয়া তোলে। অনেক সভ্য স্বামী স্ত্রীর সহিত লৌকিকতা করেন, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহাদের নানারূপ 'কন্‌সিডারেশন' আছে। শঙ্করের সে সব কিছুই নাই। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সে যেমন লৌকিকতা করে না, স্ত্রীর সহিতও করে না; অমিয়াকে সে সত্যই অর্ধাঙ্গিনী মনে করে। অমিয়াকে ঘিরিয়া কোনো রকম রোমান্স তাহার মনে জাগে নাই, অমিয়ার সহিত কোনো রকম ভণ্ডামি করাও সে প্রয়োজন মনে করে না, এমনকি অমিয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সে সর্বক্ষণ সজাগভাবে সচেতন নয় কিন্তু অমিয়া না হইলে তাহার জীবনযাত্রা অচল। অতিশয় অপ্রত্যক্ষভাবে নিঃশ্বাসবায়ুর মত অমিয়া সঙ্গোপনে তাহার জীবনের সহিত কখন যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানে না।

সিগারেট দেশলাই দিয়া অমিয়া বলিল, এবার যাই।

যাও।

চা শেষ করিয়া শঙ্কর সিগারেট ধরাইল এবং প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিল। পল্লী উন্নয়নের আবর্তে পড়িয়াও তাহার অন্তরবাসী কবি বিপর্যস্ত হয় নাই। সে সদা জাগ্রত, সদা উৎকর্ণ, কেবল দেখিতেছে, শুনিতেছে এবং মনে সুর লাগিলেই গান গাহিয়া উঠিতেছে। কোনো অজুহাতেই তাহাকে থামানো যায় না। শঙ্কর তন্ময় হইয়া লিখিতে লাগিল, যদিও তাহার এখন স্যানিটেশন বিভাগ পরিদর্শন করিতে যাওয়া উচিত ছিল।

তের

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মেঠো পথ বাহিয়া শঙ্কর একা ফিরিতেছিল। গ্রামের বাহিরে কৃষকদের চাষের নিমিত্ত গত বৎসর যে ইঁদারাটি প্রস্তুত করানো হইয়াছিল সেটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই পরিদর্শন করিতে শঙ্কর গিয়াছিল। পরিদর্শন করিয়া চিত্ত আনন্দিত হয় নাই, অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা আনন্দজনক নহে। জীবন চক্রবর্তী পুরা টাকা লইয়া কাজে ফাঁকি দিয়াছে। সে-ই এ অঞ্চলের সমস্ত ইঁদারার কন্ট্রাক্ট লইয়াছিল। যে পরিমাণ চুন সুরকি প্রভৃতি দিলে পাকা ইঁদারা সত্যই পাকা হয়, সে পরিমাণ চুন সুরকি দেওয়া হয় নাই, ইহাই সকলে বলিল। এ অঞ্চলের সব ইঁদারাই ভাঙিয়া পড়িতেছে। জীবন গ্রামেরই ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী, তাহার ন্যায্য মজুরি তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তবু সে অন্যায়ভাবে চুরি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। উৎপল বলিয়াছিল, কোনো সাহেব কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দিতে, কিন্তু শঙ্করের কোনো কথার উপর সে কথা কহিবে না প্রতিশ্রুতি ছিল, তাই শঙ্কর যখন তাহাতে সায় দিল না, সে চুপ করিয়া গেল। শঙ্কর ভাবিয়াছিল, কী হইবে বিদেশি লোক ডাকিয়া। এই সামান্য কাজ কী আর দেশের লোকেরা করিতে পারিবে না?

বিশেষত কেনারাম চক্রবর্তীর পুত্র জীবন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সোৎসাহে ইঁদারাগুলির ভার লইল, তখন শঙ্করের আর কোনো সংশয় রহিল না। এখনও কোনো সংশয় নাই, কেবল তাহার মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। নিতান্ত আপনজন যদি নিঃসংশয় চোর প্রতিপন্ন হয়, তখন যেমন জ্বালা করে, তেমনই জ্বালা করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এমন কেন হয়? কোনো সাহেবের আপিসে চাকরি করিতে পাইলে এই জীবন উপরওয়ালার চাবুকের ভয়ে অতিশয় দক্ষতার সহিত কাজ করিত, চুরি করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু চাবুকভয়শূন্য জীবন কিছুতেই স্বাধীনভাবে স্বকর্তব্য সুষ্ঠুভাবে করিবে না। তাহার শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রতা কোনো কিছুরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার উপায় নাই। করিলেই ঠকিতে হইবে। চাবুক না মারিলে কাজ করিবে না, দেশের কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তো করিবেই না, মজুরি পাইলেও করিবে না। অথচ বাহিরে কী অপরূপ ছদ্মবেশ। বি এ পাশ করিয়াছে, দেশের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে, বর্তমান যুদ্ধের প্রগতি ও পরিণাম বিষয়ে বিজ্ঞের মত বচন বিস্তার করে, লেনিন-স্টালিন-গান্ধী সকলের চরিত্র নখদর্পণে, দেশের বেকার-সমস্যা লইয়া ক্ষোভের অন্ত নাই, অথচ নিজে চোর। এই ছোকরাই সেদিন সামান্য লাউচুরির অপরাধে নিজেদের চাকরটাকে পুলিসে দিয়াছে। হঠাৎ শঙ্করের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইল। দেশের শিক্ষিত যুবকেরাই তো দেশের আশা-ভরসা, তাহাদের উপর যদি আস্থা স্থাপন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে উপায় কী! শঙ্কর বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাপারটাকে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কেন এমন হয়? ইহারা শিক্ষিত, ইহাদের সমস্ত শিক্ষা এমনভাবে নিষ্ফল হইয়া গেল কেন? যে শিক্ষার চাকচিক্য ইহাদের রসনার তুণ্ডাগ্রে ক্ষণে ক্ষণে ঝলমল করিয়া উঠে, তাহার সামান্যতম দীপ্তিও ইহাদের চরিত্রে প্রতিভাত হয় না কেন? গলদটা কোথায়?

বাবু!

মৃদু নারীকণ্ঠের ডাক শুনিয়া শঙ্কর সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল।

কে?

ফুলশরিয়া!

নামটা শুনিয়া শঙ্কর মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল।

এই অস্পৃশ্য মেয়েটার সহিত নিপুদার নাম যুক্ত করিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা শঙ্করের অবিদিত ছিল না। এ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে নিপুদাকে কিছু বলিতেও পারে নাই। উচিত হইলেও ইহা লইয়া নীতিগর্ভ বক্তৃতা দিবার অধিকার আর যাহারই থাক, তাহার যে নাই, ইহা সে সসঙ্কোচে অনুভব করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠানের হিতার্থে এ বিষয়ে নীরবে থাকা উচিত নয় তাহা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু কী করিয়া যে কথাটা পাড়িবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখন সহসা নির্জন গ্রামপ্রান্তে সেই মেয়েটার সহিতই মুখোমুখি হওয়াতে সে ভয় পাইয়া গেল। নিপুদার নামে নালিশ করিতে আসিয়াছে নাকি! তাহা হইলে তো অতিশয় অস্বস্তিকর 'পরিস্থিতি'।

কি চাই?

ফুলশরিয়া কিছু বলিল না, নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শঙ্করের মনে হইল, কাঁদিতেছে।

কি চাই? শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল।

ফুলশরিয়া মৃদুকণ্ঠে যাহা বলিল, তাহাতে শঙ্কর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিপুদার সম্বন্ধে কিছু নয়, স্বামীর অসুখের কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার স্বামী নাকি বহুদিন হইতে অসুস্থ, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তিন মাস ধরিয়া 'দাবাই পানি' করিয়াছেন, কিছুই

হয় নাই। সেদিন নট্টুবাবু আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে চরণবাবুকেও একবার ডাকিয়া দেখানো উচিত, কারণ একা তিনি এ রোগ সামলাইতে পারিবেন না। নট্টুবাবু গরিবের 'মাই বাপ', তাহাকে বিনা ফিসে ডাকা যায়, কিন্তু চরণবাবুকে ডাকিতে তাহাদের সঙ্কোচ হইতেছে। এ গ্রামে আসিলে সাধারণত তিনি আট টাকা ফিস নেন, কিন্তু আট টাকা দেওয়া তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত, বাবু যদি একটা চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি কমে আসিতে রাজি হইতে পারেন। রূপার চুড়ি বন্ধক দিয়া সে গোটা চারেক টাকা কোনোক্রমে জোগাড় করিয়াছে।

সহসা ফুলশরিয়া বসিয়া পড়িল এবং শঙ্করের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, দয়া করো বাবু।

হয়েছে কি তোর স্বামীর?

ঘা।

ঘা?

ফুলশরিয়া যে নিপুদার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া তাহাকে বিপন্ন করে নাই, ইহাতেই শঙ্কর মেয়েটার প্রতি মনে মনে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল।

চল্, দেখে আসি কী হয়েছে।

ফুলশরিয়ার সঙ্গে যাইতে যাইতে একটা কথা সহসা শঙ্করের মনে পড়িল। ফুলশরিয়ার আবার স্বামী কি? সে তো পতিতা। পতিতারও একটা লোক-দেখানো স্বামী থাকা অসম্ভব নয়—মনকে এই বলিয়া সে প্রবোধ দিল। কিছুক্ষণ হাঁটিয়া একটি মাটির ছোট কুঁড়েঘরে উপস্থিত হইয়া যে যাহা দেখিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। ঘরের কোণে খাটিয়ায় হরিয়া শুইয়া আছে। হরিয়া জাতিতে কুর্মী, স্বাভাবিকভাবে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইতে পারে না। হরিয়া এককালে তাহাদের ভৃত্য ছিল। শুধু তাহাদের নয়, অনেকের বাড়িতেই সে চাকরি করিয়াছে, কিন্তু কোথাও টিকিয়া থাকে নাই। কোথাও টিকিয়া থাকা তাহার স্বভাব নয়। কিছুদিন আসামে পালাইয়া গিয়া চা-বাগানে কুলিগিরি করিয়াছিল, একটা পাটের কলেও নাকি কিছুদিন মজুর খাটিয়াছে। এই পর্যন্ত ইতিহাস শঙ্কর জানিত, তাহার পর কিছুদিন তাহার কোনো পাত্তাই ছিল না। কবে সে ফিরিয়াছে এবং কিরূপে সে ফুলশরিয়ার স্বামী হইয়া পড়িয়াছে তাহা শঙ্কর জানিতে পারে নাই। হঠাৎ এতদিন পরে তাহাকে ফুলশরিয়ার ঘরে রোগশয্যায় শয়ান দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। সর্বাঙ্গে বড় বড় ঘা, নাকটা বসিয়া গিয়াছে, বীভৎস চেহারা! দেখিয়া মনে হয়, কুষ্ঠ হইয়াছে।

হরিয়ার উত্থানশক্তি রহিত। শুইয়া শুইয়া হাত তুলিয়া প্রাক্তন মনিব শঙ্করকে সেলাম করিল। সে-ই ফুলশরিয়াকে শঙ্করের কাছে পাঠাইয়াছে।

তোর স্বামী?

ফুলশরিয়া নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর ইতিপূর্বে মেয়েটাকে ভাল করিয়া দেখে নাই।

কেরোসিনের স্বল্পালোকে আজ প্রথম ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। রূপসী নয়, রঙ কালো। বয়সও খুব কম নয়, ত্রিশের উপর হইবে। স্বাস্থ্য কিন্তু নিটোল এবং অটুট। চোখের দৃষ্টিতে, পুষ্ট অধরে, গর্বিত গ্রীবাভঙ্গিমায় আকর্ষণী শক্তি আছে।

শঙ্কর পুনরায় হরিয়াকে প্রশ্ন করিল, তুই একে বিয়ে করেছিস নাকি?

ফুলশরিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

খোনা স্বরে হিন্দি ভাষায় হরিয়া বলিল, না বাবু, ওকে আমি 'সাধি' করি নাই। কিন্তু ও-ই আমার সব। আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভাইরা আমাকে দেখে না, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। ও-ই কেবল আমাকে ছাড়ে নাই। আমি পাজি, বদমাশ,

লুচ্চা— ও সব জানে, তবু আমাকে ছাড়ে না। আমি রোজ কত বলি, তুই কেন এ মুর্দার কাছে পড়িয়া আছিস, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি মরিয়া পচিয়া শেষ হইয়া যাই, তুইও আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করিস কেন? রাস্তায় ফেলিয়া দিতে না পারিস, হাসপাতালে দিয়া আয়। ও কিন্তু কিছুতে আমার কথা শোনে না বাবু, নিজের জেবর শাড়ি বেচিয়া ডাক্তার ডাকিতেছে, রোজ নিজের হাতে আমার এই পচা ঘা সাফ করে—

হরিয়ার চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ফুলশরিয়া হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল, চুপ চুপ ঢের ভেলো—

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল এবং দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, বিছানার চাদর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ব্যান্ডেজের ন্যাকড়াগুলি ধপধপ করিতেছে, এই কুঁড়েঘরেও হরিয়া রাজার হালে রহিয়াছে।

হরিয়া আবার শুরু করিতেছিল, বাবু—

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা আমি যতদূর পারি ব্যবস্থা করব। চরণবাবুকে খবর দেব কালই। এখন চললাম। ভাল হয়ে যাবি, ভয় কী?

হরিয়া দুর্বল কম্পিত হস্ত তুলিয়া পুনরায় সেলাম করিল।

শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়াও বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, একে হাসপাতালে দিতে এত আপত্তি কেন?

ওহাঁ আচ্ছা দবাই নেই দেইছে।

শঙ্করের কৌতূহল হইল। সর্বাঙ্গে-ঘা অসমর্থ দরিদ্র হরিয়াকে এমনভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার নিগূঢ় মনস্তত্ত্বটা কী? প্রেম? তাহার মন পরীক্ষা করিবার জন্য শঙ্কর বলিল, ও যখন তোর স্বামী নয়, তখন শুধু শুধু ওর জন্যে খরচ করে মরছিস কেন? হাসপাতালেই দে।

ফুলশরিয়া মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। তাহার নিজস্ব হিন্দিতে বলিল, ও যদি সুস্থ হইত, উহাকে অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারিতাম। এখন কিন্তু পারি না। আমিই উহাকে ওই রোগ দিয়াছি। রোগের জন্যই ওর এই দশা, আমি সময়মত 'জকশন' লইয়া ভাল হইয়া গিয়াছি। ও প্রথমে রোগটাকে গ্রাহ্যই করে নাই, নানারকম দেশি জড়িবুটি করিয়াছিল, এখন একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগের জন্যই উহার আত্মীয়-স্বজন উহাকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু আমি কী করিয়া ত্যাগ করি? আমার জন্যই যে ওর রোগ।

তাহার পর আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল, উপরে মালিক আছেন, তিনি সব দেখিতেছেন, আমি বেইমানি করিতে পারিব না, আমি জান দিয়া উহাকে ভাল করিয়া তুলিব।

আচ্ছা, কাল চরণ ডাক্তারকে খবর পাঠাব তা হলে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিপু আসিয়া হাজির হইল।

হরিয়া আজ কেইসা হ্যায়?

আচ্ছা।

ফুলশরিয়ার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া নিপু বলিল, উস্‌কা দবাইকা বাস্তে দাইকা মারফত রুপিয়া ভেজা থা, মিলা?

কোনো উত্তর না দিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং দুইখানি দশ টাকার নোট আনিয়া নিপুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, যাইয়ে।

ইসকা মানে?

ঝপাৎ করিয়া ঝাঁপটা ফেলিয়া ফুলশরিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। নিপু বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নিচের পড়িবার ঘরে একটি সুদৃশ্য আলো জ্বালিয়া উৎপল তন্ময় হইয়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত চীন দেশের রূপকথা পড়িতেছিল।

শঙ্কর হনহন করিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

শিক্ষা মানে কি বলতে পার? আসল শিক্ষা কাকে বল তুমি? এ কি করছি আমরা?

তার মানে?

বিস্মিত উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

আনুপূর্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, এখন বল, কে শিক্ষিত? জীবন চক্রবর্তী, নিপুদা, না ফুলশরিয়া?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু কোনো জবাব দিল না, কেবল গম্ভীরভাবে বাম-গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল। কিছুদিন হইতে সে গোঁফ রাখিতে শুরু করিয়াছে।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

মনের মত উত্তর যদি শুনতে চাও, ওপরে চল, কুন্তলাদেবী এসেছেন।

এমন সময় তিনি হঠাৎ?

হরিহরদা এই পাড়ায় এসেছেন কোনো একটা কাজে. তাঁরই সঙ্গে এসেছেন।

আমার সঙ্গে আলাপ নাই যে।

তার জন্য আটকাবে না, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, চল। চীনে-পরীদের গল্প গিলে গিলে মুখটাও মেরে গেছে আমার সঙ্গে থেকে। মুখটা একটু বদলানো যাক, চল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই তিনি বেশ ঝাঁজালো গোছের একটা উত্তর দেবেন।

তোমার উত্তরটা কি শুনি?

আমি উত্তর দিতে পারব না। তবে যদি আপত্তি না থাকে, পরামর্শ দিতে পারি।

কি পরামর্শ?

একজন এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ভাঙা ইঁদারাগুলো পরীক্ষা করাও, তিনি যদি বলেন যে, জীবন সত্যিই জোচ্চুরি করেছে, তা হলে তার নামে কেস ঠুকে দাও। আর তোমার নিপুদা, যদি সত্যি অপরিহার্য রকম কাজের লোক হন, তা হলে তাঁকে অপদস্থ করা ঠিক হবে না। তাঁকে বরং কিছু টাকা আর ছুটি দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও, একটু ঝরঝরে হয়ে ফিরে আসুন ভদ্রলোক। হাসছ যে? এরকম করে পারে নাকি মানুষ!

হাসছি বটে, কিন্তু আমি কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ছি।

হতাশ হবার কী আছে? পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,— ধাবিত হওয়াই আমাদের কাজ, থামলে চলবে না। চল, ওপরে চল।

কুন্তলাদেবীর সহিত সহজেই আলাপ হইয়া গেল।

উৎপল পরিচয় করাইয়া দিতেই শঙ্কর বলিল, অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে। কিন্তু সুযোগ হয়নি এতদিন।

কুন্তলা বসিয়া পান সাজিতেছিল, এই কথায় হাসিমুখে শঙ্করের দিকে একবার চোখ তুলিয়া পানই সাজিতে লাগিল, কোনো কথা কহিল না। উৎপল পরিচয় করাইয়া দিয়া গম্ভীরভাবে কোণের ক্যাম্প-চেয়ারটায় গিয়া বসিল এবং একটি সিগারেট ধরাইল। কি ভাবে আলাপ চালানো যায়, শঙ্কর মনে মনে একটু বিব্রত বোধ করিতেছিল, এমন সময় সুরমা পাশের ঘর হইতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আপনি এসে গেছেন দেখছি ঠিক সময়ে, এক্ষুনি আপনার বিষয়েই কথা হচ্ছিল কুন্তলার সঙ্গে। ও আপনার 'কুসংস্কার' লেখাটি প'ড়ে চটেছে।

কুন্তলা আর একবার হাসিভরা দৃষ্টি তুলিয়া শঙ্করের দিকে চাহিল, তাহার পর সুরমাকে বলিল, প্রথম পরিচয়ের মুখেই একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করিয়ে দিয়ে ভাল করলে না তুমি। উনি লেখক মানুষ, লেখার নিন্দে করলে ওঁর সমস্ত মন সজারুর মত কণ্টকিত হয়ে উঠবে।

শঙ্করবাবু সে রকম পরমুখাপেক্ষী লেখক নন। তুমি সত্যিই যখন চটেছ, তখন বলতে বাধা কি?

চটিনি। শঙ্করবাবুর মত প্রতিভাবান লেখককেও গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসতে দেখে দুঃখ হচ্ছিল। কুসংস্কার সম্বন্ধে ওসব কথা ক্রিশ্চান আর ব্রাহ্ম মিশনারিদের মুখে অনেকবার শুনেছি আমরা। ওঁর কাছ থেকে নতুন কথা শুনব আশা করেছিলাম।

উৎপলের চক্ষু দুইটি আরও কৌতুকদীপ্ত হইয়া উঠিল। সিগারেটে সন্তর্পণে টান দিতে দিতে সে পা দোলাইতে লাগিল।

হঠাৎ এমন কথা কুন্তলার মুখে শুনিবে, শঙ্কর আশা করে নাই। 'কুসংস্কার' প্রবন্ধটা সে অনেক দিন পূর্বে লিখিয়াছিল, যদিও সেটা সম্প্রতি 'সংস্কারক' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। 'কুসংস্কার' সম্বন্ধে তাহার নিজের মত বদলাইয়াছে। ছট পরবের পর যে প্রবন্ধটি সে লিখিয়াছে, তাহাতে তাহার পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় আছে। কিন্তু নতমুখী বধূটির মুখে এ কথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই এ বিষয়ে মেয়েটি কতদূর চিন্তা করিয়াছে, তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না, ঠিক করিল, তর্ক করিবে।

সুরমা বলিল, কিন্তু ওঁর ভাষা আর উপমাগুলো যে চমৎকার সেটা তোমাকে মানতেই হবে।

মানছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলছি যে, ভাষা আর উপমা চমৎকার ব'লেই ও প্রবন্ধ আরও ভয়ঙ্কর। যে পড়বে, সে-ই মুগ্ধ চিত্তে ওর প্রতি কথাটি বিশ্বাস করবে।

করলেই বা ক্ষতি কি?

গম্ভীরভাবে শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

আপনারা তা হ'লে তর্ক করুন, আমি ট্যাঁপারির জেলিটা চড়িয়ে এসেছি, দেখি, যদি কুন্তলা থাকতে থাকতেই নামাতে পারি। সঙ্গেই দিয়ে দেব তা হ'লে। শঙ্করবাবু নেবেন নাকি একটু?

না। ট্যাঁপারির গন্ধ পছন্দ নয় আমার।

অমিয়া কিন্তু ভালবাসে, তাকেই পাঠিয়ে দেব।

সুরমা চলিয়া গেল। কুন্তলা নীরবে পানগুলি লবঙ্গ দিয়া মুড়িতে লাগিল। শঙ্করই পুনরায় কথা কহিল, আমার প্রবন্ধে আপত্তি আপনার কোন্‌খানটায়?

সবটাতেই। আপনি যা বলছেন তা সত্যি নয়, কুসংস্কার আমাদের পঙ্গু করেনি। আপনি মুখস্থ বুলি আউড়েছেন মাত্র।

আমি যেসব কুসংস্কারের উল্লেখ করেছি, আপনি সেগুলো সমর্থন করেন, এই কি আমাকে বুঝতে হবে?

এতক্ষণ কুন্তলা ধীরকণ্ঠে কথা কহিতেছিল, শঙ্করের এই কথায় যেন আহত ফণিনীর মত তর্জন করিয়া উঠিল।

দেখুন, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত বর্বর, বিদেশি অনাত্মীয়দের মুখে এসব কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন তলিয়ে বোঝবার সময় এসেছে যে, কথাগুলো সত্যি কি না।

আপনার মতে তা হলে ওগুলো কুসংস্কার নয়?

কোন্‌টা কু, কোন্‌টা সু, তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি যে, যাদের আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ঘৃণা করতে শিখেছি, মানুষ হিসাবে তারা আজকালকার সংস্কারমুক্ত স্বার্থপর নাস্তিকগুলোর চেয়ে ঢের বড়। ওরাই দেশের মেরুদণ্ড।

শঙ্করের ফুলশরিয়ার কথা মনে পড়িল। বলিল, তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি যদি বলি, কুসংস্কারবর্জিত হলে ওরা আরও বড় হবে!

যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে তা তো মনে হয় না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কল্যাণে আমরা অনেকেই অনেক রকম কুসংস্কার ত্যাগ করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যই বড় হয়েছি কি?

হইনি স্বীকার করছি। কিন্তু তার অন্য কারণও থাকতে পারে। কতকগুলো যুক্তিহীন কুসংস্কার আঁকড়ে থাকলেই কি আমাদের মহত্ত্ব বাড়বে?

হ্যাঁ, বাড়বে। সমাজ-জীবনের একটা স্তরে ওর প্রয়োজন আছে। আচ্ছা, আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। এ যুদ্ধের বাজারে প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাবে না, মিলিটারি ট্রেনিং আপনি ভাল মনে করেন, না, খারাপ মনে করেন?

নিশ্চয়ই ভাল মনে করি।

কেন? কতকগুলো লোক ক্যাপ্টেনের হুকুম পাওয়ামাত্র কোনো একটা জিনিস লক্ষ্য করে দমাদ্দম গুলি ছুঁড়ছে, 'মার্চ' কথাটা উচ্চারিত হতে না হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, কখনও এগুচ্ছে কখনও পেছুচ্ছে, একটা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে বিশেষ রকম কায়দায় হাত পা ছুঁড়ে ড্রিল করছে, এগুলো কুসংস্কার নয়? যাকে নিরীহ বলে জানে, তাকে নির্বিচারে হত্যা করার মধ্যে কি যুক্তি আছে? প্রত্যেক সৈনিক যদি ওপরওয়ালার প্রত্যেক আদেশটি নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায় তা হলে কী রকম হয় সেটা?

মিলিটারি ট্রেনিং মিলিটারি ডিসিপ্লিন শেখায়, ওতে চরিত্র দৃঢ় হয়, এইটেই ওর সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি।

ওপরওলা অফিসারকে দেখামাত্র খটাৎ করে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে স্যালুট করা তা হলে আপনি কুসংস্কার মনে করেন না? আপনার যত আপত্তি দিশি কুসংস্কারের বেলায়? আমি যদি বলি, ওগুলোর উদ্দেশ্যও চরিত্র দৃঢ় করা? একাদশীর দিন উপবাস করা, একটা বিশেষ বারে বেগুন না খাওয়া, পূজো-পার্বণে নিষ্ঠা নিয়ম অনুসারে চলা, এসবের প্রত্যেকটির মধ্যেই কোন একটি সংযত আত্মসম্বরণের ভাব আছে, যা মেনে চলতে পারলে চরিত্র সত্যিই উন্নত হয়।

তাই যদি হয়, তা হলে সেটা স্পষ্ট করে বলা নেই কেন?

মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিও সব সময়ে স্পষ্ট করে বলা হয় না। মিলিটারি আইন হচ্ছে : You are not to reason why —

কিন্তু কুসংস্কারের সঙ্গে যে কতকগুলো জিনিস স্পষ্টভাবেই জড়ানো আছে দেখা যাচ্ছে, যথা— ভগবান, পরলোক, পাপপুণ্য—

না জড়ালে লোকে মানত না। কোর্টমার্শালের ভয় না থাকলে সাধারণ সৈনিক যেমন মিলিটারি আইন মানে না। ওগুলো আমাদের অদৃশ্য কোর্টমার্শাল। সাধারণ মানুষকে সৎপথে রাখবার আর কোনো উপায় নেই।

আমি কুসংস্কার না মেনেও সৎপথে থাকতে পারি।

আপনি অসাধারণ মানুষ। আমি সাধারণ লোকের কথা বলছি। সাধারণ লোক যদি অসাধারণত্বের ভান করে তা হলে যা কাণ্ড হয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকাল। অঙ্ক শাস্ত্রে যার কিছুমাত্র অধিকার নেই, সেই অর্বাচীনটা নামতা মুখস্থ করা, জ্যামিতি পড়াকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে উচ্চস্তরের গণিত শাস্ত্রের বুলি কপচাচ্ছে সস্তা ছাপাখানার দৌলতে, আর আপনারা তাই দেখে বাহবা করছেন।

আমি অন্তত করছি না। আমাদের কুসংস্কারগুলো যুক্তি-সহ কিনা, তাই ওই প্রবন্ধটায় বিচার করবার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র। ওটা আমার অনেকদিন আগের লেখা। এখন আমারও মত অনেকটা বদলেছে, কিন্তু তবু আমি নির্বিচারে অন্ধ কুসংস্কার মানবার পক্ষপাতী হইনি এখনও।

ভাল করে ভেবে দেখলে হবেন।

দেখি।

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিতেই উৎপল বলিয়া উঠিল, শঙ্কর হেরে গেছে তোমার বন্ধুর কাছে। প্রায় স্বীকার করে ফেলেছে যে কুসংস্কারগুলোর একটা সার্থকতা আছে।

কুন্তলা হাসিল। সুরমা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমি কিন্তু তোমার মতে মত দিয়ে পাঁজি দেখে চলতে পারব না। আমার যেদিন খুশি আমি অলাবু ভক্ষণ করব।

তা করো। জেলি কতদূর?

ঠাণ্ডা করতে দিয়েছি।

উৎপল বলিল, শঙ্করের পরাজয় উপলক্ষে একটু চা খেলে কেমন হয়?

এত রাত্রে আবার চা কেন? সুরমা ঈষৎ ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিল।

উৎপল ক্যাম্প-চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

কই, চল এবার, রাত হয়ে গেল।

কুন্তলার স্বামী হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন।

মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া কুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সভা ভঙ্গ হইল।

চোদ্দ

পাড়ায় 'রাম লীলা' হইতেছে। খুকিকে লইয়া অমিয়া শুনিতে গিয়াছে। শঙ্কর নিজেও যদিও এই 'রাম-লীলা'র একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু শরীরটা তেমন ভাল নাই বলিয়া যায় নাই, বারান্দায় আরাম-কেদারায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার অভাবে 'রাম-লীলা' উৎসবের এতটুকু অঙ্গহানি যে হইবে না, তাহা সে ভালভাবেই জানে। ক্রমশ এই কথাটা সে উপলব্ধি করিতেছে যে, যাহাদের আমরা 'মাস' অর্থাৎ জনসাধারণ বলি, তাহাদের সহিত অন্তরের যোগ রক্ষা করা কত কঠিন। আমাদের অন্তরে উহাদের স্থান নাই, উহাদের অন্তরেও আমাদের স্থান নাই। আমরা উহাদের অনুগ্রহ করি, উহারা আমাদের সেলাম করে। সম্পর্ক শুধু এইটুকু। উহাদের উৎসব আমাদের অনুপস্থিতিতে অঙ্গহীন হয় না, আমাদের উৎসব উহাদের যোগদানের

অপেক্ষা রাখে না। আমরা ভিন্ন জাতের লোক, আমরা পর। আমরা যে উহাদের হিতার্থে এত করি, তাহা কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, আন্তরিক আবেগবশত নহে।

সহসা কুন্তলার কথা শঙ্করের মনে পড়িল। সেদিন যদিও তাহার সহিত মতের কিছুমাত্র অমিল হয় নাই, তবু কেমন যেন খটকা লাগিয়াছিল। কেমন অদ্ভুত যেন মেয়েটি। ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়া উল্টা কথা বলিবার ঝোঁকটা যেন বড় বেশি রকম উগ্র। কথাবার্তা যেন তীরের মত। তীরন্দাজের লক্ষ্যভেদ-শক্তি দেখিয়া কিন্তু আনন্দিত হয় না, তীরের ফলাটা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া মর্মস্থল বিদ্ধ করে। উহার যুক্তি মানিলেও উহার কথাবার্তার ধরন, উহার দলিত-ফণিনী মূর্তি দেখিয়া উহাকে আপন লোক বলিয়া মানিতে মন ইতস্তত করে। কুন্তলার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গোল আছে, ইংরেজি ভাষায় যাহাকে 'কমপ্লেক্স' বলে। বেলা মল্লিকের কথাও মনে পড়িল। মেয়েটা পুরুষ-বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিলাতে কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে কে জানে! নারীবেশে সমাজ থাকিতে পারিল না? কেন পারিল না? পাছে পুরুষের সংস্পর্শে আত্মসম্মান আহত হয়? পুরুষের বাহুপাশে কিছুতেই ধরা দিবে না, এ অসম্ভব প্রতিজ্ঞার দুর্গে একটা অস্বাভাবিক আত্মসম্মানকে বাঁচাইয়া রাখার অর্থ কী? কোনো একজন পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেই তো হইত? এত অহঙ্কার কিসের? মনোমত পুরুষ জুটিল না! মনোমত আহার না জুটিলে কী অনাহারে থাক, মনোমত শয্যা না জুটিলে কি অনিদ্রায় কাটাও, বিবাহের বেলাতেই বা এত বিচার কেন? শঙ্করের মনে হইল, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে সকলেই একটা অস্বাভাবিক আদর্শের পিছনে ছুটিতেছে। কুন্তলা পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার বিরোধী। কিন্তু তাহার বিরোধিতাটাই কেমন যেন প্রতিক্রিয়াক্লিষ্ট হিংস্র মূর্তি ধরিয়াছে। ইহার অন্তরালে ক্ষোভের একটি গ্লানি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যেন। একজন মাতালের কথা মনে পড়িল। সে হুইস্কি পান করিয়া, যতক্ষণ নেশায় থাকিত, ততক্ষণ কুৎসিত ভাষায় হুইস্কিকেই গালাগালি দিত। উদরস্থ বিলাতি সুরাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, ওরে শালা তুই কি ভেবেছিস, তুই মস্ত বড় একটা কিছু? তুই তো ছেলেমানুষ রে ব্যাটা। সোমরসের নাম শুনেছিস? মাধ্বী, গৌড়া, পৈষ্ঠীর কথা জানিস? এদের কাছে তুই তো একটা অপোগণ্ড নাবালক রে। কুন্তলারও বোধ হয় সেই দশা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সে সর্বান্তঃকরণে সেই শিক্ষারই বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই জাতীয়তাবোধ আমরা কোথা হইতে পাইলাম? সহসা শঙ্করের মনে হইল এই জাতীয়তাবোধ জিনিসটা যে ভাবে আমরা চর্চা করিতে শিখিয়াছি, তাহা সত্যই কি ভাল? এই জিনিসটাকে কেন্দ্র করিয়াই তো আধুনিক মানবের নীচতা হীনতা হিংস্রতা সমগ্র বীভৎস রূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। একটা বড় নামের আড়ালে ইহা কি স্বার্থপরতারই জঘন্যতম রূপ নয়? ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্রাহ্মণত্বে। সে ব্রাহ্মণত্ব এখন অবলুপ্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারই আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? বর্বরসুলভ এই হানাহানির আদর্শে ভারতীয় প্রতিভা কি স্বচ্ছন্দে স্ফূর্তি পাইবে? ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কী, শঙ্কর চিন্তা করিতে লাগিল। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ— ইহাই কি ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের শেষ কথা? কিছুই কিছু নয়, সবই মায়া, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত এই সংসার ত্যাগ কর, এষণা-মুক্ত হও— ইহাই যদি ভারতীয় ঋষির নির্দেশ হয়, জাতীয় পতাকা আস্ফালন করিয়া তাহা হইলে এসব পণ্ডশ্রম কেন? পল্লী-সংস্কারেরই বা প্রয়োজন কী? যাহা মন্দ তাহা কালক্রমে আপনিই ভাল হইবে, সত্য শিব-সুন্দর যথাস্থানে যথাসময়ে নিজেকে প্রস্ফুটিত করিবেন, অলীক অবিদ্যা মিথ্যা মরীচিকাবৎ আপনি বিলুপ্ত হইবে। আমি ছটফট করিয়া মরিতেছি কেন? আমি কে? কী ক্ষমতা আছে আমার? পরক্ষণেই শঙ্করের মনে হইল, সংসারটা যে মায়া-মরীচিকা ইহা

আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এই মন্ত্রে বিহ্বল হইয়া হিন্দুসভ্যতা জড়ত্বকে কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সত্য সত্যই যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা সংসারের নশ্বরত্বকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই তপস্বী মহাপুরুষ হিন্দুসমাজের শিরোমণি, কিন্তু সকলেই শিরোমণি হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, সকলের সে অধিকারও নাই। সমাজের অধিকাংশ লোকই সাধারণ লোক। তাহারা যাহাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণেরাই করিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণ সমন্বিত হিন্দুসমাজের গুণানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য সুনির্দিষ্ট আছে। দ্রোণাচার্য ও পরশুরামের কথাও শঙ্করের মনে পড়িল। উঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপস্যাও করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রয়োজনের সময় অস্ত্রচালনা করিয়া শত্রু হনন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। শঙ্কর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভারতীয় আদর্শ তাহা হইলে নিছক মায়াসর্বস্ব নির্বেদ নয়। উহাতে বলিষ্ঠ পুরুষকারেরও স্থান আছে। উহাতে স্থান নাই কেবল মূঢ় আসক্তির, যে আসক্তি মানুষের হিতাহিত-জ্ঞান অবলুপ্ত করে। সংসারকে মায়াময় জানিয়াও নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত চিত্তে সমাজের হিতার্থে প্রত্যেককে স্বকর্তব্য করিতে হইবে, ইহাই আমাদের জাতীয়তা। বর্তমান যুগের স্বার্থপঙ্কিল পরস্বলোলুপ ন্যাশনালিজম নহে। আমাদের সঙ্কীর্ণতা নাই, কারণ আমরা জানি সংসার মায়াময়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রত্যেকেই জানে, সংসার মায়াময় অথচ প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, স্বকর্তব্য সাধন না করিলে এই মায়াপাশ ছিন্ন কবা যাইবে না। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। ইহাই আমাদের সনাতন আদর্শ, ইহাই আমাদের কর্তব্য। অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ও বিশ্বাস করিবে, সংসার অনিত্য, তবু সে যুদ্ধ করিবে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, আদর্শ ও কর্তব্যের জন্য, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে।

স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতামুক্ত নিরাসক্তচিত্ত নিষ্কাম কর্তব্যপরায়ণ সমাজ এ যুগে স্থাপন করা কি সম্ভব? কেন সম্ভব নয়? শিক্ষা দ্বারা সবই সম্ভব। শিক্ষাই গোড়ার কথা। সমস্ত দেশের চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,— রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। ভারতের সনাতন আদর্শকে নতুন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়া তাহার সমস্ত সত্তা যেন চরিতার্থ হইয়া গেল। শান্ত শুভ্র উদাত্ত বিরাট একটা অনুভূতি তাহার দেহমনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমন সময় বাই-সাইকেল ঘণ্টার শব্দে সচকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

কে?

কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর আসিল, আমি নিমাই।

ও, নিমাই, এস। এত রাত্রে হঠাৎ কী মনে করে?

কোনো খবর না দিয়ে মোটরে করে স্কুল-ইনস্পেক্টর এসেছেন একটু আগে। কাল আমাদের স্কুল দেখবেন। আপনাদের অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিটা একবার চাই।

কেন, কী হবে?

মুরগি রাঁধতে হবে তাঁর জন্যে।

একটু ইতস্তত করিয়া নিম্নকণ্ঠে নিমাই বলিল, মদও চাইছেন। এত রাত্রে মদ কি পাওয়া যাবে?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্রথমেই মুরগি ও মদের ফরমাস করিয়াছেন! দেশের শিক্ষার আদর্শনিয়ন্ত্রণের ভার ইঁহার উপর। আদর্শ চুলায় যাক, লোকটার চক্ষুলজ্জাও কি নাই! টুর করিবার জন্য উচ্চহারে ভাতা পান অথচ গরিব শিক্ষকেব বাড়িতে আসিয়া চড়াও হইযাছেন!

কোথায় উঠেছেন?

হেডমাস্টারবাবুর বাসায়।

শঙ্করের ইচ্ছা হইল, এখনই গিয়া লোকটাকে কড়া কড়া দুই-চারি কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু এ আবেগ তাহাকে সম্বরণ করিতে হইল। এই লোকটাকেই তোয়াজ করা হয় নাই বলিয়া কাঁটাপোখর স্কুলটা গভর্নমেন্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এবারও যদি ইহাকে তোয়াজ না করা হয় হাঁরাপুর স্কুলটার হয়ত সর্বনাশ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া নিমাই ঘটকের মুখ চাহিয়াই তাঁহাকে খুশি করা প্রয়োজন। সে আই এ ফেল অথচ হেডপণ্ডিতি করিতেছে। শঙ্করই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে। হেডপণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে, কিন্তু ব্যাপারটা আইনসঙ্গত নয়। ইনস্পেক্টর রুষ্ট হইলে কলমের এক খোঁচায় তাহার চাকরি চলিয়া যাইতে পারে।

এ তো এক আচ্ছা মুশকিল দেখছি!

এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি প্রথমে কেনারামবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও আজ মাংস রান্না হচ্ছে। হৃদয়বল্লভবাবু এসেছেন কি না কলকাতা থেকে।

যদিও অন্ধকারে শঙ্কর নিমাই ঘটকের মুখ দেখিতে পাইতেছিল না, তবু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইতেছিল, নিজের চাকরির জন্য সকলকে বিরক্ত করিতে হইতেছে বলিয়া বেচারা যেন সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছে। ইনস্পেক্টর আসিয়া রাত-দুপুরে মদ-মাংস দাবি করিয়াছে ইহা যেন তাহারই অপরাধ। ভারতীয় আদর্শে প্রত্যেক নরনারীর মন শিক্ষাসমৃদ্ধ করিতে পারিলে দেশের যে জাগরণ হইবে, এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে শঙ্কর তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল। সহসা সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। আদর্শের তুঙ্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া নিমাইকে আশ্বাস দিতে হইল, তার জন্যে কী হয়েছে, তুমি যাও, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

নিমাই তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

তুমি যাও, মুশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।

নিমাই চলিয়া গেল।

মুশাই।

মুশাই পাশেই কোথাও ছিল, ছায়ামূর্তির মত আসিয়া দাঁড়াইল।

দুটো মুরগি বেঁধে হরিপুরে এখুনি দিয়ে আসতে হবে। আর এক বোতল মদ। জোগাড় করতে পারবি?

হাঁ হুজুর।

শঙ্কর টাকা বাহির করিয়া দিল।

হাঁরাপুরে হেডমাস্টারবাবুর বাসায় দিয়ে আসতে হবে।

মুশাই চলিয়া গেল। শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া ইজিচেয়ারে পড়িয়া রহিল।

পনের

অলক্ষ্যে আর একটা মেঘও ঘনাইতেছিল।

কেনারাম চক্রবর্তী, ভূতপূর্ব জমিদার রাজবল্লভের একমাত্র পুত্র হৃদয়বল্লভ এবং বিখ্যাত মহাজন রাজীব দত্ত কেনারাম চক্রবর্তীর বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন।

জমিদারি বিক্রয় হইয়া যাইবার পর হৃদয়বল্লভ কলিকাতা হইতে অদ্য প্রথম আসিয়া গ্রামে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাও গোপনে, গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার আগমনবার্তা জানে না। রাত্রিবাস করিয়া কাল পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। প্রাক্তন নায়েব বন্ধুপ্রতিম কেনারাম চক্রবর্তীর বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছেন। এতদিন কেনারাম চক্রবর্তী এবং কেনারাম চক্রবর্তীর মারফত রাজীব দত্তের সহিত পত্রযোগে তাঁহার যে সব নিগূঢ় মন্ত্রণা চলিতেছিল, সাক্ষাতে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ মারা গিয়াছেন। কলিকাতায় নানা ঘাটের নানা জল আস্বাদন করিয়া, শেয়ার-মার্কেটে লোকসান দিয়া এবং চিকিৎসা-ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত হইয়া হৃদয়বল্লভ অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, কলিকাতায় থাকা তাঁহার পোষাইবে না। তাঁহাকে গ্রামেই পুনরায় ফিরিতে হইবে। কিন্তু যে গ্রামে এতদিন তিনি জমিদার ছিলেন, সে গ্রামে প্রজারূপে বিশেষ করিয়া সেদিনকার ছোঁড়া উৎপল এবং শঙ্করের আধিপত্যে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কী করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহারই জল্পনা-কল্পনা পত্রযোগে চলিতেছিল, কিন্তু এমন ঢিমা চালে চলিতেছিল যে, হৃদয়বল্লভ আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই অবিলম্বে ইহার একটা 'ফয়সালা' করিয়া ফেলিবার জন্য সশরীরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষেই কেনারাম, রাজীব দত্ত এবং প্রমথ ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার এখনও আসিয়া পৌছন নাই।

রাজীব দত্তই প্রধান ভরসা। হৃদয়বল্লভ নিজে প্রায় কপর্দকহীন। কেনারামের প্ররোচনায় রাজীব দত্ত সম্পূর্ণ জমিদারিটি মর্টগেজ রাখিয়া শতকরা পাঁচ টাকা সুদে আড়াই লক্ষ টাকা কর্জ দিতে রাজি হইয়াছেন। তিনজনই পাকা লোক. তিনজনেরই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। হৃদয়বল্লভ অপুত্রক এবং বিপত্নীক। পত্নী পুত্র উভয়েই কিছুকাল পূর্বে যক্ষ্মারোগের মারা গিয়াছেন। তিনি নিজেও যক্ষ্মাগ্রস্ত, আর বেশিদিন বাঁচিবার আশা নাই। যে কয়দিন বাঁচিবেন, পরের টাকায় জমিদারিটি ক্রয় করিয়া ভোগ করিতে চান। যদি ঋণশোধ করিতে না পারেন, জমিদারি না হয় রাজীবলোচনের হস্তগত হইবে, তাহাতে তাহার কী আসে যায়, উত্তরাধিকারী তো কেহ নাই। নিজের জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিলেই যথেষ্ট।

কেনারামের উদ্দেশ্য, কমিশন। চার বৎসর পূর্বে রাজবল্লভ যখন দেনার দায়ে জমিদারিটি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন রাজবল্লভ এবং উৎপল উভয়েরই হিতৈষী সাজিয়া তিনি উভয় পক্ষের নিকট হইতে একুনে প্রায় হাজার দশেক টাকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এসব বিষয়ে সত্যই তিনি ক্ষমতাবান পুরুষ। হিতৈষী সাজিতে অদ্বিতীয়। হিতাকাঙ্ক্ষায় কখনও কড়া কথা বলিয়া, কখনও স্পষ্টভাষণ করিয়া, কখনও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, কখনও সান্ত্বনা দিয়া তিনি এমন একটা অভিনয় করতে পারেন যে, তাঁহার ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি মনোভাব সবসময়ে সকলে বুঝিতেও পারে না। পারিলেও রাগ করিতে পারে না, রাগ করিলেও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার উপায় থাকে না এমন পরিচ্ছন্ন তাঁহার কার্যবিধি। কোনো কিছুতেই কখনও নিজেকে এমনভাবে জড়াইয়া ফেলেন না, যাহাতে আইনত তাঁহাকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়। জমিদারি পুনঃক্রয়ের বাসনাটি আভাসে-ইঙ্গিতে তিনিই একদা হৃদয়বল্লভের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ভাষাটি ছিল এইরূপ; তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয় জমিদারিটা তুমি যদি আবার ফিরে পাও, ফিরে পাওয়া শক্ত অবশ্য, কিন্তু চেষ্টা করলে হয়ত—। এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে স্ফুলিঙ্গটি যখন হৃদয়বল্লভের অন্তরে শিখারূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যখন হৃদয়বল্লভ জমিদারি ফিরিয়া

পাইবার জন্য কেনারামকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন, তখন অনেকটা বিপন্ন হইয়াই প্রাক্তন সম্বন্ধের খাতিরে তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে রাজি হইলেন। কিন্তু চেষ্টাটা এমন মন্দগতিতে করিতে লাগিলেন যে, হৃদয়বল্লভ অবশেষে স্পষ্ট করিয়া লেখা সমীচীন মনে করিলেন, তুমি চেষ্টা করিয়া জমিদারিটি যদি উৎপলের কবল হইতে নির্বিঘ্নে পুনরুদ্ধার করিতে পার, তোমর ন্যায্য পারিশ্রমিক তোমাকে আমি দিব। জমিদারির মূল্য এবং তোমার পারিশ্রমিক— এই সমস্ত টাকাটাই তুমি রাজীব দত্তর নিকট হইতে কর্জ কর। কেনারাম উত্তরে লিখিলেন, পারিশ্রমিকের জন্য কিছু আসিয়া যায় না, পারিশ্রম করিলেই অবশ্য কিছু পারিশ্রমিক লইতেই হয়, তবে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। তোমার ক্ষেত্রে টাকাটাই বড় নয়। দেখি, কত দূর কি করিতে পারি।

বলা বাহুল্য, কেনারাম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়া খানিকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। আর কিছু না হউক রাজীবলোচন তো রাজি হইয়াছেন।

কুসীদজীবী রাজীবলোচনের উদ্দেশে কুসীদ। কুসীদের লোভেই তিনি রাত্রে অসুস্থ শরীর লইয়াও কেনারামের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন এবং ইঁহাদের আগড়ম-বাগড়ম আলোচনা শুনিতেছেন। রাজীবলোচন প্রিয়দর্শন ব্যক্তি নহেন। কালো, বেঁটে, শীর্ণকায় লোক তিনি। যখন চলেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকেন, যখন বসেন উবু হইয়া বসেন। তাঁহার চোয়াল সর্বদাই নড়ে, মনে হয়, সুপারি জাতীয় কী যেন চিবাইতেছেন। মুখে এক আধ টুকরো সুপারি লবঙ্গ হরিতকি কখনও হয়ত বা থাকে, কিন্তু তাহার জন্য অত ঘন ঘন মুখ নাড়ার প্রয়োজন হয় না। ওটা তাঁহার মুদ্রাদোষ। মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক, সামান্য কাঁচা-পাকা গোঁফ, মুখভাবে বিশেষ কিছুই অসামান্যতা নাই। মুখের মধ্যে চক্ষু দুইটিই ছোট ছোট হইলেও বেশ জীবন্ত। কিন্তু প্রায় তাহা অর্ধমুদ্রিত থাকে, ক্বচিৎ কখনও কাহারও দিকে যদি চোখ খুলিয়া তাকান, সে চোখের মর্মভেদী দৃষ্টি মনে ভীতি সঞ্চার করে। পারতপক্ষে কেহ সে দৃষ্টির সম্মুখবর্তী হইতে চায় না, এমন কি তাঁহার একমাত্র পুত্রও নয়। সুদের লোভেই তিনি কেনারামের প্রস্তাবে রাজি হইয়াছেন। বিশ্বাসযোগ্য ব্যাঙ্কে আজকাল সুদের হার অতিশয় কম। টাকাগুলো কেবল পচিতেছে। কেনারামটাকে কিছু উপুড়হস্ত করিলে কিছু টাকার যদি সদগতি হয় মন্দ কি? টাকা অবশ্য ও ছোকরা শোধ করিতে পারবে না, জমিদারিটাই শেষ পর্যন্ত লইতে হইবে, তাহাই বা মন্দ কি? আড়াই লক্ষ টাকার পরিবর্তে বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি লাভ করা এ বাজারে নিন্দনীয় নয়। আজকাল ওই আড়াই লক্ষ টাকার সুদ বছরে চার হাজারও হয় না। জমিদারিতে অবশ্য হাজা শুকা আছে, নানা হাঙ্গামা। কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে মালক্ষ্মী কবেই বা কাহার গৃহে আসিয়াছেন? তাহা ছাড়া আর একটা কথা, উৎপল এবং শঙ্কর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাহারা তাঁহার বিশেষ কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তাঁহার খাতকসংখ্যা আগে যেমন ছিল এখনও যদিও প্রায় সেইরূপই আছে কিন্তু উহাদের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা যেরূপ বাড়িতেছে, (জনসাধারণ দূরের কথা, তাঁহার নিজেরই শ্রদ্ধা বাড়িতেছে!) ভবিষ্যতে হয়ত তাঁহার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই উপলক্ষে ওই দুইজনকেও যদি গ্রাম হইতে উৎখাত করা যায়, মন্দ কি? শত্রুকে অঙ্কুরে বিনাশ করাই তো ভাল। কিন্তু এই বিনাশ করা ব্যাপারে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ খটকা আছে। অসঙ্কোচে কাহাকেও বিনাশ করিতে চিরকালই তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি নিরীহ হয়। দীর্ঘনিঃশ্বাসকে তাঁহার বড় ভয়। কুসীদজীবী হইলেও তিনি ধর্মভীরু ব্যক্তি, পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক আশীর্বাদ-অভিশাপ প্রভৃতিতে আস্থাবান। বিনা দোষে শঙ্কর এবং উৎপলকে বিপন্ন করাটা কি

ঠিক হইবে? বহু অনুসন্ধান করিয়াও তো তিনি উৎপল অথবা শঙ্করের চরিত্রে এমন কোনো দোষ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, যাহার অজুহাতে তাহাদের উচ্ছেদসাধন সমর্থন করা যায়। অম্বিকা রায়ের ব্যাটা শঙ্করকে তো ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে! নিজের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র গদাধরের সহিত তুলনা করিয়া এ কল্পনাও তিনি মাঝে মাঝে করিয়াছেন, শঙ্কর আমারই ছেলে হইলে মন্দ কি হইত? কেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলে. কোনোরূপ নষ্টামি নাই, লোকের বিপদে-আপদে বুক দিয়া করে, কথায়-বার্তায় কেমন বিনয়ী, অথচ চালাক-চতুর। সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত কেমন গড়গড় করিয়া আলাপ করিল! অথচ গদাধরটা কি যেন! ঠিক যেন একটা কানা কুলি-বেগুন, বেঁটে কুরকুট্টে, পেঁচার মতন স্বভাব, ভদ্রসমাজে মুখ দেখায় না, বদমাইসের ধাড়ি, যত আড্ডা ছোটলোকদের সঙ্গে, এই বয়সেই গাঁজা ধরিয়াছে নাকি, তুরিটোলার ছুঁড়িগুলা তো তাহার পয়সায় বড়লোক বনিয়া গেল। শাড়ি-চুড়ির কি বাহার হারামজাদিদের!

সহসা রাজীবলোচনের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল।

কেনারাম মূল সমস্যাটা লইয়া আলোচনা করিতেছেন।

আমাদের যতই না কেন গরজ থাক, উৎপল শুধু শুধু জমিদারি বিক্রি করতে রাজি হবে কেন? তার তো কোনো অভাব নাই।

রাজীব দত্তের চোয়াল নড়িয়া উঠিল।

হৃদয়বল্লভ বলিলেন, তা নেই স্বীকার করছি। কিন্তু ওদের অতিষ্ঠ করে তোল। তা হলেই পালাবে।

কেনারাম বাহিরে সভ্য ভব্য মিষ্টভাষী মার্জিতরুচি ব্যক্তি, চট করিয়া এমন কিছু বলেন না যাহার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে। অতিষ্ঠ করিবার আয়োজন তিনি করিয়াছেন, হৃদয়বল্লভের আগ্রহাতিশয্য ছাড়া ব্যক্তিগত একটা কারণও সম্প্রতি ঘটিয়াছে। উৎপলের পরামর্শ-অনুযায়ী শঙ্কর তাঁহার পুত্র জীবনকে সত্যই উকিলের চিঠি দিয়াছে। কিন্তু এত কথা হৃদয়বল্লভকে বলার প্রয়োজন কী? সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, দেখি।

না না, উঠে পড়ে লাগ ভাই, 'দেখি দেখি' তুমি অনেকদিন থেকে করছ। তুমি চুপ করে থাকবার লোক নও, নিশ্চয় কোনো আয়োজন করেছ একটা। চুপিচুপি বলই না ভেঙে, শুনি।

শীর্ণকান্তি হৃদয়বল্লভের সমস্ত প্রাণশক্তি তাঁহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটিতে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। সর্বগ্রাসী দৃষ্টি সে চক্ষুর।

আয়োজন? না, তেমন কিছু করিনি এখনও। তবে মণি বাঁড়ুজ্জের লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটা যদি বেশি দূর গড়ায়, তা হ'লে হয়ত কিছু হতে পারবে। হয়ত---

হয়ত কথাটার উপর জোর দিয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

হৃদয়বল্লভ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বল না ভাই, মণি বাঁড়ুজ্জে কে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কেনারাম অবশেষে ব্যাপারটা খুলিয়া বলাই মনস্থ করিলেন।

আমাদের হরিহর বাঁড়ুজ্জের খুড়তুতো ভাই মণি লক্ষ্মীবাগে প্রায় হাজার বিঘে জমি নিয়ে মহা ধুমধাম করে চাষ করেছে। আশেপাশের কয়েকজন বেহারিদের, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত বিহারিদের চোখ টাটাচ্ছে তাই দেখে। জনকয়েক বেহারি, জমিদার গুলাব সিং তাহাদের মধ্যে প্রধান, জনকয়েক বেহারি উকিলও সেই নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। শঙ্করের দক্ষিণহস্ত নিপুবাবুও ইন্ধন যোগাচ্ছেন তাতে। মণি যেসব চাষীর কাছ থেকে টাকা দিয়ে জমি কিনে নিয়েছিল, নিপুবাবু সেই সব চাষীদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন এই বলে যে, মণি ক্যাপিটালিস্ট, ঠকিয়ে তাদের কাছ

থেকে জমি নিয়েছে, যে চাষ করে জমি তারই, সমবায়-কৃষি সমিতি করেই রুশদেশে নাকি চাষীরা সুখে আছে, মণিব ন্যায়ত কোনো অধিকার নেই একা অতখানি জমি ভোগ করবার। মোট কথা, এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা বাধবার সম্ভাবনা।

কেনারাম চুপ করিলেন।

তার সঙ্গে উৎপল আর শঙ্করের সম্বন্ধ কী?

হাঙ্গামা যদি বাধে আর ওরা যদি যোগ দেয় তাতে, দেওয়াই সম্ভব, ওরা আদর্শবাদী লোক, মণির পক্ষ নিশ্চয়ই নেবে, তা হলে ও অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু বেহারিদের সঙ্গে আর চাষীদের সঙ্গে শত্রুতা হবে ওদের, আর তা হলেই— মানে—

মৃদু হাসিয়া কেনারাম পুনরায় চুপ করিলেন।

মানে?

মানে—একখানা টিকে একবার একটু ধরলে বাকিগুলোও ধরে উঠতে দেরি লাগবে না।

উপমাটা রাজীব দত্তের ভালই লাগিল।

তিনি একবার চোয়াল নাড়িলেন।

কিন্তু ফুঁ দেওয়া চাই, ফুঁ-টা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে—

হৃদয়বল্লভ বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না। প্রমথ ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গুলাব সিংহের উপর প্রমথ ডাক্তারের অসীম প্রভাব আছে বলিয়া কেনারাম প্রমথ ডাক্তারকে দলে টানিয়াছেন। প্রমথ ডাক্তার আসিয়াছেন শঙ্করের উপর মনে মনে রাগ আছে বলিয়া। বিশেষত সেদিনকার প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথাটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। লোকটা যেন হাতে মাথা কাটিয়া বেড়াইতেছে! উৎপলবাবু ভালমানুষ লোক, কিছু বলেন না, যা-তা করিয়া বেড়াইতেছে একেবারে! ভদ্রলোককে একটু কড়কাইয়া দেওয়া উচিত বইকি। সাদ্দৈনলি।

প্রমথ ডাক্তারের অভ্যাগমে পরামর্শসভা আরও জাঁকিয়া উঠিল।

ষোল

শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল।

পল্লীজীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে-খচিত দিনগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে এই অতি তুচ্ছ দিনগুলির হয়ত কোনো চিহ্ন থাকে না, পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ইতিহাসে কিন্তু তাহাদের মূল্য কম নয়। ডানকার্কে কে পরাজিত হইল, কোন্ পক্ষ যুদ্ধনৈপুণ্যের কী পরিচয় দিল, চীনবাসীদের প্রতি বলশেভিক রাশিয়ার আসল মনোভাব কী, জার্মানির নূতনতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অথবা বর্বরতার কোন কাহিনী কাগজে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, কোন্ পক্ষের কোন্ সেনানায়কের যুদ্ধকৌশল কিরূপ, বিমানবহর কে কত বেগে পাড়াইয়া চলিয়াছে— এসব খবর শিক্ষিত শহরবাসীকে যতটা চঞ্চল করিয়া তোলে, অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে ততটা তোলে না। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের অত্যাশ্চর্য কাহিনী তাহারা শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে অত্যাশ্চর্য কাহিনীর মতই শোনে, যেন রূপকথা শুনিতেছে। ঘর্ঘর শব্দ করিয়া আকাশপথে যখন বিমানপোত উড়িয়া যায়, বিস্ফারিত নয়নে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে—যুদ্ধের সঙ্গে ওইটুকুই তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মহাযুদ্ধের খবর তাহাদিগকে বিস্মিত করে, কিন্তু তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, অন্তত তখনও পর্যন্ত করে নাই। যুদ্ধের খবর তাহাদের নিকট খবরই নয়।

তাহাদের নিকট আসল খবর-- নিমাই পণ্ডিতের গাই একটি চমৎকার বকনা প্রসব করিয়াছে। কুচকুচে কালো রঙ, কপালের মাঝখানে চন্দনের ফোঁটার মত সাদা একটি টিপ। চমৎকার দেখিতে। হকরু গোয়ালা গাইটি সস্তায় কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়া একটা ব্যক্তিগত গর্ব অনুভব করিতেছে। বানারসি গাড়োয়ান, নৈমুদ্দিস দর্জি, ইস্কুলের চাকর পরমেশ্বরা— সকলেই ইহাতে উল্লসিত। সকলেই নিমাইকে নানারূপ পরামর্শ অযাচিত ভাবেই দিয়া যাইতেছে। এই সময়ে গাইকে কোন্ কোন্ জিনিস খাওয়ানো উচিত তাহা লইয়া রামু ও বিযুনের কলহই হইয়া গেল। রামু সরিষার খোলের পক্ষপাতী, বিযুনের মতে তিসির খোলই সর্বশ্রেষ্ঠ। খড় ভূষি কোথায় সস্তায় পাওয়া যাইবে সে পরামর্শ অনেকেই দিয়া গেল, খ'ড়ো চালাটা আগামী বর্ষায় চলিবে কি না তাহা লইয়াও অনেকে মাথা ঘামাইল! মুকুন্দ পোদ্দার কী একটা কাজে হীরাপুরে আসিয়াছিলেন, বকনাটি দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। তিনি যাচিয়া নিমাইয়ের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া গেলেন যে, নিমাই ভবিষ্যতে কখনও যদি বকনাটি বিক্রয় করে তিনিই কিনিবেন, এমন কি এখনই তিনি ইহার জন্য নগদ পাঁচ টাকা বায়না দিতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, নিমাই সম্মত হইল না।

কয়লার সদ্যোজাত শিশুটা নাকি শৃগালের কবলে গিয়াছে। কয়লার বউ তাহাকে আঙিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া ঘরের ভিতর রান্না করিতেছিল। দিনদুপুরে এই কাণ্ড! খুকির জন্য অমিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মাঝে একদিন শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। আমের মুকুল যদিও এখনও তেমন হয় নাই, তবুও যা হইয়াছিল নষ্ট হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধের শোচনীয় পরিবেশ সকলকে বেশি আকুল করিয়া তুলিল। অতীতে কে কত ভীষণ শিলাবৃষ্টি দেখিয়াছে, তাহা লইয়া পাল্লা দিয়া গল্পও চলিল দুই-চারিজন বৃদ্ধের মধ্যে।

আর একটা বিস্ময়কর ঘটনায় সব চাপা পড়িয়া গেল। গ্রামপ্রান্তে শিবমন্দিরের পাশে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক-দম্পতি বাস করিত। বেচারারা সত্যই অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এ অঞ্চলের বৃদ্ধতম লোকও নাকি তাহাদের ওই একই রকম দেখিছে। যম যেন তাহাদের ভুলিয়া আছে। ঝড় ঝঞ্ঝাবাত মহামারি দুর্ভিক্ষে কত সমর্থ লোক অকালে মরিল, কিন্তু উহাদের মৃত্যু নাই। কুব্জপৃষ্ঠে ন্যুব্জদেহে লাঠি ধরিয়া ধরিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং চিরকাল হয়ত বেড়াইত, যদি না রাজীব দত্ত দয়া করিতেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ঠেকিলেও কুসীদজীবী রাজীব দত্তই দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেচারাদের আর ভিক্ষা করিতে হইত না। বেশ ছিল। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে যণ্ডা যণ্ডা দুইজন কালো লোক তাহাদের কুঁড়েঘরে ঢুকিয়া বুড়া অন্ধ ভিখারিটাকে কাঁধে তুলিয়া লইল এবং নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। বুড়ির চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীরা সমবেত হইল। লণ্ঠন লইয়া, মশাল জ্বালিয়া অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না। কিন্তু জীবন্ত বা মৃত বুড়ার কোনো সন্ধানই মিলিল না। থানায় খবর দেওয়া হইল, কোনো ফল ফলিল না। সম্ভব অসম্ভব নানারূপ গবেষণার পর যে ধারণাটা ক্রমশ অধিকাংশ লোকের মনে বদ্ধমূল হইল তাহা এই যে, যমরাজকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। বুড়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল কিছুতেই মরিবে না। যমরাজ তাহা শুনিবে কেন? দূত পাঠাইয়া জীবন্তই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়েকদিন পরে বুড়িও মরিয়া গেল।

রহিমের ভেড়া মটরা সকলকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। ফসল খাইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কিছু বলিতে গেলেই ছুটিয়া আসিয়া ঢুঁ মারিয়া ফেলিয়া দেয়। এ অঞ্চলের ছেলেরা তো

ওটাকে যমের মত ভয় করে। সর্বাঙ্গে কোঁকড়ানো কালো লোম. প্রকাণ্ড পাকানো শিঙ দুইটা বিশাল 'ৎ'-এর মত বলিষ্ঠ গর্দানের উপর যেন ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। মটরার জ্বালায় সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু মটরার প্রতি সকলের স্নেহেরও অন্ত নাই। হইবে না? সেবার বসুলগঞ্জে যখন ভেড়ার লড়াই হয়, তখন এই মটরাই সমাগত সমস্ত ভেড়াকে পরাস্ত করিয়া গ্রামের মুখরক্ষা করিয়াছিল। সেই হইতে মটরা গ্রামবাসী সকলেরই আদরের পাত্র। ইহার বাড়ি ফ্যান খাইয়া, উহার বাড়ি ভুষি খাইয়া. কাহারও বাগান ভাঙিয়া, কাহারও ফসল চরিয়া মটরা দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি শুরু করিয়াছে। ভাগিয়ার ছেলে নন্কুকে এমন মারিয়াছে, যে, সে হাতের ভাড় ভাঙিয়া হাসপাতালে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে। ভাগিয়া শঙ্করের নিকট আসিয়া মটরার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইল।

শঙ্কর বলিল, আমি কী করব তার? রহিমকেই বল গিয়ে।

আপ থোড়া বোল দিজিয়ে হুজুর।

আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।

রহিম আসিয়া বলিল যে, মটরার জ্বালায় নিজেই সে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে।— কত দড়ি আর কিনি হুজুর, রোজ রোজ দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে' নারিকেলের শক্ত মোটা দড়িও এক ঝটকায় পট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। আমি আর উহাকে লইয়া পারি না, নাচার হইয়া পড়িয়াছি। আপনারা বরং ওটাকে কাটিয়া খাইয়া ফেলুন, আপদ চুকিয়া যাক।

এই কথায় ভাগিয়াই জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিল, আরে, ছি ছি ছি, ই কৈসন বাত!

শঙ্কর বলিল, একটা মোটা লোহার শিকল কিনে গলায় বকলস দিয়ে বেঁধে রাখ্ ব্যাটাকে।

ইহার উত্তরে রহিম যাহা ব্যক্ত করিল, তাহাও সঙ্গত। এই যুদ্ধের সময় বকলস এবং লোহার শিকলের যা দাম, তাহা জুটাইবার সঙ্গতি তাহার নাই। অবশেষে শঙ্করকে বলিতে হইল যে, দামটা সে-ই দিবে।

ভাগিয়া-রহিম উভয়েই খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

নেকি মাড়োয়ারি শীঘ্রই একটি মাখন-তোলা কল বসাইবে।

নটবর এবং চরণ ডাক্তারের চিকিৎসায় হরিয়া ক্রমশ সারিয়া উঠিতেছে।

নিপু মাঝে মাঝে একদিন হীরাপুর হাটে দাঁড়াইয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলশেভিজম সম্বন্ধে একই বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া নাকি হাস্যাস্পদ হইয়াছে।

কর্পূরা গোয়ালার মেয়ে শুক্রি মাঝে একদিন হইহই বাধাইয়া বসিল। এ দেশের সব মেয়েরই যেমন হয়, তাহারও অতি বাল্যকালেই, দুই বৎসর বয়সেই, বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত সে বাপের বাড়িতেই ছিল। মাসখানেক পূর্বে তাহার 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হইয়াছে। 'গওনা' উপলক্ষে গরিব কর্পূরা বেচারা এই দুর্দিনেই যথাসাধ্য সমারোহ করিয়া মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরে ঝপ্টি গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ি। মেয়েটা হঠাৎ সেখান হইতে পালাইয়া আসিয়াছে। রাতারাতি হাঁটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও দুই-একদিন পরে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া উপস্থিত। পলাতকা বধূকে যেমন করিয়া হোক তাহারা লইয়া যাইবেই।

শুক্রি আসিয়া অমিয়ার শরণাপন্ন হইল। বলিল, তাহার স্বামীর শ্বেতী (ধবল) হইয়াছে, কিছুতেই ও স্বামীর ঘর সে করিবে না। ঝপ্টি গ্রামের কাছেই শঙ্করদের স্থাপিত একটি ডিস্পেনসারি আছে। তাহার স্বামীর যাহাতে সুচিকিৎসা হয়, সে ব্যবস্থা করিয়া দিবে আশ্বাস দিল। প্রমথ ডাক্তার বলিলেন, ধবল আর কুষ্ঠ এক জিনিস নয়, সংক্রামকও নয়, সুচিকিৎসায়

সারিয়া যাইতে পারে। তবু শুক্‌রি যাইতে চায় না। অবশেষে শঙ্করকে গ্রামের দোহাই দিতে হইল। সে যদি না যায়, গ্রামেরই একটা বদনাম হইয়া যাইবে যে! এ গ্রামের মেয়েকে কেহ বিবাহই করিতে চাহিবে না হয়ত। তা ছাড়া এমনভাবে পলাইয়া আসিলে লোকে অন্যরকম বদনামও দিতে পারে। শুক্‌রির মত ভাল মেয়ের নামে এ রকম কুৎসা রটা কি ঠিক?

পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে-খুঁড়িতে নতমুখী শুক্‌রি বলিল, এখন গেলে আমাকে উহারা মারিবে। বাহিরের বারান্দায় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বসিয়া ছিল, তাহারা প্রতিশ্রুতি দিল যে বধূর উপর কোনো রকম অত্যাচর করা হইবে না। তখন শুক্‌রি আর এক বাহানা তুলিল। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পায়ে ভয়ানক ব্যথা হইয়াছে, সে আবাব অতটা পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না। কর্পূরা গোয়ালা নিকটে বসিয়া সব শুনিতেছিল, তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। মহিষের শিঙের মত উচ্চাগ্র বাঁকা গোঁফ চুমরাইয়া সে সগর্জনে বৈবাহিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঝোঁটি পকড়িকে ঘিশিয়াকে লে যা। বৈবাহিকটি বলিষ্ঠ-গঠন ব্যক্তি, শালপ্রাংশু মহাভুজ যাহাকে বলে। পুত্রবধূর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিযা লইয়া যাইবার মত শারীরিক ক্ষমতা তাহার আছে। লোকটি কিন্তু ধীরপ্রকৃতির। কর্পূরার কথায় তাহার মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুত্রবধূর আপত্তির যৌক্তিকতাও সে বোধ হয় উপলব্ধি করিল। বটুয়া হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া সেটির প্রতি এক দৃষ্টে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল, তাহার পর ইতস্তত করিয়া বলিল, আট আনামে বয়েল গাড়ি কি ডোলি হোতেই?

অসম্ভব। আজকালকার দিনে মাত্র আট আনায় কোনো গরুর গাড়ি বা ডুলি দশ ক্রোশ পথ যাইতে রাজি হইবে না। অন্তত চার টাকা লাগিবে। কর্পূরা 'গওনা'তে সম্প্রতি ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, আবার এই চার টাকাও তাহাকে দিতে হইবে নাকি? তাহার ভয়ানক রাগ হইল। আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়া সে বোধ হয় পুনরায় ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাবটাই করিতেছিল, কিন্তু শঙ্কর বাধা দিল।

শঙ্কর বলিল, আচ্ছা, আমার গাড়িটাই পৌঁছে দিয়ে আসুক ওকে, মুশাইকে বলে দিচ্ছি।

মুশাই মনে মনে খুব চটিল, ছুঁড়িটার দেমাক তো কম নয়! কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল। শঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার সাধ্যাতীত। শুক্‌রির আর আপত্তি করিবার উপায় রহিল না, বরং তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

শঙ্করের 'শিশা'-লাগানো 'টপ্‌পর'-দেওয়া গাড়িতে চড়িবার সুযোগ পাইয়া সত্যই সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অমিয়া তাহাকে একটি রঙিন শাড়ি কিনিয়া দিল। সে কিন্তু আরও বেশি খুশি হইল অমিয়ার অর্ধেক-খালি তরল আলতার শিশিটা পাইয়া, হাতে যেন স্বর্গ পাইল। আর কোনো আপত্তি করিল না, শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল।

পল্লীজীবনের এই সব অতি তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়া শঙ্করের দিনগুলি কাটিতেছিল। ঠিক নিরুদ্বিগ্ন না হইলেও, শান্তিপূর্ণ।

সতের

কুন্তলা গৃহকর্মে নিমগ্ন ছিল।

উঠানে বসিয়া নিজের হাতেই গরুর জাব কাটিতেছিল। বাংলাদেশ হইতে জাব কাটিবার একটা বঁটি সে আনাইয়া লইয়াছে। এ দেশের 'গড়াসা' তাহার পছন্দ নয়। বর্তমানে তাহার দৈনন্দিন জীবন সে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে যে, ভোর পাঁচটা হইতে দশটা পর্যন্ত তাহার

কোনো অবসর সে রাখে নাই। ভোর পাঁচটায় সে উঠে। উঠিয়াই প্রথমে ঘর বারান্দা উঠান স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করে। প্রতি ঘরেব চৌকাঠে জল ছিটায়, গোবর দিয়া রান্নাঘরটা নিকাইয়া ফেলে। তাহার পর গোয়াল পরিষ্কার করিয়া গরুকে খাইতে দিয়া, বাসনগুলি মাজে। এতদিন একটা বুড়ি ঝি ছিল, কিন্তু সে এখন নিতান্তই বুড়ি হইয়া পড়িয়াছে, চোখে দেখিতে পর্যন্ত পায় না। ইচ্ছা করিয়াই কুন্তলা নতুন কোনো ঝি রাখে নাই। সে নিজেই সব করিবে। বাসন মাজা হইয়া গেলে সে স্নান করে, স্নানান্তে পূজার ঘরে ঢোকে। পূজা সারিয়া রান্না শুরু করে। বেলা বারোটার পূর্বে হরিহরের খাইবার অবসর হয় না। স্নান, আহ্নিক, পৌরোহিত্য, সামান্য বৈষয়িক কাজকর্ম প্রভৃতি দৈনিক কর্তব্যগুলি করিতে বারোটাই বাজিয়া যায়। সুতরাং রান্না খাওয়া শেষ কবিতে কুন্তলার প্রায় একটা বাজে। ইহার পর ঘণ্টাখানেক সে বিশ্রাম করে। বিশ্রামের পর খানিকক্ষণ পড়াশোনা, খানিকক্ষণ চরকা। পাঁচটার সময় গরুর জাব কাটে। গরু চরিয়া ফিরিয়া আসিলে স্বহস্তে তাহার জাব পর্যন্ত সে মাখিয়া দেয়। ন্যাংড়া নামক যে বালকটি গরু চরায়, সে অবশ্য খানিকটা সাহায্য করে, না করিলেও কিছু ক্ষতি হইত না। কুন্তলা কিছুতেই দমিত না। গরুব সেবা করিয়া আবার ঠাকুরঘর, আবার রান্নাব আয়োজন। বৈকালের দিকে রান্নাটাকে সে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে। সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সব শেষ করিয়া ফেলে। আটটার পর বাহিরের বারান্দায় পাড়ার অনেকে সমবেত হন. হরিহর ভাগবত পাঠ করেন। কুন্তলাও কিছুদিন হইতে রোজ সেখানে বসিতেছে। পিসিমা যতদিন ছিলেন, ততদিন অবশ্য এসব কিছু ছিল না। তখন হরিহর পাড়ার মুনশিজির সহিত দাবা খেলিতেন। কুন্তলা পিসিমার খুঁটিনাটি কাজ করিয়া দিত এবং পিসিমাব সঙ্গেই গল্পগুজব করিত। পিসিমাব গল্পের প্রধান বিষয় ছিল হরিহরের পিতা ত্রিপুরেশ্বর এবং হরিহর। হরিহরের জীবনের অলৌকিক নানা কাহিনী পিসীমা সবিস্তারে বলিয়া যাইতেন, বার বার বলিয়াও যেন শেষ করিতে পারিতেন না, শেষ করিয়াও যেন তৃপ্তি হইত না। কুন্তলা ময়দা মাখিতে মাখিতে বা ক্ষীরের ছাঁচ তুলিতে তুলিতে স্মিতমুখে সে সব গল্প শুনিত। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত বটে; কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে অন্যমনস্ক না হয়। পিসিমা সম্প্রতি কাশীবাস করিয়াছেন। তাঁহার এক বোনপো কাশীতে বাড়ি করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই পিসিমা এখন কিছুকাল থাকিবেন। যে হরিহরকে বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহাব একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু নাবীর মনে যে ভাব শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়, তাহা তাঁহার মনেও প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিল। মাগা তো একদিন কাটাইতেই হইবে, পবকালের কাজটাও তো করা দরকার, কতদিন আব সংসারের ঝঞ্ঝাটে জড়াইয়া থাকিবেন তিনি? বাবা বিশ্বেশ্বর এমন একটা সুযোগ যখন ঘটাইয়া দিয়াছেন তখন তাহা ত্যাগ করা কি উচিত? তবু তাঁহার মনে কিছু খুঁতখুঁতানি ছিল, বউমা একা সংসার চালাইতে পারিবে কি, হাজার এম এ পাস করুক ছেলেমানুষ তো, সংসারের কতটুকু বোঝে। কুন্তলা চুপ করিয়া থাকিত। কাশী যাওয়ার সপক্ষে কিছু বলিলে পাছে পিসিমা ভাবেন, বউ তাঁহাকে কাশীতে বিদায় করিয়া দিয়া নিজেই সংসারেব কর্ত্রী হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল দোটানার মধ্যে থাকিয়া পিসিমা নিজেই অবশেষে মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দু বিধবার পক্ষে কাশীবাসেব প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। পিসিমা কাশী চলিয়া গেলে সন্ধ্যার পর কুন্তলার বড় একা একা বোধ হইত। পাড়া বেড়ানো স্বভাব তাহার নয়। পড়িতেও ইচ্ছা করে না একা একা। তাই সে হরিহরকে বলিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভাগবতপাঠের আয়োজন করিয়াছে। এ প্রস্তাবে মুনশিজিও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করাতে হরিহব রাজি হইয়াছেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত

ভাগবতপাঠ হয়। তাহার পর আহারাদি করিয়া কুন্তলা শুইয়া পড়ে। এই তাহার বর্তমান দৈনন্দিন জীবন। একেবারে নিশ্চিদ্র। ইচ্ছা করিয়াই সে কোনো ছিদ্র রাখে নাই। ছিদ্র থাকিলেই নানা ভাবনা আসিয়া জোটে। অসংখ্য আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা মনের নিম্নস্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন রচনা করে। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। যে জীবনকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে, সে জীবনের মহিমায় যেন সন্দেহের ছায়াপাত না হয়। না, কোনোরূপ অশান্তিজনক স্বপ্নবিলাসের সুযোগ নিজেকে সে কিছুতেই দিবে না, যে জীবন সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই হিন্দু নারীর আদর্শ জীবন। সর্বতোভাবে সে আদর্শের উপযুক্ত তাহাকে হইতে হইবে। কায়মনোবাক্যে সে আদর্শ জীবনের মহত্ত্বকে স্বীকার করিতে হইবে, কোনোরূপ অনুশোচনার অবসর সে দিবে না, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। আচরণ দ্বারা তো নহেই, মনেও সে স্বীকার করিবে না যে, ভুল করিয়াছে। ভুল সে করে নাই। ইহাই ভারতবর্ষীয় নারীর আদর্শ। এই আদর্শের উপযুক্ত হইতে হইবে, কষ্ট হয় হোক। যে কোনো মহৎ সাধনা করিতে হইলেই কষ্ট বরিতে হয়।

তবু মাঝে মাঝে সুধাংশুকে মনে পড়ে। কলেজ জীবনে সুধাংশুকে সত্যই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। যেমন তাহার সৌম্য মূর্তি, তেমনই আচরণ, তেমনই বিদ্যাবত্তা। দূর হইতেই সে তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল, উপযাচিকা হইয়া অন্য মেয়েদের মত ছলে ছুতায় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহার সহিত একটা কথা পর্যন্ত বলে নাই। তাহার সহপাঠিনীদের মর্যাদাবোধের অভাব চিরকাল তাহাকে পীড়া দিয়াছে। কাপড়, গহনা, সিনেমা, পুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি অতি তুচ্ছ ব্যাপারই যেন তাহাদের নিকট বড়। আত্মসম্মানের যেন কোনো মূল্য নাই। অতি তুচ্ছ মূল্যেই নিজেকে বিকাইয়া দিতে সকলে প্রস্তুত। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাটাই আমাদের কেমন যেন আত্মগৌরবশূন্য করিয়া তুলিয়াছে— এই কথাই কলেজে পড়িবার সময় বারবার তাহার মনে হইত। আমাদের যেন কিছু নাই! আমাদের ধর্ম পৌত্তলিকতাময়, আমাদের সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আমাদের সমস্ত সামাজিক নীতি সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণদের কারসাজি মাত্র। বিদেশি ধর্মকে, বিদেশি সমাজকে, বিদেশি নীতিকে, বিদেশি বুলিকে নকল করিতে না পারিলে আমাদের যেন আর মুক্তি নাই। নোবেল প্রাইজ না পাইলে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করিব না, বিলাত-ফেরত না হইলে কৌলিন্য-মর্যাদা দিব না, বিলাতি নজির না থাকিলে দেশি কোনো কিছু বিশ্বাস করিব না— এই হেয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সে চিরকাল উদ্যত প্রহরণ। এইজন্যই সে সুধাংশুর নামোল্লেখ পর্যন্ত কাহারও কাছে করে নাই। সুধাংশু জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাদের পালটি ঘরও, চেষ্টা করিলে অনায়াসেই তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু 'চেষ্টা' করিয়া বিবাহ করার ব্যাপারটায় একটা বিদেশি গন্ধ আছে বলিয়া সে চেষ্টাই সে করে নাই। সত্য বটে, এই ভারতবর্ষে পূর্বে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল। সীতা, সাবিত্রী, ঊষা, দময়ন্তী— সকলে পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের আচরণে এমন শিকারি মনোবৃত্তি ছিল না। আজকাল মেয়েরা যাহা করে, তাহা ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরার মত মর্যাদাহীন ব্যাপার। ধৃত মৎস্যটি যদি রুই কাতলা না হয়, তাহা হইলে সেটিকে ছাড়িয়া দিয়া অভিজাত মৎস্যের উদ্দেশ্যে আবার নতুন টোপ ফেলা হয়। বর্তমান যুগের অর্থশাসিত বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় প্রেমের সে মহিমা আর নেই। কেবলমাত্র প্রেমের জন্যই আজকাল কেহ প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিতে রাজি হয় না, যদি না তাহার সহিত সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত থাকে। সুধাংশুর সহিতও একটি সুরঞ্জিত 'ফিউচার' জড়িত ছিল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই কুন্তলা তাহাকে এড়াইয়া চলিত, পাছে কেহ মনে করে যে, ধনী সন্তান সুধাংশুকে সে রূপের টোপ ফেলিয়া গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছে। সুধাংশু যদি দরিদ্র হইত, যদি সে বিলাতি ডিগ্রি

অর্জন করিয়া বড় চাকুরি করিবার স্বপ্ন না দেখিত, যদি সে ব্রাহ্মণোচিত নিরাসক্তিতে দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের কর্তব্যকেই জীবনে প্রাধান্য দিত, তাহা হইলে কুন্তলা হয়ত তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত। ব্রাহ্মণ-কন্যা সে, পছন্দ করিয়া যদি বিবাহ করিতে হয় সত্যকার ব্রাহ্মণকেই সে পছন্দ করিবে। কিন্তু সে রকম ব্রাহ্মণ একজনও তো তাহার চোখে পড়িল না। সকলেই অর্থগৃধ্নু। কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের মুখোশ পরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে কেহই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। প্রেমের অঞ্জলি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য কাহার চরণে দিবে সে? ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া টাকার লোভে একটা বৈশ্যকে ভুলাইতে যাইবে? ইহা করা অপেক্ষা বর্তমান যুগের সম্প্রদান-প্রথায় আত্মসমর্পণ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ঢের বেশি আত্মসম্মানজনক। সম্প্রদানপ্রথার অন্তর্নিহিত ভাব সত্যই মহত্ত্বপূর্ণ। যে কন্যা সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নের সঙ্গে উপমিত, সেই কন্যাকে লালনপালন করিয়া স-দক্ষিণা সৎপাত্রে দান করার মধ্যে যে আভিজাত্য আছে, তাহা কি তুচ্ছ করিবার মত? বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ায় (যে আবহাওয়ায় অর্থই পরমার্থ) পণপ্রথা-দুষ্ট হইয়া সে উদারতা চর্চা করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু তাহা মহত্ত্বপূর্ণ, এ কথা কে অস্বীকার করিবে! এখন আমাদের দেশের ভদ্রসমাজ এত কষ্টে পড়িয়াও এই উদার প্রথাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, কন্যা বিক্রয়ের হীনতা স্বীকার করে নাই। তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজেই কন্যারা আজকাল নিতান্ত দেহের তাগিদে এবং বিলাস-লালসায় মত্ত হইয়া বৈশ্যের কামবহ্নিতে নিজেদের ইন্ধন দিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে পাশ্চাত্ত্য সমাজের নকল করিয়া। কুন্তলা এ হীনতা স্বীকার করে নাই। পিতার হস্তেই বিবাহের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিয়াছিল। তবু সুধাংশুর মুখখানা মাঝে মাঝে তাহার মনে পড়ে। পড়ুক, সুধাংশু তাহার কেহ নহে। হরিহরের সহিত তাহার তুলনা পর্যন্ত সে করিবে না! হরিহর তাহার স্বামী, আরাধ্য দেবতা, শুধু ইহকালের নয়, পরকালেরও সম্বল।

কুন্তলার সহিত হরিহরের বিবাহের ইতিহাসও ঈষৎ অদ্ভুত। কুন্তলার উগ্র আত্মমর্যাদাবোধের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। হরিহরের পিতা স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এ অঞ্চলে 'ঠাকুরবাবা' নামে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী-মন্দিরের পুরোহিত অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পর প্রাক্তন জমিদার রাজবল্লভ রায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বর্ধমান জেলার এক গ্রাম হইতে সন্ধান করিয়া লইয়া আসেন এবং হীরাপুরের জগদ্ধাত্রী মন্দিরে পুরোহিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ঠাকুরবাবা একমাত্র মাতৃহীন পুত্র হরিহর ও বিধবা ভগ্নীটিকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং জমিদার প্রদত্ত নিষ্কর জমিজমার সাহায্যে হীরাপুরে বসবাস করিতেছিলেন।

ঠাকুরবাবার বিষয়ে অনেক অলৌকিক গল্প এ দেশে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি ভূতপ্রেতের সহিত কথাবার্তা কহিতেন, শীতকালে পাকা আম-কাঁঠাল আনাইয়া দিতে পারিতেন। অনেক পরী নাকি তাঁহার বাধ্য ছিল। অনেকে স্বচক্ষে নাকি দেখিয়াছে, স্বচ্ছবসনা জ্যোৎস্নাবরণা পরী মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতেছে; লোহাকে সোনা করার ক্ষমতাও নাকি তাঁহার ছিল। কিন্তু এ বিদ্যা একটিবার ছাড়া কখনও তিনি কাজে লাগান নাই। তিনি সত্যই সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বর্ণ এবং লৌহ তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য ছিল। একবার কেবল একটি দরিদ্র বৃদ্ধার লোহার খন্তিটিকে তিনি সোনা করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা অর্থাভাবে তাহার একমাত্র পুত্রের চিকিৎসা করাইতে পারিতেছিল না এবং ঠাকুরবাবাকে আসিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে নিরাময় করিয়া দিবার জন্য। ঠাকুরবাবা বলিয়াছিলেন, নিয়তি কাহারও

বাধ্য নয়, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা ঘটিবেই, তুমি কর্তব্য কর, পুত্রের চিকিৎসা করাও, তাহার পর জগজ্জননীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। বৃদ্ধা অর্থাভাবের কথা জানাইলে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোর যদি কোনো লোহার বাসন থাকে, পরিষ্কার করিয়া মায়ের পায়ের তলায় রাখিয়া যা, মায়ের যদি দয়া হয় লোহাকে সোনা করিয়া দিবেন। বুড়ির প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়া ছিল, সেইটা পরিষ্কার করিয়া দিলেই হইত, কিন্তু বোকা বুড়ি তা না করিয়া খুন্তিটা দিয়া আসিয়াছিল। বুড়ি বোধ হয় ঠাকুরবাবার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই। পরদিন কিন্তু বুড়ির বিস্ময়ের অবধি রহিল না, মায়ের পদস্পর্শে লোহা সত্যই সোনা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরবাবা বুড়িকে এ কথা প্রকাশ করিতে মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুড়ি কি এত বড় একটা সংবাদ চাপিয়া রাখিতে পারে! বেশি লোককে সে অবশ্য বলে নাই। কেবল নিজের ভ্রাজাইকে, পিতিয়াকে এবং তেতরিকে বলিয়াছিল। তাহার এই অবাধ্যতার ফলও অবশ্য ফলিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচে নাই। এই সংবাদে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ঠাকুরবাবার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরবাবা কাহাকেও আর আমল দেন নাই। সকলেই চলিয়া গিয়াছিল, যায় নাই কেবল ঝক্সু। বলিষ্ঠ দুর্দান্ত ঝক্সু জাতিতে লোহার। স্বচক্ষে সে সুবর্ণময় খুন্তিটি দেখিয়াছিল। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন ঠাকুরবাবার নিকট হইতে সে সোনা করিবার মন্ত্রটি আদায় করিতে পারিল না, তখন কি যে তাহার মনে হইল, ঠাকুরবাবার আশ্রয় সে আর ত্যাগ করিল না। আজীবন তাঁহার আশ্রয়েই থাকিয়া গেল। দুর্দান্ত মাতাল দুর্দান্ত কর্মীতে পরিণত হইল। ঝক্সু তাহার মোটা বুদ্ধি দিয়া এইটুকুই বোধ হয় বুঝিয়াছিল যে ফাঁকি দিয়া অর্থোপার্জন করা পাপ। তাহা না হইলে ঠাকুরবাবা নিজেই ঐশ্বর্যবান হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা হন নাই। তিনি নিজের কয় বিঘা জমি হইতে উৎপন্ন শস্য এবং শিষ্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামান্য দক্ষিণা লইয়াই তো সন্তুষ্টচিত্তে মায়ের সেবা করিতেছেন।

এই ঠাকুরবাবার পুত্র হরিহর স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়িয়াছিলেন। কাজ-চলা-গোছের ইংরেজি বিদ্যা লাভ করিয়া পিতার নির্দেশে তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোযোগ করিতে হইয়াছিল। খাঁটি স্বদেশি ছাঁচে ঠাকুরবাবা পুত্রটিকে মানুষ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, টানা চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে শুচিতা যেন মূর্ত হইয়া আছে। নগ্ন গাত্রে এক গোছা শুভ্র উপবীত, মস্তকে গোক্ষুর-পরিমাণ শিখা বিদেশাগত আধুনিকতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত বিরাজ করিতেছে। অথচ লোকটি রবীন্দ্রনাথের গোরার মত উগ্র নয়, কথায় কথায় বক্তৃতা দিবার আবেগ তাঁহার জাগে না। অতিশয় স্বল্পভাষী মৃদুপ্রকৃতির লোক। নিজেকে লোকচক্ষু হইতে যথাসম্ভব অবলুপ্ত করিয়া রাখাই যেন তাঁহার সাধনা। অধিকাংশ সময়ই মন্দিরে থাকেন, পূজা এবং পড়াশোনা করা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নাই। শিষ্যবাড়ির আহ্বানে অথবা কোথাও কথকতা করিবার জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছা ও সংকোচ সহকারে কাঁধে চাদরটি ফেলিয়া ক্বচিৎ কখনও তিনি বাহির হন। ফসল উঠিবার সময়ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে বাহির হইতে হইত, কিন্তু কুন্তলা আসিবার পর হইতে বৈষয়িক সমস্ত ব্যাপারের ভার তাহার হাতে ন্যস্ত করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই নিরীহ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সহিত এম. এ. পাস কুন্তলার বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছিল ত্রিপুরেশ্বরের সহিত কুন্তলার পিতার আলাপ ছিল বলিয়া। শুধু আলাপ নয়, কুন্তলার পিতা ইংরেজিশিক্ষিত অধ্যাপক হইলেও ত্রিপুরেশ্বরের একজন ভক্ত ছিলেন। কুন্তলার মা-ও ত্রিপুরেশ্বরকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন। ত্রিপুরেশ্বরই নাকি একবার বালিকা কুন্তলাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি খুব সুলক্ষণা, আমার হরুর সঙ্গে এর বিয়ে দাও তো বড় খুশি হই। কুন্তলার পিতা

মাতা উভয়েই তখন এ প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, কুন্তলাও কথাটা শুনিয়া মনে একটা স্বপ্নরচনা করিয়াছিল। কিন্তু কথাটা তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে ত্রিপুরেশ্বর পত্রযোগে আবার এ প্রস্তাব করেন। কুন্তলার পিতা পত্রের উত্তরে লেখেন, কুন্তলা হরিহর উভয়েই এখন পড়িতেছে, উহাদের পড়াশোনা শেষ হইলে শুভকর্ম সমাধা করা যাইবে। বিবাহ ঠিক করাই রহিল। কিন্তু কুন্তলা এমন ভালভাবে পড়াশোনা এবং পাস করিতে লাগিল যে, তাহার বাবা পড়া বন্ধ করিতে পারিলেন না। কুন্তলা যখন আই এ পড়িতেছে তখন তাহাকে একদিন বলিলেন, হরিহরের সঙ্গে কিন্তু তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করা আছে, বিয়ে করবি তো? কুন্তলার মন তখনও পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার মোহে মুগ্ধ। সবাই যেমন বলে তেমনই বলিল, পড়াশোনা শেষ করে তারপর বিয়ের কথা। ইতিমধ্যে ত্রিপুরেশ্বর মারা গেলেন। হরিহরকে ত্রিপুরেশ্বর বিবাহের কোনো কথাই বলিয়া যান নাই, বিবাহ সম্বন্ধে হরিহরেরও বিশেষ তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। পিসিমাই মাঝে মাঝে কেবল ব্যগ্র হইতেন। এদিকে কুন্তলা যখন এম এ পাস করিয়া ফেলিল, তখন তাহাকে একটা গ্রাম্য পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিতে বাবা একটু যেন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কুন্তলার মায়েরও কেমন অনিচ্ছা দেখা যাইতে লাগিল। কুন্তলার আত্মমর্যাদাবোধ তখন উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, ওঁদের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, সে কথার নড়চড় করা অভদ্রতা হবে। ওঁদের একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, ওঁরা যদি আপত্তি করেন, আমাদের তা হলে আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

কুন্তলার মা বলিলেন, ছেলেটি তো মোটে ম্যাট্রিক পাস শুনেছি। ওর সঙ্গে তোর মানাবে কেন?

কুন্তলা হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বাবা এম এ পি এইচ ডি, আর তুমি তো একেবারে নিরক্ষর, তোমাদের কি মানায়? আমি এম এ পাস করেছি ব'লে কি তোমাকে মা ব'লে সম্মান করব না? পাস করাতে কি এসে যায়।

কুন্তলার বাবা বলিলেন, ইংরেজি তেমন না জানলেও ছেলেটি সংস্কৃতে বেশ পণ্ডিত। ঘরে খেতেপরতেও আছে। একশো বিঘের ওপর ভাল জমি, দেশের সেরা জমি আছে। সেদিকে কিছু খারাপ নয়, অতবড় বংশ, ছেলেটিও বেশ সুস্থ সচ্চরিত্র। আমি কেবল তোর কথা ভেবেই একটু দোনোমোনো করছিলাম।

আমার কোনো আপত্তি নেই।

পত্র পাইয়া হরিহর অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। মেয়ে এম এ পাস শুনিয়া পিসিমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ও মা, তা হলে সে তো মেয়ে নয়, মেমসাহেব! চশমা-গাউন পরে রুজ পাউডার মেখে বাহার দিয়ে জুতো খটখটিয়ে বেড়াবে খালি। একবার কলিকাতায় দেখেছিলাম এক এম এ পাস মেয়েকে, বাবা রে বাবা, সে কি ছিরি তার। হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতো, চোখে চশমা, ঘাগরা করে কাপড় পরা! মুখখানি কিন্তু এরই সঙ্গে শুকনো আমসির মত, তার ওপর আবার রং পাউডার।

ভীত হরিহর অসহায়ভাবে বলিলেন, বাবা কিন্তু এরই সঙ্গে কথা দিয়ে গেছেন যে!

কথা দিয়ে গেছেন? কি করে জানলি তুই?

বাবার চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

এ যুক্তি অকাট্য। উভয়েই চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে পিসিমা অবশেষে বলিলেন, এক কাজ কর না হয় তুই, গুরুঠাকুরকে চিঠি লেখ্। তিনি জ্যোতিষীও বটেন, তোর কোষ্ঠিবিচার করে সৎপরামর্শ দেবেন। এ তো এক মহামুশকিলে পড়া গেল বাপু!

হরিহর তাহাই করিলেন। কয়েকদিন পরে কুলগুরু শিবকিঙ্কর শর্মার উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন, তোমার পিতা যদি যথার্থই বাগ্‌দান করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিলে সত্যই অধর্ম হইবে জানিও। তোমার কোষ্ঠীবিচার করিয়া তোমার বধূর যে বর্ণনা উদ্ধার করিলাম, তাহা জানাইতেছি। বাগ্‌দত্তা কন্যাটির সহিত যদি মিলিয়া যায়, তুমি নির্ভয়ে বিবাহ করিতে পার। বুঝিও, ইনিই তোমার বিধি নির্দিষ্টা সহধর্মিণী। কন্যাটি গৌরবর্ণা, নাতিদীর্ঘাঙ্গী বিদূষী ও চপলা হইবে। চরিত্রে মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রখরতা থাকিতে পারে কিন্তু স্থির প্রজ্ঞাশালিনী ও চারিত্রিক শক্তিসম্পন্না হওয়াতে তাহা দুঃখের হেতু না হইয়া আনন্দেরই কারণ হইবে। কন্যার নামের আদ্যক্ষর 'ক' হওয়া উচিত। কন্যার পিতা সম্ভবত অধ্যাপক। তোমার একটা অপমৃত্যু যোগ আছে দেখিতেছি, কন্যার কোষ্ঠিতে ইহার কোনো কাটান আছে কি না জানি না। যাই হোক, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়, অদৃষ্টও দুরতিক্রম্য। আমার মতে পিতৃআদেশ পালন করাই তোমার কর্তব্য।

বর্ণনার সহিত অনেকটা যখন মিলিয়া গেল, তখন হরিহর এবং হরিহরের পিসিমা বুঝিলেন, গত্যন্তর নাই, ভবিতব্যকে মানিতেই হইবে।

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ করিয়া হরিহর যেদিন গ্রামে আসেন, সেদিন হরিহরের পিসিমা কম্পিতবক্ষে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পালকির ভিতর হইতে শেমিজ-কামিজ-জুতা-পরা কী অদ্ভুত জীবই না বাহির হইবে। হয়ত প্রণাম না করিয়া শেকহ্যান্ড করিতে যাইবে, হয়ত বা বাড়িতে পা দিতে না দিতেই হরিহরের হাত ধরিয়া বলিবে, চল, ফাঁকা মাঠের হাওয়া খাইয়া আসি, বিকালে বেড়ানো আমার অভ্যাস! কিন্তু পালকির ভিতর হইতে যখন চেলী-পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী নতমুখী সিঁথি-মউর-শোভিতা অলক্তচরণা কুন্তলা সসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল, তখন আনন্দে বিস্ময়ে তিনি কাঁদিয়াই ফেলিলেন। যতদিন সংসারে ছিলেন, তাঁহার সে বিস্ময় এবং আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল! কুন্তলার প্রশংসায় তিনি শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বউ শুধু এম এ পাসই নয়, শাক চচ্চড়ি সুক্তো হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম রান্না করিতে জানে, বড়ি দিতে পারে চমৎকার আলপনা দেয়, চরকা কাটে, এমন কী ইতুপূজা পর্যন্ত জানে। হরিহরের মনেও যে ভয়টা হইয়াছিল, তাহা অল্প পরিচয়েই কাটিয়া গেল। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণ গৃহিণী হইবার যোগ্যতা কুন্তলার আছে। ইহা লইয়া বেশি উচ্ছ্বসিত অবশ্য তিনি হন নাই, বিবাহরূপ কর্তব্যকর্ম সমাপন করিয়া নিজের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় সহজভাবেই চলিতেছিলেন। ইহাই কুন্তলার বিবাহের ইতিহাস।

কুন্তলা জাব কাটিতেছিল।

ঝক্‌সুর পুত্র রামলাল একটি খাতা ও বই লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল বেশ কায়দা-দুরস্ত করিয়া ছাঁটা। গায়ে হাফশার্ট এবং হাফশার্টের হাতা হইতে আধুনিক রীতিতে ছোট একটা ত্রিভূজাকৃতি অংশ বাদ দেওয়া। পায়ে বক্‌লসশোভিত জুতা। সে যে ঝক্‌সুর পুত্র, তাহা না জানিলে বোঝা শক্ত। এবার সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। বহুমাইজির নিকট পড়া বলিয়া লইতে আসিয়াছে। রোজ আসে। সে বারান্দায় উঠিয়া বসিল এবং গতকল্য কুন্তলা যে যে অংশগুলি অনুবাদ করিতে দিয়াছিল, তাহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে বিরক্তিতে কুন্তলার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অজস্র ভুল। রামলালকে লইয়া আর পারা গেল না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষণেরও যে লিঙ্গ আছে, এই সামান্য কথাটা কিছুতেই ইহার মাথায় ঢুকিবে না। জাব কাটিতে কাটিতেই কুন্তলা সংশোধন করিতে লাগিল।

মাঘ মাসের শীত। সকাল হইতে একটা প্রখর পশ্চিমে হাওয়া উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল, রৌদ্রকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছে, তবু কনকনে শীত, হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। আঙুলের ডগাগুলি বরফ-শীতল। গায়ে গেঞ্জি, সার্জের পাঞ্জাবি, মোটা সোয়েটার, তবু শীত করিতেছে। শঙ্কর উঠিয়া ওভারকোটটা গায়ে দিল।

ছিত করছে।

খুকি মন্তব্য করিল। খুকির শীত নাই। একটা সাধারণ জুট ফ্ল্যানেলের ফ্রকই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরের কোণে একটি টুলের উপর বসিয়া এবং আর একটি উচ্চতর টুলের উপর খাতা রাখিয়া একটি পেন্সিল সহযোগে সে হিজিবিজি কাটিতেছিল। লিখিবার সময় শঙ্কর যেমনভাবে বসে ঠিক তেমনিভাবে একটু ঝুঁকিয়া টুলের উপর বাম কনুইয়ের ভর দিয়া বসিয়াছে। যদিও আজকাল কাগজ পেন্সিল দুর্মূল্য, তবু তাহাকে একটা ছোট পেন্সিল এবং পুরাতন খাতা দিতে হইয়াছে। সে চিঠি লেখে। বাবা যাহা যাহা করে, সব করা চাই। এমনি কী, পোড়া সিগারেটের টুকরা কুড়াইয়া সে বাবার মত 'ছিগ্‌লেট'ও খায়।

বড্ড শীত করছে।

তা খাবে।

খাব।

মাকে বলে আতি।

পাকা গৃহিণীর মত মুখ করিয়া খুকি রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

শঙ্কর খবরের কাগজটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। এতক্ষণ সে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। জাপান ও জার্মানির যুদ্ধোদ্যম আশঙ্কাজনক। ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত কি না, ইহা লইয়া নেতাদের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। উচিত কি? শঙ্কর ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ক্ষণপরেই মনে হইল, আদার ব্যাপারি শুধু জাহাজের ভাবনা ভাবিয়া মরিতেছি কেন? যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানও যেমন তাহার অসম্পূর্ণ, সম্পর্কও তেমনই অসংলগ্ন। বহু সহস্র মাইল দূরে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে, এ দেশের উলুখড়দেরও আপাতত চিন্তিত হইবার কোনো হেতু নাই। যুদ্ধ এ দেশে উপস্থিত হইলে যথাকর্তব্য চিন্তা করা যাইবে। যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো প্রেরণাই তাহার মনে জাগিল না।

কট কট কট কট কট...

'তাসা' বাজিতেছে। মহরম আসিয়া পড়িল নাকি? এইবার দলে দলে মুসলমান প্রজারা আসিয়া ধারের জন্য দ্বারে ধর্না দিবে। যে উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ঠিক হইয়াছিল যে, চাষের জন্যই চাষীদের ধার দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা ভাল বীজ, ভাল সার, ভাল গরু কিনিয়া ভালভাবে চাষ করিতে পারে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে। কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি চাষা ধার চায়— হয় বিবাহের জন্য, না হয় মহাজনদের ধার শোধ করিবার জন্য, কিংবা কোনো পর্ব উপলক্ষে। ভাল ফসল উৎপন্ন করিবার দিকে তাহাদের তত উৎসাহ নাই। তাহারা জানে যে যত ভাল ফসলই তাহারা উৎপন্ন করুক না কেন, সে ফসল তাহাদের ভোগে কখনও লাগিবে না। তাহা মহাজনে গ্রাস করিবে। যে ঋণজালে তাহারা জড়িত, প্রত্যেক বছর ফসল দিয়াই সে ঋণের খানিকটা পরিশোধ করিতে হয়, অনেক সময় মহাজন মাঠ হইতেই ফসল কাটাইয়া লইয়া যায় এবং

নিজের খুশিমত একটা মূল্য ধার্য করিয়া দেয়। তাহারা জানে যে, ফসল যত ভালই হোক, ঋণ কখনও পরিশোধ হইবে না। মহাজন ফসলের দাম যাহা দিবে, তাহাই তাহাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ ওই মহাজনরাই বিপদ-আপদে টাকা ধার দেয়, মহাজনদের দ্বারেই হাত পাতিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, মহাজনরাই মালিক। বহু যুগ ধরিয়া কার্যত এই মহাজনদেরই ক্রীতদাস তাহারা। মহাজনদের ঘরে দশ মনের জায়গায় বিশ মন ফসল পৌঁছাইয়া দিলে সত্য তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারিত, সে চেষ্টা তাঁহারা নিশ্চয়ই করিত। কিন্তু অধিকাংশ চাষীরই জমি সামান্য, কিন্তু ঋণ প্রচুর। সুদের চক্রবৃদ্ধিতে সে ঋণ পর্বতপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। সে পর্বত ধূলিসাৎ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দেশের আইন তাহাদের অনুকূল নয়, চাষের উন্নতি করিয়া ঋণশোধ করিবার আশাও তাহারা করে না। ভাল সার, ভাল গরু, ভাল বীজ লইয়া কী করিবে তাহারা? ঋণমুক্ত হইবে? অসম্ভব। বংশপরম্পরা ধরিয়া এই সত্য তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে যে, ঋণ আছে এবং থাকিবে। তাই বলিয়া কি বিবাহ হইবে না? হোলি, ছট, দশমীতে রঙিন নতুন কাপড় পড়িতে হইবে না? কোনো সামাজিক অপরাধে হুক্কাপানি বন্ধ হইলে গোতিয়াদের আহারে তুষ্ট করিয়া জাতে উঠিতে হইবে না? ইহাই তো তাহাদের জীবন। চাষের উন্নতির জন্য নয়, এই জীবনকে আঁকড়াইয়া থাকিবার জনাই তাহাদের টাকার দরকার। এই জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তেই তাহারা তাড়ি মদ গাঁজা আফিং খায়। এসব বাদ দিয়া তাহারা বাঁচিবে কিসের আশায়? তাই তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত নৈতিক বক্তৃতা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ করে না। তোমাদের মত তাহারাও জীবনকে ভোগ করিতে চায়। শঙ্কর ইহা বোঝে, তাই আর আপত্তি করিতে পারে না। লিখিত আইন অমান্য করিয়াও ধার দিয়া ফেলে। মহরমের বাজনা শুনিয়া তাই সে মনে মনে বিব্রত হইয়া পড়িল। চায়ের মিথ্যা অজুহাতে আবার একদল লোককে একগাদা টাকা দিতে হইবে। অথচ না দিয়াও উপায় নাই। এ এক মহাসমস্যা। এবার কিন্তু সে টাকা দিবে না ঠিক করিয়াছে। সেবার অত টাকা মহাজনদের সিন্দুকে ঢুকিয়াছিল। এবার সে টাকা দিবে না, জিনিস কিনিয়া দিবে। নিপুদা আর নিমাই ঘটক যদি সাহায্য করে, অনায়াসেই উহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনিয়া দেওয়া যায়। মেয়েদের জিনিস হাসি কিনিতে পারে। হাসিও এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। হাসির তত্ত্বাবধানে ও কার্যকুশলতায় মেয়ে-স্কুলটার বেশ উন্নতি হইতেছিল। হাসি 'হিন্দি-নোইং' নয়। কাজ-চলা-গোছের হিন্দি সে অবশ্য শিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দি পরীক্ষা পাস না করিলে গভর্নমেন্ট চক্ষে 'হিন্দি-নোইং' হওয়া যায় না। পরীক্ষা পাস করিতে হইবে। হাসি পরীক্ষা দিতে রাজি নয়। যাঁহারা 'হিন্দি-নোইং' শিক্ষয়িত্রীর জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা যে হিন্দি ভাষার প্রতি অথবা বেহারি সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিবশত করিতেছেন তাহা নয়, তাঁহাদের সর্ব বিষয়ে বাঙালিদের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া এ ধারণা হয় না যে, স্বকীয় বেহারি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহারা খুব বেশি অবহিত। এই শিক্ষিত বেহারিগণ বাঙালিদেরই মত চাকরিলোলুপ, বাঙালি পোষাক পরেন, ছেলেমেয়েদের বাঙালি নাম রাখেন, বাঙালি আহার পছন্দ করেন, বাঙালিদের সাহিত্য হইতে চুরি করেন, কিন্তু বাঙালিদের ভাল দেখিতে পারেন না। ইংরেজি সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালিদের যে মনোভাব ছিল, বিংশ শতাব্দীতে বাঙলি সম্পর্কে ইহাদের ঠিক সেই মনোভাব। হাসি যে স্কুলের উন্নতির জন্য এত পরিশ্রম করিতেছে, তাহা ইহাদের নিকট অবাস্তব ব্যাপার, আসল কথা, হাসি 'বাঙালিনী', তাহাই তাহার চরম অপরাধ। কোনো একটা ছুতা করিয়া তাহাকে তাই তাড়াইতে হইবে। মেষ শাবককে বধ করিবার জন্য নেকড়ে বাঘের ছুতার অভাব কোনো কালে হয় না, শিক্ষা বিভাগের আইনও তাঁহাদের সপক্ষে আছে।

যাহারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তাহাদেরই এই মনোভাব। অশিক্ষিত জনসাধারণ হাসিকে ভালবাসে, ভক্তি করে। শঙ্কর বারংবার এই সত্যটাই নানারূপে উপলব্ধি করিতেছে, যত গলদ যত কলহ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই। শিক্ষাবিভাগের আইনের কবলে নিমাই বেচারাও কবলিত। এই সব কারণে তাহার স্কুলগুলি গভর্নমেন্ট-সম্পর্ক রহিত করিবার ইচ্ছা শঙ্করের কিছুদিন পূর্বে হইয়াছিল। গভর্নমেন্ট যে টাকা সাহায্য করেন তাহা যৎসামান্য, সে সাহায্য না লইয়াও শঙ্কর স্কুলগুলি চালাইতে পারে। কিন্তু অন্য মুশকিল আছে। ইনস্পেক্টর মহাশয়ের কলমের খোঁচায় কাঁটাপোখর স্কুলটি যখন গভর্নমেন্ট সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল, তখন স্কুলটা উঠিয়াই গেল। অর্থাভাবে নয়, ছাত্র জুটিল না। যে স্কুল হইতে পাস করিয়া গভর্নমেন্ট 'নোকরি' মিলিবে না, সে স্কুলে কেহ পড়িতে চায় না। কেহই 'শিক্ষা' চায় না, সকলেরই উদ্দেশ্য 'নোকরি'। গভর্নমেন্ট অননুমোদিত 'জাতীয়' স্কুলে ছাত্র জুটিবে না। এ মনোভাব যদিও প্রশংসনীয় নয়, তবু শঙ্কর ভাবিয়া দেখিয়াছে, 'নোকরি'র লোভে তবু খানিকটা শিক্ষা তো হয়, তাহাই মন্দের ভাল। নিমাই আইনত নিজেকে 'কোয়ালিফাই' করিতেছে। মুরগি-মদ-পরিতুষ্ট ইনস্পেক্টর দয়া করিয়া তাহাকে 'টাইম' দিয়াছেন। হাসিকেও রাজি করাইতে হইবে। হাসি দিন দিন কেমন যেন গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে। মুখে হাসি নাই, প্রসন্নতা নাই, চোখে কেমন যেন একটা দৃষ্টি। কোথাও যায় না, কাহারও সহিত মেশে না। নিজের ছেলেকেও কাহারও সহিত মিশিতে দেয় না। নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যটুকু করিয়া নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। অমিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছিল, আলাপ জমে নাই। খুব কম কথা বলে। মনে হয়, সর্বদাই যেন অন্যমনস্ক। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক সেইটুকুই উত্তর দিয়া চুপ করিয়া যায়। ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া করিয়া আলাপ জমানো যায় না। অমিয়ার আর হাসির কাছে যাইবার উৎসাহ নাই। সুরমা কিন্তু মাঝে মাঝে যায়। কারণ সুরমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে, তদনুসারে সে নিয়মিতভাবে সামাজিক কর্তব্যগুলি করিয়া যায়। কবে কাহার বাড়ি যাইতে হইবে, কাহার বাড়িতে কবে কোন্ খাবারটি পাঠাইতে হইবে, কোন্ মেয়েটিকে কবে কোন্ গান শিখাইতে হইবে, কবে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে— এ সমস্তই সুরমা বাঁধা-নিয়ম অনুসারে করে, ঠিক নিয়মিতভাবে আসন বুনিয়া চলিয়াছে। অথচ উৎপলের সম্বন্ধেও সে উদাসীন নয়, উৎপলের জন্য অন্তত একটি খাবার তাহার নিজের হাতে করা চাই, উৎপলের অনেক চিঠির জবাব সে-ই লেখে। পড়াশোনাও করে। পাড়ায় কয়েকজন বাঙালি ও বেহারি মেয়েকে ব্যাডমিন্টন খেলাতেও উৎসাহিত করিয়াছে। কুন্তলার সহিত তর্ক করিবারও অবসর পায়। তুমুল তর্ক করিয়া বন্ধুত্বও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। অদ্ভুত রকম ছন্দোময় তাহার জীবন। অদ্ভুত মাত্রাজ্ঞান আছে। অমিয়ার সহিত যখন কথা কয়, মনে হয়, শিক্ষায় সে অমিয়ারই সমান। ঠিক সমান স্বচ্ছন্দতার সহিত সে সেদিন পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টের মেমসাহেবের সহিতও আলাপ করিল। কোথাও কখনও বেসুরো হয় না। সুরমার কর্মতৎপরতায় শঙ্কর মুগ্ধ। বহুকাল পূর্বে এই সুরমাকে ঘিরিয়া তাহার মনে যে মোহ জাগিয়াছিল, সে মোহ এখন কিন্তু আর নাই। নিজের স্ত্রীরূপে অমিয়ার স্থানে সুরমাকে সে কল্পনাই করিতে পারে না। সুরমা কারুকার্যমণ্ডিত পালঙ্ক, অমিয়া হয়ত অতি সাধারণ তক্তাপোশ। কিন্তু সুনিদ্রার জন্য শঙ্করের পালঙ্কের আর প্রয়োজন নাই, তক্তাপোশই যথেষ্ট। বস্তুত পালঙ্কে হয়তো মোটেই নিদ্রা আসিবে না, এ আশঙ্কাও আছে। না, সুরমাকে ঘিরিয়া সে মোহ তাহার আর নাই। তবু সুরমা-চরিত্রে সে মুগ্ধ।

বাবুজি!

দ্বারপ্রান্তে রহিম দেখা দিল। তাহার সহিত পুরণও আসিয়াছে। মহরমে কী কী জিনিস লাগে, তাহারই আলোচনা করিবার জন্য শঙ্কর রহিমকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। শঙ্কর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতেই রহিম এবং পুরণ উভয়েই সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুরণের কী খবর?

পুরণ কোনো উত্তর না দিয়া সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর তখন রহিমকে বলিল, মহরমে তোদের কি কি হয়, বলতো? এবার আর টাকা পাবি না কেউ, জিনিস কিনে দেব ভাবছি। মহরমে কি কি করবি বল?

রহিম নিজের ভাষায় মহরম-পর্ব বর্ণনা করিতে লাগিল।

আমরা যেমন পূজা-পার্বণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করি, উহারাও তেমনই একজন 'মোজাবর' নিযুক্ত করে। 'মোজাবর'কেই সব করিতে হয়। আমাদের দুর্গাপূজায় যেমন ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী আছে, মহরমেও তেমনই আছে। 'ছট্‌মি'র দিন দুইটি কর্তব্য। প্রথম 'কেলা কাট্‌টি'। সকালে কলার গাছ কাটিতে হয়। তাহার পর পাড়ার লোক দল বাঁধিয়া গিয়া 'ইমামবাড়া'তে সমবেত হইয়া সেই কলাগাছ পুঁতিয়া আসে। বিকালে দ্বিতীয় কর্তব্যটি করা হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য নদী হইতে মাটি আনা। পরিষ্কার মাটির গামলায় সে মাটি রাখিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া তাহা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই হইল 'ছট্‌মি'র কাজ। সপ্তমীর দিন 'সুনসান', অর্থাৎ শূন্য, বিশেষ কিছু করিবার থাকে না। 'অষ্টমী'র দিন কিন্তু অনেক কাজ। সেদিন ইমামবাড়াতে শরবত এবং তিল-চৌরি লইয়া যাইতে হয়। 'তিল-চৌরি' চাল চিনি এবং তিল দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্ন। প্রত্যেকে ঘরেই তৈরি শরবত এবং তিল-চৌরি ইমামবাড়াতে লইয়া যাইবার পর 'মোজাবর' নমাজ পড়েন। সেই নমাজ-পূত শরবত তিল-চৌরি ঘরে আনিয়া রাখা হয়। তাহার পর 'মলিকা' বানাইয়া কিছু বুঁদিয়া এবং লাল সুতা উহার উপর দিয়া মুরতজ আলির পাঞ্জার নিকট লইয়া গিয়া ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার পর সেগুলি ঘরে আনিয়া সকলে মিলিয়া খায়। সেই 'অঠ্‌মী'তেই রাত দুইটার সময় 'তাসা' বাজিয়া উঠে। মাটির কড়ার উপর চামড়া দিয়া এই বাদ্যটি প্রস্তুত, কোমরের কাছে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কাঠি দিয়া বাজাইতে হয়। 'তাসা' বাজিলেই সকলে নিজেদের নিশান-তাজিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাজিয়া-নিশান-সমন্বিত এক একটা দলকে 'আখড়া' বলে। আপন আপন আখড়া লইয়া তাসা বাজাইতে বাজাইতে লাঠি খেলিতে খেলিতে মুরতজ আলির বাজারে যায়। সেখানে নিশান নামাইয়া ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে। তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'নউমী'র দিনে কিছু হয় না, রাত্রে একটু ভালো আহারের ব্যবস্থা থাকে সেদিন। পোলাও হয়। রাত্রি নয়-দশটা নাগাদ পোলাও লইয়া মোজাবর-সহ সকলে ইমামবাড়াতে যায়। সেখানে 'ফতেহা' হয়। মোজাবর 'দোয়া' মানে অর্থাৎ সকলের জন্য ভগবানের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বাড়িতে পোলাও আহার করে। ইহার সঙ্গে মাংসও থাকে। রাত্রি দুইটার সময় আবার 'তাসা' বাজিয়া উঠে। আবার সকলে 'আখড়া' লইয়া বাহির হয়, পূর্বদিনের মত মুরতজ আলির বাজারে যায়, সেখানে নিশান-তাজিয়া নামাইয়া খনিকক্ষণ বিশ্রাম করে, ভোর হইতে না হইতে আবার বাড়ি ফিরিয়া আসে। 'দশমী'র সকালবেলাটা স্নানাদি করিয়া গতরাত্রির শ্রম অপনোদন করিতেই কাটিয়া যায়। অপরাহ্নে বেলা দুইটা নাগাদ আবার আখড়া হয়। সেদিন চতুর্দিক হইতে 'আখড়া' আসিয়া রাস্তার চৌমাথায় জমিতে থাকে। সেখান হইতে সকলে 'কারবালা'য় যায়। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী যাহার আখড়া আগে যাইবার আগে যায়, যাহার পিছনে যাইবার কথা সে পিছে থাকে। আগে-পিছে যাওয়া লইয়া অনেক সময় দাঙ্গাও

বাধে। কারবালায় পৌঁছিয়া 'দফ্না' দিতে হয়। নিশানে নিশানে কাগজের যে ফুল থাকে, সেই ফুলগুলিকে ছোট ছোট পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রায় বাঁধিয়া কবর দেওয়া হয়, কবরের ভিতর 'কফন' থাকে। এই কাগজের ফুল কবর দেওয়াই দফ্না দেওয়া। দফ্না দিবার পর নিশানগুলির সম্মুখে 'শির্নি' দিয়া সকলে আপন আপন বাড়ি ফিরিয়া যায়। এই উপলক্ষে কারবালার কাছে মেলা বসে, অনেকে সেখানে জিনিসপত্র কেনে। দশমীর পর চারদিন কাটিয়া গেলে 'ফুল-পান' হয়। সকলে পানের সহিত এক টুকরা ফুল চিবাইয়া খায়। ইহা হাসান-হোসেনের মৃত্যুদিবস পালন। চল্লিশ দিন পরে 'চলিশ্‌মা' হয়। আবার 'আখড়া' লইয়া মুরতজের কাছে সকলে যায় ইহাকে 'চেহেল্‌লুম'ও বলে অনেকে।

বর্ণনা শেষ করিয়া রহিম বলিল যে, সে এবার মানত করিয়াছে নিশান চড়াইবে।

তোরাও হিন্দুদের মত মানত করিস নাকি?

শঙ্করের অজ্ঞতা দেখিয়া রহিম হাসিল। তাহারা মানত করে বইকি। কেহ নিশান চড়ায়, কেহ হাত বাঁধে, কেহ দুল পরে। অনেক হিন্দুও মহরমের মানত করে, এই পুরণই তো এবার হাত বাঁধিয়াছে।

তাই নাকি?

পুরণ সসঙ্কোচে একটু হাসিল।

ইতিপূর্বে শঙ্করের অনেকবার মনে হইয়াছে, এখন আবার মনে হইল, হিন্দু মুসলমান সমস্যা লইয়া জিন্না-সাভারকরের যে দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক গজকচ্ছপ যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, সে দ্বন্দ্ব ইহাদের মধ্যে নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও শঙ্করের মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে মংলার বউটা একটা সদ্যোজাত শিশু রাখিয়া মারা গিয়াছে। প্রায় একই সময়ে আলিজানেরও ছেলে হইয়াছিল। আলিজানের বউ মংলার ছেলেকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করিতেছে। যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা খবরের কাগজের পাতায়, শিক্ষিত সমাজের বক্তৃতামঞ্চে, রাউন্ড-টেবল কনফারেন্সে বিষ উদ্গিরণ করে, সে সমস্যা ইহাদের মধ্যে নাই। সে সমস্যা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, ইহাদের নয়। ইহাদের একটি সমস্যাই আছে, তাহা দারিদ্র্য। সেই নিদারুণ সমস্যার প্রবল চাপে ইহারা সকলেই এক জাত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বিপন্ন। বাহিরের ধর্ম যাহাই হউক, অন্তরে সকলে এক। ইহারা মহরমই করুক আর 'ছট'ই করুক সকলেই দেবতার কাছে মানত করে, একই ভাষায় একই প্রার্থনা জানায়— ভগবান আমাদের বাঁচাও।

রহিম পুরণ উভয়েই টাকা ধার চাহিল। চাহিলে এ লোকটি যে 'না' বলিতে পারে না, এ খবর ইহারা জানিয়াছে, তাই ইহারই কাছে বার বার ছুটিয়া আসে। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে এমনভাবে কত টাকা সে দিতে পারে? জিনিস কিনিয়া দিলেও বা কী সুবিধা হইবে? জিনিস কিনিতেও টাকা লাগিবে, অথচ ইহারা সুখী হইবে না। নিজেদের উৎসবে নিজেরা জিনিস কিনিলে যে আনন্দ হয়, পরের দেওয়া জিনিসে ঠিক সে আনন্দ হয় না। সে আনন্দে ইহাদের বঞ্চিত করার কী অধিকার আছে তাহার?

টাকা নিয়ে যে মহাজনদের ধার শোধ করবে, তা হবে না।

নেই বাবু নেই, কিরিয়া খিলা লিজিয়ে।

উভয়েই সমস্বরে শপথ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ইহাদের শপথও যে সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা শঙ্কর বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, এই নিদারুণ শীতে উভয়েই অতি জীর্ণ সূতীর চাদর জড়াইয়া আছে, পরিধানেও অতি মলিন ছিন্ন বসন, হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে নাই। অথচ সে কোটের উপর

ওভারকোট চড়াইয়াছে! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আর সে তুলিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, কাল আসিস দেব।

উভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আবার শঙ্করের মনে প্রশ্ন জাগিল, ব্যাঙ্কের টাকা এমনভাবে খরচ করা কি ঠিক হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ব্যাঙ্কের যদি কিছু ক্ষতি হয়, আমিই না হয় তাহা নিজের টাকা হইতে পূরণ করিয়া দিব। নিজের টাকা। নিজের কত টাকা আছে তাহার! উৎপল তাহাকে যে বেতন দেয়, তাহার সমস্তই তো খরচ হইয়া যায়। পৈতৃক কিছু টাকা অবশ্য রাজীবলোচনের কাছে জমা আছে, (অম্বিকাবাবুর রাজীবলোচনের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল) কিন্তু সে টাকার পরিমাণ কত শঙ্করের তাহা জানা নাই। পিতা যে উইল করিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছে, এই অভিমানে সে এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধানই করে নাই এতদিন। রাজীবলোচনের কাছে যত টাকাই থাক, তাহা ধর্মত অমিয়ার। উইল সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু টাকা খরচ করিবার অধিকার তাহার নাই।

তোমার আদুরে মেয়েকে নিয়ে আর পারি না বাপু, সমস্ত দেশলাই কাঠিগুলো বাক্স থেকে বার করে মেঝেময় ছড়িয়েছে।

অমিয়া খুকিকে দুম করিয়া বসাইয়া চলিয়া গেল।

খুকি কাঁদিল না। তাহার সমস্ত মুখে যেন আহত আত্মসম্মান মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিস্ফারিত চক্ষুর কোণে অশ্রুর আভাস, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

মা দুষ্টু, এস তুমি আমার কাছে।

মুহূর্তে সমস্ত দুঃখ অন্তর্হিত হইল, হাসিতে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, শঙ্করের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, বাবা বালো।

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

চায়ের কথা ঠিক বলেছে গিয়ে তা হলে!

তক্ষুনি। উনুন জোড়া ছিল বলে দেরি হয়ে গেল।

খুকি শঙ্করের বুকের উপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

যা আদুরে করছ মেয়েটিকে, বুঝবে মজা। দুধ খাবি চল্।

আমি ডুড কাব না। বাবার তন্দে তা কাব।

শঙ্কর হাসিয়া উঠিল।

দেখেছ আস্পর্ধা! চল্!

অমিয়া জোর করিয়া তাহাকে তুলিয়া লইল।

না না না—

আচ্ছা, একটু চা দিচ্ছি, দুধ খাও গিয়ে। লক্ষ্মী তো—

ডিসে একটু চা ঢালিয়া দিতে হইল। খুকি অমিয়ার কোল হইতে ঝুঁকিয়া তাহা পান করিতেছে, এমন সময় বাড়ির উঠোনে কোঁকর-কোঁ শব্দে মুরগি ডাকিয়া উঠিল।

ঝমরু—

হ্যাঁ, ঝমরু এসেছে চল।

খুকি আর যাইতে আপত্তি করিল না।

চা-পান শেষ করিয়া শঙ্কর আবার ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল। নানা চিন্তার আলো-ছায়ায় তাহার মনটা বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কাছে দূরে সর্বত্র মহরমের বাজনা বাজিতেছে। কিন্তু এই

বাজনার অন্তরালে অপরিশোধ্য ঋণের যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই কাহিনীটাই শঙ্করের অন্তরে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া রহিল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, এত করিয়াও কিছু হইতেছে না। ইহারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। সকলেরই অর্থাভাব। কাহারও সচ্ছলতা নাই। এমন কী তাহার নিজেরও। টাকা টাকা— সকলেরই ওই এক চিন্তা।

উনিশ

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পাইয়া শঙ্করকে কলিকাতা চলিয়া যাইতে হইল। যে অ্যাডভোকেট জীবন চক্রবর্তীকে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাইয়া চিঠি দিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতাবাসী। তিনিই শঙ্করকে অবিলম্বে কলিকাতা যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কলিকাতার লোককে দিয়া কাজ করানোর নানারূপ অসুবিধা আছে। তথাপি দুইটি কারণে এই ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। প্রথমত, ইনি উৎপলের বন্ধু। দ্বিতীয়ত, এ অঞ্চলের কোনো ভাল উকিল কেনারাম চক্রবর্তীর পুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে রাজি নহেন। মনে মনে কেনারাম চক্রবর্তীর উপর সকলেই চটা, কিন্তু খোলাখুলিভাবে তাহা প্রকাশ করিতে সকলেই অনিচ্ছুক। লোকটাকে সবাই ভয় করে। জীবন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা করার ইচ্ছা শঙ্করের তেমন ছিল না কিন্তু উৎপল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন কথাটা তুলিয়াছে এবং সমস্ত টাকা যখন উৎপলেরই, তখন না করিবার আর সঙ্গত উপায় রহিল না। মকদ্দমা করিতে অস্বীকার করিলে উৎপল হয়ত আপত্তি করিত না, কিন্তু ওই 'হয়ত' জিনিসটা বড়ই অনিশ্চিত, বিশেষত টাকাকড়ির ব্যাপারে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করাই নিরাপদ। উৎপল যদিও তাহাকেই সর্বময় কর্তা করিয়া রাখিয়াছে, তবু সে যেন স্বাধীন নয়, একটা অদৃশ্য পরাধীনতার বন্ধন তাহাকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কিছুতেই সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। নেপথ্যবাসী উৎপল নীরবে থাকিয়াও যেন তাহার ওপর কর্তৃত্ব করিতেছে। কেন এমন হয়? ট্রেনে বসিয়া শঙ্কর এই কথাটাই ভাবিতেছিল। মনটা ভাল ছিল না। অনেকদিন পরে অমিয়াকে, বিশেষত খুকিকে, ছাড়িয়া আসিয়া সে কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। আসিবার সময় মেয়েটা বড় কাঁদিয়াছে। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়ে পড়িয়া তাহাকে যাইতে হইতেছে। কী দরকার ছিল এই কলহ করিবার? সে কেন সোজাসুজি উৎপলের প্রস্তাবে আপত্তি করিল না? কেন তাহার এই দীনতা?

ট্রেন চলিতেছে। দুই ধারে চাষের জমি। কৃষিপ্রধান দেশ। জমিই এ দেশের উন্নতি। চাষের উন্নতির জন্যই ইঁদারা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই ইঁদারাকে কেন্দ্র করিয়াই মকদ্দমা বাধিয়াছে। সহসা শঙ্করের একটা কথা মনে হইল, ইঁদারা করাইয়া লাভ কী? মকদ্দমায় জিতিয়া জীবন চক্রবর্তীর নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করিয়া পুনরায় পঁচিশটি ইঁদারা করাইয়া দেওয়া যদি সম্ভবও হয়, তাহা হইলেই কি চাষীদের দুঃখমোচন হইবে? যে অঞ্চলে জলকষ্ট নাই, সে অঞ্চলের চাষীরাই কি সুখী? তাহা তো নয়। সকলেই দুঃখী, সকলেই ঋণগ্রস্ত, সকলেরই টাকার অভাব। টাকা রোজগার করিবার জন্যই প্রত্যহ দলে দলে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া ফ্যাক্টরিতে, কলিয়ারিতে, চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। সকলেরই টাকার দরকার। টাকা না থাকিলে জমিদারের খাজনা দেওয়া যায় না, মহাজনের ধার শোধ হয় না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যায় না, এমন কি বিবাহ পর্যন্ত করা যায় না। প্রতি পদক্ষেপে নগদ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু টাকা তাহারা কিছুতেই পায় না। যে টাকার লোভে তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ছুটিয়া যায় সে টাকা তাহারা শহরেও সংগ্রহ করিতে পারে না।

শহরে বাড়িভাড়া আছে, কাবুলিওয়ালা আছে, ঘুষ আছে, মদের দোকান আছে। শহরের টাকা শহরেই রাখিয়া আসিতে হয়। শহরে বাস করিয়া তাহারা কেবল শহুরে হয়। বিলাসিতার নেশায় কুসংসর্গে জর্জরিত হইয়া পশুর মতই অবশেষে মরিয়া যায়। কয়েকটা ইঁদারা করাইয়া দিলেই কি ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে? এক সময় ছিল, যখন তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়েই প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস পাইত। দেশের রাজারা খাজনা হিসাবে উৎপন্ন শস্যেরই অংশ লইতেন, টাকা চাহিতেন না। শস্যের বদলেই তাঁতি কাপড় দিত, নাপিত ক্ষৌরকার্য করিত, ধোপা কাপড় কাচিত, কুম্ভকার বাসন প্রস্তুত করিত, পুরোহিত পূজা করিতেন, অধ্যাপক টোল চালাইতেন। আজকাল কিন্তু সকলেই টাকা চায়। চাষীরা টাকা পাইবে কোথায়? তাহারা টাকা উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে শস্য। যে শস্য না হইলে পৃথিবীর কাহারও চলে না, সেই শস্য যাহারা রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া উৎপন্ন করে, তাহারাই আজ টাকার ফেরে পড়িয়া নিরন্ন বিবস্ত্র। আর আমরা তাহাদের আসল দুঃখটা না বুঝিয়া কেবল কতকগুলা বাঁধা বুলি কপচাইয়া মরিতেছি। আমরা তাহাদের নিকট টাকার দাবি করি বলিয়াই তাহারা তাহাদের কষ্টার্জিত শস্য লইয়া রক্তশোষক মহাজনদের দ্বারস্থ হয় এবং যে কোনো মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে। সারা বছরের খাইবার সংস্থানও অনেকের থাকে না, বীজের শস্যও অনেককে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। এই যেখানে চাষের পরিণাম, সেখানে চাষের জন্য জল সরবরাহ করিলে কতটুকু সুবিধা হইবে, যদি উৎপন্ন শস্যের পরিবর্তে তাহারা জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি না পায়? এ চাষ করিয়া লাভ কী তাহাদের? যত শস্যই হোক না, তাহা বিক্রয় করিয়া টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং তাহার দর ঠিক করিবে মহাজন, যে মহাজন পূর্বে টাকা ধার দিয়া সুদের সুদ কষিয়া বসিয়া আছে। মহাজনরাও নিরুপায়। কারণ তাহারাও মহত্তর জনের নির্দেশ অনুসারে চলিতে বাধ্য।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল। চাষীদের নয়, খুকিকে নয়, অমিয়াকে নয়,—শৈলকে। সেই ফলসা গাছটার তলায় শৈল যেন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। কোঁচড়ে মিত্তিরদের বাড়ির পেয়ারা। কোঁচড় হইতে একটা ডাঁশা পেয়ারা বাহির করিয়া শঙ্করকে দেখাইয়া ভুরু নাচাইয়া ঘাড় নাড়িল, তাহার পর তাহাতে কামড় দিল। সমস্ত মুখখানাতে দুষ্টুমি মাখান। হঠাৎ সে কাঁদিয়া উঠিল। শঙ্করদা, শিগগির এসো, এটা পেয়ারা নয়, ওল, মুখ কুটকুট করছে আমার, শিগগির এস তুমি, এস না—। ছুটিয়া যাইতে গিয়া শঙ্কর হোঁচট খাইল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। হঠাৎ এতদিন পরে শৈল আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিল কেন? শৈলর কথা সে বহুদিন ভাবে নাই। শঙ্কর উঠিয়া বসিল। শৈলর মুখখানাই চোখের উপর ভাসিতে লাগিল। সত্যই পরলোক বলিয়া কিছু আছে নাকি? প্রায় চার বৎসর হইল, শৈল মারা গিয়াছে। যে সন্তানের জন্য তাহার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সন্তানটিও বাঁচে নাই। মিস্টার এল কে বোস আবার বিবাহ করিয়াছে। অন্যমনস্ক হইয়া শঙ্কর শৈলর কথাই ভাবিতে লাগিল। ঠিক করিল, কলিকাতায় গিয়া তাহার নামে তর্পণ করিবে। হয়ত তাহার তৃষিত আত্মা এখনও কোথাও একবিন্দু জলের জন্য আশা করিয়া আছে। হয়ত—

ট্রেন একটা বড় স্টেশনে আসিয়া প্রবেশ করিল। 'চা-গ্রম' 'গোশ্‌তরোটি' 'চাই কমলালেবু', যাত্রীদের কলরব, কুলির চিৎকার, ট্রলির ঘড়ঘড়ানি, হুড়মুড় করিয়া একটা প্রচণ্ড কোলাহল মনের ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শৈল কোথায় হারাইয়া গেল!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল।

চার বৎসর পরে এই তাহার কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ। সেই যে গিয়াছিল, আর আসে

নাই। কলিকাতার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে 'বিফল' দেওয়াল, রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে ট্রেঞ্চ। রাত্রে ব্ল্যাক আউট। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিতেছে। মাথার ওপর এরোপ্লেন ঘুরিতেছে। চায়ের দোকানে, বৈঠকখানায়, ট্রামে বাসে সর্বত্রই যুদ্ধের আলোচনা। জাপান ক্রমশ আগাইয়া আসিতেছে, জওহরলাল কোন্ বক্তৃতায় কী বলিয়াছেন, মহাত্মাজির স্বল্প দুই-চারিটি উক্তি হইতে কী আভাসিত হইতেছে, সে সবের সহিত বর্তমান যুদ্ধ-'পরিস্থিতি'র কী সম্পর্ক এই সব লইয়াই কথা, আলোচনা, তর্ক। দীর্ঘ চার বৎসর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া সে সত্যই যেন গেঁয়ো হইয়া গিয়াছে। বর্তমান জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিবার প্রয়োজনই সে অনুভব করে নাই, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আগ্রহই নাই তাহার। একটা মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে বটে, তাহার আঁচ গৌণভাবে আমাদের গায়েও লাগিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ইতিপূর্বে এমন প্রত্যক্ষভাবে তাহার অন্তরকে বিচলিত করে নাই। সত্যই একটা কিছু হইবে নাকি? সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিল। আর এক মুশকিল, পুরাতন পরিচিত দলের কাহারও সহিত দেখা হইল না। সকলেই হয় অনুপস্থিত, না হয় অসুস্থ। কাহারও সহিত যে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবে, তাহার উপায় নাই। নীরা, অনিল, পলাশকান্তি, রেণুকা, নিলয়কুমারের দল পলাশকান্তির সহিত আসাম পরিভ্রমণে গিয়াছেন। প্রফেসর গুপ্ত পক্ষাঘাতে শয্যাগত, কাহারও সহিত দেখা করেন না। ভণ্টু সে ঠিকানায় নাই। চুনচুনও ঠিকানা বদলাইয়াছে। খুঁজিলে হয়ত চুনচুন্‌কে বাহির করা যায়, কিন্তু কি দরকার? চুনচুনেরও যে ছবিটি মনে আঁকা আছে, তাহাই তো চমৎকার। তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে, হয়তো সে সন্তানসম্ভবা, কিংবা হয়ত— না, দরকার নাই। বর্তমানের চুনচুন্ আপন কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে যাইবার চলিয়া যাক। যে চুনচুন্ একদা তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছিল, তাহার ছবিটাই অমর হইয়া থাক। শুধু চুনচুন্ সম্বন্ধে মনের গহনে যে দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, এতদিন পরে সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া শঙ্কর নিজের কাছেই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। না, চুনচুনের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা সে আর করিবে না।

সেকালে আর কে তাহার পরিচিত ছিল, ভাবিতে গিয়া অনেকগুলি মুখ একে একে মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদি, মুক্তো, মুক্তোর সগোত্রবর্গ, ভণ্টু, ভণ্টুদের পরিবার, অরিজিনাল, প্রোটোটাইপ, নিবারণবাবু, আস্‌মি, দার্জি, অপূর্বকৃষ্ণ, বেলা মল্লিক, প্রফেসর গুপ্ত, মুকুজ্জেমশাই, মৃন্ময়, মিসেস স্যানিয়েল, হিরণদার দল, সংস্কার পত্রিকার পূর্বতন কর্মচারীবৃন্দ, করালীচরণ, লোকনাথ ঘোষাল, ছোট বড় আরো কত লোক মনের পর্দায় যেন মিছিল করিয়া আসিল এবং মিলাইয়া গেল। কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, সবই অস্পষ্ট। ছায়াছবির মিছিল। কাহারও সম্বন্ধে কিন্তু মনের সে আগ্রহ আর নাই। এমন কি তাহার নিজের শ্বশুরবাড়ির সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ অতিশয় কম। বিবাহের পর হইতে সে শ্বশুরবাড়ির যায় নাই বলিলেও চলে। শিরীষবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন, মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া অমিয়াকে লইয়া যান। পূজার সময়, জামাই ষষ্ঠীতে কখনও কিছু কাপড়-জামা পাঠান। ইহার অধিক কোনো সম্পর্ক নাই। শ্বশুরবাড়ি দূরের কথা, নিজের মায়ের সহিতই বা তাহার নিবিড় সম্পর্ক কতটুকু? মা পাগলা গারদে আছেন, মাসে তাঁহার জন্য সে টাকা পাঠাইয়া দেয়। মাঝে একবার রাঁচি গিয়াছিল, কর্তব্যবোধেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মায়ের পাগলামি আরও যেন বাড়িয়া গেল। ডাক্তাররা দেখা করিতে মানা করিলেন। প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া তাই সে নিশ্চিন্ত আছে। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক থাকিলে সে কি ডাক্তারের মানা শুনিত? সে কি মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত? না, সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, মায়ের সহিতও তাহার

প্রাণের গভীর সম্পর্ক নাই। যাহা আছে, তাহা কর্তব্যের সম্পর্ক মাত্র। প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা বড় কঠিন। মনে যে সুর বাজে, সেই সুরের যাহারা সমঝদার তাহাদেরই সহিত কেবল অন্তরঙ্গতা হয়, বাকি সকলে পর। মনে চিরকাল এক সুর বাজে না। আপনজনও চিরকাল একা থাকে না। নতুন সমঝদার আসিয়া জোটে, সে-ই তখন অন্তরতম হয়। পুরাতন আপনজনেরা স্মৃতির ফলকে কখনও বা সামান্য চিহ্ন রাখিয়া, কখনও বা না রাখিয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যায়।

ট্রামের এক কোণে বসিয়া শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। ট্রামটা প্রায় খালি, সামনের দিকে আর একজন মাত্র যাত্রী বসিয়া আছেন। শঙ্কর একটা হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে সে কতক্ষণই বা থাকিতে পায়! সমস্ত দিনই ট্রামে-বাসে কাটিতেছে। মফস্বলের লোক অনেকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছে, বহু লোকের বহু ফরমাশ আছে। কোন্‌টা চাঁদনিতে পাওয়া যায়, কোন্‌টা বড়বাজারে, কোন্‌টা শ্যামবাজারে, কোন্‌টা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। চরকির মত ঘুরিতে হইতেছে। অ্যাডভোকেট মহাশয়ের সহিতও পরামর্শটা সমাধা হয় নাই। সম্মুখে উপবিষ্ট যাত্রীটি শঙ্করের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিল।

আরে কে শঙ্কর নাকি! অ্যাঁ, ছ্যা-ছ্যা, চিনতেই পারিনি! ভাবছিলুম, কে না কে-অ্যাঁ।

শঙ্করও এতক্ষণ চিনিতে পারে নাই। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল। ভণ্টুর মেজকাকা, ওরফে বাবাজি, ওরফে মুক্তানন্দ। সেকালের গোঁফদাড়ি কিছুই নাই, সমস্তই কামাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই সহসা চেনা আরও কঠিন।

অনেক দিন পরে দেখা হল। তাপর ভাল তো সব?

বাবাজি নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

চলে যাচ্ছে এক রকম।

ভণ্টুর কাছে শুনেছিলাম, তুমি দেশে ফিরে গেছ। তা ভালই করেছ এক রকম। কলকাতা ভদ্রলোকের বাস করবার অযোগ্য হয়ে পড়ছে ক্রমে। জাপান যদি অ্যাটাক করে, সকলকেই পালাতে হবে।

ভণ্টুর খবর কি?

ভণ্টুর চিঠিপত্র পাও না?

গোড়ায় গোড়ায় পেয়েছিলাম দু-একখানা। তারপর আর পাইনি।

তাহার ঠিকানাটা কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময় বাবাজি সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, আফিং খেলেই মানুষ জন্তু হয়ে যায়, ইনজেকশন নিলে কি আর রক্ষে আছে তার।

কে ইনজেকশন নেয়?

তোমার ভণ্টু গো।

আপিঙের ইনজেকশন? মানে মর্ফিয়া?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই রকম কি একটা যেন নাম তার।

মর্ফিয়া নেয়! কেন?

কেন আবার, নেশা? পায়ের হাড় ভেঙে মেডিকেল কলেজে যখন পড়ে ছিল, তখন সেখানকার ডাক্তাররা ওই ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে ওর সর্বনাশটি ক'রে দিয়েছে। এখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-বেলা ও-বেলা ইনজেকশন না হ'লে চলে না, নিজেই পট পট ছুঁচ ফুটিয়ে নেয়।

অত মর্ফিয়া পায় কোথায়?

পায় কোথায়? শোন কথা একবার। পায় ডাক্তারদের মারফত।

আজকালকার লক্ষ্মীছাড়া ডাক্তারগুলো পয়সা পেলে না করতে পারে হেন কাজ তো নেই। ফি পেলেই প্রেসক্রিপশন লিখে দিচ্ছে।

বাবাজি হাত উল্টাইয়া মুখভঙ্গি করিলেন।

ঘেন্না ধরে গেছে বুঝলে, সমস্ত সংসারের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

ভন্টুর ঠিকানাটা কি?

সে তো এখানে নেই। তার আপিস দিল্লিতে উঠে গেছে। সে এখন দিল্লিতে।

বউদিরা? বউদিরা সেখানে নাকি?

ওরা তো বহুকাল হল ভিন্ন হয়ে গেছে, এ খবর জান না বুঝি তুমি?

না।

শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিল না।

বাবাজি কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া পকেট হাতড়াইয়া একটা পকেট বুক বাহির করিলেন। সেটা একবার খুলিয়া কি দেখিয়া আবার সেটা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

ওদের খবর কতদিন জান না?

ভন্টুর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম, তারপর আর জানি না।

দাদা বেঁচে থাকতে কিছু হয়নি, তারপর এই কাণ্ড।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বাবাজি পুনরায় বলিলেন, ভন্টুর বউ বড়লোকের মেয়ে, কাঁহাতক সে আর আস্তাকুঁড়ে হাঁটু গেড়ে বাসন মাজতে পারে, বল?

বাবাজির চোখে যেন একটা বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলিয়া গেল। শঙ্কর যেন বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল। যে ভন্টুকে সে চিনিত, সে যে স্ত্রীর পরিশ্রম লাঘবের জন্য বউদিদির সহিত মনোমালিন্য করিয়া পৃথক হইয়া যাইতে পারে, এ কল্পনাও সে কোনোদিন করে নাই।

বউকে বাসন-মাজা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যে অবশ্য ভন্টু আলাদা হয়নি। আলাদা হ'ল একটা তুচ্ছ কারণে, আর তোমার ওই বউদির জেদে। ভয়ঙ্কর লোক তোমার ওই বউদিটি। আমি পট ক'রে মাঝ থেকে খামকা জড়িয়ে পড়লাম।

এমনভাবে শঙ্করের দিকে চাহিলেন, যেন শঙ্করই এজন্য অপরাধী। তাহার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ট্রাম আসিয়া মেডিকেল কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

আসল কারণটা তা হলে কি?

আসল কারণ হল ভন্টুর ছেলেটা। ছেলেটা হয়ে উঠেছিল ভয়ানক আদুরে। কারণও ছিল। ভন্টু গ্রাহ্য করত না যদিও, কিন্তু ভন্টুর স্ত্রীর মনে একটা ক্ষোভ হতই যে, তার ছেলের ঠিক যত্ন হচ্ছে না। দুধ পেত না, খেলনা পেত না, ভাল পোশাক পেত না। দিতে হলে সব ছেলেকেই দিতে হয়, পয়সায় কুলোত না ভন্টুর। এ সমস্তর অভাব ভন্টুর স্ত্রী পূরণ করত আদর দিয়ে দিয়ে। ভন্টুর বউদি ছেলেটাকে সমীহ করত। ভয়ানক আদুরে করে তুলেছিল ছেলেটাকে। যা হাতের কাছে পেত ভাঙত, বই পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলত, কেউ কিছু বলত না। হাতে কাঁচি পেলে তো রক্ষে নেই, যা পাবে কেটে ফেলবে। ভন্টুর বই-খাতা, কাগজ-পত্তর, এমন কি ভন্টুর একটা দামি স্যুট পর্যন্ত কাঁচি চালিয়ে দিলে একদিন সাবাড়। দুপুরে সবাই ঘুমত, ভন্টু আপিসে, বড় ছেলে দুটো স্কুলে, কর্তা সেই অবসরে সব জিনিস নষ্ট করতেন বসে বসে। রাগলে ভন্টুর চেহারা কী রকম হয় তা নিশ্চয় তোমার অজানা নেই। আপিস থেকে ফিরে এসে রোজ

সে অনর্থ করত। অথচ আসল অপরাধীর নাম বলতে কারও সাহস হত না, ভন্টুর স্ত্রীর তো হতই না, তোমার বউদির হত না, ছেলেগুলোও ভয়ে চুপ করে থাকত। কারণ নাম বললেই ভন্টু নির্দয় ঠেঙাবে।

বাবাজি চুপ করিলেন।

তারপর?

ভন্টু কিন্তু ঠেঙানো বন্ধ করলে না। সে ভুল করে মনে করত যে, তার ভাইপোরাই বোধ হয় এসব করছে। তারা যত বলত— আমরা করিনি, তত তার রাগ চড়ে যেত, মনে হত ওরা মিছে কথা বলছে। তার নিজের ওইটুকু ছেলে কাঁচি চালাতে পারে, এ সন্দেহও তার মনে হত না। তার এ ভুল ভাঙিয়েও কেউ দিত না, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য। ভাইপো তিনটে রোজ মার খেয়ে মরত, তবু সত্যি কথাটা বলত না। না, ভুল করছি. একদিন একজন বোধ হয় বলেছিল। কিন্তু সে আরও বেশি মার খেয়ে মল, ভন্টু বিশ্বাসই করল না তার কথা। ভন্টুর মার যে কী মার, তা তো জানই। মারতে মারতে বেত ফেটে ছ্যাতরা ছ্যাতরা হয়ে যেত। শেষকালে তোমার বউদি একদিন এক কাণ্ড করে বসল। একটা খোলার বাড়ি দেখে সেইখানে একদিন উঠে গেল দুপুরে, ভন্টু তখন আপিসে।

বাবাজি পুনরায় নীরব হইলেন।

তারপর?

তারপর আর কি? সেই থেকেই ভিন্ন। ভন্টু অনেক সাধ্যসাধনা করল, কিন্তু বউদি আর কিছুতেই ফিরল না। কেন আলাদা হয়ে গেল, তাও ঘুণাক্ষরে বলল না, মানে সত্যি কথাটা বলল না। শুধু বলল, তোমার দাদার বেশি ঝামেলা সহ্য হয় না, তাই স'রে এসেছি।

ভন্টুর দাদা ফিরে এসেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, অনেক দিন। সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেশ মুটিয়ে ফিরেছে। চাকরি করছে আবার।

তারপর?

তারপর আর কী! কিছুদিন পরেই ভন্টু দিল্লিতে বদলি হয়ে গেল। ওরাও কলকাতার খরচ চালাতে না পেরে নৈহাটিতে গিয়ে বাসা বাধল। সেখানেই এখন আছে। আমি মাঝ থেকে কেবল বিপদে পড়ে গেছি।

আপনার কি হল?

জড়িয়ে পড়েছি। ঠাকুরের আদেশ অমান্য করতে পারি না!

ঠাকুরের আদেশ মানে? মুখুজ্জে মশাইয়ের?

বাবাজি বিস্মিত হইলেন।

ঠাকুরকে তুমি চিনলে কি করে?

আমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল যে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ। চমৎকার লোক। ও-রকম পরোপকারী লোক আমি আর দেখিনি।

ওই! ওই পরোপকারের ঠেলাতে আমিও অথৈ জলে পড়েছি।

কী রকম?

গুজরাটে গিয়েছিলাম প্রভাসতীর্থ করতে। মন বসল না। ফিরে এলাম। এসে শুনলাম, ওরা সব নৈহাটিতে। কর্তব্যের খাতিরেই গেলাম একদিন দেখা করতে। সেখানে গিয়ে দেখি, হইহই ব্যাপার, রইরই কাণ্ড। ফন্তির হয়েছে টাইফয়েড, আর ঠাকুর সেখানে রয়েছেন। আমি তো অবাক। শুনলাম, বিষ্ণুচরণের সঙ্গে ওঁর পুরীতে আলাপ হয়েছিল নাকি। দেখলামও, খুবই স্নেহ

করেন বিষ্ণুচরণকে। ফন্তির চিকিৎসা উনিই চালাচ্ছেন। বড় ডাক্তার আসছে, বরফ লেবু আঙুর সমস্ত ওঁরই খরচে। এত টাকা যে উনি কোথা থেকে পান, ভগবানই জানেন। আমি প্রণাম করতেই বললেন, আরে তুমি কোথা থেকে এখানে! আমি যে বিষ্ণুচরণের কাকা, এ খবর ঠাকুর জানতেন না। শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন, তা, বেশ ভালই হল, এখন কী করছ তুমি? বললাম, প্রভাসতীর্থটা সেরে এলাম। বললেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আর কি হবে, তুমি এদের কাছেই থাক। আমি তো শুনে অবাক! কিন্তু ঠাকুরের মুখের ওপর কিছু বলতে ভরসা করলাম না। রাত জেগে ফন্তির সেবায় লেগে পড়তে হল। কি করি, ঠাকুর নিজে রাত জাগছেন, আমি কি করে ঘুমোই? একদিন ঠাকুরকে আড়ালে পেয়ে বললাম, ঠাকুর নামজপ করে মন ভরছে না, আমাকে একটা মন্তর দিন আপনি। ঠাকুর হেসে ফেললেন, পাগল নাকি! আমি কী মন্তর দেব তোমাকে! আমি জোর করে চেপে ধরতে বললেন, আচ্ছা, আমি যা বলব তা সত্যি করবে? আমি বললাম, নিশ্চয়। ঠাকুর কী বললেন শুনবে?

বাবাজির চক্ষু দুইটি যেন অক্ষিকোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

কি বললেন?

তুমি বিষ্ণুচরণদের সেবার ভার নাও। এরা বড় দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। এদের সেবা করলে তোমার পুণ্য হবে। কর্মযোগও মুক্তিলাভের একটা শ্রেষ্ঠ পন্থা। তুমি কায়মনোবাক্যে এদের সেবা কর দিকি, আনন্দ পাবে, মুক্তিও পাবে। কোনো মন্ত্রের দরকার নেই। বিশ বাঁও জলে পড়ে গেলুম, বুঝলে? বললাম, আপনি যা বলছেন, তা করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখন এদের এই দুরবস্থা, বিষ্ণুচরণের আয় যৎসামান্য, এর ওপর আমার নিজের যা বিষয়-আশয় ছিল, তা তো সব ফুটকড়াই হয়ে গেছে। ভন্টুকে দিতে চেয়েছিলাম, সে নেয়নি, বন্ধুর গর্ভেই গেল শেষকালে সব। ঠাকুর বললেন, না, গলগ্রহ হতে বলছি না। ওদের সাহায্য করতে বলছি। তোমাকে রোজগার করতে হবে। যা রোজগার করবে, সব এনে বউমার হাতে দেবে। চাও তো এক্ষুণি তোমার একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারি। আমার চেনা একজন রেশমের কারবারি বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন। আমার আর কিছু বলবার উপায় রইল না। কিছুদিন পরে সত্যিই ঠাকুর চাকরিটি জুটিয়ে দিলেন এবং তা' কিছুদিনের পরে ফন্তি যেই একটু সেরে উঠল, অমনি অন্তর্ধান করলেন, তাঁর যা চিরকাল স্বভাব।

তারপর?

তারপর আর কী! সেই চাকরি করছি। নৈহাটি থেকে রোজ ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করি। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝ একবার।

বাবাজি চোখের দৃষ্টিতে পুনরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

শঙ্কর বুঝিল, বাবাজি সেবাটা কায়মনোবাক্যে হয়ত করিতেছেন, কিন্তু সে বিষয়ে নির্বিকার নন।

ভন্টু কিছু সাহায্য করে না?

আগে আগে করত কিছু কিছু। এখন আর পারে না। পারবে কি করে? একে দিল্লির ভীষণ খরচ, তার ওপর ওই ইঞ্জেকশন কিনতে হচ্ছে অগ্নিমূল্যে।

ইঞ্জেকশন রোজ নেয়?

রোজ, দুবেলা। রেশমের ক্যানভাসিং করতে মাঝে আমি একবার দিল্লি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, তার বউ বেশ ছিমছাম করে, মানে, নিজের মনের মত করে সংসারটি গুছিয়ে নিয়েছে। ছেলের ট্রাইসাইকেল, বাইরের ঘরে সোফা, রেডিও কিনেছে একটা।

আর ভন্টু?

ভণ্টু ঊর্ধ্বশ্বাসে চাকরি করছে। সন্ধের পর আপিস থেকে ফিরে ইঞ্জেকশন নেয়, আর ছাতে ব'সে হেঁড়ে গলায় গান গায়। আর মাঝে মাঝে হা-হা ক'রে হাসে— মর্মান্তিক সে হাসি, বুঝলে?

কী গান গায়?

নিজে তৈরি করেছে গান হে। টুকে এনেছি আমি, দেখবে? বাবাজি পকেট হইতে পকেট-বুকটি বাহির করিলেন এবং একটি পাতা খুলিয়া শঙ্করকে দিলেন।

শঙ্কর পড়িল

লদ্‌কালদ্‌কি করতে করতে হিল্লি দিল্লি হলাম পার
নৈহাটিতে রান্নাঘরে বেগুন ভাজছে বিড়্‌ডিকার
খুজবুজ, খুজবুজ, খুজবুজ—
ফাটকা খেলায় আটকে গিয়ে পড়লাম বিষম গাড্ডায়
চুনোপুঁটি স্মোকিং হুক্কা তিমি মাছের আড্ডায়
খুজবুজ, খুজবুজ, খুজবুজ—

দাও, এবার আমাকে নামতে হবে। এই, রোক্‌কে।

ট্রাম থামিল। পকেট-বুক লইয়া বাবাজি নামিয়া গেলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ সে যেন তন্ময় হইয়া একটা উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। ট্রামে অনেক যাত্রী উঠিয়াছে, সে লক্ষ্য করে নাই। তাহার যেখানে নামিবার কথা, সে স্থান বহুক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক আবার বাহির হইয়া না যান। উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্যা এখন ভণ্টু নয়, তাহার সমস্যা এখন উকিল এবং ইঁদারা। অনেক জিনিসও কিনিতে বাকি আছে। সহসা মনে পড়িল, কুমোরটুলিতেও একবার যাইতে হইবে।

চলন্ত ট্রাম হইতে সে লাফাইয়া পড়িল।

কুড়ি

দিবা দ্বিপ্রহর।

খোলা মাঠে হু-হু করিয়া একটা হাওয়া বহিতেছে। কাছে দূরে গরু চরিতেছে। মাঠের প্রান্তে যে কুলগাছটা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কয়েকটা রাখাল বালক ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িয়া চলিয়াছে। আরও দূরে চাষের জমি। কোথাও সরিষা, কোথাও গম, কোথাও যব, কোথাও মটর, কোথাও ছোলা— হলুদ-সবুজ-নীলের মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে যেন। যমুনিয়ার কিন্তু এ সব দিকে লক্ষ্য নাই, সে আপন মনে কাঠ ও গোবর কুড়াইতেছে। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ইহাই তাহার কাজ। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সে শুকনো ডালপালা ও গোবর সংগ্রহ করে। প্রকৃতির এই ঐশ্বর্যের মাঝখানে তাহাকে কিন্তু মোটেই মানায় নাই, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মাঝখানে খানিকটা সচল আবর্জনা যেন। মাথায় রুক্ষ তৈলহীন চুল, পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন. রোগে খাদ্যাভাবে শীর্ণ শ্রীহীন বিগত যৌবন দেহ। বলিষ্ঠ মুশাইকে ভুলাইবার মত তাহার কিছুই নাই। অথচ কতই বা তাহার বয়স। ত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে বুড়ি হইয়া গিয়াছে। মুশাইকে ভুলাইবার মত কিছু না থাকিলেও মুশাইকে ভুলাইবার আগ্রহ তাহার কম নয়। বস্তুত উহাই তাহার জীবনের একমাত্র আগ্রহ। তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া, তাহার জন্য পূজা করিয়া, তাহার পছন্দমত রান্না করিয়া, রাত্রে কোমরে তেল মালিশ করিয়া, সকালে চা প্রস্তুত করিয়া, তাহার কাপড়-জামা-পাগড়ি ক্ষার

দিয়া পরিষ্কার করিয়া নানা উপায়ে সে মুশাইকে আগলাইয়া রাখিয়াছে। মুশাই যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার গতি কি হইবে। কাহাকে লইয়া থাকিবে সে! নিজের পেটের ছেলে জোয়ান বউ লইয়া শহরে চলিয়া গেল, তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল না পর্যন্ত। কলে নোকরি করিতেছে। যমুনিয়া অমন নোকারির মুখে প্রত্যহ হাজারবার ঝাড়ু মারে। নোকরি নয়, আসল কথা 'জরু'। জোয়ান জরু লইয়া মজা করিয়া আলাদা থাকিতে চায়। তাহার কথা একবার ভাবিল না পর্যন্ত, জরু লইয়া উন্মত্ত হইয়া চলিয়া গেল। কমবয়সী ছুঁড়ি দেখিলে পুরুষগুলার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায় যেন। 'পুতহু'র যৌবনের কথা ভাবিতে গিয়া সহসা তাহার নিজের যৌবনের কথা মনে পড়িল। তাহাকেও কি কম নাকাল হইতে হইয়াছিল। জমিদারের গোমস্তা কুঞ্জবাবু, পিরু গাড়োয়ান, জমিরুদ্দিন সিপাহি, কত লোকই যে তাহার পিছনে লাগিয়াছিল! থানায় নাককাটা চৌকিদারটা তো তাহাকে ধরিয়া একদিন জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। বিগত যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় নানা কাহিনী মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। কয়দিনই বা ছিল সে যৌবন। চকিতে আসিল এবং চলিয়া গেল। মুশাইয়ের সহিত কবে কোন্ বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ভাল করিয়া মনেও পড়ে না। মনে পড়ে, যখন সে যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিল, সেই দিনগুলি। মুশাই তখন তাহাকে লইয়া বিভোর হইয়া থাকিত, পাগল হইয়া গিয়াছিল যেন। কাহারও দিকে তাকাইলে ক্ষেপিয়া যাইত, কোনো বেচালের খবর কানে গেলে মারিয়া ধুনিয়া দিত। গুণ্ডাটা চিরকালই একরকম, কথায় কথায় কেবল মারপিট। কিছুদিন পরে বিষুনের জন্ম হইল. দেখিতে দেখিতে তাহার যৌবন চলিয়া গেল। শুধু যৌবন কেন, কত দিনই কাটিল তাহার পর। মুশাই তাড়ি ধরিল, মদ ধরিল, কত ছুঁড়ির পিছনে ঘুরিল, এক সাহেবের কাছে কিছুদিন নোকরি করিল, তাহা ছাড়িয়া আবার কিছুদিন মজুরি খাটিল। এক দারোগাবাবুর বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া দুই মাস জেল পর্যন্ত খাটিয়া আসিল। এখন শঙ্করবাবুর কাছে বহাল হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শঙ্করবাবুর কাছেই ও জব্দ থাকে। তবু মুসহরনীটাকে লইয়া সেদিন পর্যন্ত কী কাণ্ড। পাপটা বিদায় হইয়াছে, বাঁচা গিয়াছে। মুশাই তাহার, আর কাহারও নয়। আর কাহাকেও কাছে ঘেঁষিতে দিবে না সে। মুশাইয়ের জন্যই যমুনিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। শীতকাল। ঘর একটু গরম না করিলে মুশাই ঘুমাইতে পারে না। এইগুলি দিয়া ঘরে 'বোরশি', উঠানে 'ঘুর' জ্বালাইতে হইবে। ঘুরের পাশে বসিয়া মুশাই গল্প করিতে ভালবাসে। বার বার বিড়ি খাওয়াও আছে, কত 'শালা'ই কিনিবে সে!

নির্জন মাঠে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জীর্ণবসনা শীর্ণকান্তি যমুনিয়া শুকনা ডালপালা কুড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

একুশ

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

সমস্ত গ্রাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ। চতুর্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার অবিশ্রান্ত ঝিল্লিধ্বনি। হুঁম্হুঁ। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের অন্ধকার ভেদ করিয়া শব্দ হইল, দূরের আর একটা বৃক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর আসিল, হুঁ মৃহু, হুঁমৃহু, হুঁমৃহ। নির্জন নিশীথে নিশাচর পক্ষিমিথুন গম্ভীর কণ্ঠে আলাপ করিতেছে। শীতের বাতাস প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের শাখাপ্রশাখা দুলাইয়া, বাঁশবনে শিহরন জাগাইয়া, মাঠের শুষ্ক পাতা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। ঝিল্লি ধ্বনির সহিত হিল্লোলিত বৃক্ষপল্লবের মর্মরধ্বনি মিশিয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া

অপরূপ ছন্দে রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে। সহসা পাশের ঝোপে একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ তীব্র একটি মাত্র ডাক। তাহার পর সব চুপচাপ। অন্ধকারের নিবিড়তা ঘনতর হইয়া উঠিল। সমস্ত শব্দ যেন মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকার বিদীর্ণ হইল, কে যেন শিস দিতেছে। ঝোপটি নড়িয়া উঠিল, ঝোপের ভিতর হইয়া গুঁড়ি মারিয়া বাহির হইয়া আসিল— শৃগাল নয়, মানুষ। কারু। যে দিকে শিস বাজিয়াছিল, সেই দিকে সে দ্রুতপদে আগাইয়া গেল। শ্যাওড়াগাছের অন্ধকারে কম্বল গায়ে দিয়া ফরিদ দাঁড়াইয়া আছে। দুজনে নিঃশব্দ গতিতে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। চুবি করিতে চলিয়াছে।

মানুষের সাড়া পাইয়া নিশাচর পক্ষী দম্পতি উড়িয়া গেল।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি আবার নিবিড় হইয়া উঠিল।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—

মহিষের গলার ঘণ্টা বাজিতেছে। মাঠের পথ ধরিয়া গুলাব সিংহের শতাধিক মহিষ ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। চলিয়াছে লক্ষ্মীবাগের উদ্দেশে। মণি বাঁড়ুজ্জের জমিতে এবার নাকি চমৎকার ফসল হইয়াছে, আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ক্ষেত্র চরাইয়া দিতে হইবে, ইহাই গুলাব সিংহের হুকুম। চারিজন বলিষ্ঠ পশ্চিমা গোয়ালা প্রকাণ্ড লাঠি কাঁধে করিয়া মহিষ বাহিনীর পিছনে পিছনে চলিয়াছে।

হুঁম্‌হু, হুঁম্‌হু—

দূর আম্রকাননে নিশাচর পক্ষী দম্পতি পুনর্বায় আলাপ শুরু করিল।

বাইশ

নিকল্, নিকল্, নিকল্, হম্‌রা ঘরসে---

ফুলশরিয়ার চোখে আগুন, ঠোঁট কাঁপিতেছে। পদাহত কুকুরের মত হরিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলশরিয়া তাহার কাপড়ের পুঁটলি এবং বিছানাটাও বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর লণ্ঠনের আলোটা আর একটু উসকাইয়া দিয়া বঁটিটা টানিয়া পেঁয়াজ কুটিতে বসিল। একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে যেন। ঘা কবে সারিয়া গিয়াছে, অথচ নড়িবার নাম নাই। এক পয়সা রোজগার করিবে না, জোয়ান মরদ বসিয়া বসিয়া আমার অন্ন ধ্বংস করিবে রোজ রোজ। আমি কত জোগাই! ঘায়ের চিকিৎসা করিতে গিয়া তো যা কিছু সঞ্চিত ছিল সব গিয়াছে, কিছু 'জেবর' পর্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছে! ও কী সে টাকা শোধ দিবে? 'মুরদ' আবার 'আশনাই' করিতে চায়, একবার 'আশনাই' করিতে গিয়া তো মরিতে বসিয়াছিল, লজ্জাও করে না 'বেহুদ্দাটা'র! আমার কাছে আর কোনো 'মরদ' আসিতে দিবে না, কাল তো রাজীববাবুর ব্যাটাকে অপমানই করিয়া বসিল। ইস্ 'সাধি' করা 'জরু' বানাইয়া তুলিতে চায় আমাকে! সাধি করা 'জরু' তো ঘরে আছে একজন, সেইখানেই যা না, এখানে মরিতে পড়িয়া আছিস কেন? এক কড়ার সামর্থ্য নাই, 'আশনাই' জমাইতে চায়! এই জাতীয় স্বগতোক্তি করিতে করিতে ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে লাগিল। পেঁয়াজের তরকারিটা বানাইয়া এক বোতল 'শরাব' আনিতে হইবে। আজও গদাইবাবুর আসিবার কথা আছে। রাজীবলোচনের পুত্র গদাইবাবুর মুখটা মনে পড়িতে তাহার হাসি পাইল। কী বেহায়া, আত্মসম্মানহীন এ লোকটা। কাল হরিয়ার নিকট অপমানিত হইয়াও আজ আবার আসিবে, খবর পাঠাইয়াছে। আজ আসিবার অন্য একটা কারণ আছে অবশ্য। ফরিদ কারু নিশ্চয় খবর দিয়াছে যে গহনাগুলি

ফুলশরিয়ার জিম্মায় তাহারা রাখিয়া গিয়াছে। সেইগুলি হস্তগত করিবার জন্যই গদাইবাবু আজ বিশেষ করিয়া আসিতেছেন। উৎপলবাবুর ঘরে সিঁধ দিয়া উহারা আর কী কী পাইল, কে জানে। মাইজির দামি শাড়িগুলা নিশ্চয়ই নেকি মাড়োয়ারির ঘরে গিয়াছে। জেবরগুলা রাজীববাবুর ঘরে গিয়া ঢুকিবে। চোরাই গহনা আত্মসাৎ করিবার জন্য রাজীববাবু একজন স্যাকরাকেই নিজের বৈঠকখানার বাহিরের ঘরটাতে আশ্রয় দিয়াছেন, লোককে অবশ্য বলেন ভাড়া দিয়াছেন। চোরাই গহনা গালানোই ওই স্যাকরাটার একমাত্র কাজ। ভাড়া না আর কিছু! ফুলশরিয়ার অজানা কিছুই নাই। 'চোট্টা' সব। শুধু 'চোট্টা' নয়, ভীতুও। চোরের হাত হইতে সোজাসুজি গহনা লইবারও হিম্মত নাই হুজুরদের, পাছে ধরা পড়েন। ফুলশরিয়া গহনাগুলি কয়েকদিন লুকাইয়া রাখিবে, তাহার পর চুপিচুপি গদাইবাবু আসিয়া একদিন লইয়া যাইবেন। বিশেষ করিয়া এই জন্যই আরও হরিয়াকে তাড়াইয়া দিতে হইল। সেদিন শেষরাত্রে গহনার পুঁটুলি লইয়া কারু আসিয়া যখন ডাক দিল, তখন কী মুশকিলেই না সে পড়িয়াছিল। পুঁটুলিটা সারারাত বাড়ির পিছনে ছাইগাদায় লুকাইয়া রাখিতে হইল। হরিয়াকে এসব কথা বলা যায় না। বিশ্বাস করিবার মত লোক সে নয়। কারুকেও ফিরাইয়া দিতে পারে না। নিজের স্বার্থের জনাই পারে না। এসব ব্যাপারে তাহার বেশ মোটা রকম পাওনা আছে। দুই দফা পাওনা— একবার কারুরা দিবে, আর একবার গদাইবাবু। নানা রকম 'দুখ ধান্দা' করিয়া তাহাকে রোজগার করিতে হইবে তো! না করিলে তাহার চলিবে কেমন করিয়া! সহসা ফরিদ এবং কারুর জন্য তাহার দুঃখ হইল। চুরির সমস্ত ঝুঁকিটা তাহাদের! ধরা পড়িলে তাহাদের জেল হইবে। অথচ কয়টা টাকাই বা বেচারারা পাইবে! রাজীবলোচন এবং নেকিরাম দয়া করিয়া যাহা দিবে, তাহাই। কারুর ভীতচকিত মুখখানা তাহার মনে পড়িল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, কারু এবং ফরিদের নিকট হইতে সে এবার আর কমিশন লইবে না।

চানাচুর গরম পেয়ারে ম্যয় লায়া হুঁজি চানাচুর গরম— চানাচুরওয়ালা রামু আসিতেছে। রোজই প্রায় আসে। ফুলশরিয়া ঘাড়টা একটু উঁচু করিয়া দেখিল, তাকে বিড়ির বাণ্ডিলটা আছে কি না। এদিকে আসিলে রামুর ফুলশরিয়ার আঙিনায় একবার ঢোকা চাই। পুরাতন আলাপ। ফুলশরিয়ার প্রথম প্রণয় রামুর সহিত। প্রণয়ের নেশা অবশ্য রামুর বহুদিন পূর্বে ছুটিয়া গিয়াছে। এখন তাহার ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে এবং মারমুখী খাণ্ডার বউ। তবু রামু এখনও আসে। আসে, একটু বসে, বিড়ি খায়, দু-একটা অশ্লীল রসিকতা করে, তাহার পর চলিয়া যায়। মাঝে মাঝে দুই-এক দোনা চানাচুর উপহার দেয়, দাম দিতে গেলে লয় না। বলে—ই তোরা সুদ ছে। বলে আর অপ্রতিভ হাসি হাসে একটা।

চানাচুরের ব্যবসা করিবার জন্য ফুলশরিয়াই তাহাকে কুড়িটা টাকা দিয়াছিল কিছুকাল পূর্বে। সে ভাল করিয়াই জানে যে, রামু ও-টাকা কখনও শোধ দিবে না। রামু কিন্তু রোজই বলে যে পরের মাসেই সে সব শোধ করিয়া দিবে। বহু পরের মাস আসিল এবং চলিয়া গেল. টাকা আজও শোধ হয় না। ফুলশরিয়া মনে মনে হাসে। যদিও সে জানে যে ও-টাকা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, তবু সে মুখ ফুটিয়া কখনও বলে না যে টাকাটা তোমায় দান করিলাম। রামু বড় আত্মসম্মানী লোক, তাহার দান সে লইবে না। তা ছাড়া সে মুখ ফুটিয়া বলিতেই বা যাইবে কেন, লোকটাকে হাতে রাখাই তো ভাল। ফুলশরিয়া পেঁয়াজ কুটিতে কুটিতে রামুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রামু চলিয়া গেলে গদাইবাবু আসিবেন, তাহার পর জমাদার সাহেব। হঠাৎ ফুলশরিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। জমাদার সাহেবের কি ভীষণ গালপাট্টা, বাহিরে কী তর্জন-গর্জন, হঠাৎ মনে হয়, দুর্ধর্ষ সিংহ একটা যেন অথচ—। ফুলশরিয়া আবার হাসিল।

তেইশ

নিপুদা ডায়েরি লিখিতেছিল—

"যাহাদের গৃহের কোনো বন্ধন নাই, যাহারা ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি স্বীকার করে না, সতীত্বের যূপকাষ্ঠে স্ত্রীপুরুষের প্রজননপ্রবৃত্তিকে যাহারা বলিদান দিবার পক্ষপাতী নয়, কর্ম ছাড়া যাহাদের অন্য কোনো ধর্ম নাই, এমন কি ভগবানকে পর্যন্ত যাহারা মানে না, আমি সেই দলের। আমি নির্ভীক। কোনো কিছুর খাতির আমি সত্যপথভ্রষ্ট হইব না। শঙ্কর, আমাকে চাকরি করিয়া দিয়াছে, এই অজুহাতে শঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য অথবা উৎপলকে তুষ্ট করিবার জন্য আমি আমার জীবনের নীতি বিসর্জন দিব না, দিতে পারিব না। আমি বিদ্রোহী। বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোই আমার কাজ। প্রতি শ্রমিকের, প্রতি কৃষকের প্রাণে প্রাণে যে ভাব জাগাইতে হইবে, তাহা যদি শঙ্কর-উৎপলের স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। কৃতজ্ঞতা? কিসের কৃতজ্ঞতা! আমার কাজের পরিবর্তে উহারা আমাকে বেতন দেয়। অমনই দেয় না। যাহা দেয় তাহাও যথেষ্ট নয়। আমার মতো একজন কর্মী রুশ দেশে ইহার অপেক্ষা ঢের বেশি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। আমিই বা থাকিব না কেন? অতিশয় স্থূল দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি পর্যন্ত আমার নাই। প্রায়ই ধার করিতে হয়। ভজহরি হয়ত আজই তাগাদা করিতে আসিবে। কেন আমি ধার করিব? শঙ্কর-উৎপল 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট' সিগারেট খাইবে, আমিই বা কেন বিড়ি ফুঁকিয়া মরিব? শঙ্কর-উৎপল শাল-দোশালা উড়াইবে, আমিই বা দারুণ শীতে একটা শস্তা র‍্যাপার জড়াইয়া কাঁপিয়া মরিব কেন? আমি কি মানুষ নই? আমি কি উহাদের অপেক্ষা কম বিদ্বান? কম বুদ্ধিমান? আমার ক্ষুধা কি উহাদের ক্ষুধা অপেক্ষা কম প্রবল? সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিলাসিতার অনুকূল না হয়, সকলে মিলিয়া সমানভাবে দুঃখ ভোগ করিব, সকলে মিলিয়া ব্ল্যাক-ব্রেড আহার করিতে আপত্তি নাই। কিন্তু একজন পোলাও খাইবে, আর একজন পান্তা-ভাত— এ অবিচার সহ্য করা শক্ত। এ অসাম্য দূর করিতেই হইবে। আমারই যখন এই অবস্থা, তখন দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের অবস্থা যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। দারিদ্র্যের চাপে তাহাদের সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছে, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতেও পারে না। প্রতি শ্রমিককে, প্রতি কৃষককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, যাহারা তোমাদের পেশীর শক্তি অন্যায়ভাবে অপহরণ করিয়া ক্রমাগত নিজেদের শক্তি বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহাদের লোভের অন্ত নাই, তোমাদের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া জোঁকের মত স্ফীতকায় হইতে যাহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তাহাদের ওই গগনস্পর্শী প্রাসাদটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিস্যাৎ কর। ওই পুঁজিতন্ত্রী ধনীরাই তোমাদের শত্রু। তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য জোর করিয়া কাড়িয়া লও।..."

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। ভজহরি আসিল বোধ হয়। ঘাড় ফিরাইয়া নিপু দেখিল, ভজহরি নয়, দুলকি। একটু বিব্রত বোধ করিল। মেয়েটাকে আজই টাকা দিবার কথা। দুলকি কিছু না বলিয়া দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই স্তব্ধতা অস্বস্তিকর। নিপু যতটুকু দেখিয়াছে, তাহাতে অদ্যাবধি কোনো উচ্ছলতা সে দুলকির মধ্যে লক্ষ্য করে নাই। নির্ঝরের চাপল্য কিংবা অগ্নির প্রদাহ, মান অভিমান, সোহাগ আবদার— অর্থাৎ ইহার অন্তরের কোনো পরিচয় আজ পর্যন্ত নিপু পায় নাই। দুলকি শুধুই যেন দেহ, কেবল মাংস খানিকটা, আর কিছু নয়। কিন্তু অপরূপ সে দেহের গঠন। ক্ষীণকটি কুচভর নমিতাঙ্গী নিবিড়নিতম্বিনী দুলকি যেন জীবন্ত অজন্তা-চিত্র। কোনো শিল্পীর কল্পনা যেন মূর্ত হইয়াছে। কিন্তু এ মূর্তির মধ্যে প্রাণ নাই, থাকিলেও নিপু তাহার কোনো স্পর্শ পায় নাই। নিপুর কাছে দুলকি পাথরের মতই স্থির কঠিন নীরব। নিপু

বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিল। দুলকি লাল-ফুটকি-দেওয়া হলুদ রঙের একটা শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। অবগুণ্ঠন নাই। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা নাই, লজ্জা নাই, আগ্রহ নাই, প্রেম নাই, এমন কি দীপ্তিও নাই। স্থির অপলক দৃষ্টি যেন অনুচ্ছ্বসিত নীরব ভাষায় বলিতেছে, আমার পাওনাটা দিয়ে দাও, আমি চলিয়া যাই।

দুলকি জাতে মুসহর। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে মধু বিক্রয় করিতে আসে। মাথায় মধুর হাঁড়ি লইয়া 'মধু-উ-উ-উ মধু লিবে গো' বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়ায়। সঙ্গে একজন পুরুষও থাকে। ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা ভীষনদর্শণ লোকটা, তাহারও শরীর যেন পাথরে কোঁদা, কোমরে সর্বদা একটা ছোরা গোঁজা, চক্ষুর দৃষ্টি সামান্য উত্তেজনাতেই হিংস্র হইয়া উঠে। স্বামী বলিতে সভ্য-সমাজে যে সম্পর্ক বুঝায়, এ ব্যক্তির সহিত দুলকির ঠিক সে সম্পর্ক আছে কি না, তাহা জানা কঠিন; কিন্তু সে যে দুলকির মালিক, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। দুলকি তাহার পদানত। এই আত্মসমর্পণের মূলে কী আছে, ছোরা, না প্রেম, না, সামাজিক বন্ধন তাহাও কেহ জানে না। এইটুকু শুধু সকলে জানে যে, সে দুলকির মালিক। দুলকির এই সব নৈশ-অভিযান সে-ই নিয়ন্ত্রিত করে, উপার্জনের সমস্ত টাকা সে-ই লয়। কিছুকাল আগে মুশাই এই দুলকির কবলে পড়িয়াছিল। অর্থাভাবেই হোক বা যমুনিয়ার ছট পরবের জোরেই হোক, এখন দুলকিকে ছাড়িয়েছে। দুলকি এখন নিপুর। ফুলশরিয়া কর্তৃক প্রত্যাখাত হইয়া নিপু কিছুদিন ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়ও তাহার কম হয় নাই, যখন সে আবিষ্কার করিল যে ওই ঘেয়ো লোকটা তাহার স্বামী নয়। সামান্য পণ্যরমণী হইয়াও ওই লোকটাকে সে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। কেন? যে বস্তুতান্ত্রিক মানদণ্ড দিয়া সে জীবনের সমস্ত রহস্য নিরূপণ করিতে অভ্যস্ত, তাহা দিয়া সে ফুলশরিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারিল না। কাব্যের মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া অবশেষে সে মনকে স্তোক দিল, প্রেমের বিচিত্র নিয়ম বোধ হয়। ইহা লইয়া বেশিদিন সে মাথাও ঘামাইল না, দুলকিকে পাইয়া ফুলশরিয়াকে ভুলিয়া গেল। সে বায়োলজিকালি বাঁচিতে চায়,—দুলকি ফুলশরিয়া যে কেহ একটা জুটিলেই হইল। এখন কিন্তু দুলকিকে দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিল। হাতে মাত্র পাঁচটি টাকা আছে। পাঁচ টাকাই উহাকে দিয়া দিলে হাত যে একেবারে খালি হইয়া যাইবে। কিন্তু দুলকির অপলক নীরব দৃষ্টিকে উপেক্ষা করা শক্ত। একটু ইতস্তত করিয়া নিপু অবশেষে পাঁচ টাকার নোটটা বাহির করিল এবং সেটা টেবিলে রাখিয়া একমুখ হাসিয়া বলল, বৈঠো।

দুলকি বসিল না।

পাঁচ টাকার নোটটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, পাঁচ টাকায় হোবে না বাবু, পঁচাশ টাকা লাগবে।

মুসহরদের নিজেদের ভাষা একরূপ অদ্ভুত হিন্দি। কিন্তু বাঙালি বাবুদের সহিত ইহারা বাঁকা বাংলায় কথা বলে।

নিপু আকাশ হইতে পড়িল। বলে কী! পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে।

কাহে?

দুলকি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণপরেই যাহা ঘটিল, তাহা অপ্রত্যাশিত। নিপু চমকাইয়া উঠিল। হঠাৎ পিছনের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল দুলকির মালিক এবং খাঁউখাঁউ করিয়া নিজস্ব ভাষায় যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম এই: আপনিই তো হুজুর, সেদিন হাটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, মজুরদের বেতন দশগুণ হওয়া উচিত। বাবু-ভেইয়ারা তাহাদের ঠকাইয়া তাহাদের ন্যায্য মজুরি চুরি করিয়া নিজেরা বাবুয়ানি করে। কথাটা আমার বড় ভাল

লাগিয়াছিল। আশা করিয়াছিলাম যে, আপনি অন্তত মজুরদের প্রতি সুবিচার করিবেন। আপনিও আর সকলের মত কম মজুরি দিতে চাহিতেছেন, এ তো বড় তাজ্জব কি বাত।

শাণিত দন্ত বিকশিত করিয়া লোকটা হাসিল। নিপু যে কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। লোকটার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতেও পারিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। এই মূর্খটাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে যে, সকলে যদি সমাজতন্ত্রী না হয়, সে একা কি করিয়া হইবে, অর্থনৈতিক আইন অনুসারে তাহা যে কিছুতেই হওয়া যায় না। তাহার মনে হইল, অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি সহজ ভাষায় ইহাদের মধ্যে প্রচার করা উচিত, তাহা না হইলে বক্তৃতার সহিত আচরণের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমি নিজেও যে কত অসহায়, তাহা ইহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে—

চল্।

নিপু চকিতে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, লোকটা দুলকির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, চোখ দুইটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। কয়টা টাকার জন্য মেয়েটা নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে নাকি।

আরে ঠহরো, ঠহরো, যাও মত।

উভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যদিও এতদিন ধরিয়া সে সাম্যবাদের মন্ত্র জপ করিয়াছে, কার্যকালে কিন্তু তাহার সুপ্ত বুর্জোয়া মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। টাকা দিয়া এই ছোটলোকগুলোকে কিনিয়া রাখিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে অপমান করিয়া চলিয়া যাইবে আস্পর্ধা তো কম নয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে জুয়াড়ির যে রকম অযৌক্তিক রোখ চাপিয়া যায়, বৈজ্ঞানিক নিপুরও ঠিক তাহাই হইল। সে অশুদ্ধ হিন্দিতে বলিয়া বসিল যে, সে পঞ্চাশ টাকাই দিবে, আজ হাতে অত টাকা নাই, দুলকি কাল আসিয়া যেন টাকা লইয়া যায়।

বহুত খুব।

দুইজনেই অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

নিপু খোলা দ্বারটার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। আরও অবাক হইয়া যাইত, যদি দেখিতে পাইত, অন্ধকারে কেমন দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত গলা ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। দেহের শুচিতা ইহাদের কাছে তত বড় নয়, মনের শুচিতা যতটা। প্রাণ ধারণ করিবার জন্য যেমন মধু বিক্রয় করিতে হয়, তেমনই দরকার পড়িলে দেহ বিক্রয়ও করিতে হয়। নারী-মাংসলোলুপ কুত্তার অভাব নাই পৃথিবীতে। তাহাদের লোভের খোরাক যোগাইয়া অর্থ উপার্জন করিতে হয় বইকি মাঝে মাঝে। অর্থটা যে অতিশয় প্রয়োজনীয় জিনিস, না থাকিলে চলে না এবং মধু বিক্রয় করিয়া সব সময়ে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহও করা যায় না। উপরি রোজগার করিতে দোষ কি ? ইহাদের নীতি কমিউনিস্টিক নয়, একেবারে মহাভারতীয়। মন যদি একনিষ্ঠ থাকে, দেহ লইয়া ইহারা মাথা ঘামায় না। সমুদ্রাভিমুখিনী স্রোতস্বতীর বুকে সাময়িক খড়-কুটা জঞ্জালের মত এসব নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার, আসে এবং ভাসিয়া যায়। কেকার ধ্বনির ন্যায় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিল। নিপুর মনে হইল, আকাশে বোধ হয় হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। এ অঞ্চলের খালে-বিলে এ সময় হাঁস আসে। এ কিন্তু হাঁস নয়, দুলকি স্বামীর কী একটা রসিকতায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়াছে। নিপু বুঝিতে পারিল না, কারণ নিপুর কাছে দুলকি কখনও হাসে নাই... উন্মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া নিপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের মধ্যে অতৃপ্ত লালসা, দারিদ্র্যজনিত ক্ষোভ, আদর্শনিষ্ঠা, আদর্শচ্যুতি, আহত আত্ম-অভিমান, ব্যর্থ আক্রোশ—সমস্ত যেন একটা তিক্ত বীভৎস রসের ফেনিল আবর্তে টগবগ

করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, যে সমাজবিধান তাহাকে এমন ক্ষুধিত অসমর্থ অসহায় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিতে, ভীম যেমন করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করিয়াছিল।

দেবতা, বাড়ি আছেন নাকি?

তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া নিপু যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। মুকুন্দ পোদ্দারের কণ্ঠস্বর।

এবার ভজহরিকে না পাঠাইয়া স্বয়ং আসিবার মানে? ভজহরিই তো প্রতি মাসে সুদ লইয়া যায়। দ্বারপ্রান্তে মুকুন্দ পোদ্দার আবির্ভূত হইলেন।

এই যে, দেবতা আছেন দেখছি!

চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পোদ্দার মহাশয় পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া চটিজুতা হইতে ধূলি অপসারণ করিলেন। তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া তৈলপক্ক বেঁটে বাঁশের লাঠিটা কোণে সন্তর্পণে রাখিয়া চৌকিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিপুর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। দন্তলগ্ন স্বর্ণখণ্ডগুলি বাতির আলোকে চকমক করিয়া উঠিল।

আপনি নিজেই এলেন যে আজ?

কেন, দেবতাদর্শনে দোষ কি আছে?

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, ভজহরির শরীরটা খারাপ। বাবু লোক সে, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই কাবু হইয়া পড়ে। ঠাণ্ডার দিনে আমি কিন্তু হাঁটিলেই ভাল থাকি, তাই ভাবলুম বেড়িয়েই আসি একটু।

ক্ষণকাল থামিয়া মুকুন্দ পুনরায় বলিলেন, আঃ, সেদিন হাটের বক্তৃতাটা আপনার চমৎকার হয়েছিল অমন কথা বহুকাল শোনা যায়নি।

তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল, মুখে হাসি।

নিপু হাসিয়া বলিল, আপনার ভাল লেগেছিল? আমার বক্তৃতা শুনে ওরা যদি জাগে তা হলে তো আপনাদেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি।

তা হলেও হক কথা হক কথাই। তা ছাড়া আমরা আর কদিন? আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন দেবতা?— এই।

মুকুন্দ পোদ্দার ললাটের মধ্যস্থলে তর্জনী স্থাপন করিয়া হাসিলেন।

এটি যতক্ষণ আমার সপক্ষে আছে, ততক্ষণ, দেবতা, কোনো বক্তৃতাকেই আমি কেয়ার করি না। এমন কি আপনার প্যামপ্লেট না কি বললেন সেদিন তাও ছাপিয়ে দিতে আমি রাজি আছি।

রাজি আছেন?

আপত্তি কি?

নিপু যেন আকূলে কূল পাইল। কলিকাতায় যে কমিউনিস্ট দলের সহিত সে এখন নামেমাত্র সংশ্লিষ্ট আছে এবং যে দলের হরেন তালুকদার তাহার চাকরি-করা লইয়া খুব একটা ব্যঙ্গাত্মক পত্র লিখিয়াছে, হাজার কয়েক গরম প্যামপ্লেট ছাপাইয়া যদি সেই দলে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার শুধু যে মুখরক্ষা হইবে তাহাই নয়, নীরব কর্মী হিসাবে হয়ত দলের মধ্যে একটা জয়জয়াকারও পড়িয়া যাইতে পারে। ইহা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত জিনিস নয়। এমন কি প্যামপ্লেটের ভাষায় সে যে আগুন ছুটাইবে, তাহা যদি পুলিস বিভাগের রোষ উৎপাদন করিয়া তাহাকে কারাবরণ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে তো কথাই নাই, তাহার প্রতিপত্তির অন্ত থাকিবে না। উত্তেজনাপূর্ণ কোনো একটা কিছু করিতে না পারিলে তৃপ্তি নাই। এই অখ্যাত পল্লীগ্রামে একটা ক্যাপিটালিস্ট জমিদারের অধীনে হাড়ি-ডোমদের মধ্যে বাস করিয়া সহস্র

বিরুদ্ধতার মধ্যে কাজ করা কি সম্ভব? কেহ তাহার একটা কথা বোঝে না। ইহাদের মধ্যে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো উৎসাহ নাই, কেহ একটা কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত প্রকাশ করে না। উত্তেজনার সন্ধানেই সেদিন সে হাটে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিল, উত্তেজনার সন্ধানেই লক্ষ্মীবাগে মণির বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি নাই। সমস্ত দেশকে মাতাইবে— ইহাই তাহার স্বপ্ন। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকিলে তাহার স্বপ্ন সফল হইবে কি? মুকুন্দ পোদ্দারের কথায় তাহার অন্তরের সুপ্ত বহ্নি যেন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুখে কিন্তু বিশেষ আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না, সে বিষয়ে সে খুব চালাক, অত্যন্ত নিরীহভাবেই বলিল, বেশ তো, দিন না। তা হলে তো একটা ভাল কাজ হয়।

ভাল কাজ করতে কোনো কালে পেছপা নই আমি। শঙ্করবাবু ইস্কুল করতে চাইলেন, দিলাম করে। এখন সে ইস্কুলে ছাত্তোর জুটছে না, তা তো আর আমার দোষ নয়!

ছাত্র জুটছেনা নাকি?

জুটবে কি করে? যা এক মাস্টার পাঠিয়েছেন শঙ্করবাবু— লোকটার নাক সর্বদা কুঁচকেই আছে। এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই— নিত্যি একটা না একটা বায়নাক্কা লেগেই আছে। তা ছাড়া বলে কি শুনবেন? বলে, ছোটলোকের ছেলেদের গায়ে বড্ড গন্ধ, কাছে বসা যায় না। ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেন্সওলা রুমাল নাকের কাছে ধরে পড়ান। এরকম হতচ্ছেদা করলে ছাত্তোর ওর কাছে ঘেঁষবে কেন— অ্যাঁ কি বলেন আপনি? ছোটলোক হলেও ওরা মানুষ তো। এখন প্রতিটি ছাত্তোরকে যদি সাবান মাখাতে পারি তা হলে হয়ত ওঁর মনঃপূত হয়, কিন্তু অত পয়সা আমার নেই মশাই, অমন করে লেখাপড়া শিখিয়েও কাজ নেই, আর লেখাপড়া শিখে হবে তো কচু, ইস্কুল করার চেয়ে এ দেশে অন্নছত্র খোলা ভাল। ছোটখাটো একটা খুলেওছি, গুটি দশেক লোককে খেতে দিই, তার বেশি আর পারি না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুকুন্দ পোদ্দার পুনরায় বলিলেন, ইস্কুল-ফিস্কুল চলবে না।

স্কুল সম্বন্ধে নিপুর নিকট হইতে কোনো মন্তব্য না শুনিয়া পোদ্দার মহাশয় ও-বিষয়ে আর আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কি জানি, শঙ্করকে গিয়া যদি লাগায়! উৎপলের দক্ষিণ হস্ত শঙ্করকে চটাইবার সাহস তাঁহার নাই। স্কুল সম্বন্ধে এতক্ষণ তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য খানিকটা সত্য। কিন্তু স্কুল না চলিবার আসল কারণ শিক্ষকের ফিনফিনে পাঞ্জাবি অথবা তাঁহার সুগন্ধপ্রিয়তা নয়। আসল কারণ তিনি নিজেই। ভজহরির মারফত তিনিই পাকে-প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন, ছাত্র যাহাতে না জোটে। ভজহরি গ্রামের চাষীদের গোপনে 'টিপিয়া' দিয়াছে স্কুলে যেন তাহারা ছেলে না পাঠায়। পাঠাইলে পোদ্দারজি চটিয়া যাইবেন। ছাত্র না জুটিবার ইহাই যথেষ্ট কারণ এবং আসল কারণ।

সহাস্য দৃষ্টিতে মুকুন্দ নিপুর দিকে চাহিলেন।

প্যামপ্লেট লিখি তা হলে?

লিখুন। পাঁচজনের যদি উপকার হয়, দেব না হয় ছাপিয়ে। কিন্তু একটি শর্তে।

কী বলুন?

একটি নয়, দুটি শর্ত আছে। প্রথম আমার নাম কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। দ্বিতীয় শর্তটি একটু ইয়ে-গোছের—বুঝিয়ে বলি তা হলে শুনন। আচ্ছা, ছোটলোকদের মধ্যে আন্দোলন চালাতে পারবেন কি? মানে, স্ট্রাইক, ধর্মঘট এই সব।

তা চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়।

বহুৎ আচ্ছা। একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। শুনেছেন বোধ হয়, হৃদয়... উৎপলের

কাছ থেকে জমিদারিটা ফিরে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে, রাজীব দিচ্ছে টাকা। এর মানেটা বুঝেছেন?

নিপু কিছুই শোনে নাই। মনে মনে আশ্চর্য হইল। বাহিরে কিন্তু এমন ভাব করিল, যেন সে সব জানে।

বুঝছেন কিছু?

না?

এর মানে, ওই চশমখোর কঞ্জুস রাজীবই শেষ পর্যন্ত জমিদার হবে। আর তা হলে দুর্গতির অন্ত থাকবে না ভদ্দরলোকদের। উৎপল জমিদারি বিক্রি করুক, হৃদয়বল্লভ তা কিনুক—এ ওয়াজিব ব্যাপার, আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু রাজীবকে মাথা গলাতে দেব না আমি তার মধ্যে। হৃদয়বল্লভ যদি চায়, আমিই টাকা দিতে পারি।

বিহ্বল নিপু বলিল, আমাকে কী করতে হবে?

কিছু নয়, হৃদয়বল্লভকে এই কথাটি শুধু জানিয়ে দিতে হবে যে, রাজীবের টাকা নিয়ে আপনি যদি জমিদারি কেনেন, তা হলে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন না। আমরা ধর্মঘট করব, প্রজারা যাতে খাজনা না দেয় তার চেষ্টা করব, গান্ধীর দলকে ডেকে আনিয়ে ছারখার করে দেব সব। জমিদারি আপনি কিনুন, কিন্তু রাজীবের টাকা দিয়ে নয়। আমি টাকা দিতে রাজি আছি, নিতে হলে আমার টাকাই নিন।

মানে, আপনি নিজেই জমিদার হতে চান?

মুকুন্দ পোদ্দার হাসিলেন। তাঁহার দাঁতের সোনা আবার চকচক করিয়া উঠিল।

আমি জমিদার হলে দেখবেন, কি করি। নিজের মুখে আগে থাকতে বলতে চাই না কিছু, দেখবেন। প্রজার ভাল কি করে করতে হয়, তা দেখিয়ে দেব আমি।

নিপু সহসা অনুভব করিল, এই ধনী মহাজনটিকে খুশি রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহার অনেক সুবিধা হইতে পারে। আজ শঙ্কর যেমন উৎপলের সহায়তায় প্রতাপান্বিত হইয়াছে, সেও একদিন জমিদার মুকুন্দ পোদ্দারের সহায়তায় বহুলোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। নিজের আদর্শ প্রচার করিবার সুবিধাই হইবে তাহাতে। তাহার এতদিনকার মহাজন-বিদ্বেষ সহসা যেন কুয়াশার মত মিলাইয়া গেল। এই পুঁজিবাদী লোকটার স্বার্থরক্ষা করিতে তাহার আর দ্বিধা হইল না। বলিল, আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই কিন্তু মুকুন্দ পোদ্দারের আসল কথাটি মনে পড়িয়া গেল।

আজ কিছু দেবেন নাকি?

হাতে এ মাসে একদম কিচ্ছু নেই। আরও গোটা পঞ্চাশেক টাকার জরুরি দরকার। কী যে করব ভাবছি। দেবেন আপনি?

দিতে পারি অবশ্য, যদি—

একটু ইতস্তত করিয়া মুকুন্দ বলিলেন, আচ্ছা থাক, আপনার সঙ্গে আর ব্যবসাদারি নাই করলাম, বন্ধকি দিতে হবে না আপনাকে, এমনই দেব। কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবেন। আপনার সোনার হাত ঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে বন্ধকি কারবার আর নাই করলাম— অ্যাঁ, কি বলেন?

নিপু শুধু একটু মুচকি হাসিল।

রাত হল এবার ওঠা যাক।

ঘরের কোণ হইতে লাঠিটা লইয়া মুকুন্দ চৌকাঠের উপর সেটি অভ্যাসমত বার দুই ঠুকিলেন। শীতকালের একটি সুখ কী জানেন, সাপ-খোপের ভয় থাকে না। ওই জিনিসটিকে বড় ডরাই দেবতা।

নিপু আবার মুচকি হাসিল।

মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলেন। মুকুন্দ পোদ্দার চলিয়া গেলে নিপু আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। মনে হইল, সে যেন নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এতদিন যে বিত্ত সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ যেন তাহা ডাকাতে লুণ্ঠিত করিয়া লইয়া গেল। না, না, না, সে মুকুন্দ, রাজীব, শঙ্কর, উৎপল— কাহাকেও সাহায্য করিবে না, শত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একক সে সগর্বে বিদ্রোহ-পতাকা তুলিয়া যুদ্ধ করিবে, ক্যাপিট্যালিজ্‌মের সহিত কোনো শর্তেই রফা করা চলিবে না। মুকুন্দ পোদ্দারকে এখনই সে কথাটা বলিয়া দেওয়া ভাল। সে উঠিয়া বাহিরে গেল।

পোদ্দার মশাই!

কোনো উত্তর আসিল না। পোদ্দার মশাই অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলেন। একটা পেচক কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

চব্বিশ

গ্রামের ছোট স্টেশনটিতে শঙ্কর ট্রেন হইতে যখন নামিল, তখন তাহার মনে হইল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে যেন তাহার পরিচিত বিছানায় আবার জাগিয়া উঠিল। এতদিন একটা কদর্য ঘূর্ণাবর্তে সে যেন হাবুডুবু খাইতেছিল। দেঁতো হাসি, ছেঁদো কথা, অনান্তরিক আলাপ, সবজান্তা উন্নাসিকতা, স্বার্থসর্বস্ব মনোভাব, যুদ্ধের হিড়িক, তা ছাড়া দোকান— দোকান— দোকান— এই অল্প কয়েক দিনে কলিকাতার আবহাওয়া তাহার মনে যে গ্লানি জমাইয়া তুলিয়াছিল, কুৎসিত দর্শন স্টেশনমাস্টারের আকর্ণবিস্তৃত আন্তরিক হাসির স্পর্শে তাহার অনেকখানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আমার জিনিস এনেছেন?— হাসিয়া মাস্টারমহাশয় আগাইয়া আসিলেন।

এনেছি।

ঝুড়ির ভিতর হইতে রবিনসনের বার্লির কৌটাটি শঙ্কর বাহির করিয়া দিল।

বিস্তর জিনিস এনেছেন দেখছি। আরে, বা বা বা— চমৎকার, কুমোরটুলির নিশ্চয়?

হ্যাঁ। সমস্ত রাস্তা আগলে আগলে আসছি। পাছে কেউ ধাক্কা মেরে দেয়।

সরস্বতী প্রতিমাটিকে শঙ্কর সস্নেহে একধারে সরাইয়া রাখিল। ছোট প্রতিমাটি, কিন্তু নিখুঁত একেবারে।

আপনার আনা চারেক ফিরেছে। এই দিন।

ঘাড় ফিরাইয়া শঙ্কর দেখিল, মাস্টারমহাশয় নিজ প্রকোষ্ঠে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ক্ষণপরেই তিনি থার্মোফ্লাস্ক হইতে কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

একটু ইস্টিম করে নিন, যা শীত।

কোথা পেলেন এই ভোরে?

আমার জন্যে এসেছিল বাড়ি থেকে। আমি আবার আনিয়ে নিচ্ছি।

না না, সেটা ঠিক হয় না।

খুব ঠিক হয়। আমি আনিয়ে নিচ্ছি এখুনি। আপনি যা জিনিস এনেছেন, গিন্নি দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে এখন আপনাকে।

বাড়িতে কারও অসুখ নাকি?

তিন-তিনটে মেয়ে পেটের অসুখে ভুগছে মশাই। গ্যাঁদালপাতার ঝোল আর খেতে পারে না বেচারিরা। নটবর বার্লি খাওয়াতে বলেছে, কিন্তু এ অঞ্চলে ওবস্তু পাবার জো নেই। ভাগ্যে আপনি কলকাতা গেলেন! ও ইয়েস, আপনার সব জিনিস নেমেছে তো, ও ইয়েস, অল রাইট, অল রাইট।

মাস্টারমহাশয়ের সমর্থন পাইয়া গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া সবুজ পতাকা আন্দোলিত করিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

চা খুব খারাপ, তবু শঙ্করের অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। চা পান করিয়া শঙ্কর পেয়ালাটি নামাইয়া রাখিল। ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার মনে হইয়াছে—এখন আবার মনে হইল, এই কেরানিরাই প্রকৃত ভদ্রলোক। ইহারা হয়ত 'এডুকেটেড' নয়, কিন্তু ইহারাই ভদ্রলোক। ছাপোষা বেচারিরা তথাকথিত কালচারের ধার ধারে না, কিন্তু স্বল্পআয় সত্ত্বেও ইহারাই সামাজিক সমস্ত দায়িত্ব বহন করে। থলি হাতে বাজারে যায়, ঋণগ্রস্ত হইয়া ছেলে পড়ায়, মেয়ের বিবাহ দেয়, অসমর্থ আত্মীয়কে প্রতিপালন করে, লোক-লৌকিকতা বজায় রাখে, চাঁদা করিয়া দুর্গাপূজা কালীপূজা করে, রাত জাগিয়া যাত্রা-থিয়েটার শোনে। অথচ কোনো অহমিকা নাই, সর্বদাই যেন সঙ্কুচিত হইয়া আছে। স্বাতন্ত্র্যবাদী ড্রইংরুম-বিহারী আলোকপ্রাপ্ত সমাজে যে আন্তরিকতার অভাব, ইহাদের মধ্যে বাঙালি জাতির সেই সহৃদয় আন্তরিকতা এখনও জীবন্ত হইয়া আছে, ওষ্ঠ-চটক অন্তঃসারশূন্য আপ্যায়নমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

আপনার চার আনা ফিরেছে, এই নিন।

সস্তায় পেয়েছেন তা হলে। ওরে বজরঙ্গি, পেয়ালাটা তুলে রাখ্ বাবা, পা লেগে ভেঙে গেলেই গেল। আচ্ছা, অমি এবার চলি, ঘানি কামাই দেওয়ার জো নেই তো।

হাসিয়া মাস্টারমহাশয় নিজ অফিসে প্রবেশ করিলেন।

মুশাই গরুর গাড়ি আনিয়াছিল। কুলির সাহায্যে সে জিনিসপত্র গরুর গাড়িতে তুলিতে লাগিল। কাপড়চোপড়, বই-খাতা, এক ঝুড়ি কমলালেবু, এক ঝুড়ি নারকুলে কুল, বাসনপত্র, গোটা দুই কোদাল, বাংলাদেশের কুলো, ধুচুনি, এক বাক্স গ্রামাফোন রেকর্ড, তা ছাড়া সুটকেস, বিছানা— গাড়িতে বসিবার স্থান আর রহিল না। শঙ্কর ঠিক করিল, হাঁটিয়াই যাইবে। সরস্বতী প্রতিমাটা লইয়া যাওয়াই সমস্যা। স্কুলের ছেলেদের ফরমাস, অনেক কষ্টে বাঁচাইয়া এতদূর আনিয়াছে। ছোট প্রতিমা, একটা কুলি মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না? পারা তো উচিত। মুশাইকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, চেটিয়া সেনি আইলোছে, ওহি লোগ লে যাইতে—

ওরা এসেছে? কই, কোথায়?

মুশাইয়ের অঙ্গুলিনির্দেশে শঙ্কর দেখিল, স্টেশন হইতে একটু দূরে যে প্রকাণ্ড বটগাছ, তাহার নিচে একদল ছাত্র সত্যই বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে এখনও দেখিতে পায় নাই বোধ হয়। এই ভোরে এতটা পথ তাহারা হাঁটিয়া আসিয়াছে। তাহার নিজের ছাত্রজীবন মনে পড়িল। সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রজীবনে কী উৎসাহই না হইত! সরস্বতী পূজার আগেরদিন রাত্রে চোখে ঘুমই আসিত না; দুবেজিকে মনে পড়িল। তিনি স্বহস্তে প্রতিমা নির্মাণ করিতেন। খড় দেওয়া হইতে শুরু করিয়া রঙ দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ দুবেজির বাড়িতে ধর্না দিয়া বসিয়া থাকিত সে।

দুবেজির চেহারাটা স্পষ্ট মনের উপর ভাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ হইয়া একটু কুঁজো হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে একটি দাঁত ছিল না, কপালের মাঝখানে একটি চন্দনের ফোঁটা পরিতেন। বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাণ দিয়া ঠাকুরটি গড়িতেন, প্রাণ দিয়া পূজাও করিতেন। ছাত্রজীবনের সেই অতীত দিনগুলি শঙ্করের মনে সজীব হইয়া উঠিল। দেবদারুপাতা আর রঙিন কাগজের শিকল দিয়া স্কুল সাজানো, নিষ্ঠাভরে কুল না খাওয়া, পূজার দিন ভোরে উঠিয়া যবের শীষ সংগ্রহের জন্য মাঠে যাওয়া, অঞ্জলি না দেওয়া পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকা...। ছাত্রদল আসিয়া শঙ্করকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের চোখে মুখে কী প্রদীপ্ত উৎসাহ! তাহারা আশাই করিতে পারে নাই যে, শঙ্করবাবু সত্য সত্য তাহাদের জন্য প্রতিমা লইয়া আসিবেন। যদির ওপর নির্ভর করিয়াই তাহারা এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। কুলির দরকার কী ? প্রতিমা তাহারাই বহিয়া লইয়া যাইবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন বালক সোৎসাহে আগাইয়া আসিল। মুশাই গরুর গাড়ি লইয়া আগাইয়া চলিয়া গেল। ছাত্রদের সহিত শঙ্কর পথ হাঁটিতে লাগিল।

প্রভাত হইতেছে। দুই পাশে চাষের জমি। সরষা কাটা হইতেছে। গম এবং যবের শিষ ধরিয়াছে। চতুর্দিকেই স্নিগ্ধ শ্যামল শ্রী। ফুলে পাতায় শিশিরবিন্দু টলমল করিতেছে। কোথায় যেন একটা শ্যামা পাখি শিস দিতেছে। বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে। একটা ক্ষেতের মাঝখানে বসিয়া কয়েকটা কাক কলরব তুলিয়াছে। কোথাও যেন কোনো অভাব নাই, নীচতা নাই, কলহ নাই, সমস্তই যেন প্রাচুর্যে দাক্ষিণ্যে, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। শঙ্করের মনে হইল, এই তো আমার দেশমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, সদাহাস্যময়ী জননী। মুগ্ধনেত্রে শঙ্কর সম্মুখের দিকে চলিল। ছাত্রের দল সরস্বতী প্রতিমাকে মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যে সরস্বতী কুন্দেন্দুতুষারধবলা, পুস্তক শ্রী, বীণাপাণি, সংশয়-অন্ধকার-বিনাশিনী, জ্যোতির্ময়ী বাণী। তাহার মনে হইল, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট রূপটি আজ যেন এই প্রভাত আলোকে অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে! দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল মাঠের বুক চিরিয়া সরু একটি পায়ে-চলার পথ, সেই পথ দিয়া বিদ্যার্থীর দল বাণীমূর্তিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, কত রাজ্যের কত উত্থান-পতন হইল, ভারতবর্ষের এই মূর্তিটি কিন্তু এখনও শাশ্বত হইয়া আছে।

পঁচিশ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড হল ঘরে প্রকাণ্ড একটা ম্যাপ বিস্তৃত করিয়া উৎপল তন্ময়চিত্তে কী যেন দেখিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল।

ও কী?

তাহার স্বরটা যেন রুক্ষ। উৎপল চকিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় ম্যাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল এবং বলিল, আধুনিক কুরুক্ষেত্র।

ম্যাপ দেখে খবরের কাগজ পড়ছ! যুদ্ধ নিয়ে খুব উন্মত্ত হয়ে উঠেছ তা হলে?

খুব। মানব সভ্যতার এত বড় একটা ঊর্ধ্বোৎক্ষেপে তোমরা যে কী করে অবিচলিত আছ, আমি বুঝতে পারছি না।

আমরা তো উদ্ভিদ মাত্র। মানব সভ্যতার হর্ষ-বিষাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী? যাদের তুমি মানব বলছ, তাদের সঙ্গে আমাদের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। তুমিই হয়ত মানব, কিন্তু আমি নই।

উৎপল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর

টেবিল হইতে সিগারেট কেসটা স্মিতমুখে খুলিয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ সিগারেট খাওনি মনে হচ্ছে।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ এ তৃষ্ণী ভাব?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল।

ব্যাপার কি? বস্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

শঙ্কর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। সিগারেট-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নয়, যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই বলিয়া ফেলিল।

নিজে জামিন হয়ে ওদের ছড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কাদের?

ফরিদ কারু পূরণ আর হরিয়াকে।

কে তারা?

তোমার প্রজা। দারোগা সাহেব তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে মারধর করছিলেন, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নাই।

ও।

উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটা টান দিল এবং ব্যাপারটা এইবার হৃদয়ঙ্গম করিল। এতক্ষণ সে সত্যিই কিছু বুঝিতে পারে নাই। সিগারেটে মৃদু গোছের আর একটা টান দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্কর আর কোনো কথা বলিল না, তাহার রগের শিরাগুলা দপদপ করিতেছিল। উৎপল ম্যাপটার ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা বলিল, ওরা যে নির্দোষ; আশা করি তুমি ঠিক জান।

না, জানি না।

অথচ ওদের জন্যে জামিন হলে?

ওরা দোষী কী নির্দোষ তা জানি না বটে, কিন্তু আসল কথাটা জানি।

কী সেটা?

ওরা নিরুপায়।

বাই জোভ!

ওরা চুরি করে কেন, জান?

উৎপলের চক্ষু দুইটি কৌতুকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

জানি এবং এর পর তোমার কি বক্তৃতা যে আসন্ন তাও জানি।

সব জেনেও ওদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিস করতে ইচ্ছে হল তোমার?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়মের খাতিরে অনেক জিনিস করতে হয়। বিশেষ করে ওদের বিরুদ্ধেই আমি কিছু করিনি, চুরি হলে থানায় খবর দেওয়া উচিত বলেই দিয়েছিলাম।

থানায় খবর দিলেই চোর ঠিক ধরা পড়বে, এটা তুমি বিশ্বাস কর?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না। চুরি হলে থানায় খবর দেওয়াই প্রতিকারের একমাত্র উপায়। সভ্য সমাজে এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কী উপায় আছে, বল?

সভ্য সমাজের কথা জানি না, নিজেদের সমাজের কথা জানি।

সেটা কি, খুলেই বল না?

ওই তো বললাম, আমরা নিরুপায়।

উৎপল স্মিতমুখে ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কী করতে বল তা হলে? চুরি হলে সহ্য করব?

তোমার নিজের ভাই চুরি করলে থানায় খবর দিতে? ধর, যদি তোমার একটি চোর ভাই থাকত।

তা হয়ত দিতাম না। কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ সকলকে নিজের সহোদর বলে স্বীকার করতে হবে? কার্যকালে তা পারি না, কাব্য করবার সময় পারি অবশ্য।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

পুনরায় ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উৎপল বলিল, হঠাৎ হল কী তোর? ছাড়িয়ে এনেছিস বেশ করেছিস, আমর ওপর তম্বি কেন? আমি কি আপত্তি করছি?

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা চালাতে দেব না তোমাকে আমি।

হঠাৎ তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। সে আর বসিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া উৎপল অস্ফুটকণ্ঠে পুনরায় বলিল, বাই জোভ।

শঙ্কর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের যুক্তিহীন ক্ষোভকে অকস্মাৎ ভাষায় প্রকাশ করিয়া সে যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিল। এলোমেলো নানা কথা মনে হইতেছিল। কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। কি করা উচিত, কোথায় পথ, অসংখ্য অসহায় পল্লীবাসীদের কী করিলে উপায় হইবে? মনে হইতেছিল, সে কিছুই জানে না, অথচ পল্লীসংস্কার করিতে নামিয়াছে। নিজের অক্ষমতায় সে মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। উৎপলের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পরমুহূর্ত হইতেই একটা নিদারুণ সঙ্কোচ হইতেছিল। একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, ভাবপ্রবণতার আধিক্যবশত সে হয়ত অমিয়ার প্রতি অবিচার করিতেছে। এই তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করিয়া হয়ত ঝড় উঠিবে এবং ঝড়ে অমিয়ার ক্ষুদ্র নীড়খানি হয়ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। নিজের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। হঠাৎ কখন যে কী করিয়া বসিবে, অতর্কিতে কী হইয়া যাইবে তাহা নিজেও সে জানে না। অন্তরের অন্তস্তল হইতে মাঝে মাঝে কিসের যেন একটা ঘূর্ণন জাগে, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে অবিন্যস্ত করিয়া দেয়, সাজানো বাগান ছারখার হইয়া যায়। হঠাৎ খুকির মুখটা মনে পড়িল; কচি দুষ্টু মুখটা। না না, উৎপলের সহিত ঝগড়া করা চলিবে না। কিন্তু উৎপল কেন তাহার মনের কথা বুঝিবে না? কেন সে এমন নির্বিকারভাবে দূর হইতে মজা দেখিবে কেবল? সভ্য সমাজের আইন মানিয়া চলাটাই কি জীবনের একমাত্র নীতি? কিন্তু উৎপলই বা করিবে কি? আইন মানিয়া চলা ছাড়া যে উপায় নাই। চুরি হইলে থানায় খবর দেওয়াই উচিত। ... পরক্ষণেই ফরিদ-কারু-হরিয়ার মুখগুলি মনের ওপর একে একে ভাসিয়া উঠিল, তাহাদের পিঠের বেতের দাগগুলিও। নিরীহ ও নিরুপায় বেচারারা। সুরমার শাড়ি গহনা উহারা যদি লইয়াই থাকে, নিতান্ত পেটের দায়েই... সহসা মনে হইল, সুরমা হয়তো উৎপলের নিকট সব শুনিয়াছে, হয়ত তাহার কথা লইয়া দু'জনেই এতক্ষণে হাসাহাসি

হ... হঠাৎ তাহার রাগ হইল, আবার পরক্ষণে লজ্জা হইল।...

শঙ্কর নাকি?

কে?

শঙ্কর হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল।

আমি নিপু।

ও, নিপুদা। বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

না। আমি মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি থেকে ফিরছি। তোমার সঙ্গেও একটু দরকার ছিল, একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।

কি, বলুন? চলুন, বাড়ির দিকে ফেরা যাক।

চল।

নিপুদার সান্নিধ্যে শঙ্কর যেন আশ্বস্থ হইল। যে দ্বন্দ্ব এতক্ষণ তাহার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। উৎপলের জমিদারির সর্বেসর্বা ম্যানেজার জনৈক কর্মচারীর প্রয়োজনীয় আলাপ শুনবার জন্য সহসা অতিশয় স্বাভাবিকভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুই যেন হয় নাই।

কি বলবেন বলুন?

মুকুন্দ পোদ্দারকে যে কথা বলবার জন্যে গিয়েছিলাম, তোমাকেও সেই কথাই বলতে চাই। আমি তোমাদের শত্রু।

শত্রু।

শঙ্কর বিস্মিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মন অজ্ঞাতসারেই যেন শত্রুর বিরুদ্ধে বর্মাবৃত হইয়া গেল। কমিউনিস্ট নিপুদা।

আপনি আমাদের শত্রু। বলেন কি?

হ্যাঁ, শত্রু। আমি কমিউনিস্ট, তোমরা ক্যাপিটালিস্ট, তোমাদের উচ্ছেদ করাই আমার ধর্ম। তোমাদের সঙ্গে আপস করে চলতে পারব না আমি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, আমার ধারণা ছিল আমরা সবাই এক দলের।

ভুল ধারণা ছিল। আমি অন্য জাতের লোক।

অন্য জাত মানে? অ-ভারতীয়?

না, কমিউনিস্ট।

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল, একটা নামের লেবেল লাগিয়ে দিলেই যে জাত বদলে যায়, তা তো জানতুম না। যে লেবেলই লাগান নিপুদা একটা কথা ভুলে যাবেন না, আমরা সকলেই নিরুপায় পরাধীন ভারতবাসী, এখন ওই আমাদের একমাত্র পরিচয় জগতের কাছে।

ভুলব কেন? মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না সে কথা। ভুলি না বলেই যে ক্যাপিটালিজম এই পরাধীনতার কারণ, যে ক্যাপিট্যালিজমের তোমরা পৃষ্ঠপোষক, সেই ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করতে চাই আমরা। আমরা চাই সাম্য।

কে না চায়? পৃথিবীতে যুগে যুগে সভ্য মানুষের ওই তো আদর্শ, ওই তো স্বপ্ন।

স্বপ্ন কিন্তু এখন আর স্বপ্নমাত্র নেই, রাশিয়ায় তা সফল হয়েছে। আমরাও যদি তাদের পন্থা অনুসরণ করি—

রাশিয়ায় কি সর্বজনীন সাম্য হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস? আমার মনে হয়, সেখানে চাকাটা ঘুরে গেছে শুধু। সেখানে হিংস্র বর্বরতা অসহায় দুর্বলকে পেষণ করছে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রমিকরা নির্যাতন করছে ক্ষমতাচ্যুত ধনিকদের। একে আপনি সাম্য বলেন? সাদা চামড়া যেমন অস্পৃশ্য করে রেখেছে কালো চামড়াকে, সোবিয়েটেও তেমনি অস্পৃশ্য করে রেখেছে 'কুলাক'দের।

কালা কাদমি আর 'কুলাক' এক জাতীয় নয়। উপমাটা ঠিক হল না তোমার।

বিশেষ তফাত কী? কালো হয়ে জন্মানোটাই যদি অপরাধ বলে না ধরেন, ধনী হয়ে জন্মানোটাই বা অপরাধ বলে ধরবেন কেন?

ধনী হয়ে কেউ জন্মায় না, গরিবের রক্ত শোষণ করে তবে লোক ধনী হয়।

সত্যি সত্যি গরিবের রক্ত শোষণ যারা করেনি, ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছে— একমাত্র যাদের অপরাধ, তাদেরও আপনারা নিস্তার দেননি।

রক্তবীজের বংশ নির্মূল করাই উচিত।

ওটা আপনাদের রাগের ভাষা। একটু তলিয়ে দেখেন যদি, কালো আদমি আর ধনীদের উপমাটা নেহাত খেলো মনে হবে না! একটি বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যেমন কালো হয় তেমনই একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবেশে বুদ্ধিমানও ধনী হয়। গরিব হয় বোকারা। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই এসব হয়, এর জন্যে ন্যায়ত কাউকে অপরাধী করা যায় না। শক্তি অথবা বুদ্ধি থাকা পাপ নয়।

ডাকাতকেও তা হ'লে অপরাধী করা যায় না তোমার মতে। তার শক্তি, বুদ্ধি দুইই আছে।

শক্তি আর বুদ্ধির যুদ্ধে সে যদি জয়ী হয়, বিজ্ঞানের চোখে নিশ্চয়ই সে অপরাধী নয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই বাহবা দেবে, বিজয়ী সোবিয়েটকে এখন আপনারা যেমন দিচ্ছেন।

অসহায় দুর্বলরা তাদের প্রাপ্য ফিরে পেয়েছে বলে দিচ্ছি, অন্য কোনো হেতু নেই। আমরা অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে—

অসহায় উদ্ভিদ গরু ছাগল মুরগি মাছ— এদের দিক দিয়ে ভেবে দেখলে সমস্ত মানব জাতিটাকেই তা হলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়।

তোমার মত ক্যাপিটালিস্টসুলভ কল্পনাশক্তি আমার নেই। আমি মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই ভাবি। গরু-ছাগলের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বাজে কবিত্ব আমার নেই। মানুষের মধ্যে যারা বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারা, যাদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে তোমরা বড়লোক হয়েছ, আমি তাদের দলে, তুমি যতই না কবিত্ব কর।

কবিত্ব নয়, বায়োলজি। বায়োলজিস্টের চোখে জীবজগতের দুটি মাত্র দল আছে— বিজিত এবং বিজেতা। উদ্ভিদ গরু ছাগল মুরগি মাছ এবং আপনার ওই বঞ্চিত দুর্গত সর্বহারারা বায়োলজিস্টের চোখে একশ্রেণীভুক্ত, জীবনযুদ্ধে সক্ষম লোকের কাছে ওরা হেরে গেছে কিংবা যাচ্ছে।

যারা মানুষকে মুরগি-মাছের সামিল করে দেখে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। আমরা বঞ্চিতদের দলে। ওরাও যাতে পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করব আমি।

আমরাও তো সেই চেষ্টাই করছি! সেইজনাই তো আপনাকেও ডেকে এনেছি, আপনি আমাদের শত্রু ভাবছেন কেন?

নিপুদা চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ পথ চলিযা শঙ্কর আবার প্রশ্ন করিল, হঠাৎ আপনার আজ এ কথা মনে হচ্ছে কেন?

হঠাৎ হয়নি, বরাবর এই আমার মত। এতদিন সে কথা বলবার সাহস ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, দু'নৌকায় পা দিয়ে আমি চলতে পারব না।

সত্যিই কি নৌকো দুটো? আমরা সবাই কি এক নৌকোতেই ভাসছি না?

না। কবিত্ব করে আসল সত্যটা কিছুতেই ঢাকা দিতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক তফাত। তোমরা সুখী। অন্তত দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা মেটাবার সঙ্গতি তোমাদের আছে, আমার নেই। কোনোক্রমে কদন্ন খেয়ে, ভয়ে ভয়ে কুৎসিত নারীসঙ্গ করে, দেঁতো হাসি হেসে আমাকে যে দুর্বহ জীবন যাপন করতে হয়, তার সঙ্গে তোমাদের জীবনের কিছুমাত্র মিল নেই। তোমাদের অধীনে থেকে তোমাদের অনুগ্রহ-প্রদত্ত যৎসামান্য বেতন নিয়ে হাঁড়িপাড়ার কদর্যতার মধ্যে বাস করে এ কথা কিছুতেই আমি মানতে পারব না যে, আমরা এক নৌকোতে ভাসছি।

আমাদের জাত আলাদা, আমরা বঞ্চিত, তোমরা বঞ্চক। মিথ্যা অভিনয় করতে পারব না আমি।

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে এবং ক্ষণকাল পরে সংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি করবেন তা হলে?

আজই কলকাতায় চলে যাব। মিথ্যার মুখোশ পরে তোমাদের অধীনে কাজ করা পোষাল না আমার।

বেশ।

আচ্ছা, চলি তা হলে।

নিপুদা হঠাৎ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বিস্মিত শঙ্কর বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। উদীয়মান ক্রোধ কোথায় বিলীন হইয়া গেল, নিপুদার কাতর অন্তরটা সহসা যেন অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল সে। শুধু নিপুদার নয়, দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবদের করুণ মর্মকথা নতুন করিয়া তাহার চিত্তকে উন্মথিত করিয়া তুলিল। সত্যই বঞ্চিত বেচারা। লেখাপড়া শিখিবার সময় আদর্শ জীবনের যে স্বপ্ন তাহারা দেখে, লেখাপড়া শেষ করিয়া কিছুতেই তাহারা বাস্তব জীবনে সে স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারে না। মরীচিকার মত কেবলই তাহা দূর হইতে প্রলুব্ধ করে, কিছুতেই নাগালের মধ্যে ধরা দেয় না। আদর্শ জীবন দূরে থাক, স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবার সুযোগই মেলে না, অতিশয় স্থূল আধিভৌতিক ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি নাই। ঘরের পরের, সকলের অবজ্ঞা-উপহাস সহ্য করিয়া চাকরির চেষ্টায় আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, মুক্তির চেষ্টায় অবশেষে হয় স্বদেশি, না হয় সাহিত্যিক হয়। শঙ্কর আবার পথ চলিতে শুরু করিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ফরিদ কারু হরিয়া পূরণই কেবল নয়, নিপুদা, এমনকি সে নিজেও একদলভুক্ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত। নিপুদাদের দুঃখটা আরও বেশি মর্মান্তিক। কল্পনায় তাহারা যে মহত্তর জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, বাস্তবে কিছুতেই তাহাকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। পিপাসা জাগিয়াছে, কিন্তু পানীয় নাই, আছে শুধু স্বপ্ন। আলো কি তাহা জানে, মিলিয়াছে কিন্তু আলেয়া। ফরিদ কারু হরিয়াদের অভাব আছে, কিন্তু স্বপ্ন নাই। তাই তাহারা অভাবের মধ্যেও সুখী। স্বপ্নই পাগল করিয়া তোলে। পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, এই কথাগুলাই বারবার আবৃত্তি করিতে করিতে শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল। বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল, সুমহৎ হিন্দু সভ্যতার ঐতিহাসিক আস্ফালনে মাতিয়া যত বাগাড়ম্বরই আমরা করি না কেন, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না যে, আমরা হারিয়া গিয়াছি। বিজয়ী প্রতিপক্ষের নিষ্ঠুর প্রহারে আমরা মরণোন্মুখ, কেবলমাত্র হিন্দু সভ্যতার জয়গান করিয়া গীতা-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত আওড়াইয়া কিছুতেই সে মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে না। সহসা তাহার মনে হইল, সনাতন আর্য সভ্যতা সত্যই যদি এত মহৎ ছিল, তবে তাহা সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না কেন? বৌদ্ধধর্মের অবির্ভাব কেন সম্ভবপর হইল? মুসলমানই বা আসিল কেন? তাহা ছাড়া আর্য সভ্যতার যাহা লইয়া আমরা গর্ব করি, তাহার সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় যোগ কতটুকু? যাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-উপনিষদ্ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এবং আমরা কি একজাতের লোক? রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র কি আমাদের চরিত্র? কিছুমাত্র কি মিল আছে? মিল আছে বরং ইউরোপের। যে আর্যরা এখন ইউরোপে রাজত্ব করিতেছে, সেই আর্যদেরই একটা অংশ ভারতবর্ষে একদা আসিয়াছিল, তাহাদেরই কীর্তিকলাপ, তাহাদেরই সভ্যতা বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, ইউরোপের ইতিহাসে কাব্যে বিজ্ঞানে যেমন লিপিবদ্ধ আছে ইউরোপীয় আর্য সভ্যতার কাহিনী। আমরা কি আর্য? মোটেই

নয়। ওসব বলিয়া আমরা বৃথা গর্ব করিয়া মরি। আমরা পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, *শোষিত, পদদলিত— এইটুকুই ঐতিহাসিক সত্য, এই সত্যটা যদি কাঁটার মত মর্মে বিঁধিয়া থাকে, তবেই হয়ত উদ্ধারের উপায় আছে। সহসা তাহার মনে হইল, মর্মে কি বিঁধিয়া নাই? প্রতি পদে প্রতি কশাঘাতের সহিত কি মনে পড়িতেছে না, আমরা অক্ষম অশক্ত অপটু নির্বীর্য স্বপ্নবিলাসীর দল? কিন্তু কই, উদ্ধারের উপায় তো দেখা যাইতেছে না? আমাদের অপটুতা লইয়া আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছি, আমাদের দুঃখ দৈন্য লইয়া কবিত্ব করিতেছি, রাজনীতির নামে হয় খোশামোদ, না হয় দলাদলি করিতেছি, উদ্ধারের উপায় সন্ধান করিতেছি কই? আমাদের শক্তি বাড়িতেছে কই? তাহা ছাড়া আমরা মানে কাহারা? এই গ্রামের লোক? বেহারিরা? বাঙালিরা? ভারতবাসীরা, না এশিয়াবাসীরা? না, পৃথিবীর যেখানে যত দুর্গত দুর্ভাগা আছে সকলে? ...* হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল, নিপুদাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিপুদার বাসায় গিয়া যখন সে হাজির হইল, তখন নিপুদা তোরঙ্গ গোছানো শেষ করিয়া বিছানা বাঁধিতেছেন। বাহিরে একটা গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে।

নিপুদা, আপনার যাওয়া হবে না।

নিপুদা শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। যদিও সে যাইবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল তবু শঙ্করের কথায় মনে মনে যেন একটু তৃপ্তি অনুভব করিল। মুখে বাঁকা হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

আমি থাকতে পারব না ভাই, মাপ কর। যে কাজের ভার তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি তার উপযুক্ত নই। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে মতেরও মিল নেই আমার।

আমার মত যে ঠিক কী, আমিই তা জানি না। অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি কেবল। আপনি চলে যাবেন না নিপুদা।

শঙ্করের কণ্ঠস্বরে এমন একটা মিনতি ফুটিয়া উঠিল যে, নিপুদা অবাক হইয়া গেল। অন্ধকারে অসহায় পথভ্রান্ত পথিক যেন সাহায্য চাহিতেছে।

তোমার মতের ঠিক নেই, অথচ তুমি দেশের কাজে নেমেছ? তোমার একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়।

দেশের ভাল হোক— সর্বান্তঃকরণে এই আমি চাই, এর বেশি আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ভাল মানে কি? মাড়েয়ারিরা বেশি বড়লোক হোক?

সে সব আলোচনা পরে হবে, আপনি এখন বিছানা খুলুন।

পরস্পর উভয়ের দিকে নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিপুদা বলিল, আচ্ছা, তুমি এত করে বলছ যখন, আজকে অন্তত যাওয়াটা স্থগিত রাখলুম পরে কী করব বলতে পারি না।

শঙ্কর বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ্মীবাগের মণি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। মণি স্বাস্থ্যবান যুবক। শুধু দেহ নয়, মনও তাহার বলিষ্ঠ। কলেজে পড়াশোনা শেষ করিয়া চাষ করিতেছে, চাকরি পাইয়াও চাকরি করে নাই। খুব ভাল শিকারি, কলেজে নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিল।

কি হে, কি খবর?

গুলাব সিং রোজ মোষ পাঠিয়ে আমার গমের ক্ষেতে চরিয়ে দিচ্ছিল, আমি দু'দিন লোক পাঠিয়ে ভদ্রভাবে তাকে মানা করেছিলাম, তবু কাল আবার তার মোষ এসেছিল—

এই পর্যন্ত বলিয়া মণি চুপ করিল।

তারপর?

আমি গোটা দুই মোষ গুলি করে মেরেছি কাল।

মেরেছ!

না মেরে উপায় কি, ভদ্রভাবে বললে যখন শুনবে না? আমার একশো বিঘে গম কীভাবে নষ্ট করেছে, আপনি যদি দেখেন গিয়ে—

তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল।

আমাকে কি করতে হবে?

গুলাব সিং দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে শুনে উৎপলবাবুর কাছে এসেছিলাম, তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, তুমি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে দাও আপাতত। বলিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল, এই থানা লইয়াই কিছুক্ষণ আগে উৎপলের সহিত তাহার ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া কি-ই বা করিবার আছে এখন? ওই ঘুষখোর দারোগাটার কাছেই প্রতিকারের জন্য ছুটিতে হইবে।

মণি উঠিয়া দাঁড়াইল।

আপনি বলছেন যখন, যাচ্ছি আমি থানায়, কিন্তু ওতে কিছু হবে না। আমি এসেছিলাম গোটা কয়েক লাঠিয়াল সিপাহি চাইতে। বেশি নয়, গোটা দশেক সিপাহি আমাকে যদি দেন, মেরে পস্তা উড়িয়ে দিতে পারি আমি ব্যাটাদের।

আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আগে আইনত চেষ্টা করে দেখা যাক।

মণি উঠিয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্করের ব্যবস্থাটা তাহার মনঃপূত হইল না।

রহিম আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

হুজুর, দশঠো রুপিয়াকা বড়া—

শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত তাহাকে শান্তি দিবে না ইহারা!

হিঁয়া কি রূপিয়াকা গাছ হ্যায়? ভাগো হিঁয়াসে।

কণ্ঠস্বর অতটা উচ্চ করিতে সে চাহে নাই, কিন্তু উচ্চ হইয়া পড়িল।

রহিম সভয়ে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। তাহার ভীতচকিত দৃষ্টি শঙ্করকে কষাঘাত করিল যেন।

শুনো—

রহিম ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্যা করেগা রুপিয়া লেকে?

তিন দিনসে বালবাচ্চা সব ভুখা হ্যায় হুজুর। কুছ নেই খায়া। মোদিকা দোকানমে দশ রুপিয়া বাকি হ্যায়, ই রুপিয়া নেহি দেনেসে আর উধার নেহি মিলেগা।

সসঙ্কোচে থামিয়া গেল। আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা দৃষ্টি তুলিয়া চকিতে শঙ্করের মুখের দিকে একবার চাহিল। নিরুপায় শঙ্কর পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিল। দেখিল, পাঁচটা টাকা আছে। ঘরে ঢুকিয়া ড্রয়ার হইতে আরও পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া আনিল। টাকা লইয়া রহিম সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর বাড়ির ভিতর গেল না। বারান্দায় ক্যাম্পচেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। মনে হইল, সে যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পা দুইটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। অমিয়াকে ডাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা দিয়া কোনো স্বর বাহির হইল না। পাথরের মত কি একটা যেন কণ্ঠরোধ করিয়া আছে। আর একদিন ঠিক এমনই হইয়াছিল, যেদিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ আসে।... একা অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সহসা তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ছাব্বিশ

শঙ্করের সহিত তর্ক করিবার পর হইতে কুন্তলা মনে মনে কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, নিজের কাছেই যেন সে ছোট হইয়া গিয়াছে! কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে সে তর্ক করিত, সেই অভ্যাসবশেই সেদিন সে নিজেকে সংযত করিতে পারে নাই। ভুলিয়াই গিয়াছিল, কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে যা শোভন, শ্বশুরবাড়িতে তাহা শোভন নহে। তা ছাড়া তর্ক করিয়া লাভ কি ? তর্ক করিয়া কখনও কাহারও স্বভাব বা মত পরিবর্তন করা যায় না। মুখে স্বীকার করিলেও মনে মনে যে যাহা, তাহাই থাকিয়া যায়। তর্ক করিয়া সময় নষ্ট হয়, নিজের মর্যাদাও নষ্ট হয়। কুন্তলা তর্ক ছাড়িয়া দিয়াছে। সুরমার সঙ্গেও আর সে তর্ক করে না। সে অনুভব করিয়াছে, সুরমা তর্ক করে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য নয়, তাহার গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য। সুরমা অবশ্য অভদ্রতা করে না, কোনো অপ্রিয় কথা বলে না। তাহার সভ্য শিক্ষিত আচরণে এমন কিছুই প্রকাশ পায় না, যাহা লইয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে রাগ করা চলে। কুন্তলার গোঁড়ামিতে সুরমা বিস্ময় প্রকাশ করে, প্রতিবাদ করিলেও এমন সুষ্ঠু সহাস্য ভঙ্গিতে করে যে তাহাতে সোজাসুজি অসন্তুষ্ট হওয়া যায় না। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, হাসির টুকরায়, বিস্মিত ব্যাজস্তুতিতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গই তাহা বুঝিতে কুন্তলার বিলম্ব হয় নাই। অনেক সময় সুরমা কুন্তলার কথায় সায়ও দেয়, কিন্তু তাহা যেন বয়স্ক ব্যক্তির শিশুর অসঙ্গত কথায় সায় দেওয়ার মত। কুন্তলা তাই আর তর্ক করে না। যাহা তাহার অন্তরেব বস্তু, যাহাকে সে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাও সে সহ্য করিতে পারে না, তাহা লইয়া এই মূঢ়দের সহিত সে আর বচসায় প্রবৃত্ত হইবে না। টেনিস বল লইয়া লোফালুফি করা যায়, অন্তরের বেদনা লইয়া যায় না। আজকাল সুরমার সঙ্গ তাই সে এড়াইয়া চলিতেছে। তাহার ভয় হয়, হয়ত কথায় কথায় এমন কিছু বলিয়া ফেলিবে, যাহা তাহার আদর্শের পক্ষে গ্লানিকর। ইহাদের চক্ষে নিজের আদর্শকে সে কিছুতেই কোনো কারণেই খাটো করিবে না। যে স্বার্থসর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মুখোশ পরিয়া ইহারা নাচিয়া বেড়াইতেছে, সে সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে লইয়া ব্যঙ্গ করিতে যাওয়াও গ্লানিকর। ক্ষুদ্রকে ব্যঙ্গ করিতে গেলে নিজেকেও ক্ষুদ্রের পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে হয়। একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে অগ্রগতির প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ, সেই অগ্রগতির স্বরূপটা বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে। ও দেশের মনীষা নানারকম আশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে সন্দেহ নাই, চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আরও চমৎকৃত হইতে হয় সে যন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া। ওই সব অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য যন্ত্র লইয়া সকলে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহা না করিলে অগ্রগতি হইবে কী করিয়া! কিন্তু প্রবন্ধ রচনা করিবার বাসনাও সে ত্যাগ করিয়াছে। সে কিছুই করিবে না, কাহারও কথায় থাকিবে না, কাহারও সহিত মিশিবে না! অনাড়ম্বরে নিজের আদর্শকে অনুসরণ করিবে কেবল, আস্ফালন করিবার প্রয়োজন কী? সে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবে থাকিবে। হরিহর পর্যন্ত কুন্তলার পরিবর্তিত আচরণে বিস্মিত। তাহার স্বামীভক্তি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান করে। হরিহর প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি টেকে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কুন্তলা নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া নিপুণভাবে ছুরি দিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়কে প্রস্তুত করিতেছিল। দুই বেলা আহারের পর হরিহরের খড়কে না হইলে চলে না। এতদিন ন্যাংড়াই খড়কে প্রস্তুত করিত, কোনোটা বেশি সরু, কোনোটা বেশি মোটা হইত। হরিহরের খুব যে

একটা অসুবিধা হইত তাহা নয়, কোনোদিন এ বিষয়ে কিছু বলেও নাই সে, তবু স্বামীর এতটুকু অসুবিধাই বা কুন্তলা হইতে দিবে কেন?

হরিহর আসিয়া প্রবেশ করিল।

তোমাকে নেওয়ার জন্যে উৎপলের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে।

আমি আর এখন যাব না।

ওগুলো তো ন্যাংড়াও করতে পারে, তুমি ঘুরে এস না।

কুন্তলা কোনো কথা বলিল না, কেবল, যেমন তাহার স্বভাব, হাসিভরা চোখ তুলিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

সাতাশ

উৎপলের আজ জন্মতিথি। সমস্ত দিন শঙ্কর বাড়ি ছিল না। তাহাকে যাইতে হইয়াছিল লক্ষ্মীবাগে, মণির ব্যাপারে তদন্তের জন্য। তাই দুপুরবেলা সে আসিতে পারে নাই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া দেখিল সুরমার চিঠি লইয়া একজন চাকর তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। চিঠিতে তেমন বিশেষত্ব কিছু ছিল না। সাধারণ কাগজে সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণলিপি।

শঙ্করবাবু,

আজ আপনার বন্ধুর জন্মদিন। দুপুরে তো আপনাকে পাওয়াই গেল না। অমিয়া একা মেয়ে নিয়ে এসেছিল। আপনি সন্ধ্যায় এখানে নিশ্চয়ই আসবেন, রাত্রে আমাদের এখানেই খেয়ে যাবেন। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়। আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমরা।

ইতি—

সুরমা

সেদিনের পর হইতে শঙ্কর আর উৎপলের কাছে যায় নাই। উৎপলের আজ যে জন্মদিন, সে কথাও তাহার মনে ছিল না। চিঠিটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া এ সঙ্কল্পও সে একবার করিল যে, যাইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না গেলে ব্যাপারটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিবে। তা ছাড়া না যাইবার কোনো সঙ্গত কারণ তো নাই। একা একা বাড়িতে বসিয়া কী করিবে এখন? অমিয়া বাড়ি নাই। দাইটা বলিল, খুকিকে লইয়া স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরীদের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছে সে। চৌধুরির স্ত্রীর সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, প্রায়ই সেখানে যায়। সুরমা কুন্তলা অথবা হাসির সহিত তাহার তেমন ভাব নাই, যত ভাব চৌধুরীর স্ত্রীর সহিত। শঙ্কর বাড়ির ভিতরে জামা বদলাইবার জন্য একবার ঢুকিল। ঘরে তালা বন্ধ, সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। সমস্ত বাড়িটাই যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ছোট্ট দুইটি প্রাণী, কিন্তু সমস্ত বাড়িটাকে যেন পূর্ণ করিয়া রাখে। মুশাই বাইরের ঘরে স্টোভ জ্বালিয়া চা করিয়া দিল। চা পান করিয়া শঙ্কর ঠিক করিয়া ফেলিল, যাইবে। মনটা তবু একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। সেদিনের ওই হাস্যজনক কাণ্ডের পর সহজভাবে উহাদের সম্মুখে সে যাইবে কী করিয়া। সেদিন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যাহা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা যুক্তির আলোকে আজ তাহার নিকটও হাস্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে।

সূর্যালোকস্পর্শে কুয়াশা যেমন বিলুপ্ত হয়, সুরমার হাসির স্পর্শে শঙ্করের মনের সমস্ত গ্লানি তেমনি নিমেষে মুছিয়া গেল। অতিশয় তুচ্ছ কারণে সহসা উদ্দীপ্ত উত্তেজনায় উৎপলের সহিত

তাহার যে মনোমালিন্য ঘটিয়া গেল বলিয়া শঙ্করের ধারণা হইয়াছিল এবং যে ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন অস্বস্তিতে আশঙ্কায় বিতৃষ্ণায় ক্ষোভে সম্ভব-অসম্ভব নানা কাল্পনিক বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া গেল স্মিতমুখী সুরমার সানন্দ অভ্যর্থনায়।

আসুন—

একটি কথা মাত্রই সুরমা বলিল। কিন্তু তাহার আলোকিত দৃষ্টি হাস্যোজ্জ্বল অধর, অভ্যর্থনার প্রসন্ন ভঙ্গিমায় যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাহার মনের গ্লানিই শুধু মুছিয়া গেল না. মনে রঙও ধরিয়া গেল। যে বীণার তার বহুকাল অনাহত ছিল, তাহা সহসা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল যেন। শঙ্কর স্পন্দিত বক্ষে বিস্মিত মুগ্ধ নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া রহিল। বহুকাল পূর্বে যে সুরমা তাহাকে স্বপ্নলোকেব পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল. সেই সুরমাই সহসা যেন আজ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ডাক দিল, আসুন।

সেই সুরমা! দীর্ঘদিনের ব্যবধান চকিতে অতিক্রম করিয়া পরিবর্তনের বাধাপুঞ্জ নিমেষে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া সহসা তাহার এ কি অপ্রত্যাশিত অপূর্ব আবির্ভাব! শঙ্করের বয়স সহসা যেন কমিয়া গেল। সেকালের সুরমা-স্বপ্নবিহ্বল শঙ্কর পুনর্জীবন লাভ করিয়া সেকালের মোহে, সেকালের বিস্ময়ে আকুলতায় আত্মহারা হইয়া ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রবলে যেন রূপকথার দেশে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্যই।

লোকগুলোর কাণ্ড দেখেছ!

উৎপলের কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ চুরমার হইয়া গেল সব। উৎপলকে সে দেখিতে পায় নাই, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই এতক্ষণ সচেতন ছিল না সে। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল প্রশস্ত হলটার কোণে একটা সোফায় ঠেস দিয়া উৎপল বসিয়া আছে। পায়ে কারুকার্যমণ্ডিত দামি একখানা শাল, হাতে লাল রঙের ছোট একখানা বই, চোখে মুখে চাপা হাসি। শিয়রের দিকে টেবিলের উপর সুদৃশ্য একটি বাতিও জ্বলিতেছে।

আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি!

সুরমা চলিয়া গেল।

কী কাণ্ডর কথা বলছ?

শঙ্কর আগাইয়া গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

এই ম্লেচ্ছ ব্যাটাদের—

লাল বইখানা তুলিয়া দেখাইল সে। পেঙ্গুইন সিরিজের বই, 'সায়েন্স ইন ওয়ার'। শঙ্কর একটু মুচকি হাসিল।

কী কাণ্ড! কোথায় আধ্যাত্মিক চিন্তা করবে, তা না, কাঠ থেকে চিনি করছে, বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে নাইট্রেট তৈরি ক'রে তা দিয়ে বোমা বানাচ্ছে! সিন্‌থেটিক রাবারই বানিয়ে ফেললে। সিন্‌থেটিক সিল্ক।

উৎপল সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং টেবিল হইতে সিগারেট কেসটা তুলিয়া বলিল, যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা ব্যাটাদের। এই নাও।

সিগারেট-কেসটা আগাইয়া দিল। পরক্ষণেই সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার।

ও, আই অ্যাম সরি, মনেই ছিল না!

নিজে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইল, তাহার পর চোখের দৃষ্টিতে হাসি বিকিরণ করিয়া বলল, কতদিন এ কৃচ্ছ্রসাধন চলবে তোমার?

যতদিন চালাতে পারি।

উৎপল ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া আবার নামাইয়া লইল, কোনো কথা বলিল না। শঙ্করও চুপ করিয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না, সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল।

কুন্তলা এ বেলাও এল না।

ও। উৎপল সন্তর্পণে সিগারেটে একটা টান দিল।

আর একটা কথা শুনেছ? শঙ্কর সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে।

ভালই তো।

উৎপল শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চোখে মুখে ছদ্ম-উদ্বেগ ফুটাইয়া প্রশ্ন করিল, মাছ মাংস খাচ্ছিস তো?

শঙ্করের কানের দুই পাশ সহসা গরম হইয়া উঠিল। সুরমার সম্মুখে উৎপলের এ ব্যঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তবু আত্মসম্বরণ করিয়া রহিল সে। কোনো উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল শুধু।

চা খাবেন? সুরমা প্রশ্ন করিল।

না, এই মাত্র খেয়ে আসছি।

উৎপলের চোখের দৃষ্টি পুনরায় কৌতুক-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টির অর্থ--- ও, চা-টা ছাড়নি তা হলে? ভাল। শঙ্কর সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, মনে মনে আরও একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

সুরমার দিকে চাহিয়া উৎপল বলিল, অকূল সমুদ্রে পড়ে ও একটা ভেলা খুঁজছে, উদ্ধার কর ওকে।

শঙ্করবাবু সমর্থ লোক, সমুদ্রে যদি পড়েই থাকেন, সাঁতরে পার হয়ে যাওয়ার শক্তি আছে ওঁর। ভেলার দরকার হবে না।

আহা, তবু একটা ছুঁড়ে দিতে ক্ষতি কী! বিশেষ কিছু করতে হবে না, একটা গান কর শুধু। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হবে। তোমার চেয়ে ওকে আমি বেশি চিনি।

স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিয়া শঙ্কর হাসিয়া বলিল, গান শুনতে আপত্তি নেই। করুন না একটা গান, অনেকদিন গান শুনিনি আপনার।

উৎপল ফরমাশ করিল, কাল রবিবাবুর যে গানটা শিখলে সেইটে ধর। উতরেছে গানটা।

সুরমার চোখে মুখে স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। পর্দা সরাইয়া সে পাশের ঘরে গেল এবং অর্গানের ডালাটা তুলিয়া বসিল। একটু বাজাইয়া ধরিল।

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন পড়ে মনে, ভুলো না
ভুলো না ভুলো না ভুলো না...

অন্ধকার রাত্রে শঙ্কর হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। সুরমার কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, তাহার অন্তরের গভীরতম স্তরে যে ছন্দস্পন্দন তুলিয়াছিল, তাহারই আবেশে আত্মহারা হইয়া সে পথ চলিতেছিল। একের পর এক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানই আজ সুরমা গাহিয়াছে। সকলগুলিরই নিগূঢ় আবেদন এক। হে প্রিয়, হে দয়িত, কোথা তুমি, কত আয়োজন করিয়া যুগযুগান্ত যে তোমার জন্য বসিয়া আছি। জানি, বিজন ঘরে আঁধার রাতে একদিন তুমি আসিবে,

সকল কাঁটা ধন্য করিয়া গোলাপ হইয়া একদিন তুমি ফুটিবে, তোমার পায়ের শব্দ, তোমার গন্ধ পাইতেছি, তোমার জন্যই যে আকাশ ভরিয়া নক্ষত্রের দীপালি তাহা জানি, বনে বনে কুসুম-কিশলয়ের উৎসব তোমারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, শুক্লা একাদশীর মধ্যরাত্রে নিদ্রাহারা শশী তোমার পথ চাহিয়াই স্বপ্ন-পারাপারের খেয়া বাহিতেছে, কিন্তু হে প্রিয়, আভাসে-ইঙ্গিতে স্বপ্নে কল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আর কতকাল লুকাইয়া থাকিবে তুমি? আগ্রহে অধীর হইয়া আর কতকাল অপেক্ষা করিব? মূর্ত হও, হে জীবনবল্লভ, দেখা দাও, ধরা দাও। তোমাকে পাইয়াও যে পাই না। একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, সেইটুকু লইয়া আর কতদিন ফাল্গুনী-স্বপ্ন রচনা করিব? কোথায় তুমি কবে আসিবে? হয়ত নিশীথ-রাতের বাদলধারার সুরে আমার একলা ঘরে চুপি চুপি তুমি আস, কিন্তু তখন চোখে আমার ঘুম, চারিদিকে অন্ধকার, তোমাকে কাছে পাইয়াও পাই না। যখন জাগিয়া উঠি তখন দেখি, তুমি নাই, দখিন হাওয়াকে পাগল করিয়া আঁধার ভরিয়া তোমার গন্ধ কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তুমি চলিয়া গিয়াছ। আকুল চিত্তে কল্পনা করি, তোমার মালার পরশ আমার বুকে লাগিয়াছিল কি...

রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুর, সুরমার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। সুরমা বিশেষ করিয়া এই গানগুলিই গাহিল কেন? তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই গাহিল কি? সুরমার অন্তরের অন্তস্তলে এমন কোনো কথা কি লুকানো আছে যাহা সহজ ভাষায় বলা যায় না, যাহার রূপ-রস-নিবিড়তা একমাত্র গানের সুরই প্রকাশ করিতে পারে? আশ্চর্য কী! হয়ত আছে। কিন্তু...। 'কিন্তু' ভাব কিন্তু বেশিক্ষণ রহিল না। ঈষৎ-জাগ্রত বিবেককে সম্মোহিত করিয়া তাহার মন চিরন্তন পুরুষোচিত সেই স্বপ্ন সৃজন করিতে লাগিল, যে স্বপ্নে সামাজিক নীতির ভেজাল নাই, সংস্কারকের সংযম যাহাকে কুণ্ঠিত করিতে পারে না, অবিমিশ্র আবেগে যাহা চিরকাল সুস্থ পুরুষের মর্মমূলে কবিত্ব উৎসারিত করিয়া আসিয়াছে। আদিম উদ্দাম প্রেরণায় স্বকীয়া-পরকীয়ার কৃত্রিম গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা নরনারীর আপাত-সামাজিক বন্ধনকে যুগে যুগে শিথিল করিতেছে। চিরকাল করিবে। বহুকাল পরে অকস্মাৎ শঙ্করের চিত্ত সুরমাকে ঘিরিয়া স্বপ্নমধুর হইয়া উঠিল। শুধু মধুর নয়, মদিরও। সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করিল, তাহার অন্তরতম সত্তা দেশের দুঃখে এতটুকু ম্রিয়মাণ নয়। বাহিরে সে একটা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে শুধু। ইহা তাহার সংস্কারক মনের কর্তব্যবোধ মাত্র, অন্তরতম সত্তার সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। যে নিগূঢ় বেদনা আজ বহুকাল পরে সত্যিই তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারিয়াছে তাহা পল্লীবাসীর দুঃখজনিত বেদনা নয়, তাহা বিরহ-বেদনা। সুরমার গান শুনিয়া তাহার অন্তর বেতসপত্রের ন্যায় আজ যে আকুলতায় কম্পিত হইতেছে, সুরমার মনের কথাটি জানিবার জন্য অবুঝের মত যে আগ্রহে সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, সে আকুলতা, সে আগ্রহ কি তাহার দেশসেবায় ফুটিয়াছে কখনও? দেশকে ঘিরিয়া এমন তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি জাগিয়াছে? সুরমার সান্নিধ্যে আজ তাহার অন্তর যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইল, এমন কি দেশের কাজে কোনোদিন হইয়াছে? সত্যটা আবিষ্কার করিয়া মনে মনে সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবং পরমুহূর্তেই তাহার রাগ হইল। সে রাগ শুধু নিজের ওপর নয়, দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ওপর, এমন কী রবীন্দ্রনাথের উপরও।

তাহার মনে হইল, তাহার চিত্তকে এমন উন্মনা স্বপ্নবিলাসী করিয়া তুলিয়াছে রবীন্দ্রনাথই। কবিই দেশের চিত্ত গঠন করেন। এ কী করিয়াছেন তিনি। পেলব মধুর ভাষায়, মর্মস্পর্শী ছন্দে সুরে মানব মনের প্রেমবিহ্বলতাকে, না-পাওয়ার আকুলতাকে, সুদূরের পিপাসাকে রূপে রসে রঙে এমন মনোহারিণী করিয়া গিয়াছেন যে দেশের সমস্ত যুবক-যুবতী ভাবাকুললোচনে

কল্পনার কুঞ্জকুটিরে আজ কেবল স্বপ্ন দেখিতেছে। বলিষ্ঠতা কোথাও নাই, কেবল স্বপ্ন। অর্জুন একজনও নাই, ঘরে ঘরে কেবল রাধা। একটা তূর্যধ্বনি শোনা যায় না, চারিদিকে কেবল বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি সঙ্গীত লিখিয়াছেন, 'নৈবেদ্য' রচনা করিয়াছেন, নানা প্রবন্ধে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সে সব রচনা দেশের মনে প্রেরণা দিতে পারিল কই? দেশ যত আবেগভরে 'মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি— সখি জাগো' গাহিল, ঠিক তত আবেগভরে কি 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গাহিতে পারিল? হুজুগে মাতিয়া দুই-চারিদিন হয়ত গাহিয়াছিল, কিন্তু সে গান তাহাদের মর্মে প্রবেশ করে নাই। তাহাদের মর্মে প্রবেশ করিয়াছে 'কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া নামে'। কেন? শঙ্করের সন্দেহ হইল, হয়ত রবীন্দ্রনাথই ঠিক তেমন প্রাণ ঢালিয়া ওই দেশাত্মবোধক রচনাগুলি লেখেন নাই। ওগুলি সুললিত সুন্দর রচনা কিন্তু ওগুলিতে ঠিক যেন তাঁহার প্রাণের সুর বাজে নাই, তাই দেশের কর্ণে প্রবেশ করিলেও দেশের মর্মে উহারা প্রবেশ করিতে পারিল না। তিনি অচিন পথের উন্মাদ পথিক ছিলেন, ছিলেন বাউল সুফি মরমিয়া। দেশকে নয়, প্রিয়কে, সুন্দরকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন, ধ্যান করিয়াছেন। পচা পানাপুকুরের পঙ্কোদ্ধারের কথা তিনি মাঝে মাঝে চিন্তা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে 'সোনার তরী' ভাসাইতেই তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কালিদাসের ভাববিলাস অথবা বৈষ্ণব কবিদের কান্ত-কোমলতা ভারতের যে স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে স্বাস্থ্যকর ছিল, পরাধীন নিবন্ন ভারতের পক্ষে তাহা যে মারাত্মক, সে খেয়াল থাকিলেও তাহার প্রতিবিধান করিবার উপায় তাঁহার হাতে ছিল না। কারণ নিজের সংস্কারকে, নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না— কোনো কবিন্দ্র পারেন না। কোকিলের গান যদি কোনো কারণে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হয় কোকিল কি নিজের সুর বা স্বর পরিবর্তন করিতে পারে?...

সমস্ত দোষটা রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া নিপুণভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া শঙ্কর যেন নিজের কাছেই জবাবদিহি করিল। পতনের কারণ নির্ণয় করিয়া পতনের গ্লানি হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস পাইল, একটুও অনুতপ্ত হইল না। সুরমার হাসি, গান, মার্জিত আলাপ, তন্বী দেহশ্রী, শাড়ির রঙ, অলকের কম্পন অপাঙ্গের মাধুর্য ঘিরিয়া যে কল্পলোকে তাহার মুগ্ধ মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল, সে কল্পলোকে কল্পনাই সম্রাজ্ঞী, যুক্তির স্থান সেখানে নাই। পুলকিত চিত্তে শঙ্কর আবিষ্কার করিল তাহার যৌবন এখনও সজীব আছে। যে ভয়ে সে কলিকাতায় চুনচুনের সহিত দেখা করে নাই, তাহা তাহার লুব্ধ বাসনারই ভীত রূপ। তাহার কবিমানসে যে মানসীলিপ্সা চিরকাল চিরন্তনী প্রিয়ার স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে, তাহা মরে নাই প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল আজ সহসা সুরমাকে ঘিরিয়া তাহা আকুল হইয়া উঠিয়াছে, মুগ্ধমদির হৃদয়ে সে পথ চলিতে লাগিল। শীতের আকাশে শীর্ণ চাঁদ উঠিয়াছে। দূরে রাস্তায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া গরুর গাড়ি চলিয়াছে, সমস্ত পল্লী ধূম ও কুযাশায় আচ্ছন্ন. শিউলি ফুলের এক ঝলক গন্ধ যেন কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল। 'আজি মম অন্তর-মাঝে কোন্ পথিকের পদধ্বনি বাজে'— মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতেছে সুরমার গানের সুর। একটা নিদারুণ চিৎকারে সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। সে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনের সুরটা কাটিয়া গেল। বিরক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠিল। কে এমন বেসুর চিৎকার করিতেছে? চাহিয়া দেখিল, পাশেই মুশাইয়ের বাড়ি, চিৎকারটা সেখান হইতে আসিতেছে। শঙ্কর আগাইয়া গিয়া থামিল। হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিল যমুনিয়া। তাহার রুক্ষ চুল, ছিন্ন বসন অসম্বৃত। এমন সময়ে সেখানে শঙ্করকে দেখিতে পাইবে, সে প্রত্যাশা করে নাই। শঙ্করকে দেখিয়া তাহার দুঃখ যেন আরও উথলাইয়া উঠিল।

কাপড় সামলাইবার কথা তাহার মনে রহিল না, অসম্বৃত বসনেই সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুশাই তাহাকে মারিতেছে। এইমাত্র কোথা হইতে সে 'পিইয়া' আসিয়াছে। ম্লান জ্যোৎস্নার স্বল্পালোকেও শঙ্কর দেখিতে পাইল যমুনিয়ার পাঁজর গোনা যায়, জীর্ণ বুকের হাড়গুলো উঁচু হইয়া রহিয়াছে, স্তনযুগল শুষ্ক বিশীর্ণ— যেন রুগণ পুরুষ মানুষের বুক। নিজের ভাষায় যমুনিয়া বকিয়া চলিয়াছিল। অত দাম দিয়া মুশাইকে সেদিন একটা 'মোটিয়া' কিনিয়া দিল, কোথা ফেলিয়া আসিয়াছে—কোনো ছুঁড়িকে দিয়া আসিয়াছে কি না তাহারই বা ঠিক কী। ইহার জন্য সে কিন্তু কোনো অনুযোগ করে নাই, সে 'কিরিয়া খাইতে' (শপথ করিতে) প্রস্তুত আছে বরং নিজের গায়ের চাদরখানা তাহাকে দিতে গিয়াছিল, তখন অবশ্য বলিয়াছিল, নে, এটাও নে, আমার যথাসর্বস্ব গ্রাস কর তুই। এই কথাতেই তাহাকে মারিতে শুরু করিয়া দিল, চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মুক্কা, থাপ্পড়, লাত (কিল, চড়, লাথি)। ... শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝখানে 'ঘুর' জ্বলিতেছে, তাহার পাশে মুশাই দাঁড়াইয়া আছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, আরক্ত চক্ষু।

যমুনিয়াকে কেন মেরেছিস?

মুশাই সাধারণত নীরব প্রকৃতির। কিন্তু মদের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, হামারা খুশি।

খুশি?

ঠাস করিয়া তাহাব গালে শঙ্কর প্রচণ্ড একটা চড় বসাইয়া দিল। মুশাই পড়িয়া গেল।

ওঠ্, ওঠ্, শিগগির। খুন করে ফেলব তোকে আজ।

মুশাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং নতমস্তকে বসিয়াই রহিল। উঠানেব এক কোণে শুষ্ক মুখে যমনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, আব ছোড়ি দে নুনু, পিলোছে (এবাব ছেড়ে দে বাবা, মদ খেয়ে ও র া ক করছে)।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল যমুনিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। শুধু ভয়ে নয়, শীতেও। গায়ে কাপড় নাই, নিজেব একমাত্র গায়েব কাপড়খানি মাতাল চরিত্রহীন স্বামীকে দিয়াছে। শঙ্কর নিজের গায়ের র‍্যাপারটা খুলিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। চেঁচামেচিতে যে দুই-চারিজন পাড়াব লোক বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ফুলশরিয়া একজন। শঙ্কর কাহারও দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। ফুলশরিয়া অবাক হইয়া গেল।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল, অমিয়াও তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া আছে। খুকিকে ঘাড়ের উপর শোয়াইয়া পায়চারি করিতেছে। আসন্নপ্রসবা সে, নিশ্চয়ই কষ্ট হইতেছে।

এখনও ঘুমোওনি?

খুকির পেটব্যথা করছে, কিছুতে ঘুমুচ্ছে না। পারুলের বাড়িতে পানফলটল খেলে কতকগুলো যা-তা—

শঙ্করের সাড়া পাইয়া খুকি মাথা তুলিল এবং ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, পেত ব্যাতা কত্তে।

এস আমার কাছে।

সমস্ত দিন একটিবারও আজ সে বাবাকে পায় নাই, একমুখ হাসিয়া ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল।

সুরমার মোহ স্বপ্নের মত ভাঙিয়া গেল।

সে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামিল, না মর্ত্য হইতে স্বর্গে উঠিল, বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে যখন উঠিল, তখন দেখিল, মনের আকাশ নির্মেঘ। কম্প দিয়া যে জ্বরটা সহসা আসিয়াছিল, তাহা সহসাই ছাড়িয়া গিয়াছে। মুশাই আসিয়া প্রবেশ করিল এবং অন্যদিনের মত টেবিল ঝাড়িতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই।

আঠাশ

'তুমি' অঘোরে ঘুমাইতেছে। বিনিদ্র নয়নে হাসি একা জাগিয়া আছে। ভাবিতেছে। রোজই ভাবে। ভাবে, কোথায় সে ভাসিয়া চলিয়াছে, কি তাহার জীবনের পরিণাম? বিহার পল্লীর একটা তুচ্ছ স্কুলের নগণ্য শিক্ষয়িত্রী রূপেই কি তাহার জীবনের অবসান হইবে? শঙ্করবাবুর আগ্রহাতিশয্যে সে আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে এতদিন কাটিয়াও গেল, ফল কী হইল। কিছুই না। শিক্ষার যে আদর্শ লইয়া সে আসিয়াছিল, সে আদর্শে মনের মত করিয়া একটা মেয়েকেও সে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না, শিখাইবার উপায় নাই। একপাল মেয়ে সাজিয়া গুজিয়া স্কুলে আসে যেন তাহারই মাথা কিনিবার জন্য। পড়াশোনায় কাহারও মন নাই। মেয়েদের অভিভাবকরাও এ বিষয়ে খুব সচেতন নন। দুই দিন পরে তো বিবাহ হইয়া যাইবে, লেখাপড়া কত আর শিখিবে! শঙ্করবাবুর খাতিরে, অনেকটা চক্ষুলজ্জাবশত, যেন তাঁহারা মেয়েদের স্কুলে পাঠান। খানিকটা ফ্যাশনের খাতিরেও বটে। আজকাল সভ্যসমাজে টর্চ, হাতকাটা কামিজ, বাটারফ্লাই গোঁফের মত মেয়েদের 'লিখাপঢ়ি' শেখানোটাও একটা ফ্যাশন হইয়াছে। 'ধাংগালি' বাবুরা তাঁহাদের 'লেড়কি'দের লেখাপড়া শিখাইতেছেন, তাঁহাদের লেড়কিরাও শিখুক যতটা পারে--- ক্ষতি কি? ইহাই অধিকাংশ লোকের মনোভাব। আমরাই বা কম কিসে, এ মনোভাবও কয়েকজন শিক্ষিত 'ফিলিংওয়ালা' বিহারির আছে। কিন্তু ওই ফিলিং-দুষ্ট মনোভাবটুকু আছে, যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে হইলে যে আগ্রহ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা নাই। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বাড়াইয়া ইনস্পেক্টরের কাছে বাহাদুরি লইবার জন্যই তাঁহারা ব্যগ্র। স্কুলকমিটির কে মেম্বার হইবে এবং মেম্বারদের মধ্যে কে সেক্রেটারি হইবে তাহা লইয়াই সকলে ঝগড়া করিয়া মরিতেছে আর এস ডি ও-র খোশামোদ করিতেছে। তাহারা যে স্কুল এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন, তাহা প্রমাণ করিবার একটিমাত্র উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, স্কুলের নানা খুঁত ধরিয়া গোপনে ইনস্পেক্টরের নিকট দরখাস্ত করা। খুঁতও সব অদ্ভুত ধরনের। সেদিন কে একজন লিখিয়াছে, বিদ্যালয়ের হাতায় ঘাস গজাইয়াছে, পরিষ্কার করানো হয় নাই, শিক্ষয়িত্রীর গাভীটিকে চরিবার সুবিধাদান করিবার জন্য কি স্কুলের হাতাটিকে জঙ্গলে পরিণত করা উচিত? মাসিক পনের টাকা কনটিনজেন্সির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য একজন মোক্তার মেম্বার বদ্ধপরিকর। খড়ি, কাগজ, কলম, দোয়াত নিব প্রত্যেকটি কবে কেনা হইয়াছে, কেন কেনা হইযাছে, নির্ভরযোগ্য রসিদ আছে কিনা, থাকিলেও এত ঘন ঘন কেনা হইয়াছে কেন--- এই সব লইয়া তিনি তাঁহার শাণিত আইনজ্ঞানের এমন সুতীব্র পরিচয় দিতেছেন যে হাসি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে ভাল বই আনাইবার উপায় নাই। বিহারি লেখকের লেখা বিহারি প্রকাশকের প্রকাশিত বই সর্বাগ্রে আনাইতে হইবে। তাহা কিনিতেই টাকা ফুরাইয়া যায়, ভাল বই কেনা হয় না। হাসি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বিরক্ত হইয়াছে, শুধু বিরক্ত নয়, অপমানিতও বোধ করিয়াছে তাহার প্রতি সকলের অনুকম্পা প্রদর্শনে। সকলের ভাবটা যেন, আহা, স্কুলটা চলুক, আর কিছু না হোক, একজন গরিব বিধবার অন্নসংস্থান হইতেছে তো, বেচারির একটা ছেলেও আছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য নয়, তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেও নয়, তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সকলে স্কুলটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। শিক্ষিত বিহারি মেম্বারগণ আবার আইনের কষ্টিপাথরে বারংবার যাচাই করিয়া দেখিতেছেন, মহিলাটি প্রকৃতই তাঁহাদের, অর্থাৎ বিহারিদের, দয়া পাইবার উপযুক্ত কিনা! 'পাবলিক মানি' লইয়া ছিনিমিনি খেলা তো উচিত নয়। খুঁত ধরা পড়িয়াছে, সে 'হিন্দি-নোইং' নয়। শঙ্করবাবু তাহাকে হিন্দি

পরীক্ষা পাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছে। পরীক্ষা পাস করা অসম্ভব নয়, কিন্তু সে পরীক্ষা দিবে না। এই তুচ্ছ কাজের জন্য সে আর একবিন্দু শক্তি ক্ষয় করিবে না। মৃন্ময়ের সহধর্মিণীর এই কী উপযুক্ত কাজ? তাহার সঙ্কল্প—মৃন্ময়ের সহধর্মিণী হইবে সে, মৃন্ময়ের আদর্শকেই জীবনে সফল করিয়া তুলিয়া ধরিবে। কি সে আদর্শ? ন্যায়ের সমর্থন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কী জীবনও। এই ত্যাগের স্বপ্ন দেখাইয়া সে এই অপরিচিত পল্লীগ্রামে, শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছিল। শঙ্কর তাহাকে বুঝাইয়াছিল, নারীত্বের যে লাঞ্ছনার প্রতিকার করিতে গিয়া মৃন্ময় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, সে লাঞ্ছনার সত্যকার প্রতিকার স্ত্রী-শিক্ষায়। এই স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে হাসি যদি সাহায্য করে, ইহার জন্য সে যদি সুখ সুবিধা স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলেই মৃন্ময়ের আত্মা তৃপ্ত হইবে। স্বার্থত্যাগ করিতেই হাসি আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে এতদিন কাটাইয়া সে অনুভব করিতেছে যে, দেশের সমস্ত জনসাধারণকে মনুষ্যত্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে অপমানিত নারীত্বকে উন্নত করা যায় না। শঙ্করবাবু একা কী করিবেন? গদাই দত্ত, নেকি মাড়োয়ারি, গুলাব সিং, প্রমথ ডাক্তার, সুখদেও মোক্তার যে স্কুলের পরিচালকবর্গ, হাজার স্বার্থত্যাগ করিয়াও সে স্কুলের কিছু করা যাইবে না। পাষাণ প্রাচীরে মাথা কুটিলে তাহা যদি ভাঙিয়া পড়িত, মাথা কুটিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু হাসি বুঝিয়াছে, মাথা কুটিয়া মাথা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেও এ অনড় প্রাচীর নড়িবে না, তাহার কাণ্ড দেখিয়া লোকে শুধু হাসিবে। শুধু স্কুল কমিটির দোষ নয়, গভর্নমেন্ট শিক্ষা বিভাগের আইনও প্রকৃত শিক্ষার অনুকূল নয়। ভিতরে 'পলিসি' আছে। হাসির স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার নামে কতকগুলো-বর্বরের খোশামোদ করা কি ত্যাগ? ইহাতে কি মহত্ত্ব আছে? ইহা তো ভণ্ডামির নামান্তর, ত্যাগের অজুহাতে নিজেকে খর্ব করিয়া নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে কোনোক্রমে বাঁচিয়া থাকা। ত্যাগ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ সে একদিনের জন্যও পায় নাই। সমস্ত অন্তর ভরিয়া কেবল গ্লানি, ক্ষোভ আর হতাশাই তো হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। সে কী করিবে, কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে শান্তি পাইবে? স্বার্থত্যাগ করিয়া, আত্মত্যাগ করিয়া, বৃহৎ একটা কিছু করিয়া স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য তাহার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া আছে, প্রয়োজন হইলে সে ছেলের দিকেও ফিরিয়া চাহিবে না। প্রতিদিন রাত্রে মৃত মৃন্ময়ের উদ্দেশে এই একই কথা সে রোজ লেখে, আজও লিখিয়াছে, আজও সে তাহাকে আশ্বাস দিয়াছে— তুমি অপেক্ষা কর, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমিও তোমার অনুপযুক্ত ছিলাম না যে সিংহাসনে স্বর্ণলতাকে বসাইয়াছিলে, সেখানে আমারও কিছু অধিকার আমি দাবি করিতে পারিতাম। কিন্তু কী করিয়া প্রমাণ করিব? কে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিবে, কে তাহাকে সেই মহাদেবীর মন্দিরে লইয়া যাইবে, যে মহাদেবীর পূজাবেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিলে অশান্ত হৃদয় শান্তিলাভ করে, অধন্য ধন্য হয়, অপূর্ণ পূর্ণতা লাভ করে? ধাত্রী পান্না, জোয়ান অব আর্ক যে পথে চলিয়াছিল, কোথায় সে পথ?

বিনিদ্র নয়নে হাসি ভাবিতেছিল। রোজই ভাবে।

উনত্রিশ

এই, নাও লে আও—

খেয়াঘাটের নৌকোটা ঘাট ছাড়িয়া প্রায় নদীর মাঝামাঝি চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে নটবর ডাক্তার নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য সময় হইলে জানকি মাঝি

অবিলম্বে নৌকা তীরে ভিড়াইয়া নটবর ডাক্তারকে তুলিয়া লইত, আজ কিন্তু সে একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। প্রথমত, নৌকায় নেকি মাড়োয়ারির একটা 'বরিয়াত' রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, রহিয়াছেন স্বয়ং দারোগা সাহেব। উহাদের মধ্যে কাহাকেও চটানো গরিব জান্‌কির পক্ষে শক্ত। নেকি মাড়োয়ারির কাছে আপদে বিপদে হাত পাতিতে হয় তা ছাড়া সুশৃঙ্খলায় 'বরিয়াত'টা পার করিয়া দিলে হয়ত কিছু বকশিশও আজ মিলিতে পারে। আর দারোগা সাহেব তো স্বয়ং সম্রাটেরই প্রতিনিধি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা রাজদ্রোহেরই সামিল। অথচ নটুটুবাবুকে ফেলিয়া যাওয়াও যে অসম্ভব। গরিবের 'মাই-বাপ' তিনি। জান্‌কি বেচারা একটু বিপদে পড়িয়া গেল। অনুমতির প্রত্যাশায় সে একবার নেকি মাড়োয়ারির দিকে, একবার দারোগা সাহেবের দিকে চাহিল। নেকি মাড়োয়ারি চতুর লোক, সহসা 'হাঁ', 'না' কিছুই বলিল না। দারোগাজির সহিত নটবর ডাক্তারের ঠিক কী সম্পর্ক আছে, জানা তো নাই, চট করিয়া কিছু একটা বলিয়া শেষে ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবার মত বোকা লোক সে নয়। তাহার স্থূলকায় পুত্র 'কানাইয়া' চোখ পাকাইয়া জান্‌কিকে নৌকা ভিড়াইতে মানা করিতে যাইতেছিল, নেকি গোপনে পুত্রের গা টিপিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। নেকি মাড়োয়ারির মনের ইচ্ছাটা অবশ্য নটবর ডাক্তারকে না লওয়া, লোকটা ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকোতে উঠিবে, বরিয়াত জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বমুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার মত সাহস সে সংগ্রহ করিতে পারিল না। দারোগা সাহেব কী বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সোৎসুক বিপন্ন দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দারোগা সাহেব ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিলেন।

চলো তুম্। ডাক্টরবাবু দেরি করকে আয়েহেঁ, পিছে যায়েঙ্গে।

এই, নাও ঘুরাও—

বজ্রনির্ঘোষে নটবর অবার হাঁক দিলেন।

জান্‌কি লগি ঠেলিতে ঠেলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ডাক্তারবাবুর পাহাড়ি ঘোড়াটা ঘাটে অধীরভাবে পরিক্রমণ করিতেছে। ঘোড়াটা দেখিয়া সহসা জান্‌কির মনে দুই বৎসর আগেকার একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল! অন্ধকার গভীর রাত্রি, আকাশে ঘনঘটা, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে, ঝড় উঠিয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। দুর্যোগ মাথায় করিয়া দুর্গম পথে এই পাহাড়ি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া নটবর ডাক্তার ছুটিয়া চলিয়াছেন—তাহারই বাড়ির উদ্দেশে চলিয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র জ্বরে অচৈতন্য। গরিব শুনিয়া হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিতে রাজি হন নাই, কবিরাজজিও আসিলেন না। নুটুটুবাবু কিন্তু শুনিবামাত্র ঘোড়ার সওয়ার হইলেন, 'ঝড়-ঝাপটি' কিছু মানিলেন না আসিয়া বিনাপয়সায় 'জকসন' দিলেন, ঔষধ খাওয়াইলেন— ছেলে তাহার বাঁচিয়া গেল।

আরে, নাও ঘুরাতা হ্যায় কাহে ফের?

জান্‌কি আইনসঙ্গত অজুহাত একটা খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, নৌকায় জল জমিয়া গিয়াছে, জল তুলিবার পাত্রটা সে ঘাটে ফেলিয়া আসিয়াছে, সেটা না লইলে যদি জল বেশি জমিয়া যায় মাঝ-দরিয়ায় তাহা হইলে—। কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না। নেকি শশব্যস্ত হইয়া বলিল, নেই নেই, লে লেও ভাই, দো-পাঁচ মিনিটকে কেয়া হর্‌জা হোয়েগা।

দারোগা সাহেব কিছু বলিলেন না। স্বল্পভাষী লোক তিনি। নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। নটবর ডাক্তার ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া নৌকায় উঠিলেন এবং জান্‌কিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ক্যা রে, কানমে আজকাল কম শুনতা হ্যায়? জান্‌কি একটু কুণ্ঠিত হাসি

হাসিল। নৌকায় চড়িয়াও ঘোড়ার পিঠ হইতে নটবর নামিলেন না। জান্‌কি জল তুলিবার পাত্রটা লইয়া আসিল।

রাম রাম ডাক্‌টারবাবু।

দন্ত বিকশিত করিয়া নেকি মাড়োয়ারি অভিবাদন করিল।

রাম রাম, শেঠজির খবর কি, ছেলের বিয়ে নাকি?

আপলোককা কিরপা।

দারোগা সাহেবও নটবরকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতি-নমস্কারান্তে নটবর বলিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হল, আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। হরিয়াটার নামে কি আপনি বি এল কেস করেছেন?

হ্যাঁ। ও ব্যাটা তো একের নম্বর লুচ্চা গুণ্ডা। শঙ্করবাবু জামিন হ'য়ে ছড়িয়ে দিলেন, তা না হলে ওই থেফ্‌ট চার্জেই ফাঁসাতাম ওকে।

নটবর ডাক্তারের ভ্রূকুঞ্চিত হইল এবং অনেকক্ষণ কুঞ্চিত হইয়াই রহিল।

বি এল কেস প্রমাণ করতে পারবেন ওর বিরুদ্ধে?

নিশ্চয়।

দারোগাবাবুর আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া নটবর মনে মনে হাসিলেন চক্ষুদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। চোখের দৃষ্টি যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ও বাবা! হরিয়াটা কাল তাঁহার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। যদিও নবাগত দারোগা সাহেবের সঙ্গে তেমন আলাপ নাই, তবু ভাবছিলেন, তাঁহাকে একবার বলিলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে বোধ হয়। এখন দেখিতেছেন, লোকটির কর্তব্যজ্ঞান বেশ টনটনে। এ ধরনের জীবরা ভদ্রলোকের মর্যাদা বোঝে না; ইহাদের কাছে কোনো অনুরোধ করা বৃথা। আর কিছু বলিলেন না, ঘাড় ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একটু হাসিও পাইল। হরিয়া লুচ্চা এবং গুণ্ডা! সুচ এবং চালুনির গল্পটা মনে পড়িল।

ত্রিশ

উত্তেজিতভাবে নিপুদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমাকে তুমি মিছিমিছি আটকে রাখলে শঙ্কর, এখানে কোনো কাজ করা অসম্ভব।

আবার কি হল?

রামলাল পড়বে না।

কেন?

বহুমাইজি মানা করেছে।

নিপুদা ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল।

বহুমাইজি মানে কুন্তলা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার কে? এম এ পাস করলে কি হবে, সেকেলে বুর্জোয়া সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনও। হাজার হোক বামুনের মেয়ে তো, কামারের ছেলে লেখাপড়া শিখছে—বরদাস্ত করতে পারছেন না সেটা।

নিপুদা কায়স্থসন্তান, ব্রাহ্মণদের উপর ভীষণ রাগ, সুযোগ পাইলে ছোবল দিতে ছাড়েন না। নিপুদার কথায় ব্রাহ্মণ সন্তান শঙ্করের কান ঈষৎ গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছু বলিল না সে।

নিপুদার চালচলন কথাবার্তা কিছুই তাহার ভাল লাগে না, তবু তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই। তাহার সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ একরূপ খোশামোদ করিয়াই আবার তাহাকে রাখিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে, নিপুদা না থাকিলে অনুন্নতদের উন্নত করিবার ভার কে লইবে? পল্লী উন্নয়নের উহাই যে একটা প্রধান অঙ্গ। নিপুদার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না। এ পল্লীগ্রামে কেহ আসিতেই চাহিবে না। আসলে অসহায় নিপুদার প্রতি অনুকম্পাবশতই যে তাহাকে সে যাইতে দেয় নাই, এ কথা নিজের কাছেও শঙ্কর স্বীকার করিতে চায় না। নিপুদা সত্যই উপযুক্ত লোক, অভাবের চাপেই মনটা বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোক যে তাহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা যুক্তি দিয়া নিজের মনকে বুঝাইয়াছে সে, দেশের স্বার্থের জন্যই নিপুদার থাকা প্রয়োজন। যদি মন দিয়া কাজ করেন, সত্যই অনুন্নত শ্রেণীর অনেক উপকার হইবে। ডোমপাড়ার নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পাঠশালা খাড়া তো করিয়াছেন। অনুন্নতদের উন্নত করিতে না পারিলে যে দেশের উন্নতি অসম্ভব, তাহা শঙ্করের অনেক দিনের বদ্ধমূল ধারণা। তাহাদের জন্যই সে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা করিয়াছে। স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাদের বাসস্থানের চতুর্দিক পরিষ্কার করাইয়াছে, ভ্যাকসিন দেওয়াইবার জন্য কুইনিন বিতরণ করিবার জন্য চৌধুরীকে নিযুক্ত করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর একটি বালকের জন্য বৃত্তি স্থাপনও করিয়াছে: কামার কুমোর তেলি অথবা নিম্নতর কোনো বর্ণের বালক যদি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে এম এ পর্যন্ত পড়িবার খরচ উৎপলের এস্টেট হইতে দেওয়া হইবে। বালকটির সহিত একটি শর্ত থাকিবে কেবল উপার্জনক্ষম হইলে টাকাটা তাহাকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে, সেই টাকায় ভবিষ্যতে যাহাতে আর একটি ছেলের পড়া হয়। নিম্নশ্রেণীর কোনো বালক এতদিন ম্যাট্রিকুলেশন দিবে, পাস করিতে পারিবে কি না তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু তবু সে নিপুদা কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া 'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া বৃত্তিটি দাবি করিয়াছে। নিপুদার উদ্দেশ্য, ক্যাপিটালিস্ট উৎপল সত্য সত্যই টাকাটা দেয় কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখা এবং উৎপল সত্যই যদি টাকাটা দিয়া ফেলে (সে বিষয়ে নিপুদার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল), তাহা হইলে তাহা লইয়া ছোটলোকমহলে নিজের বেশ একটা প্রতিপত্তি বিস্তার করা। উৎপল বিনা দ্বিধায় রামলালের দাবি মঞ্জুর করিয়াছে। সমস্তই ঠিকঠাক, এমন সময়ে এক অপ্রত্যাশিত বাধা আসিয়া উপস্থিত। রামলালের পিতা ঝকসু হঠাৎ বাঁকিয়া বসিয়াছে! পুত্রকে সে আর 'অংরেজি' পড়াইবে না, বহুমাইজি বারণ করিয়াছেন। বহুমাইজির কথা তাহার নিকট বেদবাক্য।

কুন্তলার এই বিরুদ্ধতায় শঙ্কর বিস্ময় বোধ করিল। শিক্ষিত মহিলার নিকট এ আচরণ সে প্রত্যাশা করে নাই।

কুন্তলা মানা করলে? কেন বুঝতে পারছি না তো!

আমিও প্রথমটা পারিনি, তাই জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম।

কী বললে?

দেখা পর্যন্ত করলে না আমার সঙ্গে হে।

নিপুদার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

ভাবলে বোধ হয়, যেহেতু আমি এম এ পাস নই, সেই হেতু ওর সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করবারও যোগ্য নই। দি ইন্‌সোলেন্ট স্মার্ট—

ইংরেজি গালাগালিটা অর্ধস্বগত উচ্চারণ করিয়া নিপুদা চুপ করিল এবং যেমন তাহার স্বভাব, মুখে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। কুন্তলার সম্বন্ধে নিপুদার

অপমানসূচক ভাষাটা শঙ্করের নিজের আত্মসম্মানকেই যেন আঘাত করিল। কিন্তু তবু সে কিছু বলিতে পারিল না। কুন্তলার সপক্ষে কোনো যুক্তিই সে খুঁজিয়া পাইল না। নিপুদার সহিত সে কলহ করিতে চায় না, পল্লী উন্নয়নের বিঘ্ন হিসাবে কুন্তলার এই আচরণ তাহার নিকট বিরক্তিকর, তবু তাহার ভদ্র মন তাহার অজ্ঞাতসারেই কুন্তলার সপক্ষে একটা যুক্তি আহরণ করিতে ব্যস্ত হইল। নিপুদাকে মুখের মত একটা জবাব দিতে পারিলে সে যেন আরাম বোধ করিত। লোকটা ভারি অভদ্র। কিন্তু কুন্তলা—

কি ভাবছ? ওঠ, চল, যাওয়া যাক।

কোথা?

ঝক্‌সুর কাছে। তাকে রাজি করাতে হবে। যদি নেহাত রাজি না হয়, তা হলে রামলালকে তার বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব। ও যদি পাস করতে পারে, ওকে কলেজে ভর্তি করবই আমরা, দেখি, কে আটকায়!

সেটা কি ঠিক হবে, মানে— বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাটা?

তুমি তোমার প্রিন্সিপ্‌লের খাতিরে বাপের বিরুদ্ধে যাওনি? রাশিয়াতে অ্যান্টি-রিভলিউশনারি বাপ-মাকে হরদম বর্জন করছে সেখানকার ছেলেমেয়েরা এবং বায়োলজিক্যালি— আত্মরক্ষার জন্য তা করা ছাড়া উপায় নেই।

সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের সহিত কথাগুলি বলিয়া নিপুদা হাসিল।

শঙ্কর আর থাকিতে পারিল না।

আত্মরক্ষা মানে?

আত্মরক্ষা মানে আত্মরক্ষা, আবার কি?

কার আত্মরক্ষা? আমাদের না রামলালদের?

আমাদের সকলের।

বলশেভিক রাশিয়ায় কিন্তু সকলে রক্ষা পায়নি। 'কুলাক' এবং 'নেপ্‌ম্যান'দের দুর্গতির অন্ত ছিল না সেখানে। এখানেও যদি সবাই বলশেভিক হয়ে ওঠে, আপনি আমি বাঁচব না। বলশেভিক শাস্ত্রমতে— আমরা শোষকের দলে। বায়োলজিক্যালি আত্মরক্ষা করতে হলে রামলালদের বাড়তে না দেওয়াই উচিত। সে হিসাবে কুন্তলাদেবীর যুক্তি ঠিক।

কুন্তলাদেবীর যুক্তি স্বার্থপর পশুর যুক্তি!

বায়োলজিতে পরার্থ বলে কিছু নেই, স্বার্থই সেখানে মূলমন্ত্র।

মানলাম। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান দিতে হবে।

মানে সোজা ভাষায় আমার স্বার্থ, আপনার স্বার্থ, আমাদের বংশধরদের স্বার্থ সব বলিদান দিতে হবে। শ্রমিকদের বড় করে নিজেদের অবলুপ্ত করে ফেলতে হবে।

বাঁকা হাসি হাসিয়া নিপুদা বলিল, একদিন তা হবেই। শ্রমিকদের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গত্যন্তর থাকবে না যখন, তখন নেব। আগে থাকতে যেচে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি কেন?

যুক্তির পথে না গিয়া নিপুদা চটিয়া উঠিল।

তা হলে কী বুঝতে হবে তুমিও কুন্তলার দলে? তোমার এ পল্লী উন্নয়ন টন্নয়ন একটা 'শো' মাত্র। আমাকে তা হলে মিছামিছি কেন—

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, আহা, চটছেন কেন? ব্যাপারটা বায়োলজির দিক থেকে ভেবে দেখছি একটু, সেদিন যেমন দেখছিলাম।

এ বায়োলজি নয়, এ তোমার কবিত্ব।

আর একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল কবিত্বই তো সত্য নিপুদা। ডারউইনও কবি ছিলেন Struggle for existence, survival of the fittest — আসলে বোধহয় কাব্যকথাই। আমরা কি নিজেদের এক্জিসটেন্সের জন্যে স্ট্রাগল করছি? যদি নিছক পশু প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হতাম, তা হলে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবার জন্যে এমন করে উঠে-পড়ে লাগতাম না। এটা ঠিক জানবেন, যাদের জাগাবার আমরা চেষ্টা করছি, তারা জাগলে আমরা কেউ বাঁচব না। বৃহত্তর মানব সমাজ হয়ত রক্ষা পাবে—

তুমি ঝক্সুর ওখানে যাবে, না বাজে তর্ক করবে বসে বসে?

চলুন।

উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। পরিহাস ছলে তর্ক করিতে গিয়া শঙ্কর যেন একটা সত্য আবিষ্কার করিল এবং মনে মনে চমৎকৃত হইয়া গেল। বায়োলজির দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে পতিতোদ্ধারের চেষ্টা করা, মানে সত্যই তো আত্মবিলোপের আয়োজন করা। কোনো জীব কী সজ্ঞানে আত্মবিলোপের আয়োজন করে? বায়োলজিক্যালি রামলালদের হয়ত উপকার হইবে, কিন্তু আমরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি কিসের প্রেরণায়? আমরা তো উহাদের চোখ ফুটাইতেছি। নিজেদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত জানিয়াও কিসের প্রেরণায় আমরা নিজেদের মারণাস্ত্র উহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি? ইহা জৈবিক নয়, ইহা জীবোত্তর প্রেরণা, ইহাই মনুষ্যত্ব, ইহাই মহত্ত্ব। এই প্রেরণাবশেই দধীচি বজ্র নির্মাণের জন্য নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ আত্মনিধনযজ্ঞে পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নিজের কল্পনায় মশগুল হইয়া শঙ্কর পথ চলিতে লাগিল।

হুঃ, ক্যাপিটালিস্টদের লেখা কতকগুলো বাজে প্রোপাগান্ডা প'ড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

নিপুদা খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল এবং আড়চোখে শঙ্করের দিকে চাহিল। শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না। তাহার মন তখন আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

মুখময় বসন্তের দাগ, কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া গোঁফ, কালোরঙ, একমাথা অবিন্যস্ত চুল, বিরাটকায় ঝক্সু বিশাল হাতুড়িটা তুলিয়া চতুর্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করিতে করিতে তপ্ত লোহা পিটিতেছিল। শঙ্করের শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ক বক্তৃতা অথবা নিপুদার কমিউনিস্টিক বচন সে শুনিতেছিল কিনা, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা শক্ত। রামলালও একটু দূরে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাইতেছিল এবং সব শুনিতেছিল। শঙ্করের এবং নিপুদার বক্তব্য যখন শেষ হইয়া গেল, তখনও ঝক্সু কিছু বলিল না, লোহাই পিটিতে লাগিল!

কি রে, কিছু বলছিস না যে? তোর এক পয়সা খরচ লাগবে না, খরচ যা লাগে, আমরাই দেব সব।

হাতুড়ি পেটা বন্ধ করিয়া বাম হাত দিয়া ঝক্সু মাথার ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঠাকুর বাবার শিষ্যকে ইহারা পয়সার লোভ দেখাইতে আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে সে অবশ্য মুখে কিছু বলিল না। গলা খাঁকারি দিয়া বাক্যন্ত্রটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া সংক্ষেপে কেবল বলিল, বহুমাইজিকা বাতো সে হাম্ বাহার নেই হোবে পারব, অংরেজি উ আর নেহি পঢ়তে।

ওই এক বুলি ধরেছে।

নিপুদা হতাশভাবে হাত উল্টাইল।

অংরেজি পড়তে দোষটা কি?— শঙ্কর প্রশ্ন করিল।

ঝক্‌সু হাতুড়ি তুলিয়া কাজ শুরু করিতে যাইতেছিল, এই কথায় হাতুড়ি নামাইয়া রামলালের দিকে নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুটা প্রসারিত করিয়া সক্ষোভে বলিল, অংরেজি পঢ়ি কর্‌ শালারো হালত্‌ কি ভোলোছে দেখো, তো আপন আঁখিসে দেখো।

পুত্রকে শালা সম্বোধন করাতে নিপুদা শঙ্করের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। শঙ্কর হাসিতে সায় দিল না, রামলালের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। রামলালকে সে ইতিপূর্বে বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু এই পারিপার্শ্বিকে সে যেন রামলালকে নবরূপে আবিষ্কার করিল। এই ঝকসুর পুত্র এই রামলাল! লিক্‌লিকে চেহারা, দশ আনা-ছ আনা চুল ছাঁটা, গায়ে শৌখিন কামিজ, গলায় রেশমের গলাবন্ধ, পায়ে গ্রিসিয়ান স্লিপার, গোঁফ কামানো। তাহাদের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। পুরুষ নয়, যেন মেয়েমানুষ! একটা বটের চারা অস্বাভাবিক আওতায় পড়িয়া কেমন যেন লতানে-গোছের হইয়া গিয়াছে।

হোপলেস্‌! চল, হরিহরবাবুর কাছে যাওয়া যাক, এর কাছে বকবক করে কোনো লাভ নেই। কী হে, গুম মেরে গেলে যে?

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না। ঝক্‌সু আবার লোহা পিটিতে শুরু করিয়াছিল। বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মনে হইতেছিল, আমরা ভুল পথে চলিতেছি না তো?

একত্রিশ

সমস্ত রাত শঙ্করের ঘুম হয় নাই। নিপুদা, কুন্তলা, ঝক্‌সু, রামলাল, সুরমা, উৎপল— সকলের সম্মিলিত প্রভাব একটা পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল। সে যেন স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও লইতে পারিতেছিল না। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া সবশেষে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। কমানো বাতিটার স্বল্পালোকে চোখে পড়িল, অমিয়া এবং খুকি অঘোরে ঘুমাইতেছে। খুকির গায়ে লেপ নাই, অমিয়ার খোঁপাটা এলাইয়া পড়িয়াছে। খুকির গায়ের লেপটা সন্তর্পণে ঠিক করিয়া দিয়া সে মশারি হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় আসিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ যে রূপকথার রাজ্য। তাহারই ঘরের বারান্দায় এই অপরূপ স্বপ্ন কতক্ষণ হইতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। মেঘচাপা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় চতুর্দিক স্বপ্নাকুল। কিছু দূরে রাস্তায় যে অস্ফুট কলরব উঠিতেছিল, তাহা তাহার জ্যোৎস্না-অভিভূত মন প্রথমটা শুনিতেই পাইল না। একটু পরেই কিন্তু পাইল এবং উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কিসের কলরব? রাস্তায় ভিড় কিসের? বারান্দা হইতে নামিয়া দেখিল দলে দলে লোক চলিয়াছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ মাঘীপূর্ণিমা। গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়াছে সব। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড উৎসব আজ। মেলা বসিবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তীব্র হাওয়া উঠিয়াছে একটা, মাঘের কনকনে শীত। কিন্তু কিছুই ইহাদের নিরস্ত করিতে পারে নাই। দলে দলে চলিয়াছে সব। দূরদূরান্ত হইতে আসিয়াছে। মাঝে মাঝে 'টপ্‌পর' দেওয়া গরুর গাড়ি, তাহাতেও লোক ঠাসা। কী উৎসাহ! মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের উচ্চহাস্য শোনা যাইতেছে, মাঝে মাঝে শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনও। 'জয় গঙ্গামায়ী কি জয়' বলিয়া এক একটা দল মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিতেছে, কেহ ভজন গাহিতেছে, দেশি ঢোল খঞ্জনি বাজাইয়া কেহ কীর্তন ধরিয়াছে। মেঘ-মেদুর জ্যোৎস্নায় শঙ্কর স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইতেছিল না, কিন্তু

সে অনুভব করিতেছিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চলিয়াছে আজ। অন্ধ-খঞ্জ, সুস্থ-অসুস্থ, ধনী দরিদ্র, কৃপণ-দাতা, চোর-সাধু, পাপী-পুণ্যবান কেহ বাদ নাই। তাহার মনে হইল, আমাদের মত 'কাল্‌চার্ড' কুসংস্কারমুক্ত ইংরেজিপড়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সকলেই আজ গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। কিসের টানে চলিয়াছে? কোন্ অদৃশ্য আইন ইহাদের এই শীতের ভোরে হাঁটিতে বাধ্য করিতেছে? পুণ্যের লোভ? পরলোকের সদ্‌গতি? সে কিন্তু লোভ দেখাইয়া ইহাদের সৎপথে আনিতে পারিতেছে না তো! পাশ করিলে চাকরি পাইবে, হাকিম হইবে— এসব লোভ দেখান সত্ত্বেও, তাহার অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র কই জুটিল! আর একটা ঘটনাও মনে পড়িয়া গেল। রাজীব দত্ত একবার মাতৃশ্রাদ্ধে গরিব-দুঃখীদের পোলাও খাওয়াইবেন বলিয়া ট্যাঁটরা দিয়াছিলেন। কয়েকজন অস্পৃশ্য ভিখারিছাড়া তেমন বেশি লোক জোটে নাই! এই নিরন্ন বুভুক্ষু দেশে পোলাও খাইবার লোভে দলে দলে লোক ছুটিয়া গেল না তো! রাজীব দত্তের ট্যাঁটরা দিয়া পোলাও খাওয়ানোর অশোভন অহমিকাকে এ দেশের গরিব দুঃখীরাও প্রশ্রয় দিল না। না না, ঠিক লোভ নয়। বিশ্বাস, তৃপ্তি, নিগূঢ় সংস্কার বা ওই জাতীয় একটা কিছু ইহাদের অন্তরে এখনও আছে, যাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারা যাহা বিশ্বাস করে, আমাদের তাহাতে বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাসের জোরে ইহারা বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসবে মাতিয়া উঠিতে পারে, আমরা পারি না, নিরুৎসবে আমরা নাক সিঁটকাইয়া দূরে বসিয়া থাকি। মনে করি, যদি এই অসভ্যগুলোকে ধরিয়া সাবান পাউডার মাখাইয়া ফিটফাট কেতা-দুরস্ত করিয়া মুখে বিদেশি বুলি এবং মনে বিলাতি সভ্যতার বড়টা ধরাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই বুঝি ইহারা শান্তি পাইবে। কিন্তু তাহাতে ইহারা বোধ হয় শান্তি পায় না। আমরাই কি পাইয়াছি? শীতের ভোরে খালি পায়ে হাঁটিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিয়াই বোধ হয় ইহারা শান্তি পায়। প্রত্যুষের অস্ফুট আলোকে তীর্থযাত্রী এই জনস্রোতের দিকে শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, সে যেন বিদেশি, ইহাদের চেনে না, ইহাদের সহিত কোনো সম্পর্ক যেন তাহার নাই।

এই বিদেশির জন্যই কিন্তু যমুনিয়া লুকাইয়া মুকুন্দ পোদ্দারের দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং কিছু টাকা কর্জ করিয়া 'ঝানডা' উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। বাজু জোড়া বাঁধা দিতে হইল। কিন্তু উপায় কি, মানত শোধ করিতে হইবে তো। মানত শোধের জন্য এত খরচ অবশ্য না করিলেও চলিত, কম পূজা দিলেও 'দেওতা' অসন্তুষ্ট হইতেন না; কিন্তু শঙ্করবাবুকে ভাল মাংস খাওয়াইবার সাধ তাহার অনেক দিন হইতে। সেদিন এক কথায় অমন একটা দামি পশমি দোশালা তাহাকে দিয়া দিলেন। সামান্য কিছু একটু প্রতিদান না দিলে কি ভাল দেখায়। সুতরাং মাঘীপূর্ণিমার দিন 'দেও' স্থানে 'ঝানডা' উঠাইবার অজুহাতে সে একটা পাঁঠা এবং পাঁচটা কবুতর চড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মেথরপাড়ার এই 'দেও'-স্থানটি বড় জাগ্রত স্থান। ডাইনির 'আঁখ লাগিয়া' কেহ যদি অসুস্থ হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি যদি কাহারও না সারে, কাহারও যদি বারবার ছেলে হইয়া মরিয়া যায়, বিদেশে পুত্রের সংবাদ না পাইয়া যদি ব্যাকুল হয়, এই 'দেও'স্থানে আসিয়া সে মানত করে মাঘীপূর্ণিমার পূজা চড়ায়। বিষুণের অনেক দিন কোনো খবর নাই, কলকাতায় যে সে গিয়াছে আর আসে নাই। চিঠিও লেখে না। চিঠি লিখিলে উত্তরও আসে না। ছেলের জন্যই যমুনিয়া মানত করিয়াছিল। মুশাই আপত্তি করে নাই, বরং খুশিই হইয়াছিল। অন্য কোনো কারণে নয়, ন্যায়সঙ্গতভাবে মদ খাইতে পারা যাইবে বলিয়া। আজ যমুনিয়া আপত্তি করিবে না। একটা বিষয়ে সে কিন্তু যমুনিয়াকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, ধারের কথা

বাবু যেন না জানিতে পারে। ইহা লইয়া বাবু যদি তাহাকে 'বকঝক' করে তাহা হইলে কিন্তু মারিয়া ধুনিয়া দিবে। যমুনিয়াও ধারের ব্যাপারটা যথাসাধ্য গোপন রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

বত্রিশ

পরম শ্রদ্ধাবিষ্ট কণ্ঠে হরিহর জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সম্মুখে মন্ত্রপাঠ করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন—

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তী চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্র-পরিধানাং বালার্কসদৃশী তনুম্
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাম্ ভবসুন্দরীম্
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্
রত্ন-দ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভব-গেহিনীম্।

ধ্যানান্তে ভক্তিভরে তিনি প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ প্রণত হইয়াই রহিলেন এবং মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, ত্রিভুবণ-পালিনি, জগজ্জননী, সকলের মঙ্গল কর মা, সকলকে শান্তি দাও। সকলের জন্যই প্রার্থনা করিলেন তিনি, কেবল নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হইল। কিন্তু নিজের জন্যও প্রার্থনাব প্রয়োজন ছিল তাঁহার। কিছুদিন হইতে তিনি কেমন যেন একটা অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন। অশান্তিটা যে ঠিক কি এবং কেন, তাহাও তাঁহার অগোচর ছিল। স্পষ্ট কোনো কারণ তো চোখে পড়ে না! তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি, অস্পষ্ট কিসের যেন একটা ছায়া তাঁহার মনের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছিল। কিসের একটা অভাব যেন তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন। এই অভাব বোধটা কি কুন্তলাকে কেন্দ্র করিয়াই? মাঝে মাঝে এ কথা তাঁহার মনে হয়, আবার তখনই ভাবেন না, কুন্তলাব আচরণ তো নিখুঁত। তাহার পতিভক্তি, গৃহকর্ম-নিপুণতা, দেবসেবা, কর্মশৃঙ্খলা সমস্তই তো অনিন্দনীয়। কেবল সে বড় বেশি গম্ভীর এবং আন্তরিক। একবার যাহা ভাল বলিয়া মনে করিবে, প্রাণপণে তাহা করিবেই। কলেজে পড়া মেয়ে একটু যদি বিলাসিতা করিতই, কী এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? তাঁহার জন্যই হয়ত সে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে, এ সন্দেহ মাঝে মাঝে মনে জাগে এবং জাগিলেই তাঁহাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাঁহার জন্য কেহ কষ্ট পাইতেছে, এ চিন্তা অতিশয় পীড়াদায়ক। তাঁহার জন্য কি কুন্তলা কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে? জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। তুমি বিলাসী হও, এ কথাও মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। অথচ..। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এতটা সনাতন মনোবৃত্তি কি ভাল? কে জানে। রামলাল যদি ম্যাট্রিক পাস করিয়া জমিদারের খরচে আই এ পড়িত, কি এমন ক্ষতি ছিল তাহাতে? ইহা লইয়া অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। নিপুবাবু সেদিন যা মুখে আসিল বলিয়া গেলেন। কি দরকার ছিল এসবের? কুন্তলা কিন্তু কিছুতেই নিজের মত পরিবর্তন করিবে না। ঝক্সুও কুন্তলার মতের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাইবে না। কুন্তলা যাহা বলিতেছে এক হিসাবে তাহা ঠিক। সংস্কৃত লজিক মুখস্ত করিয়া অবশেষে একটা অকর্মণ্য জীবে পরিণত হওয়া অপেক্ষা কুলকর্ম করাই রামলালের

পক্ষে শ্রেয়...। কিন্তু কি দরকার আমাদের এসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়ার? জগদ্ধাত্রীর চরণাশ্রয়ে যে শান্ত শুদ্ধ আনন্দিত জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এ সবের কোনো স্থান ছিল না এতদিন। সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া সকলেই স্বীয় নিয়তিনির্ধারিত পথে চলিতে দেওয়াই বিবেকসম্মত মনে হইত। কিন্তু কুন্তলাও হয়ত নিজের বিবেককেই অনুসরণ করিতেছে। স্বামীত্বের জোরে তাহাকে বাধা দিতে যাওয়াটাও কি ঠিক? তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে তাঁহার নিজেরও একটা খটকা লাগিয়াছে। সকলেই স্বীয়-নিয়তি-নির্ধারিত পথে চলিতেছে— এই বলিয়া নির্বিকারভাবে বসিয়া থাকা কি ব্রাহ্মণোচিত? শস্যশামলা দেশ আমাদের শ্মশান হইয়া উঠিল যে! সবই নিয়তি-নির্ধারিত? অসংখ্য লোকের অসংখ্য দুর্দশা এবং নিজেদের ক্লীবত্ব মনকে পীড়িত করিয়া তোলে। ভিখারির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমার কী করিবার আছে, আমি কি করিতে পারি— বলিয়া বসিয়া থাকা কি উচিত? পুনরায় তিনি জগদ্ধাত্রী-চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, জগদ্ধাত্রী জননী, সকলের মঙ্গল কর মা, সকলকে শান্তি দাও।

প্রণামান্তে বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, কাঠেরপা-পরা সেই ভিখারিটা দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্গে একটি শিশু। প্রাণপণে কী একটি জানোয়ারের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। গলা একেবারে বসিয়া গিয়াছে। বড় ছেলেটা মহিষের ডাক ডাকিবার চেষ্টা করিল। কিছুই হইল না! এখনও ভাল শিখিতে পারে নাই।

হরিহর ভিতরে ঢুকিয়া চাল-কলা-ফল যাহা কিছু সব বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। ঝমরু চলিয়া গেল, হরিহর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তেত্রিশ

শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সম্বন্ধে সুরমা অচেতন ছিল না। নিগূঢ় উপায়ে সে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল। বুঝিতে পারিয়াও কিন্তু নিজের সহজ আচরণকে সে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বিশেষ বিব্রত বা কুণ্ঠিত সে হয় নাই। অন্তরের অন্তস্তলে সে বরং একটি সূক্ষ্ম গর্বই অনুভব করিতেছিল। অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই সে এই মুগ্ধ ভৃঙ্গটিকে মনে মনে যে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহা সতীসুলভ নহে, বিস্ময়িনী-সুলভ। কিন্তু তাই বলিয়া বিগলিত কিংবা বিচলিত সে হয় নাই। বাক্যে বা আচরণে এমন কিছুই সে প্রকাশ করে নাই, যাহা অশোভন। সে যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাও তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার সুমার্জিত ব্যবহারের স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় একটুকু ছন্দপতন হয় নাই, তাহা ঠিক আগের মতই সংযত অথচ অনাড়ষ্ট ছিল। কিন্তু শঙ্করের স্পন্দিত হৃদয়ের উন্মুখ প্রণয়োৎকণ্ঠায় তাহার মনের নিভৃততম প্রদেশে যে সূক্ষ্ম আনন্দ অদৃশ্য পুষ্পসুরভির মত সঞ্চারিত হইতেছিল তাহাতে সে ঈষৎ আবিষ্ট হইয়াছিল বইকি। কিন্তু সে মনে মনে বর্মাবৃতও হইতেছিল। ধরা দেওয়া হইবে না, লঘু ললিত-গতিতে স্থূলতাকে এড়াইতে হইবে, এমন আচরণ করিতে হইবে, যাহাতে এই তথাকথিত প্রণয়-আকুতি কথা প্রেমালাপের ইতরতায় পরিণত হইবার সুযোগ না পায়। নেপথ্য মানস-বিলাসকে নেপথ্যেই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু স্থূলতা এড়াইবার এই চেষ্টাও আবার স্থূলভাবে প্রকট হইয়া না পড়ে, সে দিকেও তাহার সতর্কদৃষ্টি ছিল। নিজের কৃতিত্ব মনে মনে উপভোগ করিতে করিতে নিপুণা সার্কাস-অভিনেত্রী যেমন ছাতা হাতে সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, সুরমাও মনে মনে অনেকটা সেই জাতীয় ক্রীড়ায় লিপ্ত ছিল।

একটু তফাত অবশ্য ছিল। মানসলোকের প্রত্যন্তদেশে অতিশয় সঙ্গোপনে যে খেলা চলিতেছিল, তাহাতে ক্রীড়ক এবং দর্শক— উভয়েরই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সে নিজেই। বাহিরের কোনো দর্শক সেখানে ছিল না।

চৌত্রিশ

ভজহরি-প্রমুখাৎ বার্তা শুনিয়া মুকুন্দ পোদ্দার শুধু বিস্মিত নয়, কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। অঙ্কে ভুল করিয়া ফেলিলে লোকে যেমন অপ্রস্তুত হয়, তেমনি অপ্রস্তুত হইলেন তিনি একটু মনে মনে। সেদিন নিপুর ব্যবহারে তিনি মোটে বিচলিত হন নাই। বস্তুত আজকালকার এই ডেঁপো ছোকরাদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার সপক্ষে আর একটা প্রমাণ পাইয়া মনে মনে বরং তিনি খুশি হইয়াছিলেন। ছোকরা বাড়ি বহিয়া তাঁহাকে বলিতে আসিয়াছিল, আমি আপনার শত্রু, এ জেনেও যদি আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান করুন। ময়রাকে রসগোল্লা চিনাইতে আসিয়াছে। অ্যাঁ। ডাহা উজবুক না হইলে এতটা পথ হাঁটিয়া এ কথা বলিতে আসে কেহ? লোক চরাইতে চরাইতে মাথায় টাক পড়িয়া গেল, কে শত্রু কে মিত্র তাঁহার এখনও চিনিতে বাকি আছে যেন। মিত্র কে? সব ব্যাটাই তো শত্রু। ঘাড় মটকাইবার সুযোগ পাইলে কোন্ দেবতা তাহা ছাড়েন? তুই যে শত্রু, তা ভাল করিয়াই জানি কিন্তু সেদিনকার ছোঁড়া তুই, তোর নাক টিপিলে এখনও বোধহয় দুধ বাহির হইবে, আমার সঙ্গে কী শত্রুতা করবি তুই? ডাহা উজবুক না হইলে এ কাজ করে কেহ? নিপুর প্রতি পোদ্দার মহাশয়ের সে দিন সস্নেহ অনুকম্পাই হইয়াছিল একটু। নেহাত গাড়োল একটা। একমুখ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বেশ বেশ, আপনি যে শত্রু, তা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু শত্রুরও উপকার যদি করি আমি, কার কি বলবার আছে। আপনি মানুষ তো, ভারতবাসী তো, হিন্দু তো, আপনি বিপন্ন হয়েছেন এইই যথেষ্ট নয় কি, অত শত্রু মিত্র বিচার করার কি দরকার? গোটাকয়েক টাকা দিয়ে যদি আমি সাহায্যই করি আপনার, কার চণ্ডী অশুদ্ধ হবে তাতে অ্যাঁ, কি বল ভজহরি? দাও, ওঁকে পঞ্চাশ টাকা দাও, নোট নেবেন না, খুচরো, আর হাতঘড়িটাও ফেরত দিয়ে দাও। কথার নড়চড় করবার লোক নই আমি।

নিপু বলিয়াছিল, আপনার কাজ কিন্তু আমি করব না।

আপনার ধর্ম আপনার কাছে। বলিয়া তিনি হাসিয়াছিলেন। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলি চকচক করিয়া উঠিয়াছিল। কেবল নিপুর উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া থাকিবেন, এমন কাঁচা লোক তিনি নন। ইতিমধ্যে আরও দুই-তিনজন লোক মারফত তিনি হৃদয়বল্লভকে খবর পাঠাইয়াছেন। কেনারাম চক্রবর্তীকেই হাত করিবার ফিকিরে আছেন তিনি। আরও হাজার খানেক টাকা কবুল করিলেই লোকটি তাঁহার দিকে ঢলিয়া পড়িবে, বেশ বোঝা যাইতেছে। কেবলমাত্র নিপুর মত চ্যাংড়ার সাহায্যেই তিনি যে এতবড় জমিদারিটা কিনিয়া ফেলিবেন, এ হাস্যকর আশা তাঁহার কোনোদিনই ছিল না। তবে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও যখন কাঠবিড়ালিকে উপেক্ষা করেন নাই, তখন তাঁহার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা করিবে কোন্ সাহসে? স্পষ্ট ভাষায় শত্রুতা ঘোষণা করিলেও তাই তিনি কাঠবিড়ালিটার হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। এত লম্ফঝম্ফ তো, টাকা ও ঘড়িটা কিন্তু বেশ হাত পাতিয়াই লইল। তাহার পর অবশ্য আর কোনো খোঁজখবর পান নাই ছোকরার। রাখেনও নাই। ভাবিয়াছিলেন, টাকা কয়টা বোধ হয় জলেই গেল। এই ভাবিয়া কেবল সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন যে, ছোকরা আর যাই করুক, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ

অন্তত করিবে না। যে ছিদ্র দিয়া বুড়বুড়ি কাটিবার সম্ভাবনা ছিল, চাঁদির চাকতি দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া গেল। ভজহরির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিবার পর কিন্তু এ বিশ্বাস টিকাইয়া রাখা শক্ত হইল। ছোটলোকদের মধ্যে এ অঞ্চলে তাঁহার যত খাতক ছিল, সকলেই সুদ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে যে, আর এক পয়সাও সুদ তাহারা দিবে না। দশ কিস্তিতে আসলটা তাহারা পাঁচ বৎসরে ক্রমশ শোধ করিয়া দিবে। তাহাতে যদি পোদ্দার মহাশয় সম্মত না থাকেন, মকদ্দমা করিতে পারেন। সকলের মুখেই এক বুলি এবং বুলিটা নিপুবাবুই নাকি সকলকে মুখস্থ করাইয়াছেন।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, অন্নছত্রে আজকাল লোক খাচ্ছে কত?

দশ জন খাওয়ার কথা, খায় কিন্তু বারো-তের জন, মানা করলে শোনে না, এসে বসে পড়ে।

কাল থেকে একশো জনের আয়োজন কর। একটা তরকারিও বাড়িয়ে দাও। কি তরকারি দিচ্ছ আজকাল? কদিন যেতেই পারিনি।

শাক বেগুন মুলো দিয়ে একটা ঘণ্ট হয়েছিল আজ।

লাউ সস্তা আজকাল, লাউয়ের তরকারি কর একটা কাল থেকে।

যে আজ্ঞে।

আর যারা যারা সুদ মাপ চায়, তাদের বলো— আমার সঙ্গে যেন দেখা করে তারা। বলো যে, তাদের বিপদে আপদে আমরাই চিরকাল করেছি, চিরকাল করবও। আজ হঠাৎ নিপুবাবুর কথায় নেচে মরছিস কেন তোরা? ভাল করে বুঝিয়ে বলো, বুঝলে? দুটো মিষ্টি কথা বলতে শেখো।

যে আজ্ঞে।

ভজহরি চলিয়া গেল, পোদ্দার মহাশয় স্মিতমুখে বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চোখে আগুনের আভা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পঁয়ত্রিশ

ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশী।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। অতিশয় অসহায়ভাবে শঙ্কর গোরুর গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া শুইয়াছিল। মন্থরগতিতে গ্রাম্যপথে গাড়ি চলিয়াছে, মুশাই গাড়ি হাঁকাইতেছে, শঙ্কর ভাল করিয়া ভাবিতেও পারিতেছে না, এখন কি করা উচিত। কিছুক্ষণ পূর্বে লক্ষ্মীবাগে স্বচক্ষে সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল, তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাহার মননশক্তিই যেন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য সত্যই কিন্তু দিবা-দ্বিপ্রহরে একদল উন্মত্ত জনতা আসিয়া মারপিট লুটতরাজ করিয়া মণিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে। মণির মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় সে এখন সদর হাসপাতালে। তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুলাব সিং দখল করিয়া বসিয়াছে। মণির ঘরে মণিরই বিছানায় বসিয়া লোকটা সদলবলে আসর জমাইয়াছে। দলে আছে কেনারামের পুত্র জীবন, রাজীবের পুত্র গদাই, প্রমথ ডাক্তার ও স্থানীয় বেহারি উকিল দুইজন। ফুলশরিয়া মদ পরিবেশন করিতেছে। প্রাঙ্গণে জনতার মধ্যে ছিল ফরিদ, কারু, হরিয়া করিম, কর্পূরা, পুরণ— চেনা-শোনা আরও কত লোক, সকলেই তাহাদের প্রজা। সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া চোরের মত লুকাইয়া পড়িল সব। লুকাইল না কেবল গুলাব সিং এবং ফুলশরিয়া। গুলাব সিং গোঁফে চাড়া দিয়া একপাত্র মদ আগাইয়া দিয়া বরং সম্বর্ধনাই

করিল তাহাকে। স্বয়ং দারোগা সাহেবকে সে হাত করিয়াছে। শঙ্করবাবুকে তাহার কি ভয়। ফুলশরিয়া এক পাশে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। ফুলশরিয়া! এই ফুলশরিয়া নিপুদাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, নিজের গহনা বেচিয়া অসুস্থ হরিয়ার চিকিৎসা করিয়াছিল, এখন ডাকাতের দলে মদ পরিবেশন করিতেছে। পরিধানে চমৎকার একটি ছাপা বোম্বাই শাড়ি। একদিন তাহার মহত্ত্ব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া যে যেখানে পারিল আত্মগোপন করিল, সেই কেবল কোথাও গেল না। এক ধারে একটু সরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফরিদ কারু রহিম কর্পূরা— প্রত্যেকের মুখ একে একে আবার তাহার মনে পড়িল। বিশেষ করিয়া ইহাদের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রত্যেককে আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে সে। ... সেদিন নিজে জামিন হইয়া ছাড়াইয়া আনিল, দুই দিন যাইতে না যাইতেই ডাকাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! দিনে-দুপুরে! কেবল অভাবের তাড়নাতেই তাহারা এসব কবিতেছে— এ অজুহাতে আর মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। অভাব নয়, ইহাই উহাদের স্বভাব। স্বভাব। স্বভাবই যদি হয়, তাহার জন্যও কি উহাদের দায়ী করা যায়? বহু যুগের নানা অভাবই কি উহাদের স্বভাব গঠন করে নাই? শুধু অন্নাভাব বস্ত্রাভাব নয়, শিক্ষার অভাব। তখনই আবার মনে হইল, জীবন চক্রবর্তী, গদাই দত্ত, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন বেহারি উকিল, গুলাব সিং— ইহাদের কিসের অভাব আছে? ইহারাই তো আসল ডাকাত, কারু-ফরিদরা তো উহাদের চালিত যন্ত্রমাত্র। শিক্ষা? জীবন চক্রবর্তী, প্রমথ ডাক্তার, দুইজন উকিল— ইহাদের কি শিক্ষার অভাব ছিল? ইহারা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, সে শিক্ষা পাইলে ফরিদ-কারুদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইত কি? রামলাল কি উন্নত হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়িয়া গেল। কাকের ঠোঁট সোনা দিয়া, পা মানিক দিয়া এবং ডানা মুক্তা দিয়া অলঙ্কৃত করিলেও কাক কাকই থাকে, রাজহংস হয় না। কাককে রাজহংস করিবার তাহার এ আগ্রহ কেন? নিমগাছের তলায় দুধ ঢালিলেই তাহাতে আম ফলিবে, এ দুরাশা সে কেন করিতেছে? কেন করিতেছে— চিন্তা করিতে গিয়া অনিবার্যভাবে তাহার মনে হইল, করিতেছে নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য, করিতেছে তাহার আর কিছু করিবার নাই বলিয়া। যে শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ, সেই শিক্ষাই অপরকে জোর করিয়া গিলাইবার এই সাড়ম্বর অয়োজনের অন্য অর্থ আর কি হইতে পারে? তাহা ছাড়া তাহার নিজের কি এমন যোগ্যতা আছে, কি এমন চরিত্রবল আছে, যাহার জোরে সে সমাজ-সংস্কার করিবার স্পর্ধা করে? বাহাদুরি করিয়া সেদিন উৎপলের দেওয়া সিগারেটটা প্রত্যাখান করিল বটে, কিন্তু মনে মনে তাহার স্ত্রীকে কামনা করিতে তো তাহার বাধিল না? সে নিজেও কি কম পরস্ব-লোলুপ? যে শিক্ষা তাহার নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে নাই, সেই শিক্ষা দিয়া সে সমাজসংস্কার করিবে! সে নিজেই তো ভণ্ড।

মুশাই!

কি বাবু?

এখানে কাছাকাছি কোনোও দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে?

কোশিস্ করনে সে মিলবে জরুর।

দেখ তো।

মুশাই গাড়ি থামাইয়া নামিয়া গেল। শঙ্কর শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল। সূচিভেদ্য অন্ধকার চতুর্দিকে। একা একা তাহার কেমন যেন গা-ছমছম করিতে লাগিল। চারিদিক নির্জন, কোথাও আলোর লেশমাত্র নাই। গরুর গাড়ির আলোটাও নিবিয়া গিয়াছে। মুশাইটা গেল কোথায়?

এখানে সিগারেট কোথা পাইবে? না পাঠাইলেই হইত। শঙ্কর মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিতে পাইল, দূরে একটা আলো আসিতেছে। আলো, না, আলেয়া? না আলোই বোধ হয়। কাছাকাছি তো কোনো জলাভূমি নাই। শঙ্কর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একটু কাছাকাছি হইলে প্রশ্ন করিল, কে?

কোনো উত্তর নাই। আর একটু কাছে আসিলে শঙ্কর দেখিতে পাইল, একজন স্ত্রীলোক, সঙ্গে কেহ নাই। এত রাত্রে একা এই নির্জন মাঠের মধ্যে কে এ!

কোন্ হ্যায়, কাঁহা যায়েগা?

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া পড়িল। আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, শঙ্করবাবু নাকি?

শঙ্কর চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কুন্তলা!

এত রাত্রে একা কোথা চলেছেন?

শিবমন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছি।

এত রাত্রে শিবমন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ। আজ শিবরাত্রি যে।

একা কেন?

মণি-ঠাকুরপোর খবর পেয়ে উনি হাসপাতালে চ'লে গেলেন, চাকরটারও অসুখ করেছে, তাই একাই যাচ্ছি। কি আর হবে।

আর কোনো সঙ্গী পেলেন না?

কই আর পেলুম!

কুন্তলা একটু হাসিল। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। শঙ্করের মনে হইল, সে হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে, থিয়েটার সিনেমা হইলে অনেক সঙ্গী মিলিত, কিন্তু এই শীতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিবপূজা করিতে যাইবে কে?

বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি।

না থাক।

কুন্তলা চলিয়া গেল। শঙ্কর একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ওই মেয়েটার তুলনায় নিজেকে কেমন যেন খেলো মনে হইতে লাগিল। পরমুহূর্তেই সে নিজের সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। নতুন যুগের নতুন পারিপার্শ্বিকে যাহারা পুরাতন প্রথাকে অবুঝের মত আঁকড়াইয়া আছে, তাহারা কি সত্যই শ্রদ্ধেয়? কুন্তলা রামলালের শিক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিষ্ঠাভরে শিবরাত্রি করিতেছে। মনে মনে কথাটি বলিয়াই সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নিজেই তো সে এতক্ষণ এই শিক্ষার তুচ্ছতার কথা ভাবিতেছিল। চিন্তার সূত্রটা কেমন যেন হারাইয়া গেল। নিজেরই অন্তরেব পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আবর্ত ফেনাইয়া তুলিল। একবার মনে হইল, শিবরাত্রি করায় কী এমন মহত্ত্ব আছে? আছে শুধু দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমের অন্তঃসারশূন্য দম্ভ এবং তাহা বজায় রাখিবার জেদ। পরমুহূর্তেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তঃসারশূন্য? সতিই কি ইহা অন্তঃসারশূন্য। নতুন যুগের নতুন ঢেউয়ের মুখে যে হালকা শোলাটা নাচিয়া বেড়াইতেছে তাহারই অন্তর পরিপূর্ণ, আর যে পর্বত সমস্ত ঢেউ সত্ত্বেও অটল হইয়া আছে সে-ই অন্তঃসারশূন্য? সহসা ইহার কোনো সদুত্তর মাথায় আসিল না, তবু কিন্তু নতুন যুগের নতুন দাবি যে একটা আছে, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। নতুন যুগের সে অভিনব দাবিটা কী? কমিউনিজম? তাহাও কি পুরাতন মনোবৃত্তিরই পুনরাবর্তন নয়? শক্তিমান শ্রমিক জরাগ্রস্ত ধনিকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। তবে

নতুন যুগের নতুন দাবিটা যে কী, তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল। একটু পরেই মুশাই আসিয়া হাজির হইল। দেখা গেল তাহার অসাধ্য কিছু নাই, ঠিক এক প্যাকেট সিগারেট কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়াছে। কুন্তলার নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গভরে অবজ্ঞা করিবার জন্যই শঙ্কর যেন সাড়ম্বরে একটা সিগারেট ধরাইল এবং অপ্রস্তুত মুখে ফসফস করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

ছত্রিশ

ভিতরে উত্তেজনা হইলে উৎপল বাহিরে খুব শান্ত হইয়া পড়ে। ভ্রূ উত্তোলন করা, পা দোলান, গোঁফে তা দেওয়া প্রভৃতি মুদ্রাদোষগুলি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিও অচল হইয়া পড়ে। শঙ্কর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এইরূপ তুরীয় অবস্থায় সে নিচের ঘরে বসিয়া রেডিও শুনিতেছে। শঙ্কর ঢুকিতেই সে রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিল। প্রবেশ করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, খবর জান?

খুব জানি। জাপানিরা সিটাং নদী পেরিয়ে আঠার মাইল এগিয়েছে। রেঙ্গুন যায়-যায়।

সে খবরের কথা বলছি না। মণির কথা বলছি। মণির খবর জান?

মণির খবর তোমার জানবার কথা, আমার নয়।

জমিদারি কিন্তু তোমার এবং মণি তোমারই প্রজা।

সেটা কাগজে কলমে, আসলে মালিক তুমি। — বলিয়া সে হাসিল। শঙ্করের ইচ্ছা করিতে লাগিল, উৎপলের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া দিতে, ছেলেবেলায় চটিয়া গেলে যেমন মাঝে মাঝে দিত। কিন্তু সে ছেলেবেলা আর নাই, উৎপলের সে ঝুঁটি নাই, সে উৎপলও আর নাই বোধ হয়। তাই সে সব কিছু না করিয়া বলিল, ননসেন্স।

একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।

শঙ্করের আগমনে এবং কথাবার্তায় উৎপলের উত্তেজনা কমিয়া গিয়াছিল। তাহার চোখের স্বাভাবিক কৌতুকদীপ্তিও ফিরিয়া আসিয়াছিল। শালটা সর্বাঙ্গে ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিল, তা হলে বলো, শ্রবণ করি।

তুই কিছুই শুনিসনি?

বৈশম্পায়ন না বললে তো জনমেজয়ের শোনবার কথা নয়। মহাভারতের ট্রাডিশন ওল্টাই কি করে বল?

শঙ্কর আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, উৎপল বলিল, দাঁড়াও।

সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে উৎপল চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিল।

আমাকেও দে একটা!

উৎপল ভ্রূ উত্তোলন করিল এবং একটু হাসিল। শঙ্করও হাসিতে যোগ দিল বটে কিন্তু মনে মনে সে যেন মরিয়া গেল।

মণির ব্যাপার সমস্ত শুনিয়া উৎপল বলল, আমাকে কি করতে বল?

ব্যবস্থা কর।

আমার ব্যবস্থা কী তোমার পছন্দ হবে?

দেখ, ফের যদি ওরকম করে কথা বলিস, এক ঘুষি মারব তোকে।

উৎপল হাসিল।

শঙ্কর বলিল, ও-রকম ক'রে গা বাঁচিয়ে থাকলে চলবে না। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

তোমার যদি আপত্তি না থকে, হঠাৎ ভাবগ্রস্ত হয়ে তুমি যদি বাধা না দাও, খুব ভাল ব্যবস্থা হতে পারে।

আমার আপত্তি হবে কেন?

উৎপল নীরবে বামগুম্ফ পাকাইতে লাগিল।

কি ব্যবস্থা করিতে চাও?

বিকট রকম, অর্থাৎ ব্লিৎস্‌ক্রিগ।

মানে?

উৎপল কিছুক্ষণ নীরবে গোঁফে তা দিল, তাহার পর বলিল, শোন তা হলে। প্রথমেই দারোগাটাকে টাকা দিয়ে হাত করতে হবে। গুলাব সিং যা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি দিয়ে আমাদের স্বপক্ষে আনতে হবে ওকে। দ্বিতীয়, জীবন চক্রবর্তীর নামে কেসটা তুমি 'উইথড্র' করবে ভাবছিলে, তা না ক'রে 'ফুল ফোর্সে' চালাতে হবে সেটা। তৃতীয়, রাজীব দত্তর ধানের গোলা আর পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে এক্ষুনি— পরের সম্পত্তি নষ্ট করার মজাটা বুঝুন একবার ভদ্রলোক, তার আগে অবশ্য একটা ওয়ার্নিং দিতে পার এবারের মত। চতুর্থ, তোমার ওই নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে আজই জবাব দিয়ে দাও। আজই যেন তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ করেন, জবাব দেওয়ার আগে থামে বেঁধে চাবকে দিলেও মন্দ হয় না। পঞ্চম, এই গুলাব সিংকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। মণির হয়ে কেউ ওর নামে থানায় গিয়ে নালিশ করে আসুক, আমাদের এলাকায় ওর যত মহিষ আছে সব আড়পোড়া দিয়ে দাও, আর মুখে মুখে প্রচার করে দাও (অর্থাৎ কথাটা যেন ওর কানে গিয়ে পৌঁছয়) যে, ওর মাথাটা কেউ যদি কেটে এনে দিতে পারে, তাকে হাজার টাকা বকশিশ দেব আমরা। ষষ্ঠ, তোমার ওই 'লেম ডাক্স'দের— ফরিদ কারু আর কি কি নাম বলছিলে সেদিন, ওদের প্রত্যেককে ডেকে এনে বেশ করে চাবকাও, তারপর বলে দাও যে, ওরা যদি সব মণির স্বপক্ষ সাক্ষী না দেয়, সর্বনাশ করে দেব ওদের। সপ্তম, এ অঞ্চলের বেহারি বাঙালি যত উকিল মোক্তার আছে, সবাইকে মণির তরফে নিযুক্ত করে ফেল; যে দুজন ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা যদি আমাদের পক্ষে আসতে রাজি না থাকেন, তাঁদেরও আসামী ক'রে ফেল— আসামী করাই ভাল বোধ হয়। অষ্টম, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহায়তায় পুলিস ফোর্স নিয়ে মণির সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর অবাক হইয়া শুনিতেছিল।

এত না করলে হবে না?

হবে না— হবে না— হবে না— খোল তলোয়ার, এসব দৈত্য নহে তেমন। অবশ্য তোমার যদি মনে হয়, বাঘের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলে ফল হবে, ক'রে দেখতে পার, আমি কিন্তু সে সবের মধ্যে থাকব না।

সিগারেটটা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সেটা ফেলিয়া দিয়া উৎপল আর একটি ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তুমি আর একটি ধরিয়ে ব্যাপারটাকে প্রণিধান কর। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি একটু।

উৎপল চলিয়া গেল। শঙ্কর আর সিগারেট ধরাইল না! নীরবে বসিয়া রহিল। সে বিস্মিত

হইয়া গিয়াছিল। উৎপল কি ঠাট্টা করিতেছে? না, তাহা তো মনে হইল না। প্রয়োজন হইলে সত্যই সে যে এমন বীভৎস রকম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এ ধারণা শঙ্করের ছিল না কখনও। তাহার ধারণা ছিল, উৎপল খামখেয়ালি এপিকিউরিয়ান মাত্র। তাহার আপাত-সৌম্য পেলব মূর্তির অন্তরালে যে এমন একটা রাক্ষস প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কে ভাবিয়াছিল! মণি এবং গুলাব সিংয়ের কথা ভুলিয়া শঙ্কর উৎপলের কথা ভাবিতে লাগিল। আবাল্য পরিচিত উৎপলের মধ্যে এই অপরিচিত ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ দেখিয়া মানব-চরিত্রের বিবিধ সম্ভাবনা বিষয়েই আর একবার সে সচেতন হইল যেন। কিছুক্ষণ আগে ফুলশরিয়াকে দেখিয়া যেমন হইয়াছিল। এতগুলি ভয়ানক অনুষ্ঠানের তালিকা বেশ নির্বিকারভাবে দিয়া গেল তো! শক্তি আছে বলিতে হইবে। তখনই মনে হইল, শক্তি যে আছে, তাহা তো তাহার আগেই বোঝা উচিত ছিল। শক্তি না থাকিলে কেহ কি নিজের স্ত্রীর জবানিতে প্রেমপত্র লিখিয়া বন্ধুর নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারে? শক্তি না থাকিলে কেহ কি এত টাকা এমন অবহেলাভরে খরচ করিতে পারে? এত বড় সম্পত্তির সমস্ত ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আজ পর্যন্ত কোনোও প্রশ্ন করে নাই, কোনোও জবাবদিহি চাহে নাই। শক্তি আছে বইকি! এ শক্তির সম্মুখে কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে বসিয়া রহিল। প্রতিকারস্বরূপ উৎপল যাহা করিতে চাহিতেছে, তাহাতে সায় দেওয়ার শক্তি তাহার যে নাই। প্রতিশোধের কথা সেও যে ভাবিয়া দেখে নাই তাহা নয়, কিন্তু সাদীর কবিতাটা মনে পড়িতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কুকুর কামড়াইয়াছে বলিয়া কুকুরকে কামড়াইতে হইবে? তোমার যদি মনে হয়, বাঘের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পড়লে ফল হবে, করে দেখতে পার... উৎপলের কথাগুলি মনে পড়িল। সত্যিই কি উহারা বাঘ? সত্যিই কি এ উপমা খাটে? পরমুহূর্তেই মনে হইল, এখনই তো সে নিজেই উহাদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করিতেছিল। উহারা সত্যই যে পশু ছাড়া আর কিছু নয়, অন্তরের অন্তস্তলে নিজেই কি সে এ কথা বিশ্বাস করে না? উহাদের কাছে শ্রীমদ্ভাবগত পাঠ করিলে যে কোনো ফল হইবে না, ইহা কি সে নিজেই অনুভব করিতেছে না? তবে এই পশুসমাজে তাহার কি করিবার আছে? নখদন্ত বিস্তার করিয়া উহাদের সহিত কলহ করিবে, না, দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের পশুত্ব লইয়া নৈতিক হাহাকার করিবে? এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে বাছিয়া লওয়া ছাড়া অন্য আর কী করিবার আছে? পশুকে মানুষ করা? তাহার তো সম্ভাবনাই নাই। যাহা করিলে পশু সত্য সত্য মানুষ হয়, তাহা করিবার সুযোগ এই পরাধীন দেশে কোথায়? এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়, রাজনৈতিক আইনের নিক্তিতে ওজন করিয়া। হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-বেহারি প্রত্যেকের মন রাখিয়া ধর্ম-রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়, তাহার ফলে মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হয় না, পশু ছদ্মবেশী হয় মাত্র। তবে? কি কর্তব্য এখন? সে কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। মনে হইল, একটা বিপুল অরণ্যে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কি ঠিক হল?

উৎপল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না।

আর একটা সিগারেট ধরাও না।

সিগারেট কেসটা আগাইয়া দিল। শঙ্করের মনে হইল, তাহার চক্ষু দুইটি যেন কৌতুকে নাচিতেছে। মনে হইবামাত্র তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেল। অযৌক্তিকভাবে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া বসিল, তোমর জমিদারিতে তুমি যা ইচ্ছে করতে পার, যেখানে খুশি আগুন দিতে পার, যাকে ইচ্ছে চাবকাতে পার; কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব কি না ঠিক করতে

পারিনি এখনও।

উৎপল কিছু বলিল না। নীরবে একটি সিগারেট তুলিয়া লইল।

শঙ্কর বলিয়া চলিল, কতকগুলো অসহায় লোককে ধরে চাবকানো, অশিক্ষিত লোকের বাড়িতে আগুন দেওয়া, গরিব কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার করার মধ্যে সত্যিকারের পৌরুষের কোনো লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি হয়ত পাচ্ছ।

আমি পাচ্ছি না।

তবে?

আমি মণির কথা ভাবছি। কতকগুলো হিংস্র জন্তু তাকে আক্রমণ করেছে— এই কথাই মনে হচ্ছিল খালি। ঠিক কী করলে জগতের সম্মুখে নিজের পৌরুষ-প্রদর্শন নিখুঁত হবে, সে চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।

বেশ, তা হলে যা ভাল বোঝ, কর।

আমার কথা শেষ কবতে দে আগে। একটা কথা জানিস?

কি?

বাথরুম নাম স্থানটি অতি উত্তম স্থান। ওখানে গেলে হু-হু করে অনেক ভাল ভাল চিন্তা আমার মাথায় আসে, বোঁ বোঁ করে বড় বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ আমি খুব ভাল একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি হঠাৎ।

কি সেটা?

আমি এ বিষয়ে কিছুই করব না, যা করবার তুমিই কর।

রাগে শঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে লইয়া খেলা করে, তাহার সন্দেহ হইল, উৎপলও তাহার সহিত তেমনই খেলা করিতেছে।

তুমি কিছুই করবে না কেন।

ভাবছি শুধু শুধু তোমার মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

আমার ব্যক্তিগত কষ্টের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক আছে বইকি। তুমিই তো সব, ব্যক্তিই তো আসল ভাই।

উৎপলের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে বিড়াল-ইঁদুরের উপমাটা নিমেষে ধুলিসাৎ হইয়া গেল। সহসা তাহার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িল। স্কুলের ফুটবল ম্যাচে সে একবার খেলিতে চাহে নাই। উৎপল সেবার ক্যাপ্টেন ছিল। আসিয়া ধরিয়া পড়িল, খেলিতেই হইবে। তুই-ই তো সব, তুই না খেললে আমরা দাঁড়াতেই পারব না। বহু বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া উৎপলের কথাগুলি সহসা যেন ভাসিয়া আসিল। সেই উৎপল কি এখনও আছে?

ভুরু কুঁচকে দেখছিস কি?

তোমার কাণ্ডটা। বিপদে প'ড়ে তোমার পরামর্শ চাইতে এলুম, তুমি তা না দিয়ে কতকগুলো আজগুবি কসরত দেখাচ্ছ কেবল।

পরামর্শ তো দিয়েছি, এখন তদনুসারে চলা না-চলা তোমার ইচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যা করবে, তাই হবে।

প্রতিশোধ না নিলে এর প্রতিকার হবে না?

আর কি উপায় আছে, বল?

শঙ্কর বলিতে পারিল না। বস্তুত সেও আর কোনো উপায় ভাবিয়া পাইতেছিল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

অত দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। তুমি ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে যা হয় করো। আপাতত আর একটা কাজ করা যেতে পারে বরং।

কি?

এই অসময়ে সুরমার কাছ থেকে এক কাপ করে 'কফি' আদায় করবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। আমি বলাতে ফ্ল্যাটলি 'না' বলে দিলে। তুমি যদি চাও—

আমারও এখন খেতে ইচ্ছে করছে না ভাই।

বাই জোভ!

উৎপল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিতে লাগিল।

আমি ছুটি চাইছি ভাই! আমি এখান থেকে কয়েকদিনের জন্য পালাতে চাই। ও সমস্যার সমাধান তুমি যা ভাল বোধ কর।

দ্যাট'স নট শঙ্কর লাইক। পালাবি!

শঙ্করকে কে যেন কশাঘাত করিল। যদিও সে অবিলম্বে ঠিক করিয়া ফেলিল যে, পালাইবে না। তবু বলিল, কিছুদিন ছুটি নিতে ইচ্ছে করছে।

কেন?

এ সব নোংরামির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

পল্লীসংস্কার মানেই তো আবর্জনা সাফ করা।

দেশের লোক খুন করা নয়।

দেশের লোক যদি আবর্জনা হয়ে ওঠে, তা হ'লে তাও হবে বইকি।

কিন্তু যে দেশের লোক এককালে মনুষ্যত্বের জন্যে বিখ্যাত ছিল, সে দেশের লোক যে কারণে আবর্জনায় পরিণত হচ্ছে, সেই কারণটা দূর করবার চেষ্টাই কি সংস্কার নয়?

কে অস্বীকার করছে তা? রিসার্চ করে রোগের কারণটা বার করবার চেষ্টা কর। কিন্তু রোগাক্রান্ত যে ব্যক্তিটি সত্যি মারা গেছেন, দেশের লোক হলেও তাঁকে পুড়িয়ে ফেলাই তো উচিত মনে করি।

রিসার্চ করবার দরকার নেই। রোগের কারণ অনেক দিন আগেই ধরা পড়েছে, আর মারা আমরা সবাই গেছি, পোড়াতে হলে দেশসুদ্ধ সবাইকে পোড়াতে হয়— তোমাকে আমাকে সবাইকে।

যদি দরকার হয়, তাই করতে হবে।

আমার মতে কিন্তু তার দরকার নেই। দস্যু রত্নাকরকে পুড়িয়ে ফেললে বাল্মীকিকে পাওয়া যেত না। হাজার খারাপ হলেও মানুষ আবর্জনা নয়। আজকের বিলাসী মিস্টার গান্ধী কাল মহাত্মা গান্ধীতে বিবর্তিত হয়ে যেতে পারেন; আজ যে দুর্বল জীর্ণ শীর্ণ কাল সে স্যান্ডো। মানুষের ইতিহাসে এ সব উদাহরণ মোটেই বিরল নয়।

নারদ সেজে তা হলে গুলাব সিংয়ের কাছে যাওয়া যাক্ চল। কিছুই বলা যায় না, লোকটা সত্যিই হয়ত মহাকাব্য লিখে ফেলতে পারে। অন্তত সম্ভাবনা যে আছে, তর্কের খাতিরে সে কথা মানতেই হবে।

উৎপলের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল। শঙ্কর কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল না। নিজেরই আলোচনার সূত্র ধরিয়া সে এক ভিন্ন লোকে উপনীত হইয়াছিল, যেখানে দীন দরিদ্র বালক

প্রতিভাবান ফ্যারাডেতে পরিণত হয়, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তপস্বী বুদ্ধে রূপান্তরিত হন, সামান্য সৈনিক দেখিতে দেখিতে নেপোলিয়ানের শৌর্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন—

বাই জোভ! সহসা এত দয়া!

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুরমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পিছনে বেয়ারা কফির সরঞ্জাম বহন করিয়া আনিতেছে।

কল্পনার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সুরমার আবির্ভাবে নতুন ধরনের একটা উত্তেজনা তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একটা আলো নিবিয়া গিয়া আর একটি রঙিন আলো যেন জ্বলিয়া উঠিল। শুধু তাই নয়, নিমেষমধ্যে সে নিজের সহিত সেই পুরাতন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অন্যায় করিতেছে, ভুল করিতেছে, পাপ করিতেছে, বন্ধুপত্নীকে দেখিয়া মনে মনে মুগ্ধ হইবার অধিকার তোমার নাই; নির্বিকার থাক। প্রাণপণে সে নির্বিকার থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনার কাছে একবার যাব ভাবছিলাম।

শঙ্কর চাহিয়া দেখিল, সুরমার শুভ্র কপোলে কয়েকটি চূর্ণ অলক কাঁপিতেছে। শুভ্র নির্মল কপোল, আরক্তিম নয়।

কেন?

গুলাব সিং লোকটাকে শিক্ষা দিয়ে দিন, সব শুনেছেন তো? আমি আজ দুপুরে কুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম, তাকে কথা দিয়ে এসেছি, এর প্রতিকার আমরা করবই।

কি বললেন তিনি?

বিশেষ কিছু বললেনে না। আজকাল বেশি কথা বলে না সে আর। শুধু বললে অরাজক দেশে বাস করছি, মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হবে। আমি কিন্তু সহ্য করব না, এর একটা প্রতিবিধান করুন।

এতক্ষণ তুমি আমাকে কিছু বলনি তো?

বিস্মিত উৎপল প্রশ্ন করিল।

জানি তোমাকে বলা বৃথা।

উৎপল ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইল।

শেষ পর্যন্ত শঙ্করবাবুকেই সব করতে হবে রেডিও আর যুদ্ধ নিয়ে যা মেতেছ তুমি আজকাল।

না মেতে উপায় কি? শত্রুবাহিনী দ্বারে হানা দিয়েছে।

এ কথায় কোনো মন্তব্য না করিয়া সুরমা শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল, এই মেড়ো জমিদারটাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, আমরা, মানে বাঙালিরা, সত্যিই ভেতো নই। পারবেন তো?

নিশ্চয়ই।

অতর্কিতে কথাটা শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া বলিল, উৎপলের সঙ্গে এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। উৎপল তো একেবারে সপ্তমে চড়তে চায়।

চড়াই উচিত। এই বলিয়া সুরমা কফির কাপটা উৎপলের দিকে আগাইয়া দিল। শঙ্করও এক কাপ লইল, প্রত্যাখান করিতে পারিল না। কফিতে এক চুমুক দিয়া উৎপল বলল, শঙ্করের কিন্তু ইচ্ছে—

না, আমি ভেবে দেখলাম তুমি যা বলছ তাই ঠিক। ও ছাড়া উপায় নেই।

শঙ্করবাবুর কি ইচ্ছে? সুরমা প্রশ্ন করিল।

ও বলছিল—

উৎপলের কথায় বাধা দিয়া শঙ্কর বলিল, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ — এই বর্বর নীতিকে মানতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ভদ্রতর কোনোও উপায়ে এ সমাস্যার সমাধান হয় কি না আলোচনা করছিলাম।

আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আপনাকে বর্বর নীতি মানতে হবে, তার কারণ আসলে আমরা এখনও বর্বরই আছি। যিশুখ্রিস্ট বা বুদ্ধের বাণী আজও আমাদের মুখের বুলি মাত্র। তদনুসারে কোনো দিন আমরা চলি না। এবং চলতে চেষ্টা করলে, সেটা ভণ্ডামীর নামান্তর হবে। নয় কি?

অনুত্তেজিত কণ্ঠে হাসিমুখে সুরমা কথাগুলি বলিল। শঙ্কর নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিরাট একটা বীরত্ব করিয়া সুরমার চোখে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার প্রবল বাসনা সহসা তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। উৎপলের মুখে যে কথা শুনিয়া সে এতক্ষণ তাহাকে হৃদয়হীন ভাবিতেছিল, সুরমার মুখে ঠিক সেই একই কথা শুনিয়া সুরমাকে অতিশয় হৃদয়বতী বলিয়া মনে হইতে লাগিল! সহসা সে নিজেই নিজেকে মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, নারীস্তাবক পশুটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে! কোনো যুক্তি আর টিকিবে না। ব্যঙ্গ করিল কিন্তু বিহ্বলতা কমিল না। কফি পান করিয়া সোৎসাহে সে উৎপলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কি উপায়ে গুলাব সিং এবং তাহার দলকে বিদলিত করা যায়?

শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল।

ভাবিতেছিল, ক্ষতি কি? বিশেষ একটা যুক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অসুখী হইবার কি হেতু থাকিতে পারে? সুখে বাঁচিয়া থাকাটাই আসল জিনিস। আনন্দই কাম্য, যুক্তি নয়। যত বড় যুক্তিই হোক না, তাহা যদি পারিপার্শ্বিককে শেষ পর্যন্ত নিরানন্দময় করিয়া তোলে, তাহা হইলে সে যুক্তি মানিবার সার্থকতা কি? আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানোই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কি হইবে একটা বিশেষ মতবাদ লইয়া? সুরমাকে একটু খুশি করিতে গিয়া সে যদি আগেকার মত পরিবর্তনই করিয়া থাকে, কি এমন ক্ষতি তাহাতে? সুরমাকে খুশি করিয়া সে আনন্দ পাইতেছে, ইহাই তো মতপরিবর্তনের সপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি। উৎপলের বিপক্ষেও সে যুক্তি খাড়া করিয়াছিল স্বীয় চিত্তকে আনন্দিত করিবার জন্যই। আনন্দহীন যুক্তির মূল্য কি? বিবেক? বিবেকও একটা সংস্কার, তাহাকেও বারংবার ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়া যায়। মরিয়া হইয়া শঙ্কর নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, মতপরিবর্তন করিয়া সে অন্যায় কিছু করে নাই। পরস্ত্রীকে দেখিয়া এত মুগ্ধ হইবার কি অধিকার আছে তাহার— এই পুরাতন প্রশ্নটারও একটা উত্তর খাড়া করিয়াছিল। বারংবার নিজেকে বলিতেছিল, মুগ্ধ করো, তাই মুগ্ধ হই। সন্ধ্যা ঊষা দেখিয়া মুগ্ধ হই, সুরমাকে দেখিয়াও তেমনি মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার মতে মত দিয়া আনন্দ পাইতেছি। মুগ্ধ হইতে ক্ষতি কি? আর তো কিছুই করিতেছি না।.... অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে পথ হাঁটিতে লাগিল। বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ির সামনে একটি পালকি রহিয়াছে। পালকি করিয়া কে আবার আসিল? বেয়ারারা বারান্দার একধারে বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া আসিয়া সংবাদ দিল বাবু গুলাব সিংয়ের জেনানা রুক্মিণীদেবী আসিয়াছেন এবং তাহার অপেক্ষায় অন্দরে গিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। হঠাৎ? ভিতরে গিয়া দেখিল, রুক্মিণীদেবী অমিয়ার সহিত গল্প করিতেছেন। শঙ্করকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নমস্কারান্তে অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়া নতনেত্রে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রুক্মিণীদেবীর রূপ দেখিয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। স্বর্ণাভ, গৌরবর্ণ, নিটোল নিখুঁত মুখশ্রী, আয়ত ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দুইটি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরিধানে কালোপাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি। শঙ্করের মনে হইল, স্বয়ং বৈদেহী যেন তাহার ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ম্যায় মাফি মাংনে আয়ি হুঁ।

মৃদুকণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া তিনি অমিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপহি সব কহিয়ে।

অমিয়া বলিল, ইনি গুলাব সিংয়ের স্ত্রী, লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার সম্পর্কে এসেছেন। স্বামীর হয়ে মাপ চাইতে এসেছেন উনি। বলছেন, এ ঘটনার জন্য উনি মর্মান্তিক দুঃখিত। মণিবাবুর চিকিৎসার যা খরচ লাগে তা উনি দেবেন, স্বামীকেও লক্ষ্মীবাগ ছেড়ে আসতে বাধ্য করবেন। স্বামী যদি ওর কথা না শোনেন, তা হলে স্বামীর বিরুদ্ধে উনি নিজে গিয়া কোর্টে এজাহার দেবেন বলছেন, তোমরা যদি মকদ্দমা কর। কিন্তু তার বোধ হয় দরকার হবে না কারণ ওঁর বিশ্বাস— স্বামী ওঁর কথা রাখবেন। উনি অনুরোধ করতে এসেছেন, তোমরা আগে থাকতে ওঁর নামে কোনো কেস করো না। কারণ মকদ্দমা করা ওঁর স্বামীর একটা নেশা। একবার যদি শুরু হয়ে যায় ওঁকে থামানো শক্ত হবে। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস, স্বামী ওঁর কথা রাখবেন, মকদ্দমা করতে হবে না।

অমিয়া যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। এই পর্যন্ত বলিয়া রুক্মিণীদেবীর দিকে চাহিল। রুক্মিণীদেবী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, তাঁহার বক্তব্য যথাযথ উক্ত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আঁচল হইতে একখানি হাজার টাকার নোট খুলিয়া অমিয়ার হাতে দিতে গেলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কি ও?

উনি মণিবাবুর ক্ষতিপূরণস্বরূপ হাজার টাকা দিতে চাইছেন।

শঙ্কর বলিল, আমরা তা নিই কি করে? মণিবাবুর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তিনি ভাল হয়ে আসুন, তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন। তিনি যদি নিতে চান নেবেন।

রুক্মিণীদেবী নোটটা ক্ষণকাল ধরিয়া থাকিয়া আনতমস্তকে শঙ্করের কথাগুলি প্রণিধান করিলেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে সেটি আবার আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, আপনি যে এখানে এসেছেন, তা কি গুলাব সিং জানেন?

রুক্মিণী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, জানেন না। তাহার পর অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন। অমিয়া শঙ্করকে জানাইল, ওঁর স্বামী অন্য আর একটি মকদ্দমার তদ্বির করিতে সদরে গেছেন, এখানে নেই তিনি।

ও।

রুক্মিণীদেবী আবার অমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন।

অমিয়া বলল, উনি জিজ্ঞেস করছেন, তা হলে উনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন তো? তোমার কিছু করবে না তো?

শঙ্করের বলিতেই হইল যে, ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটিয়া গেলে তাহারা আর কিছুই করিবেন না।

বলিয়াই কিন্তু দুঃখিত হইল, সুরমার মুখটা মনে পড়িল।

রুক্মিণীদেবী নমস্কারান্তে চলিয়া গেলেন।

অমিয়া বলিল, দই ক্ষীর কলা সন্দেশ কত কি এনেছে দেখবে এস।

খুকি কোথা?

যমুনিয়া পারুলদের বাড়ি নিয়ে গেছে তাকে।

এত রাত্রে সেখানে কেন?

সমস্ত দিন ঘুমিয়েছে। চোখে ঘুম নেই। কেবল আমাকে বিরক্ত করছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে কি জান? মানাতে রঙ মাখিয়ে লজেনচুষ করে দাও। এত দুষ্টু হয়েছে।

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও একটু হাসিল।

তোমার শরীরটা কি ভাল নেই? অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

শঙ্করে শুষ্ক মুখ ও প্রাণহীন হাসি অমিয়ার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

অমিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর আর একটু হাসিল।

কি যে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ এ কদিন মণিবাবুর ব্যাপার নিয়ে। নাওয়া-খাওয়ার পর্যন্ত ঠিক নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

উৎপলের বাড়িতে। খিদে পেয়েছে, খাবার ঠিক কর।

খিদে পাবে না? সেই কোন্‌কালে দু'টি খেয়ে বেরিয়েছ। বেগুনগুলো ভেজে ফেলি, কুটে রেখে এসেছি।

অমিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। শঙ্কর ইহাই চাহিতেছিল। সত্যই তাহার ক্ষুধা পায় নাই। তাহার মনে হইতেছিল, অমিয়ার মনোযোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে সে যেন বাঁচে! নির্জনে বসিয়া সে নিজের সহিত বোঝাপড়া করিতে চায়। সিগারেট ধরাইয়া বাহিরের ঘরটাতে গিয়া সে বসিল। বসিয়াই মনে হইল, সে অন্যায় করিতেছে--- ঘোরতর অন্যায় করিতেছে। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবার স্বপক্ষে যে সব যুক্তি সে এতক্ষণ খাড়া করিয়াছিল, মনে হইল, তাহা অর্থহীন দুর্বল মনের মূঢ় লোভ মাত্র। সুরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া মানে বৃহত্তর সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাহা কি উচিত? তা ছাড়া মনের এই কাঙালপনা আত্মসম্মান হানিকর নয় কি? সুরমা না হয় খুবই সুন্দর, কিন্তু যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখিবে, অমনই তাহা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিতে হইবে? সে দিন তো সে নিজেই এক বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তির বিলাত-ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। মনে হইতেছিল, লোকটা বিলাতে গিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গিয়াছে যেন! সেখানকার চাকরানী হইতে শুরু করিয়া রাজরানী পর্যন্ত সমস্তই তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রতি পদেই এদেশের সহিত ওদেশের তুলনা করিয়া গদগদ পঞ্চমুখে ওদেশের স্তুতি এবং এদেশের নিন্দা করিতে করিতে ভদ্রলোক বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে যেন! একটা গ্রাম্য বর্বর যেন সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসিয়া কৃতার্থ নয়নে হাইকোর্ট দর্শন করিতেছে! ভারতীয় বলিয়া তাহার মনে যেন কিছুমাত্র গর্ব নাই, বিলাতি ঐশ্বর্য দেখিয়া আত্মসম্মানশূন্য লোকটা লোভে ক্ষোভে যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে! তাহার নিজের আচরণও কি ঠিক অনুরূপ নয়? সুরমা সুন্দর, কিন্তু অমিয়াও কী কম সুন্দর! সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তাহার মনের গ্লানি যেন কাটিয়া গেল। সে বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, অমিয়াও সুন্দর, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সুন্দর বইকি।

কোথায় তুমি?

এই যে, বাইরের ঘরে।

অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করবে, আজ তোমার একখানা চিঠি এসেছিল, দিতে ভুলে গেছি।

কার চিঠি?

খামের চিঠি, খুলিনি। মেয়েলি, হাতের লেখা।

মুচকি হাসিয়া অমিয়া ড্রয়ার হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া দিল।

বেগুনভাজা হয়ে গেছে, রুটি সেঁকছি, এস তুমি।

অমিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর চিঠিখানা খুলিয়া পড়তে লাগিল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি আমাকে চেনেন না। আমরা পলাশপুরে থাকি, আমার স্বামীর নাম লোকনাথ ঘোষাল। অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। ইতিপূর্বে ওঁর মুখে আপনার যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তাতে বিশ্বাস আছে যে, আপনি নিশ্চয় এ বিপদে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। পলাশপুর আপনার ওখান থেকে বেশি দূর নয়, দয়া করে যদি একবার আসেন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবেন। চিঠিতে আমাব বিপদের কথা লেখা যাবে না। আসুন একবার। বেশি বিপদে না পড়লে আপনাকে এ অনুরোধ আমি করতাম না। ওঁকে না জানিয়ে গোপনে আপনাকে চিঠি লিখলাম। দেখবেন, উনি যেন না জানতে পারেন। আশা করি, যত শীঘ্র সম্ভব আপনি আসবেন।

ইতি—

বিনীতা শ্রীমতী হররমাদেবী

পত্রটি পড়িয়া শঙ্কর বিস্মিত হইল কিন্তু বাহিরে যাইবার একটা সঙ্গত কারণ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। পবদিন প্রভাতে উৎপলকে সমস্ত কথা একটি পত্রযোগে জানাইয়া সে পলাশপুরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। উৎপলের সহিতও দেখা করিল না। কারণ তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেই সুরমার সহিতও দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। এ লোভনীয় সম্ভাবনার সুযোগ লইতে তাহার সাহস হইল না।

সাঁইত্রিশ

শঙ্করের পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া উৎপলের মুখে মৃদু হাসি এবং ভ্রূযুগলে কুঞ্চন জাগিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া পত্রখানি তৃতীয়বার সে পাঠ কবিল।—

ভাই উৎপল,

লোকনাথবাবুর স্ত্রী খুব বিপন্ন হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল ভোরেই তাই আমাকে পলাশপুর যেতে হচ্ছে। ফিরতে কত দেরি হবে তা বলতে পারি না, কারণ বিপদটা যে ঠিক কি জাতীয়, তা তিনি লেখেননি। তুমি ইতিমধ্যে লক্ষ্মীবাগের ব্যাপারটার একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল। যা ভাল বোঝ, তাই কর। যদিও প্রথমে আমার মনে একটু খুঁতখুঁতানি ছিল (এবং সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আছে) কিন্তু ভেবে দেখলাম, তোমার এবং সুরমার মতটাই ঠিক। এ অপমান হজম করা উচিত নয়। গুলাব সিংহের নামে এখন কিছু ক'রো না, কারণ কাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি, তাঁর স্ত্রী রুক্মিণীদেবী আমার বাড়িতে ব'সে আছেন। তিনি তাঁর স্বামীর হয়ে মাপ চাইলেন এবং ব'লে গেলেন যে, মণির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করবেন তাঁরা, আমরা যেন এই নিয়ে কোর্টে না যাই। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রমথ ডাক্তার, নিপুদা, গদাই, কেনারাম এবং আর সকলের সম্বন্ধে তোমরা যা খুশি ক'রো, আমি আপত্তি করব না।

ইতি—

শঙ্কর

কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া উৎপল কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। যদিও সে ইংরেজিনবিশ লোক, তবু দুইটি প্রচলিত সংস্কৃত প্রবচন পর পর তাহার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমটি— 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহ', দ্বিতীয়টি 'কন্টকেনৈব কন্টকম্'। সে কেনারাম চক্রবর্তীকে ডাকিতে পাঠাইল। লক্ষ্মীবাগের দাঙ্গার পর কেনারাম একটা আহ্বান প্রত্যাশাই করিতেছিলেন। খুব একটা ক্ষুব্ধ মুখভাব লইয়া তিনি উৎপলের নিকট গেলেন। নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইল।

বিনা ভুমিকায় উৎপল বলিল, শঙ্কর এখানে নেই। আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

লক্ষ্মীবাগে মণির সম্পত্তি লুঠ করা ব্যাপারে যারা লিপ্ত ছিল, তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। কে কে ছিল, খবর পেয়েছি আমি।

কেনারামের মুখের উপর নির্নিমেষে ক্ষণকাল চাহিয়া সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল। গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীরভাবে বলিল, সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অপনাকে করতে হবে না। আপনি ফরিদ কারু হরিয়া রহিম কর্পূরা— এই কজনের নাম থানায় পাঠিয়ে দিন; লিখে দিন যে ওরা ডাকাতের দলে ছিল, প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনার দ্বিতীয় কাজ, নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারকে নোটিশ দেওয়া। এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে তাঁদের বলে দিন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি তাঁরা আমার এলাকা ত্যাগ না করেন, অপমানিত হবেন। তৃতীয় কাজ, রাজীব দত্ত। তাঁর ছেলে গদাইকেও শঙ্কর ওদের মধ্যে দেখে এসেছে। আপনি রাজীব দত্তকে গিয়ে বলুন যে, অবিলম্বে তিনি খেসারৎস্বরূপ যদি এক হাজার টাকা দিতে রাজি না হন, আমরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করব।

কেনারাম মনে মনে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়। রাজীব-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা কয়টি বলিলেন, রাজীব এখানে নেই, কলকাতা গেছে।

গদাইকে গিয়ে বলুন তা হ'লে।

বেশ। কিন্তু গদাই যদি বলে যে, সে ওদের সঙ্গে ছিল না?

অবিচলিতকণ্ঠে উৎপল মিথ্যাভাষণ করিল, অস্বীকার করিবার উপায় নেই। শঙ্করের কাছে ছোট্ট একটা পকেট-ক্যামেরা ছিল, সমস্ত দলটার ফোটো সে তুলে এনেছে।

এই সংবাদে কেনারাম চক্রবর্তী মনে মনে একটু অশান্ত হইয়া উঠিলেন। জীবনও সেখানে ছিল যে।

উৎপল চকিতে একবার কেনারামের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, জীবনও সেখানে ছিল। কিন্তু জীবনের কথা আমরা প্রকাশ করব না, আপনি নিজেই তাকে ধমক দিন।

নিশ্চয়— নিশ্চয় ধমকে দেব। এ কথা তো আমার কানেই যায়নি।

উৎপল এ বিষয়ে আর বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করিল না। কেবল বলিল, হ্যাঁ ও ছিল। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এটা মগের মুলুক নয়। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকেও চিঠি লিখছি আজ।

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন, তিনি বড় বদমেজাজী লোক শুনেছি। কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান না বড়। সেদিন—

আমার সঙ্গে হয়তো দুর্ব্যবহার না-ও করতে পারে, একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলাম।

ও।

কেনারাম মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখন আপাতত উৎপলের বিরুদ্ধাচারণ করা চলিবে

না। তাঁহার মুখভাব সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অভিভাবকী ভঙ্গিতে বলিলেন, নিশ্চয়ই, এর একটা বিহিত করা দরকার বইকি। যা যা বললে, এখুনি আমি করছি সব। তুমি নিজে এসব ব্যাপারে মন দিয়েছ দেখে ভারী সুখী হলাম। এই তো চাই। শঙ্কর অবশ্য খুবই করে। তবু—। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, তবু তোমার নিজের সব দেখা চাই। কারণ জমিদারি তোমার।— এই কথা বলিবার পরই প্রসঙ্গত আর একটা কথাও যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, পাঁচ বছর পরে একটা যে হিসেবনিকেশের কথা ছিল, তারও সময় হয়ে এল প্রায়। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসেবটা আমি আপ-টু-ডেট ক'রে রেখেছি। অন্য অন্য ব্যাপারগুলোও শঙ্করকে ঠিক ক'রে রাখতে বলব, রেখেছে আশা করি, বেশ কেপেবেল ছোকরা ও, তবু তুমি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিও সব। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, নিজের সম্পত্তি নিজে না দেখলে থাকে না, মা-লক্ষ্মীর আইনই ওই রকম। রাজবল্লভবাবু নিজে কিছু দেখতেন না ব'লেই তো সব গেল। কেনারাম আবার একটু হাসিলেন। উৎপল গম্ভীরভাবে আনত নয়নে ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গোঁফ পাকাইতে লাগিল, কোনো উত্তর দিল না। তাহার মনোভাব যে কি, তাহা টের না পাইলেও কেনারাম প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলিতেও ছাড়িলেন না।

সেদিন হৃদয়বল্লভও এসেছিল। সে জমিদারিটা আবার ফিরে কিনে নিতে চায়। ভাল দামও দিতে চাইছিল। আমি অবশ্য তাকে ব'লে দিয়েছি যে, জমিদারি বেচবার কোনো কথাই ওঠেনি এখনও।

উৎপল ইহারও কোনো উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কেনারাম অবশেষে বলিলেন, এখন উঠি তাহ'লে। প্রমথ ডাক্তার আর নিপুকে কি আজই নোটিশ দেবে?

আজই।

বেশ। তা হ'লে ড্রাফট ক'রে টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই ক'রে দিও।

দিন।

কেনারামবাবু চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবামাত্র উৎপলের মুখভাব পরিবর্তিত হইল। প্রচ্ছন্ন হাস্যে মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

আটত্রিশ

শঙ্করের সম্বন্ধে ফুলশরিয়ার অনেক দিন হইতেই একটা খটকা ছিল। হরিয়ার মুখে খবর শুনিয়া তাহা আরও বাড়িয়া গেল। কি রকম ধরণের লোকটা যেন। মণিবাবুর 'কামতে' যাহারা ডাকাতি করিতে গিয়াছিল, তাহাদের সকলের নামে নাকি থানায় নালিশ হইয়া গিয়াছে! শঙ্করবাবুই নিশ্চয় ইহার মূলে আছেন, কারণ সব জিনিসের মূলে তিনিই থাকেন। এতদিন ধারণা ছিল, লোকটা সত্যই বোধ হয় দেবতা। কেন যে এমন অসম্ভব একটা ধারণা তাহার হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া নিজের ওপর রাগ হইতে লাগিল। তাহার পতিতা-জীবনে অনেক লোকের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু 'দেওতা' তো একজনও চোখে পড়ে নাই, শঙ্করবাবুকেই বা শুধু শুধু দেবতা ভাবিতে গেল কেন সে? লোকটাকে দেখিয়া 'তাজ্জব' লাগে কিন্তু। হাবভাব ইঙ্গিতে কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ করে না, মাথা উঁচু করিয়া কেবল পরোপকার করিয়া বেড়ায়। এ যে আশ্চর্য ব্যাপার! নটুবাবু ডাক্তারও কম পরোপকারী নন,

কিন্তু 'সরাব' পান করিয়া রাত-দুপুরে তাহার দরজা ঠেলাঠেলি করিতে তিনি কোনোদিন ইতস্তত করেন না। এ লোকটা কিন্তু সে সবের ধার দিয়াও যায় না। পাথরের নয়, রক্তমাংসের শরীর নিশ্চয়, কিন্তু কোনোরূপ বেচাল নাই। এমন নিখুঁত রকম 'বরহম্‌চারী' তো দেখা যায় না বড়। কিন্তু না, ফুলশরিয়া ওসব বিশ্বাস করে না। শঙ্করবাবু একদিন তাহার উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তাহাতে হইয়াছে কী? বাবু ভেইয়াদের পায়ে পড়িলে অনেকেই অমন উপকার করিয়া থাকে। গরিব-দুখীদের কাকুতি-মিনতিতে গলিয়া পড়া অনেকের ঢঙ, অনেকের শখ; 'চুহা মুহা' নিপুবাবুও সকলের উপকার করিবার জন্য লালায়িত; উপকার করিয়াছেন বলিয়াই শঙ্করবাবুকে 'মহাৎমাজি' মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তাহা করিলে মানুষের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার ধারণাই যে বদলাইয়া ফেলিতে হয়। না, সে বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই আর সকলের মত এ লোকটারও গলদ আছে। কিন্তু কোথায় সে গলদ? সেদিন লছমিবাগে গুলাব সিংজির দরবারে হঠাৎ গিয়া হাজির। তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকালেন না পর্যন্ত। অথচ গুলাব সিংহের মত লোক তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে। আর একদিন কোথাও কিছু নাই, রাত-দুপুরে যমুনিয়ার বাড়ি গিয়া উপস্থিত। চিৎকার চেঁচামেচি শুনিয়া সে ভাবিল, এইবার হুজুর বোধ হয় ধরা পড়িলেন। কিন্তু কোথায় কি? পরে শোনা গেল, মুশাইকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছেন, ওই 'ডোকহর'-মার্কা যমুনিয়াকে গায়ের দামি শালটি বকশিশ করিয়া গেলেন। দরদ দেখাইবার আর লোক পাইলেন না! গরিবদের প্রতি দরদ যে কত, তাহার নমুনা তো এইবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিজেদের লেজে যেই পা পড়িয়াছে, অমনিই ফোঁস করিয়া উঠিয়াছেন। মণিবাবুর 'কামৎ' যেই লুঠ হইয়াছে, অমনই যত গরিব-দুখীয়াদের নামে থানায় নালিশ হইয়া গেল। আসল ডাকাত গুলাব সিংহের নামে নাকি নালিশ হয় নাই। যত দোষ ইহাদের। অথচ ইহাদের জন্য শঙ্করবাবুর দয়া একদিন উথলাইয়া উঠিয়াছিল। সকলের 'মাইবাপ' সাজিয়া বসিয়াছিলেন। নিজে জামিন হইয়া থানা হইতে ছাড়াইয়া পর্যন্ত আনিয়াছিলেন। কেন যে আনিয়াছিলেন কে জানে! কিছু নয়, ও-সমস্ত লোক-দেখানো ঢঙ।...

ঘুঁটের উনুনে হাওয়া করিতে করিতে ফুলশরিয়া মনে মনে গজরাইতেছিল। সেদিন লক্ষ্মীবাগে শঙ্কর যে তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় বার আর দেখে নাই, ইহাতে সে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিল। শঙ্কর যদি তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বকিয়া দিত, যদি বলিত— ফুলশরিয়া, তুই এখানে? তোকে এখানে দেখব আশা করিনি তো, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতে সে। বুঝাইয়া বলিতে পারিত যে, তাহারা অসহায় জনমজুর মাত্র, ধনীদের ডাকে সাড়া না দিলে তাহাদের দিন চলা ভার। ভাল কাজ মন্দ কাজের বিচার করিয়া চলিবার উপায় আছে কি তাহাদের? যাহাতে বেশি মজুরি, তাহাই তাহাদের কাছে ভাল কাজ; যাহাতে কম মজুরি, তাহা মন্দ। তাহারা অন্নহীন বস্ত্রহীন সহায়সম্পদহীন দীন দরিদ্র যে। গুলাব সিংহের অত মজুরির লোভ তাহারা কি সামলাইতে পারে? এত কথা ঠিক এমনভাবে মনে জাগে নাই, কিন্তু এমনই ধরনের কিছু একটা সে শঙ্করকে বুঝাইয়া বলিতে পারিত। কিন্তু শঙ্করবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না পর্যন্ত। সে যেন মানুষ নয়, ডাকিয়া কথা বলিবার উপযুক্ত নয়, পোকামাকড় যেন। মাঝে মাঝে দয়া করিয়া কৌতুহলভরে নিরীক্ষণ করেন, কখনও আবার পায়ে দলিয়া চলিয়া যান। ইস্‌ ভারি বড়লোক আমার! অমন বড়লোক সে ঢের দেখিয়াছে। সজোরে আবার সে উনুনে হাওয়া করিতে লাগিল। হরিয়াটা আবার আসিয়া জুটিয়াছে। এত রাত্রে তাহার জন্য আবার রাঁধিতে হইবে। ঘরে চাল নাই, কিন্তু হরিয়া সে কথা শুনিবে না, ভাত সে খাইবেই। পয়সা লইয়া দোকানে চাল কিনিতে গিয়াছে। বলিল, উপর্যুপরি কয়েকদিন ভাত খাইতে পায়

নাই, চিড়া মুড়ি কিংবা ছাতু খাইয়া কাটাইয়াছে। কে তাহাকে রাঁধিয়া দিবে! বউ তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না, সে নাকি আর একটা 'চুমানা' করিয়াছে। থানার দারোগা ব্যাগার ধরিয়া তাহাকে দিয়া কয়েক দিন 'বরতন' মলাইয়াছিলেন, বেতন চাওয়াতে দূর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার নামে বি এল কেস করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। হরিয়ার মুখেই ফুলশরিয়া শুনিল যে, লক্ষ্মীবাগ লুঠ উপলক্ষে সকলের নামে নালিশ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে এইবার কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হইবে। নালিশটা উৎপল করিয়াছে; শঙ্করের ইহাতে যে কোনো হাত নাই, তাহা হরিয়া জানিত না।

হরিয়া চাল লইয়া প্রবেশ করিল এবং খবর দিল, শঙ্করবাবু পলাশপুরে চলিয়া গিয়াছেন। নটবরবাবু তাহার জন্য শঙ্করবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, দেখা হইল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন। 'বদ্‌নসিব' বসিয়া হতাশ হরিয়া কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

বদ্‌নসিব তো হাম্ কি করবো? যঁহা কি ছে?

হরিয়া কিছু বলিল না, ফুলশরিয়া প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দে; চাউল দে।

চাল লইয়া সে ধুইতে বসিল। সহসা নটবর ডাক্তারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

উনচল্লিশ

পলাশপুর অভিমুখে যাইতে যাইতে শঙ্কর নিজের মনের আধুনিকতম সমস্যার কথাটাই ভাবিতেছিল। তাহা পল্লীসংস্কার নয়, গুলাব সিং নয়, সুরমা। সুরমাকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না। এজন্য সে লজ্জিত হইতেছিল, নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল; কিন্তু কিছুতেই মনকে সুরমা-মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবল মনে হইতেছিল, এই অশুদ্ধ অশান্ত চিত্ত লইয়া দেশের কাজ করিবার সত্যই কি কোনো অধিকার আছে তাহার? কোনোও কালে কি ছিল? বাষ্পে স্ফীত রবারের বেলুনের মত এক-একটা ভাবে মাতিয়া কিছুকাল সে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এত দুর্বল কেন সে? নারীর সান্নিধ্যে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না, সমস্ত আদর্শ সমস্ত শিক্ষা নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কেন এমন হয়? সে তো প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখে, তবু কেন তাহার অন্তরবীণার সমস্ত তার আচম্বিতে অকস্মাৎ এমনভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে? জীবনে এমন বহুবার হইয়াছে। কেন এমন হয়? অমিয়াকে ঘিরিয়া তাহার এ আকুলতা জাগে না তো। চুনচুন, সুরমা, বেলা, নীরা তাহার মনে যে ঢেউ তোলে, অমিয়া তাহা পারে না কেন? মনকে সহস্র প্রশ্ন করিয়াও কোনো উত্তর মেলে না, মন কেবল স্বপ্ন দেখিতে থাকে। সে ভাবিয়াছিল, তাহার মনের এই স্বপ্নসাধ বুঝি মিটিয়া গিয়াছে। পল্লীসংস্কারের প্রেরণায় আদর্শবাদের কঠোরতায় তাহার চঞ্চল যৌবনচিত্ত বুঝি শান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু না, আজ সে সবিস্ময়ে দেখিতেছে, মনের এই প্রিয়-প্রবণতা প্রচ্ছন্ন ছিল মাত্র, বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহা এতদিন পরে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল কেন? এই সুরমাকে তো সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, এতদিন তো কিছু হয় নাই। এতদিন পরে সুরমাকে ঘিরিয়াই আবার স্বপ্ন জাগে কেন? সহসা সে অনুভব করিল, তাহার মন যেন ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এক অংশ অপরাধী, এক অংশ বিচারক এবং আর এক অংশ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা অংশ উভয় পক্ষেরই কথা শুনিতেছে, উভয় পক্ষের প্রতিই সে সহানুভূতিসম্পন্ন।

মনের এই অংশই যেন নিগূঢ়ভাবে শঙ্করের প্রশ্নের উত্তর দিল। বলিল, তোমার কবি-চিত্ত যে প্রিয়া কামনা করে, অমিয়ার মধ্যে সে প্রিয়া নাই। অমিয়া তোমার প্রিয়া নয়, প্রয়োজন। প্রিয়াকেই তুমি মনে মনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ এবং যে নারীর মধ্যে তাহার আভাস পাইতেছ তাহাকে ঘিরিয়াই তোমার মনে স্বপ্ন-রচনা করাই তোমার স্বভাব। এতদিন পল্লীসংস্কারের স্বপ্নে মগ্ন ছিলে, বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে স্বপ্ন ক্রমশ ভাঙিতেছে, প্রাক্তন স্বপ্ন তাই ফিরিয়া আসিতেছে আবার। তাই কি?

লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর অবাক হইয়া গেল। যে লোকটি তাহাকে লোকনাথের বাড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, সে বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে চাহিল না। আকারে ইঙ্গিতে সে এমন ভাব প্রকাশ করিল যেন একটা বাঘের গুহা অথবা সাপের বিবর। দূর হইতে অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাঁচে। শঙ্করের প্রতিও লোকটা এমনভাবে দুই-একবার চাহিল, যাহার ভাবটা--- আচ্ছা অসমসাহসিক ভদ্রলোক তো, ওখানে কি দরকার? তাহারই মুখে শঙ্কর শুনিল যে, লোকনাথবাবু স্কুলে আর চাকরি করেন না, স্কুল হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা দাঁড়াইল না। চলিয়া গেল। শঙ্কর একা দাঁড়াইয়া রহিল।

সূর্য অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যা আসন্ন। লোকনাথ ঘোষালের জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল। লোকনাথবাবুর সহিত বহুদিন তাহার কোনো যোগ নাই। কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে দেখা তো হয়ই নাই, বছর দুই হইতে পত্রালাপও বন্ধ আছে। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাতেও সে আর লেখে না। লোকনাথবাবু উপর্যুপরি কয়েকবার তাহার লেখা প্রত্যাখান করায় আর লেখাও পাঠায় নাই। বস্তুত লোকনাথবাবুর সহিত কার্যত কোনো যোগ তাহার আর নাই। তবু সে হঠাৎ— মাত্র একখানি পত্র পাইয়াই---- আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের এই আচরণে নিজেই সে বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল। আসিয়াছে বলিয়া বিস্ময় নয়। এতদিনের অদর্শন এবং এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও লোকনাথবাবুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এখনও অটুট আছে, ইহা আবিষ্কার করিয়াই সে বিস্মিত হইল। লোকনাথবাবুর প্রতি এ অহেতুক শ্রদ্ধা কেন? কী আছে লোকটার মধ্যে।

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

ভাঙা পুরুষকণ্ঠে কে যেন ধমকাইয়া উঠিল! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম করিয়া একটা গুরুভার পতনের শব্দ এবং নারীকণ্ঠের আর্ত করুণ একটা চিৎকার। শঙ্কর আর আত্মবিশ্লেষণ করিবার অবসর পাইল না, ভদ্রতার রীতি লঙ্ঘন করিয়া সামনের দরজা ঠেলিয়া সোজা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়াই যাহা তাহার চোখে পড়িল, তাহা অপ্রত্যাশিত। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার একটি রমণী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। শঙ্করকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া বসিলেন। শঙ্কর দেখিল তাঁহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। লোকনাথবাবু একটা তক্তাপোশের উপর বসিয়া রহিয়াছেন, চতুর্দিকে বই খাতা ছড়ানো। তাঁহার রক্তচক্ষু কপালে উঠিয়াছে, দৃষ্টি দিয়া আগুনের হলকা বাহির হইতেছে, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, ঠোঁট কাঁপিতেছে, বাহু ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত, সমস্ত দেহটাই যেন আক্ষিপ্ত। সর্ব-অবয়বে যেন ক্রোধ এবং ঘৃণা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, গলার চারিদিকে ঘা। পূর্বে গণ্ডমালা ছিল, এখন সেগুলি ঘায়ে পরিণত হইয়াছে। তৈলাভাবে মাথার চুল রুক্ষ অবিন্যস্ত। কপালে ঠোঁটের আশেপাশে কালো দাগ। শঙ্করের সহসা মনে হইল, লোকটা দগ্ধ হইতেছে।

কে—কে আপনি?

লোকনাথবাবু শঙ্করকে চিনিতেই পারিলেন না।

আমি শঙ্কর।

শঙ্করবাবু! ও। আসুন আসুন, আপনি, এখানে এমন হঠাৎ?

বাঁচান আমাকে বাঁচান।—ভব্যতা লজ্জা সমস্ত ভুলিয়া হররমা শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

ভেতরে যাও, ভেতরে যাও শিগগির, ভেতরে যাও বলছি।

লোকনাথবাবু এমন চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, শঙ্করের ভয় হইল, হয়ত আবার কি করিয়া বসিবেন! তাড়াতাড়ি নিজের পা ছাড়াইয়া লইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল।

ভেতরে যা—ও।

হররমা আর বসিয়া থাকিতে সাহস করিলেন না। মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে উঠিয়া ভেতরের দিকে চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবামাত্র লোকনাথবাবুর মুখভাব পরিবর্তিত হইল। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই, প্রফুল্লমুখে বলিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে?

বহুদিন পরে প্রিয়দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আসল সত্য গোপন করিয়া শঙ্কর বলিল, এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যাই।

বেশ করেছেন। আসুন, বসুন। ভালই হ'ল এসেছেন. আপনাকে শোনানো যাক তা হ'লে। সময় আছে তো আপনার?

আছে।

বসুন তা হ'লে। একটা প্রবন্ধ লিখেছি, শুনবেন?

বেশ তো।

নিকটেই একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার ছিল, শঙ্কর তাহাতে উপবেশন করিল। লোকনাথবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিয়া দিলেন। পড়িতে পড়িতে আবেগভরে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। প্রবন্ধের নাম—'বাঙালিত্ব'। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা আবিষ্কার করিল যে, সে প্রবন্ধ শুনিতেছে না, এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটিকে অদৃশ্য একটা নিক্তিতে চড়াইয়া মনে মনে ওজন করিতেছে এবং তাহা লইয়া নিজের সহিত নানা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। একটা জিনিস যাহা ইতিপূর্বে ইহার সম্বন্ধে কখনও মনে হয় নাই, তাহাই সহসা যেন অতি স্পষ্ট এবং কষ্টদায়ক রূপে মনে প্রতিভাত হইল এবং চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। অজানিত হররমা-সম্পর্কিত ব্যাপার বাদ দিয়াও, শুধু তাহার সাহিত্যিক প্রকৃতি হইতে বিচার করিলেই অনিবার্যভাবে মনে হয়, অতিশয় সঙ্কীর্ণমনা লোকটা, এতটুকু উদারতা নাই। জগতের সহিত দূরের কথা, সমগ্র ভারতের সহিতই তাঁহার অন্তরের আত্মীয়তা নাই। নিরতিশয় স্বল্পপরিসর গণ্ডির মধ্যে নিজের 'বাঙালিত্ব' লইয়া তিনি আস্ফালন করিতেছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ লইয়াও তাঁহার গর্ব নয়। তাঁহার ধারণা, পদ্মার ওপারে যাহারা থাকে, তাহারা সকলেই অসভ্য বর্বর, তাঁহার মতে বাঁকুড়া-মানভূমও প্রকৃষ্টরূপে মার্জিত নয়, তাঁহার যত গর্ব ভাগীরথীর-সন্নিহিত রাঢ় প্রদেশ লইয়া। শুধু তাহাই নয়, সাহিত্যের একটা বিশেষ নীতি, সীমাবদ্ধ মতবাদ, বিশিষ্ট ভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করে না। সেই সীমার মধ্যে তাঁহার স্বকীয় সাহিত্য-চর্চা অবশ্য শক্তির পরিচায়ক, কিন্তু তাহা চর্চা মাত্র, সৃষ্টি নয়,—সঙ্কীর্ণ মন লইয়া বৃহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় না। বিদ্যাবত্তা এবং মনীষার সমন্বয়ে তাঁহার রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দেহ নাই, বিদগ্ধ চিত্তকে তাহা পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পরিমিত বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া ওঠে। মনে হয়, দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে, মুক্তি

পাইলে বাঁচি। তাহার শুচিবায়ুগ্রস্ত সাবধানী মন নিজ বক্তব্যকে নিখুঁতরকমে সুস্পষ্ট করিবার প্রয়াসে শব্দবিন্যাসের এত নিপুণতা এত পাণ্ডিত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে এত দম্ভ এত বক্রোক্তি প্রকাশ করিয়াছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা কাব্য না হইয়া একটি জটিল গ্রন্থিসঙ্কুল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে তাহাতে স্বচ্ছতা নাই, স্নিগ্ধতা নাই, মনে হয়, বকবকানি ছাড়া যেন আর কিছুই নাই। সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া ওঠে। কেহ তাই তাঁহার লেখা পড়ে না। শ্রোতা পাইলে তাই তিনি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। এই যে এতকাল পরে আসিলাম, আমাকে একটা কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না, আহারাদি হইয়াছে কি না খোঁজ লইলেন না, নিজের কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য একেবারে হুড়মুড় করিয়া প্রবন্ধ পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন। লোকটার সঙ্কীর্ণতা, আত্মম্ভরিতা এবং কাঙালপনা শঙ্করকে পীড়িত করিতে লাগিল। আবার তখনি মনে হইল, একটা বিশেষ পন্থায় বিশেষ দেবতার সাধনা মানেই সঙ্কীর্ণতা নয়। একসঙ্গে তেত্রিশ কোটির পূজা করা কি সম্ভব? একনিষ্ঠ পূজা মানেই কি নিজের বিশেষ দেবতাটি ছাড়া বাকি সকলের প্রতি ঔদাসিন্য নয়? এবং সেই ঔদাসিন্যের সহিত গৌণভাবেও কি ঈষৎ বিতৃষ্ণা মিশ্রিত থাকে না? থাকাটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষ একটি দেবতা বাছিয়া বরণ করার অর্থই তো অন্য দেবতার খুঁত সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। যাঁহারা সমদৃষ্টি অথবা উদারদৃষ্টির বড়াই করেন, হয় তাঁহারা কোনোও দেবতারই উপাসক নন, না হয় তাঁহারা ভণ্ড। দেবতার সম্বন্ধে যাহা সত্য, সাহিত্যবুদ্ধি সম্বন্ধে বা রাজনীতি সম্বন্ধেই বা তাহা সত্য নহে কেন?

লোকনাথবাবু পড়িয়া চলিয়াছেন, 'জীবনে কাহারও কৃপা, করুণা অথবা ক্রোধের তোয়াক্কা না রাখিয়া এ দেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর আশীর্বাদ অভিশাপ উপেক্ষা করিয়া আমি যে ধরনের সাহিত্যচর্চা করিয়াছি, তাহাও এক হিসাবে আমারা বাঙালিত্বেরই পরিচয় বহন করিতেছে। বাঙালিজাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পরানুকৃতি তাহার একটা মজ্জাগত স্বভাব বটে, কিন্তু সকলে যখন অনুকরণের সুরায় বুঁদ হইয়া রহিয়াছে তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও উল্টা কথা বলিবার শক্তি এই বাঙালিরই আছে। নেশা করিয়াও সে নেশার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতে পারে; তাই আজ যখন সকলের চিত্ত বিশ্বমুখী, কেহ যখন চীনের দুঃখে কাতর, কেহ কমিউনিস্ট, কেহ যখন ইউরোপীয় ডেমোক্রেসির অধঃপতনে বিগতনিদ্র, তখন আমিই কেবল তারস্বরে বলিতেছি— আগে ঘর সামলাও; বিশ্বকে জানিবার পূর্বে নিজেকে জানো। নিজের বৈশিষ্ট্য বৈভবকে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের পবিত্র যজ্ঞাগ্নির মত রক্ষা করিতে শেখো, নিজের বৈশিষ্ট্য যদি পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পার, তবেই তোমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক। পরের কথায় সায় দিয়া পরের সুরে সুর মিলাইয়া পরের হুজুগে মাতিয়া নাচিলে ইতঃভ্রষ্ট ততো নষ্ট হইবে মাত্র। ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি— সকলেই আগে ঘর সামালাইয়াছে, বস্তুত উহাই তাহাদের মুখ্য লক্ষ্য। নিজের ঘর সামলাইয়া তাহার পর তাহারা বিশ্বের দিকে নজর দিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বনজরের প্রকৃত তাৎপর্যও আজ সুধী সমাজে অবিদিত নাই। সুতরাং—'

লোকনাথবাবু আবেগভরে পড়িয়া চলিয়াছেন, শঙ্কর হঠাৎ বাধা দিল। বস্তুত তাহার মনে হইল, এই আহত রমণীটির সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ না করিলে তাহার আচরণ শুধু যে ভণ্ডামির নামান্তর হইতেছে তাহাই নয়, অস্বাভাবিকও হইতেছে। ভূপতিত রক্তাক্ত একটি নারীকে স্বচক্ষে এমন অবস্থায় দেখিবার পর সে সম্বন্ধে নীরব থাকা খুবই অশোভন। উনিই যে হররমা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু উনিই যদি হররমা হন, তাহা হইলে লোকনাথবাবুর এ কি রকম আচরণ।

মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, একটা কথা—

কি বলুন?

আমি এসে যাঁকে দেখলাম, উনি—

শঙ্কর ইতস্তত করিতে লাগিল।

উনি আমার স্ত্রী।

লোকনাথবাবু শঙ্করের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, উনি আমার সাহিত্যিক জীবনের বাধা, অভিশাপ।

শঙ্কর সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বুঝতে পারছি না ঠিক।

পারতেন, যদি আপনিও একনিষ্ঠ সাহিত্যিক হতেন।

কেন, উনি করেছেন কি?

আমাকে সাহিত্য-পথভ্রষ্ট করবার জন্যে না করেছেন হেন কাজ নেই। আমার লণ্ঠনের পলতে ফেলে দিয়েছেন, দোয়াতের কালিতে জল মিশিয়েছেন, আমার খাতা কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ওঁর ইচ্ছে, ভারতীর নয়, ওঁরই আরতি আমি সারাজীবন ধ'রে করি।

লোকনাথবাবুর মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই বাঁজা মাগীটা জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছে আমার।

তিনি আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া হররমা পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

আমি তোমার জীবন দুর্বহ ক'রে তুলেছি? শুনুন তা হ'লে আপনি—

যাও, ভেতরে যাও।

আমার বিছে ফেরত দাও, এখুনি চ'লে যাচ্ছি।

দেব না। চ'লে যাও বলছি।

লোকনাথবাবুর চোখ দুইটা ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়মুষ্টিতে তিনি একখানা বই চাপিয়া ধরিলেন। শঙ্করের ভয় হইল, হয়তো ছুঁড়িয়া মারিবেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং হররমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

আমার যা কিছু গয়না কাপড় ছিল, সব বেচে বেচে ওই 'ক্ষত্রিয়' ছাপা হচ্ছে। খাট বিছানা আলমারি দেরাজ সব ওইতে গেছে। ওই বিছেটুকু লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাও জোর ক'রে নিয়েছে আজ। ওটুকু উদ্ধার ক'রে দিন আমাকে, আপনার পায়ে পড়ছি আমি।

বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও বলছি—

চুপ করুন আপনি।

ধৈর্যচ্যুত শঙ্কর হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল। গর্জন শুনিয়া লোকনাথবাবুও চমকাইয়া উঠিলেন। শঙ্করের এইরূপ রূপ তিনি কখনও দেখেন নাই। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সহসা তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

চল্লিশ

শঙ্কর পলাশপুর হইতে ফিরিতেছিল।

হররমার বিছা উদ্ধার করিয়া সে প্রত্যর্পণ করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা বড় দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে। লোকনাথবাবুকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে, 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইবার সমস্ত ব্যয়ভার সে বহন করিবে। 'ক্ষত্রিয়ে'র প্রবন্ধাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে লোকনাথবাবু তাহা শঙ্করের

নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং শঙ্কর নিজে কলিকাতায় গিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তাহা ছাপাইয়া যথাস্থানে সেগুলি বিতরণ করিবে। আজকাল মূল্য দিয়া কেহ 'ক্ষত্রিয়' কেনে না। লোকনাথবাবুর বিচারে যাঁহারা সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা বিনামূল্যে 'ক্ষত্রিয়' উপহার পাইয়া থাকেন। ইহা করিতে গিয়াই লোকনাথবাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না, শঙ্কর তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু শক্তি এবং আমার ঘরে একখণ্ড কপর্দক অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আমি থামব না। আমার স্ত্রী আমারই অর্থে তাঁর বোনপো-বউকে শাড়ি পাঠাবেন আর অর্থাভাবে আমার কাগজ উঠে যাবে— এ কখনও হতে পারে না। এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য।... লোকনাথবাবুর কথাগুলি শঙ্করের মনে পড়িল। লাঞ্ছিতা হররমার কাতর অশ্রুসিক্ত মুখখানিও মনে পড়িল। কাহারও দাবি সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

আজকাল 'ক্ষত্রিয়' ছাপাইতে কত খরচ পড়িতে পারে, মনে মনে তাহাই সে হিসাব করিতেছিল। শুধু তাহাই নয়, যে 'ক্ষত্রিয়'কে একদিন প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, যাহা একদিন তাহার দিবসের চিন্তা এবং রাত্রির স্বপ্ন ছিল, সেই 'ক্ষত্রিয়' অদ্ভুতভাবে আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে— এই চিন্তায় সে বিভোর হইয়াছিল। সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া যাহাকে সে একদা স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিল! 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকাটাকে একটা জীবন্ত প্রাণবান কিছু বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল, মায়া কাটাইতে না পারিয়া পথ চিনিয়া আবার যেন ফিরিয়াছে। বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়িল। ছেলেবেলায় সে একটা কুকুর পুষিয়াছিল। যদিও অতি সাধারণ দেশি কুকুর, কিন্তু তাহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে খাওয়ান, নাওয়ান, শোওয়ান, কসরৎ শেখান ছাড়া আর কোনো কাজ বা চিন্তা ছিল না। কিন্তু সে কুকুরকে ছাড়িতে হইল। মায়ের শুচিবায়ু প্রবল ছিল। কুকুরটাকে দেখিলেই তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন। শঙ্কর ওটাকে লইয়া মাখামাখি করিতেছে— এ চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। বাধ্য হইয়া কুকুরটাকে ছাড়িতে হইল। না ছাড়িলে মা হয়তো পাগলই হইয়া যাইতেন। সহপাঠী অবিনাশের কুকুরটার প্রতি লোভ ছিল, তাহাকেই সে কুকুরটা দান করিয়া দিল। অবিনাশ কুকুর লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। তাহার বাড়ি দশ ক্রোশ দূরে। মাস দুই পরে একদিন মনে হইল, কে যেন কপাট আঁচড়াইতেছে, কুঁই-কুঁই শব্দও শোনা গেল। দ্বার খুলিয়া শঙ্কর দেখে, টম ফিরিয়া আসিয়াছে। দশ ক্রোশ হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার উৎসুক দৃষ্টি, আনন্দিত পুচ্ছ, চোখের উপর ছবিটা আবার যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'ক্ষত্রিয়ে'র মলাটটা এবার নূতন ধরনের করিতে হইবে, কতই বা খরচ পড়িবে?

স্টেশনে গাড়ি ছিল না, শঙ্কর হাঁটিয়া ফিরিতেছিল। হঠাৎ একটা কোলাহল কানে আসিল। চাহিয়া দেখিল, একদল লোক হাল্লা করিতে করিতে আসিতেছে। কিসের হাল্লা? কে ইহারা? ছ্যারা-রা-রা-রা—। ও, হোলির দল। সকলের মাথায় ফাগ, জামা-কাপড়ে রঙ, যুদ্ধের বাজারে ভাল লাল রঙ জোটে নাই, সবুজ হলুদ বেগুনি যে যাহা পাইয়াছে মাখিয়াছে, অনেকের মুখে তেল কালি মাখানো, খচমচ করিয়া একটা বাজনা বাজিতেছে, সঙ্গে গোটা কয়েক ঢোলও আছে, দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে হোলিতে মাতিয়াছে সব। ছ্যারা-রা-রা-রা...। শঙ্কর এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহার মনে হইল, কে ইহারা? ইহারাই কি তাহার স্বদেশবাসী? ইহাদের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল কি আছে? এই ইহাদের উৎসব? এভাবে উৎসব করিবার কল্পনাও সে কি করিতে পারে? সভ্যতা ভব্যতা, শ্লীলতা, শোভনতা, মানসিক যে সব উৎকর্ষকে আয়ত্ত করিবার জন্য সে এতদিন সাধনা করিয়াছে, এই জনতা কি তাহার

মূর্ত প্রতিবাদ নয়? কিছুকাল পূর্বে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার মনে যে গর্ব হইয়াছিল, তাহা সহসা যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ইহাই কি ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ? বসন্তোৎসবের সহিত যে মদনিকা-মালবিকা, আবীর-কুঙ্কুম, ঝারি-পিচকারি, যে রঙ ও রসের মধুর ছবি তাহার কল্পলোকে রঙিন হইয়া আছে, এই উন্মত্ত সভ্যতা দেহসর্বস্ব জনতার মধ্যে তাহার কিছুমাত্র আভাস তো নাই। ইহারা কি সত্যই ভারতীয়? সত্যই তাহার আপন লোক? ইহাদের উদ্ধার করিবার জন্যই কি সে জীবন পণ করিয়াছে? ইহাদের, এই মূঢ় বর্বরদের উদ্ধার করিবার সত্যই কি উপায় আছে কোনো? নির্বাক বিস্ময়ে নূতন দৃষ্টিতে সে এই জনতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দূরে একটা নারীমূর্তি দেখা গেল। একটু কাছে আসিতেই দলের মধ্যে একজন আগাইয়া গিয়া অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীসহকারে মেয়েটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া অশ্লীল একটা ছড়া মুখে মুখে বানাইয়া সুর করিয়া গাহিতে লাগিল। জনতা গর্জন করিয়া উঠিল, হো-হো-হো-হো ছ্যারা-রা-রা-রা—। খচমচ খচমচ বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। মেয়েটি লজ্জায় মরিয়া গেল না। সরিয়া গেল না। ছদ্ম রোষভরে সে বরং আগাইয়া আসিল এবং রাস্তা হইতে এক আঁজলা ধূলা তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। শঙ্কর হঠাৎ চিনিতে পারিল। মেয়েটি আর কেহ নয়, ফুলশরিয়া। তাহাকে দেখিয়া যে লোকটা গান ধরিয়াছিল, সে চানাচুরওয়ালা রামু। রামুর চোখে বোধ হয় ধূলা পড়িয়াছিল। তবু সে চোখ মুখ কুঁচকাইয়া হাসিতে হাসিতে আগাইয়া গেল এবং ফুলশরিয়াকে ধরিয়া তাহার সমস্ত মুখখানাতে 'বাঁদুরে রঙ' মাখাইয়া দিল। আর একজন ঢালিয়া দিল পাতলা খানিকটা গোলাপি রঙ। বিস্রস্তকেশা ফুলশরিয়া একমুঠা ধূলা ছুঁড়িয়া মারিল। সর্বাঙ্গ তাহার রঙে ভিজাইয়া দিল 'ছৌড়াপুতারা'। খচমচ খচমচ করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। হো-হো-হো-হো—ছ্যারা-রা-রা-রা— উন্মত্ত জনতা উদ্বাহু হইয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। সহসা তাহারা শঙ্করকে দেখিতে পাইল এবং থামিয়া গেল। হঠাৎ ভিড়ের ভিতর হইতে ঈষৎ টলিতে টলিতে নটবর ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন।

নমস্কার শঙ্করবাবু, আসুন, আজকের দিনে একটু ফাগ নিন। অমন টিপ-টপ হয়ে থাকা মানায় না আজকের দিনে।

দিন।

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও কপালটা না বাড়াইয়া দিয়া সে পারিল না। নটবর তাহার কপালে ফাগ লাগাইয়া দিলেন।

সেদিন আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছি আমি।

কেন, কিছু দরকার ছিল?

ছিল বইকি। হরিয়াটার নামে দারোগা সাহেব বি এল কেস চালাতে চান। এ গ্রাম থেকে একটি সাক্ষী যাতে না জোটে, তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

হরিয়া এবং অন্যান্য অনেকের নামে পুনরায় থানায় নালিশ হইয়াছে— এ কথা তিনি হরিয়ার মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া শঙ্করকে এ বিষয়ে কিছু বলাটা তাঁহার অনুচিত বোধ হইল। কেবল বলিলেন, কথা যখন দিয়েছি, তখন ও ব্যাটাকে বাঁচাতেই হবে। আপনাকে সাহায্য করতে হবে একটু। ওরে হরিয়া!

ভিড়ের ভিতর হইতে রঙ-মাখা হরিয়া কুণ্ঠিতমুখে বাহির হইয়া আসিল।

কাল যাবি বাবুর বাড়িতে, গিয়ে একবার মনে করিয়ে দিবি। উনি পাঁচ কাজের মানুষ।

জি হুজুর।

আচ্ছা, চলি তবে এখন আমরা। হইহই করা যাক আজকের দিনটা— বছরের একটি দিন বই তো নয়।

দল আগাইয়া গেল। শঙ্কর দেখিল, দলের ভিতর শুধু হরিয়া নয়, কারু, ফকিরা, কর্পূরা, মধু, বেচু— সকলেই রহিয়াছে। রঙে নাহিয়া ফুলশরিয়া একটু দূরে আগে আগে চলিতেছিল। শঙ্কর তাহার পিছু পিছু চলিতে লাগিল।

হঠাৎ আর একটা দল আবির্ভূত হইল। ইহাদের ধরণটা অন্যরূপ। একজনকে মড়া সাজাইয়া খাটের উপর শোয়াইয়াছে এবং শোভাযাত্রা করিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। শোভাযাত্রার আগে একজন এবং পিছনে একজন গাধার পিঠে চড়িয়া আসিতেছে। সকলে, এমন কি মড়া এবং গাধা দুইটা পর্যন্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত। যে মড়া সাজিয়াছে, সে মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে এবং বাকি সকলে জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে। হোলির দিনে মৃত্যুকেও তাহারা রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে। হাসির হর্‌রা তুলিয়া মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতেছে, রাম নাম সৎ হ্যায়।

ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর উভয়েই রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। তাহাদের কেহ কিন্তু লক্ষ্যই করিল না, নিজেদের আনন্দেই সকলে মশগুল হইয়া রহিয়াছে।

ইহাদের পিছনে আর একটা তৃতীয় দলও দেখা দিল। ইহারা একটু প্রবীণ গোছের, পক্ককেশ বৃদ্ধও আছে। সকলেই ফাগ-মাখা, সকলেরই গায়ে রঙ। ঢোল এবং খঞ্জনি বাজাইয়া সমস্বরে গান গাহিতেছে ও নাচিতেছে।

সীতারাম সীতারাম, জয় জয় সীতারামকি—
রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম, জয় জয় রাধেশ্যামকি—

দুই হাত তুলিয়া উদ্দাম নৃত্য। ইহারাও চলিয়া গেল। ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর তখন পথে উঠিল। ফুলশরিয়া আগাইয়া চলিতে লাগিল। শঙ্কর গতিবেগ একটু মন্থর করিয়া দিল। ভাবিল, মেয়েটা আগাইয়া যাক। যে চিন্তাটা কিছুক্ষণ আগে তাহার মনকে আলোড়িত করিতেছিল, তাহাই মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল। আমরা সত্যই কি একজাতের। ফুলশরিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একমুখ হাসিয়া বলিল, তু হাম সেনিসে ঘিন করইছ, নেই বাবু?

প্রশ্নটা শুনিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার মনের কথা মেয়েটা টের পাইল কি করিয়া! উহাদের সম্বন্ধে ঘৃণা, বড় জোর অনুকম্পা ছাড়া অন্য কোনো ভাব যে সে পোষণ করি না, তাহা নিজেই সে এতদিন স্পষ্ট করিয়া জানিত না। ইহাদের সহিত সত্যই তো তাহার কোনোও আন্তরিক যোগ নাই। শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে চিন্তায় কর্মে সত্যই সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের লোক। গায়ের রঙ এবং মুখের ভাষা ছাড়া বিলাতি মিশনারিদের সহিত তাহার যে বিশেষ কোনো তফাত নাই, সহসা এই সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ইহাদের সকলকে বর্বর মনে করিয়াই তো সে ইহাদের উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু ইহারা সত্যই কি বর্বর নয়? হঠাৎ নজরে পড়িল, ফুলশরিয়া তাহার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া আছে। মুখময় কালচে সবুজ রঙ, মাঝে মাঝে আবির লাগিয়াছে, বিস্রস্ত অলকগুচ্ছ কপালের দুই পাশে দুলিতেছে, হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক রকম সাদা, রঙে ভিজিয়া শাড়িটা সর্বাঙ্গে সাঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে। একটা ডাকিনী যেন! এই কি ভারতীয় রমণীর প্রতীক? এই কি শতকরা পঁচানব্বই জনের একজন? চকিতের মধ্যে কয়েকটা মুখ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। অমিয়া, সুরমা, কুন্তলা, চুনচুন, বেলা, বউদিদি, মিন্টিদিদি, রিনি, মুক্তো— ইহাদের মধ্যে কে ভারতীয়? সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কস্তুরবাঈ গান্ধী— ইহাদের মধ্যেই কি ভারতীয় রমণীর

বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে? এইমাত্র যে হররমার গহনা-সমস্যা সে সমাধান করিয়া আসিল, সেই কি ভারতীয়? না, এই ফুলশরিয়ারা? যমুনিয়ার শীর্ণ শুষ্ক মুখটাও মনে পড়িয়া গেল। ইহারাই তো সংখ্যায় বেশি। ইহাদেরও একটা জীবনযাপন নীতি আছে, কিন্তু আমাদের মানদণ্ড অনুসারে তাহা অসভ্য। সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহাদের সে সব বালাই নাই, ইহারাও চাষ করে, চাকরি করে, ব্যবসা করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, উপবাস করে। কিন্তু বিশেষ একটা কোনো সভ্যতার আদর্শে সবাই চলে না। অথচ খুঁজিলে ইহাদের মধ্যে সবই মিলিবে। অনার্য-আর্য-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব রকম সভ্যতার উচ্ছিষ্ট আসিয়া ইহাদের মধ্যে জমা হইয়াছে। যেন একটা ডাস্টবিন।

ডাস্টবিনটা সহসা আবার কথা কহিয়া উঠিল, কহ না বাবু, তু হাম সেনি সে নফ্‌রত করইছ?

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, ফুলশরিয়ার কথায় আবার আত্মস্থ হইল। অপ্রস্তুত মুখে ভুল হিন্দিতে আমতা আমতা করিয়া বলিতে হইল, না না, সে কি কথা, তোমাদের ঘৃণা করি না তো? আর কিন্তু সে ফুলশরিয়ার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, দ্রুত আগাইয়া গেল। ফুলশরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিছন ফিরিয়া তাকাইলে শঙ্কর দেখিতে পাইত, ফুলশিরা তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতেছে, যেন বাঘিনীর চোখ।

শঙ্কর কিন্তু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার মনের মধ্যে একটা ঘৃণা জাগিয়াছিল। এবং তাহাতে পল্লী-সংস্কার, লোকনাথ ঘোষাল, 'ক্ষত্রিয়', হররমা, অমিয়া, সুরমা, নিজের জীবনের আদর্শ, ভারতের ইতিহাস, ভবিষ্যৎ কর্তব্য— সমস্তই যেন অসংলগ্নভাবে আবর্তিত হইতেছিল। নতমস্তকে দ্রুতবেগে সে হাঁটিতে লাগিল, যেন একটা বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয়া চোখ বুজিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে।

একচল্লিশ

উৎপল নিবিষ্টচিত্তে রেডিও শুনিতেছিল। কি সর্বনাশ, রেঙ্গুন যে যায় যায়! কেনারাম চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন।

নিপুবাবু আর প্রমথবাবু চ'লে গেলেন। কিন্তু—

কেনারাম ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া উৎপল যে আবার কি মূর্তি ধরিবে, তাহা তিনি আন্দাজ করিতে পারিতেছিলেন না।

আবার 'কিন্তু কি'?

উৎপল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

গদাই দত্ত জরিমানা দিতে চাইছে না।

কি বলছে?

বলছে— দেব না, আপনারা যা করতে পারেন করুন।

উৎপল রেডিওর ডায়ালটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনি এখন যান।

কেনারাম কতকগুলি কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেগুলি টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, ব্যাঙ্কের হিসেব এটা। আমি আপ-টু-ডেট ক'রে রেখেছি। হাজার দশেক টাকা লোকসান হয়েছে।

ওসব শঙ্করকে দেবেন। আমি তার সঙ্গেই কথাবার্তা কইব।

কেনারাম চলিয়া গেলেন।

উৎপল ক্ষণকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে তাহার অধরে হাসি ফুটিল। রেডিওটা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ভিতরে যাইবার জন্য উঠিল। সুরমার সহিতই পরামর্শটা করা যাক। ছোটখাটো একটা প্রলয় করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির সাহায্য লইলে নেহাত অশোভন হইবে না।

বিয়াল্লিশ

গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্কর দেখিল, গ্রামে একটা হইহই পড়িয়া গিয়াছে। রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন লাগিয়াছে। পাটের গুদাম এবং ধানের গোলা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। রাজীব দত্তের বাড়ির চতুর্দিকে ভিড় এবং কোলাহল। দূর হইতে আকাশবিসর্পী লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উৎপল কথাকে কাজে পরিণত করিতে পারিয়াছে তাহা হইলে। রাগে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ যে কাহার উপর, ক্ষোভ ও দুঃখ যে কিসের জন্য, তাহা সে নির্ণয় করিতে পারিল না বলিয়াই সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বেদনায় আরও টনটন করিতে লাগিল। দুষ্ট শাস্তি পাইয়াছে এবং সে শাস্তির আয়োজন তাহার অভিমত অনুসারেই হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই: সুরমাও ইহাতে খুশি হইবে— এ সব যুক্তি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল। হারিয়া গেলাম, নামিয়া গেলাম, সব নষ্ট হইয়া গেল। যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা হইল না। সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া চুপে চুপে সে বাড়ি ফিরিল। ফিরিবার পথে বারংবার তাহার মনে হইতে লাগিল, ছাত্রজীবনে কোথাও আগুন লাগিয়াছে শুনিলে সে-ই সর্বাগ্রে ছুটিত আগুন নিবাইতে, এখন চোরের মত পলাইতেছে। কোন্ মুখ লইয়া সে এখন উহাদের কাছে যাইবে? ছি ছি, কি শোচনীয় অধঃপতন! কিন্তু কেন। কেন সে নিজের আদর্শকে ছোট করিতেছে? সনাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ ছাড়িয়া কোথায় কিসের লোভে চলিয়াছে সে? নিজের ক্রটি বিচ্যুতি দুর্বলতা সমস্ত ভুলিয়া তাহার মন সহসা এক নিষ্কলুষ স্বপ্নরাজ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ওই স্বপ্নরাজ্যই তো তাহার লক্ষ্য! অপথে বিপথে কোথায় সে ঘুরিয়া মরিতেছে?

বাড়ি ফিরিতেই খুকী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বাড়ির সামনেই ফাঁকা মাঠটায় সে দুইটি সমবয়সীর সঙ্গে ধুলা মাখিয়া খেলা করিতেছিল। তাহার ফ্রকে কে খানিকটা রঙ দিয়াছে। শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

বাবা, তুমি কোতা দেতলে?

পলাশপুর।

আমি পলাচপুর যাব।

এরা কে?

ছামিয়া বুদিয়া। কাও।

আধখানা-কামড়ানো একটা কুল সে শঙ্করের মুখে গুঁজিয়া দিল।

মুছাই এতো দুত্তু হয়েছে বাবা কুল পেলে দিতে বললে দেয় না। তাকে ব'কে দিও তো।

আচ্ছা।

বারান্দায় উঠিয়া সে খুকীকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খুকী ছুটিল মাকে খবর দিতে।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই শঙ্করের চোখে পড়িল, টেবিলের উপর কয়েক দিনের ডাক জমিয়া রহিয়াছে। উপরের পোস্টকার্ডখানা শ্বশুরের। তুলিয়া পড়িতে লাগিল— আসন্নপ্রসবা অমিয়াকে লইয়া যাইতে চান। অমিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাপড় নানা রঙে বিচিত্র এবং সিক্ত।

এমন অসময়ে রঙ দিলে কে?

রঙ সকালে দিয়েছে। আমি এখন আমাদের খোড়ো চালে জল ঢালছিলাম। রাজীববাবুর গোলায় আগুন ধরেছে, দেখলে না?

হ্যাঁ, দেখলাম আসতে আসতে।

আহা, বেচারীর সব পুড়ে গেল। কি ক'রে যে লাগল আগুন।

শঙ্কর পোস্টকার্ডেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না।

একদিনের নাম ক'রে গেলে, এই বুঝি তোমার একদিন?

এ কথারও জবাব না দিয়া শঙ্কর বলিল, তোমার বাবা চিঠি লিখেছেন, দেখেছ?

দেখেছি।

যাচ্ছ কবে?

আমার আবার যাওয়া। আরও তিনজন পোষ্য জুটেছে— দাইয়ের ছেলেমেয়েরা তো আছেই।

আবার কে জুটল?

ঝমরু তার ছেলেদের নিয়ে হাজির হয়েছে এসে। তার গলা দিয়ে আর স্বর বেরোয় না, কেঁপে কেঁপে জ্বর আসছে রোজ। কাল দেখি, খিড়কি দরজার পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েআছে। ছেলে দুটো পাশে ব'সে আছে চুপ ক'রে। দু'দিন খেতে পায়নি বললে। ডেকে এনে খেতে দিলাম। আর নড়তে চাইছে না।

অমিয়া হাসিল। শঙ্করও হাসিল।

দীনদুঃখীদের প্রতি অমিয়ার একটা স্বাভাবিক করুণা অবশ্য আছে; কিন্তু কেবল এই জন্যই সে যে বাপের বাড়ি যাইতে চাহিতেছে না, তাহা সত্য নহে। আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে। শঙ্করের পরিবর্তিত মনোভাব সেও টের পাইয়াছিল। মুখে সে কিছু বলে নাই, কোনোওদিন বলিবেও না, কিন্তু শঙ্করকে ছাড়িয়া এ সময় সে কোথাও যাইবে না।

দুই হাতে দুই মুঠো মটরশুঁটি লইয়া খুকী ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া পাশ কাটাইয়া বাহিরে পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দেখেছ মেয়ের কাণ্ড? রেখে আয় মটরশুঁটি— বলিয়া অমিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। খুকী চোখ দুইটি বড় করিয়া নীরবে শঙ্করের পানে চাহিল। ভাবটা, মায়ের ব্যবহারটা দেখ একবার।

শঙ্কর বলিল, দাও, দাও, ছেড়ে দাও।

ছাড়িয়া দিতেই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এমনি দস্যি হয়েছে! ওরা এসে থেকে পর্যন্ত দিনরাত ওদের সঙ্গে আছে। কাল সন্ধেবেলা ওদের কাছে গিয়ে শুয়েছিল পর্যন্ত।

ওরা শুচ্ছে কোথা?

ভাঁড়ার ঘরের পাশের গলিটায়।

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া শঙ্কর বেশিক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইল না। বাহিরের ঘরে লোকের পর লোক আসিতে লাগিল। স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়া দুই পাউন্ড কুইনিন লইয়া গেলেন। বিরিপুরের একজন শিক্ষক আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, লছমন গোয়ালার পুত্রকে ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হয় নাই বলিয়া লছমন তাহাকে শাসাইতেছে, মারিবে বলিতেছে। লছমন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বিরিপুরে তাহার প্রতিপত্তিও আছে। শিক্ষক মহাশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার ব্যবস্থা না করিলে কার্যে ইস্তফা দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কারু, ফরিদ, রহিম, কর্পূরা, ফকিরার দল এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আসিয়া পায়ে উপুড় হইয়া পড়িল, দারোগার কবল হইতে বাঁচাইতে হইবে। কেনারামবাবু তাহাদের নামে থানায় নালিশ করিয়া আসিয়াছেন। জমিরগঞ্জে উল্টামহরমের দিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জমিরগঞ্জ মুসলমান প্রধান স্থান। একজন মৌলভি আসিয়া সমস্ত মুসলমানদের মন হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া তুলিয়াছে। সেখানকার হিন্দু-প্রজাদের মুখপাত্র গুলজার সিং আসিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিল। প্রতিকারের উপায়ও বলিয়া দিল। শঙ্করবাবু এবং গুলাব সিং আসিয়া যদি 'মদৎ' করেন, তাহা হইলে সে—গুলজার সিং— একাই উহাদের 'বীজ' পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিতে পারে। বদমায়েসগুলা একটা কচি বাছুরের গলায় মালা পরাইয়া সেটাকে হিন্দুদের বাড়ির সামনে দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গিয়া প্রকাশ্য স্থানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে! গুলজার সিং আর একটা উপায়ও বলিল। রাজীব দত্ত এই মুসলমানগুলার মহাজন। তিনিও ইচ্ছা করিলে প্রতিশোধ লইতে পারেন এবং শঙ্করবাবু অনুরোধ করিলে তিনি যে অস্বীকার করিবেন তাহা মনে হয় না। গুলাব সিং ও শঙ্করবাবুর অনুরোধ সে ঠেলিতে পারিবে না। চক্রবর্তী মহাশয় আসিয়া নিপুদা এবং প্রমথ ডাক্তারের বিতাড়নবার্তা জানাইয়া গেলেন! প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলিলেন, পাঁচ বছর পুরে গেছে, উৎপল হিসেব চাইছিল। আমি ব্যাঙ্কের হিসেব ঠিক ক'রে রেখেছি। দশটি হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। তুমি বাকি সব ডিপার্টমেন্টগুলোর হিসেব ঠিক রেখো। উৎপল বাইরে দেখতে ও রকম হ'লে কি হবে ভেতরে বেশ স্ট্রিকট আছে। খু—ব। চক্রবর্তী মহাশয় চলিয়া যাইবার পর ঝক্‌সু আসিল এবং বলিল যে, নিপুবাবুর সহিত তাহার পুত্র রামলালও অন্তর্ধান করিয়াছে। ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার একজন চৌকিদারকে দিয়া খবর পাঠাইলেন, আশপাশের গ্রামে এই অসময়ে (খুব সম্ভব হোলির জন্য) কলেরা লাগিয়াছে। পাশের গ্রামেই দশজন মারা গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে স্যানিটেশন বিভাগের চৌধুরী আসিয়া ছিলেন, তিনি তো কিছুই বলিলেন না, সম্ভবত কোনো খবরই রাখেন না। অথচ প্রতি মাসে এই জন্য বেতন পান।

শঙ্কর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় অমিয়াকে বলিয়া গেল, কেহ যদি খুঁজিতে আসে, তাহাকে যেন বলিয়া দেওয়া হয় যে, সে বাড়ি নাই। রাত্রি দশটার সময় অমিয়া যখন তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতে গেল তখনও নিস্তব্ধ হইয়াই বসিয়া ছিল।

চল, খাবে চল।

চল।

অমন চুপ ক'রে মন-মরা হয়ে বসে আছ যে। কি হয়েছে?

কিছু না।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বলবে না?

অমিয়াও পাশে বসিয়া পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। টাকাটা

পুরিয়ে দিতে না পারিলে উৎপলের কাছে মান থাকবে না।

অত টাকা লোকসান হল কি ক'রে?

সবাই ধার নিয়েছে আর শোধ দেয়নি, মানে দিতে পারেনি। আমি ভাবছি—

বলিতে গিয়া শঙ্কর হঠাৎ থামিয়া গেল।

কি ভাবছ?

একটা কথা তুমি জান—বাবা উইল ক'রে তাঁর সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে গেছেন।

জানি তো।

কি ক'রে জানলে।

তাঁর উইল তো ওই কাঠের আলমারির দেরাজে রয়েছে, দাদা সেবার এসে বার করলে যে। কেন, তাতে কি হয়েছে?

অমিয়া জানিত। জানিয়াও তাহাকে এতদিন কিছু বলে নাই। অমিয়া চরিত্রের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ সহসা যেন তাহার চোখে পড়িয়া গেল।

কি ভাবছ, বললে না?

ভাবছি— না থাক্ তোমার টাকাগুলো নষ্ট ক'রে ফেলা ঠিক হবে না।

আমার টাকা তোমার টাকা বলে আলাদা কিছু আছে নাকি? কালই তুমি টাকাটা তুলে ব্যাঙ্কে জমা করে দাও। তোমার মানের চেয়ে তো আর টাকা বড় নয়।

বাবা যে কত টাকা রেখে গেছেন, তাও তো ঠিক জানি না। ও-টাকাতে যদি না কুলোয়—

যদি না কুলোয় তা হ'লে আমার গয়না বিক্রি ক'রে দাও। ওর জন্যে আর ভাবনা কি? চল, খাবে চল। রাত হয়েছে।

শ্রদ্ধায় শঙ্করের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায়, অমিয়া তো তাহা নয়, তবু সে এত মহৎ। এত সহজে এত অনাড়ম্বরে এতগুলা টাকার অধিকার এমন অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া দিল। অনিবার্যভাবে একটা কথা তাহার মনে পড়িল। অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে সুরমা কি ঠিক এই রকম পারিত?

তেতাল্লিশ

হাসি অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে বসিয়া জবাবদিহি লিখিতেছিল।

গত পরীক্ষায় এত কম সংখ্যক ছাত্রী পাস করিয়াছে কেন, স্কুল-কমিটি জানিতে চাহিয়াছেন। হাসি সত্য কথাই লিখিতেছিল। লিখিতেছিল, এই অল্প কয়েকজন ছাত্রীই যে পাস করিতে পারিয়াছে, এজন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। পিতামাতারা যদি নিজেদের কন্যাদের লেখাপড়া বিষয়ে অবহিত না হন, বাড়িতে যদি তাহারা পড়াশোনা না করে, তাহা হইলে কেবলমাত্র সাজিয়া-গুজিয়া স্কুলে আসিলেই তাহারা কোনোকালে পাস করিতে পারিবে না। স্কুলেও তাহারা নিয়মিত আসে না। যখন আসে, তখনও পড়ায় মন দেয় না। অমনোযোগী হইবার জন্য সামান্য শাস্তি দিলেও কান্নাকাটি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া বসে যে, কিছু বলিতে ভয় করে। অনেক অভিভাবক এবং স্কুলের কর্তৃপক্ষ শাস্তি দেওয়া পছন্দ করেন না। এ অবস্থায় বেশি মেয়ে পাস করিলেই আমি বিস্মিত হইতাম। লেখাপড়ায় মেয়েদের এবং তাহার অভিভাবকদের যদি আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকে—

এ পর্যন্ত লিখিয়া সে থামিয়া গেল। বারান্দায় কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া যাইতেছে।

বিছানায় বসিয়া হেঁট হইয়া লিখিতেছিল সে, কলম ছাড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল।

দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল।

কে?

কোন উত্তর নাই।

কে?

খোলই না।

গলার স্বরটা যেন চেনা মনে হইল; কিন্তু কাহার, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লইল এবং আগাইয়া গিয়া খিল খুলিয়া দিল। প্রবেশ করিল একজন লাল-পাগড়ি কন্‌স্টেবল।

চিনতে পারছ?

লোকটার সামনের দাঁত একটাও নাই। এক-মুখ গোঁফদাড়ি। তবু চোখের দিকে চাহিয়া হাসি চিন্ময়কে চিনিতে পারিল এবং বিস্মিত হইয়া গেল।

ঠাকুরপো!

ওষ্ঠে তর্জনী স্থাপন করিয়া চিন্ময় বলিল, চুপ, আস্তে। জেল থেকে পালিয়ে এসেছি।

পুলিসের পোশাক কেন?

ছদ্মবেশ।

হাসি আরও খানিকক্ষণ চিন্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি যে এখানে আছি, সে খবর কে দিলে তোমাকে?

বেলা মল্লিক।

সে আবার কে?

তুমি তাকে চেন না, আলাপ হবে, ভয় নেই।

চিন্ময় হাসিল। হাসিতেই তাহার মুখের বীভৎসতা আরও প্রকট হইয়া পড়িল। সামনের দাঁত একটাও নাই, ঠোঁটগুলা কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো— সমভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হয় না।

তোমার দাঁত কি হ'ল?

মেরে ভেঙে দিয়েছে। লোহার নাল-বসানো বুটের লাথি---। বলিয়া সে আবার হাসিল।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে হাসি চাহিয়া রহিল।

চিন্ময় বলিল, গোঁফ-দাড়ি দিয়েও এ-হাসি ঢাকা যাবে না। ধরা পড়তে হবেই। তার আগে একটা দল গ'ড়ে দিয়ে যেতে চাই।

কিসের দল?

সব বলছি।

চুয়াল্লিশ

অর্ধ নিমীলিত লোচনে শঙ্করের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাজীবলোচনের অন্তরে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। ছোঁড়ার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিলে কেমন হয়। পুণ্য যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলে কি। পিতার সঞ্চিত অর্থ হইতে নির্বিকারভাবে দশ হাজার টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ করিবে। দেবতা, না; পাগল— কি এ।

বক্তব্য শেষ করিয়া কুণ্ঠিতমুখে বলিল, আপনার কাছে অবশ্য বাবার কত টাকা জমা আছে,

তা আমি জানি না ঠিক। কিন্তু দশ হাজার টাকা আমার চাই।

রাজীব অর্ধনিমীলিত লোচনেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। চোয়ালটা বার দুই নড়িল।

আমার কাছে কত টাকা আছে, তা তোমার না-জানবার কথা নয়। টাকা নিয়ে তোমার বাবাকে আমি রসিদ দিয়েছি।

সে কোথায় আছে আমি খুঁজে দেখিনি।

রাজীবলোচনের ভাবলেশহীন মুখে প্রচ্ছন্ন হাসির একটা আভাস যেন ফুটিয়া উঠিল।

আমার কাছে টাকা আছে, তা হ'লে জানলে কি ক'রে।

ছেলেবেলা থেকেই জানি। বাবা আর তো কোথাও টাকা রাখতেন না।

এই বু'দ্ধি লইয়া ছোকরা উৎপলের জমিদারি চালাইতেছে নাকি? মনে মনে মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, ছেলেবেলা থেকেই জানি। আরে বাপু, তার প্রমাণ কি? আমি যদি এখন অস্বীকার করি, একটি আধলা যদি না দিই? গাড়োল কোথাকার! তাঁহার চোয়াল আরও বার দুই নড়িল, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, এ বছরের সুদটা এখনও হিসেব করিনি। গত বছর পর্যন্ত কুড়ি হাজার টাকা ছিল। এ বছরের সুদ নিয়ে বেশি হবে আরও কিছু।

তা হ'লে দশ হাজার টাকা দিন আমাকে।

হঠাৎ রাজীবলোচন ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া তাকাইলেন এবং তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি শঙ্করের মুখের ওপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, একটি কপর্দক দেব না।

দেবেন না! কেন?

তোমার বাবা আমার বন্ধুলোক ছিলেন। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে বরবাদ করতে দেব না আমি। বিশ্বাস ক'রে তিনি আমার হাতে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শঙ্কর ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

একটু সসঙ্কোচে বলিল, কিন্তু আমার দরকার যে।

ও দরকার কোনো দরকারই নয়। ও টাকা কেনারাম দিক— ওই তো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল, ওই খেয়েছে টাকাটা, ওকে চেপে ধর।

আমার হুকুমেই টাকাটা খরচ হয়েছে, আইনত আমিই দায়ী।

আমার কাছ থেকে কিছু পাবে না।

একটু হাসিয়া শঙ্কর বলিল, এ কি রকম কথা বলছেন আপনি! আমার টাকা আমি পাব না!

টাকা তোমার নয়, তোমার স্ত্রীর। উইলের কপি আমার কাছেও দিয়ে গেছে অম্বিক।

বেশ, তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসছি।

চিঠি নিয়ে এলেও হবে না, সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট চাই, করালীচরণ বক্‌শিরও ফ্যাচাং আছে একটা।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রাজীবলোচনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এ সব সত্ত্বেও দিতাম যদি বুঝতাম টাকাটা ন্যায্য খরচ হবে। তা যখন বুঝছি না, তখন বাগড়া দেব। বিশেষত তোমার কাছে যখন কোনো প্রমাণ নেই যে, টাকাটা আমার কাছে আছে তখন তো কিছুই করতে পার না তুমি। আগে রসিদ বার কর।

রাজীবলোচনের চক্ষু দুইটি পুনরায় অর্ধনিমীলিত হইল। শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার কানের পাশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পিতৃবন্ধুকে কোনো অসম্মানজনক কথা

সে বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রাজীবলোচন পুনরায় চোখ খুলিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

অতিশয় নির্বোধ তোমরা। অগ্রপশ্চাৎ কিছু চিন্তা কর না, হুটহাট ক'রে একটা কিছু ক'রে বসাটাই স্বভাব তোমাদের। গদাইটা যে অতি নচ্ছার তা আমি জানি, ওকে শাসন করাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ওকে ধ'রে চড়টা চাপড়টা দিলে পারতে, আমার গোলায় আগুন দিতে গেলে কেন বাপু? আমার কি ক্ষতি হ'ল তাতে, লাভই হ'ল বরং, ইন্‌সিওর করা ছিল সব। মরতে ম'ল কতকগুলো গরিব। ঠিক পাশের একটা ঘরে গরিব চাষীদের পাটের বাণ্ডিলগুলো ছিল, কোথাও রাখতে জায়গা পায় না, রেখে গিয়েছিল ওখানে, সেগুলো পুড়ে গিয়ে তাদেরই লোকসান হ'ল। আমার আর কি হ'ল?

আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না।

শঙ্কর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

আচ্ছা, আমি চললাম এখন তা হ'লে।

টাকার জন্য চিন্তা করো না, দরকারের সময় ঠিক পাবে, কিন্তু বরবাদ করতে দেব না আমি।

শঙ্কর কোনো উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রাজীব দত্ত একটু মুচকি হাসিলেন।

অন্ধকারে শঙ্কর গ্রামের পথে পথে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবিলম্বে দশ হাজার টাকা কোথায় কি উপায়ে পাওয়া যায়? রাজীব দত্ত সত্যই টাকাটা দিবে না নাকি... নিপুদা গেলেন কোথায়... কলেরা ক্রমশ বাড়িতেছে... হরিয়া, কারু, ফরিদকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব কি... সুরমা আর তো তাহার কোনো খোঁজ করিল না... ডাকিতে না পাঠাইলে আর সে যাইবে না... নানা অসংলগ্ন চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতেছিল।

অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন অমিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার পদশব্দ শুনিবামাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

ছি ছি, কত রাত করলে তুমি!

বেশি রাত তো হয়নি, সাড়ে দশটা।

ও।

অমিয়ার চোখে ঘুম ছিল, তাই সে শঙ্করের চিন্তাচ্ছন্ন মুখটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল না। তাড়াতাড়ি আহারাদি চুকাইয়া শুইয়া পড়িল। শঙ্করও শুইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়াও যখন কিছুই হইল না, তখন সে উঠিয়া বসিল। অমিয়া খুকী উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দচরণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। পাশের ঘরেই আলমারিটা আছে। বাবার বিরাট আলমারিটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল সে। বহুদিন এটাকে খোলা হয় নাই। ইহার চাবি যে কোন্‌টা, তাহার মনে নাই। চাবির গোছাটা আনিয়া একটার পর একটা লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। রসিদটা খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

চিঠির বাণ্ডিল খাতা ডায়েরি বই ফাইলের স্তূপের ভিতর বসিয়া শঙ্কর রসিদ খুঁজিতেছিল। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সহসা শব্দ হইল।

রাম নাম সৎ হ্যায়—

সে চমকাইয়া উঠিল। কে মারা গেল? ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, ভোর হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেছে। সমস্ত রাত খুঁজিয়াও কোনো রসিদ বা পাস-বই

পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল সে। কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিতেই চোখে পড়িল, লেটার-বক্সে একখানা চিঠি রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল, খামের উপরে তাহার নাম লেখা। কাহার চিঠি? খুলিয়া পড়িল—

শ্রীচরণেষু,

আমি আর থাকতে পারলাম না, চললাম। কেন বা কোথায়, তা বলব না। বৃহত্তর যে আহ্বানের অপেক্ষা করছিলাম, তা এসেছে। আমাকে খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। 'তুমি' আপনার কাছে রইল। ওর ভার আপনাকে দিয়ে গেলাম। কোন্ অধিকারে যে এত বড় ভার স্বচ্ছন্দে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি, তা জানি না। মনে হচ্ছে কিন্তু, অধিকার আছে। কোনো সংকোচ হচ্ছে না। আর একটা কথা। যে দশ হাজার টাকার জন্যে আপনার বন্ধুর জেল হয়েছিল, তা আমার কাছে ছিল এতদিন। টাকাটা আমাকেই এনে দিয়েছিলেন তিনি, আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। সে টাকা আমার ট্রাঙ্কের তলায় আছে। টাকাটা আপনিই নিন, আমি আর কি করব ও নিয়ে। এতবড় গোপনীয় চিঠিটা আপনার খোলা লেটার-বক্সে রেখে যেতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কি? একটা ভরসার কথা, খোলা জায়গাতেই গোপনীয় জিনিস সবচেয়ে নিরাপদে থাকে। সন্দেহ জাগে না কারও। আশা করি, আমার জন্যে বিপদে পড়বেন না। চিঠিটা প'ড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনাকে একটা প্রণাম ক'রে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না, দূর থেকেই তাই প্রণাম জানাচ্ছি। আমার সম্বন্ধে যাহোক একটা গল্প বানিয়ে প্রচার ক'রে দেবেন। যদি কোনোদিন ফিরি, আবার দেখা হবে। আর যদি না ফিরি, তা হ'লে এই শেষ।

ইতি—
প্রণতা হাসি

শঙ্কর নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। হাসি কোথায় গেল? কেন গেল? তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে বাহির হইয়া পড়িল সে। হাসির কোয়ার্টার্সে গিয়া দেখিল, হাসি নাই। চাকরটা কিছুই বলিতে পারিল না। 'তুমি' উঠিয়াছে এবং গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ছোট মৃন্ময় যেন।

মা কোথায়?

জানি না।

আমাদের বাড়ি যাবে? চল।

'তুমি' গম্ভীরভাবে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইল।

তাহার পর বলিল, চলুন।

কোন আপত্তি করিল না, জামাটা গায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করিল না। শঙ্কর স্কুলের চাকরটাকে ডাকিয়া যখন তাহার মাথায় ট্রাঙ্কটা তুলিয়া দিল, তখনও সে কোনো প্রশ্ন করিল না।

চল।

শঙ্করের পিছু পিছু সে চলিতে লাগিল।

শঙ্কর বলিল, তোমার মা একটা কাজে গেছেন। কিছুদিন পরে আবার আসবেন। ততদিন আমার কাছে থাক।

আচ্ছা।

হাসির ব্যবহারে শঙ্কর অবাক হইয়া গিয়াছিল। আরও অবাক হইয়া গেল 'তুমি'র ব্যবহারে। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'তুমি' যেন সব জানে, কেবল আত্মসম্মানে বাধিতেছে বলিয়া কিছু বলিতেছে না।

শঙ্কর অমিয়াকে সত্য কথাটা বলিল না। বলিল, হাসি স্কুলের কাজে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছে। যতদিন না ফেরে, ততদিন 'তুমি' তাহার নিকট থাকিবে।

অমিয়া বলিল, বেশ তো।

সবচেয়ে খুশি হইয়া উঠিল খুকী। সে তাড়াতাড়ি 'তুমি'র হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার নিজের ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখাইতে বসিল।

এইতে হাতি, এইতে খুকু, এইতে মোতল—

শঙ্কর পুনরায় আসিয়া আলমারির সম্মুখে বসিয়া ছিল। খাতাপত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তুলিয়া রাখিতে রাখিতে হাসির কথাই ভাবিতে লাগিল। বৃহত্তর আহ্বান কি হইতে পারে। হাসিকে সে কোনোদিনই বুঝিতে পারে নাই। তখনই আবার মনে হইল, কাহাকেই বা আমরা বুঝি? যাহাকে বুঝি বলিয়া মনে করি, তাহাকে হয়তো ভুল বুঝি। চকিতে সুরমার কথাটা মনে পড়িল। সুরমার কথাই ভাবিতে লাগিল সে। রসিদ খুঁজিবার আগ্রহ তাহার তো আর নাই। হাসির অপ্রত্যাশিত চিঠিটা পাইয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও এখন ট্রাঙ্ক খুলিয়া— সহসা মনে হইল, ট্রাঙ্কের চাবি তো আমার কাছে নাই! বাসায় নিশ্চয়ই আছে কোথাও। পরে গিয়া লইয়া আসিলেই হইবে। টাকাটা আছে নিশ্চয়। হাসি শুধু শুধু মিথ্যা কথা লিখিবে কেন? তখনই আবার মনে হইল, ও টাকা এমন ভাবে খরচ করাটা ঠিক হইবে? দেখা যাক।

চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়—

আবার? শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে গেল।

বাহিরে গিয়া দেখিল, মুশাই আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনিল, গ্রামে খুব কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে।

পঁয়তাল্লিশ

সাইকেলে চড়িয়া শঙ্কর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিল। এমন সময়ে যে এত কলেরা হইতে পারে, তাহা তাহার স্যানিটেশন বিভাগ কল্পনা করে নাই। চৌধুরী বলিলেন যে, প্রথমটা যদিও তিনি খবর পান নাই, এখন কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কূপে কূপে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া হইয়াছে, গরিবদের মধ্যে পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট বিতরিত হইয়াছে, নতুন রোগী হইলেই স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হইতেছে, কিছু কিছু ভ্যাকসিনও দেওয়া হইয়াছে; তথাপি কেন যে ফলোদয় হইতেছে না সে জবাবদিহি করিতে তিনি অপারগ। তিনি যথাকর্তব্য যথাসাধ্যই তো করিয়া চলিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শঙ্কর হতাশ হইয়া পড়িল। বহু লোক মরিতেছে। একটা ডাকবাংলোয় গভর্মেন্ট-নিয়োজিত একজন হেল্‌থ অফিসারের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। ভদ্রলোক খাকী হাফ-প্যান্ট হাফ-শার্ট পরিয়া মাথায় শোলার হ্যাট চড়াইয়া শঙ্করের মতই সাইকেল-যোগে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কলেরা যেন থামিতেছে না,

জিজ্ঞাসা করায় তিনি ফস করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া সক্ষোভে উত্তর দিলেন, কি ক'রে বলব বলুন? কলেরা থামানো তো আমার কাজ নয়, আমার কাজ ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করা। তাই ক'রে যাচ্ছি প্রাণপণে। কলেরা থামল কি থামল না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই আমার।

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, ইচ্ছেও নেই নাকি? দিন একটা আমাকে— আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

এই যে আসুন। ইচ্ছে থাকবে না কেন মশাই, ইচ্ছে খুব আছে, উপায়ও জানা আছে. কিন্তু কিছু করা যাবে না।

করা যাবে না কেন?

বলি তা হ'লে শুনুন। কলেরার বিষ শুধু যে জল দিয়েই সংক্রামিত হয় তা নয়, যে কোনো খাদ্যদ্রব্য দিয়েই তা হয়। কিন্তু আমাদের যত আক্রোশ কেবল জলের ওপর, অন্য সব বিষয়ে আমরা উদাসীন। এই যে গয়লানীগুলো দুধ বেচছে, এই যে সবাই পেয়ারা চিবুচ্ছে, এদের ওপর আমাদের কোনো কনট্রোল নেই। আমরা শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়েই খালাস— সব ফুটাকে খাও। আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করে না।

না করবার কারণটা কি?

আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, ভেবেছেন? নট এ সিংগ্‌ল সোল। খাকী হ্যাট-কোট দেখলেই ভাবে পুলিসজাতীয় কেউ হবে বোধ হয় একজন— আমাদের হ্যারাস করতে এসেছে। আর আমরা পুলিসের হেলপ নিয়ে কাজও করি যে। সেইজন্যে লোকে আমাদের ভয় করে, বিশ্বাস করে না। ওদের যত বিশ্বাস বৈদ্য কবরেজ গোঁসাই এই সবের উপর। কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট পর্যন্ত দিতে দেয় না মশাই। একটা কুয়োয় পার্মাঙ্গানেট দিয়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। ভাগ্য বাইক ছিল, চোঁ-চোঁ দৌড়ে তবে প্রাণটা বাঁচে। আর একটু হ'লেই পশ্চিমে গোয়ালার লাঠিতে মাথাটি ফাটত আমার সেদিন। ডাক্তারবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সবিস্তারে গল্পটি বলিলেন।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, এ অবিশ্বাসের হেতু কি?

তা জানি না মশাই, তবে এইটে বুঝেছি যে, ফরসা-জামা-কাপড়-ওলা সো-কলড ভদ্রলোক মাত্রকেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। ফরসা কাপড় জামার ওপর ওদের ঘোর সন্দেহ। ওদের নিজেদের মধ্যেও কেউ যদি বেশ ফরসা কাপড় জামা প'রে একটু ফিটফাট হয়, ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে নেয় যে, তার চরিত্র খারাপ হয়েছে। মেয়েরা তো এই ভয়ে ফরসা কাপড় পড়তেই চায় না। আর সত্যিই দেখা যায় যে, যারা বেশি ফিটফাট, তাদের চরিত্র খারাপ। আমাদের সম্বন্ধেও ওদের ধারণা যে, আমরা ভাল করবার ছুতোয় এসে ঠিক পকেট মেরে নিয়ে যাব।

একটু হাসিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, আর পকেট মারিও আমরা। নেহাৎ মিথ্যে কথাও নয়।

পকেট মারেন?

মারি না? আজই তো এক পাউন্ড পার্মাঙ্গানেট, এক পাউন্ড কুইনিন বেচলুম। কিন্তু খরচ দেখিয়ে দিলুম। শুধু যে বেচি তা নয়, দানও করি। বন্ধু-বান্ধবদের স্পিরিট, টিঞ্চার আইয়োডিন, কুইনিন তো হরদম দিচ্ছি। কি করি, চাইলে 'না' বলতে পারি না।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

না বেচে কি করি বলুন, আমাদের ওপর তো জাস্টিস হয় না। দশ বচ্ছরের ওপর চাকরি

করছি, এখনও পর্যন্ত একটা ডিসপেন্সারি পেলাম না। অথচ আমার চেয়ে কত জুনিয়র ঢুকল আর পটাপট ডিসপেন্সারি পেলে। আমার অপরাধ আমি বাঙালি আর হিন্দু। এই কংগ্রেস মিনিস্ট্রি আরও ডোবালে আমাদের মশাই। এতগুলো চোর যে কী করে একসঙ্গে জুটল এত অল্প সময়ের মধ্যে! এর চেয়ে সাহেব মনিব ঢের ভাল ছিল মশাই, সাহেব জাত গুণের কদর বোঝে।

শঙ্কর চুপ করিয়াই রহিল।

ডাক্তারবাবুও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, লাক্, লাক্, সবই লাক্ মশাই। যখন আই এসসি পাস করলুম, বাবা বললেন— যা, ইঞ্জিনিয়রিং পড়গে যা। তখন কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল, ডাক্তারটা নোবল প্রফেশন, ডাক্তারই হতে হবে। মেডিকেল কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, কোথাও ঢুকতে না পেয়ে শেষে দুর্গা বলে কটক মেডিকেল স্কুলেই ঢুকলাম, তা-ও অনেক ঘুষ-ঘাষ দিয়ে। বার তিনেক ফেলও করলাম। শেষে অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে বেরিয়ে প্র্যাকটিস করতে বসলাম দিনকতক। কিছু হ'ল না। আমাকে ডাকবে কে! ঢুকলাম শেষে চাকরিতে। বৃহৎ পরিবার ঘাড়ে, কী করি বলুন? কিন্তু চাকরির তো এই দশা—

বৃহৎ পরিবার বুঝি আপনার?

রাবণের গুষ্টি। আর সব এই শর্মার ঘাড়ে। গজাতে দিলে না মশাই, অনেক কষ্টে যেই দুটি একটি পাতা ছাড়ছি, অমনি কেউ না কেউ এসে মুড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে। আজ ভাগনে, কাল ভাইপো, পরশু বেয়াই, তরশু বউ— একটা না একটা লেগেই আছে। শুধু মাইনেটি সম্বল ক'রে কি চলে মশাই? চলে না।

আপনাদের উপরি কিছু নেই বুঝি?

ওই যা অ্যালাউন্স পাই তাও যৎসামান্য। আর এই চুরি-চামারি ক'রে যা দু-চার টাকা হয়। কলেরা থামবে কি ক'রে? আমরা কেউ কি উইলিং ওয়ার্কার? কেউ না। উইলিং হব কি ক'রে, বলুন? আমাদের হাতে ক্ষমতাও দেয় না, পয়সাও দেয় না, আমাদের ওপর সুবিচারও হয় না। আমাদের কেবল I have the honour to be sir, your most obedient servant পর্যন্ত দৌড়। তাই করে যাচ্ছি। কেউ প্রাণ দিয়ে কাজ করে না। সব চোর। আমাদের কাজ হচ্ছে গ্রামের গুরুদের কাছে কুইনিন, পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট দেওয়া। উদ্দেশ্য— তারা গ্রামের গরিবদের বিনা পয়সায় বিতরণ করবে। কেউ তা করে ভেবেছেন? সব বিক্রি করে। আর এই যে আপনারা সব ছ টাকা আট টাকা মাইনে দিয়ে গুরু নিযুক্ত করেছেন, এরা কেউ কি পড়ায় ভেবেছেন ভাল করে? পাজির পা-ঝারা ব্যাটারা। কারও বারান্দায়, কারও আটচালায়, থিয়োরেটিক্যাল এক একটা পাঠশালা খুলে রেখেছে খালি, কতকগুলো ছোঁড়া সেখানে ব'সে গুলতানি করে মাঝে মাঝে। পড়াশোনা কিচ্ছু নয় না। অনেক গুরু আবার অন্য জায়গায় চাকরিও করেন। অথচ কাগজে কলমে দেখুন এত টাকা spent of education! এডুকেশন তো হচ্ছে কচু!

বলেন কি।

শুধু কচু নয়, কচু পোড়া। এ দেশের উদ্ধার নেই মশাই। এই আপনারাই যে পল্লীসংস্কারের জন্যে এত টাকা ঢালছেন, তা কি হচ্ছে জানেন? আমার মতে দেশের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে কেবল। অধিকাংশ টাকাই পাঁচজন লুটে-পুটে খেয়ে ফেলছে, দেশ কিছুই পাচ্ছে না। কাজ করছে মিশনারিরা, দেখে আসুন গিয়ে।

কিন্তু আমাদের উপায় কি?

উপায়? উপায় ভগবান।

বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ওই যে আপনাদের চৌধুরী, যাকে আপনারা স্যানিটেশন বিভাগের কর্তা ক'রে রেখেছেন, একের নম্বর চোর ব্যাটা। চরণ ডাক্তারের কম্পাউন্ডার মাঝে মাঝে কুইনিন নেয় আমার কাছে, হাফ প্রাইসে দিই তাকে আমি, এবারেও তার জন্যে রেখেছিলুম কিছু, কিন্তু এবার সে নিলে না, বললে, চৌধুরীর কাছে পাঁচ পাউন্ড পেয়েছে ওয়ান ফোর্থ দামে। চৌধুরী পাঁচ পাউন্ড কুইনিন পায় কোথা থেকে মশাই?

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রহিল। কয়েকদিন আগেই চৌধুরী তার নিকট হইতে দুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গিয়াছে।

ডাক বাংলোর চৌকিদারটা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারই আত্মীয় একটি শিশুর কলেরা হইয়াছে। বলিল, চেষ্টার কোনোও ত্রুটি হয় নাই। স্থানীয় কূপে 'দাবাই' দেওয়া হইয়াছে, ছেলেটিকে 'জকসন'ও দেওয়া হইয়াছিল, একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া 'পানি'ও চড়াইয়া গিয়াছেন, তবু অবস্থা শোচনীয়। সাহেব যদি মেহেরবানি করিয়া একবার—

তোমার বাড়ি কতদূর?

নগিচে হুজুর।

যাবেন নাকি, চলুন না দেখে আসা যাক, কাছেই বলছে।

চলুন।

যাইতে যাইতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাক্‌সিনের কি অভিজ্ঞতা আপনার?

সময়মত হিসেবমত দিলে খাসা কাজ করে। কাজেও বেশ উপকার হয়। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, ঠিক সময়ে ঠিকমত সব হয়ে ওঠে না। এরা সব সময়ে ইন্‌জেকশন নিতেই চায় না। কাঁহাতক সাধ্যসাধনা ক'রে বেড়াই ব্যাটাদের!

রোগীর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, রোগী মুমূর্ষু। তিন-চারি বৎসরের একটি শিশু। শঙ্করদের ডিস্‌পেন্সারির ডাক্তারবাবু 'স্যালাইন সাব-কিউটেনিয়াস' দিয়া গিয়াছেন। বগলের নিচেটা ফুলিয়া আছে। ফাজ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা খাওয়ানো হইতেছে। গোপনে বৈদ্যদের দাবাইও চলিতেছে। গলায় একটা মাদুলিও পরানো হইয়াছে। তবু অবস্থা শোচনীয়। চোখের কোণ বসা, মাথার চুল রুক্ষ, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শুষ্ক অধর। অন্ধকার ঘরের ভিতর পচা ভ্যাপসা একটা গন্ধ। বমি ও বিষ্ঠার উপর মাছি ভনভন করিতেছে। কাল ইহার বড়টি মারা গিয়াছে, আজ এটিও যায় যায়। নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মৃত— ক্ষীণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও থামিয়া যায় নাই কেবল। ডাক্তারবাবু ঝুঁকিয়া নাড়ীটা দেখিলেন, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া শঙ্করের পানে চাহিলেন।

মেয়েটা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, মাই গে!

মা পাশেই বসিয়াছিল। ঝুঁকিয়া বলিল, কি বেটা?

মেয়েটা দুই শীর্ণ হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। ভয় পাইয়াছে।

ডর নেই বেটা, ডাকটরবাবু আইলোছে, ঘুর দেখে দ।

মেয়ে কিন্তু মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

মা তখন তাকে চুম খাইয়া খাইয়া ভুলাইতে লাগিল, লালু মেরা শুগা মেরা, ঘুর ঘুর দেখে দ।

ডাক্তারবাবু অধীর হইয়া উঠিলেন।

আর দেখবার দরকার নেই। যা দেখবার দেখে নিয়েছি। চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি হবে? আরে, ওইসে করকে চুম মৎ খাও। ফিন তুমরাভি হোগা।

মা কিন্তু চুম খাইতে লাগিল, বারণ শুনিল না।

ডিসগাস্টিং। আসুন।

ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু শঙ্করও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু চৌকিদারটাকে বলিলেন যে, চিকিৎসা ঠিক মতই চলিতেছে, আর নূতন কিছু করিবার নেই। ফাজটা ঘন ঘন যেন খাওয়ানো হয়। চৌকিদার 'জি হুজুর' বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

চলুন যাওয়া যাক।

নির্বাক শঙ্কর ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু যেন যন্ত্রচালিতবৎ চলিতে লাগিল।

ওকে বললুম বটে, চিকিৎসা ঠিকমত চলছে, কিন্তু ঠিকমত চলছে না। অধিকাংশ ডাক্তারই মনে করে, কলেরা হলেই স্যালাইন দিতে হবে। কোনো রকমে পানি চড়াতে পারলেই যেন চিকিৎসার চরম হয়ে গেল। ও কি। আপনি অমন গুম মেরে গেলেন কেন?

শঙ্কর তবু কিছু বলিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল।

আপনার কি মনে হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি। I respect your feeling — আপনার মনে হচ্ছে, এত করে কিছু হচ্ছে না। হবে কি ক'রে? স্বচক্ষেই তো দেখলেন, মা-টা ওর মুখে মুখ লাগিয়ে চুম খাচ্ছে, চতুর্দিকে মাছি ভনভন করছে, পাশেই সরাতে পান্তা ভাত বাসি ডাল রয়েছে, তাতে মাছি বসছে, একটু পরেই মাগী গিলবে এগুলো গপগপ ক'রে। আমরা জলে পার্মাঙ্গানেট দিয়ে আর কি করব, বলুন?

ম্লান হেসে শঙ্কর বলিল, সব বুঝেও কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। আমি আর ডাকবাংলোয় ফিরব না, আপনি যান।

আপনি কোথা যাবেন?

আমি আমাদের ডিসপেন্সারির দিকেই যাই একবার।

আচ্ছা, তা হ'লে নমস্কার।

নমস্কার।

এক ছেলে মারা গিয়াছে, আশেপাশে সকলে মারা যাইতেছে, রোগটা কত ভীষণ তাহা অজানা নাই, কি করিলে রোগের হাত থেকে বাঁচা যায় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বারংবার তাহা বলিয়া দিতেছেন, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া তবু মা সন্তানকে চুম খাইতেছে। শঙ্করের নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহারই অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার সান্নিধ্য তিনি এড়াইতে চান। অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ডিসপেন্সারির দিকে না গিয়া অন্য দিকে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঠে ফসল উঠিতেছে। কলাই মুগ কুরথি কাটা হইয়াছে, এখন গরু দিয়া তাহা মাড়ানো হইতেছে— এদেশে 'দৌনি' বলে। পাশাপাশি আট-দশটা গরু মাঝখানে পোঁতা একটা বাঁশের খুঁটাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক গরুর মুখে একটা করিয়া দড়ির জাল না দিলে ফলস খাইয়া ফেলিবে। গরুগুলা অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। যে লোকটা গরু হাঁকাইতেছে, সেও অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ। মাথায় একটা মলিন পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, ছেঁড়া ময়লা কাপড় হাঁটুর উপর উঠিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার আনন্দের সীমা নাই। আশেপাশে যে এত লোক কলেরায় মরিতেছে, তাহা যেন সে জানেই না। আনন্দে গান ধরিয়া দিয়াছে। নিকটেই 'ওসৌনি' হইতেছে। একদল মেয়ে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে, প্রত্যেকেই এক-একটি করিয়া কুলা হাত দিয়া মাথার কাছে তুলিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছে। কুলায় আছে মাড়ানো ফসল। ফসল পায়ের কাছে পড়িতেছে, খোসাগুলি উড়িয়া যাইতেছে। মেয়েগুলিও সমস্বরে গান ধরিয়াছে। একটি

যুবক ফসলগুলি মেয়েদের পায়ের নিকট হইতে সরাইয়া এক জায়গায় জমা করিতেছিল, সে একটি যুবতীর পায়ের নিকট আসিয়া কি একটা রসিকতাই করিল বোধ হয়, মেয়েটি সকোপকটাক্ষে ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহাকে ছোট্ট একটি লাথি মারিল। সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। গরুগুলি দ্রুততর বেগে ছুটিয়া যেন এ আনন্দে যোগ দিল। শঙ্করের মনের মেঘও সহসা যেন কাটিয়া গেল। এত দুঃখেও এদের প্রাণের উৎসব থামিয়া যায় নাই তো! খাইতে পায় না, পরিতে পায় না, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কলেরায় মরে, তবু এত আনন্দ! দুঃখ হাহাকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু, তাই বলিয়া সুখের দিনে উৎসব করিতেও ইহাদের বাধে না। কোনো 'পরব' বাদ দেয় না, একটা কিছু হইলেই হইল। উপার্জন করিয়া, ধার করিয়া, চুরি করিয়া, যেমন করিয়া হোক দলে দলে রঙিন কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হইবে— মিঠাই কিনিবে, পুতুল কিনিবে, নাচিবে, গাহিবে। সে মিঠাই, সে পুতুল, সে নাচ, সে গান হয়তো উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু তাহাতেই উহারা আনন্দে বিহ্বল। আমরা উহাদের ঠিক চিনি না, উহারাও আমাদের ঠিক চেনে না মাঝখানে কি একটা যেন বাধা সৃষ্টি করিয়াছে! কী সেটা? হঠাৎ অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া শঙ্কর পিছু ফিরিয়া চাহিল। একরাশ ধুলা উড়াইয়া নটবর ডাক্তার বিদ্যুৎবেগে চলিয়া গেলেন। মনে হইল, গ্রামের ভিতরই গেলেন। ওই মেয়েটাকেই দেখিতে গেলেন নাকি? শঙ্কর ফিরিল, সেই চৌকিদারের বাড়ির দিকেই আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। গিয়া দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক।

চৌকিদারের বাড়ির সামনে বেঁটে খেঁজুরগাছটায় নটবর ডাক্তারের ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। আর একটু কাছে গিয়া শঙ্কর শুনিতে পাইল, নটবর তারস্বরে গালাগালি শুরু করিয়াছেন।

এত্না দের তক্ কেয়া করথা থা রে শালা সব? পুটুর পুটুর তাকে হ্যায়! আগিন্ বানাও জলদি— ফুকো জোরসে উল্লু কাঁহাকা। হট।

শঙ্কর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। উঁকি দিয়া দেখিল, নটবর নিজেই উবু হইয়া একটা উনুনে ফুঁ দিতেছেন। তাঁহার বড় বড় লাল চোখ ধোঁয়ায় আরও লাল হইয়া উঠিয়াছে। খানিকক্ষণ ফুঁ দিয়া তিনি বলিলেন, ফুঁক আচ্ছা করকে এবং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইতেই শঙ্করের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

আরে, আপনাকেও ডেকে এনেছে নাকি ব্যাটা?

না, আমি এমনিই এসেছি।

চলুন, বাইরে চলুন এখানে বড্ড ধোঁয়া। শালারা উনুনটা পর্যন্ত ভাল ক'রে ধরিয়ে রাখেনি। অথচ ঘণ্টা দুই আগে আমাকে যখন ডাকতে গিয়েছিল, তখন পই পই ক'রে ব'লে দিলাম, চরণ ডাক্তারকে খবর দিয়ে বিকেল নাগাদ আমি ঠিক পৌঁছব। তোরা উনুনে এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে রাখগে যা, গরম জল চাই। কিচ্ছু করেনি শালা, কেবল ডাক্তার চেখে চেখে বেড়াচ্ছে, হেলথ অফিসারটাকে পর্যন্ত ডেকে এনে দেখিয়েছে বলছে। আর যার যা খুশি ওষুধ ইন্জেক্শন দিয়ে গেছে। এখন তুই শালা সামলা। আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথাও আছে। এ ব্যাটাদের শতরঞ্চি মাদুর কিচ্ছু নেই যে বিছিয়ে বসি, সব শুয়ে মুতে একশা হয়ে আছে। আঃ আসুন, এইখানেই বসা যাক।

বাড়ির সামনে গোটা কয়েক ইঁট পড়িয়া ছিল। একটা ইঁট শঙ্করের দিকে আগাইয়া দিয়া আর একটাতে নটবর উপবেশন করিলেন এবং হুকুম করিলেন, বেগ লে আও।

ত্রস্ত চৌকিদার তাড়াতাড়ি ঔষধের ব্যাগটি আনিয়া সম্মুখে রাখিল। নটবর ব্যাগ খুলিয়া কয়েকটা ইন্জেকশনের ঔষধ বাহির করিয়া দেখিলেন, তাহার পর মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, এই মরেছে, কিছুই শালার মনে থাকে না, আঃ।

কি হ'ল?

পি ডি-র পিটুইট্রিনটা আনতে ভুলেছি, অথচ ওটা দরকার এখুনি। যাই, টপ ক'রে গিয়ে নিয়ে আসি। জলটা ততক্ষণ গরম হোক। আপনি বসবেন? আমি যাব আর আসব। ঘোড়ার পিঠে দু'কোশ যেতে আর কতক্ষণ লাগবে। আপনার সঙ্গে দরকার ছিল একটু, হরিয়ার সেই ব্যাপারটা— আচ্ছা সে পরে হবে না হয়, ওষুধটা আগে দরকার, যাই।

এখানে আমাদের ডিসপেন্সারিতে ওষুধটা কি পাওয়া যাবে না?

পাওয়া তো উচিত।— বলিয়াই মুচকি হাসিয়া নটবর বলিলেন, কিন্তু আমার নাম শুনলে আপনাদের ডাক্তার দেবে কি না সন্দেহ। সেদিন মদের ঝোঁকে লোকটাকে জুতো নিয়ে তাড়া করেছিলুম।

এক মুখ হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিলেন।

কেন কি হয়েছিল?

সেদিন এই পাশের গ্রামেই ভোজু গোয়ালার বাড়িতে রুগী দেখতে গেছি। গিয়ে শুনলাম ভোজু ওঁকেও খবর দিয়েছে। ব'সে রইলাম ওঁর অপেক্ষায়। খানিকক্ষণ পরে উনি সুট চড়িয়ে গটমট ক'রে এলেন, রুগী দেখলেন, আমার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত কইলেন না। আমি নিজেই তখন উপযাচক হয়ে বললাম, পিঠের ডান দিকে নীচে 'ক্রিপিটেশন' আছে ব'লে মনে হচ্ছে, দেখেছেন সেটা কি? ব্যাটা বলে কি শুনবেন?

নটবরের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

কি?

বললে, কোয়াকের সঙ্গে আমি কন্‌সাল্ট করি না। শুনুন কথা একবার। বল্লাম. তবে রে শালা, তোর পাশের নিকুচি করেছে, বেরোও এখান থেকে। এ ভজুর বাড়ি নয়। আমার বাড়ি। আমিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এই ফী নাও, বেরোও এখান থেকে এখ্‌খুনি। তোমাদের নোট মুখস্থ ক'রে চুরি ক'রে ঘুষ দিয়ে পাশ করবার যে মুরোদ কত, তা আমার জানা আছে। তেল দিতে পারলে আমিও একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারতাম। নিকালো শালা—। টং টং ক'রে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে দূর ক'রে দিলাম। শালা হেঁট হয়ে টাকা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল। চিকিৎসার 'চ' জানে না, এটিকেট মারাতে এসেছেন। খুব সম্ভব, চুরি ক'রে পাশ করেছে ছোকরা।

নটবরের হস্তে নিজেদের ডাক্তারের এই লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া শঙ্কর আহত হইল।

বলিল, তা হতে পারে। কিন্তু তাঁকে এমনভাবে অপমান করাটা ঠিক হয়নি আপনার।

নিশ্চয় হয়নি। কিন্তু একটি বোতল 'খাঁটি' তখন আমার মগজে চ'ড়ে আছে, বাজে 'ফরম্যালিটি' করতে দেবে কেন সে? সাদা চোখে একদিন অ্যাপলজি চেয়ে আসব ভেবেছি, কিন্তু ফুরসৎই পাচ্ছি না।

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্করও হাসিয়া ফেলিল ও উঠিয়া দাঁড়াইল।

কি ওষুধ বললেন? পিটুইট্রিন?

হ্যাঁ, পি ডি.-র।

দেখি যদি আনতে পারি।

আপনি গেলে তো 'বাপ বাপ' ক'রে দেবে।

শঙ্কর চলিয়া গেল।

ডিসপেন্সারি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। গিয়া দেখিল, ডাক্তার কম্পাউন্ডার কেহ নাই। কলেরার মরশুম, দুইজনই 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছেন। ড্রেসার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার কাছে চাবিও ছিল। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া সে ঔষধটা বাহির করিয়া দিল। শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, উনুন ধরিয়া উঠিয়াছে, জলও গরম হইয়াছে, নটবর ডাক্তার নিজেই মেয়েটির হাতে শেঁক দিতেছেন। মেয়েটি অনেকটা যেন চাঙ্গা হইয়াছে। নটবর ইনজেকশনটা দিলেন, ব্র্যান্ডি দিয়া এক দাগ ঔষধ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। তাহার পর বলিলেন, এইবার স্যালাইনটার ব্যবস্থা করা যাক।

শঙ্কর বলিল, একবার দেওয়া হয়েছে শুনলাম।

আর একটু দেওয়া দরকার। আমি পেট ফুঁড়ে দেব। এঁদের ভয় হয়। কেউ বলেন, ইনটেস্টাইন ছ্যাঁদা হয়ে যাবে; কেউ বলেন, পেরিটোনাইটিস হবে। আমি কিন্তু বহুৎ দিয়ে দেখেছি, কিছু হয় না, খুব ভাল ফল হয়। আর কত সহজে টপ টপ দেওয়া যায়। ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। চরণ ডাক্তারের আশায় কতক্ষণ আর থাকি। তিনি তাঁর প্রত্যেক রুগীর প্রত্যেক কথায় উত্তর দিয়ে প্রত্যেকের পথ্যের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা ক'রে সকলের সব রকম আবদার মিটিয়ে তবে আসবেন। আশ্চর্য লোক! অথচ ওঁকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস হয় না আমার।

চরণ ডাক্তারকে এরাই ডেকেছে নাকি?

এরা ডাকবে কেন, আমি ডেকেছি। দায় কি এদের? দায় এই শালার। চরণবাবু বোধ হয় ফি নিতে চাইবেন না, কিন্তু দিতে হবে কিছু বলে রাখি। এই শুনতা হ্যায়, চরণবাবুকো বোলায়ে হেঁ। আঠ রুপিয়া ফিস লাগে গা।

হুজুর মাই বাপ জো বোলিয়ে!

নটবর মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, জো বোলিয়ে! জো বোলিয়ে কি রে! রূপিয়া হ্যায়?

মেয়ের মা অশ্রু মুছিয়া সজলকণ্ঠে বলিল, থালি লোটা বন্ধক দে করিকে রূপিয়া আনব বাবু, বেটিকে মেরা বাঁচাই দে—

এই গাইতে শুরু করেছে!— তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, যা দেখছি, শেষকালে I shall have to pay from my own pocket — এই ব্যাটারাই ফতুর করবে আমাকে। মেথরপাড়ায় এক মিশনারি সায়েব সেবা ক'রে বেড়াচ্ছে দেখলাম, তাকেও কতকগুলো কাজ করে দিয়ে আসতে হ'ল। চাইলে, 'না' বলতে পারলাম না। আর সত্যিই কাজ করছে লোকটা।

মেথরপাড়াতেও কলেরা হয়েছে নাকি?

চারটে মরেছে, দশটা শুষছে।

তা হ'লে আমার তো একবার যাওয়া দরকার সেখানে।

নিশ্চয়। যান। যদি পারেন, কিছু সাহায্যও করুন। হ্যাঁ, আপনাকে সেই কথাটা ব'লে নিই। হরিয়ার নামে শুনলাম উৎপলবাবু নালিশ করেছেন। দারোগাও তার নামে বি এল কেস আগেই দায়ের করেছে। আমি কিন্তু বলে রাখছি হরিয়ার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না আপনারা। তার বিরুদ্ধে একটি সাক্ষীও পাবেন না, মিছিমিছি অপ্রস্তুত হবেন শুধু। হরিয়া, বিষুণ, ফরিদ— সকলের হয়ে লড়ব আমি। এই জেলার সেরা উকিলরা বিনা পয়সায় আমার হয়ে খেটে দিয়ে যাবে। উৎপলবাবুকে বলে দেবেন কথাটা। তিনি সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করলেন না, কিন্তু একদিন তাঁকে এই শর্মার কাছে আসতে হবে, তা বলে দিচ্ছি। তাঁকে বলে দেবেন, শুধু যে সাক্ষী পাবেন না তা নয়, ধোপা পাবেন না, নাপিত পাবেন না, গোয়ালা পাবেন না, কিচ্ছু পাবেন না।

এই গরিবরাই আপনাদের হাত পা, এদের পীড়ন করে কোনো সুখ পাবেন না আপনারা। এ কলকাত্যা নয়, মফস্বল। এখানে পয়সা ফেললেই সব জিনিস পাওয়া যায় না। এদের কাছে হুকুম হাকিম নয়, ভালবাসাই হাকিম। এই অসহায় দরিদ্রদের পীড়ন করতে ইচ্ছেও হয় আপনাদের? আশ্চর্য।

শঙ্কর যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

আমি তো কিছুই করিনি। উৎপল করেছে। পালাশপুর থেকে আসার পর তার সঙ্গে দেখাও হয়নি আমার। কলেরা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি চারিদিকে। তাকে বলব আপনার কথা।

বলবেন।

নটবর স্যালাইন দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বাহির হইয়া চলিতে শুরু করিল। পলাশপুর হইতে আসিয়া সত্যই সে উৎপলের সহিত দেখা করে নাই। কলেরার অজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। সুরমার সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিতেছিল। ও ফাঁদে সে আর পা দিবে না। ফাঁদটা যে তাহার মনেই, এ খেয়াল তাহার ছিল না। নিপুদাকে, প্রমথ ডাক্তারকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এতগুলো গরিব লোকের নামে নালিশ করা হইয়াছে, রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন দেওয়া হইয়াছে, দুষ্ট দমনের এত আয়োজন উৎপল সাড়ম্বরে করিয়াছে, তাহার সহিত দেখা হইলেই নিশ্চয় সোৎসাহে সে এই সব কথা আলোচনা করিবে। শঙ্করকে চুপ করিয়া সব শুনিতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। উৎপল তাহার উপরই সব ভার দিতে চাহিয়াছিল, সে লয় নাই, লইতে পারে নাই, সমস্যার সমাধান করিবার কোনো সদুপায় তাহার মাথায় আসে নাই; সুরমার প্ররোচনায় প্রতিবাদ করিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া উৎপলের কথাতেই অবশেষে সায় দিয়া সামান্য একটা ছুতোয় ভীরুর মত সে পলাশপুরে পলাইয়া গিয়াছিল।

মেথরপাড়ায় গিয়া সে দেখিল মিশনারি সাহেব মলমূত্রসিক্ত কতকগুলি কাপড় জামা বাঁখারি করিয়া তুলিয়া প্রকাণ্ড একটি গামলায় ফেলিতেছেন। গামলায় ফিনাইল মিশানো সাদা জল রহিয়াছে। সারি সারি অনেকগুলি গামলা। সাহেবের সঙ্গে শঙ্করের আলাপ ছিল।

গুড আফটারনুন মিস্টার রয়।— তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, ডিসইনফেকটিং সয়েল ক্লোদজ।

শঙ্কর প্রত্যাভিবাদন করিয়া চুপ রহিল।

সাহেব বাংলাও জানেন। বলিলেন, আপনিও সেবাকার্য করছেন।

শঙ্কর ঘাড় নাড়িল।

উত্তম, খুব উত্তম। আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি?

নিশ্চয়, কি করতে হবে, বলুন?

আসুন।

সাহেবের পিছু পিছু শঙ্কর ছোট একটা কুঁড়েঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে এত অন্ধকার যে, সে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না, কিছু শুনিতেও পাইল না। মৃত্যুর স্তব্ধতায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন যেন। একটা নিদারুণ দুর্গন্ধ কেবল তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সহসা টর্চ জ্বালিলেন। তীব্র আলোক প্রথমেই চোখে পড়িল, ঘরের এক কোণে গোটা দুই প্রকাণ্ড শূকর বাঁধা রহিয়াছে। তাহার পর দেখিতে পাইল, আর একধারে সারি সারি তিনজন শুইয়া আছে। দুইজনের মুখ ঢাকা, একজনের মুখ খোলা। যাহার মুখ খোলা, মনে হইল, সে যেন দুই চোখে কালো ঠুলি পরিয়া আছে। সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপর নাড়িতেই ভনভন করিয়া

অসংখ্য মাছি উড়িয়া গেল। চক্ষুকোটর বাহির হইয়া পড়িল। চক্ষু দেখা যায় না, খালি কোটর। ঠুলি নয়, মাছির স্তূপ। হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সামর্থ্য নাই।

সাহেব ঝুঁকিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, নাড়ী নাই, তবু এ বোধ হয় বাঁচিয়া আছে। এ লোকটাকে আমি হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি যদি এ দুজনের ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করেন, বড় ভাল হয়।

শঙ্করের মুখে কথা সরিতেছিল না।

বাক্যস্ফূর্তি হইলে দুইটি মাত্র কথা সে বলিল, এ কি।

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এই আপনার দেশ! Your country lives in huts. not in palaces,— lives like this and dies like this—

শঙ্করের আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বলিয়া ফেলিল, I have read about Blak Plague of your country too.

No offence please— চলুন, কাজ করা যাক। Let us be up and doing.

সাহেব বাহিরে আসিয়া ডিসইন্‌ফেকটিং মন দিলেন।

শঙ্কর অকূল পাথারে পড়িল। একটি লোক নাই, কি করিয়া মড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা করিবে সে? এ পাড়ার সকলে পলাইয়াছে। অন্য কোনোও জাত মেথরের মড়া স্পর্শ করিবে না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে একটি মাত্র লোকের নাগাল পাইল। ফুলশরিয়ারই শরণাপন্ন হইল। সে যদি কোনোও লোক যোগাড় করিয়া দিতে পারে। ফুলশরিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করবাবু তাহাকে ডাকিয়া কাজের ভার দিতেছেন! জরুর সে 'কোসিস' করিবে। মেথবদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালি বর্ষণ করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল, শঙ্কর আবার মেথরপাড়ায় ফিরিয়া আসিল। সাহেব তাঁহার 'ডিসইনফেক্‌টিং' শেষ করিয়াছেন।

লোক পেলেন?

ডাকতে পাঠিয়েছি!

সাহেবের চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মিটিমিটি কবিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, পাওয়া শক্ত। কেউ আসিবে না। এ দেশের লোককে আমি চিনি।

সত্য কথাটা শুনিয়া শঙ্করের লজ্জা হইল। হঠাৎ রাগও হইল। আশ্চর্য স্পর্ধা এই বিদেশিটার! আমাদেরই অর্থে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া, আমাদের দেশের মাটিতেই দাঁড়াইয়া, আমাদেরই নিন্দা করিতেছে! আমাদের উপকার করিবার জন্য কে উহাকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল? উত্তরে একটা রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার অবস্থাও কি অনুরূপ নয়? তাহাকে কে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল এখানে আসিতে? সাহেব কিছু না বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং অবলীলাক্রমে মুমূর্ষু কলেরা রোগীটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

আমি হস্‌পিটালে চলি। আপনি অপেক্ষা করুন। শীঘ্র কেহ আসিবে না। জানোয়ার সব—

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহেব চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ দেখা গেল, শঙ্কর দাঁড়াইয়া দেখিল। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, স্কুলের স্পোর্টসে একবার সে ফার্স্ট হইতে পারে নাই। তাহার অপেক্ষা বলিষ্ঠ আর একজনের নিকটে সে হারিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সেই ছেলেটা যখন 'কাপ' লইয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার যাহা মনে হইয়াছিল, এই সাহেবকে দেখিয়া ঠিক তাহাই মনে হইল। সাহেবের মহত্ত্বে যতটা প্রীত হইয়াছিল, তাহার ওই 'জানোয়ার' কথাটায় ঠিক ততটাই বিরক্ত হইল সে। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল যেন। মনে হইতে লাগিল, এই যে ইহারা

আমাদের সকলকে অশিক্ষিত বর্বর বলিয়া অনুকম্পাভরে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মূলে কি আছে? নিছক মানব-প্রেম? স্বার্থ নয়? ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পর্যন্ত স্বদেশবাসীকে হীনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। আমাদের কবিও গাহিয়া গিয়াছেন— 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।' কাহার ভাষা? সত্যই কি আমরা মূঢ়, সত্যই কি আমরা মূক, সত্যই কি আমরা ম্লান? সত্যই কি আমাদের নিজের কোনো বুদ্ধি নাই, সৌন্দর্য নাই, ভাষা নাই? যে বিদেশি মানদণ্ডের মাপে এসব কথা বলিতে শিখিয়াছি, সেই মানদণ্ডটাই কি নিখুঁত? উহাদের চোখ দিয়া দেখিলে আমাদের হয়তো ম্লান দেখায়, উহাদের কান দিয়া শুনিলে আমাদের প্রাণের ভাষা হয়তো শোনা যায় না, কিন্তু উহাদের বিচারটাই কি শেষ বিচার? কলেরায় দলে দলে লোক পলাইতেছে, ইহা লইয়া ঠাট্টা করিবার কি আছে? উহাদের দেশে পলায় না? নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে কি স্থির হইয়া থাকিতে পারে? পলাইয়াছে তো হইয়াছে কি? উহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায় না? প্রাণের ভয় কাহার নাই? ও-দেশের গরিবদের কথা কে না জানে? ও দেশের 'স্লাম'বাসীদের তুলনায় আমাদের গরিব লোকেরা তো দেবতা। উহাদের সাহিত্যে স্লামের যে পাশবিক ছবি আমরা পাই তাহা বীভৎস, এ দেশে ও-ছবি কল্পনাও করা যায় না। আমাদের অনেক দোষ আছে— আমরা রুগ্ন, আমরা অশিক্ষিত, আমরা অসহায়; কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি পরাধীনতা নয়? নিরীহ হরিণ বিরাট একটা পাইথনের কবলে পড়িয়া নানারূপ অশোভন ভঙ্গিতে ছটফট করিতেছে। এই অশোভনতা যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আমরা দুষ্ট। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহার মনের গ্লানি অনেকটা যেন কমিয়া গেল। কিন্তু তাহা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইবার অবসর পাইল না। ফুলশরিয়া আসিয়া হাজির হইল। বলিল যে, ভদু ও যোগীয়ার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, কয়েকদিন আগে তাহাদের দুজনেরই ছেলে-বউ মরিয়াছে। এখন তাহারা কালালিতে বসিয়া মদ খাইতেছে। মড়া ফেলিবার কথা বলায় হা-হী করিয়া অশ্লীল ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিল। বাবু নিজে যদি গিয়া ছোঁড়া-পুতাদের কান ধরিয়া টানিয়া আনেন, তবে ঠিক হয়।

শঙ্কর বলিল, দুটো ছোট খাটিয়া যোগাড় করতে পারিস?

হাঁ। উ আর কি ভারী বাত ছে।

তাই আন তা হ'লে। তোর আপত্তি আছে ছুঁতে? যদি না থাকে তা হ'লে তুই আর আমি একে একে এদের নিয়ে যাই, চল।

ফুলশরিয়া শিহরিয়া উঠিল।

উ বাবু হম নেই সেকবো।

শঙ্কর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন গভীর রাত্রে শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দুইটা, সমস্ত দেহ মন অবসন্ন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। সে কাহাকেও উঠাইল না। উঠাইবার প্রবৃত্তিও হইল না। বাহিরের ঘরে তাহার এক প্রস্থ বিছানা পাতাই থাকিত, বাহিরের ঘরের চাবিও তাহার কাছে ছিল, বাহিরের ঘরেই সে শুইয়া পড়িল। সাহেবের কথাগুলি তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল — Your country lives in huts, not in palaces— lives like this and dies like this. তাহার ঘুম আসিল না। খানিকক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল, আলো জ্বালিয়া লিখিতে শুরু করিয়া দিল।

'যেমন করিয়া হোক ইহাদের আমি উদ্ধার করিব, তাহা করিতে গিয়া যদি আমার ধনপ্রাণ সর্বস্ব যায়, তবু আমি নিরস্ত হইব না। ...'

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিল, বারান্দায় একটা ছায়ামূর্তির মত্ত কে যেন দাঁড়াইয়া আছে।

কে?

ছায়ামূর্তি আগাইয়া আসিল।

কি চাই এত রাত্রে?

কম্পিতকণ্ঠে ফুলশরিয়া বলিল, কুছ নেই।

শঙ্কর উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিতেই ফুলশরিয়া হঠাৎ আগাইয়া আসিল এবং তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

এ কি।

ফুলশরিয়া কিছুতেই পা ছাড়ে না। কি হইল? কাঁদিতেছে কেন? জোর করিয়া পা সরাইয়া লইতে ফুলশরিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে চোখ মুছিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। একটি কথাও বলিল না। নিজের অদ্ভুত আচরণে নিজেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু না আসিয়া সে কিছুতেই পারে নাই। কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ হইতেই সে শঙ্করের বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরিতেছিল! মেথরের মড়া বাবু নিজে কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া গেলেন। এ কি মানুষে পারে? এ লোককে প্রণাম না করিয়া থাকা যায়?

শঙ্কর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সকালে খোঁজ করিয়া শুনিল ফুলশরিয়া বাড়িতে নাই। হাতে কোনো কাজ ছিল না, মনে হইল, উৎপলের কাছে একবার যাওয়া যাক। তাহার সহিত দেখা না করাটা অশোভন হইতেছে। সুরমা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তবে যাইবে, এ কি তার পাগলামি! সেখানেও গিয়া দেখিল, কেহ নাই। দারোয়ান বলিল, বাবু এবং মাইজি একটা জরুরি তার পাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন বলিয়া যান নাই।

ছেচল্লিশ

পরদিন একজন পাচক সমভিব্যাহারে শিরীষবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং শুধু অমিয়াকে নয়, শঙ্করকেও লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমিয়া বলিল, আমি যাই কি ক'রে, বল? হাসিদি তাঁর ছেলেকে আমার কাছে রেখে গেছেন। কার কাছে রেখে যাই একে?

চিবুকের তলাটা চুলকাইতে চুলকাইতে শিরিষবাবু বলিলেন, রেখে যাবি কেন? ও চলুক আমাদের সঙ্গে।

বাঃ, হাসিদি ফিরে এসে যদি ছেলে খোঁজেন?

শঙ্কর বলিল, তার ফিরতে এখন দেরি আছে। তুমি নিয়ে যেতে পার ওকে।

অমিয়া বলিল, তা ছাড়া বাড়িতে এতগুলি পোষ্য, তাদের দেখে কে?

ইহার জন্য শিরিষবাবু প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন।

সেই জন্যই তো রাঁধুনী বামুনটাকে সঙ্গে এনেছি, ও স্বচ্ছন্দে সব চালিয়ে দিতে পারবে। শঙ্করও আমাদের সঙ্গে চলুক। চারিদিকে কলেরা হচ্ছে, এখন এখানে থাকা ঠিক নয়।

শঙ্কর বলিল, কলেরা হচ্ছে ব'লেই আরও আমাকে থাকতে হবে।

শিরীষবাবু জামাতার দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া আবার চিবুক চুলকাইতে শুরু করিলেন।

অমিয়া বলিল, যাই, বাবার চা-টা নিয়ে আসি। তুমিও খাবে নাকি আর এক কাপ?

আন।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, খাবে বই কি। আন্।

অমিয়া চলিয়া গেল।

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। মুশাই আসিয়া ডাকের চিঠি দিয়া গেল।

ডাক এল নাকি?

হ্যাঁ।

শঙ্কর খামখানা খুলিয়া দেখিল, উৎপলের চিঠি।

উৎপল লিখিয়াছে—

ভাই শঙ্কর,

চিঠি পড়বার আগেই একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি। যা করেছি, তার প্রেরণা মানবসুলভ কৌতূহল, অন্য কিছু নয়। লোভটা সামলাতে পারা গেল না। শুধু তাই নয়, সামলানো উচিত বলেও মনে হল না। আগে তোমাদের কাউকে কিছু বলিনি, কারণ বললেই তোমরা বাগড়া দিতে। সুরমা এখনও দেবার চেষ্টা করছে, যদিও এখন আর ফেরবার পথ নেই, সই করে দিয়েছি। অর্থাৎ, ইন ব্রিফ, কিংগ্স কমিশন পেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আগে থাকতেই গোপনে গোপনে চেষ্টা করছিলাম, লেগে গেছে। মানব-মনীষার এই নবতম বহ্ন্যুৎসবটা স্বচক্ষে দেখবার কি যে আগ্রহ হচ্ছে আমার, তা তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করব না; কারণ তোমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক, তোমাদের ধরনধারণ সবই স্বতন্ত্র। যাক সে কথা। এখন যে-কোন মুহূর্তেই উড়ব এবং চীন না কায়রো কোথায় গিয়ে হাজির হব, তা জানি না। যতদিন না ফিরি সুরমা তার বাবার কাছে বম্বেতে থাকবে। তোমার সঙ্গে দেখা হল না, তাই চিঠিতেই গোটাকতক কাজের কথা বলে যাচ্ছি, অবধান কর। আগে যেমন ছিলে, এখনও তেমনই তুমি জমিদারির সর্বময় কর্তা রইলে। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার অবর্তমানে তুমি যা করবে, তাতে আমার অগ্রিম সম্মতি রইল এবং আইনতই সেটা পাকা করবার জন্যে আমার উকিলকেও অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু একটা কথা। দেশোদ্ধারের যে এক্সপেরিমেন্টটা আমরা করেছিলাম, তাতে যে খুব সুবিধে হয়নি, এতদিনে তুমিও সেটা বুঝেছ নিশ্চয়। অন্য একটা লাইন ধরলে কেমন হয়? অবশ্য কি লাইন ধরলে যে ভাল হবে, সেটা তুমিই ভেবে-চিন্তে ঠিক করো।

মণির ব্যাপারে আমি যে বিকট কাণ্ড করে এসেছি, তার ফল কি হল? আমার পদ্ধতি উল্টে দিয়ে নতুন কোনো উপায়ে যদি সমস্যাটার সমাধান করতে পার, করো আমার কিছু আপত্তি নেই। বিবেকদংশনে ক্ষত-বিক্ষত হবার দরকার কি। যাদের ক্ষতি হয়েছে, যদি ভাল মনে কর, তাদের ক্ষতিপূরণ করে দিতে পার।

তোমার নিপুদার সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল। রিক্রুটিং আপিসে দেখি, তিনি ওয়ারে নাম লেখাবার জন্যে এসেছেন। নেহাত পেটের দায়েই এসেছিলেন বলে মনে হল, যদিও অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট নানারকম বুক্‌নি ঝাড়লেন। এ কথা মনে হবার কারণ, যেই তাঁকে বললাম— আপনি যদি চান সিভিল লাইনেই ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি আপনার, অমনই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছি তাঁর। তিনি একটি অনুরোধ করেছেন। জমিদারি আমরা যদি বিক্রি করি, মুকুন্দ পোদ্দার বা রাজীব দত্তকে যেন না দিই। এ অনুরোধের

অর্থ কিছু বুঝলাম না। জমিদারি আমরা বিক্রি করব, এ গুজব উঠল কি করে। কেনারামও একদিন বলছিল এ কথা। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওই কেনারামটিকে সাবধান। বড় গভীর জলের মাছ উনি। আমাকে জানিয়ে গেছেন, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছেটা এই নিয়ে তোমার সঙ্গে একটা মনোমালিন্য করি। আমি যে গভীরতর জলের জীব, এ খবর উনি জানেন না বলেই এ চেষ্টা করেছিলেন। পারতপক্ষে ওঁর সংস্পর্শ পরিহার করো। আমার মতে লোকসান টোকসান যা হয়েছে, তা 'রাইট অফ' করে দিয়ে ব্যাঙ্কটা তুলে দাও। ধার হিসেবে না দিয়ে বছরে গরিব প্রজাদের যা পার দানই করো বরং কিছু কিছু। সব দিক থেকে নিরাপদ সেটা, দেখতে শুনতেও ভাল।

আর বিশেষ কিছু লেখবার নাই। চুম্বন গ্রহণ কর।

সুরমা খুব হাসিমুখে থাকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ভেতরটা যে টনটন করছে, তা ঠিক ঢাকতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে একটু একটু তবে সেটা আমার জন্যে, না তোমার বিরহে, বুঝতে পারছি না ঠিক।

ইতি—
উৎপল

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

কার চিঠি?

উৎপলের।

ডাকে আসবার মানে?

ওরা এখানে নেই। উৎপল যুদ্ধে যাচ্ছে।

আর সুরমা?

সে বম্বে যাবে।

বাহির হইতে কে ডাকিল, শঙ্করদা।

শঙ্কর বাহিরে গিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক দাঁড়াইয়া আছে।

কি খবর?

আমাদের গ্রামেও কলেরা লেগেছে।

চৌধুরী মশাইকে খবর দাও তা হ'লে। আমাকে আজ কলকাতা যেতে হচ্ছে।

ও। কলকাতায় কোথায় উঠবেন?

সপরিবারে যাচ্ছি যখন, ক্যালকাটা হোটেলেই উঠব। তেমন দরকার যদি বোঝ, খবর দিও।

আচ্ছা।

নিমাই ঘটক চলিয়া গেল।

সুরমা এখানে নাই এবং কিছুদিন এখন থাকিবে না— এই বার্তা শুনিয়া অমিয়া আর বাপের বাড়ি যাইতে আপত্তি করিল না।

শঙ্করও বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত যাই। উৎপলের সঙ্গে দেখা করা দরকার একটু।

শিরীষবাবু সোৎসাহে বলিলেন, বেশ তো, বেশ তো।

সাতচল্লিশ

অমিয়াকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া শঙ্কর গড়ের মাঠে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। নির্জনে নিজের সঙ্গে সে বোঝা-পড়া করিতে চায়। উৎপল সুরমা কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই। বিমর্ষচিত্তে সে বারংবার আবৃত্তি করিতেছিল, ভালই হইয়াছে, আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামে সকলে যখন কলেরায় মরিতেছে, তখন সে তাহাদের ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল কেন? এই না সেদিন উচ্ছ্বাসভরে লিখিতেছিল, 'আমি যেমন করিয়া হোক উহাদের উদ্ধার করিব?' এই উদ্ধার করিবার নমুনা! কেন আসিল সে? অমিয়ার জন্য আসে নাই, শ্বশুরের অনুরোধেও নয়, এমন কি উৎপলের সহিত দেখা করিবারও একটা বিশেষ আগ্রহ জাগে নাই তাহার, সে আসিয়াছিল সুরমার জন্য। নির্জনে এই রূঢ় সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। ছি ছি, কেন এই হীন লোলুপতা। আত্মসম্বরণ করিবার জন্য সামান্য এ শক্তিটুকু যাহার নাই, সে করিবে পতিতোদ্ধার। চরিত্রের কোন্ সম্পদ আছে তাহার। বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সে হাসির টাকাটা দিয়া নিজের ঋণপরিশোধের জল্পনা করিয়াছিল। অতি সহজেই তো রাজীব দত্তকে স্পষ্ট মিথ্যা কথাটা বলিয়া আসিল, আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না। পরোপকার করিবার ছুতায় সে এতদিন আত্মবিনোদন ছাড়া আর কি করিয়াছে? কেবল কর্তৃত্ব করিয়াছে সকলের উপর। যে তাহার অহংকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছে, তাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছে; যে পারে নাই, তাহাকে নির্যাতন না করিলেও অনুকম্পা করিয়াছে। পরের অর্থে নিজের অহঙ্কারকে পরিতুষ্ট করিতে করিতেই তো জীবন কাটিল। গৌরব করিবার মত তাহার নিজের কি আছে? কিছুই নাই। ... নিঃস্ব ভিখারির মত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। সহসা মনে পড়িল শাস্ত্রে বলিয়াছে— আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। নিজেকে? অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার গুহায় লুব্ধ পশুটা বসিয়া আছে— কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবিটা। শিহরিয়া উঠিল। ওই কদাকার পশুটাই আমি? আর কিছু নাই? মিথ্যা কথা। আমার অন্তরে এক স্বপ্ন, পশু কি কখনও স্বপ্ন দেখে? পশুর অন্তরে কি উচ্চাশা জাগে? আমার অহঙ্কার অসংযম অপৌরুষ অসন্তোষ অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার যে কল্পনা আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা কি পশুর কল্পনা? এতদিনের এত শ্রম এত সাধনা সব পণ্ড হইয়া যাইবে, পশুটারই জয় হইবে শেষে? সহসা তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর বেগে বহিতে লাগিল, চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অন্তরের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিছুতেই না, পশুটাকে আমি জয় করিবই। পরক্ষণেই মনে হইল, কিরূপে? অন্ধকার অন্তরলোকে তাহার ব্যাকুল মন কেবলই প্রশ্ন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিরূপে? কিরূপে? কিরূপে? অন্ধকারের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল, বিলাস বর্জন করিয়া কাজ কর। ভোগের শিখরে বসিয়া এতদিন কাজ করিবার অভিনয় করিয়াছ মাত্র, তোমার অন্ন অপরে উৎপাদন করিয়াছে, তোমার বস্ত্র অপরে বয়ন করিয়াছে, তুমি কেবল সাড়ম্বরে আস্ফালন করিয়াছ, আর কিছুই কর নাই। সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়া এইবার কাজে লাগ। কাজ করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। অপরকে ভাল করিবার দায়িত্ব তোমার নহে, কায়মনবাক্যে নিজে তুমি ভাল হও। নিজে যদি ভাল হইতে পার, তোমার সংস্পর্শে যাহারা আসিবে, তাহারাও ভাল হইবে। মুখের উপদেশ দিয়া নয়, নিজের পবিত্র জীবন দিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ কর। অন্য কোনো পথ নাই। নিজের বিবেকের চক্ষে নিজেকে যদি নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহাই তোমার সর্বপ্রথম এবং

সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

এই কর্তব্যই পালন করিবে সে। এবার ফিরিয়া জমিদারির সর্বময় কর্তা আর সে হইবে না। উৎপলের জমিদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া শাসন-পরিষদ গড়িবে, নিজেদের হিতাহিতচিন্তা নিজেরাই করিবে। তাহাকে যদি নির্বাচন করে, ভৃত্যের মত সেবা করিবে সে। তাহার বেশি আর কিছু নয়। নিজে সে কৃষকজীবন যাপন করিবে। ফরিদ, কারু, বিষুণদের দলে মিশিয়া ঠিক উহাদেরই মত বাস করিবে। উহাদেরই মত নিজের হাতে চাষ করিয়া স্বোপার্জিত অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবে। বাবু আর সে থাকিবে না। মুশাইয়ের বাড়ির পাশে ছোট একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া ... কল্পনার ডানায় উড়িয়া উড়িয়া মন তাহার স্বপ্ন-রচনা করিতে লাগিল। আচ্ছন্নের মত সে বসিয়া রহিল। কখন যে তাহার চোখ বুজিয়া আসিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল, তাহাও সে জানে না।

অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ খুলিল, তখন মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত একটা প্রেরণায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল, নিমাই ঘটক তাহার অপেক্ষায় হোটেলের সামনে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে।

নিমাই যে, কি খবর?

বড় দুঃসংবাদ। হরিদা কলেরায় মারা গেছেন, আর কুন্তলাদি সহমৃতা হয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

সে কি!

হ্যাঁ। প্রমথ ডাক্তার চলে যাওয়ার পর থেকে গ্রামে তো আর ডাক্তার নেই। আপনি যেদিন আসেন সেইদিনই সন্ধেবেলা হরিদার কলেরা হয়, পাড়ার কে যেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল, কিছু হয়নি। কেউ কিছু জানে না। ভোরে ঝক্সু দেখতে পেলে বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া আর গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাকাডাকি করা হ'ল, কোনোও সাড়া নেই। কপাট ভেঙে ঢুকে দেখা গেল, উঠোনে চিতা জ্বলছে। তেল আর ঘিয়ের খালি টিন প'ড়ে রয়েছে। বাড়িতে যত কাঠ কাপড়চোপড় ছিল, তাই দিয়ে চৌকির উপর চিতা সাজিয়েছেন কুন্তলাদি, আর তাইতেই পুড়েছেন স্বামীর সঙ্গে, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি, কেউ জানতে পারেনি।

শঙ্কর নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুলিস এ নিয়ে গোলমাল করছে, আপনার একবার যাওয়া দরকার।

নিশ্চয়। চল।— বলিয়াই সে চলিতে শুরু করিল।

এখন তো ট্রেন নেই।

এ কথা শঙ্কর শুনিতে পাইল কি না বোঝা গেল না।

সে দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল।

সমাপ্ত

স্থাবর

ভূমিকা

মানবজাতির যে কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হইয়া আছে, তাহার সম্পূর্ণ রূপ এখনও অজ্ঞাত। যতটুকু জানা গিয়েছে, তাহারই প্রাথমিক পর্ব লইয়া এই উপন্যাস রচিত হইল। স্থান কাল পাত্রের যে সীমাবদ্ধতা সাধারণ উপন্যাসকে রসোত্তীর্ণ করে, এক্ষেত্রে তাহা নাই। কারণ যিনি এই উপন্যাসের বক্তা, বিশেষ কোনো স্থান, কাল বা পাত্রে তিনি আবদ্ধ নহেন। যুগ-যুগান্তরে বহু খণ্ড-জীবনের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহারই স্মৃতিকথা এই উপন্যাস।

এ আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু ইতিহাসে এ কল্পনার সমর্থন আছে। সন্ধানী পাঠক-পাঠিকারা বর্তমানের অতি আধুনিক প্রগতিশীল সভ্যসমাজেও হয়ত এ কল্পনার বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষ করিবেন। বক্তাও মাঝে মাঝে সে ইঙ্গিত দিয়াছেন। মানবজাতির ইতিহাস বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় বহু বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। সেই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সময়ই আমার এই ধরণের একটি আখ্যায়িকা লিখিবার ইচ্ছা হয়। সেই সব পুস্তক হইতেই আমি আমার কল্পনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। কোথা হইতে কোন্ উপকরণ পাইয়াছি তাহা এখন ঠিক মনে নাই। সমগ্রভাবে তাহাদের ঋণ স্বীকার করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু মহাশয়গণ এ বিষয়ে বহু পুস্তক সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

লেখক

উৎসর্গ

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

বন্ধুবরেষু

এক

সুদূর অতীতের নিবিড় অন্ধকার হইতে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতেছি। আমি অমর আত্মা, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আকাশে-বাতাসে, সমুদ্রে-নদীতে, অরণ্যে-পর্বতে, মরুভূমির উষরতায়, শস্যক্ষেত্রের শ্যাম-শোভায় অহরহ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছি। আমি মরি নাই; তোমাদের ধর্মে-কর্মে সংস্কৃতিতে, কাব্যে শাস্ত্রে পুরাণে, চিন্তা-ধারার বৈচিত্র্যে, রক্তধারার অণুপরমাণুতে আজও আমি স্পন্দিত হইতেছি। কবরভূমি খনন করিয়া আমাকে অনুসন্ধান করিও না, আত্মানুসন্ধান কর, তোমার মধ্যেই আমাকে পাইবে। তোমার মধ্যেই আজও আমি ওতপ্রোত হইয়া আছি। তাহাই আমার বৈশিষ্ট্য এবং সেইখানেই আমার জয়। আমি মরিয়াও মরি নাই। আমার আদিমতম রূপ কী ছিল তাহা জানি না। আমি ছিলাম, আছি এবং থাকব—এইটুকুই শুধু নিঃসংশয়ে জানি। কিন্তু কাহিনী বলিতে হইলে একটা আরম্ভ থাকা চাই। সুতরাং একস্থান হইতে আরম্ভ করি।...

প্রভাত হইয়াছে। অদূরে পর্বতশিখরে, নবোদিত সূর্যের কিরণজালে, অসংখ্য বন্য কুসুমে, সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গকুলের কাকলিতে যে অপরূপ মহিমার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা আমার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সেদিন আমি অতিশয় বিষণ্ণচিত্তে সু-উচ্চ একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আছি। দলপতি তাড়াইয়া দিয়াছে; পলায়ন করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছি। ধরিতে পারিলে মারিয়া ফেলিত। লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি। বসিয়া বসিয়া তাহার মূর্তিটাই ভাবিতেছিলাম। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া ভ্রূ, ছোট ছোট চক্ষু দুইটি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড, হিংস্রতায় জ্বলিতেছে। মুখ বুক কালো কর্কশ লোমে পরিপূর্ণ। আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু। চলিবার সময় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চলে। আমিও নদীর জলে ঝুঁকিয়া একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, আমার চেহারাও ঠিক উহার মতো। নিচের চোয়ালটা ঠিক তেমনি সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, বিরাট থ্যাবড়া নাকটায় ঠিক তেমনি দুইটা বিরাট গর্ত। বেশ মনে পড়িতেছে ক্ষুব্ধ হই নাই, মুগ্ধও হই নাই, বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রথমে মনে হইয়াছিল জলের তলায় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি বসিয়া আছে। মনে হইবামাত্র রাগ হইয়াছিল, মুখ ভ্যাংচাইয়া ছিলাম। সে-ও ঠিক তেমনিভাবে মুখ ভ্যাংচাইল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িলাম...প্রতিচ্ছবি কোথায় মিলিয়া গেল। ভুল ভাঙিল আমার সঙ্গিনীর সহায়তায়। যে সঙ্গিনীর জন্য আমার এত লাঞ্ছনা, সেই সঙ্গিনীকে লইয়া একদিন নদীতীরে গিয়াছিলাম। সহসা তাহার প্রতিচ্ছবিও নদী তরঙ্গে প্রতিফলিত দেখিলাম। উভয়ে নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া সেদিন উপলব্ধি করিয়াছিলাম আমাদেরই কায়ার ছায়া নদীর জলে পড়িয়াছে। সবিস্ময়ে সেদিন দুজনে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। তখন আমরা কিশোর-কিশোরী।

...ওই সঙ্গিনীই শেষে আমার কাল হইল। আমাদের উভয়েরই বয়স ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। শরীরের শিরা-উপশিরায় যৌবনের উন্মাদনা জাগিল। আজও তোমরা যে লুব্ধ দৃষ্টিতে যুবতী নারীর প্রস্ফুটিত যৌবনের দিকে চাহিয়া থাক, সেই লুব্ধ দৃষ্টিতে আমিও তাহার দিকে চাহিয়া

থাকিতাম। তখন দেহের বা মনের কোনো আবরণ ছিল না। নগ্ন দেহের প্রতি রোমকূপে নগ্ন কামনা উদগ্র হইয়া থাকিত। সহসা সকলের সমক্ষেই একদিন তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ প্রস্তরফলক আসিয়া পৃষ্ঠে বিঁধিল এবং পরমুহূর্তেই দলপতি আসিয়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আঁচড়াইয়া খামচাইয়া কামড়াইয়া হয়তো আমাকে মারিয়াই ফেলিত, যদি না আমি রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতাম। রণে ভঙ্গ দিয়াও নিরাপদ হই নাই, অজস্র পাথর ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বহু দূর পর্যন্ত সে আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। প্রাণপণে ছুটিয়া তাহার এলাকা পার হইয়া এই গভীর অরণ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। তিন্তিড়ী বৃক্ষের উচ্চ ডালে আরোহণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই। একপাল হায়েনা কাছে দূরে ক্রমাগত চিৎকার করিয়াছে। একটা অস্ফুট আর্তনাদও যেন সমস্ত বনে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছে। সর্বাঙ্গে নিদারুণ বেদনা। পৃষ্ঠের ক্ষতটা টন-টন করিতেছে। প্রভাতের মহিমায় মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। যে পরিবেশের মধ্যে এতকাল ছিলাম, সেখানে আর ফিরিবার উপায় নাই। ওই দলপতিই আমার পিতা কি না, তাহা জানি না। যে রমণীটিকে মা বলিয়া জানিতাম, বাল্যকালেই তাঁহাকে চোখের সম্মুখে নিহত হইতে দেখিয়াছি একটা দুর্দান্ত বন্যবরাহের তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে। নিমেষের মধ্যে পেটটা চিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নাড়ী-ভুঁড়িগুলো বাহির হইয়া পড়িল। সে বীভৎস দৃশ্য অনেকদিন আমার রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে। বস্তুত সেই আমার জীবনে প্রথম বিভীষিকা। সেদিন হইতে বন্যবরাহকে সামান্য জন্তু বলিয়া ভাবিতে পারি না, মনে হয় স্বয়ং মৃত্যু। সামান্য পশুর কি এত শক্তি থাকিতে পারে? আর একটা ছবিও মনে আঁকা আছে। ...অন্ধকার রাত্রি, আগুনের চারিধারে আমরা সকলে বসিয়া আছি। আগুনটা নিবিয়া আসিয়াছে। ঘুম ধরিতেছিল, চোখ বুজিয়া বসিয়াছিলাম। একটা প্রচণ্ড গর্জনে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম...যে যেখানে পারিল পলাইল, আমিও ছুটিয়া একটা ঝোপের ভিতর লুকাইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ সেখানে লুকাইয়া রহিলাম। তাহার পর একটা হাওয়া উঠিল, খুব জোর হাওয়া, নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, শূন্যে যেন দুইটি গোল অঙ্গারখণ্ড ধক-ধক করিয়া জ্বলিতেছে। প্রকাণ্ড একটা কালো মুণ্ডে ভয়ঙ্কর দুইটা চোখ। জ্বলন্ত অগ্নিশিখাটার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইয়া আছে। পরমুহূর্তেই আবার ঘাড় ফিরাইয়া লইল, হাড়-ভাঙার কমড়মড় শব্দ শোনা গেল। সামনের দুই থাবায় চাপিয়া কী যেন খাইতেছে। মুখটা আর একবার তুলিয়া হিংস্র দৃষ্টিতে আগুনের শিখাটার দিকে চাহিয়া সমস্ত দন্তগুলি বাহির করিল...কান দুইটা পিছনের দিকে চলিয়া গেল...খ্যা খ্যা জাতীয় একটা চাপা রুষ্ট গর্জন করিয়া আবার আহারে মন দিল। বাঘ একটা। তাহার জ্বলন্ত চক্ষু, লেলিহান জিহ্বা, রক্তাক্ত দংষ্ট্রা সেই স্বল্পালোকে মুহূর্তের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর চিত্র আমার অন্তরতম চেতনায় আঁকিয়া দিল, তাহার মূল রূপটি আজও অপরিবর্তিত। সে চিত্র বাঘের নয়। তাহা হিংস্র দেবতার নিষ্ঠুর পিশাচের নিরপরাধ নিরীহ জীবকে যে অতর্কিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, তাহার। যুগে যুগে সে রূপ বদলাইয়াছে সত্য, কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। তাহার নবতম মূর্তি তোমাদের অ্যাটম বম। পরদিন দেখা গেল, আমাদের দলের একজন নাই। তাহার জন্য কেহ শোক করিল না। শুধু তাই নয়, তাহার কয়েকদিন পরে আমাদের দলপতি আর একটি ছেলেকে দলছাড়া করিল। তাহার কোনো অপরাধ ছিল না। একমাত্র অপরাধ সে প্রাপ্তবয়স্ক, দলপতির সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাই তখন নিয়ম ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর নিজে চরিয়া খাইতে হইবে, নিজের শক্তিতে নিজের বিচরণভূমি আবিষ্কার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হইবে, নিজের সঙ্গিনী সন্ধান করিয়া নিজের

সংসার পাতিতে হইবে।

...অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বসিয়া আছি, প্রভাতের মহিমায় মুগ্ধ হইতে পারিতেছি না। কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে। লাল পিঁপড়েরাও জ্বালাতন করিতেছিল। গাছটায় অসংখ্য লাল পিঁপড়ে। কয়েকটা খাইয়া দেখিলাম—টক টক, মন্দ নয়। কিন্তু ইহাতে পেট ভরিবে না, ইহাদের নিঃশেষও করা যাইবে না। সুতরাং গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম। ঝোপের আড়ালে আড়ালে সাবধানে উঁকি-ঝুঁকি দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সে যুগে মানুষ নির্ভয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিত না। অনেক শত্রু ছিল। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, বন্যমহিষ, বন্যবরাহ কখন কে কোন্ দিক হইতে অতর্কিতে আসিয়া পড়িবে, সেই ভয়ে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হইত। মানুষ তখনও নিজের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা করিতে পারে নাই, তখনও তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। বাঘ সিংহ গণ্ডারেরাই তখন রাজত্ব করিতেছিল। অনেক সময় তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই দিন কাটাইতে হইত। একবার মনে আছে, ভীষণ একটা গর্জন শুনিয়া সকলে নিকটবর্তী গাছে চড়িয়া পড়িলাম। তখন গাছেই আমাদের আশ্রয় ছিল। দলপতি গাছের ডাল ফাঁক কবিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, আমরাও তাহাই করিতে লাগিলাম। গর্জনটা কিসের এবং আমরা নিরাপদ কি না, তাহা না জানা পর্যন্ত কাহারও স্বস্তি নাই। সহসা দলপতি হর্ষসূচক একটা শব্দ কবিল। যদিও কিছুই দেখিতে পাই নাই, তবু বুঝিলাম আনন্দজনক কিছু একটা ঘটিতেছে। আমরাও অনুরূপ শব্দ করিয়া দলপতিকে সমর্থন করিলাম। পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে শুধু গর্জন নয়, তুমুল একটা আলোড়নও চলিতেছিল। কিছুক্ষণ চলিয়া হঠাৎ সেটা থামিয়া গেল। দলপতি সচকিতে একবার চাহিল। যে মেয়েটি তাহার মাথার উকুন বাছিতেছিল, সেও সচকিত হইল—কিংবা হইবার ভান করিল—দলের মধ্যে সে-ই তখন দলপতির প্রিয়তমা। দলপতি সন্তর্পণে গাছ হইতে নামিল। আমরাও নামিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু দলপতি দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসিতে আমরা নিরস্ত হইলাম। সে একাই নামিয়া গেল। একটু পরে যখন ফিরিয়া আসিয়া বসিল, তখন তাহার মুখ গম্ভীর। চতুর্দিকে অন্ধকার...পরিস্থিতি অনিশ্চিত.. আমরা আর টু শব্দটি করিলাম না। সমস্ত রাত্রি দলপতি কেমন যেন উসখুস করিতে লাগিল। রাত্রিতে কিন্তু সে আর গাছ হইতে নামিবার সাহস করিল না। পরদিন সকালে উঠিয়াই নামিয়া গেল এবং বনের ভিতর হইতে অর্ধভুক্ত মহিষ টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবত কোনো বাঘ কিংবা সিংহ মহিষটাকে বধ করিয়াছিল, সবটা খাইয়া শেষ করিতে পারে নাই। দলপতি সেটাকে টানিয়া টানিয়া বহুদূরে লইয়া গেল, আমরাও তাহার অনুসরণ করিলাম। একটা নিরাপদ স্থানে গিয়া যতটা পারা গেল, তখনই সকলে মিলিয়া খাওয়া গেল। অবশিষ্ট যেটুকু রহিল, সেটুকু দলপতি একটি খাদের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। মহিষের পচা মাংস খাইয়া আমাদের বেশ কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছিল মনে পড়িতেছে।

—এদিকে ওদিক ঘুরিয়া একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম, যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা জুজুমের এলাকা। জুজুমকে বহুদিন পূর্বে বহুদূর হইতে দেখিয়াছিলাম। ভীষণ-দর্শন। সে যুগে কেহই মহাত্মা ছিল না, সুতরাং প্রকৃতিও যে তাহার হিংস্র, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। একবার যদি নাগালের মধ্যে পায় আস্ত রাখিবে না। তখন সদ্ভাব দূরে থাক, প্রতিবেশী বলিয়াই কিছু ছিল না। একজন দলপতির সহিত আর একজনের কচিৎ দেখা হইত। প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকায় নিজের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী লইয়া বিচরণ করিত এবং সেখানে কাহাকেও প্রবেশ

করিতে দিত না। এদিক ওদিক চাহিয়া আর একটি বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। অবিলম্বে সহজলভ্য কিছু খাদ্যের সন্ধান করিতে হইবে। মাটি খুঁড়িয়া কেঁচো কিংবা কন্দ সংগ্রহ করিবার উৎসাহ ছিল না। বিনা পরিশ্রমে কিংবা অল্প পরিশ্রমে যদি খানিকটা মাংস বা ফল পাওয়া যায় বড় ভাল হয়।

গাছে উঠিয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর দেখিতে পাইলাম, অদূরে একটা গাছের ডালে প্রকাণ্ড একটা মৌচাক রহিয়াছে। কিছুদূরে একটা নদীও বহিয়া গিয়াছে! তাহার নীরে অথবা তীরে কিছু খাদ্য পাওয়া অসম্ভব নয়। ডান দিকে প্রকাণ্ড একটা জলাভূমিও দেখা যাইতেছে, সেখানে আর কিছু না থাক, শামুক গুগলি নিশ্চয়ই আছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা ঝোপ থাকাতে সবটা দেখা যাইতেছে না, হয়তো আরও কিছু আছে। মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিতে হইলে আগুন দরকার। ধোঁয়া না দিলে মৌমাছিগুলো পলাইবে না। চকমকি পাথর খুঁজিয়া শুষ্ক ডাল-পাতা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইতে বেশ কিছু সময় লাগিবে। নদীর তীরেই আপাতত কিছু খোঁজ করা যাক।

গাছ হইতে নামিলাম। ঝোপের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হইতেছি, দেখি একটা হরিণ তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কাছেই একটা বেশ বড় পাথর পড়িয়াছিল, ত্বরিতহস্তে সেটা তুলিয়া লইলাম। যদি কপালের মাঝখানে কিংবা পায়ে মারিতে পারি, নির্ঘাত পড়িয়া যাইবে এবং তাহা হইলে কয়েকদিনেব জন্য নিশ্চিন্ত। পাথরটা তুলিয়া মারিতে গিয়া কিন্তু মারা হইল না, ত্রস্ত হইয়া ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করিতে হইল। স্বয়ং জুজুম হরিণটার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে! ক্ষণপরেই হরিণটা আমার পাশ দিয়া সবেগে চলিয়া গেল, দেখিলাম তাহার পিঠে একটা পাথরের তীর গাঁথা। আমার মাথার ওপর দিয়া কয়েকটা প্রস্তরফলক সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া গেল। তাহার পরমুহূর্তেই দ্রুত পদক্ষেপে কেবল জুজুম নয় আরও দুইজন গেল বুঝিতে পারিলাম। আমি একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম। সন্তর্পণে ডালপালা ফাঁক করিয়া দেখিলাম—যাহা দেখিলাম, তাহা আজও ভুলি নাই।

...হরিণটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। জুজুম তাহার পেটের উপর বসিয়া তীক্ষ্ণ প্রস্তর-ছুরিকা দিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। তাহার ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া আছে দুইটি স্ত্রীলোক, একজন প্রৌঢ়া আর একজন যুবতী। সম্ভবত মা আর মেয়ে। জুজুম হরিণের বুক হইতে ছুরিটা খুলিয়া লইতেই ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি হরিণটার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার ক্ষতস্থান হইতে চুষিয়া রক্ত পান করিতে লাগিল। জুজুম অবশ্য তাহাকে বেশিক্ষণ এ সুযোগ দিল না; এক ঝটকায় সরাইয়া দিয়া নিজেই পান করিতে লাগিল। মেয়েটা ভ্রূভঙ্গি সহকারে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত দন্তপাতি বিকশিত করিয়া মায়ের দিকে একবার চাহিল। তাহার সে মূর্তি আজও ভুলি নাই। প্রভাতের স্বর্ণকিরণে শ্যামল প্রকৃতি উদ্ভাসিত, অদূরে শৈলশিখরে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা, এই পটভূমিকায় সেদিন নগ্না কৃষ্ণাঙ্গী ইকাকে দেখিয়াছিলাম—পীনোন্নত-পয়োধরা, নিবিড় নিতম্বিনী বিস্রস্ত কুন্তলা—তীক্ষ্ণ দন্তে পুষ্ট অধরে উষ্ণ মৃগরক্ত লাগিয়া আছে।

...একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তখন কাহারও কোন নাম ছিল না। তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য তোমাদের কল্পনা অনুযায়ী নামকরণ করিতেছি। তখন আমরা সকলেই নাম-গোত্রহীন। নামের বা গোত্রের প্রয়োজন ছিল না। ইকাকে দেখিয়া যে ক্ষুধা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাই তখন জীবনেব প্রধান প্রেরণা ছিল, তাহারই তাড়নায় যাহা করিতাম,

তাহাই ছিল তখনকার দিনে প্রধান প্রয়োজন, অন্য কিছু চিন্তা করারও প্রয়োজন অনুভব করিতাম না। আমি তাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম, সে-ও আমাকে দেখিলে চিনিবে। ডাকিবার প্রয়োজন ছিল না। ডাকিলে তো আসিবে না, সবলে অধিকার করিতে হইবে। যে ভাষায় এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহাও তোমাদের ভাষা। কারণ এ ভাষায় না বলিলে তোমরা বুঝিবে না। সেকালে আমাদের যে ভাষা ছিল, তাহা ইঙ্গিতের চাহনির ভঙ্গির—তাহা লিপিবদ্ধ করা যায় না।

...অনেকক্ষণ ইকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। যাহাকে বাহুপাশে বাঁধিতে গিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে বিতাড়িত হইয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি আমার উন্মুখ বাসনাকে ম্লান করিল না। তাহার মধ্যে যাহার অনবদ্য প্রকাশ আমাকে আকুল করিয়াছিল, ইকার মধ্যেও তাহাই দেখিতেছিলাম। মানুষ নয়, দেহ নয়, যৌবন।

জুজুম হরিণটাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। ইকা এবং সেই প্রৌঢ়াও তাহার পিছু পিছু চলিল। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম, কখনও বুকে হাঁটিয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও ঝোপের আড়ালে। একটু আগেই খাদ্যের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। উগ্রতর ক্ষুধার তাড়নায় সে কথা ভুলিয়া গেলাম। ইকা কোথায় থাকে, তাহা আবিষ্কার করাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ম বলিয়া মনে হইল। কণ্টকে কঙ্করে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সরীসৃপের মতো ইকার অনুসরণ করিতেছিলাম। একটু পরেই কলরব শোনা গেল। হর্ষধ্বনি। জুজুমের পরিবারবর্গ—নানা বয়সের কতকগুলি নারী এবং শিশু ছুটিয়া আসিয়া জুজুমকে সংবর্ধনা করিল। ঝোপের আড়াল হইতে সন্তর্পণে ঘাড়টা তুলিয়া জুজুমের আস্তানা দেখিলাম। তখন আমরা কুঁড়েঘরও প্রস্তুত করিতে শিখি নাই। ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া একটা স্থান চিহ্নিত করা থাকিত, কাছেই থাকিত একটা বড় গাছ, তাহাতেই বিপদের সময় আশ্রয় লইতে হইত। মানুষের গৃহের কোনো প্রয়োজনও ছিল না তখন। তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রায় প্রত্যহই আহরণ করিতে হইত। সঞ্চয় করিবার মতো উদ্বৃত্ত প্রায়ই থাকিত না। একটি জিনিস কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইত—পাথরের নুড়ি। একস্থানে পাথরের নুড়ি স্তূপীকৃত থাকিলেই বোঝা যাইত যে কাছেপিঠে মানুষ আছে। গৃহের আর একটা প্রয়োজন অন্তরাল সৃষ্টি করা। তখন সে প্রয়োজনও মানুষের ছিল না। তখন আমরা উলঙ্গ ছিলাম। যাহা করিবার তাহা প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত আকাশের নিচেই করিতাম। লজ্জা বলিয়া কিছু ছিল না, শ্লীলতার জটিলতা কল্পনাই করিতে পারিতাম না। প্রত্যেক দলে একটি মাত্র সমর্থ পুরুষ থাকিত। বালক যৌবনে পদার্পণ করিলেই নিহত কিংবা বিতাড়িত হইত। আমি যেমন হইয়াছিলাম।

...জুজুম শিকার লইয়া বেড়ার অন্তরালে অদৃশ্য হইল। আমি উৎসুক নয়নে চাহিয়া রহিলাম। ইকাকে আর দেখা গেল না। আহারের সন্ধানে ধীরে ধীরে জলাটার দিকে অবশেষে অগ্রসর হইলাম। জঠরের তাড়নায় বেশিক্ষণ উদাসীন থাকা আর সম্ভব ছিল না। সদ্য নিহত হরিণের রক্তাক্ত স্মৃতিটা রসনাকে লালায়িত করিতেছিল, কিন্তু নিরুপায় হইয়া লোভ সংবরণ করিতে হইল।

জলাশয়ের ধারে কিছু খাদ্য জুটিল। প্রচুর ব্যাং ছিল। শামুকও ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা মাছও পাইয়া গেলাম। মাছটা আকাশ হইতে পড়িল। ওপরে চাহিয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা মাছরাঙা পাখি এবং উৎক্রোশ দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। সম্ভবত মাছরাঙাটার মুখ হইতেই মাছটা খসিয়া পড়িয়াছে। তীরবর্তী গাছের ডালে ডালে নানা জাতীয় মৎস্যভুক পাখির সমাবেশ দেখিয়া

অনুমান করিলাম, জলাশয়ে প্রচুর মাছ আছে। বড় আনন্দ হইল, আহারের বেশ সংস্থান আছে। পরক্ষণেই কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল। ইহা যে জুজুমের এলাকা। যে কয়দিন এখানে থাকিতে হইবে, চুরি করিয়া লুকাইয়া থাকিতে হইবে। ধরা পড়িলে জীবন-সংশয়। কিন্তু উপায় নাই, থাকিতেই হইবে। সুতরাং যথাসম্ভব সাবধানে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছু শুষ্ক ডালপালা এবং কয়েকটা ভাল পাথর সংগ্রহ করিতে হইবে। যে মৌচাকটা দেখিয়াছি, তাহার নিচে আগুন জ্বালাইয়া মধু ও মৌমাছির বাচ্চাগুলি অবিলম্বে সংগ্রহ করা দরকার। ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাথর সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। সে যুগে পাথরই ছিল আমাদের অস্ত্র। শুধু অস্ত্র নয়, জীবনধারণের প্রধান সহায়। পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিতাম, পাথরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতাম, পাথরের মধ্যেই আমরা অগ্নিকে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। নানা শত্রুপরিবেষ্টিত সেই যুগে অসহায় মানুষের পাথরই ছিল পরম সহায়। পরবর্তী যুগে পাথরই তাই আমাদের দেবতা হইয়াছিল। সমস্ত দিন ঘুরিয়া অনেক পাথর সংগ্রহ করিলাম। ছোট বড় মাঝারি, গোল লম্বা নানা আকারের। সেই সময়ই লক্ষ্য করিলাম কোথায় কোন্ কন্দ আছে, কোন্ কোন্ গাছের ডালে, পাতায় বা ফাটলে গুটিপোকা পাওয়া যায়, কোন্ গর্তটি মূষিকের, কোন্টি শশকের, কোন্টি সজারুর। একটা গাছে দেখিলাম, অজস্র কুল ধরিয়া আছে। কতদিন এখানে থাকিতে হইবে ঠিক নাই, খাদ্যের যত সন্ধান জানা থাকে ততই ভাল। অস্ত্র কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, খাদ্যের সন্ধান কিছু পাওয়া গেল, এইবার একটা আশ্রয় চাই। অর্থাৎ একটা বৃক্ষ নির্বাচন করিতে হইবে। সে যুগে গাছই আমাদের গৃহ ছিল, দুর্গ ছিল। গাছ আমাদের ফল দিত, ছায়া দিত। পাথরের মতো ইহারও মধ্যে তাই আমরা দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

গাছের অভাব ছিল না। প্রকাণ্ড একটা গাছ বাছিয়া ঠিক করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম বেশ মনোমত—শাখাপত্রবহুল। ওপরের দিকে কাণ্ডের ভিতর একটা গর্তও ছিল। পাথঁরের নুড়িগুলি তুলিয়া তুলিয়া সেখানে রাখিলাম। পাশাপাশি দুই-তিনটা ডাল বাহির হইয়াছে, আরও কয়েকটি ডাল ভাঙিয়া সেখানে সাজাইয়া দিলাম, বেশ একটা মাচার মতো হইল। গাছের মূল কাণ্ডে ঠেস দিয়া বেশ ঘুমানো যাইবে। আহার এবং নিদ্রার ব্যবস্থা হইল, এইবার একটি সঙ্গিনী চাই। সঙ্গিনী পাইলেই মনোমত একটা স্থান বাছিয়া নিজের গৃহস্থালি স্থাপন করিতে পারিব। ওই দূরে পাহাড়ের ওপারে নিশ্চয়ই অনেক অনধিকৃত স্থান পড়িয়া আছে। দূর পর্বতশ্রেণীর দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইকার মূর্তিটা মনশ্চক্ষে বারংবার মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল। ইকাকে কী উপায়ে পাওয়া যায় আকুল অন্তঃকরণে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলাম যে, নিছক বলপ্রয়োগ করিয়া কাজ হইবে না। জুজুম স্বেচ্ছায় আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। শুধু জুজুম কেন, কেহই করিবে না। সে যুগে এ জাতীয় কল্পনাও কেহ করিত না। আমার কল্পনাতেও তাহা আসে নাই। আমি কেবল ইকাকে সমস্ত অন্তর দিয়া কামনা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম কী উপায়ে তাহাকে পাওয়া যায়। পাইতেই হইবে। পাইবই...একটা অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট আত্মবিশ্বাস যেন অলক্ষিতে আমাকে আশ্বাস দিতেছিল। বলে আমি পারিব না, ছল অথবা কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ ছল এবং কী কৌশল? কখন কিরূপে কার্যকরী হইবে? কল্পনা করিতে না পারিলেও মনের অন্ধ প্রেরণা আমাকে উপদেশ দিল—কোনো না কোনো উপায় হইবেই একটা। আপাতত আত্মগোপন করিয়া ইকার গতিবিধি লক্ষ্য করাই প্রথম কর্তব্য, তাহাই ভাল করিয়া কর।

সূর্য অস্ত গিয়াছে, অন্ধকার নামিতে লাগিল। অন্ধকার কিন্তু গাঢ় হইল না। পূর্ব-দিগন্তে

পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল, চারিদিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। নিবিড় অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধতা নিশাচর পতঙ্গদের গুঞ্জনে মুখরিত হইয়া উঠিল। আমি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মাচার ওপর উপবেশন করিলাম। ঠেস দিয়া বসিয়া আরামে চক্ষু মুদিলাম। মুদিত নয়নের সম্মুখে ইকার মূর্তি ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত উপত্যকা অদ্ভুত নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চতুর্দিকে অশ্রান্ত ঝিল্লীরব। অরণ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে অসংখ্যা জোনাকি। মধ্যে মধ্যে শুষ্ক পত্রপল্লবের খড়-খড় শব্দ। সরীসৃপ শ্বাপদের দল বাহির হইয়াছে। মট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, শুষ্ক ডাল ভাঙার শব্দ। শব্দ শুনিয়া মনে হইল ডালটা নেহাত পাতলা নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে জন্তুর পদভরে ইহা ভাঙিল সে জন্তুটিও নিশ্চয় হালকা নয়। উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ কোনো শব্দ নাই। নিশ্চয় নিঃশব্দ সঞ্চরণে অগ্রসর হইতেছে। পরমুহূর্তেই গন্ধ পাইলাম এবং তাহার পরই সেই ভয়ানক পরিচিত ঘরর-ঘরর শব্দ। মুদিতনেত্রে রুদ্ধশ্বাসে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। আর একটু দূরে মট্ করিয়া আবার শব্দ হইল। বাঘটা দূরে চলিয়া গেল।

...কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিলাম মনে নাই, হঠাৎ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম যেন ইকা আমার হইয়াছে, যেন পিছন দিক হইতে আমার কাঁধের ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া সাগ্রহে আমার মাথার উকুন বাছিতেছে। একটা বাহু যেন আমার গলায় জড়ানো। নিটোল বাহুর নিবিড় বন্ধন...মনে হইল তাহা ক্রমশ নিবিড়তর হইতেছে...জোরে, জোরে, আরও জোরে চাপিয়া ধরিতেছে...শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল—ইকা এ কি করিতেছে? ঘুম ভাঙিয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে শিহরিয়া উপলব্ধি করিলাম ইকার বাহু নয়, একটা ময়াল সাপ আমার গলায় পাক লাগাইয়াছে। প্রবল শক্তিতে পাকটা একটু আলগা করিযা সাপের দেহের সেই অংশটুকু মুখের কাছে আনিয়া প্রাণপণে কামড়াইয়া ধরিলাম। আমার শাণিত শ্বাদন্ত কর্ কর্ তাহার মাংসে বসিয়া গেল। খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া তুলিয়া লইলাম। আবার কামড়াইলাম। এইবার অনুভব করিলাম গলার ফাঁস কিছুটা আলগা হইয়াছে, মাংসপেশী ক্রমশ শিথিল হইতেছে। চকিতে ফাঁসটা গলা হইতে খুলিয়া অন্য ডালে সরিযা গেলাম। তাহার পর একটা বড় পাথর বৃক্ষকোটর হইতে বাহির করিয়া সাপের মাথাটা খুঁজিতে লাগিলাম। সাপটা বুঝিয়াছিল যে, আততায়ী নিতান্ত নিরীহ প্রাণী নয়, মানুষ। পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, মাথাটা নিচে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আমি কিন্তু ছাড়িলাম না। সবলে তাহাকে টানিয়া তুলিযা বহুবার ব্যর্থ মনোরথ হইবার পর অবশেষে গাছের কাণ্ডের ওপর মাথাটা রাখিয়া প্রস্তরাঘাতে তাহা বিচূর্ণিত করিলাম। তাহার পর দূরের একটা মোটা ডালে সেটাকে জড়াইয়া রাখিয়া দিলাম। সকালে কাজে লাগিবে। আবার অপ্রত্যাশিতভাবে খানিকটা মাংস জুটিয়া গেল। সেযুগে এরূপ অপ্রত্যাশিত আহার প্রায় জুটিত। তখনই হয়তো আহারটা শেষ করিতাম কিন্তু ক্ষুধা ছিল না। আবার নিজের মাচাটির ওপর গিয়া কাণ্ডে ঠেস দিয়া বসিলাম। বিঘ্নিত নিদ্রাটা যেন পাশের ডালেই অপেক্ষা করিতেছিল, চক্ষু বুজিবামাত্র চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল।

...কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না, তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে, চতুর্দিকে আলো। আবার চিৎকার হইল—তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকার—মনে হইল বায়ুস্তর যেন চিরিয়া গেল। দেখি সাপটা ডালে নাই। ঝুঁকিয়া দেখিলাম একদল ময়ূর সেটাকে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া ছেঁড়াছেঁড়ি করিয়া খাইতেছে। সাপটা সম্পূর্ণ মরে নাই, তখনও তাহার দেহের পেশিতে পেশিতে কুঞ্চন-প্রসারণের তরঙ্গ উঠিতেছে। একদল ময়ূর তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুঘাতে তাহার সার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে, তবু মরে নাই। শুধু ময়ূর নয়, একদল

কাকও ঝাঁক বাঁধিয়া অদূরে বসিয়াছিল, কিন্তু ময়ূরের প্রতাপে কাছে ঘেঁষিতে পারিতেছিল না। অগ্রসর হইবার সামান্য চেষ্টা করিলেই তীক্ষ্ণ কেকাকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতেছিল। সেই প্রভাত-আলোকে সেই আরণ্য পটভূমিকায় সেই বিচিত্রপক্ষ হিংস্র ময়ূরগণের তেজোদৃপ্ত গ্রীবাভঙ্গি দেখিয়া একবারও মনে হইতেছিল না যে আর সকলের মতো বুভুক্ষার তাড়নায় ইহারা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে---কি যেন মনে হইতেছিল তাহাও বর্ণনা করিতে পারিব না। এইটুকু শুধু মনে আছে স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়াছিলাম। সহসা চোখে পড়িল পাশের একটা ঝোপে একটা শৃগালও মুখ বাড়াইয়া ধৈর্যভরে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে—সে-ও কাছে আসিতে সাহস করিতেছে না। মুহূর্ত মধ্যে কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল, নিজের সম্পত্তি রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। বৃক্ষকোটরে প্রস্তর সংগ্রহ করাই ছিল, শাখার অন্তরাল হইতে তাহাই ক্রমাগত ছুঁড়িতে লাগিলাম। ময়ূর, কাক, শৃগাল সকলকেই অবশেষে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভুক্তাবশিষ্ট সাপটাকে টানিয়া জঙ্গলের ভিতরে লইয়া গেলাম এবং আর কালবিলম্ব না করিয়া খাইতে শুরু করিয়া দিলাম। সাপটা খুব বড় ছিল না, দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। ময়ূরের দল অনেকটা মাংস খাইয়া ফেলিয়াছিল, আমার জন্য খুব বেশি অবশিষ্ট ছিল না। ক্ষুধা মিটিল না বরং আরও উগ্র হইয়া উঠিল। মনে পড়িল আগের দিন একটা মৌচাক দেখিয়াছিলাম, সেটাকে আত্মসাৎ করিলে মন্দ হয় না। প্রকাণ্ড একটা গাছের উঁচু ডালে মৌচাকটা আছে। ভাবিলাম প্রথমে দেখিয়া আসা যাক, তাহার পর শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিয়া পাথরে পাথরে ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইব, ধোঁয়া না দিলে মৌমাছিরা পালায় না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল ধোঁয়া করিলে তো জুজুম জানিতে পারিবে। কথাটা মনে হইবামাত্র আপাদমস্তক একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। জুজুম জানিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, আমাকে তাড়াইয়া তবে সে ছাড়িবে। ইকার মূর্তিটা আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিল, শিরা-উপশিরায় উন্মাদ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া যাহা বহিতে লাগিল তাহা নিশ্বাস নয়, আগুনের হলকা। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ বাহুযুগল আকাশের দিকে তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম --যাইব না, যেমন করিয়া পারি ইকাকে অধিকার করিব। সেই নির্জন বনে উত্তোলিত বাহু অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম বলিতে পারি না, একটা বন্যপাখির তীব্র চিৎকারে চমক ভাঙিল। আত্মস্থ হইলাম। ধীরে ধীরে আবার সেই মৌচাকটার ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। জিহ্বা লালায়িত হইল। বিপদ আছে জানিয়াও আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। বনের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটা দুর্নিবার ক্ষুধা যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। একটু পরে সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলাম। লোলুপ দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা হতাশাজনক। মানবদস্যুকে ফাঁকি দিয়া মৌমাছিরা মধু খাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। পড়িয়া আছে শুধু শূন্য চাকটা।... ক্ষুব্ধচিত্তে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সহসা এক ঝাঁক মৌমাছির ভন ভন শব্দ শুনিতে পাইলাম, ছুটিয়া একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলাম। বাল্যকালে একবার মৌমাছির কামড় খাইয়াছিলাম, সে নিদারুণ যন্ত্রণার কথা আজও ভুলি নাই। ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিলাম বটে, কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলাম না। মৌমাছিদের এই অতর্কিত আবির্ভাবের কারণ নির্ণয় না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। প্রতিটি জিনিসের কারণ নির্ণয় করিবার প্রবৃত্তি বোধ হয় বন্য-মানবকে সভ্য করিয়াছে। প্রতিটি জিনিসের কারণ নির্ণয় না করা পর্যন্ত আজও তাহার শান্তি নাই। ঐ

মৌচাকটার মৌমাছিগুলিই কি মধুপান করিয়া আনন্দে মাতিয়া বেড়াইতেছে, না এ আর একটা দল? এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কারণটা হঠাৎ চোখে পড়িল। কাছেই একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ, তাহার উচ্চডালে উঠিয়া একটা প্রকাণ্ড ভালুক আর একটা মৌচাক আক্রমণ করিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গে সহস্র মৌমাছি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু লোমশ ভালুকেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। নির্বিকারচিত্তে দস্যুটা লুণ্ঠন করিতেছে। ...স্থানটা নিরাপদ মনে হইল না। হামাগুড়ি দিয়া ঝোপ হইতে বাহিব হইয়া গেলাম। সেই জলাটার দিকেই গেলাম, কিছু খাদ্য সেখানে পাইবই। জলাশয়ের তীরবর্তী হইতে বেশ একটু সময় লাগিল, পথঘাট তখনও অপরিচিত। তা ছাড়া ঝোপের ভিতর গা-ঢাকা দিয়া চলিতে হইতেছিল, ফাঁকা জায়গায় বাহির হইবার সাহস ছিল না। জুজুম যদি দেখিয়া ফেলে! অসংখ্য বন্য-শত্রুরও অভাব নেই। অনাবৃত স্থানে আত্মপ্রকাশ করা নিরাপদ ছিল না সেকালে। মাঝে মাঝে হাঁসের ডাক শুনিতে পাইতেছিলাম, তাহাই অনুসরণ করিয়া অবশেষে জলার ধারে গিয়া পৌঁছিলাম। ঝোপের ভিতর হইতে সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম কাছে-পিঠে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। সেরকম কিছু চোখে পড়িল না, দেখিলাম অজস্র পদ্ম ফুটিয়া আছে, অসংখ্য হাঁস ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকটা শামুক সংগ্রহ করিয়া হাতের কাছে যে পদ্মগুলি ছিল তুলিয়া ফেলিলাম। পদ্মের ভিতবের চাকগুলি অতিশয় সুখাদ্য। মোটামুটি ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। জলাটার ধারে ধারেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছু কাছিমের ডিমও পাইয়া গেলাম একস্থানে। এক জায়গায় কিছু কন্দও চোখে পড়িল। কিন্তু তখন আর খাইবার প্রবৃত্তি ছিল না, স্থানটা চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম ভবিষ্যতের জন্য। তাহার পর পাথব সংগ্রহে মন দিলাম। নানা আকৃতির কয়েকটি পাথর কুড়াইবার পর মনে হইল শুধু পাথর সংগ্রহ করিলেই তো চলিবে না, ওগুলিকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পরিণত কবিতে হইবে, অর্থাৎ পাথর ঘষিবাব একটা স্থানও চাই। কয়েকটা তীক্ষ্ণ তীর যদি করিতে পারি তাহা হইলে আর ভাবনা কি। সম্মুখ-যুদ্ধে জুজুমকে আহ্বান করিবার সাহস যদি না-ও হয়, গাছের আড়াল হইতে তার শির লক্ষ্য করিয়া একটা তীর নিশ্চয়ই ছুঁড়িতে পারিব এবং তীরটা যদি ঠিক লক্ষ্যভেদ করে, জুজুমকে আব উঠিতে হইবে না। একবার পড়িয়া গেলে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িব, টুঁটি কামড়াইয়া ধরিব। উত্তেজনায় শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিল। সংগৃহীত পাথরগুলিকে একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া চর্তুদিকে চাহিয়া দেখিলাম...পাথর ঘষিবার স্থান একটা আবিষ্কার করিতেই হইবে। স্থানটা নিরাপদ এবং নির্জন হওয়া চাই, জুজুম যেন না জানিতে পারে। দূরে আকাশের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল, সহসা মনে হইল ওইখানেই আছে। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই পাইব। অবিলম্বে পর্বতশীর্ষ লক্ষ্য করিয়া গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। কখনও হাঁটিয়া কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও গাছে চড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাটিয়াছিল বলিতে পারি না, বিকট একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে সচকিত হইয়া উঠিলাম। শুধু চিৎকার নয়, সমস্ত বন যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমি মাটিতে ছিলাম, তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীরে রক্তস্রোত ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। একদল হাতি; পর্বতাকার একটা দাঁতাল হাতি মদমত্ত হইয়া জনৈকা হস্তিনীকে প্রণয় নিবেদন করিতেছে। তাই এই আলোড়ন। গাছের উচ্চডালে আরোহণ করিয়া দেখিলাম, বৃহৎ নাতি-বৃহৎ ক্ষুদ্র অনেকগুলি হাতি রহিয়াছে। অধিকাংশই হস্তিনী। কাছাকাছি থাকা নিরাপদ মনে হইল না। গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম, হাতির দলকে দক্ষিণে রাখিয়া অন্য পথে পুনরায় অগ্রসর হইলাম। যত শীঘ্র সম্ভব এ অঞ্চল

ত্যাগ করিতে হইবে। মত্ত-মাতঙ্গ বড় ভয়ানক জিনিস। হাতির দলের সহিত দূরত্ব রক্ষা করিতে গিয়া কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুবিধা হইয়া গেল। বনের যে অংশে আসিয়া পড়িলাম তাহা কম জটিল, একটা পথের আভাসও পাওয়া গেল। কেন জানি না, হস্তিযুথের প্রতি মনটা প্রসন্ন হইয়া উঠিল। উহাদের দর্শনের ফলেই যেন অরণ্যের জটিলতা কমিয়া গেল এই ধরনের একটা ধারণা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিল। দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলাম। অরণ্য শেষ হইয়া গেল, একটা প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম প্রান্তরের ঠিক ওপারেই পাহাড়ের শ্রেণী। বন হইতে বাহির হইয়াই প্রথমে অবশ্য যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা প্রান্তরও নয়, পাহাড়ও নয়, একদল শকুনি। আর একটু আগাইয়া দেখিলাম একটা মৃত জন্তুকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া খুশি হইলাম। কাছাকাছি তাহা হইলে কোনো মানুষ নাই, থাকিলে ওই মৃত জন্তুটা শকুনিদের ভোগে লাগিত না, মানুষই সেটাকে টানিয়া খাইত। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলাম, চারিদিকে অনেক পাথর পড়িয়া আছে। অবিলম্বে কয়েকটা পাথর তুলিয়া শকুনিদের তাড়া করিলাম। তাহারা একেবারে উড়িয়া গেল না, লাফাইয়া লাফাইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল মাত্র। কাছে গিয়া দেখিলাম একটা মৃত শৃগাল। শৃগালটাকে টানিয়া লইয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। শকুনির দলও লাফাইয়া কিছুদূর পর্যন্ত আমার অনুসরণ কবিবার চেষ্টা করিল, আমিও পাথর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া তাহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত তাহারা পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। আমি শৃগালটাকে টানিয়া লইয়া অবশেষে পর্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হস্তী-দর্শনের ফল সত্যই শুভ হইয়াছিল। কাছেই একটা ঝরনা দেখিতে পাইলাম। পাহাড় হইতে স্বচ্ছ জলের ধারা নামিয়া একটি ছোট নদী সৃষ্টি করিয়াছে। দুই তীরে অসংখ্য পাথরের নুড়ি। ইতস্তত নিরীক্ষণ করিবার পর পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম। ভয় হইল। গুহামাত্রেই তখন ভীতিপ্রদ ছিল। গুহার অন্তরালে সেযুগে স্বয়ং মৃত্যু লুকাইয়া থাকিত। সিংহ ব্যাঘ্র হায়েনা আরও কত কি। এই মৃত শৃগালটা হয়তো কোনো বাঘেরই মুখের গ্রাস। গুহাটাকে পশ্চাতে রাখিয়া নদীর ধারে ধারে যতদূর পারিলাম চলিয়া গেলাম। কিছুদূর যাইবার পর পাহাড়ের গায়ে তাকের মতো একটা স্থান হঠাৎ চোখে পড়িল। মাটি হইতে বেশ একটু উঁচুতে। উঠিয়া বসিতে পারিলে বেশ নিরাপদ স্থান। যখন পাহাড়ের গায়ে রহিয়াছে তখন নিশ্চয়ই প্রস্তরময়। পাথর ঘষিবারও সুবিধা হইবে। কী করিয়া ওঠা যায়। সহসা কোনো বুদ্ধি মাথায় আসিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে আহারে মন দিলাম, নদীতীরে বসিয়া শৃগালমাংস ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিলাম। স্থান বেশ নির্জন বলিয়া মনে হইল। অন্য কোনো মানুষের এলাকভুক্ত হয় নাই সম্ভবত। অন্তত তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না; ইকাকে যদি পাই এইখানেই আসিয়া থাকিব। ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের একটা ছবি অস্পষ্টরূপে মানসপটে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সে ছবিতে কোনো নতুনত্ব নাই, তাহা আমার পুরাতন জীবনেরই পুনরাবৃত্তি। যে দলপতি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, যে জুজুমের কবল হইতে ইকাকে অপহরণ করিতে চাই, ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেকে তাহাদেরই অনুরূপ কল্পনা করিয়া শৃগালের হাড় চুষিতে চুষিতে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

কোথায় বাসা বাঁধিব। পাহাড়ের ওপর? তাহার পূর্বে পাহাড়ের ওপরটা ঘুরিয়া দেখিতে হইবে নিরাপদ কি না। দূরে ওই গাছটা আছে...সহসা তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। একটা প্রেরণার বিদ্যুৎ মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, চেষ্টা করিয়া দেখিব বই কি;

এক লম্ফে নির্ঝরিণী পার হইয়া সেই গাছটার কাছে গিয়া হাজির হইলাম। মোটা একটা ডাল ভাঙা শক্ত কাজ, কিন্তু শক্ত বলিয়া নিরস্ত হইলে চলিবে না। এটা ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম, খুব জোরে ঝাঁকানি দিলাম, বিশেষ কিছু হইল না। তখন গাছের ওপর উঠিয়া পড়িলাম, একটা উঁচু ডাল দুই হাতে ধরিয়া পায়ে করিয়া সজোরে নিচের ডালে চাপ দিতে শুরু করিলাম। মড় মড় করিয়া ডালটা ভাঙিয়া পড়িল। ডালটা খুব বেশি মোটা নয়, কিন্তু আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট। ডালটা টানিয়া আনিয়া পাহাড়ের গায়ে লাগাইলাম—বাঃ, ঠিক তাক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গিয়াছে। ডাল বাহিয়া তাকে উঠিয়া বসিলাম। চমৎকার প্রশস্ত জায়গা, নিচে হইতে বুঝিতে পারি নাই যে এত প্রশস্ত হইবে। ডালের পত্র-পল্লব দিয়া বেশ একটু আড়ালও হইয়াছিল। নিচে নামিয়া গিয়া কয়েকটা পাথর কুড়াইয়া আনিয়া ঘষিতে শুরু করিয়া দিলাম। ভাল ভাল তীর কয়েকটা করিতেই হইবে। যেমন করিয়া হোক ইকাকে চাই।

দিন কাটিতে লাগিল। ঠিক কয়দিন কাটিল তাহার হিসাব রাখিবার তখন প্রয়োজনও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। কয়েকটি প্রভাত আসিল ও চলিয়া গেল। আহার সংগ্রহ করিতে প্রতিদিন খানিকটা সময় যাইত, তাহার পর পাথর ঘষিতাম। নিবিষ্টচিত্তে যে পাথর ঘষিতাম তাহাও নয়, পাথর ঘষিতে ঘষিতে মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়িতাম, অস্থির চিত্তে অথচ সাবধানে। চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম যদি হঠাৎ কোথাও একা ইকার সন্ধান পাইয়া যাই।

একদিন দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইলাম। একা ছিল না। জুজুম ছাড়া আর সকলেই তাহার আশেপাশে ছিল। বনের ধারে সকলে মিলিয়া শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিতেছিল। আমাকে তাহারা দেখিতে পাইল না, আমি লুকাইয়া ইকাকে দেখিতে লাগিলাম। একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করিলাম, ইকা মাথায় একটা লাল ফুল গুঁজিয়াছে। তাহার অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশপাশে সেই টকটকে লাল ফুলটা যেন নীরব ভাষায় আমাকে আশ্বাস দিল। অস্পষ্টভাবে যেন অনুভব করিলাম কঠিন প্রস্তরখণ্ডকে ধৈর্যভরে ঘষিয়া তীক্ষ্ণমুখ-তীরে পরিণত করাই যে ইকাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় তাহা নয়, ইকার মাথার ওই লাল ফুলটা নীরবে আর একটা পথের ইঙ্গিত দিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া অতৃপ্ত নয়নে দেখিতেছিলাম---হঠাৎ একটা গর্জন শোনা গেল—জুজুমের গর্জন—সকলে নিমেষমধ্যে বনান্তরালে অন্তর্ধান করিল।

আর একদিন ইকার দেখা পাইলাম; সেদিন সে কুল পাড়িতেছিল। সেদিনও একা ছিল না, কাছেই জুজুম পরিবারের সকলেই কুল কুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। ইকা লাঠি দিয়া গাছের ডালে ঝাঁকানি দিতেছিল, বাকি সকলে কুল কুড়াইতেছিল। আমি ঝোপের আড়াল হইতে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। সহসা একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমার কণ্ঠ দিয়া আমার অজ্ঞাতসারে একটা শব্দ নিঃসৃত হইল। নিরুদ্ধ আকুলতা সহসা শব্দায়িত হইয়া পড়িল যেন। ইকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, আমিও আমার মুণ্ডটা ঝোপের ভিতর টানিয়া লইতে ভুলিয়া গেলাম। ইকা আমাকে দেখিল, ক্ষণকালের জন্য ঘাড় ফিরাইয়া রহিল, তাহার পর আবার কুল-পাড়ায় মন দিল, যেন কিছুই হয় নাই। চিৎকার করিল না, পলাইয়াও গেল না। তাহার এই আচরণ আমার মনে যে অর্থ বহন করিয়া আনিল তাহাতে বিস্ময়ে আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই হয়তো আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া অসমসাহসিক কিছু একটা করিয়া ফেলিতাম, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে সচকিত হইয়া পাশের গাছটার ওপর উঠিয়া পড়িলাম। চিৎকারটা আহত জন্তুর। গাছের ওপর হইতে দেখিলাম একটু দূরে ফাঁকা মাঠে জুজুম একটা শূকরশাবককে পাথরে আছড়াইয়া মারিতেছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম---যাহা এতদিন করি নাই,

কাছে একটা ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। মাটিতে প্রকাণ্ড একটা গর্ত, সেই গর্তের ওপর ডালপালা সাজানো। শূকরশাবকটা ওই গর্তের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া সকলে জুজুমের নিকট ছুটিয়া গেল। ইকাও। রক্তাক্ত শূকর-শিশুটাকে ঘিরিয়া তাহাদের আনন্দ-কলরব জমিয়া উঠিল। আমি লুব্ধচিত্তে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে বসিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সেদিন আর সেই গাছ হইতে নামিলাম না। ভয়ের জন্য নয়, একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন আমাকে টানিয়া রাখিল, কিছুতেই নামিতে দিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারটা অজুহাত স্বরূপ হইয়া আমাকে সেই নানা অসুবিধাপূর্ণ গাছটার ওপরে বসাইয়া রাখিল। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু সেই জলাশয়ে গিয়া আর শামুক সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। একস্থানে খানিকটা কন্দ দেখিয়াছিলাম, তাহার সন্ধানে যাইতেও ইচ্ছা করিল না। সেই গাছের ডালেই আমি নানা অসুবিধা সহ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা মৃদু শব্দ হইল। পক্ষ বিধূননের শব্দ। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঠিক পাশের ডালেই একটা কোটর রহিয়াছে। কোটরে হাত ঢুকাইয়া দিতেই আঙুলে কি একটা কামড়াইয়া ধরিল। অসহ্য যন্ত্রণায় হাতটা বাহির করিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই পাখি উড়িয়া গেল। জনক-জননী উড়িয়া গেল, নিশ্চয়ই ডিম কিংবা ছানা আছে। পুনরায় হাত ঢুকাইলাম। গোটা দুই ছানা ছিল। সেই দুটিকে গলাধঃকরণ করিয়া কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। সমস্ত রাত ভাল ঘুম হইল না। ভোরের দিকে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। চোখ খুলিয়া দেখিলাম ভোর হইতেছে। পরমুহূর্তেই আনন্দে উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা কাঁপিয়া উঠিল। ভোরের আলো দেখিয়া নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই যেন মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে। ইকা আসিতেছে—একা! আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। সচকিত ইকা ছুটিয়া বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অন্তর্হিত হইবার পূর্বে কিন্তু একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া গেল। মনে হইল তাহার চকিত চোখের দৃষ্টিতে, বিকশিত দন্তরুচিতে, কম্পমান স্তনযুগলে সে যাহা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহা প্রত্যাখ্যান নয়, নিমন্ত্রণ। ঊর্ধ্বশ্বাসে অনুসরণ করিলাম, কিন্তু ধরিতে পারিলাম না। সে নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া ফাঁদটা পর্যবেক্ষণ করিলাম—ফাঁদে কিছু পড়ে নাই। মনে হইল ফাঁদটা দেখিবার জন্য ইকা বোধহয় আসিয়াছিল এবং রোজই সম্ভবত আসে। কিন্তু আজ যাহা ঘটিল তাহার পরও আসিবে কি? অনেকক্ষণ ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ইকা জুজুমকে ডাকিয়া আনিতে পারে, জুজুম নিজেই হয়তো আসিয়া পড়িতে পারে—এসব সম্ভাবনার কথা যে মনে হইতেছিল না তাহা নয়, কিন্তু কিছুতেই ওই স্থানটা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল জুজুম যদি আসে আসুক, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহার সহিত সম্মুখসমরে অগ্রসর হইব, কিন্তু এ স্থান ত্যাগ করিব না। একটা অদৃশ্য রজ্জু যেন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। একবার মনে হইল, ফিরিয়া যাই। পাহাড়ে একটা পাথর ঘষিয়া অনেকটা সুচালো করিয়া ফেলিয়াছি, আজ সমস্ত দিন ঘষিলে তাহা একটা উৎকৃষ্ট অস্ত্রে পরিণত করিতে পারিব। কিন্তু কিছুতেই ওই স্থানটি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। উহারই আশপাশে আনাচে-কানাচে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলাম। সেই কন্দটা খুঁড়িয়া খাইয়া ফেলিলাম, একটা সজারুর গর্ত হইতে একটা সজারুকে টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। একটা ঝোপে গোটা দুই পাখির ডিম পাওয়া গেল, জলাশয়ের ধারে গিয়া কয়েকটা শামুকও পাইলাম। ইকার কুলগাছটায় অনেক কুল ছিল। কুল পাড়িতে গিয়া হঠাৎ চোখে পড়িল বনের মধ্যে একটা গাছ অসংখ্য লাল ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে। ওই ফুলই

তো ইকা মাথায় পরিয়া ছিল; চকিতের মধ্যে একটা মতলব মাথায় খেলিয়া গেল। ডাঁসা ডাঁসা বড় বড় কুলসুদ্ধ একটা ছোট কুলের ডাল ভাঙিয়া লইলাম, তাহার পর সেই গাছটা হইতে ডালসুদ্ধ এক গোছা ফুলও পাড়িলাম। সন্ধ্যায় গাছে উঠিবার আগে সেই ডাল দুইটাকে একত্র বাঁধিয়া ইকার পথে রাখিয়া দিলাম। ইকা ওই পথ দিয়া আজ আসিয়াছিল, কালও আসিবে। দেখিতে আসিবে ফাঁদে শিকার পড়িয়াছে কি না। সে যখন জুজুমকে ডাকিয়া আনে নাই তখন নিশ্চয় আসিবে।

...সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে বসিয়া রহিলাম। কিছুতেই ঘুম আসিল না। রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অরণ্যের বিচিত্র শব্দে অন্ধকার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্বাপদ গর্জন করিল, ঝিল্লী ঝনৎকার তুলিল। সরীসৃপ সঞ্চরণের সর-সর, পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন অন্ধকারে শিহরন জাগাইল। আকাশে তারা উঠিল চাঁদ হাসিল। আমি নিস্পন্দ হইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। সহসা দেখিলাম অন্ধকার স্বচ্ছ হইতেছে। ঈষৎ আলোর রূপালি পটভূমিকায় নিকষ কৃষ্ণাঙ্গিনী, যৌবন-কঠিন ইকার মূর্তি অনিবার্য নিয়তির মতো যেন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

. আমি জানতাম ইকা আসিবে। ইকার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল ইকাও যেন জানে আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। অকম্পিত চরণে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর আসিয়া পথের ওপর কুল ও ফুলের গোছা দেখিতে পাইল। দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এদিক-ওদিক চাহিল একবার, তাহার পর হাসিয়া উঠিল। সভ্য তরুণীর মুচকি হাসি নয়। মনে হইল একটা ক্ষুধিত হায়েনা যেন ডাকিতেছে। পরমুহূর্তেই সে মাটিতে বসিয়া পড়িল। মাথায় ফুল গুঁজিয়া কুলে মনোনিবেশ করিল। সে যখন তন্ময় হইয়া কুল খাইতেছিল, তখন আমি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটবর্তী হইলাম। তাহার পর অতর্কিতে বিপরীত দিক হইতে আক্রমণ করিলাম, যাহাতে সে জুজুমের আস্তানার দিকে না যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া ছুট দিল, আমিও পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। কণ্টকে কঙ্করে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বনজঙ্গল ভেদ করিয়া উন্মত্তের মতো ছুটিতে লাগিলাম। জঙ্গল পার হইয়া সে জলাশয়ের তীরে আসিয়া পড়িলাম। ইকা ছুটিয়া গিয়া জলাশয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আমিও পড়িলাম। হাঁসের দল সচকিত হইয়া উড়িতে লাগিল, তাহাদের ডাকে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি প্রাণপণে সাঁতার কাটিয়া কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। নিদারুণ আর্তনাদ করিয়া ইকা হঠাৎ ডুবিয়া গেল। বুঝিলাম কুমির। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ডুব দিলাম এবং তীরবেগে ডুব সাঁতার কাটিয়া গিয়া কুমিরের পিঠের ওপর চড়িয়া বসিলাম। কুমিরকে কী করিয়া জব্দ করিতে হয় জানা ছিল। সজোরে তাহার দুই চোখে আমার তীক্ষ্ণ-নখসমন্বিত আঙুল দুইটা ঢুকিয়া দিলাম। কুমির তৎক্ষণাৎ ইকাকে ছাড়িয়া আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ধরিতে পারিল না। আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে সরিয়া গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখি, ইকা তীরে উঠিয়াছে। দ্রুতবেগে সাঁতার কাটিয়া আমিও তীরে উঠিয়া পড়িলাম। আমাকে দেখিয়া ইকা আবার ছুটিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কুমির তাহার ডান পা-টা চিবাইয়া দিয়াছিল। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহার ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তাহার রক্তাক্ত চরণের যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম না, উন্মত্ত আগ্রহে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলাম। ইকার আমার বাহুমূলে কামড়াইয়া ধরিল, তীক্ষ্ণ নখরে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, কিন্তু

কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না।

ইকা চলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে কাঁধের ওপর তুলিয়া লইয়াছিলাম। তাহার পদনিঃসৃত রক্তধারায় আমার সর্বাঙ্গ রঞ্জিত, তাহার দন্ত ও নখরাঘাতে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কাঁধের ওপর বসিয়াও রাক্ষসীটা প্রাণপণে আমার মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছিল। আমি দুই হাত দিয়া তাহার মাংসল উরুযুগল প্রাণপণে কাঁধের ওপর চাপিয়া ধরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছিলাম। সেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।

পাহাড়ে পৌঁছিয়া এক ঝটকায় কাঁধ হইতে তাহাকে ভূপাতিত করিলাম। উঃ, মাথার চুলগুলো বোধ হয় উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। কাছেই একটা গাছ ছিল, তাহার একটা ডাল ভাঙিলাম। আপাদমস্তক না চাবকাইলে পোষ মানিবে না। ডাল হাতে করিয়া ফিরিয়া দেখি ইকা হাসিতেছে। অপরূপ মোহিনী মূর্তি। ডালটা ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিলাম। আমার গৃহস্থালি স্থাপিত হইল।

দুই

তাহার পর কত কাল কাটিয়া গিয়াছে। আমি কিন্তু মরি নাই। কত ইকা আসিল এবং চলিয়া গেল, কত সন্তান জন্মিল মরিল, কত বন্য-জন্তু, আরণ্য বৃক্ষলতা, পর্বত-নির্ঝরিণী জীবনের পটভূমিকায় কখনও আনন্দ, কখনও বিস্ময়, কখনও আশঙ্কার ছবি আঁকিয়া বিলীন হইয়া গেল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, পাশবিক উল্লাস, দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় ফুল ফল লতা-পাতা কন্দ-কাণ্ড-মূল, কীট-সরীসৃপ-পশু-পক্ষীর নিরবচ্ছিন্ন সন্ধান, নারীমাংসকে কেন্দ্র করিয়া সদাজাগ্রত হিংস্র আকাঙ্ক্ষা—এই সমস্তর ওপর দিয়া কালের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। স্তরের ওপর স্তর পড়িয়াছে, ধীরে ধীরে পরিবর্তনের বীজ উপ্ত হইয়াছে, যুগের পর যুগান্তর আসিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

প্রথমটা তত গ্রাহ্য করি নাই, কিন্তু শেষে একদিন করিতেই হইল। সহসা একদিন উপলব্ধি করিলাম খুব বেশি শীত করিতেছে। নিদারুণ শীত। বর্ষাকালে নদীর জল ক্রমশ যেমন বাড়ে শীতটাও উত্তরোত্তর তেমনি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। পশুচর্মে আর যেন শীত ভাঙে না, পূর্বে একটা পশুচর্ম হইলেই যথেষ্ট হইত। পশুচর্মও বেশি নাই। কিছুদিন হইতে বনে বৃহদাকার পশুরও অভাব ঘটিয়াছে। বহুকাল বড় পশু শিকার করি নাই। হায়েনার ডাকও আজকাল তেমন শোনা যায় না। বন্য মহিষও দেখিতে পাই নাই। সুতরাং পশুচর্ম বেশি নাই। যে কয়খানা ছিল সেগুলি আমি আর আমার সঙ্গিনীরা দখল করিয়াছি, শিশুগুলা শীতে কাঁপিতেছে। কয়েকটা শিশু তাহাদের মায়ের কোল ঘেঁষিয়া বসিয়াছে, তবু কাঁপিতেছে। নিদারুণ শীত। আগুন জ্বালাইয়াছি, আগুনের চতুর্দিকে সকলেই বসিয়া আছি। তবু কিন্তু শরীর গরম হইতেছে না। তাহা ছাড়া আর একটা জিনিসও ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছি। আগুনের ইন্ধন ফুরাইয়াছে। নিকটেই যে কাঠের বোঝা ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গত কয়েক দিন আগুনের নিকট হইতে কেহ ওঠে নাই, উঠিতে পারে নাই। অরণ্যের একধারে গাছের ডালপালা দিয়া ঘিরিয়া নিজেদের যে আশ্রয়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, নিদারুণ শীতে যদিও তাহা অকিঞ্চিৎকর তবু তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ কোথাও যাইতে চাহিতেছি না। অগ্নিকুণ্ডটাকে ঘিরিয়া সকলে নিঝুম হইয়া বসিয়া আছি। শীতে মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গে শিহরন জাগিতেছে, যে অরণ্যের

আড়ালে আশ্রয় লইয়া এতকাল কাটাইয়াছি, যে অরণ্যের ভিতর শীত-তীক্ষ্ণ বায়ু গর্জন করিয়া ফিরিতেছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া শুনিতেছি। কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। তখনও মাটির নিচে বা গুহার অন্তরালে বাস করিবার কল্পনাও আমাদের মনে জাগে নাই। গাছের ডালপালা লতা দিয়া বড় বড় দুই-তিনটা আগড়ের মতো বানাইয়া তাহারই সাহায্যে কুটির প্রস্তুত করিয়া বাস করিতাম। ঝড়ে বৃষ্টিতে কখনও কখনও তাহা ভাঙিয়া পড়িত, আবার প্রস্তুত করিয়া লইতাম। এমন শীতেব অভিজ্ঞতা পূর্বে আর কখনও হয় নাই।

সমস্ত কাঠ একদিন নিঃশেষ হইয়া গেল। বনের ভিতর শীতের তীক্ষ্ণ হাওয়া তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, দূর প্রান্তরে শুষ্ক পাতার রাশি বায়ুবেগে উড়িয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছে শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উহারা যেন পলায়ন করিতেছে। ওই পলাতক পাতাগুলাকে কুড়াইয়া আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে সমর্পণ করিলে খানিকক্ষণ আরাম পাইতাম। শুষ্ক পাতা কুড়াইয়া আনিয়াই এতকাল আগুন জ্বালাইয়াছি, পাতার রাশি গাছের তলায় স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকিত, এখন সব ছুটিয়া চলিয়াছে। ছুটিয়া উহাদের ধরিতে পারিব কি? কয়েক দিন ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই, খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাহিরেই যাইতে পারি নাই। দুর্বল বোধ করিতেছিলাম, শীতে কাঁপিতেছিলাম, তবু উঠিয়া পড়িতে হইল। যেমন করিয়া হোক কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেই হইবে।

বাহিরে আসিয়া আশেপাশে চাহিয়া দেখিলাম অরণ্যও ভয়াকুল। সমস্ত পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, শুষ্ক শীর্ণ শাখা-প্রশাখা শীতের প্রখর বাতাসে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমিও কাঁপিতে লাগিলাম। বায়ুবেগে হঠাৎ আমার গাত্রাবরণ শুষ্ক চর্মখানা উড়িয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া সেটাকে কুড়াইয়া আনিয়া নগ্নদেহকে আবৃত করিলাম। ওই শুষ্ক চর্মই তখন আমাদের একমাত্র দেহাবরণ ছিল। ছুটিয়া শরীরে উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। শুষ্ক চর্মটাকে এক হাতে বুকের ওপর চাপিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহে মন দিলাম। আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য। একটু আগাইয়া বুঝিলাম শুষ্ক ডালপালার অভাব নাই, সমস্ত বনই শুকাইয়া আসিতেছে, শীতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনাই কষ্টসাধ্য। কিছু দূর গিয়াই দেখিলাম একটা ছোট গাছ মরিয়া গিয়াছে। তাহার ডালপালাগুলি তাড়াতাড়ি ভাঙিয়া যতটা পারলাম বহিয়া আনিলাম। আমার সঙ্গিনীরাও বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহারাও দেখিলাম কিছু কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একজন একটা মৃত জন্তুর কঙ্কাল টানিয়া আনিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। পশুকঙ্কাল অতি চমৎকার ইন্ধন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম দুইটি শিশু মরিয়া গিয়াছে। কুঁকড়াইয়া একধারে পড়িয়া আছে, নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। অগ্নিকুণ্ডও নির্বাপিত প্রায়। শীত আরও যেন তীব্র হইয়া উঠিতেছে। তাড়াতাড়ি সকলে মিলিয়া ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া ফেলিলাম, তাড়াতাড়ি সকলে মিলিয়া অগ্নিস্তূপের নিকট ঘেঁষিয়া বসিলাম। মৃত শিশু দুইটাকেও আগুনের মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া হইল। তখন আমরা কোনো কিছুই নষ্ট হইতে দিতাম না। শোক? নিজের সুবিধার জন্য মাথার চুল কিংবা হাতের নখ কাটিয়া ফেলিয়া তোমরা কি শোক কর? আজও যেমন সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মাপকাঠি দিয়াই শোকের বিচার হয় তখনও তাহাই হইত। একটা ক্ষুদ্র শিশু অপেক্ষা একটা পাথরের অস্ত্র আমাদের নিকট বেশি প্রিয় ছিল। একটা পাথরের অস্ত্র হারাইয়া গেলে আমরা শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়িতাম। তা ছাড়া শিশু তখন আনন্দজনক ছিল না, খাদ্যের এবং রমণীর অংশীদাররূপে বিরক্তিই উৎপাদন করিত।

...শীত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অরণ্যের পত্র-পল্লব শুকাইয়া আসিল। ইন্ধনের অভাব

হইল না, হু-হু করিয়া আগুন জ্বালাইয়া তাহার মধ্যে আমরা বসিয়া রহিলাম। কিন্তু পেটেও অগ্নি জ্বলিতেছিল। সে অগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশ। যে অরণ্য আমাদের খাদ্য সরবরাহ করিত তাহা মরিয়া যাইতেছিল। একটা প্রাণহীন অরণ্য-কারাগারে আমরা ধীরে ধীরে যেন বন্দী হইয়া পড়িতেছিলাম। বনের পশুপক্ষীরও আর সাড়া পাওয়া যায় না। তীক্ষ্ণ তীব্র শীতের বাতাস একটা হিংস্র পশুর মতো মৃতপ্রায় অরণ্যভূমিতে গর্জন করিয়া ফিরিতেছে শুধু, আর কিছু নাই। পাখির ডাক নাই, পতঙ্গের গুঞ্জন নাই, শ্বাপদের সঞ্চরণ শব্দ নাই। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হিমশীতল কবলে সমস্ত চরাচর যেন নির্জীব হইয়া আসিতেছিল।

...একে একে সমস্ত শিশুগুলি গেল। কয়েকটি আপনিই মরল, কয়েকটিকে মারিয়া ফেলিতে হইল। পলায়নক্ষম কিশোর-কিশোরীরা বিপদ আসন্ন বুঝিয়া একে একে অন্তর্ধান করিল।

...আহারের চেষ্টায় একদিন বাহির হইয়া দেখি, জলাশয় সমস্ত সাদা। সব জমিয়া গিয়াছে। তাহার পূর্বে তুষার কখনও দেখি নাই, আতঙ্কিত বিস্ময়ে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ বিপরীত দিকে ফিরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইল। একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া লক্ষ্য করিলাম আশেপাশে পেঁজা তুলার মতো কী যেন ছড়ানো রহিয়াছে। সাহস সঞ্চয় করিয়া হাত দিলাম। হাত দিয়াই চমকাইয়া উঠিতে হইল, মনে হইল হাতে যেন কামড়াইয়া দিল। মনে হইল জিনিসটা যেন জীবন্ত। জীবন্ত অথচ শীতল, চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। হঠাৎ নজরে পড়িল আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। একটা অজানা আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া আবার উঠিয়া ছুটিতে শুরু করিলাম। খানিকক্ষণ ছুটিয়া আবার বসিয়া পড়িতে হইল। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। উপর্যুপরি দুই দিন কিছু খাই নাই। ক্ষুধায় পেটের নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছে। খাদ্যের কোনো আশা নাই। অরণ্যের শ্যামশোভা অবলুপ্ত হইয়াছে, জীবনের কোনো লক্ষণ কোথাও নাই। একটা শ্বেত বিভীষিকা প্রেতের মতো সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। ছুটিয়া শরীরে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিছুক্ষণ বসিবার পর শীত করিতে লাগিল। আবার উঠিলাম। সহসা মনে হইল আগুনটা যদি নিবিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে শীতেই মরিতে হইবে। দ্রুতপদে আস্তানার দিকে ফিরিতে লাগিলাম। প্রখর বাতাসটা হঠাৎ থামিয়া গেল। পেঁজা তুলোর মতো তুষার চতুর্দিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, বিরাম নাই। চারিদিক কেমন যেন আবছা হইয়া আসিয়াছে। কিছুদুর আসিয়া চোখে পড়িল একটা গাছের মোটা ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেটাকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। আগুন জ্বালাইতে হইবে। আস্তানায় ফিরিয়া দেখিলাম একজন ছাড়া আর সকলেই পলাইয়াছে। তিনটি নারী শেষ পর্যন্ত ছিল, এখন ফিরিয়া দেখিলাম দুইজন চলিয়া গিয়াছে, একজন আছে। যে আছে, সে যে আমার প্রতি মায়াবশত আছে তাহা নয়। তাহার যাইবার সার্মথ্য নাই। চোখে দেখিতে পায় না। একটা বন-বিড়াল একবার উহার মুখের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই নখরাঘাতে চক্ষু দুইটি গিয়াছে। মুখময় কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন।

.আগুনটা প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল, অনেক কষ্টে পুনরায় তাহা জ্বালাইয়া তুলিলাম। পত্রপল্লববহুল মোটা ডালটা অবশেষে ধরিয়া উঠিল। শীত কমিল, কিন্তু ক্ষুধা বাড়িল। চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিয়া আসিলাম, খাদ্যের কোনো সম্ভাবনা কোথাও নাই। এ অরণ্য মরিয়া গিয়াছে, এখানে থাকিলে আমারও মৃত্যু অনিবার্য—এই চিন্তা আমাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। ফাঁদে পতিত মৃত্যুভীত পশুর ন্যায় আমি সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মনে হইল এখন কেবল একটিমাত্র উপায় আছে। অন্ধ সঙ্গিনীর দিকে

চাহিয়া দেখিলাম। থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। এতদিন উহার দেহটা নানাভাবে ভোগ করিয়াছি, এইবার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিব। পাথরের মুগুরটা তুলিয়া সজোরে মাথার ওপর মারিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আক্ষিপ্ত দেহের অসহায় বিক্ষোভ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। একটু পরে সব শান্ত হইয়া গেল। তাহার পর সেই রক্তাক্ত মৃতদেহটা জ্বলন্ত শাখার ওপর রাখিয়া সেটা টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যেমন করিয়া হোক আমাকে বাঁচিতেই হইবে।

...দ্রুতপদে চলিতেছিলাম। একটা হিমশীতল কুয়াশায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই, পথও দেখিতে পাইতেছিলাম না। একটা ঝড়ের মতো বহিতেছিল। সেই ঝড়ে অসংখ্য তুষারকণা ছুটিয়া আসিয়া সুচের মতো সর্বাঙ্গে বিঁধিতেছিল। আমি চোখ বুজিয়া অন্ধের মতো ছুটিতেছিলাম, কোন্ দিকে যাইতেছিলাম জ্ঞান ছিল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম কেবল। জ্বলন্ত শাখটা কিন্তু ছাড়ি নাই। দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম সেটাকে। উহাতে অগ্নি আছে, ওটা ছাড়িলে যে চলিবে না এ জ্ঞানটুকু ছিল। ছুটিতে ছুটিতে যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম খেয়াল ছিল না, হঠাৎ পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, হুড়মুড় করিয়া একটা বিরাট গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। গর্তের মধ্যে পড়িয়া একটু যেন আরাম অনুভব করিলাম, আর যাই হোক তীক্ষ্ণ বাতাসের দংশন হইতে বাঁচিয়াছি। ভিতরে বাহিরের মতো অত ঠাণ্ডাও নয়। চোখ খুলিয়া দেখিলাম বেশ প্রশস্ত বড় গর্ত। গাছের পাতলা ডাল দিয়া গর্তটা ঢাকা ছিল। তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত গাছের ডাল এবং আমার সঙ্গিনীর মৃতদেহটা গর্তের মধ্যে টানিয়া লইলাম। আগুন প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল, প্রাণপণে ফুঁ দিয়া তাহা আবার জ্বালাইয়া তুলিলাম। হঠাৎ খড়খড় করিয়া একটা শব্দ হইল, ঘাড় ফিরাইয়া দেখি গর্তের এক প্রান্তে কি একটা যেন জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। আগাইয়া গিয়া দেখিলাম একটি হরিণশাবক! বুঝিলাম এটা তাহা হইলে ফাঁদ একটা। আরও খানিকটা খাদ্য হাতের কাছে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, যে লোকটা ফাঁদ পাতিয়াছে সে কাছে-পিঠে কোথাও নাই তো! একটু পরে আসিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবে না তো! মনে হইল আমার পাথরের অস্ত্রগুলো তো আনি নাই। আত্মরক্ষা করিব কী করিয়া? অস্ত্রগুলা আনিতে হইবে। হরিণটাকে এখন মারিব না, ওটা থাক, পরে কাজে লাগিবে। নিমেষের মধ্যে এই সব চিন্তা মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে যাহা অনুভব করিতেছিলাম তাহা ক্ষুধা। ভীষণ ক্ষুধা। আগুনে ঝলসাইয়া সঙ্গিনীর মৃতদেহের খানিকটা খাইয়া ফেলিলাম। ভারি তৃপ্তি হইল। শ্রান্ত দেহে যেন খানিকটা শক্তি ফিরিয়া পাইলাম। প্রাণে আশাও সঞ্চারিত হইল। আগুনে গর্তটা বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। শীতের প্রকোপ হইতে বাঁচিবার মতো একটা আশ্রয় যখন জুটিয়াছে, তখন বোধহয় বাঁচিয়া গেলাম। এইবার আমার অস্ত্রশস্ত্রগুলি এবং গায়ে দিবার চামড়া কয়খানা আনা দরকার।

আবার গর্ত হইতে বাহির হইলাম। আবার সেই হিমশীতল বাতাসের সম্মুখীন হইতে হইল। আর একটা মুশকিলেও পড়িলাম। কোন্ দিকে যাইব? দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, আমার পুরাতন আস্তানা যে কোন্ দিকে তাহা কী করিয়া ঠিক করিব? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কেবল সাদা আর সাদা। বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিবারও উপায় ছিল না। শীতে সমস্ত শরীর জমিয়া আসিতেছিল। অসহায়ভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা কালো জিনিস চোখে পড়িল, ছুটিয়া সেই দিকে গেলাম। দেখিলাম যে পোড়া ডালটা

টানিয়া টানিয়া আনিয়াছিলাম তাহারই একটা অংশ। আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ওই যে দূরে আর একটা কালো—কিছুদূরে আর একটা। বুঝিলাম অজ্ঞাতসারে নিজেই পথ চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছি। চিহ্ন অনুসরণ করিয়া ছুটিতে লাগিলাম, অনেকক্ষণ ছুটিবার পর পুরাতন আস্তানায় গিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম সব ঠিক আছে। কোথাও জন-প্রাণী কেহ নাই। আমার আশেপাশে বিশেষ কেহ ছিলও না। তখনও গ্রাম বা সমাজ গড়িয়া ওঠে নাই। বিচ্ছিন্ন এক একটি পরিবার দূরে দূরেই থাকিত। সেই নির্জন অরণ্যে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। সমস্ত বন যেন হাহাকার করিতেছে। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। ডালপালা সমেত একটা ছোট গাছ কাটিযা তাড়াতাড়ি চামড়া কয়খানা তাহার ওপর সাজাইয়া দিলাম। চামড়ার ওপর পাথরের অস্ত্রগুলি রাখিয়া ডালটাকে টানিয়া টানিয়া আবার সেই গর্তের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিলাম। গতি কিন্তু ক্রমশ মন্থর হইয়া পড়িল। যদিও আমার পায়ে একখানা চামড়া জড়ানো ছিল, তবু শীতে কাবু হইয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া মনে হইল আর চলিতে পারিতেছি না, পা দুইটা অসাড় হইয়া জমিয়া যাইতেছে। তখন সেই চামড়া আর পাথরগুলাকে ফেলিয়া রাখিয়া কিছুদূর ছুটিয়া আসিলাম, তাহাতে শরীর যেন একটু গরম হইল। আবার ফিরিয়া আসিয়া সেগুলাকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। চোখ বুজিয়া চলিতেছিলাম, চোখ খুলিয়া রাখিবার উপায় ছিল না। চলিতে চলিতে যেই মনে হইতেছিল শরীর জমিয়া আসিতেছে, অমনি খানিকটা ছুটিয়া আসিতেছিলাম। এইভাবে টানিতে টানিতে কতক্ষণ চলিয়াছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ এক জায়গায় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার মতো হইলাম। চোখ খুলিয়া দেখিলাম একটি মেয়েমানুষ চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। অসাড় নিস্পন্দ বলিয়া মনে হইল। পরিপুষ্ট পীবর স্তনযুগল তুষারাচ্ছাদিত, মুখে চুলে আঁখিপল্লবে তুষারকণা জমিয়া আছে। চোখে পড়িল পাশে একটা সদ্যোজাত শিশুও রহিয়াছে। দুই জনকেই টানিয়া চামড়ার ওপর তুলিলাম। মাংসের সংস্থান যত থাকে ততই ভাল। কাচিন তখন যদি আমার মনের কথা টের পাইত, তাহা হইলে তাহার অসাড় শরীরেও সাড়া জাগিত বোধ হয়। চলচ্ছক্তিহীন দেহটাকে কোনোক্রমে টানিয়া তুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পাথরের স্তূপের ওপব উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। হিমতীক্ষ্ণ বাতাসের বেগ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল, চতুর্দিক বরফে ঢাকা, চোখ খুলিলেই চোখে তুষারকণা ঢুকিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, তবু আমি বিস্ফারিত নয়নে ক্ষণকাল কাচিনের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রীর দিকে চাহিয়া রহিলাম, তুষারচর্চিত হইয়া তাহা যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। পরমুহূর্তেই চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিতে হইল, বাতাসের বেগটা সহসা বাড়িয়া উঠিল, চোখ বুজিয়া আবার টানিতে শুরু করিলাম। বোঝা বেশ ভারি হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যত ভারীই হউক, গর্তে গিয়া পৌঁছিবই। যেমন করিয়া হোক বাঁচিতেই হইবে। আমি মরিয়া যাইব?

ইহা যে কল্পনা করিতে পারি না। দন্তে দন্ত চাপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাতাসও যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল, তুষারের একটা ঘূর্ণাবর্ত আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্য শুরু করিল। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল আর পারিতেছি না, এইবার শুইয়া পড়ি, আমারও তুষার-সমাধি হইয়া যাক। কিন্তু তখনই অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—না, তাহা অসম্ভব, তোমাকে বাঁচিতেই হইবে। চল, আর বেশি দূর নাই। চলিতে লাগিলাম। বাতাসেব বেগটা আরও বাড়িল, মনে হইল ঝড় উঠিয়াছে, বালিব মতো তুষারকণা উড়িতেছে...আমি চলিয়াছি। সমস্ত শরীব অসাড় পা বরফে পুঁতিয়া যাইতেছে, পিছনের বোঝাটা ক্রমশ ভারী

হইয়া উঠিয়াছে...তবু চলিয়াছি। মাঝে মাঝে কেবল চাহিয়া দেখিতেছি পথের চিহ্নগুলা ঠিক আছে কি না। যদিও কিছু কিছু বরফে ঢাকিয়া গিয়াছিল তবু একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, অর্ধদগ্ধ কালো শাখার টুকরাগুলা বরফে পুঁতিয়া গিয়া সুবিধাই হইয়াছিল, তাহা না হইলে বোধ হয় বাতাসে উড়িয়া যাইত। কালো অঙুলি তুলিয়া তাহারা আমাকে পথনির্দেশ করিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণকে এতকাল ভয় করিয়া আসিয়াছি। যে মেঘ বজ্র হানে তাহা কালো, যে রাত্রি ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সরীসৃপকে লুকাইয়া রাখে তাহা কালো, বক্রদন্ত যে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এতকাল জীবন ধারণ করিয়াছি তাহার দেহেও কালো রং, সেদিন কিন্তু শ্বেত বিভীষিকার মধ্যে ওই কালোকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহারই নির্দেশে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে চলিতেছিলাম। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ ঠিক জানি না, চোখ খুলিয়া দেখি কালো চিহ্ন আর দেখা যাইতেছে না, চারিদিকে শুধু সাদা আর সাদা। সব ঢাকিয়া গেল নাকি! বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। পথ হারাইয়া গেলে মৃত্যু অনিবার্য। আর একবার চাহিয়া দেখিতে গেলাম, চাহিতে পারিলাম না, অসংখ্য তুষারকণা আসিয়া দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। সোজা মাথা তুলিয়া চাহিবার উপায় নাই। তখন জানু পাতিয়া বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া চোখ চাহিবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম চাওয়া যায় কিন্তু বেশি দূর দেখা যায় না। তখন হামাগুড়ি দিয়া খুঁজিতে লাগিলাম কয়লার টুকরা কোথাও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে কি না। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। হামাগুড়ি দিয়া ব্যাকুলভাবে চতুর্দিকে হাতড়াইতে লাগিলাম, হামাগুড়ি দিয়াই অগ্রসর হইলাম কিছুদূর। মনে হইতেছিল আর উপায় নাই, এইবার সব শেষ। কিন্তু মনে হইবা মাত্র অমন অসহায় অবস্থাতেও অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন সাহস দিতেছিল, কে যেন ক্রমাগত বলিতেছিল---না, না, শেষ নয়, শেষ হইতে পারে না, দেখ, খোঁজ, চেষ্টা কর উপায় একটা মিলিবেই। পরমুহূর্তেই চোখে পড়িল কাছে একটা ফাটল হইতে সরু রেখায় ধোঁয়া বাহির হইতেছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া সেখানে গেলাম। এই তো সেই গর্তের মুখ, বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। ফাটলের নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই পাতলা বরফের আচ্ছাদন আমার দেহের ভারে ভাঙিয়া গেল, আমি আবার সেই গর্তের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। গর্তে পড়িয়াই আবার আরাম অনুভব করিলাম। ভিতরে আগুন জ্বলিতেছিল। আর বাহির হইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু বাহিরে যাহা রাখিয়া আসিয়াছিলাম তাহার প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়। নিতান্তই প্রয়োজনীয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই আবার বাহির হইতে হইল। ছুটিয়া গিয়া সব গর্তের মুখের নিকট টানিয়া আনিলাম। কাচিন তখনও অজ্ঞান অচৈতন্য। তাহাকেই প্রথমে গর্তের ভিতর নামাইয়া দিলাম, তাহার পর আমর পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং চামড়া কয়খানা। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম সেই সদ্যোজাত শিশুটা নাই, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে হয়তো। এই দুর্দিনে অতখানি ভাল মাংস হাতছাড়া হইয়া যাওয়াতে ক্ষুব্ধ হইলাম, সামর্থ্য থাকিলে তখনই হয়তো তাহার সন্ধানে আবার বাহির হইয়া পড়িতাম, কিন্তু আর সামর্থ্য ছিল না। সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিয়াছিল। চোখ দিয়া ক্রমাগত জল পড়িতেছিল। কান দুইটা জ্বালা করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি আসিয়া আগুনের কাছে বসিলাম, আবার অন্ধ সঙ্গিনীর ভুক্তাবশিষ্ট দেহের খানিকটা একেবারে পুড়িয়া গিয়াছিল, বাকি অংশটুকু টানিয়া লইয়া আবার আহার শুরু করিয়া দিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম গর্তের এক কোণে দেওয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া হরিণ শাবকটা চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহার দিকে চাহিতেই সে চোখ খুলিয়া চাহিল, যেন নীরব ভাষায় তাহার কানে কানে কেহ কী বলিয়া গেল, চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। সেদিক

হইতে চোখ ফিরাইয়া কাচিনের দিকে চাহিলাম, তখনও অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। বাহিরের বাতাসের বেগটা বাড়িল বলিয়া মনে হইল। মনে হইল যেন একটা অশান্ত অদৃশ্য দানব তীক্ষ্ণকণ্ঠে তর্জন করিতেছে। গর্তের ভিতর দিয়া খানিকটা শীতল বাতাস এবং বরফ ঢুকিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ইতিপূর্বে আরও ঢুকিয়াছে। গর্তের ঠিক নিচের অংশ আর্দ্র। হয়তো তুষারাচ্ছন্নই ছিল, আগুনের তাপে বরফ গলিয়া গিয়াছে। ভয় হইল। গর্তের ভিতরটাও যদি ক্রমশ বরফে ভরিয়া যায়! তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা চামড়া দিয়া গর্তের মুখটা ঢাকিয়া দিলাম। বেশ ভালভাবে ঢাকিয়া দিলাম। বাহিরের আলো যেটুকু আসিতেছিল তাহার পথ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু অন্ধকার হইল না। আগুন ছিল। আগুন যে কেবল উত্তাপ দেয় না, আলোও দেয়, এ সত্য যদিও বহুকাল পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলাম তবু তাহা পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হইলাম। জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপের রক্তিম আলোকে অন্ধকার গহ্বরটা অপরূপ হইয়া উঠিল। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। প্রদীপ্ত অঙ্গারস্তূপের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। অনুভব করিলাম, ঠিক কি যে অনুভব করিলাম তাহা ভাষায় বলিতে পারিব না, আতঙ্ক বিস্ময় কৃতজ্ঞতা ভক্তি এবং এসব ছাড়াও অবর্ণনীয় আর একটা কি যেন সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিল, যন্ত্রচালিতবৎ জানু পাতিয়া প্রত্যক্ষ অগ্নি-দেবতাকে প্রণাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু ধোঁয়ায় সমস্ত গর্তটা ভরিয়া উঠিল, শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল, দেখিলাম অগ্নির দীপ্তিও ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাড়াতাড়ি গর্তের মুখ হইতে চামড়াটা সরাইয়া দিলাম। ধোঁয়া বাহির হইয়া গেল, গর্তের বাতাস অনেকটা স্বচ্ছ হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল বাহিরের দানবটা। এক ঝলক হিমশীতল বাতাস আবার গর্তের মুখ দিয়া প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বরফ। অদ্ভুতভাবে যেন অনুভব করিতে লাগিলাম, বাহিরের ওই শ্বেত দানবটা অসীম শক্তিশালী শত্রু, কোথা হইতে আসিয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়াছে, আমাকেও গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ইহাই তাহার লক্ষ্য। উহার নির্মম কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য। ভাবিতে লাগিলাম, গর্তের মুখটা কি করিয়া বন্ধ করা যায়! আগুনের ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবে অথচ বাহিরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিবে না—কী উপায়ে তাহা করা সম্ভব! আজ যেমন তোমরা নানাবিধ রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে সমস্ত বুদ্ধি নিয়োগ করিয়াও দিশাহারা হইয়া পড়িতেছ, আমিও সেদিন তেমনি ওই সামান্য ছিদ্রটুকু বন্ধ করিবার সমস্যায় সমস্ত বুদ্ধি নিয়োগ করিয়াও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম; সেদিন উহাই আমার জীবন-মরণ সমস্যা ছিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে ঠিক করিলাম, গর্তের মুখটা সম্পূর্ণ বন্ধ না করিয়া অংশত বন্ধ করা যাইতে পারে। তাহাই করিলাম। তাহাতে বেশ খানিকটা ফলও হইল। আনন্দিত হইয়া পাথরগুলা গুছাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি হঠাৎ বাহিরের বাতাসটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল, শুষ্ক চামড়টা উড়িয়া চলিয়া গেল, আবরণহীন গর্তের মুখে শ্বেত দানবটা উঁকি দিয়া যেন হা হা রবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। একটা বাঘ কিংবা ভালুক গর্তের মুখে উঁকি দিলে যাহা করিতাম তাহাই করিলাম, কয়েকটা বড় বড় প্রস্তরফলক সজোরে ছুড়িয়া দিলাম। আশ্চর্য কাণ্ড, ঝড়টা হঠাৎ যেন থামিয়া গেল। গর্তের মুখ দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম, চামড়াটা এবং পাথরগুলা কুড়াইয়া আনিতে হইবে। বাহির হইয়া দেখি চামড়াটা বেশ কিছু দূরে উড়িয়া গিয়াছে, নির্মেঘ আকাশে সূর্য উঠিয়াছে। শুভ্র তুষারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন, তাহার ওপর সূর্যকিরণ পড়িয়াছে, বরফের ওপর যেন আগুন লাগিয়াছে। মনে হইল একটা নীরব দীপ্তির নিষ্ঠুর ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে, একটা নিঃশব্দ ভয়ঙ্কর হাসি যেন।

তাড়াতাড়ি গর্তের মধ্যে ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার চোখ খুলিতে হইল। ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সূর্য মেঘে ঢাকিয়াছে। রৌদ্রের প্রখরতা আর নাই। আবার বাহির হইলাম। ছুটিয়া গিয়া চামড়াখানা এবং পাথরগুলা কুড়াইয়া লইলাম। কুড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিতেছি, হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম। গর্তের আশেপাশে কয়েকটা বড় বড় পাথর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আগেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এখন সেইগুলাই বরফে ঢাকা পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছে। তাহারই একটাতে হোঁচট খাইলাম। তীব্র আঘাত দিয়া পাথরটা আমাকে যেন একটা সত্যের সম্মুখীন করিয়া দিল। বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে হইল বড় পাথর ওড়ে না। একটা বড় পাথর দিয়া যদি এই চামড়াখানাকে গর্তের মুখে চাপা দিতে পারি তাহা হইলে হাওয়াতে চামড়াটা উড়িয়া যাইবে না। তৎক্ষণাৎ প্রস্তরফলক দিয়া বরফ খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। চিত্তে যেন নবীন প্রেরণা নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ খুঁড়িয়া পাথরটাকে বাহির করিয়া ফেলিলাম, তাহার পর ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেটাকে গর্তের মুখে লইয়া আসিলাম, তাহার পর গর্তের মুখে চামড়াটা বসাইয়া তাহার এক ধারে পাথরটাকে চাপা দিলাম। ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য ফাঁক রাখিতে গিয়া বুঝিলাম যে শুধু ধোঁয়ার জন্য নয়, আমার নিজের ঢুকিবার এবং বাহির হইবার জন্যও ফাঁক রাখা প্রয়োজন। আবার মেঘ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, আবার সেই হাসিটা ফুটিয়া উঠিতেছে, ফাঁক দিয়া গর্তের ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম। লাফাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চীৎকার শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, কাচিন উঠিয়া বসিয়াছে এবং নিজের স্তনযুগলকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তারস্বরে চিৎকার করিতেছে। তাহার চোখে আতঙ্ক। স্ফীত পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে। বরফের ভিতর হইতে তাহার অসাড় দেহটাকে যখন কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম তখন ভাবি নাই যে সে বাঁচিয়া উঠিতে পারে। দুর্দিনের খাদ্য হিসাবে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, করুণাবশত নহে। তখনকার জীবনে করুণার কোনো স্থান ছিল না। যাহা করিতাম প্রয়োজনের তাগিদেই করিতাম। কাচিনের দিকে স্থির দৃষ্টি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম, মনে হইতে লাগিল দেহটা প্রাণহীন হইলে এখনই আমার কাজে লাগিত। আমার অন্ধ-সঙ্গিনীর দেহের খানিকটা যদিও এখনও অবশিষ্ট আছে-- ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম— নাই। কয়েকখানা হাড় পড়িয়া আছে মাত্র, আর কিছুই নাই। কাচিনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম—হ্যাঁ, ওই যে মুখে রক্তের দাগ লাগিয়া আছে, ওই-ই তাহা হইলে বাকিটা খাইয়াছে। রাক্ষসী! হঠাৎ ভয়ঙ্কর রাগ হইল, তাহাকে তাড়া করিলাম।

কাচিনও বোধহয় ইহাই আশঙ্কা করিতেছিল, সে এক লম্ফে গর্ত হইতে বাহির হইয়া ছুট দিল; আমিও পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। একটু আগে নিদারুণ বরফের মধ্যে যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা আর মনে রহিল না, একটা হিংস্র প্রবৃত্তি আমাকে আবার সেই বরফের মধ্যে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।...

কাচিন হরিণীর মতো ছুটিতেছিল। আমিও ছুটিতে লাগিলাম। দূরে প্রকাণ্ড একটা আকাশচুম্বী গাছ দাঁড়াইয়া ছিল। গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল। একটি পাতা নাই, শুষ্ক শীর্ণ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া একটা মূর্ত বিভীষিকা যেন। কাচিন আমার দিকে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই গাছটার দিকে ছুটিতে লাগিল। কাছে-পিঠে লুকাইবার মতো কোনো আবরণ ছিল না, চতুর্দিকে কেবল সাদা আর সাদা, কাচিন ছুটিয়া গিয়া সেই গাছটাতে উঠিতে লাগিল। একটু পরে আমিও সেই বৃক্ষতলে উপনীত হইলাম, কাচিন তখন অনেক দূর উঠিয়া গিয়াছে,

আমিও উঠিতে লাগিলাম। গাছের কাণ্ড বরফে পিছল হইয়া গিয়াছিল, বার বার পিছলাইয়া যাইতেছিলাম, তবু কিন্তু নিরস্ত হইলাম না, সেই কনকনে ঠাণ্ডা পিছল কাণ্ডটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ওপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। একটা হিংস্র প্রতিহিংসা যেন চুলের মুঠি ধরিয়া আমাকে উপরে টানিয়া তুলিতেছিল। বিশাল গাছ, উঠিতে অনেকক্ষণ লাগিল। উঠিয়া দেখি কাচিন বন্য বিড়ালীর মতো শাখা হইতে শাখান্তরে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। একটু আগে এই ব্যক্তিই যে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কে বলিবে। জীবন যখন বিপন্ন তখন আত্মরক্ষাকল্পে জীবনীশক্তি যে বহুগুণ বাড়িয়া যায় ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আহত হরিণ ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটিয়া যায়, চুর্ণিতমস্তক সর্প মরিয়াও যেন মরে না। কাচিনও যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছে সহজে ধরা দিবে না। আমাকে দেখিয়া কাচিন ওপরের একটা ডালে উঠিয়া বসিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি নিষ্ঠুর নয়, হিংস্র নয়, তাহাতে ভয়ও নাই। সকৌতুক মিনতির সহিত সগর্ব স্পর্ধা মিশিয়া সে দৃষ্টি যেন অদ্ভুত একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিল। উঁচু ডালে বসিয়া সে আমার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমি তাড়া করিয়া যাইতে লঘুগতিতে আরও একটু ওপরে উঠিয়া গেল। আমি অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুদুর উঠিয়া গিয়াছি, হঠাৎ সে আর একটা ডাল ধরিয়া নামিয়া পড়িল। আমি ঘুরিয়া দ্রুতগতিতে সবেগে যেই তাহাকে ধরিতে গেলাম আমার পায়ের নিচের ডালটা সহসা ভাঙিয়া গেল। বহু ঊর্ধ্ব হইতে একেবারে নিচে পড়িয়া গেলাম। তাহার অব্যবহিত পরে কী ঘটিয়াছে আমার মনে নাই।

যখন চোখ খুলিলাম তখন দেখি অন্ধকার। শীত করিতেছে না, চারিদিক বেশ গরম। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বুঝিতে পারিলাম একটা আরক্তিম আভা অন্ধকারকে একটু স্বচ্ছ করিয়াছে, কাছে কোথাও আগুন আছে। তালু শুষ্ক, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল। উঠিতে যাইব সহসা অনুভব করিলাম মুখের ওপর টপ টপ করিয়া জলের মতো কি যেন পড়িল, জিব দিয়া চাটিয়া দেখিলাম মিষ্টি। মাথার ঠিক পাশেই যে অন্ধকার স্তূপটা ছিল তাহা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম—কাচিন। দুই হাত দিয়া তাহার স্ফীত স্তন হইতে দুধ নিঙড়াইয়া ফেলিতেছে, আমি যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছি তাহা সে প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, আমি যে বাঁচিয়া আছি তাহাই বোধ হয় তাহার ধারণার অতীত ছিল। সে আমাকে বোধ হয় টানিয়া আনিয়াছিল আহার করিবে বলিয়া, আমি তাহাকে যেমন আনিয়াছিলাম। দুগ্ধ-ভারে স্ফীত স্তনযুগল তাহার পক্ষে বোধহয় পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে দুধটা নিঙড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তাহা যে উৎসধারায় আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছে ইহা বুঝিতে পারে নাই। কী অপরূপ মিষ্টি! সহসা আমার দেহে যেন অসুরের বল সঞ্চারিত হইল। নিমেষের মধ্যে উঠিয়া তাহার বুকের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্তন্যপান করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তুষারপাতের জন্য জীবনে যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার দুঃসহতাও যেন আর নাই। নতুন পারিপার্শ্বিকে নতুন অবস্থার মধ্যে যে ভীতি যে অনিশ্চয়তা মনকে প্রতিমুহূর্তে আকুল করিয়া তুলেতেছিল তাহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। গর্তের বাইরে যে শ্বেত দানবটা কখনও নিঃশব্দে কখনও সগর্জনে চরাচরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিল, গর্তের ভিতর যে তাহার প্রতাপ ততটা নাই এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়াতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। গর্তের মুখটার চতুর্দিকে বড় বড় পাথর বসাইয়া নাতিউচ্চ একটি দেওয়াল প্রস্তুত করিয়াছি, পাথরের মাছে মাঝে ছোট ছোট ফাঁক আপনিই থাকিয়া গিয়াছে, সেই

পাথরের দেওয়ালের ওপর মহিষের চামড়া বসাইয়া পাথর দিয়া চাপা দিয়াছি। ঝড়ে তাহা আর উড়িয়া যাইতেছে না। গর্তের ভিতর হইতে ধূম নির্গমনেরও আর বাধা নাই। ইহাতে প্রথমে একটা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, ধূম নির্গমনের নিরাপদ উপায় আবিষ্কার করিয়া নিজেদের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পাথরের দেওয়ালে একটা বাতায়নের মতো রাখিতে হইয়াছিল। বেশি ঝড় বহিলে সেটাকে দ্বিতীয় একটা চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইত। তখন বাঁধিবার কৌশল শিখি নাই, আমি আর কাচিন চামড়ার দুই প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কাচিনকে আর হত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই, খাদ্যের জন্য তাহাকে হত্যা করিবার প্রয়োজনও আর ছিল না, তাহার বুকেই প্রচুর খাদ্য ছিল। তাহা দিতে তাহার আপত্তিও ছিল না। দুধের ভারে ফুলিয়া তাহা টনটন করিত. আমি পান করিলে সে আরামই অনুভব করিত যেন। শিশুর জন্য যে খাদ্য এতকাল মাতৃবক্ষ সতত উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি, তাহা যে বয়স্ক ব্যক্তিরও কাজে লাগিতে পারে তাহা ইতিপূর্বে ধারণার অতীত ছিল। সেই নতুন আবিষ্কারটা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কত অধ্যায়ই না রচনা করিয়াছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে কত যে শিশু হত্যা করিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কত জননী যে দলে দলে শিশু লইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার ইতিহাসও বহুবিস্তৃত। রমণীকে কাছে রাখিবার জন্যই অবশেষে শিশু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইয়া পিতার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম। এই সমস্তর মূলে ছিল সেদিনের সেই আকস্মিক আবিষ্কার।

না, কাচিনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। কাচিনের হিংস্র ভাবটাও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। আমাকে হত্যা করিয়া আমার মাংস খাইবার প্রবৃত্তি তাহারও ছিল না। তাহাকে প্রথমে একটা হিংস্র বন্য বিড়ালীরূপেই কল্পনা করিয়াছিলাম, এই রূপই তখন সকলের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পরে দেখিলাম কাচিন একটু অস্বাভাবিক; আমার প্রতি তাহার একটা বাৎসল্যভাব জাগিয়াছে। শুধু সে যে আমাকে স্তন্যপান করাইত তাহা নয়, আমার জন্য অন্য খাদ্যও সংগ্রহ করিয়া আনিত। আমার উভয়েই অস্পষ্টভাবে যেন বুঝিয়াছিলাম যে নিদারুণ এই দুর্যোগে আমরা পরস্পরের সহায়, ওই শ্বেত দানবটা আমাদের উভয়েরই শত্রু, উহার বিরুদ্ধে সমবেতভাবেই দাঁড়াইতে হইবে। ঠিক স্পষ্টভাবে এমন করিয়া হয়তো সেদিন বিশ্লেষণ করি নাই, কিন্তু অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলাম, যে দেওয়ালের ওই ফাঁকে চামড়াটা ঠিকমতো ধরিয়া যদি বাহিরের ওই ঝড়ের হিমতীক্ষ্ণ দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে চামড়াটা দুইজনে মিলিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। একজনের দ্বারা হইবে না। কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে এইভাবে দাঁড়াইয়া কাটিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কাচিনই একদিন অন্য আর একটা পন্থা আবিষ্কার করিল। মৃগশাবকটাকে হত্যা করিয়া কয়েকদিন বেশ কাটিয়াছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার খাদ্য সমস্যা দেখা দিল। দুজনকেই আবার গর্ত হইতে বাহির হইয়া খাদ্যসন্ধানে লিপ্ত হইতে হইল। চারিদিকে অনিশ্চিতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। বায়ুর বেগ কমিলেই বাহির হইয়া পড়িতাম। খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত অরণ্যের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতাম। যে সব গাছের ফল আমাদের খাদ্য ছিল সেই সব গাছের তলায় গিয়া খুঁড়িয়া দেখিতাম, বরফের তলায় ফল পাওয়া যায় কিনা। কখনও মিলিত, কখনও মিলিত না। খুঁড়িতে খুঁড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে দুই একটা মৃত পশুপক্ষীও পাওয়া যাইত।

কাচিনের এ বিষয়ে স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল একটা। সে গন্ধ পাইত, না অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিত জানি না ঠিক, কিন্তু কাছেপিঠে কোথাও কোনো মৃত পশু বা পক্ষী থাকিলে সে ঠিক গিয়া খুঁড়িয়া বাহির করিত। দিগন্তবিস্তৃত তুষার প্রান্তরের মধ্যে সমস্তই নিশ্চিহ্ন, জলাশয় পর্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন, তাহার মধ্যে কাচিন কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিত কোথায় মৃতজন্তু ঢাকা আছে। যখন কোনো কিছুই মিলিত না, গাছের শিকড় খুঁড়িয়া আনিতাম। কন্দও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এসব ছাড়াও আর একটা প্রধান কাজ ছিল কাঠ সংগ্রহ করা। খাদ্যের অপেক্ষাও অগ্নি ছিল তখন বেশি প্রয়োজনীয়। দুই-এক দিন অনাহারে কাটানো বরং সম্ভব ছিল, কিন্তু অগ্নির অভাবে একদিনও চলিত না। পরবর্তী যুগের সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মতো অতিশয় যত্নে আমরা অগ্নিরক্ষা করিতাম। গর্তে ফিরিয়া প্রথমেই দেখিতাম অগ্নিকুণ্ডে প্রদীপ্ত অঙ্গার আছে কি না। না থাকিলে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িতাম। পাথরে পাথর ঠুকিয়া অগ্নি না জ্বালানো পর্যন্ত স্বস্তি থাকিত না। পাথরে পাথর ঠুকিয়া অগ্নি জ্বালানোও খুব সহজসাধ্য ছিল না সেকালে। অরণ্য মরিয়া গিয়াছিল, সুতরাং কাঠের অভাব ছিল না। কিন্তু শুকনো কাঠ পাওয়া যাইত না। সমস্তই বরফের জলে আর্দ্র। গর্তের মধ্যে আগুনের তাপে কিছু কাঠ সেইজন্য সর্বদা শুকাইয়া রাখিতে হইত। মৃত জন্তুর হাড়, বিশেষ করিয়া পাখির পালকও ইন্ধনরূপে ব্যবহার করিতাম। কয়েক দিন হইতে ক্রমাগত বরফ পড়িতেছিল। উপর্যুপরি তিন দিন গর্ত হইতে বাহির হইতে পারি নাই। কাচিন যে মৃত শূকরটা খুঁড়িয়া আনিয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাচিনের বুকেও আর দুধ নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। অবিলম্বে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কাচিন গর্তের মধ্যে উসখুস করিতেছিল, আমার দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া বসিতেছিল। তাহার চোখেমুখে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল ক্রমশ। সে যেন বুঝিতে পারিতেছিল যে তুষারপাত যদি বন্ধ না হয় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। হঠাৎ সে আগাইয়া আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, স্তনটা মুখে তুলিয়া দিল। আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না, তাহাকে ঠেলিয়া দিলাম। বিমর্ষ হইয়া সে আবার সরিয়া বসিল। বাহিরে অবিরাম তুষার পড়িতেছে, হাওয়া নাই, সূর্যালোক নাই। হঠাৎ গর্তের একধারে খুট করিয়া শব্দ হইতেই কাচিন সেইদিকে ছুটিয়া গেল। উপুড় হইয়া কী দেখিল, ফোঁস ফোঁস করিয়া মাটি শুঁকিতে লাগিল, তাহার পর একটা প্রস্তর-ফলক লইয়া সেই জায়গাটা খুঁড়িতে শুরু করিয়া দিল। আমিও ঔৎসুক্যভরে আগাইয়া গেলাম। কাচিন আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার চোখে দৃষ্টি উদ্ভাসিত। পরমুহূর্তেই সে গর্ত হইতে একটা ইঁদুর টানিয়া বাহির করিল। নিমেষের মধ্যে আমিও সক্রিয় হইয়া উঠিলাম এবং কাচিনকে সরাইয়া নিজেই খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। অনেক ইঁদুর পাওয়া গেল, গোটা কয়েক বড় বড় এবং অনেকগুলি বাচ্চা। শুধু যে খাদ্যসমস্যারই সমাধান হইয়া গেল তাহা নয়, আর একটা জিনিসও আবিষ্কার করিলাম। ইঁদুরেরা গর্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে আমাদের গর্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, আসিবামাত্র তাহারা কাচিনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আরও ইঁদুর পাইবার আশায় আমরা তাহাদের গর্তটা অনুসরণ করিয়া খুঁড়িয়া চলিলাম। খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটির নিচে নিচে অনেক দূর চলিয়া গেলাম। আঁকাবাঁকা প্রকাণ্ড একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িল। আরও কিছু দূর গিয়া বাহিরের আলো দেখিতে পাওয়া গেল। গর্তের বহির্মুখটা। সেই মুখটা খুঁড়িয়া বড় করিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম আমাদের গর্তের মুখ হইতে সেটা অনেক দূরে। আমাদের গর্ত-প্রবেশের দুইটা মুখ হইল। বাহিরে ঝড় উঠিলে এতদিন আমাদের গর্তের দেওয়ালে আমাদের যাতায়াত করিবার জন্য যে ফাঁক ছিল তাহাতে

চামড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত হইত। সে প্রয়োজন আর রহিল না। পাথর দিয়া সে ফাঁকটাকে বন্ধ করিয়া দিলাম। মূষিক-বিবরটাকেই দুইজনে মিলিয়া খুঁড়িয়া বিস্তৃততর করিয়া লইলাম, ইহাই আমাদের বাহিরে যাইবার পথ হইল।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। যাহাকে আকস্মিক উৎপাত বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মাটির তলায় কাচিনকে লইয়া নতুন সংসার পাতিলাম। কত সংসারই যে পাতিয়াছি! সকলের সব কথা মনে নাই। আমার এই কাহিনীতে হয়তো পৌর্বাপর্বও রাখিতে পারিব না। অতীতকে কিন্তু কখনও ভুলিতে পারি নাই। কাচিনকে লইয়া নতুন সংসার পাতিলাম, কিন্তু অতীত অবলুপ্ত হইল না। বিচিত্র পশু-পক্ষীপূর্ণ সেই জটিল অরণ্যটা স্বপ্নে মাঝে মাঝে দেখা দিত। জাগিয়া উঠিয়া ভাবিতাম বাঘ-ভালুক-শজারু-শূকরসমন্বিত বহুবিধ পতঙ্গ-পক্ষী কলরব মুখরিত লতা-পুষ্প-অলঙ্কৃত সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি কোথায় গেল! মাঝে মাঝে মনে পড়িত আমার পূর্ব পূর্ব পরিবারকে, ক্ষুধার জ্বালায় যাহাদের একে একে হত্যা করিয়াছিলাম কিংবা আমার ভয়ে যাহারা পলাইয়া গিয়াছিল তাহাদের। মনে পড়িত, কিন্তু অনুতাপ হইত না। অন্যায় করিয়াছি ইহা অনুভব করিবার মতো মনোবৃত্তি তখনও হয় নাই। ন্যায়-অন্যায় বলিয়া কোনো বোধ তখন ছিল না। যাহা করিতাম প্রয়োজনের তাড়নায় অনিবার্য বলিয়া করিতাম। অতীতকে কিন্তু মনে পড়িত। সে যে আছে তাহা বিশ্বাস করিতাম। অন্ধকার মাটির তলায় শীত-তীক্ষ্ণ তুষার-পরিবেষ্টনীর মধ্যে আলোকোজ্জ্বল ঈষদুষ্ণ শ্যামল দিনগুলির স্বপ্নে সুন্দর অতীত সুন্দরতম হইয়া উঠিত। তাহাকে অস্বীকার করিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু যে বর্তমান সেই অতীতকে নিধন করিয়াছে তাহাকেও যে খারাপ লাগিত তাহা নয়। তাহাকেও ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যাকিরণে, ঊষাকালে, মেঘাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহরে, এমন কি ঝটিকামত্ত দুর্যোগেও তুষারের যে নব নব রূপ দেখিতে শিখিয়াছিলাম তাহা ভয়ঙ্কর নয়, মনোহর। কাচিনেরও নতুন একটা রূপের আভাস অতি ক্ষীণভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যে কেবল আমার দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার যন্ত্রমাত্র, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুগ্রহ-নিগ্রহের ওপরই তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, এ বোধও ক্রমশ অপসারিত হইতেছিল। সেই বর্বর জীবনে আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কাচিন না থাকিলে আমি বাঁচিতে পারি না। প্রাচুর্যের মধ্যে স্বকীয় বলিষ্ঠতাকে সম্বল করিয়া হয়তো একা বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, কিন্তু বিপদের সময় দুঃখের দিনে সঙ্গী না থাকিলে চলে না। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন খুব বেশি ছিল না, কিন্তু যতটুকু ছিল তাহাও একা মিটাইবার সাধ্য আমার ছিল না। খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইলে সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত, দুইজনে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া বহু স্থান খনন করিয়া তবে হয়তো কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতাম। একা থাকিলে হয়তো অনাহারেই মৃত্যু হইত। সব দিন বাহির হইতেও পারিতাম না। ঝড় উঠিলে গর্তে চুপ করিয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। অনেক সময় দিনের পর দিন ঝড় চলিত। এ অবস্থায় কাচিন আমার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। ঝড় থামিলে দুইজনে বাহির হইতাম। দিগন্ত বিস্তৃত তুষারপ্রান্তরের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যে খাদ্য কোথায়। কাচিনের একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল, সে ইহারই মধ্যে খাদ্যের সন্ধান পাইত। সে হরিণীর মতো দ্রুতপদে এদিকে-ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইত, এখানে-ওখানে শুঁকিত তাহার পর একটা জায়গা খুঁড়িতে আরম্ভ করিত, খুঁড়িয়া একটা মৃত জন্তু বাহির করিয়া ফেলিত। সমাধিস্থ মৃত জন্তু অনেক ছিল কিন্তু তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করাই ছিল সমস্যা। কাচিন এ বিষয়ে পটু ছিল। ইহা ছাড়া কাচিনের আর একটা রূপও আমাকে আকৃষ্ট

করিতেছিল। সে মাঝে মাঝে অকারণ আবেগে কেন যে আমার গলা জড়াইয়া ধরিত, কেন যে বিহ্বল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত বুঝিতে পারিতাম না। বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু মুগ্ধ হইতাম।

...দিনের পর দিন এইভাবে অনেক দিনই কাটিয়া গেল। ক্রমে কাচিন আমার সন্তানের জননী হইল। একটি, আর একটি, আরও একটি...পরিবার বাড়িতে লাগিল।

দিনের পর দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড ঘটিল। গভীর রাত্রে একদিন গর্তের ছাতটা আমাদের মাথার ওপর ভাঙিয়া পড়িল। আমরা ঘুমাইতেছিলাম, আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিলাম। অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আমি লাফাইয়া গর্তের এক কোণে সরিয়া গেলাম এবং আতঙ্কে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কি হইল! ক্ষণপরেই ভাঙা ছাতের ভিতর দিয়া এক ঝলক চাঁদের আলো গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন বুঝিতে পারিলাম হাতির মতো বিরাট একটা জন্তু গর্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পা চারিটা গর্তের মধ্যে, মুখটা বাহিরে, গলার ভিতর হইতে বিকট একটা শব্দ বাহির হইতেছে। চিৎকার, ঘড়ঘড় এবং ফোঁসফোঁসের এক ভয়াবহ সমন্বয়। যদিও আমার প্রাণসংশয়, তবু বহুকাল পরে পুরাতন বন্ধু হাতিকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গুঁড়ি মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার একটা পায়ের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলাম। স্পর্শ করিয়াই কিন্তু শিহরিয়া উঠিতে হইল। বড় বড় লোম! এ কি! পেটের তলার দিকে হাত বাড়াইয়া দেখিলাম সেখান হইতেও বড় বড় লোম ঝুলিতেছে! লোমশ হাতি তো কখনও দেখি নাই! এ কি অদ্ভুত জন্তু! হাতি তো নয়! ইহা লইয়া বেশিক্ষণ মাথা ঘামাইবার অবসর কিন্তু মিলিল না, পরক্ষণেই বাহিরে একটা কলরব উঠিল। বহুলোকের কলরব, মানুষের কণ্ঠস্বর, ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে। হঠাৎ জন্তুটা আবার নিদারুণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মনে হইল একটা বিশাল গাছ যেন মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সিংহের গর্জন শুনিয়াছি, ব্যাঘ্রের হুঙ্কার শুনিয়াছি, কিন্তু এমন চিৎকার কখনও শুনি নাই। ভয়ে সমস্ত শরীর হিম হইয়া গেল। বাহিরে কলরব বাড়িতে লাগিল, ভিতরে জন্তুটা আছাড়ি-পিছাড়ি করিতেছে, মাঝে মাঝে ঘৎঘৎ জাতীয় শব্দ শুনিয়া মনে হইতে লাগিল জানোয়ারটার গায়ে বর্শার মতো কিছু একটা বিঁধিতেছে. প্রত্যেক শব্দের পর জানোয়ারটা আরও অস্থির হইয়া উঠিতেছে, আরও চিৎকার করিতেছে। গর্তের ভিতর একটা তাণ্ডব চলিতে লাগিল। গর্তের ভিতর হইতেও সহসা আর্ত চিৎকার উঠিল। কাচিন এবং তাহার সন্তানবর্গের চিৎকার। আমি সহসা জানোয়ারটার পায়ে কামড়াইয়া ধরিলাম। লোমে সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল, কিন্তু তবু আমার দাঁত তাহার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না। তখন দুই হাত দিয়া লোম ছিঁড়তে লাগিলাম। যদিও ছেঁড়া কঠিন তবু খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া পায়ের খানিকটা অংশ দংশনযোগ্য করিয়া লইয়া আবার দাঁত বসাইলাম। দাঁত খানিকটা বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া বসিল না। আবার কামড়াইলাম, আবার, আবার...। ইহা ছাড়া তখন আর কিছু করিবার ছিল না। যেমন করিয়া হোক এই আততায়ীর কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। উন্মাদের মতো কেবল কামড়াইতে লাগিলাম। জানোয়ারটা মরিয়া হইয়া অবশেষে হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের কলরবটা নিকটবর্তী হইতেছিল। গর্তের ভিতর কিন্তু আর কোনো শব্দ ছিল না। চাঁদের আলোয় গর্ত ভরিয়া গিয়াছিল. সেই আলোয় দেখিলাম, মৃত্যু—নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর মৃত্যু—সকলকে নীরব করিয়া দিয়াছে। হিংস্র হিমানীর কবল

হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মাটির তলায় যে সংসার পাতিয়াছিলাম, নিমেষের মধ্যে তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। কেহ নাই...। আমিই কেবল বাঁচিয়া আছি। কাচিনের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার মাথাটা থেঁতলাইয়া চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবে মনে হইল চোখ দুইটা যেন আমার দিকেই চাহিয়া আছে। এক লম্ফে গর্ত হইতে বাহির হইয়া গেলাম। পলাইয়া গিয়াও কিন্তু নিস্তার পাই নাই। কাচিনের সেই চক্ষুর দৃষ্টি বহুদিন আমার রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। আকাশের নক্ষত্রে, হরিণের চাহনিতে, বহু বিচিত্র ইঙ্গিতে কাচিনের সে দৃষ্টি বহুকাল আমাকে অনুসরণ করিয়াছে।

...বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বহু লোক। একটা জনতা। এত লোকের একত্র সমাবেশ আর কখনও দেখি নাই। অভূতপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপার। খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র তুষার, যত দূর দৃষ্টি যায় উদ্ভাসিত রজতকান্তি চতুর্দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু দাঁড়াইয়া উপভোগ করিবার উপায় নাই, নিদারুণ ঠাণ্ডা। তবু খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়েই বোধ হয় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। মানুষ তাহা হইলে নিঃশেষ হয় নাই। শ্বেত দানবটার সমস্ত প্রতাপকে তুচ্ছ করিয়া সে এখনও বাঁচিয়া আছে। শুধু তাহাই নয়, শত্রু নিপাত করিতেছে। যে হিংস্র জন্তুটা এখনই আমার সমস্ত সংসারটাকে পদদলিত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল, সকলে মিলিয়া সেই লোমশ পর্বতাকার জন্তুটাকে ঘিরিয়াই বড় বড় বল্লম ছুঁড়িতেছে। সহসা যেন উপলব্ধি করিলাম, একক মানুষের দিন ফুরাইযাছে। বাঁচিতে হইলে মানুষকে দল বাঁধিয়া বাঁচিতে হইবে। দৃশ্য-অদৃশ্য বিবিধ শত্রু চতুর্দিকে। একা সে বাঁচিতে পারে না। কে ইহারা? কবে ইহারা দল বাঁধিল? মনে হইল ইহারা যে-ই হউক, যে ভাবেই ইহারা দল বাঁধিবার প্রেরণা পাইয়া থাকুক, ইহারাই সঙ্কটত্রাতা। যদিও শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিলাম, তবু কেমন যেন অননুভূত এটা শক্তি অন্তরে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। মনে হইল এখন আমি আর একা নই, যে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে এখন দাঁড়াইতে পারিব। সম্মুখে একটা বল্লম পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলাম। আবার নতুন জীবন আরম্ভ হইল।

সত্য নতুন জীবন। একেবারে অভিনব। এতকাল যে জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দলের প্রভুত্ব ছিল না। আমিই আমার সংসারের রাজা ছিলাম। পারতপক্ষে দ্বিতীয় কোনো সমর্থ পুরুষের কর্তৃত্ব, এমন কি সান্নিধ্য পর্যন্ত আমি সহ্য করি নাই। বাহিরের কোনো লোককে কাছেই ঘেঁষিতে দিতাম না, নিজের পরিবারের মধ্যেও বালক সাবালক হইলে তাহাকে দূর করিয়া দিতাম। ইহাই নিয়ম ছিল। কেহ কাহারও সান্নিধ্য পছন্দও করিত না। অরণ্যে পর্বতে ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প, গণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া শীতাতপ সহ্য করিয়া একাই এতদিন আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি কিন্তু সমস্ত পৃথিবী যখন বরফে ঢাকিয়া গেল, পুরাতন অরণ্য পুরাতন পশুপক্ষী পুরাতন পারিপার্শ্বিক সহসা যখন পরিবর্তিত হইয়া গেল তখন একার শক্তিতে আর কুলাইল না। যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহাদের উপলব্ধি করিতেই হইল যে এই ভয়ানক শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে মিলিত হইতে হইবে। দল বাঁধিতে হইবে! সমর্থ মানুষ মাত্রকেই আর শত্রু মনে করিলে চলিবে না। তাহার সাহায্য লইতে হইবে। সমাজের পত্তন হইল। আমি সহসা সেই সমাজভুক্ত হইয়া গেলাম।

...সেদিন রাত্রেই সেই বিরাট ম্যামথটাকে সকলে মিলিয়া হত্যা করিলাম। সেই দিনই লক্ষ্য

করিলাম মানুষ পাথর দিয়া কী সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। আমি একটা পাথরের বল্লম কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। পরে দেখিলাম শুধু বল্লম নয়, পাথরের কুঠারও অনেকের হাতে আছে। ম্যামথটা বল্লমবিদ্ধ হইয়া যখন পড়িয়া গেল তখন কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের ওপর কুঠার চালাইতে লাগিল, তোমরা এখন যেমন বৃক্ষকাণ্ডে কুঠার চালাইয়া থাকো অনেকটা সেই রকম। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার দেহ হইতে পদচতুষ্টয় বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার পর প্রত্যেকটি পা টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হইল এবং আমরা প্রায় প্রত্যেকেই একটা করিয়া টুকরা পাইলাম। পাইবামাত্র সকলে খাইতে শুরু করিয়া দিলাম। ম্যামথের মাংস পূর্বে কখনও খাই নাই। বড় ভাল লাগিল। কয়েকজনে মিলিয়া শুঁড়টা কাটিয়া লইল এবং টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিল। এইরূপে ম্যামথের বিরাট দেহটা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যে যতটা পারিলাম আহার করিতে লাগিলাম।

...প্রভাত হইল। দেখিলাম মাংসল অংশগুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অস্থি, চর্ম এবং প্রকাণ্ড বক্র দাঁত দুইটা ছাড়া আর বিশেষ কিছু বাকি নাই। দিনের আলোকে দলটাকে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলাম। শুধু পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকও অনেক আছে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলাম। প্রত্যেকেরই গায়ে একটা আবরণ রহিয়াছে। লোমশ চামড়ার আবরণ। ম্যামথের চামড়া। ভুক্তাবশিষ্ট ম্যামথটাকে সকলে মিলিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমিও তাহার এক প্রান্ত ধরিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলাম। কেহ আপত্তি করিল না। কাল রাত্রে যখন বল্লম কুড়াইয়া লইয়া ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিলাম তখনও কেহ আপত্তি করে নাই। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। একজন সমর্থ পুরুষ আর একজনকে এত নিকটে পাইয়াও কিছু বলিতেছে না, ইহা প্রথমটা বিশ্বাস করিতেই বাধিতেছিল, নিজেরই হিংস্র প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে আমিই হয়তো আমার পার্শ্ববর্তী লোকটার ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িতাম। কিন্তু পারিলাম না, সাহস হইল না। যদিও সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছিলাম না তবু অস্পষ্টভাবে বুঝিতেছিলাম ইহারা শত্রু নয়, বন্ধু। ম্যামথের দেহটা টানিয়া সকলের সঙ্গে চলিতেছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পারিলাম না, সামর্থ্যে কুলাইল না। শীতে সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ বরফের ওপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কী ঘটিয়াছিল জানি না।

অনেকক্ষণ পরে যখন জ্ঞান হইল তখন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না আমি কোথায় আছি। একটা অন্ধকার ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল গহ্বর ছাড়া আর কিছুই ঠাহর হইল না। চতুর্দিকে সাপের মতো কুণ্ডলীকৃত কি যেন আমাকে জড়াইযা আছে। ঘাড় ফিরিয়া দেখিলাম একটা ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছে। চাঁদের আলো। হামাগুড়ি দিয়া সেই ফাঁকটার কাছে আসিলাম, হাত দিয়া ঠেলিতেই সেটা আরও ফাঁক হইয়া গেল, আমি বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম এতক্ষণ আমি ওই ম্যামথটার উদরগহ্বরে ছিলাম। যাহারা ম্যামথটাকে টানিয়া আনিয়াছে তাহারা বোধহয় হতচেতন আমাকেও উহার পেটের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোথায় গেল তাহারা। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই। চতুর্দিকে বরফ। অদূরে একটা পাহাড়ের মতো দেখা যাইতেছে। একটু আগাইয়া দেখিলাম পাহাড়ের শ্রেণী। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিতেছে। হঠাৎ ভয় পাইল। পুরাতন সংস্কারটা যেন সাবধান করিয়া দিল—উহারা তোমাকে আহার করিবার জন্যই বহন করিয়া আনিয়াছে, তুমি যেমন কাচিনকে বহন করিয়া আনিয়াছিলে। বাঁচিতে চাও তো পালাও। ছুটিতে শুরু করিলাম। সেই পাহাড়টার দিকেই ছুটিতে লাগিলাম, আবার বরফে

পা অবশ হইয়া যাইতে লাগিল। তবু কিন্তু থামিলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের নিচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়াই নজরে পড়িল কাছেই কয়েকটা বড় বড় গাছ রহিয়াছে। ঠিক গাছ নয়, গাছের কঙ্কাল। একটি পাতা নাই। অসংখ্য ডালপালা বিস্তার করিয়া তবু দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে-ওদিকে চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের পাদমূলে একটা গুহাও রহিয়াছে। শীতে সর্বাঙ্গ জমিয়া যাইবার মতো হইয়াছিল, আশ্রয়ের আশায় তাড়াতাড়ি গুহার দিকে ছুটিলাম। গুহায় ঢুকিতে গিয়া কিন্তু বাধা পাইলাম। অতিশয় তীব্র একটা দুর্গন্ধ আমাকে যেন থামাইয়া দিল। কিন্তু বাহিরে এত শীত যে দাঁড়াইয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। সাহসে ভর করিয়া অবশেষে গুহাতে ঢুকিলাম। বেশ বড় গুহা। কিছুদূর প্রবেশ করিবার পরই কিন্তু একটা চাপা তর্জন শুনিতে পাইলাম। গ র র্ র্র্...। পরমুহূর্তেই ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইল এবং আমার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল বিরাট একটা শ্বেত-ভল্লুক। প্রাণের দায়ে মানুষ অসাধ্যসাধন করে। যে আমি শীতে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই আমি শুধু যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে পারিলাম তাহা নয়, একটা বৃক্ষেও আরোহণ করিতে পারিলাম। একটি পত্রহীন বৃক্ষের সুউচ্চ ডালে উঠিয়া আমি তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলাম। চারিদিক সাদা বরফ, অদূরে বিরাট একটা পাহাড়, রজতকান্তি জ্যোৎস্না-প্রেতিনীর মতো নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, গাছের তলায় ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া আছে শ্বেত-ভল্লুকটা। এই অদ্ভুত পরিবেষ্টনী আমার চিৎকারে যেন শিহরিয়া উঠিল। চিৎকার করিতে করিতে সভয়ে লক্ষ্য করিলাম ভল্লুকটা গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেছে। সত্যিই যদি ওপরে উঠিয়া আসে গাছ হইতে লাফাইয়া পড়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুদূর উঠিয়াই ভল্লুকটা লাফাইয়া নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের চিৎকারও শুনিতে পাইলাম। দেখি সেই নতুন মানুষের দল বড় বড় বর্শা হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভল্লুকটা ছুটিতে ছুটিতে শ্বেত-প্রান্তরের মধ্যে যেন মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল। কয়েকজন তবু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে ছাড়িল না। যাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারা বৃক্ষতলে আসিয়া সমবেত হইল এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু ভাবে বোধ হইতেছিল তাহারা আমাকে নামিয়া আসিতে বলিতেছে। আমারও আর গত্যন্তর ছিল না, অতিশয় ভয়ে ভয়ে নামিয়া পড়িলাম। উহাদের ভাবগতিক যদি মন্দ বুঝি তখন আবার ছুটিতে আরম্ভ করিব। ভাবগতিক কিন্তু মন্দ মনে হইল না। নামিবামাত্র তাহাদের একজন ইঙ্গিতে আমাকে অনুসরণ করিতে বলিল। আমি নীরবে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অনুসরণ করিবার পর দেখিলাম পুনরায় সেই নিহত ম্যামথটার সমীপবর্তী হইয়াছি। পূর্বাকাশ ঊষার রক্তিম স্বর্ণাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই দেখিলাম ম্যামথটাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। আমিও বসিলাম। যাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল তাহারাও বসিয়া গেল এবং এক-একটি প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র বাহির করিয়া ম্যামথের চামড়া ছাড়াইতে শুরু করিল। আমার কোনো অস্ত্র ছিল না, আমি নখ দিয়া দাঁত দিয়া এবং হাত দিয়া টানাটানি করিতে লাগিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম দলে দলে আরও অনেক আসিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা...দলে দলে...পিপীলিকার সারির মতো...। দানবটার মৃত্যুসংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার দেহের যে যতটুকু পারে লইয়া যাইবে...। সকলে কিন্তু ম্যামথটার ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল না। যাহাদের হাতে অস্ত্র আছে তাহারাই কেবল আসিয়া চামড়া ছাড়াইতে লাগিল। বাকি সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে তুমুল চিৎকারে

আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। শত্রু-নিধন-পুলকিত সম্মিলিত মানবের জয়ধ্বনিতে বারংবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এ জাতীয় অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম।

...কলকণ্ঠে হাস্যধ্বনিতে সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখিলাম অদ্ভুতভাবে সজ্জিতা ও রঞ্জিতা একটি যুবতী আমাকে দেখাইয়া তাহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। জুমনি। তাহার গলায় ঝিনুকের মালা, মুখে-কপালে লাল ও হলুদ রঙ মাখানো, পরিধানে চামড়ার ঘাগরা। তাহার সঙ্গিনীদের কেহ কেহ রঙ মাখিয়াছে দেখিলাম। একজনের নাকের মধ্যে অদ্ভুত একটা অলংকারও রহিয়াছে। পরবর্তী যুগে যে স্থানে তোমাদের স্ত্রীলোকেরা নোলক দুলাইবে সেই স্থানে আঙুলের মতো মোটা মোটা হাড় গোঁজা আছে। ইহারা সকলেই একটা অদ্ভুত ভাষায় পরস্পরের সহিত কথা বলিতেছিল, আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আভাসে শুধু এইটুকু বুঝিতেছিলাম যে কিসের যেন একটা আয়োজন চলিতেছে। ম্যামথের দাঁত দুইটা কাটিয়া আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে, খানিকটা মাংসও পৃথকভাবে রাখা আছে দেখিলাম। তাহার পর সহসা জুমনি উচ্চকণ্ঠে কি একটা আদেশ দিল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও দাঁড়াইলাম। ম্যামথের দাঁত দুইটা ও আলাদা করিয়া রাখা সেই মাংস লইয়া তিনজন আগাইয়া গেল। জুমনি, তাহার সঙ্গিনীগণ এবং বাকি সকলে তাহাদের অনুসরণ করিল। আমিও করিলাম। কিছুদুর গিয়া দেখিলাম, বিরাট একটা গর্ত খোঁড়া রহিয়াছে। একটু দূরেই সেই পাহাড়টা এবং পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা গুহা দেখা যাইতেছে। আমরা গর্তটার কাছে সমবেত হইবামাত্র গুহার ভিতর হইতে কয়েকজন একটা মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, শবের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। মাথাটা নিষ্পিষ্ট, চোখ মুখ নাক কান কিছুই বোঝা যায় না, একটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড কেবল। সেই মৃতদেহটিকে ধরাধরি করিয়া সকলে গর্তের ভিতরে নামাইয়া দিল। দেখিলাম গর্তের ভিতর তাহার জন্য একটি প্রস্তর-শয্যাও প্রস্তুত করা আছে। তাহার মাথাটা একটা পাথরের বালিশের ওপর রাখা হইল। তাহার পর সেই গর্তের ভিতর সেই ম্যামথের দাঁত, ম্যামথের মাংস, কিছু কন্দ এবং কয়েকটা অস্ত্রশস্ত্র সাজাইয়া দেওয়া হইল। জুমনি নিজের হাতেই সেগুলি সাজাইয়া দিবার পর সকলে মিলিয়া সেই সমাধি-গহ্বরকে ঘিরিয়া শুরু করিল নৃত্য। শুধু নৃত্য নয়, সশব্দ নৃত্য। আকাশের দিকে মুখ ও হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে তাহারা বিকট একটা শব্দ করিতে লাগিল। তাহা গান নয়, ক্রন্দন নয়, আর্তনাদও নয়। তাহা যেন আক্রোশে আস্ফালন, অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে তাহা যেন তর্জন। নাচিতে নাচিতে তাহারা প্রত্যেকেই খানিকটা করিয়া মাটি ফেলিয়া দিতে লাগিল। গর্ত ক্রমশ ভরিয়া গেল। যদিও আমি উহাদের প্রতিটি কার্যকলাপ অনুসরণ করিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করিতে আর কখনও দেখি নাই। আমি মৃত ব্যক্তিকে আহার করিয়াছি, তাহাকে এভাবে মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলার কোনো অর্থ আমার বুদ্ধিতে আসিতেছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল যে, ভবিষ্যতের জন্য বোধ হয় ওটাকে রাখিয়া দেওয়া হইল। অন্য কোনো জন্তু যাহাতে না খাইয়া যায়, তাই বোধ হয় মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখিতেছে। একটু পরে লক্ষ করিলাম, নাচিতে নাচিতে সকলে আবার ফিরিয়া যাইতেছে। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। ম্যামথটার কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম, বৃহদাকার কয়েকটা শকুন জাতীয় পাখি ম্যামথটাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিল, আমাদের দেখিতে পাইয়া উড়িয়া গেল।

আবার সকলে আসিয়া ম্যামথটাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলাম। জুমনি ও তাহার সঙ্গিনীরা

পাহাড়ের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা বসিয়া ম্যামথের চামড়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি নখ ও দাঁতের সাহায্যেই করিতেছিলাম। ইহাদের ভাষা আমার বোধগম্য না হইলেও একটা জিনিস ক্রমশ আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। যাহারা চামড়া ছাড়াইতেছে, তাহারা ভৃত্যজাতীয় এবং যাহারা পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা মনিব সম্প্রদায়। পরে আবিষ্কার করিয়াছিলাম এই নতুন মানবসমাজে সবলরা দুর্বলদের মারিয়া ফেলে না, তাড়াইয়াও দেয় না, কাজে লাগায়। এক-একজন সবল লোকের আশ্রয়ে বহু দুর্বল লোক বাস করে এবং পরিবর্তে তাহারা কাজ করিয়া দেয়। কাজ করিতে পারিলে আশ্রয়ের অভাব হয় না।

বেলা বাড়িতে লাগিল। রৌদ্র উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। এ অঞ্চলটা বরফে ঢাকা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঢাকা নয়। আশেপাশে শ্যামলতার আভাস একটু-আধটু আছে। এরকম বেঁটে বেঁটে ছোট ঝাউয়ের মতো গাছও মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। দূরে দূরে পাহাড়। আরও দূরে একটা নদীর মতো কি যেন রহিয়াছে, শীতে জমিয়া গিয়াছে। দূর হইতে বিরাট একটা শ্বেত সর্পের মতো দেখাইতেছে। দাঁত দিয়া ও নখ দিয়া টানাটানি করিয়া আমি কেবল পরিশ্রান্তই হইয়া পড়িতেছিলাম, ম্যামথের চামড়া বিশেষ ছাড়াইতে পারি নাই। ভীষণ কর্কশ চামড়া, তাহার ওপর লোমে পরিপূর্ণ। আশেপাশে চাহিয়া দেখিলাম, সকলেই অখণ্ড মনোযোগ সহকারে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত। আমার দিকে দুই-একজন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে বটে, কিন্তু কেহই আমাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে না, এই অভিনব অনুভূতিটাই সবিস্ময়ে বারংবার উপভোগ করিতেছিলাম। যাহারা আমাকে গাছ হইতে নামাইয়া আনিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? তাহারা কে? ইহারাই কি তাহারা? নানা প্রশ্ন মনে জাগিতেছিল। কিন্তু প্রশ্নের সমাধান করিব কী প্রকারে? অসহায়ভাবে বসিয়া মৃত ম্যামথটার ছিন্ন চর্মপ্রান্ত লইয়া টানাটানি করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ গোটা দুই পাথরের অস্ত্র আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। একটা চামড়া ছাড়াইবার ছুরি এবং আর একটা পাথরের কুঠার। পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম, কোমরে দুই হাত দিয়া গ্রীবাভঙ্গি সহকারে জুমনি দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল ছুটিয়াছে, স্কন্ধবিলম্বিত চর্মাবরণ খুলিয়া পড়িয়াছে, দ্রুত নিশ্বাসে পীবর স্তনযুগল আন্দোলিত হইতেছে। আদেশের ভঙ্গিতে ম্যামথটার বক্ষদেশ দেখাইয়া সে কি বলিল বুঝিতে পারিলাম না। তখন ঝুঁকিয়া ম্যামথটার বক্ষদেশ দেখাইয়া সে অঙুলি দিয়া যাহা নির্দেশ করিল, তাহাতে বুঝিলাম সে বলিতেছে— এমনি করিয়া এখানটা কাট। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, অনেকেই সেখানে ছোরা বসাইতে চেষ্টা করিয়াছে, আঁচড়ের দাগ অনেক রহিয়াছে, কিন্তু কেহই সেখানকার চর্ম বিদীর্ণ করিতে পারে নাই। আমিও পারিলাম না। ছোরাটা সেখানে বসাইতে চেষ্টা করিলাম, দাগ পর্যন্ত বসিল না। তখন কুঠারটা তুলিয়া সজোরে আঘাত করিলাম, মনে হইল প্রস্তরখণ্ডে আহত হইয়া তাহা যেন ফিরিয়া আসিল। আর একবার আরও জোরে আঘাত করিলাম। তাহাতেও কিছু হইল না। ম্যামথের বক্ষ বিদীর্ণ করা সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়াই বোধ হয় ওই জায়গাটায় কেহ ভিড়ে নাই। আমার কেমন যেন রোখ চড়িয়া গেল। উন্মাদের মত আঘাতের পর আঘাত করিয়া যাইতে লাগিলাম। অনুভব করিতে লাগিলাম জুমনি আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। কাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত নানারূপ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছিলাম, আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে আমার দিকে নয়, ওই ম্যামথটার বুকের দিকে। অনেকক্ষণ কুঠার চালাইবার পর ম্যামথের বক্ষঃস্থল অবশেষে ফাটিয়া গেল। তখন জুমনি আঙুল দিয়া ইঙ্গিতে আমাকে জানাইল —উহার

হৃদপিণ্ডটা টানিয়া বাহির কর। কুঠার এবং ছুরির সাহায্যে অনেক কষ্টে হৃৎপিণ্ডটা বাহির করিলাম। বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে জুমনি তাহা আমার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল এবং সেখানে দাঁড়াইয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। সমবেত জনতা আবার চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। পরে পারিয়াছি। নিজেও পরে ম্যামথের হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া খাইয়াছি। সেইদিনই ভোরে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেখানে আমার ভাষাভাষী লোকেরা সমবেত হইয়া গ্রাম বাঁধিয়াছিল, সেইখানে জুমনির কাহিনীটা শুনিয়াছিলাম। যে ম্যামথটাকে শিকার করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমরা ছিন্নভিন্ন করিতেছিলাম, সেই ম্যামথটা দুই দিন পূর্বে জুমনির স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল, সেই স্বামীর মৃতদেহই আমরা একটু আগে কবরস্থ করিলাম। এই সমস্ত দলটারই অধিপতি ছিল জুমনির স্বামী।

রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা চুষিতে চুষিতে জুমনি দ্রুত পদক্ষেপে ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। সমস্ত দিন তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দিন ধরিয়া সে মৃত ম্যামথটাকে লইয়া সকলে ছেঁড়াছেঁড়ি করিলাম। যে যতটা পারিল সেইখানে বসিয়া বসিয়া খাইল, বহিয়াও লইয়া গেল অনেকে। মাংস, হাড়, চামড়া, চর্বি যে যতটা পারিল লইয়া গেল। হাতে অস্ত্র পাইয়া আমিও কিছু সংগ্রহ করি। পেটে আর স্থান ছিল না। উদ্বৃত্তটা কোথায় রাখিব তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল ক্রমশ। দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল। রাত্রির জন্য একটা আশ্রয় চাই। সমস্ত দিন ম্যামথের কাছে বসিয়া কাটিয়াছে, জায়গাটা ঘুরিয়া দেখা হয় নাই যে আশ্রয় পাওয়া যাইবে কি না। চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম কি করা যায়। সেই শ্বেত ভল্লুকটার কথা মনে পড়িল। ভিড় ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। সকলেই দেখিলাম পাহাড়টার দিকে চলিয়াছে। ওখানেই বোধ হয় আশ্রয় আছে। অনেকগুলি গুহা দেখিয়াছিলাম।

হঠাৎ চোখে পড়িল জুমনি আসিতেছে। আমার দিকেই আসিতেছে। তাহার হাতে দুইটা চর্মাবরণ। আমার কাছে আসিয়া চর্মাবরণ দুইটা সে আমাকেই দিল এবং উদ্ভাসিত চক্ষে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কী যে বলিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম না। এইটুকু শুধু আভাসে হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, আমার কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপই বোধ হয় এই চর্মাবরণ দুইখানা সে আমাকে দিতেছে। তাহার চোখমুখের ভঙ্গি দেখিয়া তাহাই মনে হইল। এতদিন যে জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে এসব ছিল না। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে চামড়া দুইখানা লাভ করিয়া হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইল তাহাও অভূতপূর্ব। ইতিপূর্বে কৃতজ্ঞতা নামক সুকুমার মহৎ ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই, সেদিন হইল। সমস্ত অন্তর যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, কণ্ঠের কাছে কেমন যেন ঈষৎ বেদনার মতো অনুভব করিতে লাগিলাম। একটু ভয়ও যে না হইল তাহা নয়। মনে হইতে লাগিল ইহা নতুন ধরনের ফাঁদ নয় তো! চামড়া দুইখানা দিয়া জুমনি নাচের ভঙ্গিতে দুই হাত তুলিয়া কী যেন বলিল, একটু হাসিল, তাহার পর চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবামাত্র আমার চমক ভাঙিল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হইলাম। তাড়াতাড়ি চামড়ার ওপর মাংসের টুকরো ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি চাপাইয়া দিয়া তাহা টানিতে টানিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জুমনিও পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে। সহসা সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল আমি তাহার অনুসরণ করিতেছি, দেখিতে পাইবামাত্র সে ছুটিতে লাগিল। আমিও যথাসম্ভব গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম। দেখিতে পাইলাম, ছুটিতে ছুটিতে সে একটা পাহাড়ের গুহামুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে আমি যখন পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে।

আশেপাশে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ভয়াবহ নীরবতায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। যে বিরাট জনতা এতক্ষণ ভিড় করিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? আকাশচুম্বী পাহাড়টা যেন একটা ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো। নিষ্ঠুর এবং কঠিন, নীরবে ওঁৎ পাতিয়া আছে। যে গুহামুখে জুমনিকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছিলাম, আশা হইল হয়তো উহার ভিতরই আশ্রয় মিলিবে। ধীরে ধীরে সেই গুহাটার সম্মুখীন হইলাম। গুহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু যে-ই ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছি, অমনি একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। হিংস্র জন্তুর তর্জনের মতো একটা শব্দ—গ্র গ্র গ্র—গররর—গ্র গ্র গ্র—গররর—গররর। তাহার পর দেখিতে পাইলাম শ্মশ্রু-গুম্ফ-কেশসমাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড একটা মুখ, মহিষের চোখের মতো একজোড়া লাল চোখ, প্রকাণ্ড থ্যাবড়া নাক, কালো পুরু ঠোঁট। আমি সম্মুখের অংশটাই কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম-রোমশ হাত দুইটা সম্মুখের দিকে প্রসারিত। ঠিক যেন একটা শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মহিষের মূর্তি। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র কিন্তু যে চিৎকারটা সে করিয়া উঠিল, তাহা সিংহ-গর্জনের অনুরূপ। আমি ভয়ে পিছাইয়া গেলাম। এ কে। জুমনি কোথায় গেল? পরক্ষণেই একটা খিলখিল হাসি শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, জুমনি ওই মনুষ্যরূপী মহিষটার বক্ষের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। পরে শুনিয়াছি, ওই মনুষ্যরূপী মহিষটার নাম দাহু। জুমনির স্বামীর মৃত্যুর পর ওই নাকি স্বামীর পদে বহাল হইয়াছে। একটু পরেই দাহুর যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে পরিচয় তখন জানা থাকিলে ততটা ভয় পাইতাম না। জুমনি বাহির হইয়া কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি একটা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চামড়া দুইখানা এবং স্তূপীকৃত ম্যামথের মাংস সামনেই পড়িয়াছিল। জুমনি সেগুলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আবার চারিদিকে চাহিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে সে হয়তো আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিত, কিন্তু তাহার অবসর সে পাইল না। আর একটা গর্জন করিয়া দৈত্যাকৃতি দাহু বাহির হইয়া আসিল এবং জুমনিকে শিশুর মতো দুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া গুহার অন্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, কোথাও একটা আশ্রয় যোগাড় করিতে হইবে। চামড়া দুইখানা টানিতে টানিতে আমি পাহাড়ের সানুদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ সন্ধানের পর অবশেষে একটা আশ্রয় মিলিল। ঠিক গুহা নয়, তবে মাথার ওপর একটা আবরণ পাওয়া গেল। একস্থানে পাহাড়ের খানিকটা অংশ বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহারই তলায় আশ্রয় লইলাম। কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। শীত তো ছিলই, নিরাপদও মনে হইতেছিল না। শ্বেত ভল্লুকটার কথা মনে হইতেছিল। দাহুর মুখটাও মনে পড়িতেছিল। একটু পরে একটা হাওয়া উঠিল। চামড়া দুইটা টানিয়া গায়ে দিলাম। বিশেষ কোনো ফল হইল না। আগুন না হইলে এ শীত ভাঙিবে না। কিন্তু আগুন কোথায় পাইব? চামড়া দুইটাই ভাল করিয়া জড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম।

বোধহয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। হুড়মুড় করিয়া একটা পাথর পাহাড়ের ওপর হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে মনে হইল। পরক্ষণেই দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ শোনা গেল, মনে হইল কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে, আমারই দিকে আসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। চতুর্দিকে জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলাম বৃহদাকৃতি কী যেন একটা ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার পিছনে আর একজন। যে পিছনে ছিল সে চিৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল একটা শব্দের শূল যেন আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। বৃহদাকৃতি লোকটার গতিবেগ আরও বাড়িয়া গেল। উপর্যুপরি

কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড আমার নিকটে আসিয়া পড়িল। যে পিছনে আসিতেছিল, দেখিতে পাইলাম সে-ই পাথর ছুঁড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িল। চিনিতে পারিলাম। দাহু ও জুমনি। দৈত্যাকার দাহুকে জুমনি তাড়া করিয়াছে, ভীত দাহু উর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে। উভয়েই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আরও কাছে আসিতে দেখিতে পাইলাম, দাহুর নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, নাকের সম্মুখের অংশটা নাই বলিয়া মনে হইল। দাহু আর্তনাদ করিতেছে। জুমনির মুখও রক্তাক্ত। হঠাৎ জুমনি চিৎকার করিয়া উঠিল। ইয়া—ইয়া—ইয়া—ইয়াও—ইয়াও হো হো—হু-উ-উ-উ। জুমনির এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে এই চিৎকারের প্রতিধ্বনি উঠিল। বহু লোক যেন সাড়া দিল। চতুর্দিক হইতে পিল পিল করিয়া বহু লোক বাহির হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের গা বাহিয়া যেন পিপীলিকার সারি নামিতেছে। দৈত্যাকার দাহু আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া আবার অসহায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। একটা পাথর সজোরে আসিয়া তাহার মাথায় লাগিল, সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। ইয়া—ইয়া—ইয়াও—হো হো—হু-উ-উ—সকলের মুখে এই চিৎকার। এই চিৎকারে দাহুর আর্তনাদ ডুবিয়া গেল। সকলে তাহাকে টানিতে টানিতে পাহাড়ের উপরে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিল, আমিও শিহরিয়া উঠিলাম। হঠাৎ নজরে পড়িল দূরে সেই শ্বেত ভল্লুকটা একটা হিমানী স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আছে। সে-ও যেন অবাক হইয়া গিয়াছে।

আমি হঠাৎ বাহির হইয়া বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিলাম। জুমনির দেওয়া চামড়া, ম্যামথের মাংস সমস্ত পড়িয়া রহিল। আমি যে দিকে দু'চক্ষু যায় প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, দাহুকে শেষ করিয়া জুমনি এবার আমাকে ধরিবে। ছুটিতে লাগিলাম। ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে বাধ্য হইয়া গতিবেগ কমাইয়া দিতে হইল। তবু কিন্তু থামিতে পারিলাম না, হাঁটিতে লাগিলাম। একটা অজ্ঞাত ভয় যেন আমাকে পিছনে তাড়া করিয়া আসিতেছিল। সহসা কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল জুমনি রাক্ষসী. নরমাংস ভক্ষণ করাই উহার স্বভাব, নানা স্থলে বিদেশি পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের আয়ত্তের মধ্যে লইয়া যায়, তাহার পর খাইয়া ফেলে। নিজের অনাবৃত যৌবন আমার চোখের সামনে ধরিয়া আমাকে চামড়া উপহার দিয়া আমাকেও আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দাহুকে শেষ করিয়া আমাকে ধরিবে। এইরূপ নিশাচরী রাক্ষসীর কল্পনা কী করিয়া মাথায় আসিয়াছিল তাহা জানি না। কিন্তু আসিয়াছিল এবং আসিবামাত্র উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিলাম, বিচার-বিতর্ক করি নাই। বিচার করিবার মতো বুদ্ধি আমার তখন ছিল না। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কাহার যেন ইঙ্গিত পাইতাম এবং তাহাই অনুসরণ করিতাম। এই ইঙ্গিত অনুসারে চলিয়া চিরকালই লাভবান হইয়াছি। এই ইঙ্গিতই অসহায়ের সহায়, বিপদের প্রাক্কালে নিগূঢ়ভাবে মানুষকে সতর্ক করিয়া দেয়। যুক্তির কোলাহলে ইহার মৃদু বাণী অনেক সময় শোনা যায় না, কিন্তু ভাল করিয়া শুনিও, ইহা এখনও তোমাদের অন্তরে আছে, এখনও বিপদের পূর্বে তোমাদের সর্তক করে।

...হাঁটিতেছিলাম। চাঁদের আলো ছিল, কিন্তু চাঁদের আলোয় আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস ছিল না। আড়ালে আড়ালে হাঁটিতেছিলাম। যেখানে যতটুকু আড়াল বা অন্ধকার পাইতেছিলাম ততটুকুই ব্যবহার করিতেছিলাম। বড় বড় পাথরের আড়াল ছিল, দুই-একটা বড় বড় গাছের আড়ালও ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ ছিল চন্দ্রালোকিত বড় বড় প্রান্তর। সেগুলিকে ছুটিয়া পার হইতেছিলাম। ছুটিবার আর একটা কারণও ছিল, বরফ পড়িতেছিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর সম্মুখে খুব বড় একটা প্রান্তর পাইলাম। কিছুতেই সেটা আর শেষ হয় না। হঠাৎ দেখিলাম প্রান্তরের মাঝখানে একটা পাহাড় রহিয়াছে। আর চলিতে পারিতেছিলাম না, ইচ্ছা হইল ওই পাহাড়টার নিচে খুঁজিয়া দেখি রাত্রির মতো যদি একটা আশ্রয় পাওয়া যায়। প্রায় ছুটিয়া পাহাড়টার নিকটবর্তী হইলাম। নিকটবর্তী হইয়াই কিন্তু আরও দ্রুতবেগে পলাইতে হইল। পাহাড় নয়, ম্যামথ একটা। আর একটু কাছাকাছি গেলেই ওই রোমশ জন্তুটার কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। আমাকে দেখিয়া ম্যামথটা বিকট গর্জন করিয়া উঠিল। ছুটিতে ছুটিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, আমারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিরাটকায় বলিয়া আমার মতো দ্রুতগতিতে নয়, তবু কিন্তু আসিতেছে।

...কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ মেঘে চাঁদটা ঢাকিয়া গেল। চতুর্দিকে অন্ধকার। কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, তবু ছুটিতেছি। না ছুটিয়া যে উপায় নাই। সহসা একটা বরফের স্তূপের ওপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, আর উঠিবার সামর্থ ছিল না। যদিও প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করিতেছিলাম এইবার ম্যামথটা আসিয়া পড়িবে, তাহার দন্তাঘাতে ছিন্নভিন্ন বা পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইব, তবু কিন্তু একবারও ভাবিতে পারে নাই এইবার মৃত্যু আসন্ন, এইবার সব শেষ হইয়া যাইবে! বরং ইহাই মনে হইতেছিল, বিপদে পড়িয়া গিয়াছি বটে, তবু আমি বাঁচিয়া যাইব, নিশ্চয়ই বাঁচিব, আমি কি মরিতে পারি?

...হঠাৎ একটা শব্দ হইল। কি যেন একটা ফাটিয়া গেল। ম্যামথটার চিৎকার শুনিতে পাইলাম। আমি মুখ তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চতুর্দিকে অন্ধকার। বসিয়াই রহিলাম, কারণ উঠিবার শক্তি আর ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মেঘটা সরিয়া গেল। দেখিলাম আমি একটা বরফের প্রান্তরে বসিয়া আছি, আর ম্যামথটা সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে একটা গর্তের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ঠিক কি হইয়াছে তখনও ভালো বুঝিতে পারি নাই। একটু পরেই কিন্তু মনে হইল আমি ধীরে ধীরে ম্যামথটার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। আবার চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল। মনে হইল একটা জন্তু যেন আমার দিকে ছুটিয়া আসিল, আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

...কিছুক্ষণ পরে প্রভাত হইল। তখন দেখিলাম যে বিবাট বরফের প্রান্তরে আমি বসিয়াছিলাম তাহা খরবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। বুঝিলাম একটা প্রকাণ্ড নদীর উপরে কিছু অংশ জমিয়া গিয়াছিল, এই নদীটাকেই আমি দিনের আলোকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম, ম্যামথের পদভারে তাহার খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছে এবং সমস্তটা অবশেষে ফাটিয়া গিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারে যে জন্তুটা আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল, দিনের আলোকে সেটা আবার দেখিতে পাইলাম। একটা হরিণ। আমার খাদ্য। বহুদিন হরিণ দেখি নাই। বরফপাত শুরু হওয়ার পর ইহারা কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। এখন কোথা হইতে আসিল।

সহসা মনে হইল আমাকে এভাবে রক্ষা করিতেছে কে? বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম। এই রহস্যের আভাসে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। অজানার উদ্দেশ্যে ভাসিয়া যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই এই বিশ্বাস মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল যে অদৃশ্যলোকে কে যেন একজন আছেন যিনি আমার রক্ষক।

কয়েকদিন ভাসিবার পর যেস্থানে আসিয়া ঠেকিলাম সেখানেও দেখিলাম মানুষ আছে---যাহারা আমার ভাষা বোঝে---যাহারা এই বরফকে মানিয়া লইয়াই নূতন ধরনের সমাজ পত্তন করিয়াছে।

তিন

সত্যই নূতন ধরনের সমাজ। বরফ বা খাদ্যসংগ্রহ এ সমাজের সমস্যা নহে, মানুষের প্রতি মানুষের বিভিন্ন আচরণই ইহাদের জীবনের প্রধান প্রেরণা। পুঠা, লুং, রাঠা, হুংজুরা বরফের ভয়ে ভীত নহে, খাদ্যাভাবে কাতর নহে, তাহাদের সমস্যা অন্য জাতীয়।

ইহাদের মধ্যে আসিয়া নূতন বেশ পরিধান করিয়াছি। নতুন বেশ পরিয়া নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছি।

...চর্মাবরণে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া নির্নিমেষে দিগন্তের দিকে চাহিয়াছিলাম। পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল পুঠা। প্রৌঢ়া পুঠা। পুঠাই আমার আশ্রয়দাত্রী। আশ্রয় দিবার হেতু আমার কপালের কালো জড়ুলটা। পুঠার শেষ যে পুত্রটি কিছুদিন পূর্বে অর্ধগলিত বরফের তলায় তলাইয়া গিয়াছিল, তাহারও কপালে নাকি এইরূপ একটি জড়ুল ছিল। আমার কপালের ওই কালো চিহ্নটি আমার আগন্তুকত্ব-দোষ নষ্ট করিয়া ওঁই নবসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। পুঠা যদিও দুর্ভাগিনী, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিবার কাহারও সাহস ছিল না। সে যখন আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল তখন আমার চিন্তার কারণ ছিল না।

পুঠা সত্যিই দুর্ভাগিনী। অনেকগুলি পুত্র-কন্যার জননী হইয়াও সে নিঃসন্তান। ম্যামথের কবলে, রোমশ গণ্ডারের খড়্গাঘাতে, নিদারুণ শীতে, পারিবারিক যুদ্ধবিগ্রহে তাহার সমস্ত সন্তান পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। একটিও বাঁচিয়া ছিল না। কোনো পুরুষও নাকি আর পুঠার সংস্রবে আসিতে চাহিত না। সকলে তাহাকে ভয় করিত। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, স্বল্প ভাষণ সকলের নিকট হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার নিশীথ অভিযান, গভীর রাত্রিতে একক চিৎকার সত্যই তাহাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ নাকি তাহাকে কাঁদিতে বা হাসিতে দেখে নাই। রাত্রে সে একা একা যক্ষিণীর মতো ঘুরিয়া বেড়াইত। নিস্তব্ধ তুষারপ্রান্তর কখনও তাহার আর্তনাদে কখনও তাহার অট্টহাস্যে প্রকম্পিত হইত। চন্দ্রালোকিত এক রাত্রেই পুঠার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। নতুন স্থানে সমস্ত দিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই, গভীর রাত্রে ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়াছিলাম। সহসা দূরে দেখি পুঠা দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া চিৎকার করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আমি বসিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই। সে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল এবং হেঁট হইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমিও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলাম। পুঠার নয়ন সহসা বিস্ফারিত হইয়া গেল। সে ঝুঁকিয়া আমার জড়ুলটার উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, তাহার পর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ইহার পর সে আমাকে টানিতে টানিতে তাহার বরফগুহার ভিতর লইয়া গিয়াছিল।

...পুঠাকে অনুসরণ করিয়াই গভীর নিশীথে বাহির হইয়াছিলাম। তাহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম, বল্‌গা হরিণের সারি চলিয়াছে। একটা দুইটা নয়, শত শত। পুঠা আমার হাতে একটা বর্শা তুলিয়া দিয়া সঙ্কেত করিল। শিকারিরা কুকুর লেলাইয়া দিবার সময় যেমন শব্দ করে তেমনি শব্দও করিল একটা। আমি বর্শা হাতে ছুটিয়া গেলাম। পুঠা প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

...ছুটিতে ছুটিতে আমি যখন বল্‌গা হরিণশ্রেণীর নিকটবর্তী হইলাম তখন সমস্ত দলটা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। তবু আমি দলের শেষাংশ লক্ষ্য করিয়া বর্শাটা ছুঁড়িলাম। একটা হরিণ পড়িল। পুঠা আমাকে প্রস্তরনির্মিত একটা ছোরাও দিয়াছিল। ছুটিয়া গিয়া ছোরাটা হরিণের বুকে বসাইয়া দিলাম। প্রকাণ্ড হরিণ। তাহার বক্ষের ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া খানিকটা উষ্ণ রক্ত

তখনই পান করিয়া ফেলিলাম। সমস্ত শরীরে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হইল। মুখটা মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং চতুর্দিকে চাহিয়া চাহিয়া নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলাম হরিণের দল কোন্ দিকে যাইতেছে। দেখিলাম দূরে, অনেক দূরে, সুবিস্তৃত তুষারপ্রান্তের পরপারে ঘননিবদ্ধ অরণ্যের মতো কি যেন একটা রহিয়াছে। ঘন কৃষ্ণ ভ্রূর মতো দেখাইতেছে। চন্দ্রালোকে বরফের পটভূমিকায় তাহা যেন রহস্যময় ও ভয়াবহ। একদিকে একটা জলের ধারাও দেখা গেল। হরিণের দল সেইদিকেই চলিয়াছে।

...হরিণটাকে টানিতে টানিতে লইয়া যখন পুঠার কাছে গেলাম তখন দেখি সে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছে। নিহত হরিণটা দেখিয়া তাহাব প্রস্তরবৎ মুখে ক্ষীণ আনন্দাভাস ছড়াইয়া পড়িল। পরমুহূর্তে কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার নাকে নাক ঘষিয়া আদর করিল। আমি অভিভূত হইয়া তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া রহিলাম। পুঠা ইঙ্গিতে তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিল। অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর আমরা একটা প্রকাণ্ড গর্তের সমীপবর্তী হইলাম।

পুঠা বলিল, 'এই গর্তটার ভিতর হরিণটাকে বরফ চাপা দিয়া এখন লুকাইয়া রাখ। কাল যথাসময়ে ইহাকে বাহির করিতে হইবে। কাল রূঠার জীবনের শুভতম দিন আসিবে, কাল সে নবজীবন লাভ করিবে। তখন ইহাকে কাজে লাগিবে। হরিণের সন্ধানে রূঠার সন্তানেরাও প্রত্যহ বাহির হইয়া যায় কিন্তু পায় না। আজ তাহারা হরিণ পাইয়াছে কি না কে জানে। তাহারা না পাক আমরা তো পাইয়াছি। এটা এখন এইখানে লুকানো থাকুক।'

রূঠাকে দেখিযাছি। পলিতকেশা বৃদ্ধা। পুঠারই জ্যেষ্ঠা ভগিনী। রূঠার সন্তান-সন্ততি লইয়াই এই সমাজ। সেকালে জননীই ছিল সন্তানের পরিচয়। পিতার খবর কেহ রাখিত না। পুত্রের পরিচয় জননীর নামে হইত। পৌত্র বলিয়া তখন কিছু ছিল না। দৌহিত্র ছিল। রূঠার শুধু পুত্র কন্যা দৌহিত্র নয়, দৌহিত্রের দৌহিত্রও আছে। পুঠা যদিও সন্তানহীনা কিন্তু রূঠার সন্তানসন্ততি প্রায় শতাধিক। লুংয়ের মুখে পরে শুনিয়াছি রূঠার সন্তানসন্ততিদের বিবাহ লইয়া দূর কোন্ পল্লীব টিট্টিভ সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বিবাদ। তাহারা নাকি রূঠার কয়েকটি পুত্র-দৌহিত্রকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের দলভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মেয়েরা নাকি মায়াবিনী। গভীর নিশীথে টিট্টিভ পক্ষীর ডাক ডাকিয়া তাহারা নাকি পুরুষদেব ভুলাইয়া লইয়া যায়। তাহার নাকি একপ্রকার লোমশ বন্য কুক্কুর পুষিয়া তাহাদের দিয়া কাষ্ঠনির্মিত গাড়ি টানায়। লুংয়ের মুখে এরূপ অনেক অদ্ভুত কথাই শুনিয়াছিলাম এবং যদিও এ ধরনের সংবাদ আমার অভিজ্ঞতার অতীত ছিল তবু তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পুঠার কাছে যাহা শুনিলাম তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

'নবজীবন লাভ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।'

পুঠা আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়াইয়া চাহিয়া রহিল। তাহাব পর বলিল, 'তুমি যে দেশ হইতে আসিয়াছ সেখানে বুঝি এসব নাই?'

'না। কি করিয়া নবজীবন লাভ ঘটে।'

'দেখিলেই বুঝিবে। রূঠা কাল জল-ভল্লুক হইয়া যাইবে।'

'জল-ভল্লুক কী?'

'জল-ভল্লুক দেখ নাই?'

'না?'

'আচ্ছা আজই দেখাইয়া দিব।'

শিশুর অজ্ঞতায় জননী যেমন হৃষ্ট হয়, আমার অজ্ঞতায় পুঠাও তেমনি হৃষ্ট হইতেছিল।

...প্রকাণ্ড হরিণটাকে বরফসমাধি দিতে বেশ খানিকটা সময় গেল। বরফ দিয়া গর্তের মুখটা যখন ভালভাবে ঢাকিয়া দিলাম তখন পুঠা বলিল, 'ওই পাথরটা আনিয়া উহার মুখে চাপা দাও, তাহা হইলে আর কেহ উহার উপর দাবি করিবে না।'

পাথর আনিয়া চাপা দিলাম।

'এইবার চল তোমাকে জল-ভল্লুক দেখাই। এখনই দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না ঠিক নাই, তবু চল চেষ্টা করা যাক।'

পুঠার অনুসরণ করিতেছিলাম। একটি কথাই বার বার মনে হইতেছিল, ভাগ্যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার কোনো অমিল নাই। থাকিলে কি পুঠা আমাকে আশ্রয় দিত? কি করিয়া যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার মিল হইল তাহাই চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, হয়তো কোনো কালে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল। হয়তো আমার পূর্বপুরুষ এবং ইহাদের পূর্বপুরুষ একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় ছিলাম আমরা? অতীতের দিকে চাহিতে গিয়া কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল, একটা কুয়াশার মধ্যে যে দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল, ইহারা আমার ভাষা বোঝে, ইহারা আমার আত্মীয় এবং ইহারা জয়ী হইয়াছে। এই করাল বরফকে ইহারা জয় করিয়াছে। বরফেরই গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছে। এইসব চিন্তা করিতে করিতেই নীরবে পুঠার অনুসরণ করিতেছিলাম। পুঠা একটি কথাও বলে নাই। পুঠা স্বল্পভাষিণী। সহসা সে একটা ভয়ার্ত শব্দ করিয়া মাটির ওপর শুইয়া পড়িল। আমিও পড়িলাম। যন্ত্রচালিতবৎ শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ক্ষণকাল শুইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম ব্যাপারটা কি, পুঠা এমন করিল কেন। দেখিলাম পুঠা বরফ দিয়া তাড়াতাড়ি নিজের সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিতেছে। ফিসফিস করিয়া আমাকেও সে তাহাই করিতে বলিল। আমিও তাহাই করিতে লাগিলাম। আপাদমস্তক চর্মাবরণে ঢাকা ছিল, পায়ে ছিল চামড়া দিয়া বাঁধা কাঠের জুতা, সুতরাং বরফ চাপা দিয়া খুব বেশি যে কষ্ট হইতে লাগিল তাহা নয়। কেবল নাকটি বাহির করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিলাম। বেশিক্ষণ অবশ্য থাকিতে হইল না, একটু পরেই পুঠা ডাকিল।

'এইবার ওঠ।'

ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

পুঠা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অঙুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ওই দেখ—'

দেখিলাম দূরে দীর্ঘাকৃতি কালো মানুষের মতো কি একটা যেন চলিয়া যাইতেছে। তাহার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হাত দুইটা আজানুলম্বিত তো বটেই, বোধ হয় আরও লম্বা। মাথাটাও প্রকাণ্ড। পিছনের দিকটাই বেশি বড় বলিয়া মনে হইল। মনে হইল পিছনের দিকেই বুঝি নাক-চোখও আছে। কিন্তু তাহা যে নাই তাহা তাহার গতি দেখিলেই বোঝা যায়। দূর হইতে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না কিন্তু মনে হইতেছিল সর্বাঙ্গে বড় বড় লোমও বোধহয় আছে। কেমন যেন একটা ভল্লুক-ভল্লুক ভাব।

'কি ও?' পুঠাকে প্রশ্ন করিলাম।

পুঠা বলিল, 'হুংজু। রাক্ষস। ওই দূর বনে থাকে। আমার টিন্‌টাকে ওই খাইয়াছে।'

টিন্‌টা বোধ হয় পুঠার কোনো মৃত পুত্র বা কন্যা হইবে।

'রাক্ষস?'

'হাঁ। আমাদের মাথা মড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইতে পারে। গায়েই ভয়ানক শক্তি। ওই বনে অনেক হুংজু ছিল। রূঠার ছেলেরা কয়েকটাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এইটাই এখনও বাঁচিয়া আছে, আরও দুই-একটা আছে হয়তো—'

আমি তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িলাম। আমার ভয় হইল, যদি ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের দেখিতে পায়! পুঠাকেও সেকথা বলিলাম।

পুঠা বলিল, 'সে ভয় থাকিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইতাম না। হুংজু ঘাড় ফিরাইতে পারে না, তাহার সে শক্তি নাই। যেদিকে চলে সেইদিকেই চলিতে থাকে, সহজে ফেরে না। হাওয়া এখন উল্টোদিকে বহিতেছে। আমাদের গন্ধ পাইবে না, কথাও শুনিতে পাইবে না। চল আমরা আস্তে আস্তে উহার পিছু পিছু যাই। হুংজু নিশ্চয় জল-ভল্লুকের খোঁজেই বাহির হইয়াছে। জল-ভল্লুকের মাংস উহার বড় প্রিয় এবং সেই জন্যেই রূঠার ছেলেদের ও পরম শত্রু।'

আমি সবিস্ময়ে হুংজুর দিকে চাহিয়া রহিলাম। ওই হুংজুই যে আমাদের পূর্বপুরুষ, বহু শতাব্দী পূর্বে আমিও যে উহারই মতো ছিলাম এ কথা একবারও মনে হইল না। উহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীব মনে করিয়া সভয় বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

'চল—'

পুঠার আহ্বানে চমক ভাঙিল। সন্তর্পণে দূরে দূরে হুংজুর অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কখনও থামিতেছি, কখনও গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছি, কখনও বরফ স্তূপের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি... এইভাবে অনেক দূর গেলাম। সহসা একটা করুণ শব্দ শোনা গেল, অনেকটা যেন গানের মতো, কান্নার মতো।

পুঠা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'জল-ভল্লুক! ছুটিয়া চল, ওই বরফের ঢিপিটার আড়ালে যাই। হুংজু নিশ্চয়ই এটাকে ধরিয়াছে।'

ছুটিয়া গেলাম, গিয়া দেখিলাম পুঠার অনুমানই সত্য। হুংজু মাছের মতো কি যেন একটা বগলের নিচে চাপিয়া ধরিয়া তাহার গলার কাছে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। হুংজুর কবলে সেটা ছটফট করিতেছে। তাহার পর নজরে পড়িল, আরও কয়েকটা ছুটিয়া পলাইতেছে। তখন বুঝিলাম উহারা মাছ নয়, যদিও প্রথমে ঠিক মাছের মতোই মনে হইয়াছিল। এখন লক্ষ করিয়া দেখিলাম উহাদের পা আছে, ভালুকের কানের মতো দুইটা কানও আছে। মুখটাও অনেকটা ভালুকেরই মুখের মতো। তোমরা আজকাল যাহাকে 'সিল' বল, পুঠা তাহাকেই জল-ভল্লুক বলিতেছিল। যেটা সর্বাপেক্ষা বড় সেটা প্রকাণ্ড। সেটা হুড়মুড় করিয়া জলে নামিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটাও জলে নামিল। হুংজু দেখিলাম ছুটিতেছে। ছুটিয়া গিয়া সে একটিকে পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। ঠিক এই সময় একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার হাতে যে বর্শাটা ছিল হুংজুকে লক্ষ্য করিয়া আমি হঠাৎ সেটাকে ছুঁড়িয়া দিলাম। চকিতের মধ্যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, এবং আমি যে কি বিপজ্জনক কাজ করিয়া ফেলিয়াছি তাহাও চকিতে উপলব্ধি করিয়া পরমুহূর্তেই শুইয়া পড়িলাম। হুংজু যদি এখনই ছুটিয়া আসে! পুঠাও সঙ্গে সঙ্গে শুইয়া পড়িয়াছিল। সে-ও নিশ্চয়ই একই বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল—হুংজু এইবার তাড়া করিয়া আসিবে এবং আমাদের ধরিয়া মাথাটা মড়মড় করিয়া চিবাইবে। হুংজু কিন্তু আসিল না। কোনো শব্দ পর্যন্ত হইল না। কবলিত জল-ভল্লুক দুইটির

ক্রন্দনও ক্রমশ থামিয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দেখিলাম কোথাও কেহ নাই, বর্শাটা শুধু বরফে গাঁথা রহিয়াছে। তাহার পর আর একটু উঠিয়া দেখিলাম, জল-ভল্লুকের শাবক দুইটি বগলদাবা করিয়া হুংজু দূরে পলাইতেছে। তাহার পলায়মান চেহারাটার দিকে চাহিয়া আমার ভীত ভাবটা শুধু যে অপনোদিত হইল তাহা নয় সাহসও পাইলাম। ছুটিয়া গিয়া বর্শাটা তুলিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, পুঠা আমাকে বাধা না দিলে হয়তো অনুসরণও করিতাম।

পুঠার দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। এখন দেখিলাম। আমার অবিমৃষ্যকারিতায় সে বিরক্ত হয় নাই, আনন্দে উৎসাহে গর্বে তাহার ভাললেশহীন চক্ষুযুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, 'এখন থাক, পরে হইবে। এখন বাড়ি চল। ভোর হইয়া আসিতেছে। আজ রূঠার নব-জীবন হইবে। অনেক কাজ আছে। দেখি উহারা হরিণ আনিতে পারিয়াছে কি-না—'

আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম। চলিতে চলিতে আমি প্রশ্ন করিলাম, 'নব-জীবন লাভ ব্যাপারটা কি বুঝাইয়া বল তো।'

'সত্যই তুমি জান না।'

'না।'

পুঠা তখন চুপি চুপি আমাকে বলিল, 'একথা যেন কাহাকেও বলিও না। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তুমি কি—তুমি বলিও তুমিও একজন জল-ভল্লুক। বিশেষত রূঠার মেয়েগুলো যেন কিছুতেই না জানিতে পারে যে, তোমার কুলের কোনো চিহ্ন নাই।'

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া পুঠা বলিল, 'তবে শোন, সব কথা খুলিয়া বলি। বহুদিন পূর্বে রূঠা, ডিংঘা আর আমি তিনজনে এখানে তিনটি বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম রোমশ গণ্ডারকে, রূঠা স্বপ্ন দেখিয়াছিল জল-ভল্লুকের এবং ডিংঘা স্বপ্ন দেখিয়াছিল টিট্টিভ পাখিকে। আমার মা ঠিক করিলেন ওই তিনটি জন্তু দিয়াই আমাদের বংশ চিহ্নিত করিতে হইবে। উহারাই হইবে আমাদের কুলদেবতা। আমরা যখন সন্তানধারণক্ষম হইলাম তখন আমাদের প্রত্যেককে আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট সেই জন্তুগুলি আহার করিতে হইল। আমি রোমশ গণ্ডারের মাংস আহার করিলাম, রূঠা জল-ভল্লুকের এবং ডিংঘা টিট্টিভের মাংস আহার করিল। আমাদের প্রত্যেককেই সমস্ত জন্তুটাই আহার করিতে হইল। সাত দিন ধরিয়া আমি এক রোমশ গণ্ডারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিলাম। তাহার কিছুই ফেলিয়া দিবার উপায় ছিল না, নখ দাঁত লোম পর্যন্ত আমাকে গ্রাস করিতে হইয়াছিল। রূঠা এবং ডিংঘাও এইভাবে জল-ভাল্লুক এবং টিট্টিভকে আত্মসাৎ করিয়াছিল। এইরূপে আমি হইলাম রোমশ গণ্ডার, রূঠা হইল জল-ভল্লুক এবং ডিংঘার পুত্রকন্যারা টিট্টিভ। আমার পুত্রকন্যারা কেহ বাঁচিয়া নাই। রূঠার পুত্রকন্যা দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা আছে। ডিংঘা আমাদের ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।'

'কোথায়?'

'একদিন একটা অদ্ভুত দুর্ধর্ষ লোক কুকুরের গাড়ি হাঁকাইয়া আসিল এবং ডিংঘাকে পিঠের উপর চড়াইয়া লইয়া গেল। ডিংঘা আর ফিরিয়া আসে নাই। বহু দূরে গিয়া সে টিট্টিভ বংশ স্থাপন করিয়াছে। উহাদের সহিত আমাদের কলহ। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। আমরা উহাদের অনেককে মারিয়াছি, আমাদের এবং রূঠার পুত্রকন্যাদের উহারাও মারিয়াছে। অনেকে বলে হুংজু নাকি উহাদের সপক্ষে। সেই জন্য হুংজু আমাদের কাহাকেও নাগালের মধ্যে পাইলে

ছাড়ে না, মারিয়া ফেলে। তা ছাড়া উহাদের কুকুরের গাড়ি আছে, আমরা উহাদের সহিত পারিয়া উঠি না—'

চলিতে চলিতে আমরা কথা বলিতেছিলাম। পুঠা কেমন যেন একটানা একঘেয়ে স্বরে মন্ত্রপাঠ করার মতো বলিয়া চলিয়াছিল।

'কুকুরের গাড়ি কী জিনিস?' আমি প্রশ্ন করিলাম।

পুঠা বলিল, 'গাছের ডাল পাশাপাশি বাঁধিয়া উহারা একটা আগড়ের মতো জিনিস তৈয়ারি করে। তাহার একধারে চামড়ার দড়ি দিয়া উহারা একদল ক্ষুধার্ত কুকুর বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর আগড়ের ওপর দাঁড়াইয়া উহারা মাংসের টুকরা ছুঁড়িতে থাকে আর কুকুরগুলো সেই মাংসের লোভে আগড়টাকে টানিতে টানিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। আগড়ের ওপর কুকুরের গলার দড়ি ধরিয়া যে দাঁড়াইয়া থাকে সে-ও দ্রুতগতিতে অনেকটা পথ পার হইয়া যায়।'

'কুকুর কামড়ায় না?'

'না কুকুরকে উহারা পোষ মানাইয়াছে।'

কল্পনায় চিত্রটা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। এতগুলা কথা একসঙ্গে বলিয়া পুঠাও নীরব হইয়া গেল। সে-ও বোধ হয় কল্পনানেত্রে কিছু দেখিতেছিল। সে কিন্তু কুকুরের গাড়ি দেখিতেছিল না। কারণ কিছুক্ষণ পরে সে যাহা বলিল তাহা অন্য প্রসঙ্গ। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে সে বলিল, 'রুঠা আজ নব-দেহ পাইবে। আজ বল্‌গা হরিণের দল আসিয়াছে'—মনে হইল যেন সে স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পথ চলিতেছে, যেন স্বপ্নালোক হইতে কথাগুলি বলিল।

নব দেহ? রুঠা কি নতুন দেহ পাইবে? তাহা কী রূপে হইবে?

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল। পুঠা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর আবার চলিতে শুরু করিল। চলিতে চলিতে বলিল, 'সে নবদেহই পাইবে। কিন্তু সে দেহ আমরা দেখিতে পাইব না। রুঠার আর সন্তান প্রসব করিবার ক্ষমতা নাই, এইবার তাহার দেহ তাহার সন্তানদের দেহের সহিত মিশিয়া যাইবে। কেমন করিয়া যাইবে তাহা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে। প্রথম যেদিন সে জল-ভল্লুক হইয়াছিল সেদিনও বল্‌গা হরিণের দল আসিয়াছিল। আজ আবার সেই বল্‌গা হরিণের দল আসিয়াছে। রুঠাকে ডাকিতে আসিয়াছে, রুঠা আজ চলিয়া যাইবে—'

আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার কাছে সমস্তটাই একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মতো মনে হইতেছিল। একটা কথা সহসা মনে হইল। রুঠার যখন নবজীবন লাভ হইতেছে, পুঠারও নিশ্চয় হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম।

'তোমার নবদেহ কবে হইবে?'

পুঠা কথাটা শুনিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া এমনভাবে চাহিল যেন কথাটা সে শুনিতে পায় নাই। আবার প্রশ্ন করিলাম। তখন সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখিলাম তাহার সমস্ত চোখেমুখে একটা আর্ত বেদনা স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটা গভীর দুঃখ সে যেন চাপিতে চেষ্টা করিতেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে উত্তর দিল।

'আমার নব-দেহ হইবে না। কারণ আমার গর্ভের একটি সন্তানও বাঁচিয়া নাই। কাহার মধ্যে আমি নিজেকে নবীন করিব? যদি কোনো দিন রোমশ গণ্ডার দেখিতে পাই, তাহার মুখেই আত্মসমর্পণ করিব। কিন্তু সে ভাগ্যও বোধ হয় আমার হইবে না, কারণ রোমশ গণ্ডারও

আজকাল দেখিতে পাই না। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও চলিয়া গিয়াছে। বহু কাল রোমশ গণ্ডার দেখি নাই। আমাকে বোধ হয় পশুর মতো মরিতে হইবে। রূঠার ছেলেরা আমাকে মাটির নিচে পুঁতিয়া দিবে।'

তাহার এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের কথাটা অতি সহজেই পুঠা সেদিন বলিয়াছিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মনের বেদনা মুখে ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনো হতাশাব্যঞ্জক কথা সে বলে নাই। অবশ্য যে ভাষাতে আমি রূঠার কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতেছি সে ভাষা পুঠার ভাষা নয়, তোমাদের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এইভাবে লিখিতেছি। সেযুগে আমাদের ভাষার অন্যপ্রকার রূপ ছিল। শুধু রসনা দিয়া নয়, সর্বাঙ্গ দিয়া আমরা কথা বলিতাম। পুঠার চোখের দিকে চাহিয়া তাহার নিদারুণ বেদনাটা টের পাইলাম। কিন্তু কেন যে এ বেদনা, তাহার সম্যক তাৎপর্যটা তখনও আমার কাছে পরিস্ফুট হইল না। কী অপমানে লজ্জায় তাহার ভিতরটা যে পুড়িয়া যাইতেছে, যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলিতেও তাহার আত্মসম্ভ্রম আহত হইতেছে—তাহা আমি তখন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। নীরবে অনেকক্ষণ দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিলাম।

...সহসা মাথার উপর শব্দ হইল—কাঁক, কাঁক, কাঁক—! পুঠার অন্তরের বেদনা যেন আকাশে বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম এক ঝাঁক হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। পুঠার সহসা রূপান্তর ঘটিল। তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষু দিয়া সহসা যেন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বক্ষের ওপর মুষ্ঠিবদ্ধ হস্ত চাপিয়া উদ্ভাসিত নয়নে সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু মুখে অনেকক্ষণ কিছু বলিল না।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, 'ওই হাঁসের দল কোথা হইতে আসিল? উহারা কোথায় থাকে?'

আমার কথায় পুঠার যেমন চমক ভাঙিল। আমার দিকে ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা জানি না। শুধু জানি আমি যেদিন রোমশ গণ্ডার হইয়াছিলাম, সেইদিন এই হাঁসের দল এমনিভাবে ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া আসিয়াছিল। কোথা হইতে আসিয়াছিল জানি না! তবে কি রোমশ গণ্ডারও আজ আসিবে...'

পুঠা এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। আমিও চাহিতে লাগিলাম। দিগন্তবিস্তৃত বরফ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পুঠা চক্রবাল রেখার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'আসিবে, নিশ্চয় আসিবে। হাঁসের দল আসিয়াছে, সে-ও আসিবে। আবার নব হইব। তুমি আসিয়াছ—'

সহসা সে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি কেমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পুঠা জড়াইয়া ধরিতে চমকিয়া উঠিলাম। পুঠার আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহা অসম্ভব। বলিষ্ঠ পুঠার দৃঢ় বাহুদ্বয় অজগরের মতো আমাকে বেষ্টন করিযা ধরিযাছিল। আমার চোখেমুখে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল অদৃশ্য অগ্নিশিখার মতো তাহার তপ্ত নিঃশ্বাস। একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাহার চোখের দৃষ্টিতে ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল।

'চল, চল'—আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া সে বলিল। অনুনয় এবং আদেশের এমন সমন্বয় আর কখনও শুনি নাই।

সে আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমিও আর বাধা দিলাম না, তাহার নিকট

নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম। মনে হইল একটা উত্তাল তরঙ্গময়ী খরস্রোতা নদীর স্রোতে যেন ভাসিয়া চলিয়াছি। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম, কোন্ দিকে চলিয়াছিলাম তাহা আমার খেয়াল ছিল না। সহসা লক্ষ্য করিলাম, যে গর্তটায় কিছু আগে মৃত বলগা হরিণটাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম সেই গর্তটার সমীপবর্তী হইয়াছি।

পুঠা আমাকে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া গর্তের মুখে আমি যে বরফ চাপা দিয়া গিয়াছিলাম, হস্তপদ সহযোগে তাড়াতাড়ি সে তাহা সরাইয়া ফেলিতে লাগিল। মনে পড়িল বহুকাল পূর্বে একটা বন্য ভল্লুককে ওইভাবে মাটি খুঁড়িতে দেখিয়াছিলাম। পুঠাকেও মানুষ বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল একটা ভল্লুকী বুঝি আদিম ক্ষুধার তাড়নায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তাহার পর আমিও আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমিও তাহার সহিত যোগ দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্তের মুখটা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। পুঠা ভিতরে ঢুকিল। আমিও গর্তের মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার অনুসরণ করিলাম। প্রকাণ্ড মৃত হরিণটা গর্তের একধারে পড়িয়াছিল। সম্ভবত তাহার শরীরের তাপেই গর্তের ভিতরটা একটু গরম হইয়াছিল।

...কিছুক্ষণ পরে মৃত হরিণটাকে টানিতে টানিতে যখন গুহা হইতে আমরা দুইজনে বাহির হইলাম, তখন চারিদিক ঊষালোক-রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত সে দৃশ্য। এক ভয়াবহ রক্তবর্ণ দ্যুতি চতুর্দিকের বরফকে যেন রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। চক্রবালসংলগ্ন পর্বতমালা মনে হইতেছে যেন মাংসের স্তূপ। দূর হইতে জল-ভল্লুকের করুণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে যেন একটা হত্যাকাণ্ডের পর কে যেন একটা বুকফাটা কান্না কাঁদিতেছে।

আমি অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। পুঠা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'উহারা রূঠাকে ডাকিতেছে' রোজই ডাকে। এতদিন বল্গা হরিণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া রূঠা অপেক্ষা করিয়াছে। আজ তুমি বল্গা হরিণ শিকার করিয়াছ, আজ রূঠার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চল তাড়াতাড়ি আমরা যাই।'

আমিই হরিণ পাইয়াছিলাম, রূঠার পুত্রেরা হরিণ যোগাড় করিতে পারে নাই। হরিণটাকে ঘিরিয়া সকলে মহা-উৎসব শুরু করিয়া দিল। সকলে মিলিয়া আনন্দে উদ্বাহু হইয়া নাচিতে লাগিল। স্থবিরা রূঠাও। মনে হইল তাহার আনন্দই সর্বাধিক। ন্যুব্জ দেহটাকে মহা উৎসাহে টানিয়া তুলিয়া সে তাহার সন্তান-সন্ততির সহিত নাচিতে লাগিল—নাচিতে নাচিতে বার বার সে সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'বল্গা হরিণ, বল্গা হরিণ, চল আমরা দুইজনে এবার একসঙ্গে থাকিব। আমরা পুত্র-কন্যা দৌহিত্র-দৌহিত্রীর দেহ-অরণ্যে এইবার আমরা পাশাপাশি বাস করিব। জল-ভল্লুক এবং বল্গা হরিণ এবার পাশাপাশি থাকিবে। আর তাহাদের ছাড়াছড়ি হইবে না। অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, আর হইবে না। আর আমাকে রোগে ভুগিয়া মরিতে হইবে না। মাটির কৃমিকীটেরা আর আমার দেহ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে না। আমার ছেলেমেয়েদের দেহে, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের নবীন অঙ্গে অঙ্গে আমি এবার চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব। ওরে পুঠা, তুই বড় ভাল, তোর মানুষ আজ বল্গা হরিণ ডাকিয়া আনিয়াছে! তুই বড় ভাল। তোর হাঁসও এইবার আসিবে, গণ্ডারও আসিবে। আমি তোর গণ্ডারকে পাঠাইয়া দিব। আর দেরি নয়, আমাকে তোরা এইবার মুক্তি দে, আমি চলিয়া যাই, আমি তোদের নবীন জীবনে চলিয়া যাই, বল্গা হরিণের সঙ্গে চলিয়া যাই—'

এইসব বলিতে বলিতে বৃদ্ধা রূঠা হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্রমাগত নাচিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একটি অল্পবয়স্কা ক‌ুমারী রূঠাকে আসিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'যাইবার আগে বলিয়া যাও আমি কী হইব। আমি তো স্বপ্নে কাহাকেও দেখি নাই।'

রূঠা কাহাকেও মাছ, কাহাকেও শ্বেত ভল্লুক, কাহাকেও হংস, কাহাকেও আর কোনো জন্তু হইতে বলিল। যাহারা স্বপ্নে বিশেষ কোনো জন্তুকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহারাও সে কথা আসিয়া রূঠার কানে কানে বলিল।

রূঠা আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'আমি তোমার ভিতরে গিয়া এবার বাস করিব। আমি আর ওই বল্‌গা হরিণ। আমাদের ভালভাবে থাকিতে দিবে তো? যত্ন করিবে তো?'

প্রত্যেকেই মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দিব।'

যতবার রূঠা এই সমর্থন পাইল ততবার যেন তাহার উত্তেজনা বাড়িতে লাগিল। তাহার নৃত্য ক্রমশ উদ্দাম হইতে উদ্দামতর হইয়া উঠিল। সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, 'আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে মুক্তি দাও।' ক্রমশ তাহার চিৎকারে চতুর্দিকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরাও নাচিতেছিলাম। রূঠার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে রূঠার পুত্রকন্যারাও অট্টনাদ করিতেছিল।

মধ্যে পড়িয়াছিল বল্লমবিদ্ধ বিরাট বল্‌গা হরিণটা। তাহার শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল শৃঙ্গ, তাহার বক্ষের রক্তাক্ত ক্ষত, তাহার আকাশমুখী নিষ্পলক দৃষ্টি, রৌদ্রালোকিত তুষারপ্রান্তরে নৃত্যপরা অসভ্য মানব-মানবী পরিবৃত তাহার সেই সৌম্য শবদেহ সেদিন যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল তাহা আজ তোমরা বোধহয় কল্পনাও করিতে পারিবে না। ছবিটা হয়তো কল্পনা করিতে পারিবে, কিন্তু সেই উন্মাদনাটা অসভ্য মানবের পরলোক-প্রবণতার সেই আদিম উৎসবটার পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আমিও নাচিতেছিলাম, রূঠাও নাচিতেছিল। নাচ কতক্ষণ চলিয়াছিল তাহা মনে নাই, হঠাৎ রূঠা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইতেই নাচটা থামিয়া গেল। পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রূঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দিক্ষু একটা মুগুর লইয়া ছুটিয়া আসিল এবং সজোরে রূঠার মাথায় আঘাত করিল। রূঠা মরিয়া গেল। মরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িল এবং তাহার গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। সকলকে সরাইয়া দিক্ষু অবশেষে রূঠার দেহটা বাহিরে টানিয়া আনিল এবং পাথরের একটা বড় ছোরা দিয়া সেটাকে টুকরা টুকরা করিতে লাগিল। বল্‌গা হরিণটাকেও কুচি কুচি করা হইল। রূঠার মাংস ও বল্‌গা হরিণের মাংস একসঙ্গে মিশাইয়া সেই মিশ্রিত মাংস একটু একটু করিয়া প্রত্যেকে খাইল। অবশ্য পুঠা ছাড়া। দিক্ষু আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি লইবে কি? তুমি কি'

পুঠার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, 'লইব বই কি, আমিও যে জল-ভল্লুক।'

সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। করিল না কেবল লুং, রূঠার এক দৌহিত্রী। সে-ই কেবল চোখ বড় বড় করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রথম যেদিন ইহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল সেই দিনই লুংয়ের চোখে এই দৃষ্টি দেখিয়াছিলাম। সে আশা করিয়াছিল যে, আমি বোধহয় জল-ভল্লুক নই। আমাকে লইয়া সে হয়তো নতুন সংসার পাতিতে পারিবে। সে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর পুঠার দিকে চাহিল। পুঠা সাড়ম্বরে দিক্ষুর নিকট বর্ণনা করিতেছিল আমি কিরূপ দক্ষতার সহিত বল্‌গা হরিণটা শিকার করিয়াছিলাম। বল্‌গা হরিণ না পাইলে সেদিন এ উৎসব হইত না, রূঠার

ছেলেরা বল্‌গা হরিণ পায় নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমিই সেদিনকার উৎসবের নায়ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সকলেই প্রশংসে দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেছিল। কেবল লুংয়ের দৃষ্টিতে যাহা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা প্রশংসা নয়—ঈর্ষা। লোভ ও ঈর্ষার একটা হিংস্র সমন্বয়। ইহাতে কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম না, গোপনে গোপনে আনন্দই অনুভব করিতেছিলাম। তন্বী লুংয়ের নবোদ্ভিন্ন যৌবনের দিকে চাহিয়া আমিও প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম। লোভ মানুষকে চিরকাল বিপথে লইয়া গিয়াছে। এই লোভ আমারও সর্বনাশ করিল।

পুঠার সহিতই বাস করিতে লাগিলাম। বাঘিনী যেমন তাহার শাবককে আগলায় পুঠাও তেমনি আগলাইয়া বেড়াইত, একদণ্ড চোখের আড়াল করিত না। উপর্যুপরি নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর আহার পাইয়া আমার শরীরে আবার অসুরের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হইয়াছিলাম বলিয়াই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক আমার শরীর আয়তনে ইহাদের শরীর অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। দৈর্ঘে-প্রস্থে ইহাদের কেহই আমার সমকক্ষ ছিল না।

...কিছুদিন পরে আমি আবার একটা বল্‌গা হরিণ শিকার করিলাম। তুষার-প্রান্তরের শেষ সীমায় দিগন্ত বিস্তৃত যে প্রকাণ্ড জলরাশি ছিল, সেখান হইতে প্রায়ই আমি নানা রকম মৎস্যও শিকার করিয়া আনিতাম। আমার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। নিজের কর্মনিপুণতায় আমি ক্রমশ ইহাদেব মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিলাম এবং একদিন ইহাদের দলপতি হইয়া পড়িলাম। দিক্ষুই এতদিন দলপতি ছিল। কিন্তু যেদিন দিক্ষু শ্বেত ভল্লুকের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না. যেদিন আমি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ভল্লুকটাকে মারিয়া তাহাকে বাঁচাইলাম, সেদিন হইতেই সকলে আমাকে দলপতিরূপে স্বীকার করিয়া লইল। এমন কি দিক্ষু নিজেও। সে যুগেও শক্তিই ছিল প্রভুত্বের নিয়ামক। দিক্ষু অনুভব করিয়াছিল, আমার নিকট নতিস্বীকার না করিলে আমি যে কোনো মুহূর্তে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি। সমস্ত দলটাই আমার সপক্ষে। নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আমি যে দিক্ষুকে বাঁচাইয়াছিলাম, তাহা মহত্ত্বের প্রেরণায় নহে, সমস্ত দলের চক্ষে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করিবার জন্য। সেই অসভ্য যুগেও মহত্ত্বের সম্মান ছিল, তাই মহৎ না হইয়াও আমি মহৎ সাজিতে চাহিয়াছিলাম। দিক্ষুকে বাঁচাইবার পর হইতে আমাকে সকলে বিশেষ একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখিতে লাগিল। আমি যে তাহাদের মধ্যে আসিয়াছি, ইহাতে তাহারা গর্ব অনুভব করিত। বিশেষ করিয়া পুঠার গর্বের অন্ত ছিল না যে আমি তাহার আবিষ্কার, যে আমি বিশেষ করিয়া তাহারই সম্পত্তি, সেই আমি যে নিত্য নতুন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শৌর্যের পরিচয় দিতেছিলাম, ইহা সে যেন নিজেরই গৌরব বলিয়া মনে করিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে আমি একটি প্রকাণ্ড জলচর জীবকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা ছুঁড়িয়াছিলাম। বর্শাটা লইয়া জানোয়ারটা জলের তলায় অন্তর্ধান করিয়াছিল। তাহারই সন্ধানে আমরা সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় শ্বেত ভল্লুকটা আসিয়া দিক্ষুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে।

সকলেই ভয় পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গেল, আমিও গিয়াছিলাম, কিন্তু পুঠার ইঙ্গিতে আমাকে থামিতে হইল। লুংও ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতেছিল, আমি কেমন যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম, হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইল। প্রস্তর-ছুরিকাটা দৃঢ়হস্তে চাপিয়া ভল্লুকটার দিকে ছুটিয়া গেলাম এবং তাহার পিঠের উপর লাফাইয়া পড়িলাম। ভল্লুকটা দিক্ষুর উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, আর একটু দেরি হইলে তাহাকে শেষ করিয়া দিত, কিন্তু আমি পিঠের

উপর ছুরি বসাইয়া দিতে সে ঘুরিয়া আমাকে তাড়া করিল। আমার দিকে ফিরিতেই আমি ত্বরিৎ হস্তে তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিলাম। তবু সে নিরস্ত হয় নাই। তাহার সহিত রীতিমত মল্লযুদ্ধ করিয়া তবে তাহাকে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল।

তাহার দন্ত ও নখরাঘাতে আমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, পরে কয়েকদিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু রণে ক্ষান্ত দিই নাই। তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। রক্তাক্ত দেহে সেদিন যখন মৃত ভল্লুকটাকে টানিতে টানিতে লইয়া দলের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, সেই দিনই সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আমার ললাটে অদৃশ্য তিলক পরাইয়া দিল। সেইদিন হইতেই আমি দলপতি হইয়া গেলাম।

..এইভাবেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। আরও হয়তো কিছুকাল কাটিত, কিন্তু পুঠার প্ররোচনায় যামনেই যে মিথ্যাচার করিয়াছিলাম তাহাই আমার কাল হইল। পুঠার কথায় নিজেকে জল-ভল্লুক রূপে পরিচিত করিয়া যে গোষ্ঠীতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহা রূঠার গোষ্ঠী। সে গোষ্ঠীতে স্ত্রী পুরুষ সকলেই জল-ভল্লুক। সে গোষ্ঠীর আইন অনুসারে কোনো স্ত্রী জল-ভল্লুক কোনো পুরুষ জল-ভল্লুকের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না। যদি কেহ করে প্রাণদণ্ড তাহার শাস্তি। ধরা পড়িলে দলের অন্য সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে। রূঠা, পুঠা এবং ডিংঘার মা নাকি কাহার নিকট শুনিয়াছিল যে, হুংজুরা হুংজু হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ তাহাদের সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হয়। তাহার পর একদিন হঠাৎ তিনি কেমন যেন ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে অজ্ঞান হইয়া খানিকক্ষণ পড়িয়া ছিলেন, তাহার পর যখন জ্ঞান হইল তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন। চোখ বড় বড় করিয়া মাথার চুল টানিতে টানিতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমার ছেলেরা আমার মেয়ের নিকট হইতে তফাত যাও, আমার মেয়েরা ছেলেদের নিকট হইতে তফাত থাকো।'—ক্রমাগত এই এক কথাই বলিতে বলিতে আবার তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অজ্ঞান অবস্থাতেও এই একই কথা বলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রূঠা পুঠা, ডিংঘার অনেকগুলি ভাই ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল দিঘড়া। মাতৃবাক্য অবহেলা করিয়া এই দিঘড়া নাকি জোর করিয়া ডিংঘার সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল; ফলে দুই দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সকলে এত ভয় পাইল যে, বাকি ভাইগুলি রূঠা-পুঠা-ডিংঘার সংস্রব ত্যাগ করিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া গেল। রূঠা-পুঠা-ডিংঘাও তখন তাহাদের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সোজা পূর্বমুখে চলিতে শুরু করিল। তাহাদের মা নাকি বলিয়াছিলেন যে, যেদিক হইতে সূর্য উঠিয়া আমাদের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, বিপদে পড়িলে সেইদিকেই যাইতে হয়। রূঠা-পুঠা-ডিংঘা তিন দিন তিন রাত্রি পূর্বমুখে চলিয়া অবশেষে জিম্ভন পরিবারের সাক্ষাৎ পায়। এই পরিবারের স্থাপয়িত্রী জিম্ভনের নাম অনুসারেই যদিও এই বংশের নামকরণ হইয়াছিল, কিন্তু আসলে উহার ছিল মৎস্য। জিম্ভন মৎস্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। এক যাদুকর তখন তাহাকে মৎস্য বংশ স্থাপন করিতে নির্দেশ দেয়। রূঠা-পুঠা-ডিংঘাও এই পরিবারে আশ্রয় লইয়া জিম্ভনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ বংশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু বেশিদিন তাহারা জিম্ভন পরিবারে থাকিতে পায় নাই। জিম্ভন পরিবারের লাফুর সহিত রূঠার ঘনিষ্ঠতা যখন বেশি রকম প্রকট হইয়া পড়িল, জিম্ভনের পুত্র শিকাং যখন সর্বসমক্ষেই একদিন পুঠাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল, ডিংঘার জন্য যখন জিম্ভন যুবকদের মধ্যে প্রায় কলহ

আরম্ভ হইল, তখন জিম্বন রাঠা-পুঠা-ডিংঘাকে আর নিজ পরিবারে আশ্রয় দিতে পারিল না। লাফু ও শিকাংকে লইয়া রাঠা-পুঠা-ডিংঘা একদিন সরিয়া পড়িল। ডিংঘাকে লইয়াও পরে রাঠা-পুঠার মুশকিল হইয়াছিল, কারণ ডিংঘার স্বভাব নাকি খুব উগ্র ছিল, সে প্রকাশ্যভাবেই রাঠা-পুঠার নিকট হইতে লাফু শিকাংকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। তাহার পর লালহংস দলের সহিত ইহাদের পরিচয় ঘটিল একদিন শিকার করিতে গিয়া। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। হংস গোষ্ঠীর লোকেরা রাঠা-পুঠা-ডিংঘার সহিত মিলিবার জন্য প্রায়ই আসিত। কিন্তু সহসা একদিন ডিংঘাকে লইয়া হংস দলের একটি যুবক পলায়ন করিল। তাহার পর এই হংস দলের সহায়তায় ডিংঘা টিট্টিভ বংশ স্থাপন করিয়াছে। এখন এই টিট্টিভ গোষ্ঠীর সহিত জল-ভল্লুক এবং রোমশ গণ্ডারদের কলহ। রাঠা-পুঠার অনেক সন্তান টিট্টিভদের কবলে পড়িয়া নিহত হইয়াছে। রাঠার দলের অনেক পুরুষকে টিট্টিভ যুবতীরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমি এই ইতিহাস শুনিয়াছিলাম লুংয়ের মুখে। শুনিবার ইতিহাসটিও অদ্ভুত। একটা গোটা মাছ তাড়াতাড়ি গিলিতে গিয়া পুঠার গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছিল। সেদিন তাই সে নিশীথ-অভিযানে বাহির হইতে পারে নাই। আমি একাই বাহির হইয়াছিলাম। অতিশয় সন্তর্পণে পা টিপিয়া ঘুমন্ত পুঠাকে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম লোভের বশবর্তী হইয়া। সকলের অগোচরে একদিন একটি জল-ভল্লুককে খাইয়াছিলাম। সে মাংস আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু আমি নিজেকে জল-ভল্লুক বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলাম, সেই হেতু আমার প্রকাশ্যে জল-ভল্লুকের মাংস খাইবার উপায় ছিল না। পুঠাও আমাকে প্রকাশ্যে খাইতে বারংবার মানা করিয়াছিল। পুঠার সহিত নিশীথ-অভিযানে যখন বাহির হইতাম, তখন একদিন পুঠার সম্মতি লইয়াই একটি জল-ভল্লুকের শাবককে গলাধঃকরণ করি। পুঠা সম্মতি দিয়াছিল, তাহার কারণ, সে জানিত যে আমি সত্য সত্যই জল-ভল্লুক নহি, ভান করিয়াছি মাত্র। যাহারা প্রকৃত জল-ভল্লুক তাহারাই জল-ভল্লুকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য। পুঠা রোমশ গণ্ডার, তাহারও জল-ভল্লুকের মাংস খাইতে বারণ নাই, কিন্তু সে-ও কখনও প্রকাশ্যে জল ভল্লুকের মাংস আহার করিত না। আমাকেও আহার করিতে দিত না। যে বন্য উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা এতদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছি, এই বিধি-নিষেধবদ্ধ সমাজে আশ্রয় পাইয়া তাহা প' ' পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছিল সত্য, কিন্তু সমাজকে না মানিয়া উপায় ছিল না। অতীতের উদ্দাম বন্ধনহীন জীবনের জন্য মাঝে মাঝে আকুলতা জাগিলেও একথা স্বীকার করিতেছি যে, বিধি-নিষেধ : নিতেও নিতান্ত মন্দ লাগিতেছে না। গোপনে এই বিধিনিষেধ অমান্য করার মধ্যেও একটা নতুন ধরনের আনন্দ ছিল, তাহাও ক্রমশ আবিষ্কার করিতেছিলাম। ঘুমন্ত পুঠাকে ফেলিয়া যখন বাহির হইয়া আসিলাম, একটা নতুন ধরনের উন্মাদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত নতুন একটা অনুভূতি সমস্ত সত্তাকে যেন উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি। চাঁদ তখনও ওঠে নাই, আকাশে অগণ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে। মনে আছে, আকাশ-ভরা নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া সেই দিনই বোধহয় প্রথম বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, অসংখ্য চক্ষু ওই বিরাট্ দৈত্যটা হুমড়ি খাইয়া কি দেখিতেছে। আকাশকে একটা দৈত্যরূপেই কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাও তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছিল যে, দৈত্য হইলেও শত্রু নয়, বন্ধু। শত্রু হইলে আমাদের এতদিন অনায়াসে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারিত। মাঝে মাঝে যখন চটিয়া যায়, তখন বজ্র নিক্ষেপ করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই প্রসন্ন থাকে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কেহ কোথাও নাই। চন্দ্রোদয় আসন্ন। তুষার প্রান্তরের শুভ্রতা অন্ধকার ভেদ করিয়া আবছাভাবে দেখা যাইতেছে। নক্ষত্রালোক অপূর্ব রহস্যালোক সৃজন

করিয়াছে। সহসা মৃদু ক্রন্দন-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, সেই পরিচিত ধ্বনি, জল-ভল্লুকের শাবকের আহ্বান...। শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। বেশি দূর যাইতে হইল না। অল্প দূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, একটি বৃহৎ জল-ভল্লুক (যাহাকে তোমরা আজকাল সীল বল) কয়েকটি শাবক লইয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ পাইয়া হুড়মুড় করিয়া সব কয়টিই জলে নামিয়া গেল। নিতান্ত শিশুটি পারিল না, তাহাকে আমি ধরিয়া ফেলিলাম এবং অবিলম্বে আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। সে-যুগে রহিয়া-সহিয়া কিছু করিবার উপায় ছিল না। বিলম্ব করিলেই বিপদ ঘটিত।

...তবু বিপদ ঘটিয়া গেল। তখনও আমার খাওয়া হয় নাই, মুণ্ডটা তখনও অভক্ষিত রহিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ আমার পিছন দিক হইতে কে যেন আমাকে জাপটাইয়া ধরিল। চিৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলাম না, সে আমার গলা ধরিয়া আমার পিঠের দিকে ঝুলিয়াই রহিল এবং পরমুহূর্তে খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। আবার লাফাইয়া উঠিলাম এবং এক ঝটকায় তাহাকে ভূপাতিত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাণ্ডও ঘটিল। এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। পূর্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিতেছিল। জ্বলন্তনয়না লুংকে চিনিতে পারিলাম। দেখিলাম লুংয়ের প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কৌতুকও আভাসিত হইয়াছে। সে নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, 'তুমি না জল-ভল্লুক? তবে জল-ভল্লুক খাইতেছ যে?' আমি কী উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। 'আমি যদি এখন গিয়া সকলকে বলিয়া দি'—লুংয়ের চোখের দৃষ্টি কৌতুকে নাচিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে আমার মনে যে বাসনা জাগিয়া উঠিল তাহা ভয়ানক। ইচ্ছা হইল, লুংকে হত্যা করিয়া জলে ফেলিয়া দিই। সহসা তাহার গলাটা চাপিয়া ধরিতে গেলাম, কিন্তু ফসকাইয়া গেল। কলহাস্যে তুষার প্রান্তকে সচকিত করিয়া লুং ছুটিতে লাগিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিলাম। শুধু অনুসরণ নয়, অনুনয়ও করিতে লাগিলাম।

'লুং শুনিয়া যাও। তোমাকে সত্য কথা খুলিয়া বলিব। কোনো ভয় নাই, ফিরিয়া এস। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতেছি, চলিয়া যাইও না, ফিরিয়া এস।'

লুং কিন্তু ফিরিল না। ঘাড় ফিরাইয়া দুই একবার সে আমার দিকে চাহিল বটে, কিন্তু ফিরিল না। দেখিতে দেখিতে সে একটা প্রকাণ্ড তুষার-স্তূপের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আর তাহার অনুসরণ করা বৃথা ভাবিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। আর একটা বরফ-স্তূপের উপর গিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, এখন কি করা উচিত। লুং যদি গিয়া সব কথা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার প্রাণসংশয়। ইহাদের নিয়ম অনুসারে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা গুরুতর পাপ এবং সে পাপের শাস্তি প্রাণদণ্ড। দিক্ষু যদিও ভয়ে ভয়ে আমার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু মনে মনে সে আমার উপর প্রসন্ন নয়। দলের সকলে আমাকে মানিতেছে। কিন্তু আমি জল-ভল্লুক হইয়া লুকাইয়া জল-ভল্লুক হত্যা করিয়া আহার করিয়াছি—এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িলে কেহই আমাকে মানিবে না। সকলেই আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পুঠাও আমাকে আর বাঁচাইতে পারিবে না। এখন একটিমাত্র পথ খোলা আছে—পলায়ন। কিন্তু কোথায় পলাইব? এই তুষার-প্রান্তরের তিন দিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি। আর একদিকে বহু দূরে একটা অরণ্য আছে শুনিয়াছি, যে অরণ্যে হুংজু থাকে, যে অরণ্যের অভিমুখে সেদিন বল্‌গা হরিণের দলকে যাইতে দেখিয়াছি। জলরাশি অতিক্রম করিয়া যাওয়া অসম্ভব। ওই অরণ্যের দিকেই যাইতে হইবে। হুংজুর ঝুঁকিয়া পড়া বিকট চেহারটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল; পুঠা

বলিয়াছিল, হুংজু যদি ধরিতে পারে, মাথাটা কড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবে। কিন্তু তাহাকে ধরা দিব কেন? তাহার নাগালের মধ্যে আসিব কেন? দূর হইতে বর্শা ছুঁড়িয়া আমিও তাহাকে হত্যা করিব, আমিই তাহার মাথাটা চিবাইয়া খাইব। বর্শা দেখিয়া সেদিন হুংজু ভয় পাইয়াছিল—তাহার পলায়মান মূর্তিটা চোখের ওপর ভাসিয়া উঠিল— মনে হইল সে যত বলবানই হোক না কেন, তাহাকে আমি পরাজিত করিবই। বল্‌গা হরিণের দলও আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল। ঠিক করিলাম, অরণ্যের দিকেই যাইব। পুঠা আমাকে যে বর্শা, ছোরা, বর্মাবরণ এবং কাষ্ঠপাদুকা দিয়াছিল, তাহা তো সঙ্গেই আছে, তবে আর কালবিলম্বের প্রয়োজন কী? দেরি করিলেই বরং বিপদ, লুং এতক্ষণ হয়তো সব কথা সকলকে বলিয়া দিয়াছে। উঠিতে যাইব এমন সময় বরফ স্তূপের অপর পার্শ্বে চাপা হাসি শুনিতে পাইলাম। তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ছুটিয়া পার্শ্বে গিয়া দেখিলাম লুং দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল—

'তুমি আমাকে ডাকিতেছিল কেন? সত্যিই কী সত্য কথা খুলিয়া বলিবে? বল না।'

'বলিতে পারি যদি তুমি কাহাকেও না বল।'

'পুঠাকেও না?'

লুংয়ের চোখের দৃষ্টি পুনরায় সকৌতুকে নাচিতে লাগিল। আমার দিকে ভ্রূভঙ্গি করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। চতুর্দিকে তুষারধবল নির্জনতা, জ্যোৎস্না তাহার তন্বী দেহকে ঘিরিয়া যে মোহিনী মায়া সৃজন করিতেছিল, আমি নির্বাক হইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। সহসা আমার মুখ দিয়া কোনো কথাই সরিল না। লুংয়ের কণ্ঠস্বরে পুনরায় আশ্বস্থ হইলাম।

'পুঠাকেও বলিব না?'...আবার সে প্রশ্ন করিল।

'পুঠাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। সে সব কথা জানে।'

'বেশ। কাহাকেও তাহা হইলে বলিব না। কিন্তু ইহার জন্য আমাকে কী দিবে?'

'কী চাও বল।'

'হাঁটু গাড়িয়া এমনি করিয়া বস।'

কেমন করিয়া বসিতে হইবে, তাহা সে দেখাইয়া দিল। তেমনি করিয়াই বসিলাম।

'এইবার হাত জোড় করিয়া প্রতিজ্ঞা কর—আমি শপথ করিতেছি, এখন হইতে লুংয়ের পদানত থাকিব। সে যখন যাহা বলিবে, তাহাই করিব।'

শপথও করিলাম। আমার শপথ শেষ হইতে না হইতে লুং আসিয়া আমার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেইদিনই লুং আমাকে তাহাদের সব ইতিহাস খুলিয়া বলিল। সেদিন সেই জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন তুষার প্রান্তরে নামহীন সমুদ্রতটে বসিয়া সবিস্ময়ে এক অজ্ঞাতপূর্ব সমাজের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই আমার জীবন দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটি ধারা লুংকে লইয়া গোপনে, আর একটি ধারা পুঠার সহিত প্রকাশ্যে।

আমাকে লইয়া পুঠার গর্বের অন্ত ছিল না, যদিও সে স্বল্পভাষিণী ছিল, বাক্যের সহায়তায় যদিও সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু তাহার চোখ-মুখের ভঙ্গিতে, বিস্ময়োৎক্ষিপ্ত ভ্রূ-যুগলে, উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে যাহা প্রকাশিত হইত, তাহাই যথেষ্ট ছিল। শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে দলের মধ্যে আমিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি যে পুঠার বিশেষ সম্পত্তি, পুঠাকে সামান্যতম তাচ্ছিল্য করিলে যে আমি অবিলম্বে তাহার প্রতিশোধ লইব, তাহা পুঠা আকারে-ইঙ্গিতে

সকলকেই সর্বদা বুঝাইয়া দিত। বলা বাহুল্য ইহাতে কেহ সন্তুষ্ট হইত না। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষগণ বিশেষ করিয়া এই জন্যই গোপনে গোপনে আমার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। দিক্ষুই ছিল সেই ষড়যন্ত্রের নেতা। দিক্ষুর রাগের আর একটা কারণ ছিল; কুক্কুরবংশীয়া যে যুবতীটিকে দিক্ষু কিছুকাল পূর্বে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, জল-ভল্লুক সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে প্রত্যেক পুরুষ জল-ভল্লুকেরই তাহার উপর দাম্পত্য অধিকার ছিল। নাংবা কিন্তু আমাকে ছাড়া বিশেষ কাহাকেও প্রশ্রয় দিত না। এমন কি দিক্ষুকেও না। সামাজিকভাবে নাংরার সহিত আমার মেলামেশা করিবার অধিকার থাকিলেও প্রকাশ্যে আমি তাহা করিতে পারিতাম না পুঠার ভয়ে। পুঠা আমাকে আগলাইয়া বেড়াইত। অন্য কোনো রমণীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিলে তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া কাঁপিতে থাকিত, চোখের দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিত, গর্‌র গর্‌র করিয়া একটা চাপা আওয়াজও গলার ভিতর হইতে বাহির হইত। মুখে কিন্তু সে কিছু বলিত না। কারণ সামাজিকভাবে আমাকে মানা করিবার তাহার কোনো অধিকার ছিল না। লুংয়ের সম্বন্ধে ছিল, কিন্তু নাংরার সম্বন্ধে ছিল না। কুক্কুরবংশের প্রতিষ্ঠাত্রী নাংরা সমস্ত জল-ভল্লুক সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। যদিও আমি প্রকাশ্যভাবে নাংরার সাহচর্য করিতে পারিতাম না, কিন্তু নাংরা যে আমার সঙ্গলাভের জন্য উম্মুখ, একথা দিক্ষুর অবিদিত ছিল না। সে সন্দেহ করিত যে গভীর রাত্রে আমি বোধহয় নাংরার সহিত সাক্ষাৎ করি। এ সন্দেহ মিথ্যা নয়। পুঠাকে লুকাইয়া আমি প্রায় প্রত্যহই গভীর রাত্রে বাহির হইয়া পড়িতাম, একথা সত্য। লুংয়ের সহিতই অধিকাংশ দিন সাক্ষাৎ হইত। নাংরার সহিতও মাঝে মাঝে হইত। লুং প্রায় প্রত্যহই কোনো না কোনো তুষার স্তূপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিত। নাংরার সহিত আমার যে মাঝে মাঝে সংস্রব ঘটিয়া থাকে তাহা লুং জানিত, কিন্তু আপত্তি করিত না। আপত্তি করিবার উপায় ছিল না। নিজের স্বার্থের জন্যই সে নাংরাকে সহ্য করিত।

এইভাবেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু অন্যায় বেশি দিন গোপন থাকে না। পুঠা ক্রমশ আমাকে সন্দেহ করিতে লাগিল। একদিন আমি ও লুং এক তুষার গহ্বরে বসিয়া তাহার দিগন্ত-বিদারী আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তাহা আর্তনাদ অথবা অট্টহাস্য তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। আর্তনাদই হউক অথবা অট্টহাস্যই হউক, সে চিৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছিল; দিগন্তবিস্তৃত তুষারপ্রান্তর যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আমরা উভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিষ্ঠকায়া পুঠাকে সকলেই ভয় করিত। তাহার গায়ে অসুরের শক্তি। টিট্টিভ সম্প্রদায়ের সহিত এক যুদ্ধে সে বর্শা চালনা করিয়া একাই নাকি বহু শত্রু নিপাত করিয়াছিল। লুং আমার কানে কানে বলিল,—'পুঠা যদি আমাকে তোমার সহিত দেখিতে পায়, এখনই আমাকে হত্যা করিবে। তাহার তীক্ষ্ণ দাঁত আমার গলায় বসিয়া গেলে আমি আর বাঁচিব না। শিকাংয়ের জন্য পুঠা ইতিপূর্বে বহু কিশোরীকে, বহু যুবতীকে হত্যা করিয়া তাহাদের রক্তপান করিয়াছে। পুঠার অত্যাচারেই ডিংঘা পলাইয়া গিয়া টিট্টিভ দল সৃষ্টি করিয়া এখন আমাদের শত্রুতাসাধন করিতেছে। পুঠা যেন আমাকে তোমার সঙ্গে না দেখে, তুমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাও।

আমিও বুঝিতেছিলাম যে পুঠা আমাকেই খুঁজিতেছে। আমার সহিত দেখা হইলেই সে থামিয়া যাইবে। গুঁড়ি মারিয়া গহ্বর হইতে বাহির হইলাম এবং গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পুঠা যে কোন দিকে আছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম

না। আমি কেন পুঠাকে একা ফেলিয়া রোজ রাত্রে বাহির হইয়া যাই, তাহা পুঠা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উত্তরে আমি তাহাকে একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—'হুংজুর খোঁজে বাহির হই। হুংজুকেই একাকী বধ করিব, ইহাই আমার উচ্চাশা। কাহারও সাহায্য আমি লইতে চাই না, এমন-কি তোমারও না। সেইজন্য আমি একা বাহির হইয়া যাই।'

ইহাতে পুঠা গর্ববোধ করিয়াছিল। পরদিন সে দলের সকলকে ডাকিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিযাও দিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল সকলকে তাক লাগাইয়া দেওয়া। তাহার পর আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'সত্যিই যদি তুমি এই হুংজুকে হত্যা করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে শুধু আমাদের দলের নয়, এই প্রদেশের সমস্ত দলের অধিপতি বলিয়া গণ্য হইবে। টিট্টিভরাও হয়তো তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে। কারণ এই হুংজুটা সকলের শত্রু। সকলেই ইহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কেহই পারে নাই। এ যেমন ধূর্ত তেমনি বলশালী। কিন্তু ইহার জন্য রাত্রে তোমার একা বাহির হইবার প্রয়োজন নাই। আমার সাহায্য যদি না লইতে চাও আমি সাহায্য করিব না, দূরে দাঁড়াইয়া থাকিব। কিন্তু একেবারে একা বাহির হওয়া নিরাপদ নয়।' ...তবু আমি একা বাহির হইয়াছিলাম।

পুঠার আর্তনাদ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছিল। অট্টহাস্য নয়, আর্তনাদই। মনে হইতেছিল পুঠার আর্ত-হৃদয় যেন একটা শব্দের শূল হইয়া স্তব্ধতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। আমি গিরগিটির মতো বুকে ভর দিয়া চলিতে লাগিলাম। সহসা পুঠার আর্তনাদ থামিয়া গেল। সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পুঠা প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়াই রহিল, আগাইয়া আসিল না। আমিই তাহার নিকট গেলাম।

রুক্ষকণ্ঠে পুঠা প্রশ্ন করিল, 'তুমি আবার একা বাহির হইয়াছ কেন?'

আমি দূরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলাম। যাহা দেখাইলাম, তাহা যে একটা গাছ মাত্র ইহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমি ভান করিলাম যেন ওটাকে হুংজু মনে করিয়া আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। পুঠা এত সহজে ভুলিবার পাত্রী নয়।

'ওটা যে একটা গাছ তাহা আমিও জানি তুমিও জান—'

'ওটা নয়, ওই যে আরও দূরে। এখন আর দেখা যাইতেছে না। চলিয়া গেল—'

পুঠার দৃষ্টি এড়াইয়া দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পুঠা বলিল, 'শোন, এভাবে রাত্রে একা বাহির হইয়া অনিশ্চিত ছায়ার পিছনে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইলে হুংজুকে মারা যাইবে না। এরূপভাবে বাহির হওযার জন্য বিপদও আছে। লুং বা নাংরার পাল্লায় যদি পড়িয়া যাও, সে রাক্ষসীরা তোমাকে শেষ করিয়া ফেলিবে।'

পুঠার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল। সমস্ত নাকটাই কাঁপিতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

'এখন ঘরে ফিরিয়া চল।'

নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পুঠা ফিরিয়া বলিল, 'শোন, হুংজুকে মারিতে হইবে। তুমি একাই পারিবে। কাল তুমি ওই বনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়। আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাইব।'

আমি কাতর কণ্ঠে বলিলাম, 'কিন্তু আমি একাই হুংজুকে মারিতে চাই। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, সে গৌরব হইতে আমি বঞ্চিত হইব।'

'বেশ একাই যাও। আমি কিছুদুর পর্যন্ত তোমাকে আগাইয়া দিব। কিন্তু একা তুমি হুংজুকে কী করিয়া মারিবে তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না।'

'ঠিক করিয়াছি একটা গাছের উপর বর্শা হাতে লুকাইয়া থাকিব। হুংজুকে দেখিতে পাইলেই বর্শা ছুঁড়িব। আমার লক্ষ্য যে কী অব্যর্থ তাহা সকলেই জানে।'

পুঠার চোখের দৃষ্টি গর্বোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'অরণ্যে বেশ ভাল একটা গাছ আছে। দেখাইয়া দিব।'

পরদিন সকালে জানা গেল নাংরার শিশুপুত্রটিকে হুংজু লইয়া গিয়াছে। নাংরা পুত্রটিকে লইয়া গতরাত্রে নাকি বাহির হইয়াছিল। মাছের সন্ধানে জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে হুংজুকে দেখিতে পাইয়া ছুটিতে থাকে। শিশুপুত্রটি তাহার পিঠে বাঁধা ছিল। ছুটিতে ছুটিতে পিঠের বাঁধন আলগা হইয়া শিশুটি মাটিতে পড়িয়া যায়। নাংরা তাহাকে আর তুলিয়া লইবার অবকাশ পায় নাই। তুলিতে গেলে সে নিজেই হুংজুর কবলে পড়িত। জাজা নামে আর একটি মেয়েও অন্তর্ধান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে হুংজু লইয়া যায় নাই; আমরা জানিতাম সে হ্রদ-সর্প সম্প্রদায়ের একটি যুবকের সহিত কিছুদিন হইতে মাখামাখি করিতেছিল। সম্ভবত তাহার সহিত সে চলিয়া গিয়াছে। জল-ভল্লুক-কন্যারা বড় হইলে হয় এইভাবে চলিয়া যাইত কিংবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের ছেলেকে ভুলাইয়া আনিত। বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যারা অন্তর্ধান করিলে সুতরাং কেহ বেশি বিচলিত হইত না। সকলে বলিত, 'সে মানুষ খুঁজিতে গিয়াছে। খুঁজিয়া পাইলে আবার ফিরিয়া আসিবে।' মনের মানুষ লইয়া স্ব-সমাজে ফিরিয়া আসাটা গৌরবের ছিল। কেহ না আসিলে সকলে তাহাকে শক্তিহীনা সমাজত্যাগিনী বলিয়া গালাগলি দিত। সুতরাং জাজার অন্তর্ধানে আমরা খুব বেশি চিন্তিত হইলাম না। নাংরার চিৎকার কিন্তু আমাদের বিচলিত করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, কাঁদিয়া, চিৎকার করিয়া নাংরা সকলের কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, 'আমার ছেলে আনিয়া দাও, আমার ছেলে আনিয়া দাও।' আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া আমাকে বার বার শোকাবেগে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—'তুমি শক্তিমান, তুমি দলপতি, তুমি আমাকে ছেলে আনিয়া দাও, আমার প্রথম পুত্র, প্রথম জল-ভল্লুক, হুংজুর কবলে গেল, তুমি ইহার প্রতিকার কর।'

পুঠা ওষ্ঠাধর নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছিল। সে এইবার কথা বলিল :

'ইহার প্রতিকার হইবে। ও কাল হুংজুকে মারিয়া আনিবে। আমি আজ রাত্রে উহাকে লইয়া গিয়া অরণ্যের প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিব। ও একাই যাইবে, তোমরা কেহ উহার সহিত যাইও না। কাল হুংজু মরিবে।'

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া এই অদ্ভুত ঘোষণা শুনিল।

সেদিন গভীর রাত্রে আমি এবং পুঠা অরণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। পুঠার মুখে একটিও কথা ছিল না, আমিও নীরবে অনুসরণ করিতেছিলাম। আমাদের দুজনেরই সর্বাঙ্গ শ্বেত ভল্লুকের চর্মে আবৃত, দুইজনেরই হস্তে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্মিত বর্শা। ইহা ছাড়া আমার কটিদেশে প্রস্তর-কুঠার এবং প্রস্তর-ছুরিকাও বিলম্বিত ছিল। আশা-আকাঙক্ষায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি চলিতেছিলাম। কাঁচপোকা আরশুলাকে যেভাবে টানিয়া লইয়া যায়, পুঠার অদৃশ্য শক্তি ঠিক তেমনিভাবে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। সেই বিশাল তুষার-প্রান্তরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির চিহ্ন ছিল না। মেঘাবৃত চন্দ্রালোকে সমস্ত প্রকৃতি থমথম করিতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতেছিলাম, সহসা সেই নৈশ-নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিল—কাঁক, কাঁক, কাঁক। পুঠা

থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই শ্বেত হংসদল আবার উড়িয়া চলিয়াছে। আমরা উভয়ে ঊর্ধ্বমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর পুঠা ধীরে ধীরে অঙুলি তুলিয়া আকাশের দিকে নির্দেশ করিল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম যে মেঘটা চন্দ্রকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে ঠিক রোমশ গণ্ডারের মতো। নাকের সম্মুখে ঠিক তেমনি খড়্গ, সর্বাঙ্গে তেমনি রোম। পুঠা বর্শাটা ফেলিয়া ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তুমি একাই যাও, আমি আর যাইব না। অরণ্যে ঢুকিয়া প্রথম যে বড় গাছটা দেখিবে, তাহাতেই উঠিয়া পড়িবে। আমরা শিকার করিতে গেলে উহাতেই প্রথম উঠি। কিছুদুর উঠিয়া গাছের কাণ্ডে একটা গর্ত পাইবে। সেই গর্তে বসিবার স্থান আছে। যাও, আর বিলম্ব করিও না।'

অরণ্য বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, পুঠা নতজানু হইয়া করজোড়ে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে।

অরণ্যে প্রবেশ করিয়াই বড় গাছটি দেখিতে পাইয়াছিলাম। গাছ নয়, মহীরূহ। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বিশাল একটি বৃক্ষরূপী দুর্গ যেন ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বৃক্ষের নিম্নে সূচিভেদ্য অন্ধকার। সূচিভেদ্য কিন্তু নীরব নয়, ঝিল্লীরবে মুখরিত। আমি অন্ধকারে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর হাত বাড়াইয়া বৃক্ষের কাণ্ডটা কোথায় খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ খুঁজিবার পর পাওয়া গেল। বৃক্ষারোহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কোনো শব্দ না করিয়া অতিশয় সন্তর্পণে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলাম। কাণ্ডটি পরিধিতে বেশ বড়, দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরা যায় না। কিন্তু গাছের কাণ্ডে হাত বুলাইতে বুলাইতে কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম যে, মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা আছে। তখন পুঠার কথা মনে পড়িল। পুঠা বলিয়াছিল, 'আমরা শিকার করিতে গেলে উহাতেই প্রথম উঠি।' মনে হইল উহারাই তাহা হইলে খাঁজ কাটিয়া রাখিয়াছে।

খাঁজে পা রাখিয়া সেই বিশাল বৃক্ষের স্কন্ধদেশে আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়াই অভিভূত হইয়া পড়িলাম, কে যেন আমাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। লুং। সে অনেক আগেই আসিয়া গাছে উঠিয়া বসিয়াছিল।

লুং আমার কানে কানে বলিল, 'চিৎকার করিও না। হুংজু বাহির হইয়াছে, আশেপাশে ঘুরিতেছে।' রুদ্ধশ্বাসে পাশাপাশি দুইজনে বসিয়া রহিলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই। শকুনের চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখি প্রভাত হইতেছে। লুং আমার কোলের উপর বসিয়া আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই উপরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয় স্পন্দন থামিয়া গেল। দিক্ষু তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া উপরের ডালে বসিয়া আমার দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র তাহার মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। সর্পের মতো তর্জন করিয়া চাপা কণ্ঠে সে বলিল, 'ঘৃণ্য আগন্তুক, এইবার তোকে হাতেনাতে ধরিয়াছি। বিশ্বাসঘাতককে কী করিয়া শিক্ষা দিতে হয় এইবার তোকে দেখাইব।'

সে বর্শা তুলিতেই আমি লাফাইয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লুং গাছের নিচে পড়িয়া গেল। আমিও মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু লুং-এর দিকে ফিরিয়া চাহিবার আমার অবসর ছিল না। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছিলাম। কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ ছুটিবার পরই দিক পরিবর্তন করিতে হইল। একটা খোলা জায়গায় আসিয়া

দেখি একটা রোমশ গণ্ডার দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাকে দেখিয়া তাড়া করিল না, সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বিপরীত দিকে ছুটিতে থাকিলাম। ছুটিতে ছুটিতে এক ঘন ঝোপের নিচে আশ্রয় লইলাম। সেখানে কিছু আহারও জুটিয়া গেল। বিচিত্র-পক্ষ একটি বন্য হংসী একটি প্রকাণ্ড নীড়ে বসিয়া ডিমে তা দিতেছিল। হংসীটাকে ধরিতে পারিলাম না, কিন্তু ডিমগুলি উদরসাৎ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই হইহই চিৎকার উঠিল। দিক্ষুর দল চিৎকার করিতেছে। কেন করিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। হয়তো তাহারা রোমশ গণ্ডারটাকে দেখিয়াছে, কিংবা হয়তো আমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমি ঝোপের ভিতর দিয়া কখনও গুঁড়ি মারিয়া কখনও গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যে দিক হইতে চিৎকারটা আসিতেছিল সে দিক হইতে যত দূর যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে চিৎকারটা আর শুনিতে পাইলাম না। ঝোপের মধ্যেই চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। দুই হাতের আঙুলগুলি ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছিল। তাহাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিয়াও যখন দিক্ষু দলের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন ঝোপ হইতে সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সম্মুখে একটা খোলা প্রান্তর রহিয়াছে। তাহার পর আবার অরণ্য। ছুটিয়া প্রান্তরটা পার হইয়া পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু দূরে গিয়াই দেখি বিস্তীর্ণ জলরাশি। নামহীন এক সমুদ্রতটে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সমুদ্রতটে বসিয়াই কি লুংয়ের মুখে ঝাঠা-পৃঠা-ডিংঘাদের কাহিনী শুনিয়াছিলাম? অন্যমনস্ক হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরক্ষণেই মট করিয়া একটা শব্দ হইল। ভারী ওজনের কোনো জন্তু নিশ্চয়ই এইদিকেই আসিতেছে। জলের ধারেই একটি ছোট গাছ ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার উপর উঠিয়া পড়িলাম। এদিকে-ওদিকে চাহিতে সহসা দেখিতে পাইলাম, হুংজু আসিতেছে। তাহার স্কন্ধে লুং-এর মৃতদেহ! হুংজু তাহার একটা পা চিবাইতেছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং প্রাণপণে সাঁতরাইতে লাগিলাম। বরফ-শীতল জলে সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া যাইতেছিল, তবু নিরস্ত হইলাম না। অনিশ্চিতের উদ্দেশে দুর্বার দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিতে লাগিলাম।

চার

তাহার পর বহু শতাব্দী কাটিয়াছে। আমি কিন্তু মরি নাই। বহু উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া মৃত্যুহীন জীবনের অনন্ত প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমি বিবর্তিত হইয়াছি, কিন্তু মরি নাই। কোন্ ঘাটে কতক্ষণ ছিলাম তাহার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অস্পষ্টতার কুয়াশা ভেদ করিয়া যে ছবিটি মনে জাগিতেছে তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

...বরফের বিভীষিকা আর নাই। চারিদিকে আবার শ্যামশোভা দেখা যাইতেছে। বরফ গলিয়া বহু নদনদীর সৃষ্টি হইয়াছে। নবীন অরণ্য নবীন শ্যামলতায় নবযুগের বল্‌গা হরিণের দলকে আকৃষ্ট করিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে বেশি শীত পড়ে, তখন বল্‌গা হরিণের দল সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বল্‌গা হরিণই তখন আমাদের জীবন-ধারণের প্রধান উপায়। তাহাদের অনুসরণ করিয়া আমরাও চলি।

...সেদিন আমি এক উপল-বহুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া একটি কুটির অভিমুখে চলিয়াছিলাম। আমার আকৃতি ও বেশ দুই-ই পরিবর্তিত হইয়াছিল। আকৃতির ঠিক বর্ণনা দিতে পারিব না। তবে নদীর জলে নিজের যে ছায়া প্রতিফলিত দেখিতাম তাহা ঠিক ভীত চকিত বন্য জন্তুর ছবি নহে। আত্মবিশ্বাসের নিগূঢ় শক্তি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম। আত্মপ্রতিষ্ঠার মর্যাদাবোধ আমার মুখভাবে গতিভঙ্গিতে আসন্ন মনুষ্যত্বের আভাস দিতেছিল। আমি আর হিংস্রজন্তু-তাড়িত প্রকৃতি-বিপর্যস্ত অসহায় পশুমাত্র ছিলাম না। নিজের শক্তিবলে নিজের নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং সে বার্তা আমার নিজের অজ্ঞাতসারে আমার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আমার দক্ষিণ স্কন্ধে বিলম্বিত ছিল একটি শ্বেত ভল্লুকের চর্ম, বাম স্কন্ধে ধনুক। কটিদেশে ছিল বল্‌গা-হরিণ চর্মনির্মিত প্রশস্ত কটিবন্ধন। কটিবন্ধনের একধারে ঝুলিতেছিল একটি প্রস্তর কৃপাণ, আর একধারে কয়েকটা তীর গোঁজা ছিল। মাথার দীর্ঘ কেশ আর অবিন্যস্ত ছিল না, লতা দিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়াছিলাম।

...প্রভাতের অরুণাভায় যে মেঘমালা অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, একটা প্রখর বাতাসে সহসা সেগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মনে হইল অগ্নিশিখা আকাশ ব্যাপিয়া উড়িতেছে। থানকুর কথা মনে পড়িল, বৃদ্ধা থানকুর কাছে অনেক গল্প শুনিয়াছি। থানকু বলে আদিম পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মানুষের মধ্যে ক্রমশ পাপ প্রবেশ করিল। সেই পাপের ফলেই পাপী মানুষেরা জন্তু-জানোয়ার-প্রস্তর-বৃক্ষে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যাহার যেমন স্বভাব সে তাহাই হইয়াছে। হিংসুক বিশ্বাসঘাতক সর্প হইয়াছে, বীর্যশালী পাপীরা বাঘ-সিংহ-গণ্ডার হইয়াছে। ওই অগ্নিবর্ণ মেঘেরাও কি মানুষ ছিল একদিন? কে জানে? কিছুক্ষণ ছিন্নভিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রক্তমেঘগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রখর বাতাসে আমার রুক্ষ শ্মশ্রু উড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার আমি চলিতে লাগিলাম। আমি চলিয়াছিলাম পাত্রীর সন্ধানে। এই স্থানেই ঘর বাঁধা যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নারী চাই। বৃহার কন্যা জেলমাকে দেখিয়াছিলাম। তাহারই উদ্দেশে এই অভিযান। তাহাকে কৌশলে চুরি করিবার জন্য যাইতেছিলাম না, বলপূর্বক হরণ করিবার জন্যও নহে, যাইতেছিলাম তাহার পিতার নিকট প্রার্থীরূপে। বিনিময়ে বৃহাকে যাহা দিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহারা লোভ বৃহা সম্বরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছিল না। এই অপরিচিত অঞ্চলে বৃহার মতো একজন লোককে যদি আত্মীয়রূপে পাইতে পারি, আমার অনেক সুবিধা হইবে।

একদল বল্‌গা হরিণের পিছু পিছু এই অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। একা আসি নাই, আমাদের সমস্ত দলটাই আসিয়াছিল। খাদ্যের অনুসরণ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানোই তখন আমাদের কাজ ছিল। বন্য ঘোড়া, বন্য মহিষ, বাইসন, হরিণ, শূকর ইহারাই ছিল আমাদের জীবনের প্রেরণা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা যেখানে যায়, আমরাও সেখানে যাই। আমাদের দলের কয়েকজন লোক সর্বদা ইহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। কয়েকজন শিকার করে। কেহ কেহ ফাঁদ পাতে। ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই এইভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বল্‌গা হরিণকে অনুসরণ করিয়া তুষারের দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। সেই জীবনধারাই অনুসরণ করিতেছি।

...আমি দল হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কয়েকদিন পূর্বে একটা ম্যামথের সন্ধান পাইয়া আমাদের দলের সকলে নদীর ওপারে গিয়া গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিল। ম্যামথ তখন দুষ্প্রাপ্য, এবং সেই জন্য লোভনীয়। ম্যামথ শিকার করার একটা প্রবলতর কারণও ছিল।

ম্যামথেরা বল্‌গা হরিণের দলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিত। কোনো ম্যামথ আসিলে বল্‌গা হরিণরা সে-বন ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। নিজেদের স্বার্থের জন্যই ম্যামথটাকে শিকার করিয়া বল্‌গা হরিণের রক্ষণাবেক্ষণও আমাদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। আমাদের যেদিন নদীর ওপারে চলিয়া যাইবার কথা, ঠিক সেইদিন ভোরে আমি একা উঠিয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। হঠাৎ একটা বল্‌গা হরিণ দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। কিছুদূর গিয়া তাহাকে মারিলাম বটে, কিন্তু একটা গর্তে পড়িয়া গিয়া পায়ে গুরুতর আঘাতও পাইলাম। অনেকক্ষণ উঠিতে পারিলাম না। তাহার পর কোনোক্রমে মৃত হরিণটাকে টানিতে টানিতে নিকটবর্তী একটা বৃক্ষকোটরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমার সঙ্গীরা ভাবিয়াছিল, আমি বোধ হয় সঙ্গেই আছি। আমাদের দলে শতাধিক লোক ছিল, আমি যে তাহাদের মধ্যে নাই, ইহা সহসা আবিষ্কার করা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

পায়ের ব্যথা সারিতে বেশ বিলম্ব হইয়া গেল। ভাগ্যে বল্‌গা হরিণটাকে মারিতে পারিয়াছিলাম, তাহা না হইলে অনাহারেই হয়তো কাটাইতে হইত। এই কয়দিন বৃক্ষ-কোটর-বাস কিন্তু নিষ্ফল হয় নাই। এই সময়ই জোলমাকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। জোলমার চোখের তারা নীল। এমন তো আর কখনও দেখি নাই।

ভাবিয়াছিলাম পায়ের ব্যথা কমিলে নদীর পার হইয়া দলে গিয়া যোগদান করিব। কিন্তু পায়ের ব্যথা কমিবার পর নদীতীরে গিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কয়েক দিন পূর্বে যে নদী শীর্ণকায়া ছিল, সহসা তাহা দুকূল প্লাবিনী হইয়াছে। এত খরস্রোতা যে হাঁটিয়া পার হওয়া অসম্ভব। সাঁতার দিয়া হয়তো পার হইতে পারিতাম, কিন্তু নদীতরঙ্গে এক অদ্ভুত ভাষা শুনিলাম। একটা তীব্র বায়ু হু-হু করিয়া বহিতেছিল। নদীর তরঙ্গদল নাচিতেছিল, আর বলিতেছিল—না, না, না।

বহু দূরে চক্রবালনিবদ্ধ পর্বতশ্রেণীর দিকে চাহিলাম। এই নদী উহারই বুকের ভাষা, উহারই বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যেন ওই পর্বত-দেবতারই আদেশ শুনিলাম। শান্ত শীর্ণ নদীকে সহসা তটপ্লাবিনী উন্মাদিনী করিয়া দেবতা কিসের ইঙ্গিত করিয়াছেন। পাহাড়টার দিকে সভয়ে বহুক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়াছিলাম। মনে হইল পর্বত-দেবতার অমোঘ বিধান নীরব ভাষায় যেন আমার অন্তরে সঞ্চারিত হইল, 'যে দল তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহারা তোমার আত্মীয় নয়। তুমি এই পারেই আত্মীয় পাইবে। নতুন জীবন আরম্ভ কর, পুরাতন জীবনে আর ফিরিয়া যাইও না।'

জোলমার কথা মনে পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—আর ফিরিয়া যাইব না? পিকি, বনটু, বোহিলা, ঘুনু, জামাইকিনা, দোস্কি প্রভৃতি বহু রমণীকে লইয়া যে সংসার পাতিয়াছিলাম, সেখানে আর ফিরিব না? সহসা মনে হইল পিকি, বনটু, বোহিলা, জামাইকিনা, দোস্কিরা আমার একার নয়। বহু পুরুষের সঙ্গে তাহাদের সংস্রব। জোলমার সঙ্গে তো কোনো পুরুষকে দেখিলাম না। এ অঞ্চলে পুরুষই বেশি দেখিতেছি না। তবে কি জোলমা আমার একারই হইবে? যদিও এ চিন্তা সে যুগে কল্পনাতীত ছিল, তবু ক্ষণিকের জন্যও এই সম্ভাবনাটা চিত্তকে পুলকিত করিয়া তুলিল। বিমূঢ় স্তম্ভিত হইয়া অনেক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে শুনিতে পাইলাম—না, না, না। দেবতারও কি ইহাই অভিপ্রায়? অন্তরের বিচিত্র বাসনা যেন বাঙ্ময় হইয়া আবার কানে কানে বলিতে লাগিল—নিশ্চয় তাই। তাহা না হইলে আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে এই দুরতিক্রম বাধা কে সৃজন করিল? কেন সৃজন করিল? মনে পড়িল ইক্‌ঘার

স্বপ্ন-বিধান অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে মাতৃ-কুলজাত নিন্‌কির প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলাম, তাহার গর্ভে একটি সন্তানও হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পরিণাম যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অতি ভয়ানক। ঝড়ে গাছ পড়িয়া আমার দশটি সন্তান নিহত হইল, নিন্‌কিকে বাঘে খাইল, আমি নিজেও ভয়াবহ্ পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। নিদারুণ মারী-গুটিকায় সর্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। বহুকাল শয্যাগত থাকিয়া ওই ইক্‌ঘার উদ্দেশে বহু অর্ঘ্য উপহার দিয়া কোনোক্রমে আবার প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছি, ইক্‌ঘার কাছে শপথ করিয়াছি আর কখনও দেবতার বিধান অগ্রাহ্য করিব না। পর্বতের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মূর্তিমান গাম্ভীর্য। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে বাজিতেছে—না, না, না, না।

...ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। স্থির করিয়া ফেলিলাম দেবতার বিধান অগ্রাহ্য করিব না, করিবার উপায়ও ছিল না। আবার হঠাৎ জোলমাকে দেখিলাম। বনের মধ্যে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে যে অবস্থায় ছিল তাহাতে অনায়াসে তাহার উপর বলাৎকার করিতে পারিতাম। কিন্তু বলাৎকার করিবার সাহস ছিল না। ভয় জোলমাকে কিংবা জোলমার পরিবারবর্গকে নয়, ভয় নিজের মধ্যে ছিল। জ্ঞান হইয়া অবধি কিংবদন্তী শুনিয়াছি, পুরাকালে প্রবল পরাক্রান্ত দলপতি বিহাড়া শবরী ওকাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিল। শবরী ওকার মাথার প্রত্যেকটি চুল নাকি নাগিনীতে রূপান্তরিত হইয়া বিহাড়া বংশের প্রত্যেককে দংশ করিয়াছিল, প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু নাকি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে পরিণত হইয়া ছারখার করিয়াছিল তাহার রাজ্যকে। সেই অশ্রু-স্ফুলিঙ্গগুলি আজও আকাশের লক্ষ লক্ষ তারায় জাগিয়া আছে। লক্ষ চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছে কোথাও কেহ কাহাকেও বলাৎকার করিতেছে কি না। করিলেই আকাশ হইতে তাহার মাথায় বজ্র পড়িবে। নাগিনীরাও লুকাইয়া আছে, পৃথিবীর গর্তে গর্তে তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রে মৃত্যুদণ্ড বহন করিয়া। ধর্ষণকারী নিস্তার পাইবে না। শবরী ওকা সতর্ক দৃষ্টিতে প্রত্যেককে নরনারীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

না, বলাৎকার করিবার সাহস আর ছিল না। তাহার দ্বারে গিয়া প্রার্থী হইতে হইবে। বৃহার পরিচিত বিতং আমাকে পরামর্শ দিয়াছিল। বনে ঘুরিতে ঘুরিতে বিতং নামক অদ্ভুত যুবকটির সহিত দেখা হইয়াছিল। বল্‌গা হরিণের রঙ, মাথায় হরিণের শিং বাঁধা। সে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'শেষ হরিণটিকে তুমিই বোধহয় মারিয়া ফেলিয়াছ। এ বনে আর হরিণ নাই। থাকিলে নিশ্চয় আসিত।'

তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। 'আমি হরিণ মারিয়াছি তুমি কী করিয়া জানিলে?'

'আমি দেখিয়াছি যে। শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের হইয়া আমিই তো এ বনে বল্‌গা হরিণদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করি। আমাদের এলাকায় যখন হরিণদের দল ঢোকে আমি বৃহাকে খবর দিই।'

বৃহা আমাদের যাদুকর। সে হরিণের ছবি আঁকে, সেই ছবির কানে কানে কী সব বলে। অদ্ভুত লোক সে! বৃহাকে চেন না? তাহার মেয়ে জোলমাকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, নীল চোখ—'

'দেখিয়াছি।'

'তাহার বাবাই বৃহা। বৃহা অসাধারণ লোক। সে বীব, সে যাদুকর, সে ছবি আঁকে। জোলমার মা মারা যাইবার পর সে আর দ্বিতীয় কোনো স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসে নাই। জোলমার মা-ও অদ্ভুত লোক ছিল। এদেশের মেয়ে ছিল না সে। বহুকাল পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে সে যে কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না।' এই

কথা বলিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বিতং হাতের ও পায়ের সাহায্যে হরিণের মতো তুড়ুক তুড়ুক করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিলাম।

'শোন। বৃহা কোথায় থাকে, তাহার সহিত আলাপ করিতে চাই। আমি বিদেশি—'

তুড়ুক করিয়া বিতং ঘুরিয়া বসিল এবং আমার মুখের দিকে মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, 'সুবিধা হইবে না, সে বড় শক্ত ঠাঁই—'

'কেন?'

'জোলমাকে বিবাহ করিতে চাও তো? তাহা সহজে হইবার নয়। বীরত্বের এবং শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বৃহা জোলমাকে দিবে না। আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারি নাই।'

'বৃহা তোমাকে কী করিতে বলিয়াছিল?'

'জোলমার মা যে গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল, বৃহা সেই গুঁড়িটিকে নিজের গুহার সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড পাথরের ওপর সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। তাহাতে সে নানা রকম রঙ মাখায়। কখনও লাল, কখনও কালো, কখনও হলুদ, কখনও নানা রঙের সমন্বয়। আমাকে সেই গুঁড়িটা পিঠে করিয়া তুলিতে বলিয়াছিল। আমি পারি নাই। বিতং হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

'তোমাকে এমনভাবে সাজাইয়াছে কে?

'বৃহা। আমি হরিণ সাজিয়া বনে বনে হরিণের সন্ধানে ভ্রমণ করি। আমার ডাকে হরিণেরা সাড়া দেয়। তখন আমি ডাকিতে ডাকিতে আমাদের এলাকার দিকে চলিতে থাকি। হরিণের দলও আমার পিছু পিছু আসিয়া লাফাইয়া পাহাড়ে চড়ে, তখন আমরা তাহাদের তাড়া দিই।'

'এটা কাহাদের এলাকা?'

'এটা সকলের। তোমাদের এলাকা এবং আমাদের এলাকার মধ্যে এই যে বন এটা সকলের। ইহাতে সকলেই শিকার করিতে পারে।'

'আমরা যদি তোমাদের এলাকায় ঢুকিয়া শিকার করি—'

'তাহা কেন করিতে যাইবে। তোমাদের এলাকাতেই তো যথেষ্ট শিকার আছে।' বিতংয়ের চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'কিন্তু যদি কেউ চুরি করিয়া করে!'

'চোরের শাস্তি মৃত্যু।' মুচকি হাসিয়া বিতং আর একবার হরিণের ডাক ডাকিয়া বনে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিতেছিল। আমি আবার তাহাকে বাধা দিলাম।

'আমি তোমাদের এলাকায় বাস করিতে চাই, কারণ আমার দলের লোকেরা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিতে চাই।'

'তাহা হইলে বৃহার সহিত দেখা কর। বৃহার মা গৌ যদি তোমাকে মনোনীত করে, বৃহা আপত্তি করিবে না।'

'বৃহা থাকে কোথায়?'

'অরণ্যের প্রান্তে একটা কুটির দেখিবে, তাহাই বৃহার আস্তানা। বৃহা থাকে একটা গুহার মধ্যে, ওই কুটিরটা গুহা-প্রবেশের পথ মাত্র। সাবধানে যাইও, বৃহার কুকুরটা ভীষণ রাগী।'

'বৃহা কিসে সন্তুষ্ট হয় বল তো?'

'তুমি ছবি আঁকিতে পার?'

'পারি। এই দেখ, আমার এই প্রস্তর-কুঠারের হাতল আমি প্রস্তুত করিয়াছি।'

বিতং তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া কাছে আসিল এবং আমার প্রস্তর-কুঠারটা দেখিতে লাগিল।

'হরিণের শিং দিয়া করিয়াছ?'

'হ্যাঁ।'

'ইহার উপর হরিণের মুখটি তুমিই খুদিয়াছ?'

'হ্যাঁ।'

'এইটাই গিয়া বৃহাকে উপহার দিও, সে খুশি হইবে। আর গল্প করিব না, যাই।'

বিতং বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

...উপল-বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে করিতে একটা কথা মনে হওয়াতে একটু সান্ত্বনা পাইলাম। জোলমা এবং আমি ভিন্ন-কুলজাত। ইহারা সকলেই শ্যেনপক্ষী। যদিও জোলমার বাহুমূলে শ্যেন পক্ষীর চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, কিন্তু উড্ডীয়মান একটা শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়া জোলমা শুইয়া পড়িয়াছিল তাহা দেখিয়াছি। আমি ব্যাঘ্রবংশীয়, আমার অতি-অতি-বৃদ্ধ-মাতামহী ব্যাঘ্রকেই আমাদের কুলদেবতা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জোলমার সহিত আমার বিবাহের কোনো বাধা নাই। এই সুখদায়ক চিন্তাটি মনে মনে রোমন্থন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কাছাকাছি আসিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম বৃহার কুটির হইতে ধূমরেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া নির্গত হইতেছে। মানুষ যে এই অঞ্চলে নিজ নিজ এলাকা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে, এই খবরটাও ধূমের মতো অন্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি এখন যে মাটিতে পদার্পণ করিয়াছি, তাহা যে আমার নয়, অপরের, এই ধারণাটাই বড়ই অদ্ভুত মনে হইতেছিল। বৃহার কুটিরোদ্গত ধূমরেখার দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা আনন্দে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। সর্পাকৃতি ধূমরেখা দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। থানকু বলে ইহা অতি শুভ লক্ষণ। দক্ষিণগামী সর্প মঙ্গল সূচনা করে। এ বিষয়ে যে গল্প শুনিয়াছি তাহা মনে পড়িল। সোৎসাহে পুনরায় অগ্রসর হইলাম। কিছু দূর গিয়াই কিন্তু আমাকে বর্শা উদ্যত করিতে হইল। বৃহার ভীষণাকৃতি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসিল। কুকুরটা বাঁধা ছিল, বেশি দূর আগাইয়া আসিতে পারিল না। এ রকম কুকুর পূর্বে কখনও দেখি নাই। কান দুইটা নেকড়ে বাঘের মতো। গায়ের ভালুকের মতো লোম। তাহার বন্ধন রজ্জুটাও অদ্ভুত ধরনের। প্রকাণ্ড একটা কাঠের এক দিকে চামড়ার একটা ফিতা, সেটি কুকুরটির গলায় বাঁধা আছে, অন্য দিকে বাঁধা আছে প্রকাণ্ড একটা পাথর। কুকুরের ডাক শুনিয়াই বৃহা বাহির হইয়া আসিল। তাহার হস্তে প্রস্তরের একটি বর্শা। আমি বর্শা উদ্যত করিয়াছিলাম বলিয়া সে-ও বর্শা উদ্যত করিল। আমি বর্শা নামাইয়া লইলাম, সেও নামাইয়া লইল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি দিয়া যাহা ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা আশ্বাসজনক নহে। সে দৃষ্টি রোষদীপ্ত।

বৃহার হাতে বর্শা ছিল বলিয়া যে আমি দমিয়া গিয়াছিলাম তাহা নয়। সে যুগে বিনা অস্ত্রে ঘর হইতে কেহ বাহির হইত না। আমি মানুষ না হইয়াও হিংস্র জন্তুও হইতে পারিতাম। সে যুগে হিংস্র জন্তুরাও মানুষের মতই গুহা খুঁজিয়া বেড়াইত আশ্রয় পাইবার আশায়। জন্তুরাই ছিল আদিম গুহাবাসী। মানুষ তাহাদের গুহাচ্যুত করিয়া নিজেরাই সেই গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। গুহাহীন জন্তুরা তাহাদের গুহা পুনরায় অধিকার করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু অগ্নি-আবিষ্কারক মানুষ, প্রস্তরায়ুধে বলীয়ান মানুষ, তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিত নিজের নবার্জিত শক্তিবলে। বৃহা দেখিতেছি পশুকেও নিজের পাহারার কাজে লাগাইয়াছে। শত্রু বন্ধু হইয়াছে।

জন্তু জানোয়ারেরাই সেকালে ছিল আমাদের জীবনের প্রধান প্রেরণা। একদল ছিল শত্রু, একদল ছিল মিত্র। উভয় দলই আমাদের জীবনের ধর্মকর্মে উপাদান যোগাইত। তাহাদের আমরা যে কেবল বধই করিতাম তাহা নয়, পূজাও করিতাম। বংশের প্রতীকও করিতাম। শুধু পশু কেন, গাছ পাথর কিছুই আমাদের কাছে তুচ্ছ ছিল না। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা সে যুগে সমাজ পত্তন করিয়াছিলাম। হিংস্র ব্যাঘ্র সিংহ ম্যামথ হিপোপটেমাসরাই আমাদের অস্ত্র নির্মাণে প্রবুদ্ধ করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের বিজ্ঞানী করিয়া তুলিতেছিল, উহাদের মধ্যেই আমরা অজ্ঞাত প্রবল শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া অপ্রত্যক্ষ লোকের আভাস পাইতেছিলাম, উহারাই আমাদের রূপকথার দৈত্য-দানবে রূপান্তরিত হইতেছিল। প্রাণী মাত্রেই তখন আমাদের কৌতূহলী মনকে নাড়া দিত। প্রাণী সম্বন্ধে সুতরাং আমরা সর্বদাই সচেতন থাকিতাম। প্রতি জন্তুর সঞ্চরণ শব্দ, সঞ্চরণ পথ, কণ্ঠস্বর, গায়ের গন্ধ আমাদের সুবিদিত ছিল। এ বিষয়ে যাহার জ্ঞান যত গভীর সে-ই তত শ্রদ্ধাস্পদ ছিল সে যুগে। সে-ই হইত দলের নেতা, সে-ই হইত পুরোহিত, সে-ই হইত চিকিৎসক। ইক্‌থার অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে মেঘের দিকে চাহিয়া বলিয়া দিতে পারিত এইবার হাঁসের দল উড়িয়া আসিবে। বাতাসে গন্ধ শুঁকিয়া বলিতে পারিত বন্য মহিষের দল আসিয়াছে কি না। মানুষও মানুষের কম শত্রু ছিল না সেকালে। যদিও আমরা সমাজের পত্তন করিয়াছিলাম, কিন্তু সমাজের বাহিরের যে কোনো লোককে সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম। বন্ধুত্বের অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে শত্রু মনে করিতাম। সেকালে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ এত বেশি রকম আত্মকেন্দ্রিক ছিল যে, সে সমাজটাকে একদেহ বলিলে একটুও অত্যুক্তি হইবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে রক্তসম্পর্কে সম্পৃক্ত ছিল। এক বা একাধিক নারীর সন্তান-সন্ততিরাই এক-একটি সমাজগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিত। রক্তের সম্পর্ককেই আমরা আত্মীয়তার একমাত্র বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিতাম। বাকি সব ছিল শত্রু।

সুতরাং বৃহা যে বর্শা হাতে করিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সহসা বৃহা পর্বত প্রকম্পিত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, 'কে তুমি, কী চাও, অবিলম্বে নিজের পরিচয় দাও, তাহা না হইলে—'

আবার সে বর্শা উত্তোলন করিল। তাহার কপালে মুখে বুকে বহু বর্ণের চিত্র অঙ্কিত। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। আকাশের পটভূমিকায় তাহার বিশাল দেহ, শ্মশ্রুগুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখ, জটাসম্বদ্ধ বিরাট মাথা দেখিয়া সত্যই আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি কটিবন্ধ হইতে প্রস্তর-কুঠারটি খুলিয়া তাহার পাদমূলে ছুঁড়িয়া দিলাম এবং বর্শা উন্নত করিয়া তাহার আনুগত্য স্বীকার করিলাম। তাহার পর একপায়ে দাঁড়াইয়া দুই হাত আকাশের দিকে তুলিয়া রহিলাম। সেকালে ইহাই আমাদের আত্মসমর্পণের ভঙ্গি ছিল। বৃহা খানিকক্ষণ নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর আমার দিকে একটু আগাইয়া আসিল, আমিও খানিকটা আগাইয়া গেলাম। বৃহা বুঝিয়াছিল যে, শত্রুতাসাধন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে আমার দিকে আর একটু অগ্রসর হইল, আমিও হইলাম। এইভাবে যখন পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া গেলাম, তখন আমি আমার গাত্রাবরণ ভল্লুকচর্মের অন্তরাল হইতে মৃত একটি শশক বাহির করিয়া তাহার পদপ্রান্তে রাখিলাম। শশকটি পূর্বদিন শিকার করিয়াছিলাম এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। সহসা চাহিয়া দেখি গুহার ভিতর হইতে এক পলিতকেশা বৃদ্ধা আমার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র সে মুণ্ডটা ভিতরে টানিয়া লইল। কুকুরটা ক্রমাগত ডাকিতেছিল। জোলমা বাহিরে আসিয়া তাহাকে গুহার ভিতরে লইয়া চলিয়া

গেল। আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না। কুকুরটা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। কুকুরকে ভীষণ বন্য জন্তু হিসাবেই এতকাল দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা যে পোষা যায়, এই প্রথম দেখিলাম। একটা কথা মনে পড়ে একটু ভয়-ভয়ও করিতে লাগিল। মনে হইল, জোলমা কোনো মায়াবিনী নয় তো। থানকুর কাছে গল্প শুনিয়াছিলাম, জিলাং পাহাড়ের তুষারাবৃত অন্ধকার গুহায় পিপি নামে এক মায়াবিনী বাস করে। মন্ত্রবলে মানুষকে জন্তুতে পরিণত করিবার শক্তি তাহার আছে। গভীর জঙ্গলে যে সব নরভুক মানুষ বাস করে, পিপি নাকি তাহাদের নেত্রী। মানুষের মাংস যখন ভাল লাগে না তখন সে মানুষকে নিজের অভিরুচি অনুসারে অন্য জন্তুতে পরিবর্তিত করিয়া লয়, তাহার পর তাহাকে মারিয়া খায়। তাহার অনুচরেরা মানুষ ধরিয়া তাহাকে দেয়, সে তাহাকে কখনও শূকর, কখনও হরিণ, কখনও সজারু, কখনও শশক—যখন যে জন্তুতে খুশি রূপান্তরিত করিয়া খায়, একবার নাকি লোভে পড়িয়া একটা মানুষকে ম্যামথে পরিণত করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল। ম্যামথটাকে সামলাইতে পারে নাই। জিলাং পর্বতে তুষারাবৃত অঞ্চলে সেই দুর্দান্ত ম্যামথটা নাকি এখনও চতুর্দিকে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। একজন মানুষকে বিষধর সর্পে রূপান্তরিত করিয়া সে নাকি বিপক্ষ দলের নেত্রী সিংনাকের গুহায় ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল। পিপি মায়াবিনীর অনেক গল্প থানকুর কাছে শুনিয়াছি। জোলমা সেই রকম মায়াবিনী নয় তো?

'টাহা, টাহা, টাহা—'

বৃহার কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। দেখিলাম গুহা হইতে আর একটি পুরুষ বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহারও সর্বাঙ্গে লাল ও হলুদ রঙের চিত্রবিচিত্র করা। বৃহা অঙ্গুলি সঙ্কেতে মৃত শশকটা দেখাইয়া দিতেই টাহা সেটা লইয়া গুহার ভিতরে চলিয়া গেল।

বৃহা তখন আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কেনই বা আসিয়াছ?'

নিজের পরিচয় দিলাম এবং কী করিয়া যে দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও বলিলাম।

'আমার কাছে তোমার কী প্রয়োজন?'

'পর্বতের আদেশে আমি আর পুরাতন সমাজে আর ফিরিতে পারিব না। আমাকে এই অঞ্চলেই থাকিতে হইবে। তাই তোমার কাছে সাহায্যের জন্য আসিয়াছি। আমাকে আশ্রয় দাও—'

'পর্বতের আদেশ তুমি শুনিয়াছ।'

'নদীর জলে যাহা শুনিলাম, তাহা পর্বতের আদেশ বলিয়া মনে হইল। ইহার অন্য কোনো অর্থ সম্ভব কি না জানি না।'

বৃহা আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আমার মধ্যে সে যে অসাধারণ কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহার পর গুহার দিকে চাহিয়া ডাকিল, 'গৌ গৌ—'

সেই পলিতাকেশা, বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিল। বৃহা তখন আমার পরিচয় দিয়া প্রশ্ন করিল, 'এ যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কি না।'

গৌ নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কয়েকবার মাথা নাড়িল। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার গুহার ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কোনো কথা বলিল না।

বৃহা আমাকে প্রশ্ন করিল, 'আমার কী সাহায্য তুমি চাও?'

প্রথমেই জোলমার কথা বলাটা সমীচীন মনে হইল না। বলিলাম, 'বাস করিবার জন্য আমার একটা স্থান চাই। গুহা হইলেই ভাল হয়।'

অনুসন্ধান করিলে গুহা পাওয়া যাইবে। জিকাটু পাহাড়ে একটা ভাল গুহা আছে শুনিয়াছি। টাহা জানে। গৌ কি বলে আগে শোনা যাক।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৌ গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে একটি তিত্তির পক্ষী রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া আসিল টাহা, তাহার হাতে একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড. টাহার পিছনে পিছনে আসিল জোলমা, তাহার হাতে একটা চামড়ার উপর কিছু শুষ্ক পত্র।

জোলমা পত্রগুলি একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া ঢালিয়া দিল। টাহা জ্বলন্ত কাঠের সাহায্যে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। আগুনের শিখা লেলিহান হইয়া উঠিবামাত্র গৌ তিত্তিরের মুণ্ডটা মুচড়াইয়া ফেলিল এবং মুণ্ডটাকে আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কবন্ধটাকে জোলমার হাতে দিল। জোলমা সেটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর ধরিয়া রহিল। আমি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জ্বলন্ত শিখার ওপর ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতেই অগ্নিকুণ্ড হইতে কৃষ্ণ-সর্পিল ধূমরেখা উঠিতে লাগিল। দগ্ধ রক্তের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলাম পলিতকেশা গৌ ধূমরেখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এবং বিড়বিড় করিয়া কী যেন আওড়াইতেছে। যতক্ষণ রক্ত পড়িল ততক্ষণ জোলমা ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে জোলমার দিকে চাহিয়া ছিলাম। সমস্ত প্রকৃতিই যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ গৌ সামনের মাটিতে দুই হাত দিয়া তিত্তিরের মত ডাকিয়া উঠিল। সেই ডাকে চতুর্দিক সচকিত হইয়া উঠিল যেন। জোলমা তিত্তিরের কবন্ধটা ফেলিয়া দিয়া গুহার মধ্যে চলিয়া গেল। বৃহা এবং টাহা চতুর্দিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, মনে হইল কী যেন একটা খুঁজিতেছে, গৌ তারস্বরে তিত্তিরের ডাক ডাকিয়া যাইতে লাগিল। আমি যে কী করিব ভাবিয়া পাইলাম না। মনে হইল আকাশে অস্বস্তিকর কী যেন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। এক একবার মনে হইতে লাগিল ছুটিয়া পালাই। কিন্তু আমার পা দুইটা যেন মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছিল. চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সহসা বৃহার চিৎকারে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া বৃহা এবং টাহা কি যেন দেখিতেছে। বৃহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। গৌ তিত্তিরের ডাক থামাইয়া হামাগুড়ি দিয়া বৃহার দিকে আগাইয়া গেল। জোলমাও গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমিও গেলাম। গিয়া দেখিলাম, তিত্তিরের ছিন্ন মুণ্ডটি একটি পাথরের ফাঁকে পড়িয়া আছে। গৌ তাহা দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। মুণ্ডটি কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটি চোখ আকাশের দিকে। বৃহা উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। টাহাও করিল। টাহা বৃহার অনুজ। বৃহার প্রতিটি কর্মের অনুকরণ করাই তাহার কাজ। পলিতকেশা গৌ ইহাদের মা। আমি লক্ষ্য করিলাম গৌ নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দৃষ্টি হইতে প্রসন্নতা ক্ষরিত হইতেছে। বুঝিলাম ইহারা সকলেই আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছে। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। দগ্ধ তিত্তির-রক্তের ধূমরেখার মধ্যে, তিত্তিরমুণ্ডের আকাশমুখী দৃষ্টিতে শুভলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। আমাকে বন্ধুরূপে স্বীকার করিয়া লইতে বৃহা পরিবারের আর আপত্তির কারণ নাই। বৃহা আমাকে সাদরে গুহার ভিতর লইয়া গেল। আমি যে শশক মাংস আনিয়াছিলাম. জোলমা তাহা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বৃহা বলিল, কিছু মৃগমাংস এবং কন্দও যেন আমাকে দেওয়া

হয়। জোলমা মাথা নাড়িয়া সে কথার সমর্থন করিল এবং অতিথি সৎকারে তৎপর হইয়া উঠিল।

...জোলমাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। জোলমাও আমার দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একবার মাত্র, দ্বিতীয়বার আর দেখিল না, আমার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলও তাহার ব্যবহারে আর প্রকাশ পাইল না, কিন্তু আমি অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম আমার মনের নিগূঢ়বার্তা তাহার মনেও পৌঁছিয়াছে। কেমন করিয়া করিলাম, তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু করিলাম এবং জোলমার আচরণে কোনো প্রতিবাদ লক্ষ্য না করিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহার আপাত ঔদাসীন্য আমাকে যেন আমন্ত্রণ জানাল।

আহার করিতে করিতে বৃহার গুহা এবং গুহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রকাণ্ড লম্বা গুহা। সমস্তটা দেখা যায় না। গুহায় ঢুকিয়াই দেখিলাম প্রশস্ত অগ্নিকুণ্ড, তাহার পাশেই গোলাকৃতি একটি বড় প্রস্তরখণ্ড। তাহার উপরেই খাবার রাখিয়া আমরা সকলে আহার করিতেছিলাম। আরও ভিতরের দিকে ভস্মপূর্ণ কয়েকটি লম্বা গর্ত ছিল। গর্তের কাছে চর্মাবরণ দেখিয়া অনুমান করিলাম উহাই সম্ভবত ইহাদের বিছানা। আমরাও আমাদের গুহায় ওইরূপ শয্যাতেই শয়ন করিতাম। গুহার দেওয়ালে দেখিলাম বৃহা এবং টাহার অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত আছে। দেওয়ালের আর এক দিকে প্রকাণ্ড একটা বল্‌গা হরিণের ছবি। ছোট ছবি নয়, দেয়াল-জোড়া বিরাট ছবি। একটা বল্‌গা হরিণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে, তাহার পিঠে একটা তীর বিঁধিয়া আছে। বৃহার ক্ষমতায় সত্যই আমি চমৎকৃত হইয়া গেলাম। তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্বতই অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আড়চোখে তাহার দিকে একবার চাহিলাম। দেখিলাম অন্যমনস্ক হইয়া সে শশকের মাংস খাইয়া চলিয়াছে। জোলমা তাহার কানে কানে আসিয়া কী যেন বলিল। বলিতেই তাহার যেন হুঁশ হইল, শশকের সরু সরু হাড়গুলি চুষিয়া একধারে সরাইয়া রাখিল। আমাকেও সসম্ভ্রমে অনুরোধ করিল আমিও যেন হাড়গুলি না চিবাইয়া ফেলি, জোলমা উহা দিয়া ছুঁচ প্রস্তুত করিবে। আমাকে কথাগুলি বলিয়াই আবার সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, টাহা অগ্রেই সরু সরু হাড়গুলি পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বৃহা অন্যমনস্ক হইয়াই আহার শেষ করিল এবং হঠাৎ উঠিয়া গেল। গৌ পূর্বেই গর্তের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং টাহা ছাড়া আমার কাছাকাছি আর কেহ রহিল না। কারণ বৃহার সঙ্গে সঙ্গে জোলমাও তাহার অনুসরণ করিয়াছিল।

টাহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'বৃহা কোথায় গেল?'

'ছবি আঁকিতে।'

'জোলমা?'

'জোলমা আলো ধরিতে গেল।'

ব্যাপারটা যে আমি মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা বোধ হয় আমার চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ টাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের অঞ্চলে কি গুহায় কেহ ছবি আঁকে না?'

'না।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া টাহা বলিল, 'আমাদের এদেশেও কেহ আঁকিত না। জোলমার মায়ের নিকট হইতে বৃহা শিখিয়াছে। বৃহা যেখানে ছবি আঁকে সেখানে গাঢ় অন্ধকার, সেই জন্য

জোলমা সেখানে আলো ধরিয়া থাকে। ইহার জন্য জোলমা একটা গর্ত-করা পাথরের সাহায্যে আলোর ব্যবস্থা করিয়াছে।'

'কি রকম?'

'একটা গর্ত করা পাথরে সে চর্বি ভরিয়া রাখে এবং সেই চর্বিতে শুষ্ক শ্যাওলা গুঁজিয়া দেয়। শ্যাওলাটা জ্বালাইয়া দিলে অনেক্ষণ জ্বলে। আলো হয়।'

আমার কৌতূহল হইল।

'চল গিয়া দেখি।'

'ছবি আঁকিবার সময় বৃহ্য জোলমা ছাড়া আর কাহাকেও কাছে থাকিতে দেয় না। সম্প্রতি এই বনে বন্য মহিষ এবং বন্য ঘোড়ার দল আসিয়াছে, বৃহ্য তাহাদেরই ছবি আঁকিতে ব্যস্ত আছে।'

'ছবি আঁকিয়া কী সুবিধা হইবে?'

'যদি ঠিকমতো ছবি আঁকিয়া বৃহ্য সেই ছবি ঠিকভাবে মন্ত্রপূত করিতে পারে, আমরা সহজে সেগুলি শিকার করিতে পারিব।'

'বল কি?'

'এখানে যখন বসবাস করিবে বলিতেছ স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে'—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া টাহ্য পুনরায় বলিল, 'তুমি বৃহ্যকে যে কুঠারটি উপহার দিয়াছ, তাহার হাতলে যে হরিণের মুখটি আঁকা আছে, তাহা কি তুমি আঁকিয়াছ?'

'হ্যাঁ। আমাদের অঞ্চলে অস্ত্রের হাতলে অনেকেই ছবি আঁকিতে পারে, দেওয়ালে কেহ আঁকে না।'

'আমাকে শিখাইয়া দিবে?'

'চেষ্টা করিব। খুব ধারাল ছোট পাথরের ছুরি দরকার।'

'আমার আছে একটা। দেখিবে?'

টাহার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দেওয়াল হইতে একটি প্রস্তর-ছুরিকা আনিয়া আমাকে দেখাইল।

'চমৎকার ছুরি, ইহাতেই হইবে। আমার থাকিবার একটি গুহা ঠিক করিয়া দাও, তাহার পর তোমাকে শিখাইয়া দিব।'

'বেশ, কালই তোমাকে জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া যাইব। সেখানে ভাল ভাল গুহা আছে শুনিয়াছি। কিন্তু স্থানটা বড় নির্জন, কেহই ও অঞ্চলে যাইতে চাহে না। এমন কি জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত না। আমিও কোনো দিন যাই নাই, কাল সকালে তোমাকে স্থানটা দেখাইয়া দিব।'

'বেশ, এখন চল, তোমাদের গুহার চারিপাশটা ঘুরিয়া দেখি।'

বৃহ্যর গুহার সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি পড়িয়াছিল তাহা খোলা নহে, ডালপালা দিয়া ঘেরা। উপরে ডালপালা দিয়া চালও করা ছিল। দূর হইতে তাই কুটিরের মতো দেখাইতেছিল। গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই আমার নজরে পড়িল একটা স্থান একটু বিশেষভাবে ঘেরা রহিয়াছে।

'ওখানে কি আছে?'

'ওহালির গাছ।'

'বুঝিতে পারিতেছি না।'

'জোলমার মা ওহালি একটা গাছের গুঁড়িতে চড়িয়া রুপিং নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল। বৃহা গুঁড়িটা সুদ্ধ তাহাকে উদ্ধার করে। ওহালি চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গুঁড়িটা ঐ ঘরে আছে। বৃহা খেয়ালখুশি মতো উহাতে রং মাখায়। দেখিবে?'

টাহার সহিত আগাইয়া গেলাম। দেখিলাম গাছের গুঁড়িটার উভয়প্রান্ত দুইখণ্ড উচ্চ প্রস্তরের উপর রাখিয়া সেটাকে মাটির সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। গুঁড়িটার সর্বাঙ্গে নানা বর্ণের ছাপ, সহসা মনে হয় ওটা যেন জীবন্ত কোনো প্রাণী। মনে পড়িল বিরাট একটা ময়াল সাপের গায়ে ওই ধরনের বর্ণসমাবেশ দেখিয়াছিলাম। সবিস্ময়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া গুঁড়িটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। নীল-নয়না জোলমার মা ইহার উপর চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছিল। কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোন্ বংশে তাহার জন্ম?

'ওহালি কোথা হইতে আসিয়াছিল?'

টাহা শ্রদ্ধাভরে আকাশের দিকে বাহু উত্তোলন করিয়া বলিল, 'আকাশ হইতে। ওহালি আকাশ-কন্যা, তাহার চোখে আকাশ ছিল। আকাশ যেমন নানা রঙে ছবি আঁকে ওহালিও তেমনি নানা রঙে ছবি আঁকত। বৃহা তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বৃহাকেও সে ছবি আঁকার কৌশল শিখাইয়া দিয়াছে।'

'জোলমাও কি ছবি আঁকে?'

'জানি না। জোলমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। সে হয় বৃহার কাছে থাকে, কিংবা একা একা থাকে।'

'একা কোথায় থাকে?'

'বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত মেশে না।'

নিমেষের মধ্যে আমি একটা কাণ্ড করিয়া বসিলাম। হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া সেই গুঁড়িটার নিচে বসিয়া কাঁধ দিয়া সেটাকে তুলিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। খুবই ভারী বোধ হইল, কিন্তু আমি যে ওটাকে কাঁধে তুলিতে পারিয়াছি এই গর্বে আমার সমস্ত বুকটা ভরিয়া উঠিল। টাহার দিকে চাহিয়া দেখি ঈষৎ আয়ত আননে সে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে।

'হঠাৎ তুমি ওরকম করিলে কেন?'

'ওহালির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।'

টাহা সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলিল না। আমারও মুখ দিয়া কোনো কথা সরিতেছিল না, আমি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। উভয়ে নীরবে সেই ঘরটা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমিই টাহাকে আবার প্রশ্ন করিলাম, না করিয়া পারিলাম না। কথাটা অনেকক্ষণ হইতেই আমার মনে হইতেছিল।

'এখানে তো কাছে-পিঠে কাহাকেও দেখিতেছি না। শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের লোকেরা কোথায় থাকে?'

'তাহারা ওই যে দূরে পাহাড় দেখিতেছ, ওই পাহাড়ে থাকে। ওই পাহাড়ে অনেক গুহা আছে, প্রত্যেক গুহায় আমাদের দলের লোক থাকে। ওখানে যদি খালি গুহা থাকিত তুমি অনায়াসেই পাইতে পারিতে। কিন্তু ওখানে আমাদেরই স্থানাভাব। জিকাটু পাহাড়ে কয়েকটা গুহা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু ওখানে কেহ যাইতে চায় না।'

'কারণ কি?'

'ও অঞ্চলে প্রায় মৃত পশু দেখা যায়। একদিন একটা প্রকাণ্ড মৃত বাইসনও দেখা গিয়াছিল'।

ইহার পর কণ্ঠস্বর নামাইয়া টাহা বলিল, 'নাগবংশীয় মানুষেরা পূর্বে এ অঞ্চলে থাকিত। শ্যেনপক্ষীদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। নাগদের সবংশে নিধন করিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এ অঞ্চল অধিকার করে। গৌ তখন বালিকা মাত্র। গৌ বলে সেই নাগদের দলপতি প্রেত হইয়া ওই ভ্রিকাটু পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আছে। শ্যেনবংশীয় কেহ গেলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কোনো পশুকেও সে নিজের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। একটাই থাকে—'

টাহার চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। আমিও মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। যে স্থানটা এত বিপজ্জনক বৃহা আমাকে সেই স্থানে বাস করিবার নির্দেশ দিল কেন? কিন্তু আমি যে ভয় পাইয়াছি তাহা টাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না।

'বেশ চল, কাল জায়গাটা দেখিয়া আসা যাক।'

'আমি কেবল দূর হইতে স্থানটা তোমাকে দেখাইয়া দিব, ভিতরে যাইতে পারিব না। শ্যেনপক্ষীদের ওখানে যাওয়া নিষেধ।'

'তাহা হইলে বৃহা আমাকে ওখানে যাইতে বলিল কেন?'

টাহা সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'তুমি তো শ্যেনপক্ষী নও, তোমার হয়তো কোনো বিপদ ঘটিবে না। তুমি আমাকে ছবি আঁকা কখন শিখাইবে। আমার কুঠারের হাতলে একটা ছবি আঁক না দেখি—'

আমরা একটা গাছের তলায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, 'বেশ, এইখানে বসা যাক তাহা হইলে—'

'বেশ, বেশ—'

আগ্রহভরে টাহা বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

টাহা আমার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহার কুঠারের হাতলে একটি হরিণ-মুণ্ডের ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলাম। একটি সূক্ষ্মাগ্র কয়লার টুকরা দিয়া প্রথমে ছবিটা আঁকিয়া তাহার পর ছুরি দিয়া কয়লার দাগে দাগে কাটিয়া সেটি হরিণের শিংয়ের ওপর ফুটাইয়া তুলিলাম। টাহা সবিস্ময়ে বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, কিন্তু নিজে কিছুতেই ছবি আঁকিতে পারিল না। যতবারই চেষ্টা করিল ততবারই হরিণের মুখ না হইয়া অন্য রকম কিছু একটা হইয়া গেল। তাহার ধারণা হইল আমি নিশ্চয় কোনো যাদুশক্তির অধিকারী, বৃহার মতো আমারও উপর কোনো দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ আছে, তাই আমি ছবি আঁকিতে পারিতেছি। আমার প্রতি তাহার ব্যবহার ক্রমশ সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি যখন তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে, আঁকিতে আঁকিতে সে-ও ক্রমশ ঠিক মতো পারিবে তখন সে আমার ভক্ত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'বৃহা কিন্তু আমাকে কখনও একথা বলে নাই। সে কি করিয়া ছবি আঁকে তাহা দেখিতেও দেয় নাই। অথচ আমি সর্বদা তাহার কাছে আছি, তাহার প্রতিটি কার্যের অনুকরণ করিতেছি।'

'তুমি কি বৃহার কাছে থাক? তোমার কি স্বতন্ত্র গুহা নেই?'

'আছে বই কি। আমি শ্যেনপক্ষীদের দলেই থাকি, পাহাড়ে আমার গুহাও আছে। কিন্তু আমাদের দল হইতে বৃহা নিজের সাহায্যকারী হিসাবে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে। বৃহা ওই অন্ধকার গুহায় ছবি আঁকা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। সংসারের কাজকর্ম আমাকেই দেখিতে হয়। দূরের পাহাড় হইতে আমাকে রং খুঁড়িয়াও আনিতে হয়।'

'শিকার করিতে যাও না।'

'লাফাই পাহাড় হইতে যে খাবার আসে তাহাতেই আমাদের কুলাইয়া যায়। আমাদের দলই বৃহার ভরণপোষণ করে। বৃহা অবশ্য মাঝে মাঝে শখ করিয়া শিকার করিতে বাহির হয় এবং যখন হয় তখন প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত শিকার করে। একবার বর্শার এক আঘাতে একটা ম্যামথের মাথা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল এত উহার শক্তি। কিন্তু ছবি আঁকাই বৃহার প্রধান কাজ। বৃহা ছবি না আঁকিলে আমাদের দলের শিকারিরা শিকার পায় না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া টাহা বলিল, 'বৃহা কিন্তু আমাকে কিছুই শিখায় না।'

'আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব। আমার গুহাটা আগে ঠিক করিয়া লই।'

টাহার চোখে কেমন যেন একটা সভয় দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন আমাকে কী বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না।

'চল তোমাদের লাফাই পাহাড় দেখিয়া আসি।'

টাহার সঙ্গে লাফাই পাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যাহা দেখিলাম তাহা কল্পনাতীত ছিল। লাফাই পাহাড় যেন বৃহৎ একটি মৌমাছির চাক। কেবল প্রভেদ সেখানে মৌমাছির বদলে মানুষ বাস করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। যে বনে আমি বিতংয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম সেই বন হইতে কোমল তৃণাচ্ছাদিত একটি বিস্তৃত পথ সর্পিল আকারে লাফাই পাহাড়ে আসিয়া উঠিয়াছে। উঠিতে উঠিতে সেই পথ ক্রমশ এমন একটা উচ্চতায় আসিয়া পড়িয়াছে যাহার পর আর পথ নাই—যাহার পর পাহাড় খাড়া নামিয়া গিয়াছে। এখান হইতে পতন হইলে সুনিশ্চিত মরণ। শুনিলাম, বিতং বন হইতে হরিণের দলকে ডাকিতে ডাকিতে এই পথের উপর লইয়া আসে। পথের উপর আসিয়া পড়িলে হরিণের দল আপনিই উপরে উঠিতে থাকে, কারণ পথের উপর এমন চমৎকার ঘাস আছে যে, চরিতে চরিতে তাহারা নিজেরাই উপরের দিকে আগাইয়া যায়। রাস্তাটা যেখানে পাহাড়ের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে সেখানে রাস্তার একদিকে তো পাহাড় আছেই, অন্য দিকটাও বড় বড় পাথর দিয়া প্রাচীরের মতো করা আছে। হরিণের সমস্ত দল যখন এই স্থানে আসিয়া পড়ে তখন পিছন হইতে সকলে মিলিয়া তাহাদের তাড়া দেয় এবং পাথরের প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। হরিণের দল তখন ছুটিয়া পাহাড়ের উপর ওঠে এবং পাহাড় হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করে। দলে দলে হরিণ একসঙ্গে মরে। এরূপ অদ্ভুত ফাঁদ কখনও কল্পনা করি নাই। আমরা বর্শা দিয়া অথবা তীরধনুক দিয়া হরিণ মারি, কখনও কখনও পাথর ছুঁড়িয়াও মারি। এরূপ ব্যাপকভাবে হরিণ মারিবার আয়োজন দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইলাম। আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপারও তাহার মুখে শুনিলাম। হরিণের দল যেই ওই পথের উপর আসিয়া পদার্পণ করে, অমনি সেগুলি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হইয়া যায়। এই দল হইতে মধ্যপথে তীর বা অন্য কোনো অস্ত্র দ্বারা হরিণ মারিয়া যদি কেহ অপহরণ করে তাহা হইলে তাহার শাস্তি মৃত্যু। যে অস্ত্র দ্বারা সে হরিণটিকে মারিয়াছে সেই অস্ত্রাঘাতে তাহাকেও সকলে মিলিয়া নিধন করে। ওই পথের বাহিরে অবশ্য যে যত খুশি শিকার করিতে পারে, তাহাতে কেহ আপত্তি করে না, বরং যে যত বেশি সংখ্যক হরিণ মারিতে পারে দলের মধ্যে তাহারই তত প্রতিপত্তি বাড়ে। কিন্তু বিতং যে হরিণের দলকে ডাকিয়া আনিয়া পাহাড়ে চড়ায়, তাহার একটিরও উপর কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার নেই। আমিও হরিণের অনুসরণ করিয়াই এতকাল জীবনযাপন করিয়া

আসিয়াছি, বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি, প্রয়োজন মতো বনের ধারেই সপরিবারে বাসা বাঁধিয়াছি, সংসার করিয়াছি, কিন্তু হরিণকে কেন্দ্র করিয়া এমন আয়োজন কখনও দেখি নাই। আমি যখন লাফাই পাহাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম উপত্যকার উপর একটি উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। একটি পুরুষ ও একটি যুবতী হরিণ-হরিণী সাজিয়াছে এবং তাহাদের ঘিরিয়া একদল আবালবৃদ্ধবণিতা নাচিতেছে। গানও করিতেছে। পুরুষের দল সুর করিয়া হরিণকে বলিতেছে—'ও হরিণ, ও হরিণ, তুমি ঘাস খাও, জল খাও, হরিণীর দিকে মন দাও, এবার হরিণীর দিকে মন দাও।' মেয়ের দলও সুর করিয়া সেই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া হরিণীকে বলিতেছে—'ও হরিণী ও হরিণী, তুমি ঘাস খাও, হরিণের দিকে মন দাও, এবার হরিণের দিকে মন দাও।'

হরিণ এবং হরিণী তাহাদের অনুরোধক্রমে পরস্পরের দিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহা দেখিয়া সকলের আনন্দ কলরব জমিয়া উঠিতেছে। আমিও খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই আনন্দ উপভোগ করিলাম। শুধু উপভোগ করিলাম বলিলে কিছুই হয় না, নতুন ধরনের এই আনন্দ-স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া যেন চরিতার্থ হইয়া গেলাম। এতদিন আমার মন আহার-নিদ্রা-মৈথুন-শৃঙ্খলিত হইয়া যে কারাগারে বাস করিতেছিল সহসা যেন সেই কারাগারের প্রাচীরে একটা ফাটল দেখা দিল, সেই ফাটল দিয়া নতুন আলোক প্রবেশ করিল, সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলাম গৌ-কে দেখিয়া। ওই পলিতকেশা বৃদ্ধাও আসিয়া এই নাচের দলে যোগ দিয়াছে এবং কিশোরীদের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে। আমাকে দেখিয়া গৌ হাসিল এবং নাচ শেষ হইলে আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'থাকিবার জায়গা পাইয়াছ?'

'না, এখনও পাই নাই। টাহা কাল আমাকে জিকাটু পাহাড়ের দিকে লইয়া যাইবে বলিয়াছে, সেখানে নাকি গুহা আছে।'

'জিকাটু পাহাড়ের দিকে!'

গৌ সবিস্ময়ে টাহার দিকে চাহিল।

টাহা সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল, 'ইহাই বৃহার আদেশ।'

গৌ চুপ করিয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আজ রাত্রে তুমি কোথায় থাকিবে?'

'এ কয়দিন যেখানে ছিলাম সেইখানেই ফিরিয়া যাইব।'

'এ কয়দিন কোথায় ছিলে?'

'বিতং যে বনে থাকে সেই বনে একটা বৃক্ষকোটরে ছিলাম।'

গৌ কিছু বলিল না, কেবল ধীরে ধীরে কয়েকবার মাথা নাড়িল।

সেদিন টাহার সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্যেনপক্ষী সমাজের অনেক কিছুই দেখিলাম। দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। কত রকম নতুন অস্ত্রশস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিয়াছে। শুধু পাথরের নয়, হাড়েরও। কেবল বল্লম, বর্শা, কুঠার, ছোরাই নয়, বল্লমে দাঁতের মতো খাঁজ কাটিয়া নানা আকারের অস্ত্র তাহারা বানাইয়াছে। হরিণের এতটুকু হাড় বা শিং তাহারা ফেলিয়া দেয় না, তাহা নানা রকম কাজে লাগে। কোথাও দেখিলাম, একদল স্ত্রীলোক হরিণচর্ম চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতেছে, কেহ আগুনে মাংস ঝলসাইতেছে, কেহ হরিণের শিং হইতে অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে।

সকলেই সমগ্র সমাজের হিতার্থে ব্যস্ত। হরিণচর্ম পরিষ্কৃত হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে। কোনো ব্যক্তি-বিশেষের জন্য নয়, মাংস ঝলসানো হইতেছে একটি লোকের জন্য নয়, অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে একজনের জন্য নয়—সকলের জন্য। এক একটি বিভাগে এক-একজন কর্তা আছে, সে প্রয়োজন মতো সকলকে ভাগ করিয়া দেয়। বিবাদ উপস্থিতি হইলে বৃহা তাহার মীমাংসা করে। বৃহা ইহাদের চক্ষে সাক্ষাৎ দেবতা। জোলমা মানবী নয়, দেবকন্যা। এখানে আমাদের সমাজের মতোই স্ত্রীলোক পর্যন্ত কোনো পুরুষের নিজস্ব নয়। সমস্ত স্ত্রীলোকই সকলের সম্পত্তি। ইহাদের এলাকার পরেই শঙ্খচিল সম্প্রদায়ের এলাকা। শঙ্খচিল সম্প্রদায়ের পুরুষেরা শ্যেন সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিবাহ করে, শঙ্খচিল মেয়েরা বিবাহ করে শ্যেন পুরুষদের। তাহার পরও নাকি নকুল সম্প্রদায়ের লোকেরা নতুন এলাকা স্থাপন করিয়াছে। তাহাদেরও সহিত ইহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে শুনিলাম। বল্‌গা হরিণই সকলের উপজীব্য। মাঝে মাঝে অন্য জন্তু-জানোয়ারও ইহারা শিকার করে। কখনও সমবেতভাবে, কখনও একা একা। ইহাদের পরিচয় পাইয়া ইহাদের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হইতেছিল। আশঙ্কা হইতেছিল, আমি যদি এখানে বাস করি তাহা হইলে ইহাদের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিব কি? কই, কেহই তো আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। দলে দলে মেয়েরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাকে তো কেহ লক্ষ্যও করিল না; সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। আমি এখানে কোথায় থাকিব, কী করিব...জোলমার কথা মনে পড়িল...অন্যমনস্কভাবে টাহার সহিত সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

...সন্ধ্যাবেলা আমি আমার বৃক্ষকোটর অভিমুখে ফিরিতেছিলাম। টাহা সঙ্গে ছিল। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল ছবি আঁকার প্রসঙ্গেই বার বার আসিয়া পড়িতেছিল, তাহার ধারণা আমি কোনো বিশেষ মন্ত্র জানি বলিয়াই ছবি আঁকিতে পারি, সেই মন্ত্রটি কোনোরূপে আমার নিকট হইতে সে জানিয়া লইতে চায়। সে বুঝিয়াছে, বৃহা তাহাকে ছবি আঁকা শেখাইবে না। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে, আমি যদি এখানে থাকি তাহা হইলে আমি তাহাকে নিশ্চয়ই শিখাইয়া দিব। অনেকবার এবং কিছুক্ষণ আগেই তাহাকে একথা বলিয়াছি, কিন্তু পুনরায় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে কখন তুমি আঁকা শিখাইবে? বৃহার কাছে এতদিন আছি, বৃহা আমাকে তো কিছুই শিখাইল না।'

'বৃহা তোমাকে শিখাইল না কেন? তুমি গৌকে বল না। গৌ তোমারও মা, বৃহারও মা। গৌ অনুরোধ করিলে বৃহা বোধহয় তোমাকে শিখাইয়া দিবে।'

কোনো কথা বলিলে টাহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কথাটা প্রণিধান করে, তাহার পর উত্তর দেয়। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর টাহা বলিল, 'গৌ অনুরোধ করিবে না—'

'কেন?'

'কারণ বৃহাকে একটি অনুরোধ সে করিয়াছে, বৃহা যতদিন সে অনুরোধ পালন না করিতেছে ততদিন গৌ আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিবে না।'

'বৃহাকে গৌ কী অনুরোধ কবিয়াছে?'

'আবার বিবাহ করিবার জন্য। বৃহা কিন্তু বিবাহ করিতেছে না। সে জোলমাকে লইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে চায়। জোলমা কাহাকেও বিবাহ করুক ইহাও সে চায় না। সে চায় জোলমা সারাজীবন তাহার ছবি আঁকার কাছে প্রদীপ ধরিয়া থাকুক।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

টাহা মিটিমিটি আমার দিকে চাহিতে লাগিল। মনে হইল আমি যে জোলমাকে বিবাহ করিতে চাই ইহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে এবং এই সংবাদে আমার মুখভাব কিরূপ হয় তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমার মুখভাবে কী ফুটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু ভাষায় আমি বিশেষ কিছু প্রকাশ করিলাম না। কেবল বলিলাম, 'তাই নাকি, আশ্চর্য তো। গৌ কিছু বলে না?'

'খুব বলে। গৌ ছোট ছেলে খুব ভালবাসে। তাহার নিজের গর্ভে সবসুদ্ধ ত্রিশটি সন্তান হইয়াছে। কিন্তু আমি বৃহা এবং তিনটি কন্যা ছাড়া কেহই বাঁচে নাই। আজ গৌ যে কিশোরীদের সহিত নাচিতেছিল তাহারা সকলেই উহার দৌহিত্র। শিশু উহার খুব প্রিয়। কাহারও শিশু হইয়াছে শুনিলেই গৌ সেখানে ছুটিয়া যায়। বৃহার ঘরে শিশু নাই, জোলমার কোলে শিশু নাই, ইহাতে গৌ খুবই মর্মাহত হইয়া আছে। সেই জন্যই তো ওই কুকুর-শাবকটাকে আনিয়া লালন করিতেছে। একবার একটা কুকুরের দলকে শিকারিরা মারিয়া ফেলিয়াছিল এবং বন হইতে জীবন্ত ওই বাচ্চাটাকে লইয়া আসিয়াছিল পোড়াইয়া খাইবে বলিয়া। কিন্তু গৌ উহাকে পোড়াইতে দেয় নাই, স্নেহভরে লালন করিয়াছে। বৃহার বা জোলমার শিশু থাকিলে ওই কুকুরছানাটা বোধ হয় বাঁচিত না।'

'গৌ কি কোনো রকম মন্ত্রটন্ত্র জানে?'

'অনেক রকম। মন্ত্রের জোরেই ও তিত্তির বংশদের ধ্বংস করিতেছে।'

'কেন?'

'তিত্তিরবংশীয়দের সহিত একবার আমাদের খুব যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে আমার অনেকগুলি ভাই মারা যায়। গৌ তাহার পর হইতে ফাঁদ পাতিয়া তিত্তির পাখি ধরে এবং জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। আজ সকালে যেমন করিল, কখনও কখনও তাহার মুণ্ডটা মুচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং রক্তটা আগুনে পোড়ায়। তিত্তিরের ছিন্ন মুণ্ড হইতে, পোড়া রক্ত হইতে নানারকম লক্ষণও দেখিতে পায়। উহার অনেক ক্ষমতা। তিত্তির পাখি পোড়াইয়া গৌ তিত্তির বংশকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা বলে, এক-একটা উৎকৃট অসুখে একে একে সব মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু অসুখ নয় ভূত।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া টাহা বলল, 'গৌ কিন্তু বৃহাকে ভয় করে। বৃহারও ক্ষমতা অদ্ভুত। ওহালি বৃহাকে অদ্ভুত শক্তি দিয়া গিয়াছে। তাই গৌ তাহাকে বেশি অনুরোধ করিতে সাহস করে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তাহার পর টাহা আবার সহসা বলিল, 'গৌ কিন্তু তোমাকে সুচক্ষে দেখিয়াছে। তিত্তিরের মুণ্ড বাঁ কাধে পড়া অত্যন্ত সুলক্ষণ। পোড়া রক্তের ধোঁয়াও দক্ষিণ দিকে উড়িয়া গেল, ইহাও খুব ভাল লক্ষণ। বৃহাও সেই জন্য কোনো আপত্তি করিতে পারিল না। কিছুকাল পূর্বে আর একজন বিদেশি আসিয়াছিল। গৌ তাহাকে সুনজরে দেখে নাই, বৃহাও তাহাকে থাকিতে দেয় নাই।

আমি নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। কী যে বলিব, কী বলিলে যে সুবিধা হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাই চুপ করিয়াই ছিলাম। বনের কাছাকাছি আসিয়া টাহা সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওই দেখ, ওহালি ছবি আঁকিতেছে।'

চাহিয়া দেখিলাম, মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে। নির্নিমেষে আমিও চাহিয়া রহিলাম। ওহালি ছবি আঁকিতেছে এই অভিনব কল্পনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, টাহা কখন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই।

✡ ✡ ✡

বৃক্ষকোটরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা পাথরের টুকরা গায়ে লাগিতেই উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা লাগিল। তাহার পর আর একটা। মনে হইল, আকাশ হইতে পড়িতেছে। সন্তর্পণে মুখ বাড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলাম। তাহার পরই শুনিতে পাইলাম—'দূর হ, দূর হ, দূর হ। মরিয়া গিয়াও কি তুই নিস্তার দিবি না। দূর হ। আকাশে বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন! রাক্ষসী কোথাকার! আমার বংশ ছারখার করিয়া তোর লাভ কি। তুই তো চলিয়া গিয়াছিস। বৃহাকে ছাড়িয়া দে, জোলমাকে ছাড়িয়া দে, এমন করিয়া তাহাদের বংশ লোপ করিবি তুই ডাইনি। দূর হ—দূর হ।'

দেখিলাম, গৌ আকাশের দিকে চাহিয়া ক্রমাগত বকিয়া চলিতেছে। চাঁদে এবং মেঘে মিশিয়া আকাশে অদ্ভুত ছবি ফুটিয়াছে একটা। গৌ মাঝে মাঝে সেই ছবিটার দিকে পাথর ছুঁড়িতেছে। আর দুই হাত তুলিয়া অভিশাপ দিতেছে। তাহার পলিত কেশে, তাহার দীপ্ত চক্ষুদ্বয়ে, তাহার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহুতে, তাহার সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না। মনে হইতেছে আকাশ-বাসিনী ওহালি জ্যোৎস্নারূপে নামিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। গৌ আবার আকাশের দিকে পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। আমি সবিস্ময়ে বৃক্ষকোটর হইতে বসিয়া বসিয়া তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। গৌ উন্মাদিনী কি না এ সন্দেহ একবারও আমার মনে হইল না। মনে হইল কোনো দৈবশক্তি উহার উপর ভর করিয়াছে এবং সে শক্তি ওহালির শত্রু। যে ওহালি ছবি আঁকিয়া বৃহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যে ওহালির স্মৃতি বৃহাকে স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তাহার বংশবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে গৌ ক্ষমা করিবে না, তাহার চক্রান্তকে সে যেমন করিয়া হোক ব্যর্থ করিয়া দিতে চায়। হঠাৎ গৌ বলিয়া উঠিল, 'বিদেশি বীর আসিয়াছে, এইবার তোর মায়াজাল সে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে। তুই যে অভিশপ্ত কাঠের উপর চড়িয়া এদেশে আসিয়াছিলি সেই কাঠকে সে অনায়াসে তুলিয়াছে, শুনিয়াছি তোর স্মৃতিকেও এইবার সে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। বৃহার কবল হইতে জোলমাকে সে ছিনিয়া লইবে। বৃহা তাহাকে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইয়া হত্যা করিবে ভাবিয়াছে, কিন্তু তাহা আমি হইতে দিব না, আমি তাহাকে যাইতে দিব না—'

আকাশের দিকে দুই হাত তুলিয়া গৌ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুঝিলাম গৌ আমার কথাই বলিতেছে। আমি সন্তর্পণে বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়া আসিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল না। আমি যে গৌয়ের কথা আড়াল হইতে শুনিতে পাইয়াছি তাহা গৌকে জানানো বুদ্ধিমানের কাজ হইবে বলিয়া বোধ হইল না। গৌ যে আমার হিতৈষিণী এ কথা তো জানাই গেল, এখন এভাবে তাহার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া কোনো লাভ নাই। বরং এমনভাবে তাহার সম্মুখে আসা যাক, যেন আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই, হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। ধীরে বৃক্ষান্তরালে সরিয়া গেলাম। বনের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িব এইরূপই অভিপ্রায় ছিল। বনের

ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে একটা বুদ্ধি মাথায় আসিয়া গেল। গৌয়ের নিকট যদি ভান করিতে পারি যে আমিও তাহার মতানুবর্তী, আকাশের ওই জ্যোৎস্না-মণ্ডিত মেঘের চিত্র আমারও চক্ষুশূল, তাহা হইলে গৌ একেবারে আমার বাধ্য হইয়া পড়িবে। একটা বুদ্ধিও মাথায় আসিয়া গেল। সঙ্গে তীরধনুক ছিল। অনেকখানি ঘুরিয়া বন হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম গৌ তখনও আকাশের দিকে চাহিয়া বকিয়া চলিয়াছে। আমি কিছু দূর পিছু হটিয়া গৌয়ের কাছাকাছি সরিয়া আসিলাম, যেন আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই। তাহার পর ধনুতে শরযোজনা করিয়া তাহা মেঘের দিকে ছুঁড়িয়া দিলাম।

গৌ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে বুঝিলাম, কারণ সে নীরব হইয়া গেল। আমি যখন ধনুতে দ্বিতীয় তীর লাগাইতেছি, তখন পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম গৌ আমার দিকেই আসিতেছে। কিন্তু আমি ঘাড় ফিরাইলাম না, এমন ভাব করিলাম যেন আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই নাই। নিবিষ্টচিত্তে ধনুতে তীরটি লাগাইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া মেঘের দিকে পুনরায় একটি শর নিক্ষেপ করিলাম।

'তুমি এত রাত্রে এখানে কি শিকার করিতেছ?' আমি যেন চমকাইয়া উঠিলাম। তাহার পর এমন ভান করিলাম যেন কোনো অপরাধ ধরা পড়িয়া যাওয়াতে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছি।

'কী করিতেছ এখানে?'

বিস্মিত গৌ পুনরায় প্রশ্ন করিল।

আমি গম্ভীর কণ্ঠে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিলাম, 'উহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।'

'কাহাকে?'

'ওই জ্যোৎস্নামাখা মেঘকে—'

'কেন?'

'ও আমার শক্তি নষ্ট করিতেছে। ঘুমাইতে দিতেছে না। ওই চাঁদের আলো আমার নিদ্রায় প্রবেশ করিয়া স্বপ্নরূপে আমাকে ভয় দেখাইতেছে। তীর দিয়া উহাকে দূর করা যায় কি না চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি।'

উদ্ভাসিত চক্ষু তুলিয়া গৌ নীরবে কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি তোমার অজ্ঞাতসারে ঠিক কাজই করিতেছিলে। ও তোমার শত্রুই। ও কে জান?'

'না।'

'ওহালি। জোলমার মা। উহারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বৃহা নিজে বিবাহ করে নাই...জোলমাকে বিবাহ করিতে দেয় নাই। মরিয়া গিয়াও ওহালি নিজের অধিকার ছাড়িবে না। ছবির মায়ায় উহাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।'

গৌ নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা বলিল, 'কুঠারের হাতলে ওই ছবিটা কি তোমারই আঁকা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তাহা হইলে জোলমাকে ভুলাইতে পারিবে। আকাশে তীর ছুঁড়িয়া কিছু হইবে না, জোলমাকে ভোলাও। তুমি এখানে কোথায় আছ?'

'এখন এই বনেই আছি। কাল কিন্তু জিকাটু পাহাড়ে গুহা খুঁজিতে যাইব।'

'যাইও না। সেখানে গেলে আর ফিরিবে না। বৃহা একথা জানে বলিয়াই জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বলিয়াছে। সে জোলমার কাছে কাহাকেও ঘেঁষিতে দিতে চায় না। তুমি যাইও না। এই বনেই থাক। এইখানেই জোলমার দেখা পাইব। সে এখানে কাঠ কুড়াইতে আসে। তাহার সহিত আলাপ কর, তাহাকে মুগ্ধ কর, ওহালির কুহক হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ কর।' তাহার পর গৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল—'

'সবচেয়ে সুন্দর কী জিনিস জান? ছবি নয়, শিশু। মায়ের কোলে স্তন্যপানরত শিশু। জোলমাকে তাই দাও।' আবার গৌ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি এত রাত্রে এখানে কেন আসিয়াছ?'

'তিত্তির ধরিতে। আমি রোজ আসি।'

'ফাঁদ পাতিয়া তিত্তির ধর?' আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম।

'হ্যাঁ। দেখিবে তো আইস।'

তাহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর গিয়া গৌ বলিল, 'তুমি ওই গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাক। আমি এই ঝোপের ভিতর ঢুকিব।'

আমি গাছের উপর উঠিয়া বসিলাম। গৌ ঝোপের পিছনের দিকে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরেই ঝোপের ভিতব হইতে তিত্তিরের ডাক শোনা গেল। অনুমান করিলাম, গৌ ডাকিতেছে। তিত্তিরের ডাকের এমন চমৎকার অনুকরণ যে মানুষ করিতে পারে তাহা ধারণাতীত ছিল। বিতংয়ের কথা মনে পড়িল। সে-ও চমৎকার হরিণের ডাক ডাকিতে পারে। সহসা মনে হইল অনুকরণ করাই ইহাদের বিশেষত্ব। বৃহাও ছবিতে রং দিয়া জন্তু জানোয়ারের আকৃতির অনুকরণ করিতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য পশুকে নিজের আয়ত্তাধীনে লইয়া আসা। এরূপ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য লইয়া আমারা কিন্তু ছবি আঁকিতে শিখি নাই। কেন যে আমরা ছবি আঁকিতে শিখিয়াছি তাহা জানি না। আমাদের মধ্যে অনেকে ছবি আঁকে, তাহাদের দেখাদেখি আমিও আঁকিতে শিখিয়াছি। থানকুর মুখে মুখে শুনিয়াছি, একবার একটা পাথরের গায়ে আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি একটা বল্‌গা হরিণের ছবি আঁকা দেখিয়াছিলেন বৃষ্টিতে ধূলা জমিয়া আপনিই ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছিল। তিনি নাকি পাশেই তাহার অনুকরণে একটা ছবি আঁকেন। এজন্য নিজেদের দলে তাঁহার নাকি খুব খাতির হইয়াছিল। তখন হইতেই আমাদের সমাজে ছবি আঁকার প্রচলন হইয়াছে।

হঠাৎ বনে আরও কয়েকটা তিত্তিরের ডাক শোনা গেল। আমি উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। মনে হইল, তিত্তিরগুলি ক্রমশ যেন নিকটতর হইতেছে। তাহাদের কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। ঝোপের ভিতর গৌ ক্রমাগত ডাকিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম তিন-চারটি তিত্তির ঝোপের নিকট আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। ঝোপের ভিতর গৌয়ের ডাকও পরিবর্তিত হইল। পুরুষ তিত্তিররা যেভাবে স্ত্রী তিত্তিরদের সোহাগের সুরে ডাকে, গৌ ঝোপের ভিতর হইতে ঠিক সেইভাবে ডাকিতে লাগিল। যে তিত্তিরগুলি আসিয়াছিল সেগুলি সম্ভবত স্ত্রী-তিত্তিরই। তাহারা একটু পরেই দেখিলাম ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

'এইবার নামিয়া পড়।'

হেঁট হইয়া দেখিলাম, গৌ গাছের ঠিক নিচে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছে। নামিয়া পড়িলাম।

'চল এইবার দেখিবে চল।'

'তিন-চারটি তিত্তিরকে ওই ঝোপের মধ্যে ঢুকিতে দেখিলাম এখনই।'

'ওটা ঝোপের মতো দেখিতে বটে কিন্তু ওটা ঝোপ নয়, ফাঁদ। উহার ভিতর ঢুকিয়ে তিত্তির পাখি আর বাহিরে আসিতে পারে না।'

'তুমি কি উহারই ভিতর বসিয়া ডাকিতেছিলে?'

'না, উহার পিছনে। এইবার ঢুকিব।'

গৌ টপ পরিয়া পাতা সরাইয়া চকিতের মধ্যে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এমন নিমেষের মধ্যে গেল যে আমি অবাক হইয়া গেলাম। মনে হইল কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, এটা স্বাভাবিক ঝোপ নয়, ডালপালা পুঁতিয়া এটাকে ঝোপের আকার দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে ঝটপট ঝটপট শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই গৌ বাহির হইয়া আসিল। তাহার হস্তে চারিটি জীবন্ত তিত্তির পক্ষী। আমার সম্মুখেই সে একটি পাখির মুণ্ড ছিঁড়িয়া রক্তপান করিতে লাগিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তুমি একটা খাও। দাঁড়াই একটু আগুন জ্বালি।'

মহা উৎসাহে গৌ শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। আগুন জ্বালিবার সরঞ্জাম তাহার সঙ্গেই ছিল। সরঞ্জাম বিশেষ কিছু নয়—দুই টুকরা কাষ্ঠখণ্ড। পরস্পর ঘর্ষণে আগুন হয়। এক টুকরা অপেক্ষাকৃত চওড় কাষ্ঠে যে গর্তটি আছে তাহার ভিতর গোলাকৃতি আর একটি কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া ঘর্ষণ করিলেই অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং কাছাকাছি কোনো দাহ্যবস্তু থাকিলেই তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। বৃদ্ধা গৌয়ের দেহে যেন কিশোরীসুলভ চঞ্চলতা আবির্ভূত হইল। সে তাড়াতাড়ি শুষ্কপত্র স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিল এবং তাহার খানিকটা অংশ লইয়া আগুন ধরাইতে বসিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুষ্ক পত্ররাশি জ্বলিয়া উঠিল। সেই নিবিড় অরণ্যে পাশাপাশি বসিয়া আমরা তিত্তির ঝলসাইয়া আহার করিতে লাগিলাম। দুইটি তিত্তিরকে গৌ বন্য লতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। আহার করিতে করিতে গৌ তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, 'তোদেরও খাইব। ঠিক এমনি করিয়া মুণ্ড ছিঁড়িয়া, এমনি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া, এমনি করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া খাইব। আমার সন্তানদের মারিয়া সহজে নিস্তার পাইবি না।'

আহার শেষ করিয় গৌ পা দিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পড়িয়াছিল—চর্বিত অস্থি, নাড়িভুঁড়ি—একটা পাতায় সেগুলি কুড়াইয়া লইল। আমার চোখে বিস্ময় ফুটিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'আমার কুকুরকে খাওয়াইব। বরাবর খাওয়াইয়াছি। তিত্তির যে উহার শত্রু, উহার খাদ্য, তাহা উহার মর্মে মর্মে গাঁথিয়া দিব। আমি তো কিছুদিন পর মরিয়া যাইব, তখন ও-ই আমার হইয়া প্রতিশোধ লইবে। ও-ই প্রকৃত পুত্রের কাজ করিবে। বৃহা-টাহা পুত্রের কাজ করে না। ওহালি উহাদের সর্বনাশ করিয়া গিয়াছে। উহারা তিত্তির বংশ ধ্বংস না করিয়া ছবিতে উন্মত্ত হইয়া আছে। বৃহা কী বলে জান?'

গৌ আবার হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'কী বলে?'

'হরিণের দল যেদিন মারা পড়িবে সেই দিনই শুনিতে পাইবে। বৃহা পাগল, টাহা নির্বোধ'।

তাহার পর লতায় বাঁধা তিত্তির দুইটি তুলিয়া গৌ বলিল, ''খবরদার, তুমি জিকাটু পাহাড়ে যাইও না। এই বনেই লুকাইয়া থাক। বৃহার কবল হইতে জোলমাকে উদ্ধার কর। নতুন বংশ স্থাপন কর। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস কী জান? মানুষ, মানুষ, মানুষ। সেই জন্য সবচেয়ে সুন্দর জিনিস কী জান? শিশু, শিশু, শিশু—'

এমন সময় একটু দূরে হরিণের ডাক শোনা গেল। গৌ ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল, 'বিতং। বিতংয়ের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?'

'হইয়াছে।'

'বিতং জোলমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। বৃহা দেয় নাই। বৃহা তাহাকেও হয়তো জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইত কিন্তু ও চমৎকার হরিণের ডাক ডাকিতে পারে। ও মরিয়া গেলে হরিণ ডাকিয়া আনিবে কে? তাই উহাকে ওই গাছের গুঁড়িটা তুলিতে বলিল। জানে—ও রোগা মানুষ, গাছের গুঁড়ি তুলিতে পারিবে না—'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আমি কিন্তু তুলিয়াছি।'

'তাহার মুখে সে কথা শুনিয়াছি। তাই তো তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইতেছে। সেখানে গিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ফেরে নাই। তুমি যাইও না, এই বনেই থাক।'

'কিন্তু বৃহা যদি জানিতে পারে?'

'পারিলেই বা। এ বন তো সকলের সম্পত্তি। যে কেহ এখানে থাকিতে পারে, শিকার করিতে পারে।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গৌ বলিল, 'আমি রোজ রাত্রে এখানে তিত্তির ধরিতে আসি। যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে বলিও, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব।'

তাহার পর নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমাকে আমার চাই। তোমার মতো সমর্থ্য বলিষ্ঠ পুরুষই জোলমার প্রয়োজন। তোমাকে আমি যাইতে দিব না।'

আবার হরিণের ডাক শোনা গেল।

গৌ বলিল, 'বিতং এইদিকেও বোধহয় আসিতেছে। আমি যাই।'

তাহার পর তিত্তির পক্ষী দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, 'চল, এইবার ঝাউঝাউয়ের বুকের রক্ত তোলপাড় করিবে চল।'

'ঝাউঝাউ কে?'

'কুকুরটা। ইহাদের দুইজনকে এখন তাহার নাগালের বাহিরে অথচ দৃষ্টির সম্মুখে টাঙাইয়া রাখিব। ঝাউঝাউ ইহাদের দেখিবে অথচ ধরিতে পারিবে না। দেখিবে অথচ ধরিতে পারিবে না, মর্মে মর্মে চটিয়া থাকিবে। কী মজাই না হইবে!'

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে গৌ চলিয়া গেল। আমি কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে আবার বৃক্ষকোটরের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখনও প্রভাতের বিলম্ব ছিল। কোটরে ঢুকিয়া আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

...ঘুমাইয়া অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম একটা বাঘ আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে। যেন বাঘ নয়, মানুষ। মনে হইতেছিল এখনই বোধহয় মনুষ্য কণ্ঠে আমার সহিত কথাও বলিবে। কিন্তু ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে। কেকারবে সমস্ত বন মুখরিত। তীরধনুক সঙ্গে ছিল, ইচ্ছা হইল একটা ময়ূর শিকার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করি।

গৌ যখন বৃহ্যর নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া এই বনেই থাকিতে বলিয়া গিয়াছে তখন শিকার করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কেকাধ্বনি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। অনেক দুর যাইতে হইল। ক্রমশ নিবিড় অরণ্যে গিয়া পড়িলাম। অরণ্যের ভিতরেও বেশ কিছুদূর গিয়া তাহার পর মনে হইল এইবার বোধহয় কেকাধ্বনির নিকটবর্তী হইয়াছি। জঙ্গলটা পার হইলেই বোধহয় ময়ূরের দলকে দেখিতে পাইব। জঙ্গলের শেষ প্রান্তে গিয়া অতি ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। দেখিলাম, একদল ময়ূর একটা খোলা মাঠে পেখম বিস্তার করিয়া নাচিতেছে এবং তাহাদের সহিত নাচিতেছে জোলমা। ময়ূরেরা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছে না। সে-ও যেন তাহাদেরি একজন। আমি অনেকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের নৃত্য দেখিলাম। বস্তুত আমি আত্মহারা হইয়া কিছুক্ষণের জন্য যেন ভিন্নলোকেই নীত হইলাম। বনের পাখি মানুষের সহিত এমনভাবে কী করিয়া মিশিতেছে তাহাই আমি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। পুনরায় আমার থানকুর কথাই মনে হইতেছিল, জোলমা বোধহয় হয় মায়াবিনী। মানুষকেই পাখিতে পরিণত করিয়া নাচাইতেছে, পরে আহার করিবে। সহসা জোলমা থামিয়া গেল এবং বক্ষোলগ্ন চর্মাবরণখানা খুলিয়া ফেলিল। দেখিলাম, তাহার গলায় চামড়ার থলির মতো কি যেন একটা বাঁধা রহিয়াছে। জোলমা থলিটাও খুলিয়া ফেলিল এবং থলির ভিতর হাত ঢুকাইয়া কী যেন বাহির করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইতে লাগিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, ময়ূরের দল সেগুলি সাগ্রহে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। মানুষ নিজে না খাইয়া পশুদের খাবার বিতরণ করিতেছে, এই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

'দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন, ওই তো জোলমা, এত কাছে দাঁড়াইয়া আছে, গিয়া আলাপ কর, উহাকে ভুলাও।'মনে হইল গৌ আমার কানে কানে যেন কথাগুলি বলিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমার নিজের কামনা যে বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, তাই ভয় পাইলাম। মনে হইল, যাদুকরী গৌ হয়তো কোনো অচিন্তনীয় উপায়ে আমাকে আদেশ করিতেছে। তাহার আদেশ যদি পালন না করি বিপদ হইবে। আমার নিজের আগ্রহও কম ছিল না। কিন্তু একটা বিস্ময়ান্বিত শঙ্কা যেন আমার গতিরোধ করিয়াছিল. এই ঘটনায় সাহস পাইয়া বন হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

জোলমা প্রথমে আমাকে লক্ষ্য করে নাই; কিন্তু ময়ূরেরা আমার আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। কয়েকটা ময়ূর ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেই বাকিগুলি সচকিত হইয়া উড়িয়া গেল। তখন জোলমা মুখ তুলিয়া চাহিল। আমাকে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। তাহার পর আগাইয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বিদেশি, তুমি এখনও এখানে আছ?'

'হাঁ। পর্বতের আদেশে আমাকে থাকিতে হইয়াছে। তোমাদের দেশেই ঘর বাঁধিব।'

'কোনো গুহা কি ঠিক করিয়াছ?'

'না, এখনও করি নাই, কাল জিকাটু পাহাড়ে গুহার সন্ধানে যাইব।'

'ও, জিকাটু পাহাড়ে।'

চুপ করিয়া সে খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রইলাম। একটা তীক্ষ্ণ কেকাস্বর সহসা নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

জোলমা বলিল, 'তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে কে যাইতে বলিয়াছে?'

'বৃহা।'

'ও।'

জোলমা আবার চুপ করিয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমার আচরণ বড়ই রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। আমন্ত্রণ অথবা প্রত্যাখ্যান, আনন্দ অথবা বিষাদ কিছুই তো তাহার আচরণে প্রতিভাত হইল না। সে আমাকে চায় কী চায় না তাহা তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেবতার যখন আদেশ তখন এই আদেশেই আমাকে থাকিতে হইবে, জোলমাকে লইয়া যদি ঘর না বাঁধিতে পারি, জোলমা যদি আমাকে না চায়...। ' জোলমাকে ভোলাও। বৃহার কবল হইতে উহাকে উদ্ধার কর'—অদৃশ্য গৌ আবার যেন আমার কানে কানে কথা বলিল।

আমি বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম, জোলমা যেদিকে গিয়াছে সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, জোলমাকে কিন্তু দেখা গেল না। কোথায় গেল সে? তাহাকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে চাই। আমাকে সে যদি আশ্বাস দেয়—দিবে কি? যদি না দেয়...সহসা একটা চিৎকার শুনিতে পাইলাম, জোলমার কণ্ঠস্বর, মনে হইল আকাশ হইতে ভাসিয়া আসিল। নিকটেই প্রকাণ্ড একটা শিমুলগাছ, তাহার সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে ভরা। চাহিয়া দেখিলাম, তাহারই উঁচু একটা ডালে জোলমা বসিয়া আছে। আমিও পরমুহূর্তে গাছে উঠিতে লাগিলাম। আমাকে গাছে উঠিতে দেখিয়া জোলমার কিন্তু কোনো ভাবান্তর হইল না। দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে যেমনভাবে বসিয়াছিল তেমনিভাবেই বসিয়া রহিল। আমি যখন তাহার কাছাকাছি হইলাম তখন সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখিল বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনো আগ্রহ, ভয় বা বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করিলাম না, সে দৃষ্টি নিতান্তই উদাসীন। আমি তাহার পাশের ডালে আসিয়া উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলাম, 'তুমি অমন করিয়া চিৎকার করিলে কেন?'

জোলমা কোনো কথা না বলিয়া চক্রবাল রেখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিলাম বনের ধারে যে প্রান্তরটি রহিয়াছে তাহাতে একদল বন্য মহিষ চরিতেছে।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জোলমার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, বন্য মহিষ সম্বন্ধে আমার মনোভাব আর জোলমার মনোভাব যেন এক নয়। তাহার চোখের রহস্যময় দৃষ্টিতেই তাহা আভাসিত হইতেছিল। বন্য মহিষগুলি দেখিবামাত্র আমার মনে যে লোভ ও হনন-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, জোলমার মনে ঠিক সেরূপ হয় নাই। সে সবিস্ময়ে যেন একটা আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিল। আমি জোলমার মুখের দিকে চাহিয়াই রহিলাম কোনো কথা বলিলাম না। আমার নীরবতাই অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিল, জোলমা কথা কহিল।

'বৃহার ছবি ওই মহিষের দলকে টানিয়া আনিয়াছে। এইবার উহারা আমাদের জন্য প্রাণদান করিবে।'

'বৃহার ছবি উহাদের টানিয়া আনিয়াছে? তাহা কী করিয়া সম্ভব?'

'কী করিয়া তাহা জানি না, কিন্তু সম্ভব। বৃহা ছবি আঁকে বলিয়াই হরিণের দল আসে, ইহা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। শুধু আসে না, আসিয়া আত্মদান করে।'

'আত্মদান করে? আমি তো শুনিলাম, বিতং তাহাদের লাফাই পাহাড়ের দিকে লইয়া যায়, তাহার পর তাড়া খাইয়া তাহারা পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়ে।'

'তুমি যাহা বলিতেছ তাহাও ঠিক, এই বন্য মহিষদের শিকার করিবার জন্যও বৃহা স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিবে, কিন্তু বৃহার মত এই যে প্রাণীরা স্বেচ্ছায় আত্মদান না করিলে কেহ তাহাদের মারিতে পারে না। ছবির অদৃশ্য টানে মুগ্ধ হইয়া তাহারা আসে এবং আমাদের হিতার্থে স্বেচ্ছায় প্রাণদান করে। উহারা দেবতা, পশুরূপে আসিয়া আমাদের উপকার করে। স্বেচ্ছায় না আসিলে কেহ জোর করিয়া উহাদের আনিতে পারে না। বৃহা ছবি আঁকিয়া উহাদের পূজা করে, তাই উহারা সন্তুষ্ট হইয়া আসে।'

আমি এরূপ কথা পূর্বে কখনও শুনি নাই। সবিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলাম। জোলমাই আবার কথা কহিল। বলিল, 'সন্তুষ্ট হইয়া উহারা আসে বটে, কিন্তু বীরত্ব না দেখিলে আত্মদান করে না। বৃহাকে তাই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমার বড় ভয় করিতেছে। বন্য মহিষ বড় ভয়ঙ্কর জন্তু, সহজে আত্মদান করে না।'

জোলমার চোখেমুখে শঙ্কা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, 'বৃহাকে কি যাইতেই হইবে? বৃহার বদলে যদি আমি যাই?'

জোলমা কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'তুমি যাইবে কেন?'

'তোমাকে নির্ভয় করিবার জন্য।'

'তুমি কি বৃহাকে রক্ষা করিবে?'

'বৃহার যাইবার প্রয়োজন কী? আমি একাই গিয়া বন্য মহিষদের সম্মুখীন হইব এবং বেশি না পারি একটাকেও অন্তত বধ করিব।'

জোলমা চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াই বলিল, 'বৃহাকে কিন্তু যাইতেই হইবে, কারণ সে আমাদের দলপতি। টাহা হয়তো তাহার সঙ্গে থাকিবে. তোমার কথাও বৃহাকে বলিব। তুমি কি ইতিপূর্বে বন্য মহিষ শিকার করিয়াছ?'

'করি নাই। কিন্তু তোমার জন্য আমি যে কোনো বিপদ বরণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

ইহার উত্তরে কিন্তু জোলমা যাহা করিল তাহাতে আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। সে সহসা মুখ ফিরাইয়া সানুনয়ে বলিল, 'বিদেশি, পালাও। আমাকে তুমি পাইবে না। প্রাণ থাকিতে বৃহা কখনও ওহালি কন্যাকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিবে না। যতদিন বাঁচিব, ততদিন অন্ধকার গুহায় বৃহার পার্শ্বে প্রদীপ লইয়া আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। আমার জীবন সাধারণ মানুষের ভোগে লাগিবে না, আমাকে তুমি কামনা করিও না, পালাও—'

দেখিলাম জোলমার মুখ পাংশুবর্ণ, অধর কম্পমান, চক্ষু জ্বালাময়ী। আমার অপ্রস্তুত ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়া গেল, আমার শিরায় উপশিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি সহসা তাহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম, 'আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি পর্বতের ভাষা বুঝিতে পারি, বল্গা হরিণকে ছবিতে মূর্ত করিতে পারি, গত রাত্রে ওহালিকে আমি জ্যোৎস্নামাখা মেঘে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তোমাকে পাইবার জন্য যে-কোনো দুরূহ কার্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমার মা যে কাঠের উপর চড়িয়া ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহা আমি অবলীলাক্রমে স্কন্ধে তুলিয়াছি, টাহাকে জিজ্ঞাসা করিও। বৃহা যে জিকাটু পর্বতে আমার বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছে,

তাহা শুনিয়াছি অতিশয় ভয়ঙ্কর স্থান। যত ভয়ঙ্কর হোক, সেখানে অমি যাইব, নিজের শক্তিতে সে স্থানকে নিরাপদ করিব, আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, আমি সাধারণ লোক নই। তোমাকে কামনা করিবার দাবি আছে—'

জোলমার অধরে মৃদু হাস্য স্ফুরিত হইল। সে বলিল, 'দাবি থাকিলেও আমাকে পাইবে না। কারণ, আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। আমাদের সম্প্রদায়কে বাঁচাইতে হইলে বৃহাকে ছবি আঁকিতে হইবে। আমি প্রদীপ না ধরিলে বৃহা ছবি আঁকিতে পারে না। সুতরাং বৃহার পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। আমার আশা তুমি ছাড়িয়া দাও। আমাদের সম্প্রদায়ে নারীর অভাব নাই, তুমি অপর কাহাকেও বাছিয়া লও—'

এই বলিয়া জোলমা গাছ হইতে নামিতে শুরু করিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

গাছ হইতে নামিয়া জোলমা বলিল, 'তুমি কি সত্যই মহিষ শিকার করিতে যাইবে। যদি যাও তোমার কথা বৃহাকে বলিব।'

'বৃহা কবে মহিষ শিকারে বাহির হইবে?'

'তাহাকে আজ খবরটা দিব, তাহার পরে সে নিজেই দিন স্থির করিবে।'

'আমি তাহা হইলে আজ জিকাটু পাহাড়টা ঘুরিয়া আসি। কাল সকালে আবার এইখানেই তোমার প্রতীক্ষা করিব।'

'জিকাটু পাহাড়ে তুমি যাইও না, এখানেই থাক।'

'আমি যাইবই। বৃহার আদেশ আমি অমান্য করিব না।'

জোলমা নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন কী বলিতে চাহিতেছে কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। জিকাটু পাহাড় সম্বন্ধে যে ভয় টাহা এবং গৌয়ের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি সেই ভয় জোলমাকেও অভিভূত করিয়াছে মনে হইল। অথচ সত্য কথাটা সে যেন বলিতে পারিতেছে না। জোলমার নীরব চাহনির উত্তরে আমি প্রশ্ন করিলাম, 'জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বারণ করিতেছে কেন? কী আছে সেখানে?'

'কী আছে জানি না, এইটুকু শুধু জানি, সেখানে গেলে কেহ ফেরে না—'

'তবে বৃহা আমাকে সেখানে যাইতে বলিল কেন?'

'শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য। বৃহা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, আমি চলিয়া গেল তাহার ছবি আঁকা বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও সহিত থাকি ইহা কল্পনা করাও তাহার পক্ষে শক্ত। তাই সে তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে বলিয়াছে।'

সহসা আমার মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া জোলমাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া বলিলাম, 'জিকাটু পাহাড়ে আমি যাইব, কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। বৃহার কাছে তুমি আর ফিরিয়া যাইবে না।'

'ছাড়, ছাড়, ছাড়িয়া দাও—'

জোলমা চিৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু আমি তাহাকে মুক্তি দিলাম না। আলিঙ্গনপাশ হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেও আমি বজ্রমুষ্টিতে তাহার একটা হাত ধরিয়া রহিলাম। জোলমার চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। সে শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, 'আমি আজন্ম কুমারী। আমার পবিত্রতা নষ্ট করিও না। আমার পবিত্রতার প্রভাবেই বৃহা ছবি আঁকে, সমস্ত শ্যেন সম্প্রদায়ের জীবন-মরণ আমার পবিত্রতার উপর নির্ভর করিতেছে, আমাকে কলঙ্কিত করিও না। ছাড়িয়া দাও। আমাকে কলঙ্কিত করিলে শুধু শ্যেন সম্প্রদায়ের নয়, তোমারও

সর্বনাশ হইবে। ওহালি তোমাকে ক্ষমা করিবে না—

বিহাড়া ও শবরী ওকার গল্পটা আমার মনে পড়িয়া গেল। ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িলাম কিন্তু তবু জোলমার হাত ছাড়িলাম না। ছাড়িতে পারিলাম না।

বলিলাম, 'তোমাকে আমি কলঙ্কিত করিব না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে অপমান করিব এত বড় কাপুরুষ আমি নই। কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়িব না। আমার সহিত তোমাকে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে হইবে। যে ভয় তোমাদের সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, আমি তোমাকে দেখাইয়া দিতে চাই যে সে ভয় অতিক্রম কবিবার মতো পৌরুষ আমার আছে। তোমাকে আমার সঙ্গে জিকাটু পাহাড়ে যাইতে হইবে।'

'আমি যদি না যাই—'

'জোর করিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইব।'

জোলমা নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, তাহার পর বলিল, 'জিকাটু পাহাড়ে যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমার জীবনের দায়িত্ব তোমাকে লইতে হইবে। আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের জীবন আমার জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। আমার জীবন হেলায় নষ্ট করিবার অধিকার আমার নিজেরও নাই, জিকাটু পাহাড়ে গেলে আমার জীবন যে বিপন্ন হইবে না তাহার কি জামিন তুমি দিতে পার?'

আমি আমার চর্মনির্মিত কটিপেটিকা হইতে বৃহত্তম প্রস্তর-ছুরিকাটি বাহির করিয়া তাহাব হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম, 'যখনই তুমি নিজেকে বিপন্ন মনে করিবে এইটি ব্যবহার করিও। প্রয়োজন বোধ করিলে আমার বুকেও বসাইয়া দিতে পার, আপত্তি করিব না।'

জোলমার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, 'বেশ, আমার হাত ছাড়িয়া দাও। চল তোমার সঙ্গে যাইতেছি।'

তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। সে পলাইয়া গেল না, অগ্রবর্তিনী হইয়া আমাকে পথ দেখাইয়া জিকাটু পাড়ের দিকে লইয়া চলিল। বন্যপথ তাহার সুপরিচিত। বন্য হরিণীর মতো ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া দ্রুতগতিতে সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিছু দূর গিয়া সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে আমার খটকা লাগিল।

বলিলাম, 'একটা কথা আমার মনে হইতেছে। তোমার এমন মূল্যবান জীবন রক্ষণাবেক্ষণ করিবার কোনো ব্যবস্থা কি তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা করে নাই? মনে কব সত্যি যদি কেহ তোমাকে আক্রমণ করে, তোমার আত্মরক্ষা কবিবার কি উপায় আছে? তোমার কাছে তো একটা অস্ত্রও নাই।'

'উপায় আছে বই কি, দেখিবে?'

জোলমা হাসিমুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'কই, দেখি?'

জোলমা সহসা কেকাধ্বনি করিয়া উঠিল। অরণ্য-নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া সে যেন আকাশকেও চিরিয়া দিল। একবার, দুইবার, তিনবার চিৎকার করিল সে। তাহার পর সে চিৎকার মুহূর্ত-মধ্যে শত চিৎকারে পরিণত হইল। সমস্ত বন কেকাধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দময় একটা বিরাট সমুদ্র যেন অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া আসিতেছে। তাহার পরই পক্ষবিধূননের শব্দ। দেখিলাম দলে দলে শত শত ময়ূর চতুর্দিক হইতে উড়িয়া আসিতেছে। তাহাদের চোখের দৃষ্টি হিংস্র, নখর উদ্যত, তাহাদের তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে জিঘাংসা

মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। জোলমা হাসিয়া বলিল, 'উহারা যদি দেখে আমি বিপন্ন, প্রাণ দিয়া আমাকে রক্ষা করিবে। এই বনে আমাকে আক্রমণ করিয়া কেহ নিস্তার পাইবে না, উহারা নিমেষে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে। এই ময়ূরের দলই আমার রক্ষী। বাঘের হাত হইতেও ইহারা আমাকে রক্ষা করিয়াছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই এ কথা জানে।

তাহার পরে মুচকি হাসিয়া বলিল, 'বিতংকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।'

চতুর্দিকের ঝোপঝাড় বৃক্ষশ্রেণী ময়ূরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আকাশেও দেখিলাম অনেক ময়ূর উড়িতেছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমা হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। ময়ূরের দল আবার ক্রমে অন্তর্ধান করিল।

জোলমা বলিল, 'এইবার চল, যাই—'

পুনরায় সে অগ্রবর্তিনী হইল। আমি পুনরায় তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

'আমি যখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে স্পর্শ করিয়াছিলাম তখন তুমি ময়ূরের দলকে ডাক নাই কেন?'

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না। আমার অভিভূত চেতনায় ওই প্রশ্নটাই কেবল বারংবার বাঙ্ময় হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

জোলমা মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, 'তোমার দৌড় কতদূর দেখিতেছিলাম। তুমি শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি খুশি হইয়াছি এবং সেই জন্যই তোমার সহিত জিকাটু পাহাড়ে যাইতে রাজি হইয়াছি—'

'ইহার পূর্বে জিকাটু পাহাড়ে কখনও গিয়াছ?'

'না। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই জিকাটু পাহাড়কে ভয় করে। ওখানে যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না, এইরূপ জনশ্রুতি।'

'তবে এখন যাইতেছে কেন?'

'তোমার জন্য। তুমিই তো আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ।'

'কিন্তু তোমাকে যে জোর করিয়া কোথাও লইয়া যাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণ তুমি এখনই দিয়াছ। তবে যাইতেছ কেন বুঝিতে পারিতেছি না।'

ইহার উত্তরে জোলমা আমার দিকে হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিল মাত্র, কোনো কথা কহিল বলিল না। আমিও সমস্ত পথ কোনো কথা বলিলাম না। একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে আমার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জোলমাকে আর মানবী বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল শ্যেন সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশ্বাসই বোধহয় ঠিক, জোলমা দেবকন্যা। আর একটা কথাও কিন্তু অনিবার্যভাবে মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল জোলমা মানবী বা দেবী যাহাই হউক না কেন, জোলমাকে আমার চাই। তাহাকে যদি না পাই, আমার সমস্ত পৌরুষ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিছুকাল পূর্বে বহু নারী লইয়া ঘর করিয়াছি। এখন সহসা মনে অভিনব একটা অনুভূতি জাগরিত হইল। মনে হইল জীবনে এই বোধহয় প্রথম নারী দেখিলাম। আমার পূর্ব জীবনের পিকি-বনটু-বোহিলা-জামাইকিনা-দোম্বি-ঠাঠা যেন কতকগুলি প্রাণহীন সন্তান প্রসব করিবার যন্ত্রমাত্র ছিল। তাহাদের না ছিল ব্যক্তিত্ব, না ছিল রূপ, তাহাদের ঘিরিয়া কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিত না, এমন কি কৌতূহলও জাগরিত হইত না। তাহাদের সংস্পর্শে যে ক্ষুধা অনুভব করিয়াছি তাহা নিতান্তই পাশবিক ক্ষুধা। জোলমা আমার মনে যে ভার উদ্দীপ্ত করিয়াছে

তাহার স্বাদ ইতিপূর্বে কখনও পাই নাই। জোলমাকে আমার চাই। আমার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হইয়া এই চিন্তাতেই নিবদ্ধ ছিল। জিকাটু পাহাড়ের ভীতিও আমার মন হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম।...

'ওই জিকাটু পাহাড়।'

জোলমার কথায় আমার চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিলাম, রুক্ষ একটা প্রস্তরস্তূপ অভ্রভেদী হইয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পাদদেশে দেখা যাইতেছে না। ঘননিবদ্ধ শ্যামল তরুশ্রেণীতে দৃষ্টি ব্যাহত হইতেছে। জোলমা এবং আমি উভয়েই রুক্ষ পর্বতচূড়াটার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটা অদ্ভুত নীরবতায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। পশুপক্ষীর কোনো শব্দ নাই, গাছের পাতাও নড়িতেছে না। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রও যেন পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে মৃত্যু কাছে-পিঠে কোথাও যেন ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

'এইবার কী করিবে?'

জোলমাই প্রশ্ন করিল। প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। এতক্ষণ যেন যন্ত্রচালিত মূঢ়বৎ জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম, প্রশ্নের আঘাতে জাগরিত হইলাম। চতুর্দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে ঠিক করিলাম, জিকাটু পাহাড়ের দিকে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে চতুর্দিকটা একবার পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

'এইবার একটা গাছে উঠিতে চাই।'

'আমাকেও কি উঠিতে হইবে?'

'সেটা তোমার ইচ্ছা।'

'আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছ, এখন একথা বলিতেছ কেন?'

'প্রথমে জোর করিয়াছিলাম বটে, এখন কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি, তোমাকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার মতো শক্তি আমার নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর চলিয়া যাইতে পার। জিকাটু পাহাড়ে আমি একাই যাইব। যদি বাঁচিয়া থাকি কাল তোমার সহিত দেখা হইবে।'

জোলমার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া সত্যই আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে পেশী শক্তির বলে বলীয়ান হইয়া এতদিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছি সহসা তাহার ওপর আস্থা হারাইয়া সমস্ত চিত্ত যেন বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। থানকুর নিকট যেসব রূপকথা শুনিয়াছিলাম তাহা বাস্তবে যে রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। বনের ময়ূরকে জোলমা কী করিয়া বশ করিল—ঘুরিয়া ফিরিয়া এই কথাটাই আমার মনকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল, অথচ সাহস করিয়া তাহা জোলমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো এমন একটা কিছু করিয়া বসিবে, যাহা আরও বিস্ময়কর, হয়তো সে প্রজাপতি বা পাখি হইয়া উড়িয়া যাইবে, আর কখনও তাহাকে পাইব না, চিরকালের মতো সে নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে। পাছে অশোভন কিছু করিয়া ফেলি এই ভয়ে তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম। তাহার সম্মুখে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার হৃদয় জয় করিবার আশা বহুক্ষণ পূর্বেই বিসর্জন দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে পাইবার আশা বিসর্জন দিই নাই, কিন্তু কী করিয়া যে তাহাকে পাইব তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। বস্তুত আমি দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। জোলমাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম—কিন্তু যদি জোলমা সত্যই চলিয়া যায় এই আশঙ্কায় পরমুহূর্তেই আবার ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। পরাজিত পশুশক্তি অসহায়ভাবে দৈবী-শক্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

জোলমা গেল না। সে যাহা করিল করিল তাহাও অপ্রত্যাশিত। সে জানু পাতিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। আমার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, 'তুমি জোর করিও না। জোর করিলে আমাকে কখনও পাইবে না। আমাকে আদেশ করিও না, আমাকে স্বেচ্ছায় চলিতে দাও, আমি স্বেচ্ছায় তোমারই পথে চলিব। আমার মা ওহালি মেঘবাহিনী, আকাশচারিণী। ওহালি-কন্যা কাহারও বন্দিনী হইবে না। বিদেশি, তোমাকে আমার ভাল লাগিয়াছে, তোমার সঙ্গিনী হইতেও আপত্তি আমার নাই, কিন্তু বৃহাকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি...'

জোলমা কিন্তু কথা শেষ করিতে পারিল না। পরমুহূর্তে তরুশ্রেণীর মধ্যে হুড়মড় করিয়া একটা শব্দ হইল। আমিও চমকাইয়া উঠিলাম এবং পরমুহূর্তেই একটা গাছে চড়িতে শুরু করিয়া দিলাম। জোলমাও আমার অনুসরণ করিতে লাগিল। গাছের ওপর উঠিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড বল্‌গা হরিণ তরুশ্রেণী ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। ছুটিয়া আসিয়া হরিণটা একটা প্রান্তরে পড়িল; কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারিল না, মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। আর উঠিল না, হাত-পা টান করিয়া শুইয়া রহিল। আমি কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, তাহার পার গাছ হইতে নামিয়া গেলাম। দ্রুতবেগে কাছে গিয়া দেখিলাম হরিণটা মরিয়া গিয়াছে। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম মৃত্যুর কারণটা কি। প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাহার পর সহসা নজরে পড়িল। লোমের জন্য প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। পৃষ্ঠের একধারে পাশাপাশি দুইটি রক্তাক্ত বিন্দু রহিয়াছে। বুঝিলাম সাপে কামড়াইয়াছে। সর্পদষ্ট হরিণের মাংস খাওয়া বিপজ্জনক, তাই সেটাকে আর টানিয়া আনিলাম না, ফেলিয়া আসিলাম।

পুনরায় গাছে উঠিয়া কিন্তু জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না। কোথায় গেল সে? পাশাপাশি বৃক্ষশ্রেণী ঘনসন্নিবদ্ধ. বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। জোলমা কি অন্য বৃক্ষে চলিয়া গেল? চারিদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সহসা সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, জোলমার সন্ধানে আমি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এক বৃক্ষ হইতে আর এক বৃক্ষ তাহার পর আর এক বৃক্ষ. ক্রমাগত বৃক্ষের পর বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। মহীরুহশ্রেণী মহাশূন্যে শাখাপত্র জটিল এক অদ্ভুত পথ সৃজন করিয়াছিল। তাহা কখনও নিবিড়, কখনও শ্যামল, কখনও পুষ্পাকীর্ণ, কখনও আকাশচুম্বী. কখনও ভূমিমুখী, কখনও আলোকোদ্ভাসিত কখনও অন্ধকারময়। এই পথে আত্মহারা হইয়া আমি জোলমাকে খুঁজিতেছিলাম। মনে হইতেছিল এই পথ যেন আমার মানসিক অবস্থারই প্রতিচ্ছবি! কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই। কখনও গাছের শাখায় ঝুলিয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও আরোহণ করিয়া আরও অনেকক্ষণ হয়তো চলিতাম কিন্তু বাধ্য হইয়া আমাকে অবশেষে থামিয়া যাইতে হইল। কারণ গাছ আর ছিল না। বৃক্ষশ্রেণীর শেষ বৃক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। এতক্ষণ জিকাটু পাহাড়ের কথাও মনে ছিল না। এইবার দেখিলাম নিজের অজ্ঞাতসারেই জিকাটু পাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখেই প্রান্তর এবং প্রান্তরের অপর পারেই জিকাটু পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বিস্ফারিত চক্ষে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। একটা নিষ্করুণ রুক্ষতা যেন মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে শ্যামলতার কোনো চিহ্ন নাই। পাহাড়ের গায়ে শ্যামলতার কোনো চিহ্ন না থাকিলেও তাহার ঠিক পাশেই যে জলাশয়টা দেখিতে পাইলাম তাহা শৈবালাচ্ছন্ন। তাহার চারিদিকে বহুবিধ আগাছাও জন্মিয়াছে। তখন জলাশয় কেহ খনন করিত না, বুঝিলাম পাহাড়ের কোনো স্থানে উৎস বা ঝরনা আছে। ইহাও মনে হইল নিশ্চয়ই তাহা ক্ষীণধারা, তাহা না হইলে নদী হইয়া বহিয়া যাইত। জোলমা

কোথায় গেল? গাছ হইতে নামিয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল নাকি। পাহাড়টার চতুর্দিব আবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার আকুল দৃষ্টি সেই নিষ্ঠুর প্রস্তর স্তূপের প্রতি অংশে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু একটা জিনিস আবিষ্কার করিলাম। পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ জলাশয়টার দিকে বেশ বড় একটা গুহা আছে। পাহাড়ের খানিকটা অংশ বারান্দার মতো বাহির হইয়া আসিয়াছে, ঠিক তাহারই সংলগ্ন গুহাটি। ঠিক মনে হইতেছে গুহা-দ্বারের সম্মুখেই কে যেন একটি বারান্দা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। বাস করিবার মতো গুহা সন্দেহ নাই। পরমুহূর্তেই কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে গুহার বাসোপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিল। গুহার কিছু ওপরে বিশাল একটি পাথর রহিয়াছে। মনে হইতেছে পাহাড়ের উপর হইতে বিরাট একটা মুণ্ডু যেন হুমড়ি খাইয়া গুহাটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। মাথার উপর যদি পড়িয়া যায় নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। হইতে পারে পাথরটা পাহাড়েরই একটা অংশ, কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। কিন্তু ওটা যদি আলাদা পাথর হয়, তাহা হইলে খুবই বিপজ্জনক। তবু ওই গুহাটাকে কেন্দ্র করিয়াই মন স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। জোলমা কি ওখানে আসিয়া বাস করিতে চাহিবে? সে তো বলিল বৃহাকে সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে...? সহসা খট্ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। যেন চুরি করিয়া কী একটা অপরাধ করিতেছিলাম, শব্দটা আমাকে সতর্ক করিয়া দিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল জোলমা কি কোথাও লুকাইয়া আছে? আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য সে-ই শব্দ করিল? জলাশয়টার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শিহরিয়া উঠিলাম। বিরাট একটা কৃষ্ণসর্প ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরমুহূর্তেই সে ছোবল মারিল, আবার ফট করিয়া শব্দ হইল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

সমস্ত ব্যাপারটা এইবার যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। বাল্যকালে আমাদের দলপতি আবারাবার মুখে শঙ্খচূড় সাপের গল্প শুনিয়াছিলাম। শঙ্খচূড় সাপ নির্জন অরণ্যে বাস করে। শঙ্খচূড় যেখানে থাকে সেখানে অন্য কোনো জন্তু থাকিতে পারে না, এমন কি সাপ পর্যন্ত নয়। ইহাদের দংশন সাংঘাতিক, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। জলের ধারে ধারে ঘুরিয়া ইহার শামুক আহার করে। ইহাদের ছোবলের আঘাতে শামুকের খোলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের ফণা হাতুড়ির মতো, যেখানে আঘাত করে সেখানটার আর কিছু থাকে না। ইহাদের দৃষ্টিপথে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ইহারা তীব্রবেগে ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী সকলেই শঙ্খচূড়েরর ভয়ে ভীত।

শ্যেন সম্প্রদায়ের ভয়ের কারণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। টাহার কথা মনে পড়িল, 'নাগদের দলপতি প্রেত হইয়া জিকাটু পাহাড়ের গুহায় বসিয়া আছে। শ্যেনবংশীয় কেহ গেলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কোনো পশুকে সে নিজের কাছে ঘেঁষিতে দেয় না...'

সত্যই কি শঙ্খচূড় সাপটা নাগ-দলপতির প্রেতমূর্তি? না ওটা সাধারণ সাপ মাত্র। প্রেতমূর্তি যদি হয় পূজা করিলে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইবে। দোম্বির নিকট প্রেতপূজার পদ্ধতি কিছু শিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার জন্য দুইটি কৃষ্ণ কপোত, একটি শ্বেত প্রজাপতি, তিনটি রক্তবর্ণ ফুল এবং একটি বহুরূপী গিরগিটি চাই। এইগুলিকে একসঙ্গে গাঁথিয়া একটি জীবন্ত মৃগের গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ছাড়িয়া দিবামাত্র মৃগ যদি উত্তর দিকে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রেত প্রসন্ন হইয়াছে। যদি অন্য দিকে ছোটে তাহা হইলে সেই মৃগকে শিকার করিয়া তাহার মাংসের সহিত কপোত প্রজাপতি ফুল ও গিরগিটি মিশাইয়া উত্তর দিকে মুখ

করিয়া প্রেতের উদ্দেশে উপাচার দিতে হইবে। বেশ জটিল পদ্ধতি। সহসা সব উপকরণ সংগ্রহ করাও মুশকিল।

...অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আবার ফট্ করিয়া শব্দ হইল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শঙ্খচূড় আবার ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবার আরও খানিকটা কাছে আসিয়াছে। তাহার হিংস্র চক্ষু এবং লকলকায়িত জিহ্বা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম।

সহসা আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। সংস্কারকে পরাভূত করিয়া সহজ বুদ্ধি সহসা প্রাধান্য লাভ করিল। মনের ভিতর কে যেন বলিল, 'প্রেত হউক, সাপ হউক, ও তোমার শত্রু, উহাকে নিপাত করিতে পারিলে জোলমাকে পাইবে, আঘাত কর, তোমার কাছে তীর-ধনুক আছে, চেষ্টা করিয়া দেখ না ঠিক যদি মারিতে পার, এখনই সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।'

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস হারাই নাই। পরে বহুকাল পর্যন্ত এই বিশ্বাস আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তোমাদের অনেকের জীবনকে এখনও হয়তো নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কিন্তু তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে—আমার সহজ বুদ্ধি আমাকে যুক্তিযুক্ত কাজ করিতে প্রবুদ্ধ করিল। ওই সাপটা যদি প্রতিশোধকামী নাগ-দলপতির প্রেত হয়, তাহা হইলে সামান্য একটা প্রস্তরনির্মিত তীর যে উহার কিছুই করিতে পারিবে না, বরং অচিন্ত্যপূর্ব ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিয়া যে আমার সর্বনাশ হইয়া যাইতে পারে, একথা আমি যেন সেই মুহূর্তে ভুলিয়া গেলাম। যে বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ যুগে যুগে অনিশ্চিত পথে পা বাড়াইয়াছে, সত্য সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে, চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া নব নব প্রথার প্রবর্তন করিয়াছে, সে বুদ্ধি ও যুক্তির বশে আমি প্রেতভয় তুচ্ছ করিয়া শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

শঙ্খচূড়ের ফণা লক্ষ্য করিয়া শরটা ছুঁড়িয়া দিলাম। কিন্তু ঠিক লাগিল না। সামান্য একটু আঘাত করিয়া তীর দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। ইহার ফল হইল অতি ভয়ানক। শঙ্খচূড় যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রথমে তীরটার সঙ্গে সঙ্গে সে কিছুদূর গেল, তাহার পর সমস্ত জলাশয়টা মন্থন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার তর্জন-গর্জনে প্রস্তরময় জিকাটু পাহাড়ও শিহরিয়া উঠিল। আমার কিন্তু আর ভয় করিতেছিল না। আমি একাগ্রচিত্তে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম, কখন দ্বিতীয় তীরটি ছুঁড়িব। শঙ্খচূড় আর একবার যদি ফণা তুলিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিব। ধনুতে শর-যোজনা করিয়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জলাশয় আলোড়নের ফলে লক্ষ লক্ষ মশা উড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, জলাশয় হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। মশকের দল ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রমশ আমার দিকে উড়িয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের কামড়ে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলাম। ধনুতে বা তীরে নিবিষ্টচিত্ত থাকা সম্ভবপর হইল না। দেখিলাম, যেখানে বসিয়া আছি, সেখানে বসিয়া শরসন্ধান করা সহজ হইলেও মনঃসংযোগ করা কঠিন। অবিলম্বে পত্রবহুল একটা ডালের ওপর উঠিয়া বসিলাম।

একটু পরেই শঙ্খচূড় আবার ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তীর ছুঁড়িলাম। এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। এবার তীরটা শঙ্খচূড়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাইল না। আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম তাহারই সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় তাহা মাটিতে পড়িয়া গেল। এইবারেই সত্যকার

বিপদে পড়িলাম। কারণ শঙ্খচূড় সবেগে এবং গর্জনে তীরটার দিকেই কেবল ছুটিয়া আসিল না, আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম সেই গাছটার দিকেও ছুটিয়া আসিল। তীরটা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা এবার তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই। শঙ্খচূড় গাছে উঠিতে পারে আবারাবার মুখে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং প্রমাদ গণিতে হইল। স্বয়ং মৃত্যু তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যদি দৌড়াই তাহাতেও নিস্তার পাইব না। অনতিবিলম্বেই শঙ্খচূড় আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ আগে বল্‌গা হরিণটার যে পরিণাম হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে।

আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া ঘনপত্রপল্লবে আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। একটু পরেই অনুভব করিলাম শঙ্খচূড় গাছ বাহিয়া ওপরে উঠিতেছে। তাহার রুষ্ট তর্জন শুনা যাইতে লাগিল। আমি তখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সন্তর্পণে গাছের একটা ডাল ধরিয়া পাশের গাছে আশ্রয় লইলাম। যদিও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম তবু কিন্তু একটু শব্দ হইল। পাশের গাছে বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম শঙ্খচূড় আমার সন্ধানে শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি যে বৃক্ষান্তরে আছি তাহা সে তখনও টের পায় নাই। সহসা সে আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িল, আমি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলাম না, প্রস্তর কুঠারটা সজোরে তাহার শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলাম। এবার কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই, কুঠারটা সমেত শঙ্খচূড় ছিটকাইয়া নিচে পড়িয়া গেল। সভয়ে লক্ষ্য করিলাম, পড়িয়া গিয়াছে বটে কিন্তু কাবু হয় নাই, সরোষে কুঠারফলকে ছোবল দিতেছে, মুখ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তবু ফণা তুলিতেছে। আবার সে গাছের দিকে ছুটিয়া আসিল, আমি যে গাছটায় ছিলাম সেই গাছে চড়িতে শুরু করিল, আততায়ী কোথায় বসিয়া আছে তাহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে। আমি ত্বরিত গতিতে তৃতীয় বৃক্ষে গিয়া বসিলাম। আমার কাছে যে দুইটি তীর ছিল, সে দুটি পূর্বেই ব্যবহার করিয়াছি, কুঠারটা হস্তচ্যুত হইয়াছে, প্রস্তরছুরিকাটিও জোলমাকে দিয়াছিলাম, সুতরাং আমার কাছে ধনুকটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মাত্র ধনুক লইয়া কী করিয়া ওই বিষধরের সঙ্গে যুঝিব? মটাৎ করিয়া গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া লইলাম। যদিও একটা অস্ত্র হস্তগত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিপদেও পড়িয়া গেলাম। শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সাপ ফণা তুলিল এবং আমাকে দেখিতে পাইল। তাহার হিংস্র চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া আমাকে যেন আঘাত করিল। দেখিলাম আর রক্ষা নাই, কাছে আসিয়া পড়িল বলিয়া! আর একটা শাখা পার হইলেই আমাকে দংশন করিবে। দুই হাতে গাছের ডালটা তুলিয়া সজোরে তাহার ফণায় আঘাত করিলাম। আঘাতের চোটে আবার সে নিচে পড়িয়া গেল, কিন্তু এবারেও দমিল না, আবার দেখিলাম গাছের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ডালটা ছুঁড়িয়া মারিলাম, তবু আসিতেছে। আর একটা ডাল ভাঙিলাম, আবার ছুঁড়িলাম। আর একটা ভাঙিলাম...উন্মাদের মতো কতক্ষণ ধরিয়া যে কত ডাল ভাঙিয়াছি তাহা খেয়াল ছিল না। প্রতিবার আঘাত করিয়া যদিও তাহার গতি ব্যাহত করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি নাই, হত্যাও করিতে পারি নাই, নিষ্ঠুর নিয়তির মতো আমাকে গ্রাস করিবার জন্য বারংবার সে গাছের দিকে আসিতেছিল। আমার আশেপাশে ভাঙিবার মতো আর ডাল ছিল না, আতঙ্কে শ্রান্তিতে আমার হাতও অবশ হইয়া আসিতেছিল, বিষাক্ত মৃত্যুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে তবু প্রস্তুত ছিলাম না। ঠিক করিয়াছিলাম অবশেষে সাপটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিব। যদি মরিতেই হয় একসঙ্গেই মরিব।

এমন সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। কেকারবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম

ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর উড়িয়া আসিতেছে। জোলমাও কেকারব করিতে করিতে একটা গাছে আসিয়া উঠিল।

'জোলমা! কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

'আমার ময়ূরদের ডাকিতে গিয়াছিলাম। তুমি যখন বল্‌গা হরিণের দিকে চলিয়া গেলে তখন আমি বিরাট একটা সাপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। মনে হইল এই সাপের জন্যেই বোধহয় জিকাটু পাহাড় ভয়ানক। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ময়ূরেরা সাপের শত্রু, তাই ময়ূরদের ডাকিয়া আনিলাম। তুমি কি সাপটা দেখিয়াছ?'

'সাপটার সঙ্গেই এতক্ষণ যুদ্ধ করিতেছিলাম। ওই যে—'

দেখিলাম সাপটা ময়ূরদের সাড়া পাইয়া বৃক্ষশ্রেণী হইতে অনেক দূরে সরিয়া ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ফণা উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যদি এভাবে সরিয়া না যাইত তাহা হইলে ময়ূরের দল তাহাকে হয়তো দেখিতেই পাইত না। এবার শঙ্খচূড়কে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে হইল। ময়ূরের দল ছোঁ মারিতে মারিতে তাহাকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শঙ্খচূড় ফণা তুলিয়া, মাঝে মাঝে শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া ময়ূরদের কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, ময়ূরের দলও তারস্বরে চিৎকার করিয়া তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়া পরমুহূর্তেই আবার উদ্যত নখচঞ্চু লইয়া বিদ্যুৎদ্বেগে নামিয়া আসিতেছে এবং তাহাকে আঘাত করিতেছে। সহসা শঙ্খচূড় পাহাড় লক্ষ্য করিয়া অতি দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া সেই গুহাটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ময়ূরের দল চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেকারবে চতুর্দিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। আর তাহার নাগাল পাইল না।

আমরা উভয়েই নির্বাক হইয়া এতক্ষণ এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। শঙ্খচূড়কে তার মধ্যে অন্তর্ধান করিতে দেখিয়া আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল! জোলমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে তন্ময় হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। মুখ তুলিয়া দেখি পালক মেঘে আকাশ পরিপূর্ণ।

'কী দেখিতেছ?'

'ছবি। ওহালির ছবি। ভাল করিয়া দেখ, একটু পরে আর থাকিবে না। আশ্চর্য, নয়? ওহালি ছবির পর ছবি আঁকিতেছে, কিন্তু দুইটা ছবি কখনও এক রকম হয় না। একটা ছবিই ধীরে ধীরে আর একটা ছবি হইয়া যায়, তাহার পর আর একটা, তাহার পর আর থাকে না।'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার নীল চক্ষুর দৃষ্টি আকাশের বিরাট নীলে নিমগ্ন হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল তাহার দেহটা যেন আমার পাশে বসিয়া আছে, মন নাই। মন অসীম শূন্যে পক্ষ বিস্তার করিয়াছে, শঙ্খচূড়, ময়ূর, জিকাটু পাহাড় ছাড়িয়া নামহীন এক সুদূরলোকে কিসের যেন সন্ধান করিতেছে। আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সত্যই মনে হইতেছিল, জোলমা বুঝি এ জগতের নয়। আমি কিন্তু বেশিক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, শঙ্খচূড় এখনও জীবিত আছে এই ধারণাটা সাপের মতোই আমার মনে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত আমার কর্তব্য অসমাপ্ত থাকিবে এই ধরনের একটা বোধ আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল। পালক মেঘের মনোরম বিন্যাস আমাকে মুগ্ধ করিলেও তাহা লইয়া আর সময়ক্ষেপ করা অনুচিত মনে হইতেছিল। এখনই বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া গুহার দিকে

যাওয়া উচিত, একথা বার বার মনে হইলেও কেন জানি না, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, কথা বলিলেই যেন একটা পবিত্র কিছু নষ্ট হইয়া যাইবে। সেই অসভ্য যুগেও বিরাটের মহত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিত। যাহা অসাধারণ, যাহা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হইতে বিভিন্ন, তাহাকে আমরা শুধু ভয় নয় শ্রদ্ধাও করিতাম। জোলমার যতই পরিচয় পাইতেছিলাম ততই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হইতেছিল। দৈবী-শক্তির অধিকারিণী।

জোলমা সহসা বলিল, 'ওহালি আকাশে আজ এমন সুন্দর ছবি কেন আঁকিয়াছে জান? লাফাই পাহাড়ে বৃহা আজ বল্গা হরিণদের পূজা করিবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে, চল।'

'আমি কিন্তু ওই সাপটাকে শেষ না করিয়া ফিরিব না।'

'কী করিয়া শেষ করিবে?'

'দেখ না।'

আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম, জোলমাও আমার অনুসরণ করিতেছে। প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া দ্রুতবেগে জিকাটু পাহাড়ের দিকে চলিতে লাগিলাম। শঙ্খচূড়কে আর দেখিতে না পাইয়া ময়ূরদল অনেকটা শান্ত হইয়াছিল, মাঝে মাঝে তাহাদের কেকাধ্বনি যদিও জিকাটু পাহাড়ের ভয়ঙ্কর শান্তিকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু তাহারা আর উড়িয়া বেড়াইতেছিল না। বৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষে শীর্ষে বসিয়া তাহাবা সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাকে প্রান্তরমধ্যে দেখিয়া আবার তাহারা সমবেতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু জোলমা পিছনে ছিল, সে আবাব গ্রীবালগ্ন চামড়ার থলি হইতে খাবার বাহির করিয়া তাহাদের দিতে লাগিল। ময়ূরের দল তাহাকে ঘিরিয়া আহারে মাতিল। আমি একবার ফিরিয়া এই দৃশ্য দেখিলাম, তাহার পর আবার চলিতে লাগিলাম। গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম। অন্তরের অন্তস্তলে আমি কেমন যেন একটা লজ্জাবোধ করিতেছিলাম। জোলমার ময়ূরবাহিনীই যে আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, আমার নিজের শক্তিবলে আমি যে কিছুই করিতে পারি নাই একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে জোলমার নিকট বীরত্ব আস্ফালন করিয়া তাহাকে 'তাক' লাগাইয়া দিব বলিয়া টানিয়া আনিয়াছিলাম। সে বীরত্বের কোনো মর্যাদাই রক্ষা করিতে না পারাতে আমার পৌরুষ আমার নিজের কাছেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। যেমন করিয়া হোক তাহাকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নিজের শক্তিতে জোলমার কোনো সাহায্য না লইয়া ওই শঙ্খচূড়কে বধ করিতেই হইবে। তাহা করিতে গিয়া যদি আমার প্রাণ যায় তাও শ্রেয়। অমি যে নির্ভীক বীর একথা অন্তত জোলমা বুঝুক। নারীর চক্ষে নিজেকে এত দিন বড় প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি তাহা নিতান্তই দৈহিক। পুরুষ-পশু বা পুরুষ-পাখি সহচরীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য যে প্রকার দৈহিক আস্ফালন করে আমিও এতকাল তাহাই করিয়া আসিয়াছি। প্রেয়সীর চক্ষে নিজের মানসিক উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিবার জন্য সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়ার প্রেরণা আমার জীবনে এই প্রথম। একটা অদ্ভুত উন্মাদনায়, একটা অপূর্ব আনন্দে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি ছুটিতেছিলাম, আমার ভয় করিতেছিল না। মনে অন্য কোনো অনুভূতিও ছিল না। একমাত্র জোলমার প্রভাবেই আমার সমস্ত চিত্ত পরিপ্লুত হইয়া ছিল। যতই

মনে হইতেছিল সে আমার নাগালের বাহিরে, ততই তাহাকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিলাম, মনে হইতেছিল তাহার কাছে নিজেকে বীর প্রতিপন্ন করিতে পারিলে সে আমাকে বরণ করিবে। ইহাই তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায়।

...পাহাড়ের অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছিলাম। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, তবু থামিতে পারিতেছিলাম না। জোলমা আমার অনুসরণ করিতেছিল কি না জানি না। তাহাকে আর দেখা যাইতেছিল না। বাঁকা পথ ধরিয়া উপরে উঠিতেছিলাম, প্রান্তরটা দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়াছিল। জোলমা আসুক ইহা আমি চাহিতেও ছিলাম না। এই দুঃসাধ্য সাধন আমি একাই করিব। আমার লক্ষ্য ছিল গুহার ঊর্ধ্বে স্থাপিত সেই বড় গোল পাথরটা, যেটা দেখিয়া মনে হইয়াছিল কেহ যেন ওপর হইতে হুমড়ি খাইয়া গুহাটাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর একটু উঠিয়াই পাথরটা দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইবামাত্র আমার দেহে যেন নববল সঞ্চারিত হইল। ওই পাথরটাই আমার একমাত্র আশা। ওটাকে যদি উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারি, গুহার মুখটা বন্ধ হইয়া যাইবে। বন্দী শঙ্খচূড়কে হত্যা করা তখন কঠিন হইবে না। গুহার যদি আর একটা মুখ থাকে, শঙ্খচূড় যদি সেদিক দিয়া ইতিমধ্যে বাহির হইয়া গিয়া থাকে, এ সকল সম্ভাবনা যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু এসব কথা আমি ভাবিতেও চাহিতেছিলাম না। আশা করিতেছিলাম ময়ূরের ভয়ে ভীত শঙ্খচূড় এখন কিছুক্ষণ গুহা হইতে বাহির হইবে না, পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় কোনো ছিদ্রও হয়তো নাই। সুতরাং আমার সমস্ত ভরসা ও স্বপ্ন এখন নিবদ্ধ হইয়াছিল ওই পাথরটার উপর। পাথরটার কাছে আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। আনন্দে উত্তেজনায় আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। পাথরটা সম্পূর্ণ আলাদা, পাহাড়ের অংশবিশেষ নহে। পাহাড়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হইয়াও নাই। মাত্র এক জায়গায় সামান্য একটু সংযোগ আছে। ঠেলিয়া দিলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে। প্রাণপণে ঠেলিলাম, পাথর কিন্তু নড়িল না। আবার ঠেলিলাম, কিন্তু না, কোনো ফল হইল না। আবার ঠেলিলাম...

...অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বহুবার ঠেলিয়াও পাথরকে একচুল নড়াইতে পারি নাই। পাথরটাকে ধরিয়াই বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিলাম। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত পাহাড়টা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল মৃত্যুর নবতর একটা রুদ্র রূপ যেন ধীরে ধীরে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। জিকাটু নতুন অস্ত্র বাহির করিয়াছে।

সহসা জোলমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'বিদেশি তুমি কোথায়, সাড়া দাও।'

মনে হইল শব্দটা যেন আকাশ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম দক্ষিণ দিকে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত শুষ্কপত্র একটা গাছের উপর হইতে জোলমা আমাকে ডাকিতেছে। সাড়া দিলাম। সাড়া পাইয়াই সে গাছ হইতে নামিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। দেখিলাম আমার কুঠারখানা সে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

'ওটা ফেলিয়া দাও। সাপের বিষে ওটা মাখা। শঙ্খচূড় ওটাতে বহুবার ছোবল দিয়াছে।'

'ধুইয়া আনিয়াছি। বাড়ি চল, এইখানে কী করিতেছ? আমাকে এতক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বৃহু নিশ্চয়ই খুবই উদ্বিগ্ন হইয়াছে। তা ছাড়া আজ লাফাই পাহাড়ে উৎসব, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। তুমিও চল।'

'আমি পাথরটাকে ঠেলিয়া নিচে ফেলিয়া দিতে চাই। গুহামুখ বন্ধ হইলে শঙ্খচূড় মরিবে। শঙ্খচূড়কে না মারিয়া যাইব না। তুমি চলিয়া যাইতে পার। আমি কাজ শেষ না করিয়া ফিরিব না।'

জোলমা ঘুরিয়া ফিরিয়া পাথরটাকে দেখিল। একবার ঠেলিবারও চেষ্টা করিল।

'আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, অতি সহজে হইবে না।' জোলমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'চল তাহা হইলে ওই গাছটা হইতে গোটা দুই মোটা ডাল কাটিয়া আনি। পাথরের নিচের দিকে ডাল ঢুকাইয়া চাড় দিলে হয়ত কাজ হইবে।'

তাহাই করিলাম। প্রায় সমস্ত গাছটাই কাটিয়া টানিতে টানিতে সেটা উপরে লইয়া আসিলাম। বেশি বড় গাছ নয়, সহজেই কাটা গেল। যদিও খুব ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু জোলমার সান্নিধ্যে দেহে নতুন বল সঞ্চারিত হইল। জীবনে বহুবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নতুন প্রেরণা ক্লান্ত দেহকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, দেহের অভ্যন্তরে সহসা নতুন শক্তির উৎস খুলিয়া যায়। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছিল, জিকাটু পর্বতের নিরুদ্ধ উষ্মা প্রকট হইতে প্রকটতর হইতেছিল, আমি ত্বরিতহস্তে কুঠার চালাইয়া গাছটাকে পরিষ্কার করিতেছিলাম, জোলমা চুপ করিয়া বসিয়াছিল, অতিশয় নির্বিকারভাবে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। প্রখর রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া গাছের ফুল যেমন অতিশয় স্বাভাবিক ঔদাসীন্যভরে গাছের শাখায় ফুটিয়া থাকে, জোলমাও যেন তেমনিভাবে বসিয়াছিল। ওই বিষধর সর্প, দ্বিপ্রহরের রৌদ্র বা আমার এই পাথর ফেলিবার আয়োজন কিছুই যেন তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতেছিল না। মাঝে মাঝে আকাশের পালক মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল মাত্র। মনে হইতেছিল আকাশে সে যেন কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছে।

...গাছের কাণ্ডটার এক প্রান্ত সূচালো করিয়া পাথরটার তলায় ঢুকাইবার পূর্বে পাথরের যে অংশটা পাহাড়ের গায়ে লাগিয়াছিল সেই অংশটার চারিদিক প্রস্তর-ছুরিকা ও কুঠারের সাহায্যে বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিলাম। পাথরের তলায় গাছের ডালটা বেশ ভালভাবে ঢুকিয়াছিল। সজোরে চাড় দিলাম, কিন্তু পাথর নড়িল না। আর একবার দিলাম, তবু কিছুই হইল না। প্রাণপণ শক্তিতে ডালটা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম, পাথর নড়িল না। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমার পৌরুষের অহঙ্কারকে যেন বার বার পর্যুদস্ত করিয়া দিতে লাগিল। সেদিন সেই নিদাঘতপ্ত দ্বিপ্রহরে রুক্ষ জিকাটু পাহাড়ের শীর্ষে মর্মান্তিক রূপে পুনরায় অনুভব করিতে হইল যে. আমার একক প্রয়াস নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, মানব-মানবীর সম্মিলিত মনীষাই যে মনুষ্যজাতিকে জয়যাত্রার পথে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহার ইঙ্গিত অসভ্য যুগেও আমরা বারংবার পাইয়াছি। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারেই আমাদের একক অহঙ্কার বারংবার পরাজিত হইয়াছে। সংকল্প করিয়াছিলাম জোলমার সাহায্য লইব না, কিন্তু সে সংকল্প টিকিল না। জোলমা নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিল।

'দুইজনে মিলিয়া চাড় দিলে হয়তো পাথরটা নড়িবে। সাহায্য করিব?'

'বেশ, এস।'

জোলমা এবং আমি দুইজনে মিলিয়া চাড় দিতে লাগিলাম। একটু পরেই পাথরটা স্থানচ্যুত হইল এবং সশব্দে গড়াইয়া নিচে পড়িয়া গেল। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহা হইল। গুহার মুখটা বন্ধ হইয়া গেল। আপাতদৃষ্টিতে শঙ্খচূড়ের নির্গমনের আর কোনো পথ রহিল না। পাথরটা সরিয়া যাওয়াতে কিন্তু আর একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। গর্তের মুখে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম, যদি কিছু শোনা যায়। যাহা শোনা গেল তাহাতে কিন্তু শিহরিয়া উঠিলাম। শঙ্খচূড়ের তর্জন-গর্জন শোনা যাইতেছে। নিচের গুহার সহিত তাহা হইলে ইহার যোগ আছে। কাছেই একটা ছোট গোল

পাথর ছিল, সেটা গড়াইয়া আনিয়া গর্তের মুখটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিলাম। জোলমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

'শঙ্খচূড়ের তর্জন শোনা যাইতেছে। হয়তো এই গর্ত দিয়া ও আবার বাহির হইয়া আসিবে। এক কাজ করা যাক্—'

'কি?'

'তুমি গাছের শুষ্কপত্র ও ডালগুলি এদিকে লইয়া এস। ওগুলিতে আগুন লাগাইয়া গুহার ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া যাক। শঙ্খচূড় পুড়িয়া মরুক—'

আমাদের সকলের সঙ্গেই তখন চকমকি পাথর থাকিত। পাথরে পাথরে ঘষিয়া আমরা আগুন জ্বালাইতে পারিতাম। আমদের দুইজনের কাছেই চকমকি পাথর ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুষ্ক ডালপালাতে আগুন ধরিয়া উঠিল। গর্তের মুখ হইতে পাথরটি সরাইয়া একে একে সেগুলি গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর পাথর দিয়া গর্তের মুখটি যখন বন্ধ করিতেছি তখন জোলমা সহসা বলিল—'এই গুহায় নিশ্চয় আগে মানুষ বাস করিত। তাহারাই বোধহয় ওই বড় পাথরটা দিয়া এই ছিদ্রটা বন্ধ করিয়াছিল। নাগবংশীদের সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহা হয়তো মিথ্যা নয়। হয়তো এই শঙ্খচূড় তাহাদেরই কাহারও রূপান্তরিত মূর্তি। তাহাকে এমনভাবে দগ্ধ করাটা কি ভাল হইল? ও কি বল্‌গা হরিণদের মতো স্বেচ্ছায় আমাদের সকলের জন্য আত্মবিসর্জন করিল? চল, বৃহাকে সব কথা খুলিয়া বলি। আমার কেমন যেন ভয় করিতেছে।'

আমি জোলমার সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জোলমা কিন্তু আর কিছু বলিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইচ্ছা করিলেও সে যেন আর থামিতে পারিবে না। দেখিতে দেখিতে সে অনেক দূর নামিয়া গেল। আমিও নামিতে লাগিলাম। প্রান্তরে নামিয়া দেখিলাম জোলমা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে।

'জোলমা—জোলমা—'

জোলমা ফিরিয়া চাহিল না, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষশ্রেণী পার হইয়া আমার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলাম, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিবার সামর্থ আমার ছিল না, তবু যথাসম্ভব দ্রুতবেগেই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। জিকাটু পর্বতের সীমা সেই বৃক্ষ-বীথিকা যখন পার হইয়া গেলাম তখনও জোলমাকে দেখিতে পাইলাম না। কোন্ দিকে যাইব? বৃহার আস্তানার দিকে যাওয়া নিরাপদ মনে হইল না। টাহা, গৌ, বিতং এবং জোলমার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হইতে আমার প্রতি বৃহার মনোভাব যে কি তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। আমি জোলমার সহিত কোনো প্রকার ঘনিষ্ঠতা করি ইহা বৃহার অভিপ্রেত নয়। আমাকে নিঃশেষ করিবার জন্যই সে আমাকে জিকাটু পাহাড়ের গুহা অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিল। এখানে থাকিতে হইলে বৃহার নিকট আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। আমি বনের দিকেই অগ্রসর হইলাম। চলিতে চলিতে নানা কথা মনে হইতেছিল। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পর্বত-দেবতার যে নিগূঢ় আদেশ আমি শুনিয়াছিলাম তাহা অমান্য করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার সাহস আমার ছিল না। আমরা সে-যুগে এইরূপ অদ্ভুত সংস্কারের দ্বারাই চালিত হইতাম। জোলমাকে দেখিবার পর হইতে, বিশেষত তাহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, এ স্থান ত্যাগ করিবার বাসনাও

ত্যাগ করিয়াছি। জোলমাকে লাভ করিবার আশা আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। শক্তিশালী বৃহার বিরুদ্ধ মনোভাবকে অগ্রাহ্য করিয়াও আমাকে এখানে থাকিতে হইবে। জোলমার মনোভাব কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সে আমার সঙ্গিনী হইতে চায়; কিন্তু বৃহাকেও সে ছাড়িবে না বলিয়াছে। বৃহা যদি আমার সান্নিধ্য পছন্দ করিত, জোলমার প্রতি আমার এই মনোভাবকে সমর্থন করিত, তাহা হইলে কোনো গোল থাকিত না। কিন্তু বৃহা আমাকে বিনাশ করিতে চায়। আমি আর একটা ব্যাপারও ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বৃহা শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি, ইচ্ছা করিলেই সে আমাকে নিজের এলাকা হইতে দূর করিয়া দিতে পারে। প্রথম দিন যখন তাহার কাছে গিয়াছিলাম, কিংবা যে মুহূর্তে সে জোলমার প্রতি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল তখনই সে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিল না কেন—তোমাকে এখানে থাকিতে দিব না, এখানে তোমার স্থান নাই। ইহা বলিলে আমাকে চলিয়া যাইতে হইত। স্পষ্টভাবে আমাকে চলিয়া যাইতে না বলিয়া আমাকে এভাবে জিকাটু পাহাড়ে পাঠাইয়া বিষধর শঙ্খচূড়ের কবলে ফেলিবার কী প্রয়োজন ছিল? তখনও বুঝি নাই যে, বৃহা সহজ সরল বন্য প্রকৃতির এক ধাপ ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। সে-ই নিয়ম করিয়াছে যে, গৌ যদি কোনো আগন্তুকের আগমনে কোনো দুর্লক্ষণ দেখিতে পায় তাহা হইলে সে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া অভ্যর্থনা করিবে। আগন্তুক যদি শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করিতে চায়, বৃহা তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিবে। যে নিয়ম নিজেই সে প্রবর্তন করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ তাহার পক্ষে অশোভন। তাই সে কৌশল করিয়া বাঁকাপথে আমাকে সরাইতে চাহিয়াছিল। প্রথমে কিন্তু এত কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। কিংবা জানি না, হয়তো সে আমাকে পরীক্ষা করিতেছিল।

...বনে আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলাম পলিতকেশা গৌ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে ছুটিয়া আসিল।

'তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'জিকাটু পাহাড়ে।'

'জিকাটু পাহাড়ে? সর্বনাশ! সেখানে তোমাকে যাইতে মানা করিয়া গেলাম তবু গেলে কেন? সত্যই সেখানে গিয়াছিলে? সেখানে গেলে তো কেহ ফেরে না।'

আমি স্মিতমুখে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর বলিলাম, 'কিন্তু আমি ফিরিয়াছি। যে বিরাট শঙ্খচূড় নাগ এ অঞ্চলে সকলের মনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়াও আসিয়াছি।'

'বল কি! সেই সাংঘাতিক নাগরূপী প্রেতকে তুমি বধ করিয়াছ! এ অসম্ভব কী করিয়া সম্ভব হইল! বল, বল, সব খুলিয়া বল। একথা আমি যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। বিদেশি, তুমি মানুষ না ছদ্মবেশী দেবতা—'

গৌ সহসা আমার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার দুই জানু জড়াইয়া ধরিল। অনুভব করিলাম তাহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে না আনন্দে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া তুলিয়া ধরিলাম। তাহার পর হাসিয়া বলিলাম—

'আমি তোমাদের মতো মানুষ। যাহা করিয়াছি, তাহা তোমাদেরই জোলমার সাহায্যে করিয়াছি। জোলমা না থাকিলে একা আমি পারিতাম না।'

'জোলমা তোমার সঙ্গে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

গৌ-কে তখন আনুপূর্বিক সমস্ত কথা সবিস্তারে বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া গৌ প্রগল্‌ভা বালিকার মতো হাসিয়া উঠিল, তাহার পর হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, বলিতেও লাগিল, 'এইবার বন ময়ূরীর মন ফিরিয়াছে, এইবার সে ময়ূরের পেখমের শোভা দেখিয়াছে, এইবার সে নীড় বাঁধিবে। তাহার পর সহসা আবার থামিয়া গেল, আমার সম্মুখে বসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া বলিল, 'কিছু খাইয়াছ কি? মুখটি যে শুকাইয়া গিয়াছে।'

'না, এখনও কিছু খাই নাই।'

'চল, তোমার জন্য একটা নেউল মারিয়া রাখিয়াছি। আর একটা চমৎকার খাবারও তোমাকে খাওয়াইব। চল—'

হাত ধরিয়া গৌ আমাকে নিবিড় অরণ্যে লইয়া গেল। একটা গাছের তলায় দেখিলাম, মাটি খোঁড়া রহিয়াছে, কেহ যেন গর্ত করিয়া আবার গর্তটা বুজাইয়া দিয়াছে। গর্তের মাটি সরাইয়া গৌ মৃত নেউলটাকে বাহির করিল, তাহার পর নিজেই সে ত্বরিতহস্তে কিছু শুষ্কপত্র জড়ো করিয়া চকমকি পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইয়া ফেলিল।

'এটাকে ঝলসাইয়া তুমি তৎক্ষণ খাও। আমি আসিতেছি।'

তাহাকে কিছু বলিবার পূর্বেই সে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমারও বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। নেউলটিকে যখন প্রায় নিঃশেষ করিয়াছি, তখন গৌ ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে দেখিলাম, পাতায় মোড়া কি যেন রহিয়াছে।

'এগুলোকেও আগুনে একটু সেঁকিয়া লও, চমৎকার লাগিবে।'

দেখিলাম গৌ পাতায় মুড়িয়া প্রচুর পিপীলিকার ডিম লইয়া আসিয়াছে। বহুদিন পিপীলিকার ডিম খাই নাই, এতগুলি ডিম দেখিয়া রসনা লালায়িত হইয়া উঠিল। গৌ নিজেই সেগুলিকে আবার পাতা দিয়া মুড়িয়া লতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিল এবং আগুনের উপর ধরিয়া সেঁকিতে লাগিল।

...আহার শেষ করিয়াছি, সহসা টাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

'জোলমা, জোলমা—'

গৌ তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল!

'আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হইয়াছে, টাহাকে বলিও না। জোলমা যে তোমার সঙ্গে জিকাটু পাহাড়ে গিয়াছিল, একথা বলিবার দরকার নাই। টাহা এখনই গিয়া সব বৃহাকে বলিয়া দিবে। জোলমা নিজে গিয়া বৃহাকে কী বলে, তাহাই লক্ষ্য করা এখন দরকার। তুমি মুখ বুজিয়া থাক।'

গৌ চলিয়া গেল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম এবং যেদিক হইতে টাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছু দূর গিয়া আবার তাহার ডাক শোনা গেল।

'জোলমা, জোলমা, কোথায় তুমি—'

আমি দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম। আমাকে দেখিতে পাইয়া টাহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিল।

'জোলমা কোথায়? জোলমাকে দেখিয়াছ?'

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলাম, 'জোলমার তো বৃহার কাছে থাকা উচিত।'

'জোলমা সকালে এই বনের দিকে আসিয়াছিল, আর ফেরে নাই। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বৃহা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। যত লাল রং ছিল, সব বাহির করিয়া ওহালির কাঠে মাখাইতেছে। পাগলের মতো মাখাইয়া চলিয়াছে। ওহালির কাঠ বিরাট একটা রক্তপিণ্ডের মতো দেখাইতেছে। আমি বড় ভয় পাইয়া গিয়াছি। জোলমা যদি এখনও না ফিরিয়া থাকে, সর্বনাশ হইয়া যাইবে। আজ লাফাই পাহাড়ে মহা উৎসব, বহু হরিণ মারা পড়িয়াছে, কিন্তু বৃহা যদি ক্ষেপিয়া যায়—'

টাহা আর কিছু বলিতে পারিল না, টাহার বিবর্ণ মুখ ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বাকিটা প্রকাশ করিল।

'তুমি কতক্ষণ জোলমাকে খুঁজিতেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি। কোথাও সে নাই।

'এতক্ষণে হয়তো সে ফিরিয়া গিয়াছে। বাড়িতে গিয়া খোঁজ কর।'

আমার কথায় তাহার মনে যেন নতুন আলোকপাত হইল, আপন মনে মাথা নাড়িয়া সে বিড় বিড় করিয়া কী যেন বলিল বুঝিতে পারিলাম না।

'কী বলিতেছে?'

'কিছু নয়, তোমার কথাটা ভাবিয়া দেখিতেছি। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, হয়তো সে এতক্ষণে ফিরিয়া থাকিতেও পারে। ঠিক। আচ্ছা, তুমিই বা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকেও তো দেখিতে পাই নাই। তুমি জিকাটু পাহাড়ে যাইবে বলিয়াছিলে—'

'জিকাটু পাহাড় হইতেই আসিয়াছি।'

টাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল।

'হাঁ। সেখানে একটা গুহাও দেখিয়া আসিয়াছি।'

'গুহা? আর কিছু দেখ নাই। সেখানে শুনিয়াছি—'

'যাহা শুনিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। বিরাট এক শঙ্খচূড় সাপ সেখানে ছিল, তাহারই ভয়ে কেহ সেখানে যাইতে পারিত না, তাহারই কামড়ে বহু পশু প্রাণ হারাইয়াছে। আমার চোখের সামনেই বল্‌গা হরিণকে মরিতে দেখিলাম। কিন্তু শঙ্খচূড় আর নাই, তাহাকে নিধন করিয়াছি।'

'কী করিয়া?'

আমি স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলাম। জোলমার কথা বলিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু গৌ মানা করিয়া গিয়াছিল, বলিতে সাহস করিলাম না। টাহা আমার নীরবতার যে অর্থ করে করুক। টাহা কিন্তু ইহার একটি অর্থই করিল। তাহার মনে হইল যেহেতু আমি চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী সেই হেতু আমি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সেই জন্যই আমি জিকাটু পাহাড় হইতে জীবন্ত ফিরিতে পারিয়াছি। আমাকে নীরব দেখিয়া তাই সে নিজেই উত্তরটা দিয়া দিল।

'ও, তুমি তো পারিবেই। কুঠারের হাতলে যে অমন সুন্দর হরিণের মুখ আঁকিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছু নাই। আমাকে শিখাইয়া দিবে বলিয়াছিলে, মনে আছে তো?'

'আছে। শিখাইয়া দিব।'

কথাটা বলিয়াই কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল আমি টাহাকে শিখাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি টাহা শিখিতে না পারে তখন কী হইবে? সে নিশ্চয় মনে করিবে আমি যে বিশেষ মন্ত্রবলে চিত্রকর হইয়াছি সেই বিশেষ মন্ত্রটি তাহাকে শিখাইতেছি না। আমি যে দলে পূর্বে ছিলাম সেই দলেও এইরূপ সঙ্কটে মাঝে মাঝে আমাকে পড়িতে হইয়াছে। সকলে চিত্রকর হইতে পারে না, কিন্তু চিত্রকর হইবার সাধ

অল্প-বিস্তর সকলের মনেই জাগে। তখন তাহারা চিত্রকরের খোশামোদ করে, তাহাকে নানা রকম লোভ দেখায়। অনেক প্রকৃত চিত্রকর এই সব অপটু অক্ষম শিষ্যদের নানাভাবে ভুলাইয়া নিজেদের আয়ত্তাধীন রাখিবার চেষ্টা করেন। যাদুবিদ্যা, মন্ত্র, বিশেষ রকম লতাপাতার সংমিশ্রণ প্রভৃতির দোহাই দিয়া আসল কথাটা চাপিয়া যান। বিধিদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে যে চিত্রকর হওয়া অসম্ভব, এ কথাটা কেহ তাই মানিতে চায় না, মনে করে যে বিশেষ একটা তুক্‌তাক্ মন্ত্র বা উপকরণের সন্ধান পাইলেই বুঝি ছবি আঁকিতে পারা যাইবে এবং গুণী চিত্রকর ইচ্ছা করিলে সে সবের সন্ধান দিতে পারে। সে যুগে চিত্রকরের খুব সম্মান ছিল, বহুলোক তাহাকে দেব-অনুগৃহীত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মনে করিত, বহুলোক তাহার বশীভূত থাকিত। কিন্তু এজন্য তাহাকে নানারূপ সঙ্কটেও পড়িতে হইত। টাহার সম্পর্কে এইসব কথা মনে হওয়াতে বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলাম। টাহা আমার মুখেব দিকে ভক্তি গদ্‌গদ নেত্রে তাকাইয়াছিল। তাহার মনকে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া যাইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম, 'লাফাই পাহাড়ে উৎসব কখন হইবে?'

'একটু পরেই।'

'চল, সেইখানেই যাওয়া যাক—'

'কিন্তু জোলমা যদি না ফিরিয়া থাকে—'

'চল, সে খবরটাও লওয়া দরকার।'

বাধ্য বালকের মতো টাহা আমার অনুসরণ করিতে লাগিল।

পাঁচ

লাফাই পাহাড়ের নিম্নদেশে বহু বল্‌গা হরিণ পড়িয়াছিল। কাহারও পা ভাঙিয়া গিয়াছে, কাহারও ঘাড় মটকাইয়া গিয়াছে। কাহারও মস্তক বিদীর্ণ। একটা হরিণের শিং আর একটা হরিণের উদরে প্রবেশ করিয়াছে। স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে—নানাভাবে আহত, মৃত, নানা বয়সের হরিণ-হরিণীর দল। আহত হরিণগুলি করুণস্বরে চিৎকার করিতেছে। হরিণের স্তূপ হইতে একাধিক রক্তের ধারা সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে রক্ত-চর্চিত করিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে প্রকাণ্ড জনতা। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সকলে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও মধ্যে কোনো চঞ্চলতা নাই। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকের বৃক্ষশ্রেণীও জনপূর্ণ। আমি একটি বৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া আছি। টাহা আমাকে বসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি আকুল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি জোলমা কোথায়। কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না, আমার সম্বন্ধে বৃহাকে সে কিছু বলিয়াছে কি না জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিল।

...সহসা অনুভব করিলাম, দূর হইতে একটা মৃদু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। মৃদু কিন্তু অবিচ্ছিন্ন। ক্রমশ তাহা স্পষ্টতর হইতে লাগিল। হুম, হুম, হুম, হুম এই জাতীয় একটানা শব্দ একটা। সমবেত জনতার আগ্রহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। আকাশ বাতাস সেই শব্দেব ছন্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ছন্দের মোহে আমি অবশেষে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। জোলমার প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ যেন শব্দে রূপান্তরিত হইয়া দিগন্তসীমায় দিশাহারা হইয়া ফিরিতে লাগিল। আমার স্থূল দেহটাই যেন বৃক্ষশাখায় বসিয়া রহিল, আমার মন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল শব্দের তরঙ্গে তরঙ্গে নামহীন সমুদ্রের তটে তটে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমার বোধহয়

অবলুপ্ত হইয়া গেল। হুম হুম হুম ক্রমবর্ধমান এই শব্দের মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আমি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ বসিয়া রহিলাম। অকস্মাৎ সমবেত কণ্ঠের হর্ষধ্বনিতে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের গা বাহিয়া বিচিত্র সজ্জায় একটা শোভাযাত্রা মন্থরগতিতে প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইতেছে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে একটা চলন্ত বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের চূড়ায় বসিয়া আছে একটি শ্যেনপক্ষী। তাহার পিছনে আসিতেছে দুইটি নরনারীর শ্রেণী, একটি নরের পাশে একটি নারী, এইরূপ যুগল মূর্তির যুগ্মধারা নামিয়া আসিতেছে। প্রত্যেকের মাথায় শ্যেনপক্ষীর পাখা গোঁজা, প্রত্যেকেরই হস্তে কিশলয়-সমন্বিত ছোট একটা বৃক্ষশাখা, প্রত্যেকেরই কটিতে লতার বেষ্টনী, সেই বেষ্টনী হইতে ঝুলিতেছে কচি কচি ডালপালা, বিচিত্র আকারে পত্র, বহুবর্ণের পুষ্প। ইহাতে কটি হইতে উরুর মধ্যভাগ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, দেহের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। তাহার পিছনে একদল হরিণী সাজিয়া আসিতেছে। তাহাদের মাথায় হরিণের শিং বাধা। ইহাদের মধ্যে বিতংকে চিনিতে পারিলাম। জোলমা কোথায় গেল? শোভাযাত্রার শেষভাগে দেখিলাম বৃহা আসিতেছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠকায়, মাথার দীর্ঘ কেশ চূড়ানিবদ্ধ; চূড়ার ওপর একগুচ্ছ পলাশ ফুল, দেহের সম্মুখভাগে মৃগচর্ম-বিলম্বিত, স্কন্ধে প্রকাণ্ড একটা প্রস্তরকুঠার, কৃষ্ণকুঞ্চিত শ্মশ্রু-গুম্ফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, রক্তাভ আয়ত চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত, চক্ষুর দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত জ্যোতি। দলপতি হইবার উপযুক্ত চেহারা বটে। সহসা আমার সমস্ত বুকটা জ্বালা করিয়া উঠিল, মনে হইল বৃহার রক্ত ব্যতীত সে জ্বালা প্রশমিত হইবে না। অন্তরের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছে, বৃহার রক্তেই সে আগুন নিভিতে পারে। কিন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব? কোন্ অজুহাতে আমি জোলমার পিতাকে হত্যা করিব? হত্যা করিয়াই বা লাভ কি হইবে? জোলমার কথাগুলি মনে পড়িল—'বৃহাকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। তুমি জোর করিও না, আমাকে নিজের পথে চলিতে দাও—'

হঠাৎ দেখিলাম বৃহারও পশ্চাতে টাহা আসিতেছে, টাহার স্কন্ধে গৌ। গৌ-এর দুইহাতে বদ্ধপদ কয়েকটি তিত্তিরপক্ষী ছট্‌ফট করিতেছে। জোলমাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। সে কোথায়? শোভাযাত্রা পর্বত হইতে নামিয়া ক্রমশ প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী হইল। চলন্ত বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া নরনারীর শ্রেণী বৃত্তাকারে দাঁড়াইল। বহু কণ্ঠনিঃসৃত হুম হুম শব্দ সমস্ত প্রকৃতিকে স্পন্দিত করিতে লাগিল। মনে হইল একটা অস্পষ্ট বেদনা যেন বাঙ্ময় হইতেছে, এইবার বুঝি কিছু একটা ফাটিয়া যাইবে। হঠাৎ শব্দটা থামিয়া গেল, দেখিলাম প্রাঙ্গণসীমায় যে পাথরটা ছিল, তাহার ওপর বৃহা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চলন্ত বৃক্ষের ওপর যে শ্যেন পক্ষীটি ছিল, তাহা পাখা ঝট্‌পট করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার পা বৃক্ষশীর্ষে বাঁধা ছিল। টাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া গৌ চলন্ত বৃক্ষটির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। চলন্ত বৃক্ষ আর চলন্ত ছিল না, বৃত্তের মধ্যস্থলে তাহা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি মানুষেরই চতুর্দিকে ডালপালা ঘিরিয়া যে এই চলন্ত বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এইবার বেশ বোঝা যাইতে লাগিল। খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। শাখাপত্রের ভিতর হইতে একটা রক্তবর্ণের আভা কেবল দেখা যাইতেছিল।

...নিস্তব্ধতাকে সচকিত করিয়া গৌ সহসা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। দেখিলাম হস্তধৃত তিত্তিরপক্ষীগুলিকে সবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে উন্মাদিনীর মতো নৃত্য করিতেছে। তাহার মাথার পলিত কেশদাম যেন সর্প-শিশুর ন্যায় ফণা ধরিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গবর্ষী। নাচিতে নাচিতে সহসা সে থামিয়া গেল এবং একটা তিত্তিরপক্ষীর টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। পরমুহূর্তেই

দেখিলাম ছিন্নমুণ্ড তিত্তিরপক্ষী ধুলায় পড়িয়া ছট্‌ফট করিতেছে। টাহা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে তিত্তিরটিকে তুলিয়া শ্যেনপক্ষীর সম্মুখে আস্ফালন করিল, তাহার পর তাহা দূরে ছুঁড়িয়া দিল। ছুঁড়িয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যেনপক্ষীটি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, গৌ খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার শুরু হইল তাহার উন্মাদ নৃত্য, আবার সে আর একটা তিত্তিরপক্ষীর মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিল, টাহা আবার সেই রক্তাক্ত পাখিটা বৃক্ষচূড়াবদ্ধ শ্যেনকে দেখাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া দিল। বিরাট জনতা রুদ্ধ-নিশ্বাসে গৌ-এর কার্যকলাপ দেখিতেছে, আহত হরিণদের ক্ষীয়মান আর্তনাদ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। গৌয়ের অট্টহাস্যে মাঝে মাঝে সে আর্তনাদ ডুবিয়া যাইতেছে। অতি অদ্ভুত একটা জগৎ চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে জগৎ যেন পুরাতন জগৎ নয়, তাহা মানুষের সৃষ্টি, সম্পূর্ণ নতুন অভূতপূর্ব একটা পরিবেশ।

...গৌ একে একে সমস্ত তিত্তিরগুলিকে হত্যা করিল। টাহাও প্রত্যেকটি তিত্তির শ্যেনকে দেখাইয়া দেখাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। শেষ তিত্তিরটিকে ফেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যেনপক্ষীর পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল। নিমেষের মধ্যে সে আকাশে উড়িল এবং পরমুহূর্তেই একটি মৃত তিত্তিরকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। যে জনতা এতক্ষণ চিত্রার্পিতবৎ নীরব ছিল, এইবার তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল, শত শত কণ্ঠের হর্ষধ্বনি ও উৎক্ষিপ্ত বাহু উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষীকে অভিনন্দিত করিতে লাগিল।

...বৃহা কিন্তু বিচলিত হয় নাই; সে বাহু উত্তোলন করিয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়াছিল। এইবার দেখিলাম ধীরে ধীরে সে স্কন্ধ হইতে কুঠারখানি নামাইয়া পাশে রাখিল। তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া আকাশের দিকে চাহিল। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশের মেঘে মেঘে বর্ণের মহোৎসব শুরু হইয়াছে। বৃহা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিশাল জনতা সহসা যেন আবিষ্কার করিল যে, আকাশপটেও নীরবে একটা উৎসব শুরু হইয়াছে। ইহার অভিনবত্ব যে নতুন বিস্ময়ে তাহাদের নির্বাক করিয়া দিল। তাহারাও নীরব হইয়া গেল।

...কৃতাঞ্জলিবদ্ধ বৃহা কখন যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমি বুঝিতে পারি নাই। অভিনব ঘটনাপরম্পরার চমৎকারিত্বে আমি সত্যই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, মনে হইতেছিল, ইহা যেন বাস্তব নয়, আমি কোনো স্বপ্নলোকে নীত হইয়াছি। এই অসম্ভব স্বপ্নলোকে আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কোনো মূল্য আছে কি না, সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাই মনে মনে নির্ধারণ করিতেছিলাম, বৃহা কখন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে টের পাই নাই।

...সহসা শুনিতে পাইলাম, বৃহা গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছে, 'আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্রি অনন্যকর্মা হইয়া অন্ধকারে গুহা-গাত্রে ছবির পর ছবি আঁকিয়া হরিণ-দেবতার যে অর্চনা করিয়াছিলাম, সে অর্চনা যে বিফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমাদের সকলের সম্মুখে আজ স্তূপীকৃত রহিয়াছে। আমাদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য দেবতা হরিণরূপে আসিয়া আত্মদান করিয়াছেন; একা নয়, দলে দলে আসিয়াছেন, লাফাই পাহাড়ের শিখর হইতে পড়িয়া নিজেকে আঘাত করিয়াছেন, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, নিজেকে বিনাশ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা আমরা তাঁহার মাংসে পুষ্ট হইয়া তাঁহারই আরাধনা করি। ওই মৃত মৃগস্তূপের মধ্যে যে সব মৃগ এখনও মরে নাই, তাহাদের করুণ কণ্ঠস্বর শোন। করুণ সুরে স্বয়ং দেবতাই বলিতেছেন—'আমাকে বধ করিয়া আমার মাংস আহার কর। আমাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আমি নব নব রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের হিতার্থে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলাইয়া দিই।

যাহারা আমাকে পূজা করে, তাহাদের নিকট আমি আত্মদান করি। যে রূপে যে মূর্তিতে আমাকে অর্চনা করিবে সেই রূপে সেই মূর্তিতেই আমি তোমাদের কাছে ধরা দিব। তোমরা হরিণের ছবি আঁকিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছ, হরিণরূপেই তোমাদের নিকট ধরা দিয়াছি। আমাকে বধ করিয়া ভক্ষণ কর।' আমরা যদি মন দিয়া শুনি আহত হরিণের কণ্ঠস্বরে এই কথাই শুনিতে পাইব। আজ আর একটা অদ্ভুত কথাও তোমাদের বলিতে চাই। যে আকাশকন্যা ওহ্‌লি অহোরাত্র আকাশে নিত্যনতুন চিত্রের নমুনা দিয়া আমাকে উৎসাহ দিতেছে, এই মুহূর্তেও আকাশের মেঘে মেঘে যাহার চিত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই প্রেরণায় আমি কিছুদিন পূর্বে দেবতার নবরূপ কল্পনা করিয়া বন্য মহিষের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আজ খবর পাইয়াছি দেবতা আমার অর্চনায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাদের বনে বন্য-মহিষের দল আসিয়াছে। বন্য-মহিষ কিন্তু বল্‌গা হরিণ নহে। বীরত্বের পরিচয় না পাইলে মহিষ-দেবতা আত্মদান করে না। আমার অর্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের কাছে আসিয়াছেন, শৌর্যের পরিচয় দিলে তিনি আত্মদান করিবেন। সে পরিচয় আমাকেই দিতে হইবে, আমি অবসরমতো সে পরিচয় একদিন দিব। তোমরা যথাকালে তাহার সংবাদ পাইবে। আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমার কার্য আরম্ভ করিব। যে ছবির প্রভাবে আমরা দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছি, সে ছবির প্রেরণা দিয়াছিল আকাশ-কন্যা ওহ্‌লি, তাহার প্রেরণা এখনও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে; কিন্তু ওহ্‌লি-কন্যা জোলমা যদি না থাকিত কেবলমাত্র প্রেরণা লইয়া আমি ছবি আঁকিতে পারিতাম না। গুহার অন্ধকারে জোলমা প্রদীপ হস্তে দিনের পর দিন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার সান্নিধ্য, তাহার পবিত্র সৌন্দর্য, তাহার নীরবতা আমার অন্তরে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তাহাই আমার ছবির প্রাণ। জোলমা আমার পার্শ্বে না থাকিলে আমি ছবি আঁকিতে পারিব না। শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য চিরকুমারী জোলমাকে আমার পার্শ্বে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতে। জোলমা তাহাতে সম্মত আছে। ওহ্‌লি-কন্যা জোলমা দেবী। তোমরা দেবীরূপে তাহাকে বন্দনা কর, দেবীরূপে তাহাকে রক্ষা কর, কাহারও লালসা যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। কোনো পুরুষের লালসা যদি তাহাকে কলঙ্কিত করে, তাহার আলো আর আমার ছবিকে উজ্জ্বল করিবে না, তাহার সান্নিধ্য আর আমাকে উৎসাহ দিবে না। এই কথা তোমাদের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য জোলমাকে দেবীরূপে আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, দেবীরূপেই তোমরা তাহাকে পূজা কর।'

বৃহা ধীরে ধীরে প্রস্তরবেদী হইতে অবতরণ করিয়া বৃত্তমধ্যবর্তী সেই চলন্ত বৃক্ষের নিকট আসিল। তাহার পর কটিবন্ধন হইতে একটি প্রস্তর-ছুরিকা বাহির করিয়া তাহার ডালপালাগুলি কাটিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত গাছটাই মাটিতে পড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে দেখিলাম জোলমা দাঁড়াইয়া আছে। জোলমার সেকি অদ্ভুত মূর্তি! তাহার সর্বাঙ্গ নানা বর্ণে রঞ্জিত। বাহু এবং উরু দুইটিতে টকটকে লাল রং, কনুই হইতে হাত পর্যন্ত এবং জানু হইতে পা পর্যন্ত সবুজ, গ্রীবা হইতে কোমর পর্যন্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডলে লাল এবং কালোর ডোরাকাটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী জোলমা প্রসারিত করপল্লবে একটি প্রদীপ ধরিয়া নিমীলিত নয়নে দাঁড়াইয়া আছে। সহসা লক্ষ্য করিলাম বিরাট জনতা শ্রদ্ধায় শির অবনত করিয়াছে। সেই শ্রদ্ধাপ্লুত নীরবতা কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ অট্টহাস্যে বিঘ্নিত হইল। চাহিয়া দেখিলাম গৌ হাসিতেছে। আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কোমরে দুই হাত দিয়া হাসিতেছে। হাসি না আর্তনাদ? ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গৌ আর সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল না, হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। জোলমা দেখিলাম

নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, মৃন্ময় প্রতিমা। সকলেই দেখিলাম নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে, এমন কি বৃহা পর্যন্ত। বৃহা যাহা বলিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য আমি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে দর্শন পরবর্তী যুগে সর্বদেশের ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রভাবিত করিয়াছে, যাহা তোমাদের বেদে উপনিষদে বিশদতররূপে ব্যক্ত, সেই অসভ্য যুগেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। অসভ্য মানবের মানসপটেই দেবতা প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারাই বৃক্ষে, নদীতে, পর্বতে, প্রস্তরে, পশুতে, পক্ষীতে, সূর্যে, চন্দ্রে, এমনকি মৃত্যুর ভয়াবহতার মধ্যেও দেবতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুসারে সমাজ ও জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। তবু আমি বৃহার কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না, আমার মনে হইতেছিল—কী যে মনে হইতেছিল—তাহাও ঠিক প্রকাশ করিতে পারিব না—বৃহার কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বৃহা যে ভণ্ডামি করিতেছে, একথা সজ্ঞানে ভাবিবার সাহসও আমার ছিল না, কিন্তু তবুও মনে হইতেছিল কোথায় যেন কী একটা গলদ আছে। বল্‌গা হরিণের দলকে ফাঁদে ফেলিয়া তাহার পর সেটাকে দেবতার নামে চালানো কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকিতেছিল। মনে হইতেছিল, শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের প্রভুত্ব অটুট রাখিবার জন্য বৃহা নিজেই নিজেকে ভুলাইতেছে; তাহার ছবি আঁকিবার ক্ষমতাই তাহার চোখে মোহের অঞ্জন পরাইয়াছে। সে ভণ্ডামি করিতেছে না, সে যাহা বলিল তাহার প্রত্যেক কথাটি সে নিজে বিশ্বাস করে। তাহার ধারণা জোলমা চিরকুমারী না থাকিলে শ্যেন সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি নিজে দেবতায় কম বিশ্বাসী ছিলাম না, পর্বতদেবতার আদেশ শুনিয়াই আমি এই দেশে বসবাস করিব স্থির করিয়াছিলাম, তবু কিন্তু বৃহার কথায় আমার কেমন যেন অবিশ্বাস হইতেছিল; মনে হইতেছিল, বৃহা নিজের শিল্প-প্রেরণার মোহে জোলমার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। আমি আমার অবিশ্বাস অনুসারেই চলিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হই নাই। আমার বিফলতার জন্য যে দুর্ঘটনাকে দায়ী করিয়াছিলাম, এখন মনে হয় তাহার পিছনে বিধাতার ইঙ্গিত ছিল। মনে হয় আমার নিজের মোহ, জোলমার প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি হয়তো আমাকেও ভুল পথে চালিত করিয়াছিল।

...গৌ চলিয়া যাইবার পর নীরবতাটা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন দুই বিভিন্ন মনোবৃত্তি নীরব হিংস্রতায় পরস্পরের সহিত পাঞ্জা লড়িতেছে। বিরাট জনতা যেন রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য উৎসুক হইয়া আছে। বৃহা সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিল। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল—'শ্যেন বংশের স্থাপয়িত্রী গৌ অট্টহাস্য করিয়া আমার ইচ্ছাকে সমর্থন করিয়া গেল ইহাতে আমি আনন্দিত। এইবার আমাদের উৎসব শুরু হোক।'

তাহার পর নৃত্য শুরু হইল। যে নর-নারীরা যুগ্ম শ্রেণীতে বৃক্ষরূপিণী জোলমার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা ধীরে ধীরে অঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। নাচিতে নাচিতে ক্রমশ তাহারা জোলমার নিকট আসিল এবং বৃহা যে গাছের শাখাগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল, সেইগুলি একে একে তুলিয়া আবার লতা দিয়া বাঁধিতে লাগিল। বৃক্ষবীথির ভিতর দিয়া বেগে বায়ু বহিলে যে ধরনের মর্মরধ্বনি হয়, সেই ধরনের শব্দ শুনিয়া আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঝড় উঠিতেছে কি না। ক্ষণপরেই আমার ভুল ভাঙিল। বুঝিতে পারিলাম নর্তক-নর্তকীরাই মুখে ওইরূপ শব্দ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে জোলমা পুনরায় চলন্ত বৃক্ষে রূপান্তরিত হইল। আবার সে পর্বত অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। নরনারীর দল নাচিতে নাচিতে আবার তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম তাহাদের মুখনিঃসৃত মর্মরধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। আশা করিয়াছিলাম ইহারা বোধহয় পুনরায় পাহাড়ের গা বাহিয়া ওপরে উঠিবে, কিন্তু

তাহা উঠিল না। পাহাড়ের সানুদেশে যে প্রকাণ্ড ফাটলটা ছিল তাহার ভিতরেই জোলমা অদৃশ্য হইয়া গেল। যে অন্ধকার গুহায় বৃহা ছবি আঁকে, এই ফাটলটা যে তাহার আর একটা প্রবেশপথ তাহা পরে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। আমার সহিত বৃহার প্রথম যে স্থানে সাক্ষাৎ হয় তাহা ওই গুহা-প্রবেশের আর একটা দ্বার। চলন্ত বৃক্ষরূপী জোলমা ফাটলের ভিতর অন্তর্ধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যপরা নরনারীর দল আবার ফিরিল। এবার তাহাদের নাচের ভঙ্গি ও গানের সুর বদলাইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ সর্বাঙ্গে ছিল মৃদু হিল্লোল, মুখে ছিল মর্মরধ্বনি, এবার দেখিলাম উদ্বাহু হইয়া প্রত্যেকে উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে, প্রত্যেকের কণ্ঠে কলহাস্য ছন্দিত হইয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে যেন এক ঝাঁক কলহংস আকাশকে সচকিত করিয়া উড়িয়া আসিতেছে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা আসিয়া আবার প্রাঙ্গণে সমবেত হইল, এবার আর বৃত্তাকারে দাঁড়াইল না, জনতার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বৃহা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল— বস্তুত তাহার এই নীরবতা, এই নির্বাক নিয়মানুবর্তিতা,—আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, আতঙ্কিতও করিতেছিল। তাহার এই যন্ত্রবৎ ব্যবহারই সকলের মনে সভয় সম্ভ্রম বিস্তার করিয়া তাহাকে অসাধারণ স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, সকলের ধারণা হইয়াছিল যে সে মানুষ নয়, দেবতা। মানুষ এত স্থির, ধীর, অচঞ্চল, মিতবাক হইতে পারে না। আমি অনুভব করিতেছিলাম কেবলমাত্র শিল্প-প্রতিভার জন্য নয়, এই অসাধারণ সংযমের জন্যই বৃহা আজ শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি। পরবর্তী জীবনেও বারংবার আমি ইহা অনুভব করিয়াছি। কেবল প্রতিভা নয়, অসাধারণ চরিত্রই মানুষকে শ্রদ্ধাপদ করে। বৃহার চরিত্র শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলের মধ্যেই প্রভাবও বিস্তার করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ সেই বিরাট জনতায় কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না, সমস্তই যেন সুনিয়ন্ত্রিত। অদৃশ্য এক দেবতার পূজায় সকলেই যেন সংযত, সশ্রদ্ধ। বৃহা কুঠারটি তুলিয়া লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। হরিণস্তূপের ভিতর হইতে যেই একটি আহত হরিণ করুণকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, অমনই বৃহা কথা কহিল। "ওই শোন, দেবতা আবার বলিতেছেন, 'আমাকে বধ কবিয়া আমার মাংস তোমরা ভক্ষণ কর।' দেবতার আদেশ পালন করিতে আর আমি বিলম্ব করিব না।"

বৃহা কুঠার হস্তে সেই হরিণস্তূপের উপর উঠিয়া গেল এবং যে হরিণগুলি মরে নাই, আহত হইয়া চিৎকার করিতেছিল, তাহাদের একে একে হত্যা করিতে লাগিল। কুঠারের প্রতি আঘাতের সহিত জনতার ভিতর হইতে সমস্বরে রব উঠিতে লাগিল— 'হে দেবতা, তুমিই ধন্য! হে দেবতা, তুমিই ধন্য।। হে দেবতা, তুমিই ধন্য।'

...বৃক্ষের কাণ্ডে ঠেস দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কতকগুলি পেচকের কর্কশ কোলাহলে জাগরিত হইয়া দেখিলাম সকলে চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার, বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না, লাফাই পাহাড়টা কেবল বিরাট একটা অন্ধকার পিণ্ডের মতো আকাশকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিশেষ কিছু শোনাও যাইতেছে না, এমন-কি কীটপতঙ্গের শব্দ পর্যন্ত নয়। যে বিরাট এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এখানে কিছুক্ষণ আগে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহার ভীষণতায় সমস্ত প্রকৃতি যেন আতঙ্কবিহ্বল। পেচকগুলা বোধহয় পথ ভুল করিয়া আসিয়াছিল, আসিয়াই ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। আমি প্রস্তরযুগের অসভ্য মানুষ, হত্যা করিয়া জীবন-ধারণ করিতেই আমি অভ্যস্ত, পশুর প্রতি সদয় হইবার নীতি তখনও আমি শিখি নাই, কিন্তু যে অনুভূতি হইতে এই নীতির জন্ম সেদিন অন্ধকারে একা বৃক্ষচূড়ায় বসিয়া অস্পষ্টভাবে যেন সেই অনুভূতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল বৃহার কথা যদি সত্য না হয়, তাহার লোভই দেবতার ছদ্মবেশে সকলকে ভুলাইতেছে — আমার এই

অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেবতা কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? বৃহা কি নিস্তার পাইবে? অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম, মানসপটে ধীরে ধীরে যে ছবি ফুটিয়া উঠিল তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও ফোটে নাই—অসংখ্য আহত হরিণের অসহায় মুখচ্ছবি, চোখের দৃষ্টিতে করুণ মিনতি। সহসা শিহরিয়া উঠিলাম। অন্ধকার যেন হাসিয়া উঠিল। নারী কণ্ঠের হাসি। উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম ক্ষণকাল। আবার হাসির শব্দ পাওয়া গেল, মনে হইল দূর অন্ধকারে কাহারা যেন চাপাকণ্ঠে কথাও কহিতেছে। আমি আর গাছে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। নামিয়াই দেখিলাম ঠিক গাছের তলায় কাহারা যেন ছিল, আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনে হইল মৃত হরিণদের প্রেতাত্মারা বোধহয় অন্ধকারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। পায়ের নিচের মাটি মনে হইল ভিজা, বেশ যেন কাদা-কাদা, বৃষ্টি তো হয় নাই, তবে...সহসা বুঝিতে পারিলাম...হরিণের রক্তে কাদা হইয়া গিয়াছে। বৃহার পেশীসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ মূর্তিটা চোখের ওপর ভাসিয়া উঠিল...বিশাল প্রস্তরকুঠার তুলিয়া হরিণের পর হরিণ কাটিয়া চলিয়াছে...কর্তিত মুণ্ড দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেছে—উৎসাকারে রক্তধারা নিঃসৃত হইতেছে—লুব্ধ জনতা সাগ্রহে চিৎকার করিতেছে, 'হে দেবতা, তুমিই ধন্য, হে দেবতা, তুমিই ধন্য!' হাসির শব্দ অন্ধকারকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এবার কাছে নয়, বেশ একটু দূরে। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। অগ্রসর হইব ভাবিতেছি, এমন সময় নারীকণ্ঠে কে যেন প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না, না, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও। প্রতিবাদের সুর পরমুহূর্তে হাসির হিল্লোলে ভাসিয়া গেল। কে যেন হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

...চাঁদ উঠিতেছে। চন্দ্রালোকে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। হাসির কারণ আবিষ্কার করিয়াছি। শ্যেন সম্প্রদায়ের সমস্ত নর-নারী মিলনোৎসবে মাতিয়াছে। প্রত্যেকের হাতে এক এক টুকরা হরিণের মাংস, প্রত্যেকের সঙ্গে একজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী। পাহাড়ের সানুদেশে, উপত্যকায়, গুহায়, বৃক্ষবীথিকার আলো আঁধারিতে সর্বত্র ওই এক দৃশ্য। আমি পাগলের মত একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। টাহা যে পথে আমাকে বন হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছিল তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। যে পথ দিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম, তাহাই আমাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লাফাই পর্বতের কাছে লইয়া আসিতেছিল। একটা অদ্ভুত মায়াপুরীর অদৃশ্য জালে আমি যেন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। জোলমার জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, মনে হইতেছিল বনে গিয়া যদি আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরে বসিতে পারি জোলমার দেখা পাইব, জোলমা নিশ্চয় সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। বনে ফিরিবার পথ কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, লাফাই পাহাড়ের চতুর্দিকে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মিলনোন্মত্ত নর-নারীর হাসি, তর্জন, কলোচ্ছ্বাস আমাকে আরও উদভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। আমাকে কেহ গ্রাহ্যও করিতেছিল না, আমি কাছে গেলে কেহ দূরে সরিয়া যাইতেছিল, কেহ বা যাইতেছিল না, আমি নিজেই তখন সরিয়া যাইতেছিলাম। নিজের আচরণে নিজেই আমি বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম। আমার চরিত্রে যে এত শক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না, জীবনে যে কোনো দিন এমন আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারিব তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছিল জোলমার জন্য। আমার কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছিল অসংযমের স্রোতে গা ভাসাইলে জোলমাকে পাইব না। জোলমা দেবকন্যা, তাহাকে পাইতে

হইলে সংযত হইতে হইবে। তাই সেদিন চন্দ্রালোকিত রজনীতে লাফাই পাহাড়ের আকাশে-বাতাসে যখন লালসার বিদ্যুৎসঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল তখন আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। প্রেমই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল।

...সহসা লক্ষ্য করিলাম একটা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কে যেন আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আর একটু নিকটে আসিতে বুঝিতে পারিলাম লোকটি পুরুষ, দেখিলাম একটি নারীও তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া রহিয়াছে। পুরুষটি তাহার দুই বলিষ্ঠ বাহুতে নারীটিকে শিশুর মতো ধরিয়া রাখিয়াছে। আমার কাছাকাছি আসিয়া নারীটি পুরুষের বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম গৌ।

গৌ বলিল, 'তুমি একা ঘুরিতেছ যে? জোলমাকে খুঁজিতেছ বুঝি? আজ জোলমাকে পাইবে না। তাহাকে বৃহা আজ দেবী বানাইতেছে, আজ আর তাহার নাগাল পাইবে না, আর কাহাকেও জুটাইয়া লও। আজ আমাদের লাফাই পাহাড়ে অনেক সম্প্রদায়ের লোক আসিয়াছে। হংস, ডাহুক, শঙ্খচিল, সজারু, শশক—লোকের অভাব নাই। কাহারও সঙ্গে ভাব করিয়া ফেল। আজ রাত্রে একা থাকিতে নাই। এই দেখ না, আমার তিনকাল গিয়া এককাল ঠেকিয়াছে, আমিও একজন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়াছি। এটি কে জান? আমার বড় দৌহিত্রীর বড় দৌহিত্র। সারস বংশের দলপতি। একপাল হংসীকে লইয়া মাতিয়াছিল, আমি ডাক দিতেই আসিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। ছোকরার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে লইয়া গাছে উঠিতেছিল এমন সময় আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম, দেখিলাম তুমি একা,—ও কি, তুমি অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন, বৃহার ভূত তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে নাকি—এই রে তবেই সারিয়াছে, দাঁড়াও তোমার ভূত ছাড়াই'—গৌ অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল। বকুনি থামাইয়া সহসা সে ছুটিয়া আসিয়া বাম হস্তে আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল এবং ভঙ্গিভরে দক্ষিণ হস্তটি মাথার ওপর রাখিয়া কোমর দুলাইয়া গান ধরিল—'গাছের ডালে ফুল ধরিয়াছে। সূর্য রোজ আসিয়া খবর লয়, চাঁদ রোজ আসিয়া উঁকি দেয়, ফল কবে ধরিবে। ফল আন, ফল আন, ওগো ফুল আন. ফুলের কানে কানে বাতাস বলে। সূর্য খবর লয়, চাঁদ উঁকি দেয়—বাতাস কানে কানে বলে—ওগো ফুল ফল চাই, ফল ফল ফল'—বলিতে বলিতে সহসা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। তাহার পর বলিল,—'চল তোমাকে হংসীদের সহিত আলাপ করিয়া দিই। আমার মনের মানুষটির সঙ্গেও আলাপ কর, ঝিংটু, বিদেশি অতিথিকে গান শোনাও তুমি—তোমার সেই সারস পাখির গানটা—'

ঝিংটু একটু হাসিয়া আমার দিকে চাহিল, তাহার পরে তারস্বরে গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল—'সারস আকাশে ওড়ে চাঁদের আলোতে, দিনের বেলা ছবি দেখে নদীর জলেতে, নিজের নয় হংসীর, ডাহুকীর. ময়ূরীর, কপোতীর, রাতের বেলা উড়ে বেড়ায় চাঁদের আলোতে, সারস আকাশে ওড়ে— '

তাহার পর সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার হাসির সহিত মিশিল গৌ-এর খিলখিল হাসি। দূর হইতে কাহাদের কলহাস্য ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম একদল নরনারী পাহাড়ের সানুদেশ বাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। গৌ বলিল—'চল আমরাও যাই।' আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। গৌ বলিতে বলিতে চলিল—'জোলমা তোমার বিরুদ্ধে বৃহাকে কিছু বলে নাই, সুতরাং তোমার আশা আছে। তুমি যদি লাগিয়া থাক ওর দেবিত্ব বেশি

দিন টিকিবে না। তুমি যখন শঙ্খচূড়কে কাবু করিয়াছ, উহাকেও কাবু করিতে পারিবে। কিন্তু খুব সাবধানে অগ্রসর হও। বৃহা শক্তিশালী শ্যেনপক্ষী, অন্ধ বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। ওহালি উহাকে অন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভুল পথে ভীষণ বেগে বৃহা উড়িয়া চলিয়াছে, উহার সামনে পড়িয়া গেলে তীক্ষ্ণ নখ চঞ্চু দিয়া তোমাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিবে, উহার পাখার ঝাপট সহ্য করিতে পারিবে না। তোমাকে খুব সাবধানে চলিতে হইবে।'

'আমি যে বনে ছিলাম সে বনের পথটা কোন্ দিকে? কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না।'

'আর একটু গেলেই দেখিতে পাইবে। আমার কথাগুলি মন দিয়া শোন। বৃহার ওসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস করিও না, কিন্তু অবিশ্বাস করিতেছ ইহাও বৃহাকে বুঝিতে দিও না। বৃহা পাগল, অন্ধ এবং পাগল, সেই জন্যই ভয়ানক। জোলমাকে চিরকুমারী করিয়া রাখিতে চায়। বলে কি না জোলমা কুমারী না থাকিলে ছবি আঁকা হইবে না। জোলমার মা ওহালি তো কুমারী ছিল না, সে তবে কী করিয়া বৃহাকে ছবি আঁকা শিখাইল! আর ছবি না আঁকিলে হরিণ আসিবে না, এই বা কেমন কথা! ঝিংটু তো ছবি আঁকে না, তাহাদের কাছে কি হরিণেরা যায় না? যত সব আজগুবি কাণ্ড। বৃহার বাপ ছিল পাগল। সে প্রতিটি পাথরে দেবতা দেখিত আর তাহার ওপর মাথা কুটিত। মাথা কুটিতে কুটিতে শেষকালে মাথা ফাটিয়া মরিয়া গেল। আর টাহার বাবা ছিল বোকা। কিছু বলিলেই ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত আর ফিক ফিক করিয়া হাসিত। আমার দুই ছেলে তাই দুই রকমের অদ্ভুত হইয়াছে। একটা পাগল আর একটা বোকা। টাহা বোকা হোক তাহার ছেলেমেয়ে হইয়াছে, বংশ থাকিবে। কিন্তু বৃহা এ কী করিতেছে? এ আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। শোন, জোলমাকে তুমি ভোলাও। তুমি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, তুমি ছবি আঁকিতে পার, তুমি পারিবে। বৃহাকে ভুলাইবার আয়োজন আমি নিজে করিতেছি। দেখি সে কতক্ষণ নারীকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। হরিণ দেবতা নয়, শিশুই দেবতা, হতভাগাটা একথা কিছুতেই বুঝিবে না! শিশু দেবতা বলিয়াই যে নারীর গর্ভে শিশু আসে, সে নারী উপেক্ষণীয় নয়। একথা তাহাকে বুঝাইয়া তবে আমি ছাড়িব। আমি ক'দিন বাঁচিব? টাহা-বৃহার বংশধরেরা যদি সংখ্যায় বেশি হয়, তবেই না তাহারা তিত্তিরদের নিঃশেষ করিতে পারিবে? বৃহা অপুত্রক থাকিলে এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। ঝিংটু, তোমার দলের মেয়েরা প্রস্তুত আছে তো?'

ঝিংটু উত্তর দিল, 'আছে। তাহারা গোপনে গোপনে বৃহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। ওই বোধহয় একজন এই দিকেই আসিতেছে।'

'ডাক উহাকে—'

ঝিংটু সারসের ডাক ডাকিয়া উঠিল। ডাক শুনিয়া দূরে যে ছায়ামূর্তিটি গাছের আলো-আঁধারিতে দাঁড়াইয়াছিল সে আগাইয়া আসিল। দেখিলাম সম্পূর্ণ নগ্না একটি যুবতী। তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চলিবার ভঙ্গিতে কামনা উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। আমাকে অপাঙ্গে একবার দেখিয়া ঝিংটুর দিকে চাহিল।

'বৃহার খবর কী?'—ঝিংটু প্রশ্ন করিল।

'বৃহা নিজের আস্তানা ছাড়িয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে কেহ জানে না। খি, পুরা, নিংকা, নোনা চারিদিকে তাহার খোঁজে বাহির হইয়াছে। খবর পাইলেই তাহারা আমাকে এবং টুংগাকে খবর দিবে। টুংগা পাহাড়ের ধারে অপেক্ষা করিতেছে।'

'বেশ, তুমিও অপেক্ষা কর। কাজ হাসিল করা চাই কিন্তু।'

মেয়েটি আমার দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া মৃদু হাসিল। তাহার পর আবার গিয়া গাছের ছায়ায় দাঁড়াইল। কিছু দূর গিয়া দেখিলাম বিতং হরিণ সাজিয়া ছুটিতেছে, তাহার পৃষ্ঠে একটি একটি মেয়ে তাহার গলা জড়াইয়া রহিয়াছে। আমার শিরায় উপশিরায় রক্তস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন একটু সু-উচ্চ পর্বতশিখরের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছি, নিচেই অতলস্পর্শী গহ্বর, একটু বিচলিত হইলেই পড়িয়া যাইব। পড়িয়া গেলে কিন্তু জোলমাকে আর পাইব না, এই ধারণাটা যেন আমাকে আগলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তে তবু মনে হইতেছিল, আর বোধ হয় পারিলাম না, এইবার বোধ হয় পা ফসকাইয়া গেল।

'এই তোমার বনে যাইবার পথ'—গৌ সহসা কথা কহিয়া উঠিল। অনর্গল কথা কহিবার পর গৌ কিছুক্ষণ নীরব ছিল। সম্ভবত আপন মনে কিছু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল। আমরাও নীরবে তাহার অনুসরণ করিতেছিলাম। গৌ-এর কথা শুনিয়া আমি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। সম্মুখে দেখিলাম একটি পথ বিসর্পিত রেখায় চলিয়া গিয়াছে। আমি গৌকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া সোজা সেই পথ দিয়া ছুটিতে লাগিলাম। সহসা মনে হইল এই মায়াপুরী হইতে পলায়ন না করিলে আমার পতন অবশ্যম্ভাবী এবং পতন হইলে জোলমাকে আমি আর পাইব না, কিছুতেই পাইব না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম।

নিজের সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বৃহার উদাত্ত আহ্বানে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

'বিদেশি, বিদেশি, কোথায় আছ তুমি সাড়া দাও—' বৃক্ষকোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া কিন্তু বৃহাকে দেখিতে পাইলাম না। প্রথমে চোখে পড়িল বনের যে বৃক্ষহীন অংশটুকু চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল সেই অংশে হামাগুড়ি দিয়া কাহারা যেন সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে। মুখ তুলিতেই চিনিতে পারিলাম। ঝিংটুর সেই নারীবাহিনী। প্রত্যেকেরই চোখ জ্বল জ্বল করিতেছে। চোখের তারায় প্রতিফলিত চন্দ্রালোকে কামনার লেলিহান দীপ্তি। মানবী নয়, যেন বাঘিনী।

'বিদেশি কোথায় তুমি'—আবার বৃহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া নিচে নামিতে নামিতে আশঙ্কা হইল বৃহার সহিত এখনই হয়তো বোঝাপড়া হইবে। প্রস্তর-কুঠারের হাতলটা চাপিয়া ধরিয়া রহিলাম, কী জানি বৃহা আচমকা যদি আক্রমণ করিয়া বসে। নিচে নামিবা মাত্র বৃহাকে দেখিতে পাইলাম। সে ঠিক গাছের নিচেই ছিল। বৃহা যাহা বলিল, তাহাকে আমি কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম। তাহার নিকট এ আচরণ প্রত্যাশা করি নাই।

বৃহা বলিল, 'বিদেশি, তোমার বীরত্বে এবং ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। জিকাটু পাহাড়ে গিয়া বিষধর শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া তুমি শ্যেন সম্প্রদায়কে বিভীষিকামুক্ত করিয়াছ। তোমাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। জোলমার প্রতি যে ভদ্র ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতেও আমি আনন্দিত। আজ তাই এমন একটা কার্যের ভার তোমার উপর দিতে আসিয়াছি, যাহা পাইলে শ্যেন সম্প্রদাযের যে কোনো লোক নিজেকে ধন্য মনে করিত। এই কার্য যদি তুমি সুসম্পন্ন করিতে পার, শ্যেন সম্প্রদায় তোমাকে আত্মীয়রূপে গণ্য করিবে। দলপতিরূপে আমিও তোমার যে কোনো প্রার্থনা পূর্ণ করিব।'

'আমাকে কোন্ কার্য করিতে হইবে, বলুন—'

'এই বনে বন্য-মহিষের দল আসিয়াছে। আমি কাল সশস্ত্র হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইব। তোমাকে আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে।'

'আর কে থাকিবে।'

'টাহা।'

'আমি নিশ্চয় যাইব। আমার কিন্তু একটি নিবেদন আছে, শুনিবেন কি?'

'শুনিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কী চাও, তাহা আমি জানি। জোলমার কাছে সব শুনিয়াছি। জোলমাকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে, শ্যেন সম্প্রদায়ের জীবনমরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই অমোঘ বিধান মানিয়াও যদি তুমি জোলমাকে সঙ্গিনীরূপে পাইতে চাও, আমার আপত্তি নাই। তোমার চরিত্র, তোমার বীরত্ব, তোমার ছবি আঁকিবার ক্ষমতা জোলমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমিও মুগ্ধ হইয়াছি। আমি যখন থাকিব না তখন তুমিই দলপতি হইবে। সে যোগ্যতা তোমার আছে। তখন কুমারী জোলমা হয়তো, একদিন তোমারই পার্শ্বে অন্ধকার গুহায় প্রদীপ ধরিয়া তোমার ছবিকে উজ্জ্বল করিবে। আমার ইহাতে আপত্তি নাই—'

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম।

'কাল আমার সহিত যাইতেছ তাহা হইলে?'

'যাইব।'

বৃহা আর কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার বিশাল মূর্তি বৃক্ষের অন্তরালে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল। আমিও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার সমস্ত সত্তা যে উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল এখনই একটা অঘটন ঘটিবে। পরমুহূর্তেই বৃহার চিৎকার শুনিতে পাইলাম।

'এ কি এ কি এ কি করিতেছ! ছাড়িয়া দাও আমাকে, ছাড়। কাল আমাকে মহিষ-দেবতার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাকে নষ্ট করিও না, আমি অপবিত্র হইয়া যদি দেবতার কাছে যাই, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না; আমার মৃত্যু হইবে—ছাড়, ছাড়—'

সম্মিলিত নারীকণ্ঠের কলকাকলীতে বৃহার কণ্ঠস্বর নিমজ্জিত হইয়া গেল। তাহার কোনো কথা আমি শুনিতে পাইলাম না।

...পরদিন বৃহা, টাহা এবং আমি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বনপথ অতিক্রম করিতেছিলাম। বৃহার স্কন্ধে ছিল ধনুক এবং হস্তে ছিল সেই বিরাট প্রস্তর কুঠারটা, যাহা দিয়া সে অবলীলাক্রমে শত শত হরিণ কাটিয়াছে, টাহার স্কন্ধেও ধনুক ছিল, তা ছাড়া হাতে ছিল একটা বর্শা এবং বর্শা ছুঁড়িবার একটা যন্ত্র, আমার ছিল প্রস্তরকুঠার এবং ধনুর্বাণ। জোলমা যে বৃক্ষ শীর্ষে বসিয়া মহিষের দলটিকে দেখিয়াছিল, আমরা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম। কাহারও মুখে কোনো কথা ছিল না, চক্ষু কর্ণ এবং নাসিকার সাহায্যে আমরা একাগ্র চিত্তে কেবল পারিপার্শ্বিক পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। কথা বলিবার অবসর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। আমরা প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করিতেছিলাম দুর্ধর্ষ মহিষের দল অতর্কিতে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দিক হইতে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। নিরাপদে কোনো বৃক্ষে আরোহণ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। কিন্তু কোথায় গিয়া কোন্ বৃক্ষে আরোহণ করিব, তাহা ঠিক করিবার পূর্বে মহিষের দলটি কোথায় আছে, জানা প্রয়োজন। জোলমা যে বৃক্ষ হইতে তাহাদের দেখিয়াছিল,

সেই বৃক্ষ অভিমুখেই তাই আমরা চলিয়াছিলাম। বৃক্ষতলে আসিয়া বৃহা আমাদের দিকে একবার চাহিল, তাহার পর নিঃশব্দে নিজেই বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। আমরা দুইজন নিচে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। একটু পরে বৃহা নামিয়া আসিল এবং মাথা নাড়িল। বুঝিলাম বৃহা মহিষের দলকে দেখিতে পায় নাই। বৃহা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চলিবার পরও কিন্তু শিকারের সন্ধান মিলিল না। বৃহা দাঁড়াইয়া পড়িল এবং আমরা পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল বৃহার চোখের জ্যোতি যে ম্লান দেখাইতেছে। তাহার পরই লক্ষ্য করিলাম তাহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। সে একবার টাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় আমার দিকে চাহিল। মনে হইল যে কোনো গুহ্য খবর সে ব্যক্ত করিতে চায়, কিন্তু কথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করা নিরাপদ মনে করিতেছে না। আমরাও সে খবরটা জানিতে পারিয়াছি কি না তাহাই সে ভুরু নাচাইয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমরা কেহই কিছু বুঝিতে পারি নাই। বৃহা কিছুক্ষণ এইভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির অভাবের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল তখন খবরটি ব্যক্ত করিল। ভাষার দ্বারা নয়, ইশারায়। আঙুল দিয়া কয়েকটি পশু-পদচিহ্ন দেখাইয়া দিল। আমরা এগুলি দেখিতে পাই নাই। ঝুঁকিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেগুলি যে কোন্ পশুর পায়ের চিহ্ন তাহা বোধগম্য হইল না! আমি অন্তত এরূপ পদচিহ্ন পূর্বে দেখি নাই। টাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল টাহাও দেখে নাই।

বৃহা তখন চুপি চুপি বলিল, 'দেবতা আবার আর এক রূপে আমাদের দেখা দিতেছেন। আমি একদিন দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছি, দাড়িওয়ালা একদল ঘোড়া মধ্যে মধ্যে এই বনে যাতায়াত করিতেছে। এগুলি তাহাদেরই পায়ের দাগ। মনে হইতেছে ইহারাই মহিষের দলকে দূরে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।'

বৃহার কথাটা তুচ্ছ করিবার মতো নহে।

বলিলাম—'তাহা খুবই সম্ভব। ম্যামথরা বল্‌গা হরিণের দলকে তাড়াইয়া দেয়। আর একটু আগাইয়া দেখা যাক তাহা হইলে। হয়তো আর একটু গেলে তাহাদের সন্ধান মিলিবে—'

আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে অরণ্যের এক বৃক্ষবহুল স্থানে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে যেন আকাশচুম্বী মহীরূহদল পরামর্শ করিয়া সমবেত হইয়াছে। অবর্ণনীয় গাম্ভীর্যে সমস্ত স্থানটা পরিপূর্ণ। শাখাপত্রের মধ্যে প্রবহমান বাতাসও যেন উচ্চ শব্দ করিতে সাহস করিতেছে না। মৃদু মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সহসা টাহা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম সে বর্শাটা ফেলিয়া দিয়া মাটিতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃহাও শুইয়া পড়িল। তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাহারা একটা দেবদারু গাছের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কী যেন বলিতেছে। আমিও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর আমিও দেখিতে পাইলাম। দেবদারু শীর্ষে শ্যেনপক্ষী বসিয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম কুলদেবতাকে ইহারা সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। আমার কী করা উচিত সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না। অপরের কুলদেবতাকে ইতিপূর্বে কখনও প্রণাম করি নাই। থানকু বলিয়াছিল. করিলে আমাদের কুলদেবতা ব্যাঘ্র ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যখন শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়রূপে বসবাস করিব ঠিক করিয়াছি তখন ইহাদের কুলদেবতাকে অবহেলা করাও কি ঠিক হইবে? জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং শ্যেনপক্ষীটিকে প্রণাম করিলাম। অন্তরের অন্তস্তলে কিন্তু একটা অপমানের কাঁটা যেন খচখচ করিতে লাগিল, মনে হইল

জোলমাকে পাইবার জন্য এই হীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই বৃহার প্রতি মন বিরূপ হইয়া উঠিল। মনে হইল বৃহা যেন আমাকে একটা উদ্ভট ফাঁদে ফেলিয়া আমার ধর্ম নষ্ট করিতেছে, আমার ব্যাঘ্র দেবতাকে যেন শ্যেনপক্ষীর নিকট নতিস্বীকার করাইতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্যেনপক্ষী কর্কশ ভাষায় কী যেন বলিয়া উড়িয়া গেল। দেখিলাম বৃহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অপরাধীর মতো সে বার বার উড্ডীয়মান শ্যেনকে প্রণাম করিতে লাগিল, তাহার পর আমরা তিনজনেই তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বৃহার ভ্রূ যুগল আবার একটু একটু কম্পিত হইতে লাগিল। টাহার দিকে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল—'কুলদেবতা হয়তো ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। চল উহাকেই আমরা অনুসরণ করি।'

...আমরা পূর্বদিকে যাইতেছিলাম, শ্যেনপক্ষীকে অনুসরণ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর চলিবার পর ছোট ছোট ঘন জঙ্গল আরম্ভ হইল। সেই জঙ্গলের ভিতরই পথ ধরিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম, সহসা তিনজনকেই যুগপৎ থামিয়া যাইতে হইল। পশুরা চরিবার সময় ঘাস ছেঁড়ার যে রকম শব্দ হয় ঠিক সেই রকম শব্দ পাওয়া গেল। কাছেই ছিল কয়েকটা বড় গাছ। আমি একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। বৃহা এবং টাহাও এক একটা গাছে উঠিল। গাছের শীর্ষদেশে উঠিয়া আমি একটা বন্য-মহিষকে দেখিতে পাইলাম। জঙ্গলের ঠিক ওপারেই তৃণাচ্ছাদিত একটা মাঠ রহিয়াছে। মাঠের ওপারে নদী। মাঠটা ঢালু হইয়া নদীর দিকে নামিয়া গিয়াছে। সেই ঢালুর ওপর পুরুষ-মহিষটা চরিতেছে। ভীষণদর্শন স্বয়ং কালান্তক যম যেন। আশেপাশেই দলটাও আছে নিশ্চয়। বৃহা এবং টাহাও মহিষ দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম মাটিতে নামিয়াই তাহারা আনন্দাবেগে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাদের কুলদেবতা ইঙ্গিতে তাহাদের যে ঠিক স্থানটিতে লইয়া আসিয়াছেন এই আনন্দেই তাহারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছিল। আমার দিকে ফিরিয়া বৃহা আমাকে গাছ হইতে নামিতে ইঙ্গিত করিল। মনে হইল আমার প্রতি তাহার প্রসন্নতা যেন আর একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

...নিম্নকণ্ঠে তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। ঠিক হইল তিন দিক হইতে আক্রমণ করিতে হইবে। যে মাঠে মহিষগুলি চরিতেছে সেই মাঠ হইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার একটি পথ নিশ্চয়ই আছে। একাধিক পথও থাকিতে পারে, কিন্তু একটি পথ নিশ্চয়ই আছে, সেই পথ দিয়াই মহিষের দল জঙ্গল হইতে বাহির হয় এবং জঙ্গলে ঢোকে। আমাকে সেই পথটি আবিষ্কার করিয়া সেই পথের ধারে কুঠারহস্তে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। তাড়া খাইয়া মহিষের দল যদি জঙ্গলে ঢোকে আমি তাহাদের আক্রমণ করিব। টাহা পূর্বদিকে এবং বৃহা পশ্চিমদিকে গিয়া নানারূপ শব্দ করিতে করিতে জঙ্গল হইতে বাহির হইবে। শব্দ শুনিয়া মহিষের দল তাহাদের আক্রমণ করিতে পারে, তখন তাহারা কুঠার ও বর্শা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইবে। আক্রমণ না করিয়া মহিষেরা জঙ্গলে ঢুকিতে পারে, কিংবা নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। জঙ্গলে আমি কুঠারহস্তে অপেক্ষা করিব, নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলে তিনজনে মিলিয়া তীর ছুঁড়িব। এই পরামর্শ করিয়া তিনজনে তিনদিকে অগ্রসর হইলাম।

...মাঠের দিক হইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পথটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ কিছু সময় লাগিল। পথের ধারেই কিন্তু বেশ একটি বড় গাছ পাওয়া গেল, আমি অবিলম্বে তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়া সানন্দে দেখিলাম গাছের একটি মোটা ডাল ঠিক পথের উপরই বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যদি মহিষরা এদিকেই আসে, গাছের ডালে বসিয়াই কুঠার চালাইতে পারিব, নিচে নামিতে হইবে না।

...গাছে উঠিয়া মহিষগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। পুরুষ মহিষটি সত্যই ভীষণ-দর্শন। কুঠারের আঘাতটা যদি সজোরে ঠিক উহার মাথার উপর না পড়ে তাহা হইলে উহাকে কাবু করা যাইবে না। দুইটি মহিষী এবং দুইটি বাছুরও আছে দেখিলাম। বাছুরদের মধ্যে একটা যদি আসে এক আঘাতেই শেষ করিতে পারিব। মহিষী দুইটিও বেশ বলিষ্ঠকায়া। উহাদেরও সহজে কায়দা করা যাইবে না। মাথায়, কোমরে কিংবা পিছনের পায়ে মারিতে না পারিলে, অর্থাৎ এক আঘাতেই চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিতে না পারিলে অভিযান ব্যর্থ হইবে। অনেক দিন পূর্বে একবার মহিষের মাংস খাইয়াছিলাম, বড় ভাল লাগিয়াছিল। মহিষগুলির সুপুষ্ট কান্তি আমার রসনাকে লালায়িত করিয়া তুলিল। হঠাৎ বোহিলার কথা মনে পড়িয়া গেল। বোহিলাই আগুন জ্বালিয়া মহিষের রংটা ঝলসাইয়া দিয়াছিল। বোহিলার কালো মুখে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুইটা যেন মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। বোহিলা শুধু আমার নয়, আমাদের দলের সকলেরই প্রেয়সী ছিল। তাহার ক্ষুদে চোখে বিদ্যুৎ খেলিত। বোহিলার কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মহিষগুলিকে দেখিতেছিলাম। নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে। একটা মহিষী বোধ হয় প্রহরায় নিযুক্ত আছে। সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। বৃহা বা টাহার কোনো সাড়াশব্দ নাই। মাঠটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য গাছের আরও খানিকটা উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখি অরণ্য পশ্চিম দিকেও মাঠকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পূর্বদিক হইতে টাহার তাড়া খাইয়া মহিষের দল পশ্চিম দিকের জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িতে পারে। পশ্চিম দিকে অবশ্য বৃহা আছে। কিন্তু বৃহার চিৎকার অগ্রাহ্য করিয়া এবং বৃহাকে বিধ্বস্ত করিয়াও তো ঢুকিতে পারে। এই সম্ভাবনাতে মনটা বিষণ্ণ হইয়া গেল। বন্য মহিষের মাংস অনেক দিন খাই নাই, আমাদেরও অঞ্চলে কচিৎ উহাদের দেখা মেলে। শুধু এই জন্যই যে বিষণ্ণ বোধ করিতেছিলাম তাহাও নয়, মনে হইতেছিল অদ্যকার এই অভিযানের সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে আমি জোলমাকে পাইব কি না। বৃহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। যে কারণে সেদিন বৃহা আমাকে বিষধর শঙ্খচূড়ের মুখে পাঠাইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই হয়তো আজ হিংস্র মহিষের সম্মুখে আনিয়াছে। যেমন করিয়া হোক আমাকে বিনাশ করাই তাহার উদ্দেশ্য, আমার মধ্যে সে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বুঝিয়াছে আমাকে জীবন্ত রাখিলে চলিবে না। শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছি, বন্য মহিষদেরও যদি বধ করিতে পারি তাহা হইলে শক্তি পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইব। ইহার পরেও বৃহা হয়তো আরও নানা প্রকার কৌশল করিবে—তা করুক, জোলমা আমার সপক্ষে আছে—আজ কিন্তু অন্তত একটা বন্য মহিষ শিকার করিয়া তাহার কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিব আশা করিয়া আসিয়াছিলাম। মহিষগুলি হয়তো পশ্চিম দিকের জঙ্গলে ঢুকিয়া হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে এই সম্ভাবনায় তাই বিমর্ষ বোধ করিতে লাগিলাম।

...অরণ্যের যে অংশটা মাঠের পশ্চিমদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সেই অংশটুকু ভাল করিয়া দেখিতেছিলাম। ওই অংশে জঙ্গলে প্রবেশ করিবার কোনো পথ আছে কি না। বৃহা হয়তো এখনই ওই দিক হইতে বাহির হইবে। ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া হঠাৎ কিন্তু যাহা দেখিয়া ফেলিলাম তাহাতে শরীরের রক্তস্রোত ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল। দেখিলাম পশ্চিম দিকে জঙ্গলের যে অংশটুকু নদীর তীর পর্যন্ত আসিয়াছে, নদী ও অরণ্যের সেই সঙ্গমস্থলে, বিরাট একটি ব্যাঘ্র ওঁৎ পাতিয়া আছে। রৌদ্র ছায়া ও জঙ্গলের সহিত তাহার গায়ের রং এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে, প্রহারারত মহিষী তাহাকে দেখিতে পায় নাই, গন্ধও পায় নাই, কারণ বাতাস উল্টা দিকে বহিতেছিল। দেখিলাম বাঘের লক্ষ্য ওই মহিষগুলি। বাঘ না হইয়া যদি অন্য কোনো

জন্তু হইত আমি চিৎকার করিয়া বৃহা টাহাকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ব্যাঘ্র যে আমার কুলদেবতা। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম এবং রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম পুরুষ মহিষটা চরিতে চরিতে বাঘের দিকেই আগাইয়া যাইতেছে। নিঃসংশয়ে অনুভব করিতে লাগিলাম যে, স্বয়ং কুলদেবতা যখন মহিষগুলি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছেন আমার আর কোনো আশা নাই। আমার ভবিষ্যতের ছবিটাই যেন দেখিতে দেখিতে বদলাইয়া গেল। আজ যদি মহিষ-শিকারে ব্যর্থকাম হই বৃহার জয় হইবে। আমাকেই সে হয়তো এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করিয়া এখান হইতে দূর করিয়া দিবে। বলিবে এই বিদেশির জন্যই মহিষ-দেবতা আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। বৃহার জয় হইবে, জোলমাকে আর পাইব না, একথা মনে হওয়া মাত্র শরীরের সমস্ত রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, রগের শিরাগুলি দপদপ করিতে লাগিল। গাছের উপর উঠিয়া চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিবার বাসনা না জাগিলে এ উভয় সঙ্কটে পড়িতাম না। কৌতূহলের আতিশয্যে জীবনে অনেকবার বিপদে পড়িয়াছি, এবারও পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে অবশেষে তাহাই করিলাম, নিরুপায় হইয়া তোমরা আজও যাহা করিয়া থাক। দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম। কুলদেবতা ব্যঘ্রকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলাম, 'তুমি স্বয়ং যখন দেখা দিয়াছ, আমার আর কিছুই করিবার নাই। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই তুমি জান। তোমাকে বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, চিরকাল পূজা করিব। তোমাকে চিরকাল রক্ষা করিয়াছি; চিরকাল রক্ষা করিব। আমার ভবিষ্যতের ভালমন্দ সব তোমার হাতে অর্পণ করিতেছি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' আমার প্রার্থনার জন্য কিনা জানি না, কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই বাঘ পুরুষ মহিষের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, দারুণ চিৎকার করিয়া মহিষটাও লাফাইল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম বাঘ মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং মহিষ তাহাকে গুঁতাইবার জন্য মাথা নিচু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মহিষী দুইটিও মাথা নিচু করিয়া বাঘের দিকে ছুটিতেছে। নিমেষের মধ্যে ভূপতিত বাঘ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বিরাট গর্জনে অরণ্যভূমি প্রকম্পিত করিয়া পুরুষ মহিষটার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক থাবা মারিল। মহিষ ছিটকাইয়া পড়িল কিন্তু মরিল না। আবার ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করিল। মহিষী দুইটিও ইতিমধ্যে বাঘের পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে গুঁতাইতে শুরু করিয়াছিল। প্রচণ্ড গর্জন করিয়া বাঘ আবার শূন্যে লাফাইয়া উঠিল এবং অরণ্যের প্রান্ত ঘেঁষিয়া এমন জায়গায় আসিয়া বসিল যেখানে পিছন দিক হইতে মহিষরা তাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। মহিষের দল অর্ধ-বৃত্তাকারে মাথা নিচু করিয়া বাঘের দিকে আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঘ থাবা গাড়িয়া বসিয়া ল্যাজ আছড়াইতেছিল, সহসা আবার লাফাইয়া উঠিয়া পুরুষ মহিষটির পিঠে বসিয়া ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। মহিষও এক ঝটকায় মাটিতে ফেলিয়া দিল তাহাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার লাফাইয়া উঠিল এবং এবার অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করিল একটা বাছুরকে। থাবার এক আঘাতে বাছুরটাকে বোধহয় মারিয়াই ফেলিল, কারণ আর সে উঠিল না। পুরুষ মহিষটা একটু দূরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে গজরাইতেছিল। হয়তো আবার তাহাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হইত, কিন্তু আর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দেখিলাম বৃহা বনের ভিতর হইতে বাঘকে লক্ষ্য করিয়া তাহার কুঠার উত্তোলন করিয়াছে। দেখিবামাত্র আমার মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বৃহার হাতে আমার কুলদেবতার জীবন বিপন্ন দেখিয়া আমি ভুলিয়া গেলাম যে, আমি বৃহার অতিথি, ভুলিয়া গেলাম যে বৃহা জোলমার পিতা। আমার অতি-অতি-বৃদ্ধা-মাতামহী, যিনি ব্যাঘ্রমাংস আহার করিয়া ব্যাঘ্রকে আমাদের কুলদেবতা

করিয়াছিলেন, যাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই—তিনিই সহসা যেন আমার অন্তরতম সত্তায় কথা কহিয়া উঠিলেন। সেই বন্যা ব্যাঘ্রী-রূপিণী নগ্না রাক্ষসীর আর্তকণ্ঠ যেন শুনিতে পাইলাম, 'তোমার বংশমর্যাদা নষ্ট হইতেছে দেখিতেছ না? চুপ করিয়া বসিয়া আছ? চক্ষুর সম্মুখে তোমার বংশের প্রতীককে এমনভাবে লাঞ্ছিত হইতে দিবে? ও যে তোমার শত্রু, এখনও চিনিতে পার নাই? জোলমাকে পাইতে হইলেও যে উহাকেই নিপাত করিতে হইবে তাহা কি এখনও বোঝ নাই? এই সুযোগ, কুলদেবতাকে রক্ষা কর, জোলমাকে অধিকার কর, আত্মসম্মান বাঁচাও। ওঠ, ওঠ, ওঠ।'

আমার সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—ওঠ, ওঠ, ওঠ। নিমেষের মধ্যে আমি ধনুকে শর যোজনা করিলাম এবং পরমুহূর্তেই আমার বাণ বৃহার মস্তক বিদীর্ণ করিল। ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় বৃহা পড়িয়া গেল। বৃহার আর্তনাদে সচকিত হইয়া বাঘ আবার লাফাইয়া উঠিল এবং বৃহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বৃহা তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল একবার, তাহার পরই থামিয়া গেল। বৃহার চিৎকারে মহিষরাও ভীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা বৃহাকে দেখিতে পাইল না। বাঘ তাহাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আর একটা চিৎকার শুনিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ তাহারা পূর্বমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় চিৎকারটা টাহার। টাহা শুধু চিৎকার করে নাই, মহিষদের লক্ষ্য করিয়া সে বর্শাও নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঝড়ের বেগে ক্ষিপ্ত মহিষের দল তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। টাহাকে বাঁচাইবার জন্য এবার আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। যে বিবেক সেদিন আমার মধ্যে জাগরিত হইয়াছিল তাহারই আলোকে আমি সেদিন কর্তব্যের এক অভিনব মূর্তি দেখিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল কুলদেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য বৃহাকে হত্যা করা যেমন আমার কর্তব্য এই শিকার-অভিযানে ইহাদের আমি সাহায্য করিব এই প্রতিশ্রুতি পালন করাও তেমনি আমার কর্তব্য। এক ভাইকে হত্যা করিয়া আর এক ভাইকে বাঁচাইবার চেষ্টা তোমরা আজও কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছ না কি? আমিও আমার সেদিনকার বিবেকের আলোকে তাহাই মনে করিয়াছিলাম। অকৃত্রিম আগ্রহ সহকারেই আমি টাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম।

...দ্রুতবেগে বন হইতে বাহির হইয়া মাঠে পড়িলাম। মাঠে গিয়া দেখি মহিষের শৃঙ্গাঘাতে টাহা ভূশায়ী হইয়াছে। আরও দেখিলাম টাহার বর্শা পুরুষ মহিষটার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে। বাঘের আক্রমণে সে ইতিপূর্বেই আহত হইয়াছিল, টাহার বর্শার আঘাত তাই আর সহ্য করিতে পারে নাই, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। টাহাকে ভূপাতিত করিয়াছিল একটি মহিষী। দ্বিতীয় মহিষীটি দূরে মৃত বৎসটিকে ঘিরিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ঘুরিতেছিল। বৎসটি সম্ভবত তাহারই। আর একটা বাছুর আরও দূরে ছুটাছুটি করিতেছিল, মাঝে মাঝে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল। এ বাছুরটি নিতান্তই শিশু, এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা তাহার জীবনে ইতিপূর্বে বোধহয় আর ঘটে নাই।

...টাহা ভূপাতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ থামাই নাই। সবেগে প্রস্তর-কুঠার চালাইতেছিল। আমি ছুটিয়া গিয়া পিছন দিক হইতে মহিষীর কোমরে সজোরে কুঠারাঘাত করিলাম। মহিষী সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িল। বসিয়া পড়িতেই কুঠারটা তুলিয়া লইয়া আবার তাহার মাথায় আঘাত করিলাম। টাহার কুঠারাঘাতে তাহার মুখের সম্মুখভাগটা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, আমার কুঠারাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। টাহা নিজে কিন্তু সাংঘাতিক আহত হইয়াছিল। মহিষী তাহার

পেট চিরিয়া দিয়াছিল, অন্ত্রগুলা বাহির হইয়া ঝুলিতেছিল। বুঝিলাম সে আর বাঁচিবে না। আমাকে দেখিয়া মরণোন্মুখ টাহার মুখ আশায় আশ্বাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিল :

'বিদেশি তুমি আসিয়াছ, তোমার ওই ছবি-আঁকা কুঠারখানা আমাকে একবার দাও। ওটা দিয়া আমি একবার মহিষটাকে আঘাত করি। আহা, একটা ছবি-আঁকা কুঠার যদি আমার থাকিত মহিষ আমার কিছু করিতে পারিত না।'

আমি আমার কুঠারখানা তাহার হাতে দিতে মৃত মহিষীকে সে একবার আঘাত করিল। আঘাত করিতে গিয়া সে বুঝিল যে শরীরে শক্তি নাই, হাত উঠিতেছে না। তখন আমার দিকে করুণনেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'বিদেশি, ইহজন্মে আর তোমার নিকট ছবি আঁকা বোধ হয় শেখা হইল না। চোখে অন্ধকার দেখিতেছি। আমাকে বাড়ি লইয়া চল। বৃহা কোথায়—'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আমি যে বৃহাকে বিনাশ করিয়াছি এ সত্য কথা বলিবার সাহস ছিল না। বৃহা যে মারা গিয়াছে এ কথা বলিতেও বাধিতেছিল।

'বৃহা কোথায়?'

আবার টাহা প্রশ্ন করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলাম, 'বৃহা মারা গিয়াছে—'

'মারা গিয়াছে! শ্যেনবংশও এবার ধ্বংস হইবে। রাক্ষসী গৌ চক্রান্ত করিয়া এই সর্বনাশ করিল। বৃহা জানিত সে আর ফিরিবে না, আসিবার সময় একথা সে আমাকে বলিয়াছিল—'

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা একটা নতুন ধরনের যুক্তি মনে হওয়াতে আশ্বস্ত হইলাম। বৃহাকে হত্যা করিয়া সত্যই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কুলদেবতাকে রক্ষা করিবার জন্য কর্তব্যবোধেই এই নৃশংস কার্য করিয়াছিলাম, মনের ভিতর কিন্তু কেমন যেন খচখচ করিতেছিল, মনে হইতেছিল এই অজুহাতে জোলমাকে অধিকার করিবার পথ সুগম করিবার জন্যই আমি এই কৃতঘ্ন করিলাম। টাহার কথায় কিন্তু মনে হইল আমি হয়তো উপলক্ষ মাত্র, স্খলিতচরিত্র আচরণ বৃহা নিজের মরণ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে এবং তাহার সহায়ক হইয়াছে তাহার মা। মানসপটে সেই ছবিটা ভাসিয়া উঠিল—চন্দ্রালোকিত অরণ্যের আড়ালে উলঙ্গিনী মায়াবিনীর দল হামাগুড়ি দিয়া বাঘিনীর মতো নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছে। উহারাই বৃহার মৃত্যুর কারণ, আমি নয়। সহসা মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। একটা ঘড় ঘড় শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমাকে দেখিয়া পুরুষ মহিষটি প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে আগুন ছুটিতেছে। যদিও তাহার নাক দিয়া গলগল করিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল, উঠিতে গিয়া যদিও মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, তবু মনে হইল সে নিরস্ত হইবে না, প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া আমকে আক্রমণ করিবেই। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া টাহার কুঠারটা লইয়া ছুটিয়া গেলাম এবং যেমন করিয়া কাঠ চেলায় তেমনিভাবে তাহার মাথার ওপর কুঠার চালাইতে লাগিলাম। মাথা চৌচির হইয়া গেল। যে বাছুরটা দূরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া সে এক ছুটে বনের ভিতর অন্তর্ধান হইল। যে মহিষীটি তাহার মৃত বৎসকে ঘিরিয়া আক্রোশে গর্জন করিতেছিল, সেও সবেগে তাহার অনুসরণ করিল। উপর্যুপরি তিন তিনটি মৃত্যু দেখিয়া তাহারা বোধহয় অনুভব করিল যে, আপাতত এখন রণে ভঙ্গ দিয়া আত্মরক্ষা করাই সমীচীন। কিন্তু বাছুরটি যে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না তাহা পরমুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম। আমার কুলদেবতা ব্যাঘ্র বনের ভিতর হইতে আবার গর্জন করিয়া উঠিল এবং তাহার পরই দেখিতে পাইলাম মহিষ শাবকটিকে মুখে

লইয়া সে নদীর তীরলগ্ন ঝোপের অন্তরালে একলম্ফে অদৃশ্য হইয়া গেল।

'ওটা কিসের গজর্ন? বাঘের মনে হইল—' টাহা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল।

'বাঘেরই।'

'আমাকে বাড়ি লইয়া চল।'

আমি একটু মুশকিলে পড়িলাম। তিন-তিনটি মৃত মহিষকে অরণ্যপ্রান্তে এমন অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। অন্য কোনো জন্তু আসিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। আর কেহ না আসুক, শকুনি-গৃধিনী তো নিশ্চয় আসিবে। অথচ টাহার এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়াও যে উপায় নাই। মরণোন্মুখ মানুষের শেষ ইচ্ছা পালন করা উচিত—থানকু বলিয়াছিল। না করিলে প্রেতরূপে সে আসিয়া প্রতিশোধ লইবে। প্রত্যেক মানুষই যে মরিবার পর প্রেতরূপ ধারণ করে এ ধারণা আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমরা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছিলাম। ভক্তিতে নয়, ভয়ে। আমরা কী করিয়া যেন বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের জীবন্ত পেশী-শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়াও আর একটা এমন শক্তি আছে যা দেহাতীত, যাহা অদৃশ্যচারী, যাহা মৃত্যুর সহিত জড়িত এবং সেই জন্যই তাহা ভয়ঙ্কর। টাহা একটু পরেই মরিবে, মরিয়া এমন শক্তিলাভ করিবে যাহা মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি, যাহা আমার ভবিষ্যৎকে নির্মাণ অথবা ধ্বংস করিতে পারে।

'বিদেশি, আমাকে বাড়ি লইয়া চল—'

'এখনই লইয়া যাইতেছি—'

...মৃত মহিষগুলির একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম। আজকাল তোমরা যাহাকে 'তুক' বল, আমাদের বিপদসঙ্কুল জীবনে তাহাই আমাদের সহায় ছিল। থানকুর নিকটই জানিয়াছিলাম—এবং অনেক সময় পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি যে, কুলদেবতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিলে অপহরণের আশঙ্কা থাকে না। আমার কুলদেবতা তো নিকটেই বনের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই মনে মনে স্মরণ করিয়া বলিলাম—আমার জিনিসপত্রগুলি তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, ফিরিয়া আসিয়া আবার যেন পাই। আমার অতি-বৃদ্ধা মাতামহী যিনি এই ব্যাঘ্রবংশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার মূর্তিও মনে মনে স্মরণ করিলাম। তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার কথা শুনিয়াছি। তাঁহার মূর্তি কিরূপ ছিল, আমাদের বংশের প্রত্যেকের মানসপটে তাহা অঙ্কিত আছে। সে মূর্তি মানবীর নয়, রাক্ষসীর, তাহা মানবী ও ব্যাঘ্রীর সমন্বয়। মানবীর দেহে ব্যাঘ্রীর মুণ্ড বসানো। হস্তপদের উপরাংশ মানুষের হস্তপদের মতোই, আঙুলের স্থানে কিন্তু নখরসমন্বিত থাবা। বক্ষ, উদর, উরু মানুষের মতোই, বুকে বিরাট দুইটা স্তনও ঝুলিতেছে, পশ্চাদ্দেশে কিন্তু ব্যাঘ্রপুচ্ছ। কুলদেবতার এই ভীষণ অস্বাভাবিক মূর্তিই আমরা কল্পনা করিতে শিখিয়াছিলাম। মনে মনে ইহাকেও স্মরণ করিলাম, বলিলাম, এগুলিকে রক্ষা করিও। মনে হইল রাক্ষসী যেন হাসিল।

...টাহা আমার ছবি আঁকা কুঠারটা দৃঢ়বদ্ধ দক্ষিণ মুষ্টিতে ধরিয়াছিল, মনে হইতেছিল জীবনের শেষ কামনাটাকে জীবনের শেষ মুহূর্তে সে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কিছুতেই আর ছাড়িবে না। তাহার অন্ত্রগুলো বাহির হইয়া আমার বুকের সম্মুখে ঝুলিতেছিল। আমি তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। তাহার কণ্ঠ হইতে ঘড় ঘড় করিয়া যে শব্দ হইতেছিল,

হঠাৎ সেটা থামিয়া যাইতেই বুঝিলাম, টাহা মারা গেল। তবু তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। তাহার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিব না। বন জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিয়াছি। যতক্ষণ বনের আড়ালে ছিলাম, বিশেষ কোনো অসুবিধা ছিল না। উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া মুশকিলে পড়িলাম। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম, যখন আমার কাঁধের উপর পাখা ঝটপট করিয়া একটা শকুনি বসিল। ঠিক আমার কাঁধের উপর নয়, টাহার শবের উপর। বসিয়াই নাড়িভুঁড়িগুলা ধরিয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিল। আমার হাতে অস্ত্র ছিল, শকুনি তাড়াইতে বেগ পাইতে হইল না, কুঠারটা আস্ফালন করিবামাত্র উড়িয়া গেল। কিন্তু আস্ফালন বন্ধ করিবা মাত্র আবার বসিল। ঘাড় তুলিয়া দেখিলাম, আকাশে অনেক শকুনি উড়িতেছে। দক্ষিণ হস্তে টাহার শবটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বাম হস্তে কুঠার আস্ফালন করিতে করিতেই পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। পিছনের দিকে দুইটা শৃগাল কলহ করিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলাম, একদল শৃগালও আমার অনুসরণ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া শৃগালের দল থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কিন্তু পলাইয়া গেল না; লুব্ধ দৃষ্টিতে টাহার মৃতদেহের দিক তাকাইয়া রহিল। আমি কুঠারটা আস্ফালন করিতে যদিও একটু সরিয়া গেল, কিন্তু চলিয়া গেল না, তাহারা বুঝিয়াছিল যে তাহাদের শাস্তি দিবার ক্ষমতা এখন আমার নাই। ...শকুনি এবং শৃগাল তাড়াইতে তাড়াইতে চলিয়াছিলাম। যে আমি একদিন নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে হত্যা করিয়া আহার করিয়াছি, যে কোনো প্রকারে হোক, যে কোনো রকম মাংস সংগ্রহ করাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে আমি কালস্রোতে কোথায় হারাইয়া গিয়াছি। এতখানি বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে কী করিয়া? কে জানে!...

'বিদেশি, বিদেশি, তুমি কোথায়—'

জোলমার আকুল কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। শকুনির দল আবার আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কুঠার আস্ফালন করিতে করিতে আমি চিৎকার করিলাম—'আমি এখানে, বড় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি শীঘ্র এস—'

প্রান্তরে প্রান্তবর্তী জঙ্গল ভেদ করিয়া জোলমা ছুটিয়া বাহির হইল। জোলমার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সে যেন বুঝিতে পারিয়াছিল কী ঘটিয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে সে কাছে আসিয়া পড়িল।

'ও কি, কাঁধে ও কে?'

'টাহা—'

'বৃহা কোথায়?'

'বৃহাকে বাঘে লইয়া গিয়াছে।'

'কোন্ দিকে গিয়াছিলে তোমরা?'

অঙুলি দিয়া দেখাইয়া দিলাম।

'নদীর ধারে যে মাঠটা আছে, সেখানে তিনটি মৃত বন্য মহিষ পড়িয়া আছে দেখিতে পাইবে। সেই বনের পশ্চিম দিকে যে বন আছে, তাহারই ভিতর বাঘ বৃহাকে লইয়া ঢুকিয়াছে।'

জোলমা আর অপেক্ষা করিল না, ছুটিয়া চলিয়া গেল।

...টাহা-বৃহার সমাধি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বৃহার দেহটা জোলমা জঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল। ব্যাঘ্র দেবতা তাহার হাতের খানিকটা চিবাইয়াছিল মাত্র, বাকি

শরীরটা ঠিকই ছিল। মহিষ-শাবককে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া মনুষ্যশবের প্রতি বাঘের আর লোভ ছিল না সম্ভবত।

...টাহা-বৃহার মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া শ্যেনপক্ষী সমাজে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মন্দীভূত হইয়াছে। নতুন একটা উত্তেজনা শ্যেনপক্ষী সমাজে নতুন একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিল। বৃহার মৃত্যু পর কে দলপতি হইবে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে কিছুতেই স্থির হইতেছিল না। অনেকে বলিতেছিল শ্যেনপক্ষী সমাজের বৃদ্ধতম শিকারি খোতারি দলপতি হউক। আর এক দল বলিতেছিল খোতারি ছবি আঁকিতে জানে না, সে দলপতি হইলে বল্‌গা হরিণ আর আসিবে না। বিতং চেষ্টা করিতেছিল যাহাতে সে দলপতি হয়। সে সকলকে আশ্বাস দিতেছিল যে, যদিও সে ছবি আঁকিতে জানে না কিন্তু বল্‌গা হরিণের দলকে সে লাফাই পাহাড়ের শিখরে নিশ্চয়ই লইয়া আসিবে। ছবি আঁকিতে না জানিলেও হরিণকে ভুলাইবার মন্ত্র সে জানে। তৃতীয় আর এক দল চাহিতেছিল ওহালি-কন্যা জোলমাই দলের নেত্রী হোক। কারণ প্রথমত সে বৃহার কন্যা, দ্বিতীয়ত সে-ই প্রদীপহস্তে এতকাল বৃহার ছবিতে আলোকপাত করিয়াছে। ওহালি যেমন বৃহাকে ছবি আঁকা শিখাইয়াছিল, জোলমাও তেমনি কাহাকেও ছবি-আঁকা শিখাইবে। এ ক্ষমতা তাহার নিশ্চয় আছে। বৃহা সেদিন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছে যে, জোলমা না থাকিলে সে কিছুতেই ছবি আঁকিতে পারিত না। জোলমা দেবী, শ্যেন সম্প্রদায়ের জন্য সে চিরকুমারিত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। তাহাকেই নেতৃপদে বরণ করা উচিত।

...আমার সহিত মাত্র চারিটি লোকের পরিচয় হইয়াছিল। বৃহা, টাহা, জোলমা এবং গৌ। বিতংকেও চিনিতাম। বৃহা-টাহা মারা গিয়াছে। জোলমা এবং গৌ বৃহা-টাহার সমাধির পর আর গুহা হইতে নাকি বাহির হয় নাই। আমি আর তাহাদের দেখাই পাইতেছিলাম না। বিতংও আমাকে এড়াইয়া চলিতেছিল, যখনই সে বুঝিয়াছিল যে আমি জোলমার পাণিপ্রার্থী তখন হইতেই সে আমাকে এড়াইয়া চলিতেছিল। আমি সুতরাং একা একা শেন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। আমার মনের অভিপ্রায় কাহারও নিকট ব্যক্ত করি নাই, ব্যক্ত করিবার সাহসই ছিল না। ইহাদের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করিলাম—সকলেই আমাকে সম্ভ্রম করিতেছে। জিকাটু পাহাড়ের কাহিনী পল্লবিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। সম্ভবত টাহা এবং গৌ কাহিনীটি প্রচার করিয়াছে। যে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া বৃহা-টাহা মারা গেল, সে শিকার হইতে আমি যে জীবন্ত ও জয়ী হইয়া ফিরিয়াছি—রিক্ত হস্তে ফিরি নাই, তিনটি মৃত মহিষ লইয়া ফিরিয়াছি—এ ঘটনাও সকলকে আমার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষত আমি স্বেচ্ছায় আমার হরিণ-মুখ আঁকা কুঠারটি টাহার সমাধিতে সমর্পণ করিয়াছিলাম বলিয়া সকলে আমার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া আমাকে খুবই সমীহ করিয়া চলিতেছে। আমি বিদেশি হইয়াও যে লাফাই পাহাড়ে আসিয়া শ্যেন সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করিতে ইচ্ছুক এবং আমার সে ইচ্ছা যে বৃহা-গৌ উভয়ই সমর্থনও করিয়াছে এ সংবাদও দেখিলাম গোপন নাই। লক্ষ্য করিলাম সকলেই ইহাতে আনন্দ প্রকাশও করিতেছে, এমন কি টাহা যে গুহায় যে রমণীদল লইয়া বাস করিত সেই গুহায় সেই রমণীদল আমাকে থাকিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমাকে দলপতিরূপে কেহই কল্পনা করে নাই তাহার কারণ প্রথমত আমি বিদেশি, দ্বিতীয়ত আমি ভিন্ন বংশীয়।

...আমি টাহার গুহায় যাই নাই। আমি সেই বনে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, সেই বৃক্ষকোটরে রাত্রিবাস করিতেছিলাম, স্বহস্তে শিকার করিয়া খাদ্যসংগ্রহ করিতেছিলাম। আর

অন্যমনে চিন্তা করিতেছিলাম, জোলমা আমাকে পরিত্যাগ করিল কেন, গৌ কোথায়...।

...সহসা একদিন শ্যেন সম্প্রদায়ের এলাহির সহিত দেখা হইল। দেখিলাম সে আমার বৃক্ষটাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে, কখনও কাঠ কুড়াইতেছে, কখনও কোনো গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতেছে। একটা বন্য শশককে তাড়া করিয়া কিছুদূর ছুটিয়া গেল আবার ফিরিয়া আসিল, আমার দিকে অপাঙ্গে দুই একবার চাহিয়া মৃদু হাসিল, কিন্তু কোনো কথা বলিল না। বুঝিলাম আমার সহিত আলাপ করিতে চায়, কিন্তু তাহার ইচ্ছা আমিই আলাপটা শুরু করি। তরুণী এলাহি ইতিপূর্বেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি জোলমার কথা ভাবিয়া কোনো নারীর প্রতিই মনোযোগ দিই নাই। ব্যাপারটা আমার নিজের নিকটই কেমন অস্বাভাবিক মনে হইতেছিল, কিন্তু মনে হইতেছিল এই অস্বাভাবিকতাকে আঁকড়াইয়া থাকাই জোলমাকে পাইবার একমাত্র উপায়। জোলমাও অস্বাভাবিক, তাহাকে অস্বাভাবিক উপায়েই লাভ করিতে হইবে। এলাহি আর একবার আমার দিকে চাহিল। মনে করিলাম শ্যেন সম্প্রদায়ের খবরটা ইহার নিকট জানিয়া লইলে ক্ষতি কী? তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলাম। ডাকিবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইল, পলাইতে পলাইতে পিছু ফিরিয়া চাহিল, ইচ্ছাটা আমিও ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করি। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না। একটু পরে দেখি আবার সে পাশের ঝোপ ভেদ করিয়া উঁকি দিতেছে।

'শোন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের দলপতি কে হইবে কিছু ঠিক হইল?'

'কিছু ঠিক হয় নাই। শুনিলাম গৌ যাহাকে ঠিক করিবে সেই হইবে। গৌ এখনও কিছু ঠিক করে নাই।'

'গৌ কোথায়?'

'এখনও সে গুহার ভিতরই আছে। সে নাকি বৃহার প্রেতাত্মার সহিত পরামর্শ করিতেছে। বৃহা যাহাকে দলপতি করিতে বলিবে গৌ তাহারই নাম করিবে।'

'তাই নাকি!'

'তাই তো শুনিতেছি। জানি না গৌ কাহার নাম করিবে।'

'গৌ-এর কথা সকলে মানিয়া লইবে?'

'নিশ্চয়। দেখ না, গৌ আমার কী দুর্দশা করিয়াছে! আমার কোন সন্তান হয় নাই, সে কি আমার দোষ! গৌ সকলকে বলিয়া দিয়াছে আমার পেটে না'কি আগুন জ্বলিতেছে, তাই আমার সন্তানেরা পেটেই পুড়িয়া যায়। এ কথা শুনিবার পর কোনো পুরুষ আমার কাছে আসে না। শনকার সঙ্গে ভাব হইয়াছিল, কিন্তু গৌ নিজেই শনকাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। গৌকে কেহ অমান্য করিতে সাহস করে না। একটা কথা বলিতেছি, গৌকে বলিও না যেন। গৌ রাক্ষসী, ডাইনি—ও-ই শ্যেনবংশকে ছারখার করিবে। তিত্তির পাখি মারিলে কী হইবে, নিজের ছেলেগুলি তো একে একে মরিয়া গেল। আমি এবার যাই, আমার কাজ আছে—' ব্যস্ততার ভান করিয়া এলাহি চলিয়া যাইতে লাগিল, যাইতে যাইতে কয়েকবার পিছু ফিরিয়া চাহিল, আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল, জোলমার খবর তো লওয়া হইল না।

'শোন—'

এলাহি আবার ফিরিয়া আসিল।

'জোলমা কোথায়? তাহাকেও তো বাহিরে দেখিতে পাই না আজকাল—'

'সে-ও গুহার ভিতর আছে। বৃহার শেষ ছবিটি শেষ হয় নাই, জোলমাই নাকি সেটি শেষ

করিতেছে। বড় ভাল মেয়ে জোলমা, সত্যই দেবী। আমি তাহার প্রদীপের জন্য শ্যাওলা সংগ্রহ করিয়া আনি। জোলমা বলিয়াছে ইহার জন্য সে আমাকে পুরস্কার দিবে।'

'কী পুরস্কার?'

'যাহা চাহিব তাহাই দিবে বলিয়াছে।'

'কী চাহিবে এখনও ঠিক কর নাই বুঝি?'

'না।'

মুচকি হাসিয়া এলাহি এবার এক ছুটে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, আর ফিরিল না।

...অন্ধকার অরণ্যে একা একা বৃক্ষকোটরে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পর্বত-দেবতার যে বাণী আমি সেদিন শুনিয়াছিলাম তাহার অর্থ কি আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল? তিনি সত্যই কি আমাকে আমার পুরাতন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া এই নতুন সমাজে বাস করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন? না জোলমাকে দেখিয়া আমার মনের কামনা আমার কানে কানে ওই কথা বলিয়াছিল? জোলমাকে দেখিয়া আমি যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার সহিত পর্বত-দেবতার আদেশ জড়াইয়া গেল কী করিয়া। নদীর কলধ্বনিতে আমি পর্বত-দেবতার আদেশ স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। সহসা দেখিলাম অন্ধকার আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাণ্ড একটা উল্কাপাত হইল। মনে হইল, আকাশ হইতে আলোকরূপে পৃথিবীর দিকে ও কে ছুটিয়া আসিল? ও কি আবার আকাশে ফিরিয়া যাইবে? দেবতা কি আবার কোনো ইঙ্গিত করিলেন? নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। বৃহার মুখটা মনে পড়িল। সত্যই তাহার দৈবীশক্তি ছিল। সত্যই যদি সে নারী-সম্পর্ক-বিবর্জিত জীবনযাপন করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আরও অনেক শক্তির অধিকারী হইত। শিকার অভিযান হইতে সে যে আর ফিরিবে না তাহা সে জানিত, টাহাকে সে কথা বলিয়াছিল, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও সে নিরস্ত হয় নাই। কেন হয় নাই? প্রেতরূপে সে কি প্রতিশোধ লইবে? অন্ধকারকে চিরিয়া একটি পেচক কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল বৃহাই বুঝি আমার প্রশ্নের উত্তর দিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম এবং প্রস্তরকুঠারটাকে চাপিয়া ধরিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ভয় হইতে লাগিল শব্দটা বুঝি মূর্তি ধরিয়া এখনই আমাকে আক্রমণ করিবে। পরমুহূর্তেই মনে হইল বৃহাকে প্রস্তর-তীর দিয়া নিধন করিয়াছি বটে, কিন্তু বৃহার প্রেতকে প্রস্তরকুঠার দিয়া হনন করিতে পারিব না। সহসা সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, আমি বৃহাকে বধ করিয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর। পর্বত-দেবতার উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম— হে দেবতা, তোমারই আদেশে আমি এদেশে বসবাস করিতে চাহিয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

...ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আচমকা ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার গলায় কামড়াইয়া ধরিয়াছে। মানুষ! মাথায় চুল রহিয়াছে। ছাড়াইতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। ধস্তাধস্তি করিতে করিতে দুইজনেই নিচে পড়িয়া গেলাম। তবু সে আমাকে ছাড়ে না, গাছের নিচে ঘন অন্ধকার, সেই অন্ধকারে প্রাণপণে তাহার গলার টুঁপিটা চাপিয়া ধরিতে তবে তাহার কামড় আলগা হইল, এক ঝটকায় তাহাকে দূরে ছুঁড়িয়া দিলাম। তাড়াতাড়ি গলায় হাত দিয়া দেখিলাম গলায় কোনো ক্ষত হয় নাই, সমস্ত গলাটা লালায় পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে মাত্র। গাছের তলা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, বাহিরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটিতেছে, গাছের তলায় যদিও

নিবিড় অন্ধকার। কোথায় গেল সে? পরমুহূর্তেই দেখিলাম। বিস্রস্ত-কেশা স্ফুরিতাধরা গৌ আমার দিকে সর্পিণীর মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

'পুত্রহন্তা শয়তান। বৃহাকে বাঘে খাইয়াছে আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি করিব না। আমি তাহার মাথায় তীরের আঘাত দেখিয়াছি। এ তীর কার? বৃহার মৃতদেহের পাশে এই তীর ছিল, জোলমা কুড়াইয়া আনিয়াছে। শ্যেন সম্প্রদায়ের তীরের গড়ন এমন নয়—'

বনের ভিতর হইতে একটা তীর আনিয়া গৌ সেটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। রক্তাক্ত তীর। রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। তীরটার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'উহা আমারই তীর। বাঘকে লক্ষ্য করিয়া আমি এই তীর ছুঁড়িয়াছিলাম।'

'মিথ্যা কথা। বৃহা এখনই আসিয়াছিল, সে আমাকে সত্য কথা বলিয়া গিয়াছে। উঃ, কী আফসোস যে আমার একটাও দাঁত নাই, তোমার টুঁটিটা কামড়াইয়া ছিঁড়িতে পারিলাম না। কিন্তু বৃহা বলিয়া গিয়াছে তুমি নিস্তার পাইবে না। কিছুতেই নিস্তার পাইবে না—হা হা হা হা—বৃহা বলিয়া গিয়াছে তুমি কিছুতেই নিস্তার পাইবে না।...'

গৌ উন্মাদিনীর মতো হাসিতে হাসিতে নাচিতে লাগিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বৃহা আসিয়াছিল। আমার মনে হইল আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। আমি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—'আমি বিদেশি, তোমাদের অনুমতি লইয়াই তোমাদের দেশে বাস করিয়াছি; যথাসাধ্য তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করি নাই, তবু যদি না জানিয়া কোনো অপরাধ করিয়া থাকি তাহার শাস্তি আমাকে দাও, মাথা পাতিয়া লইব'—সত্য-সত্যই আমি মাথা পাতিয়া দিলাম। গৌ থামিয়া গেল। আমার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া ঝুঁকিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর আবার সহসা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'বৃহা তোমার শাস্তি ঠিক করিয়া দিয়াছে। কি করিয়াছে জান? বৃহাটা চিরকালই পাগল, সে বুঝিল না, যে এটা শাস্তি না হইয়া পুরস্কার হইবে। সে তোমাকে শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হইতে বলিয়াছে। বলিয়াছে দলপতি হইয়া তুমি গুহার ছবি আঁকিবে আর চিরকুমারী জোলমা অন্ধকার গুহায় তোমার পাশে আলো ধরিয়া থাকিবে। অন্ধকার গুহায়, চিরকুমারী জোলমা—হা, হা, হা—'

আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম—'আমি বৃহার আদেশ পালন করিব।'

গৌ-এর চক্ষুর দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। নিম্নকণ্ঠে ফিসফিস করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল সে।

'বৃহার নয়, আমার আদেশ পালন করিতে হইবে। বৃহার আদেশে তুমি দলপতি হও আমার আপত্তি নাই, আমি কালই সে আদেশ ঘোষণা করিয়া দিব। কিন্তু আমার আদেশে তুমি জোলমাকে বিবাহ করিবে। জোলমা বৃহার একমাত্র সন্তান, সে চিরকুমারী থাকিবে ইহা আমার পক্ষে অসহ্য। আমি তাহার কোলে শিশু দেখিতে চাই। অনেক শিশু —'

'কিন্তু বৃহার প্রেতাত্মা যদি ইহাতে রুষ্ট হয়, যদি কোনো বিপদ ঘটে—'

'সে বিপদ তোমাকে বরণ করিতে হইবে। প্রতি মুহূর্তে সে বিপদের সম্ভাবনা সম্মুখে রাখিয়া আমার আদেশ তোমাকে পালন করিতে হইবে এই তোমার শাস্তি। তুমি রাজি আছ?'

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম।

গৌ আবার বলিল—'যদি রজি না হও তোমার শাস্তি মৃত্যু। তুমি যে বৃহাকে হত্যা করিয়াছ একথা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। বৃহার মস্তকের আঘাতকে আর সকলেই ব্যাঘ্রদংশন

ভাবিয়াছে, এমন-কি জোলমা পর্যন্ত। আমি যদি আজ সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিই সকলে মিলিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। কেহই তোমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। বৃহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া আমি নিজে আজ তোমাকে হত্যা করিতাম, কিন্তু আমার দাঁত নাই। আমার দন্তহীন মাড়ি দিয়া আমি তিত্তির পক্ষীর মুণ্ড ছিঁড়িয়া লইতে পারি, কিন্তু হায় হায়, তোমার কিছু করিতে পারিলাম না। নিজে যদি তোমার রক্তপান করিতে পারিতাম, আমার এই জ্বালা, এই অসহ্য জ্বালা হয়তো খানিকটা কমিত। তাহা যখন হইল না তখন অপরকে দিয়া তোমাকে হত্যা করাইয়া কোনো সুখ হইবে না। বৃহার কথাই থাক, তুমি দলপতি হও, জোলমা তোমার ছবির পাশে আলো ধরুক আমার আপত্তি নাই। বৃহার বংশ কিন্তু লোপ হইতে দিব না, কিছুতেই না, জোলমার কোলে শিশু দেখিতে চাই। বৃহার প্রেতাত্মা হয়তো ইহার প্রতিশোধ লইবে, হয়তো সে প্রতিশোধ অতি ভয়ঙ্কর, এ কথা জানিয়াও যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হও, কাল আমি তোমাকে দলপতি মনোনীত করিব। যদি রাজি না হও, সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিব। সকলে যখন তোমাকে হত্যা করিবে তখনই তোমার রক্তপান করিব।'

আমার, কেন জানি না, হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, 'আমার রক্তপান করিলে যদি তোমার মনে জ্বালা কমে এখনই তোমাকে রক্তপান করাইতে পারি।'

'কিরূপে?'

আমার প্রস্তরছুরিকা কাছেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ তর্জনীর অগ্রভাগে একটি ছিদ্র করিয়া দিলাম। ফিনিক দিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইল।

'এই যে—'

গৌ সাগ্রহে আঙুলটি মুখে পুড়িয়া চুষিতে লাগিল। কিছুতেই ছাড়ে না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু ছাড়ে না। ক্রমশ আমার হাতটা যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। এক ঝটকায় শেষে হাতটা তাহার মুখ হইতে খুলিয়া লইলাম। গৌ কিন্তু ইহাতে রুষ্ট হইল না। দেখিলাম সে হাসিতেছে। চন্দ্রালোকে সেই রক্তাক্ত হাসি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—'আমি তৃপ্ত হইয়াছি।' গৌ সত্যই তৃপ্ত হইয়াছিল; খুশিও হইয়াছিল।

বলিল, 'আনন্দ পাইলাম। বহুকাল আগে বাল্যকালে একবার মনুষ্যরক্ত পান করিয়াছিলাম। আমার মা তাহার সতীনকে হত্যা করিয়া তাহার রক্ত পান করিয়াছিল, মায়ের সঙ্গে আমরাও করিয়াছিলাম; যাক সে কথা, আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না বল—'

ক্ষণকাল চুপ করিয়া বলিলাম—'আছি।'

গৌ উঠিয়া আসিয়া আমাকে চুম্বন করিল।

গৌ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল।

পরদিন বৈকালে লাফাই পাহাড়ের উপত্যকায় সমবেত শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের সভায় গৌ ঘোষণা করিল—'গত রাত্রে আমি বৃহাকে দেখিয়াছি, বৃহার কথা শুনিয়াছি। বৃহা কাল তোমাদের দলপতিও নির্বাচন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহাকে নির্বাচন করিয়াছে সে তোমাদের দলের কেহ নয়, সে বিদেশি, সে ব্যাঘ্রবংশীয়।' গৌয়েরই নির্দেশ অনুসারে আমি একটি বৃহৎ পর্বতের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সব শুনিতেছিলাম। ইহার ঠিক পরেই গৌ যাহা বলিল তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে এমন সুন্দরভাবে যে কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা আমার ধারণার অতীত ছিল। গৌ-এর কল্পনাশক্তিতে প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না।

তখন এটা কল্পনাশক্তি বলিয়াও আমার মনে হয় নাই, আমার মনে হইতেছিল কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বুঝি গৌ-এর উপর ভর করিয়া অনিবার্য ঘটনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতেছে। এবং সে অদৃশ্য শক্তি হয়তো আমার কুলদেবতার।

গৌ বলিল—"বৃহা বলিয়াছে, 'দেবতার ইচ্ছা এবার ব্যাঘ্র-সম্প্রদায়ের কেহ আমাদের দলের নেতৃত্ব করুক। তাই তিনি ব্যাঘ্ররূপে আসিয়া আমাকে নিধন করিয়াছেন। দেবতার ইচ্ছা যে শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি চিত্রাঙ্কন করিয়া দেবতার আরাধনা করুক, তবেই তিনি তুষ্ট হইয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে ঠিক এমনি একটি বিদেশি কিছু দিন পূর্বে আসিয়াছেন। তিনি একাধারে ব্যাঘ্রবংশীয় এবং চিত্রশিল্পী। আমার ইচ্ছা তিনিই এবার শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হউন। আমি যখন বাঁচিয়াছিলাম তখনই তিনি আসিয়াছিলেন। জিকাটু পাহাড়ে নাগরাজ শঙ্খচূড়কে হত্যা করিয়া তিনি অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বন্য-মহিষ শিকারেও তাঁহার কৃতিত্ব যে কম নয় তাহা সকলেই জানে। তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি, তিনি শ্যেন সম্প্রদায়ের দলপতি হউন। জোলমা তাঁহারই পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া তাঁহার ছবিতে আলোকপাত করুক। তিনি যদি ইচ্ছা করেন জোলমাকে বিবাহও করিতে পারেন। বিবাহ করিবার কোনো বাধা আর নাই। জোলমা যতদিন আমার পার্শ্বে প্রদীপ ধরিয়া ছিল ততদিনই তাহার কুমারী থাকার সার্থকতা ছিল। এখন আমি নাই, সে সার্থকতাও নাই। পিতার অবর্তমানে স্বামীই নারীর রক্ষক। ওই বিদেশি শিল্পী জোলমাকে বিবাহ করুক ইহাই আমার ইচ্ছা।' ...কাল রাত্রে বৃহা যেসব কথা বলিয়াছে তাহা তোমাদিগকে সবিস্তারে বলিলাম, এখন তোমাদের যদি কিছু বলিবার থাকে বলিতে পার।"

গৌ সভার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমস্ত সভা নীরব। আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইল। ভাবিলাম অসম্ভব বোধ হয় সম্ভব হইবে। সহসা বিতংযের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম।

'দলপতি বৃহার যদি ইহাই নির্দেশ হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় মানিব। জিকাটু পাহাড়ের সম্বন্ধে কিন্তু আমার একটু বক্তব্য আছে। আমার বিশ্বাস নাগরাজ শঙ্খচূড়কে বিদেশি হত্যা করিতে পারে নাই। সে ওই পর্বতগুহার মধ্যে বন্দী হইয়া আছে। কাল আমি জিকাটু পাহাড়ে গিয়াছিলাম, গুহার মুখে যে পাথরটা আছে সেখানে কান পাতিয়া শুনিলাম শঙ্খচূড় এখনও সেখানে তর্জন করিতেছে। মহিষ-শিকার অভিযানেও বিদেশির কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। টাহার অস্ত্রই মহিষীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিল। মহিষ এবং মহিষ-শাবকটিকে হত্যা করিয়াছে বাঘ। বিদেশির বীরত্বের বিশেষ পরিচয় ইহাতে নাই।'

বিতং থামিয়া গেল। গৌ-এর চক্ষু স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ করিতেছিল।

গৌ বলিল—'শঙ্খচূড় যদি না মরিয়া থাকে, তাহাকে মারিবার দায়িত্ব বিদেশি লইবে। মহিষ শিকার করিতে বৃহা গিয়াছিল, বিতং যায় নাই। বৃহার কথাই আমি বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি। আর কাহারও কিছু বলার আছে।'

বৃদ্ধা খোতারি উঠিয়া বলিল—'দলপতি বৃহার আদেশ আমি নতশিরে মানিয়া লইলাম। আগন্তুক বিদেশিই আমাদের দলপতি হোক।'

গৌ-এর নির্দেশেই আমি বৃহার গুহায় একা বসিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশা করিতেছিলাম

জোলমা একবার আসিবে। বৃহার মৃত্যুর পর তাহার সহিত একবারও দেখা হয় নাই। আমি দলপতি নির্বাচিত হইলাম, জোলমার সহিত আমার বিবাহ হইবে ঠিক হইয়া গেল, কিন্তু জোলমা তো এখনও আসিল না। কোথায় সে? গৌ-এর কুকুরটা অবিরাম ডাকিতেছিল। গৌ তাহার নাগালের বাহিরে, অথচ দৃষ্টির সম্মুখে একটি তিত্তির পক্ষী বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল সে লাফাই পাহাড়ে যাইতেছে, আমার বিবাহের আয়োজনের জন্যই যাইতেছে; রাত্রে আর ফিরিবে না। এখানে বিবাহের নিয়ম কেমন কে জানে। আমাদের ব্যাঘ্র-সমাজে বিবাহ হয় পরিবর্তন করিয়া। আমার দশটি ভগিনীর পরিবর্তে আমি দশটি স্ত্রী পাইয়াছিলাম। আমার ভগিনীগুলিকে যারা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের ভগিনীরাই আমার স্ত্রী হইয়াছিল। আমার মানে অবশ্য আমাদের গোষ্ঠীর সকলের। জামাই কিনাকে কেবল একটি কুঠারের বদলে পাইয়াছিলাম। ইহাদের বিবাহের নিয়ম কিরূপ? ইহারাও তো কেহ এক-পত্নীক নয়। একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসাও ইহাদের নারীদের পক্ষে দোষাবহ নয়, পুরুষেরা শ্যেনপক্ষী না হইলেই হইল। জোলমা কি একাধিক পুরুষকে প্রশ্রয় দিবে? জোলমা কোথায়! সহসা মনে হইল জোলমা বোধ হয় আর আসিবে না। আমার মিথ্যাচরণ ও গৌ-এর চক্রান্ত বোধ হয় টের পাইয়া গিয়াছে। সে হয়তো তাহার ময়ূরবাহিনীর পিঠে চড়িয়া বৃহার খোঁজে ওহালির দেশে চলিয়া গিয়াছে। কল্পনা করিতে লাগিলাম। যেন পাশাপাশি সার বাঁধিয়া ময়ূরদল উড়িয়া চলিয়াছে, তাহাদের পিঠের উপর বসিয়া আছে জোলমা। ময়ূর মানুষকে বহন করিতে সক্ষম কি না এ প্রশ্ন মনে জাগিল না। সেই অন্ধকার গুহায় একা বসিয়া এই অসম্ভব কল্পনায় অনেকক্ষণ মগ্ন হইয়া রহিলাম। পক্ষ-বিধুননের শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম সহসা। মনে হইল ময়ূরের দল বুঝি নিকটবর্তী হইয়াছে। কুকুরের চিৎকারে পরমুহূর্তেই কিন্তু ভুল ভাঙিল, বদ্ধ তিত্তির পাখিটাই পাখা ঝটপট করিতেছে। এই অদ্ভুত পরিবেশে এমন করিয়া আর কতক্ষণ বসিয়া থাকি। কিন্তু গৌ-এর আদেশ অমান্য করিতে সাহস হইতেছিল না, ভয় হইতেছিল চলিয়া গেলে হয়তো কোনো অঘটন ঘটিয়া যাইবে। গৌকে আর সামান্য মানবী বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস ছিল না, দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম সে মানবী নয়, পিশাচী। অসম্ভবকে যে সম্ভব করিতে পারে তাহার প্রমাণ তো প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বৃহার হত্যাকারী জানিয়াও আমাকে সে শ্যেনপক্ষী সমাজের দলপতি করিয়া দিল। যে জোলমাকে পাইবার জন্য আমি এত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধা বৃহাকে হত্যা করিয়াও যে জোলমাকে আমি আয়ত্ত করিতে পারি নাই, গৌ অবলীলাক্রমে সেই জোলমার সহিত আমার বিবাহের আয়োজন করিয়া ফেলিল। কিন্তু কেন? আমার প্রতি এত সদয় হইবার কী হেতু আছে তাহার? ছিন্ন তিত্তিরমুণ্ডের আকাশমুখী দৃষ্টিতে এমন কী সূচিত হইয়াছিল যাহা পুত্রহত্যার অপরাধকেও লঘু করিয়া দিতে পারে? কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, সেই জন্যই ভয় করিতেছিল, গৌ-এর নির্দেশ অমান্য করিয়া অন্যত্র যাইবার মতো সাহস পাইতেছিলাম না, মনে হইতেছিল গুহা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে হয়তো...সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সমস্তটাই আমাকে হত্যা করিবার একটা ষড়যন্ত্র নয় তো? মিথ্যা সভা করিয়া হয়তো আমাকে ভুলানো হইয়াছে, আমাকে একটা বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে (হয়তো বা বৃহার এই গুহাতেই) বিশেষ লোক দিয়া হত্যা করা হইবে। আজ হয়তো সেইদিন, গৌ আমাকে বসাইয়া সেই বিশেষ হত্যাকারীদের ডাকিতে গিয়াছে। নিস্তব্ধ উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিত্তির পক্ষীর

পক্ষবিধুনন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সে আর থামিতেছে না। প্রলুব্ধ কুকুরটার চিৎকার অন্ধকারেই যেন দংশন করিয়া চলিয়াছে। মনে পড়িল আমাদের সমাজে একবার এইরূপে একটা লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। পার্মা যে বৃক্ষতলে কিকনকে খুন করিয়াছিল ঠিক সেই বৃক্ষতলেই কিকনের আত্মীয়রা পার্মাকে হত্যা করে। পার্মাকে সেই বৃক্ষতলে গভীর রাত্রে ভুলাইয়া আনিয়াছিল পার্মার প্রণয়নী বোহিলা, আমার স্ত্রী বোহিলা। আমিও সেই ষড়যন্ত্রে ছিলাম। পার্মা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলিয়াই আমি তাহার মৃত্যুকামনা করিয়াছিলাম। গৌ বিতংকে ডাকিতে গিয়াছে নাকি? কুকুরটা বেশি জোরে ডাকিয়া উঠিল। বাতাসে ভাসিয়া আসিল একটা তীব্র গন্ধ, মাংসপোড়া গন্ধ, গৌ গুহার পিছনে বসিয়া তিত্তির পোড়াইতেছে না তো? হয়তো পিশাচী আমার নিধনের জন্যই কোনো মন্ত্রপাঠ করিতেছে। অন্ধকার গুহায় এমন ভাবে একা দাঁড়াইয়া থাকা আর নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না, গা ছমছম করিতে লাগিল। বাহির হইয়া যাইতেছিলাম অকস্মাৎ একটা আলোক-রেখা আসিয়া অন্ধকারকে বিদ্ধ করিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লম্বা গুহার দক্ষিণ প্রান্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, আলোটা যেন ভূগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম, জোলমা প্রদীপহস্তে ভূগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহার দক্ষিণ প্রান্ত যে ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে তাহা আমার জানা ছিল না। নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। জোলমা প্রদীপ হস্তে আমার দিকেই আগাইয়া আসিল। যে গোলাকৃতি প্রস্তর খণ্ডের উপর খাবার রাখিয়া আমি প্রথম দিন বৃহার সহিত আহার করিয়াছিলাম, সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রদীপটি রাখিয়া জোলমা আমার মুখের দিকে চাহিল। অদ্ভুত সে চাহনি। বিষণ্ণ কিন্তু শান্ত। তাহাকে কোনো উষ্মা নাই, হিংসা নাই, এমনকি শোকের উগ্রতাও নাই। মনে হইল সে সব জানে, কিন্তু সব ক্ষমা করিয়াছে, নিয়তির অমোঘ বিধানকে অনিবার্য জানিয়াই সে তাহা মানিয়া লইয়াছে, এজন্য কাহারও উপর তাহার যেন রাগ নাই। জোলমার অঙ্গে কোনো আবরণ ছিল না, আলুলায়িত কেশভার পৃষ্ঠে লুটাইতেছিল; শান্তভাবে আমার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইযা রহিল, তাহার নীল নয়নে একটা প্রচ্ছন্ন মিনতি, নীরব ভাষায় কী যেন বলিতে চাহিল বুঝিতে পারিলাম না। কয়েক মুহূর্ত পরস্পর পরস্পরের দিকে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকেই শেষে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল।

'সব কথা শুনিয়াছ?'

'শুনিয়াছি।'

'তোমার কি কিছু বলিবার আছে?'

'আমার বক্তব্য অনেক পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। তোমার মতো বীরের সঙ্গিনী হইতে পাইলে আমি কৃতার্থ হইব। কিন্তু আমার শ্যেন সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য আমাকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে। বৃহা চলিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃহার নির্দেশ চলিয়া যায় নাই। তাহার ইচ্ছা তাহার আদেশ আমার মনে সর্বদা জাগরূক থাকে। বিদেশি, তুমি গুহার প্রাচীর নব নব চিত্রে অলঙ্কৃত কর, আমি তোমার পার্শ্বে আলো ধরিয়া ধন্য হই, কিন্তু তুমি শপথ কর যে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না—'

'কিন্তু গৌ যে বলিল—'

'গৌ মিথ্যা কথা বলিয়াছে। গৌ শিশু ছাড়া আর কিছু চায় না। তাহার ধারণা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইলেই বুঝি শ্যেনপক্ষী সমাজ উন্নতি করিবে। বৃহার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। আমার ধারণাও অন্যরূপ। সকলের অগোচরে আমাদের সহিত গৌ-এর একটা নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

সেই স্বপ্নের ফলেই বৃহা প্রাণ হারাইয়াছে। হয়তো আমিও হারাইব। কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নই। তুমি আমার সহায়তা কর, বৃহার ইচ্ছা এখনও ফলবতী হইবে। বল তুমি কি আমার সহায় হইবে?'

সেই অসভ্য যুগে যুবতী নারীর মুখে এরূপ উক্তি যে কত অশোভন তাহা তোমরা যেমন অনুভব করিতেছ আমিও তেমনি অনুভব করিয়াছিলাম। প্রথম হইতেই বৃহা এবং জোলমার চরিত্র, আচরণ, কথাবার্তা আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। আমি বরাবরই ভাবিয়াছিলাম, বৃহা হয়তো নিজের স্বার্থের জন্য জোলমাকে অন্য কোনো পুরুষের সংস্রবে আসিতে দিতে চাহিতেছে না। বৃহার ভয়ে জোলমাও চিরকুমারী থাকিতে চাহিতেছে, বৃহার অবর্তমানে তাহার মত পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু এখনও জোলমা একথা বলিতেছে কেন? তাহার প্রশ্নের উত্তরে কী বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, নির্বাক বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া রহিলাম। এখন মনে হয় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ক্ষণকালের জন্য চাঁদ উঁকি দিয়া যেমন অন্তর্হিত হয়, সেই অন্ধকার অসভ্য যুগের মধ্যেও তেমনি বর্ণবহুল একটা সুন্দর সত্য যুগ কিছুদিনের জন্য আসিয়া আবার অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বৃহা জোলমা সেই যুগের প্রতীক। আমরা তাহাদের বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু আমি অন্তত প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পারি নাই। জোলমাকে পাইবার আশায় নারীসঙ্গ বর্জন করিয়া আমি কঠিন সংযমে নিজেকে সংহত করিয়া রাখিয়াছিলাম। গৌ-এর কুহকিনীরা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, এলাহির ইঙ্গিতও আমি অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার পুরস্কার পাইব। জোলমা আমার বাহুপাশে ধরা দিবে। কিন্তু জোলমা এ কী বলিতেছে।

'বল তুমি আমার সহায় হইবে?'

জোলমা পুনরায় প্রশ্ন করিয়া সোৎসুক নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, 'কিন্তু গৌ যদি তোমার কোলে শিশু না দেখিতে পায় আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ছলে বলে কৌশলে সে আমাকে সংহার করিবে। তোমার কোলে শিশু আসিবে এই আশাতেই সে আমাকে দলপতি করিয়াছে, এই আশাতেই তোমার সহিত বিবাহ দিতেছে—'

জোলমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহর পর বলিল, 'গৌ-এর আশা অপূর্ণ থাকিবে না। তাহাকে আমি শিশু দিব।'

'কিরূপে? তুমি যে চিরকুমারী থাকিতে চাও।'

'দেবতা যদি ইচ্ছা করেন কুমারীর কোলেও শিশু আসিতে পারে। বৃহা আমাকে বলিয়াছিল যে দেবতা শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়কে সন্তান দান করেন, তিনি আমাদের অরণ্যেই থাকেন। অরণ্যপ্রান্তবর্তী বিশাল দেবদারু বৃক্ষে তাঁহার বাস। ওহালি একটি পাথরে ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সেই পাথর লইয়া দেবদারু বৃক্ষের নিকট অন্ধকার রাত্রে কোন কুমারী যদি সন্তান প্রার্থনা করে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।'

'কোথায় সে পাথর?'

'আমার কাছে আছে।'

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। আমার চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জোলমা বলিল, 'দেখিবে?'

'কোথায় আছে?'

'আমার সঙ্গে এস।'

জোলমা প্রদীপটি তুলিয়া লইল। আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভে অবতরণ করিলাম। মাটির নিচে যে এত বড় গুহা আছে বাহির হইতে তাহা কল্পনা করা যায় না। আমি কিন্তু বিস্মিত হইয়া গেলাম গুহা দেখিয়া নয়, গুহার গায়ে ছবির সারি দেখিয়া। জীবন্ত বল্গা হরিণের দল যেন সারি দিয়া চলিয়াছে। নানা ভঙ্গীর বল্গা হরিণ। কেহ ছুটিতেছে, কেহ বসিয়া আছে, কাহারও পিঠে তীর বিঁধিয়া আছে...

'সব বৃহার আঁকা?'

'ওহালিও আঁকিয়াছে কিছু। আসলে সবই ওহালির।'

'আমি এমন সুন্দর করিয়া আঁকিতে পারিব কি?'

'তুমি তো আঁকিবে না, ওহালি আঁকিবে। তুমি যদি নিজেকে পবিত্র রাখিতে পার ওহালি তোমার মধ্যে আসিবে, তোমার হাত দিয়া ওহালিই ছবি আঁকিবে।'

'কেমন করিয়া নিজেকে পবিত্র রাখিব?'

'ওহালি মানুষ ভালবাসে। তুমি যত কম পশু হইবে, ওহালি তত তোমার কাছে আসিবে।

জোলমার বিষণ্ণ মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সশঙ্ক হাসি। তাহার যেন আশঙ্কা হইতেছিল তাহার এই অদ্ভুত অনুরোধ আমি রাখিতে পারিব কি না।

'তোমার সে পাথর কোথায়?'

জোলমা প্রদীপ লইয়া গুহার একপ্রান্তে চলিয়া গেল, আমি অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল যেন বল্গা হরিণের দল অন্ধকারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দ্রুত লঘু পদশব্দ যেন শুনিতে পাইলাম, তাহারা যেন ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে, পুরুষ হরিণটি কি ডাকিয়া উঠিল? প্রদীপের আলো দেখা গেল আবার। চাহিয়া দেখিলাম, দেওয়ালের বল্গা হরিণদের চোখে-মুখে যেন একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আবার ছবি হইয়া গিয়াছে।

'এই দেখ—'

দেখিলাম জোলমা বহুবর্ণ-বিচিত্র একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ড হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাথরের গায়ে নানা বর্ণের নানা পরিধির বৃত্ত আঁকা, বৃত্তগুলিকে ঘিরিয়া সরল ও বক্ররেখার বহু বিচিত্র জটিলতা। মনে হইল ওই ছোট পাথরটির উপর শিল্পী যেন রেখার সাহায্যেই সৃষ্টি-রহস্য ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে। বহুবর্ণের বিবিধ সমন্বয়ের কী এক নিগূঢ় ইঙ্গিত যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

'এ কি ওহালির আঁকা?'

'বৃহার মুখেই তাহাই শুনিয়াছি।'

'এ পাথর লইয়া কেহ কি দেবদারু বৃক্ষের নিকট গিয়া সন্তান পাইয়াছে?'

'এ পাথর আমারই জন্য ওহালি রাখিয়া গিয়াছে। আমি যদি কোনো দিন সন্তান কামনা করি, পাইব। এ পাথর আর কেহ ব্যবহার করে নাই, করিলেও বোধহয় ফল ফলিবে না। ওহালিই বৃহাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল আমি চিরকুমারী থাকি। হয়তো সে আশঙ্কা করিয়াছিল যে গৌ একদিন আমার নিকট সন্তান দাবি করিবে, তাই এই পাথর বৃহাকে সে দিয়া গিয়াছে। গৌ যদি আমার কোলে শিশু দেখিতে চায় দেখিতে পাইবে, সেজন্য তুমি চিন্তিত হইও না। তুমি কেবল আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না!'

'দিলাম।'

আমার ভিতর হইতে আর একজন কে যেন কথা বলিল। পরক্ষণেই কিন্তু আমি আবার সুস্থ হইলাম। বলিলাম—'আমি কিন্তু সংযম করিতে অভ্যস্ত নই। এতদিন আমি যে জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে সংযমের কোনো স্থান ছিল না। জানি না এরূপ অস্বাভাবিক অনভ্যস্ত জীবনযাপন করিতে পারিব কি না। চেষ্টা করিব।'

জোলমার বিষণ্ণ চোখে আবার একটু হাসির আলোক আভাসিত হইল।

'চেষ্টা কর। নিতান্তই যদি না পার অন্য কাহাকেও বিবাহ করিও। একাধিক স্ত্রী তো সকলেরই আছে।'

'আবার কাহাকে বিবাহ করিব?'

'আমি বাছিয়া দিব।'

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। জোলমা আমার মধ্যে কী দেখিতেছিল জানি না, কিন্তু আমি তাহার মধ্যে এক অসীম করুণাময়ী নারীকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল আমাকে খঞ্জ জানিয়াও সে আমাকে দুরারোহ পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে উৎসাহ দিতেছে, প্রয়োজন হইলে সে আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু শিখরে আমাকে সে লইয়া যাইবেই। ইহাতে তাহার নিজের কোনো লাভ নাই, লাভ আমার, শিখরে উঠিয়া আমিই বিরাট দিগ্বলয় দেখিতে পাইব। পর্বতশিখরের উপমাটা মনে পড়িল, কারণ সত্যই এক বলিষ্ঠা নারী একদা আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পর্বত-শিখরে লইয়া গিয়াছিল, আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। পর্বত-শিখরে উঠিয়া চক্রবালরেখা সুদূরপ্রসারী মহিমা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সেই বলিষ্ঠা নারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছিলাম। বলিষ্ঠা নারীটি আর কেহ নয়, আমারই মা। আমি ভয়ে পাহাড়ে উঠিতে চাহিতাম না, মা-ই আমার ভয় ভাঙাইয়া দিয়াছিল। জোলমা আমাকে কোন্ পর্বত-শিখরে লইয়া যাইতে চায়?

'চল।'

আবার জোলমাকে অনুসরণ করিয়া ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া আসিলাম। কুকুরের চিৎকার এবং তিত্তিরের পক্ষ-আক্ষেপ তখনও নৈশ নীরবতাকে ক্ষুব্ধ করিতেছিল। পোড়া মাংসের গন্ধটাও উগ্রতর হইয়াছে মনে হইল।

'মাংস কোথায় পোড়ানো হইতেছে?'

'লাফাই পাহাড়ে। সেদিন সহস্রাধিক হরিণ মরিয়াছে। তাহাদের মাংস আগুনে সেঁকিয়া ফুটন্ত চর্বিতে ভিজাইয়া রাখা হইতেছে। মাংসের অভাব ঘটিলে ওই মাংস কাজে লাগিবে। তা ছাড়া কাল আমাদের বিবাহ, সেজন্যও বোধ হয় কিছু আহারের আয়োজন হইতেছে।

'এখানে বিবাহ কিরূপে হয়?'

জোলমা হাসিয়া বলিল, 'দেখিতেই পাইবে। আমার হাতটা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িও না, ছাড়িয়া দিলেই বিবাহ পণ্ড হইবে।'

পরদিনই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

লাফাই পাহাড়ের উপত্যকায় শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের সকলে সমবেত হইয়াছিল। অনেকেই দেখিলাম সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছে। গৌ আমাকে লইয়া উপত্যকার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইল। বামহস্তে গৌ একটি জীবন্ত শ্যেনপক্ষীকে ধরিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার কানে কী বলিতেছিল। উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া সে আমার কানে কানে বলিল, 'তুমি ছুটিয়া গিয়া জোলমার হাতটা বাম হাত দিয়া চাপিয়া ধর, আর দক্ষিণ হস্ত দিয়া চাপিয়া ধর কুঠারটা।

জোলমার হাত চাপিয়া ধরিলেই অনেকে তোমাকে আক্রমণ করিবে, তুমি তখন কুঠার দিয়া আত্মরক্ষা করিও। জোলমার হাত কিন্তু ছাড়িও না।'

দেখিলাম নানাবর্ণে চর্চিত বহু যুবতী একস্থানে বসিয়া হাসাহাসি করিতেছে। জোলমাও তাহাদের মধ্যে আছে। তাহার সর্বাঙ্গও নানাবর্ণে রঞ্জিত। সে কিন্তু হাসিতেছে না। নিস্তব্ধ হইয়া দিগন্তলগ্ন শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চাহিয়া আছে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সে যেন সচেতন নয়। লক্ষ্য করিলাম এলাহিও তাহার পাশে বসিয়া আছে।

গৌ আমার কানের কাছে তর্জন করিয়া উঠিল—'যাও যাও, আর দেরি করিও না।' পরবর্তী যুগে আমরা শিকারের দিকে যেমন কুকুর লেলাইয়া দিতাম, গৌ তেমনিভাবেই আমাকে উৎসাহিত করিল, জোলমা যেন তাহার শিকার।

আমি ছুটিয়া গিয়া জোলমার হাত চাপিয়া ধরিলাম। দশ-বারোজন যুবক সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহার পর কিছুক্ষণ আমি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাই নাই, চক্ষু বুজিয়া কেবল কুঠার চালাইয়া গিয়াছি। আমার স্কন্ধদেশে একটা বর্শার খোঁচা বেশ একটু জোরে লাগিয়াছিল, তাহারই বেদনাটা অনুভব করিতেছিলাম। ছোটখাটো যে সব ক্ষত আমার সর্বাঙ্গে হইয়াছিল তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই। অবসরই ছিল না।

সহসা গৌ চিৎকার করিয়া উঠিল, 'এইবার থাম, শ্যেনপক্ষী চলিয়া গিয়াছে।'

আক্রমণকারীরা সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হইল। দেখিলাম আমার কুঠারাঘাতে তিনজন নিহত হইয়াছে, আরও তিনজন খুব বেশি আহত হইয়াছে। বাকি কয়জনের আঘাত সামান্য। জোলমার হাত কিন্তু আমি ছাড়ি নাই। জোলমার কোনো আঘাত লাগিযাছে কিনা দেখিতে গিয়া দেখিলাম জোলমা এলাহির হাত ধরিয়া আছে। ইহার অর্থ এলাহির সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। এলাহি যদি আর কাহারও হাত ধরিত, তাহার সহিতও হইয়া যাইত। তখন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই।

গৌ আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'শ্যেনপক্ষী তোমার উপর দয়া করিয়াছে। তুমি ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ও যদি এখানেই কোনো গাছে বসিত বা উড়িয়া বেড়াইত তাহা হইলে তোমাদের যুদ্ধ চলিতেই থাকিত। কিন্তু শ্যেন এক পাক ঘুরিয়াই উড়িয়া গেল। এ কি, এলাহিটাও জুটিয়া গেল নাকি! কি আপদ! বিলচু, খানা, গোলগোল মারা গিয়াছে দেখিতেছি। আমাদের নিয়ম জান তো? উহাদের পরিবারের ভারও তোমাকে লইতে হইবে। কয়টাকে সামলাইবে তুমি! তোমার বেশ চোট লাগিয়াছে দেখিতেছি। চল, চল—'

জয়ধ্বনি করিতে করিতে আমাকে সকলে কাঁধে করিয়া বৃহার গুহায় পৌঁছাইয়া দিল।

রক্তক্ষয়ের ফলে আমি সম্ভবত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। বৃহার গুহায় আমার যখন জ্ঞান হইল তখন প্রথমটা বুঝিতেই পারিলাম না আমি কোথায় আছি। ঘুমের ঘোরে মনে হইল আমি কি আবার আমাদের সেই পুরাতন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছি নাকি? চারিদিকে হাত বুলাইয়া দেখিতে গেলাম, কাঁধে ব্যথা লাগিল। বুঝিলাম আমি শয্যার উপর শুইয়া আছি, ভস্মশয্যায়, আমাদের সমাজেও আমরা স্তূপীকৃত ভস্মের উপর শুইতাম...সহসা কে যেন আমার হাতটা চাপিয়া ধরিল।

'কে, বোহিলা?'

'না, আমি এলাহি।'

ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে মনে পড়িল আমি এখন শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের

দলপতি, বৃহ্যর উত্তরাধিকারী, জোলমার স্বামী। উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এলাহি আমাকে বাধা দিল। বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, এলাহি এখানে কেন?

'এখন উঠিও না, চুপ করিয়া শুইয়া থাক। আমি তোমার কাঁধে পাতা ছেঁচিয়া লাগাইয়া দিয়াছি, হাত নাড়িলে সেটা পড়িয়া যাইবে। তুমি শোও।'

এলাহি জোর করিয়া আমাকে শোয়াইয়া দিল।

'পাতা? কিসের পাতা?'

'তা তোমাকে বলিব কেন? কেমন করিয়া ঘা সারিয়া যাইবে দেখিও।'

'তাই নাকি? কিন্তু পাতার নামটা বলিতে বাধা কী?'

'ও পাতার নাম আমি কাহাকেও বলি না। ওইটুকুই তো আমার সম্বল। আমার একটি সন্তানও হয় নাই, গৌ হয়তো সমাজ হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিত, কেবল কোন্ পাতায় তাড়াতাড়ি ঘা সারে তাহা জানি বলিয়া আমাকে তাড়ায় না। অনেকেই এইজন্য খাতির করে আমাকে।'

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলাম। তাহার পর এলাহি বাহু দিয়া আমার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আমার কানে কানে বলিল, 'মরিবার পূর্বে তোমাকে বলিয়া যাইব।'

'ছাড় ছাড়।'

আমি নিজেকে তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ভয় হইতেছিল জোলমা যদি আসিয়া পড়ে। তখনও জানিতাম না যে, জোলমার আদেশেই সে আমার পরিচর্যা করিতেছে। সে যে আমার স্ত্রী পদবাচ্য হইয়াছে তাহাও তখন জানিতাম না।

'ছাড়িব কেন, আমাকে বিবাহ করিয়াছ জান না?'

'কই, না?'

'জোলমা যে আমার হাত ধরিয়াছিল দেখ নাই?'

' দেখিয়াছি। তাহাতেই কি বিবাহ করা হইল?'

'নিশ্চয়। তুমি যদি তখন আপত্তি করিতে, কিংবা জোলমা যদি আমার হাত ছাড়িয়া দিত তাহা হইলে হইত না। কিন্তু তুমিও আপত্তি কর নাই, জোলমাও হাত ছাড়ে নাই।'

গ্রীবা হইতে এলাহির বাহুপাশ মুক্ত করিতে পারিলাম না।

'জোলমা তোমার হাত ধরিয়াছিল কেন?'

'সে যে আমাকে পুরস্কার দিবে বলিয়াছিল। আমি তোমাকে চাহিয়া লইয়াছি।'

'জোলমা কোনো আপত্তি করিল না?'

'না। বড় ভাল মেয়ে সে।'

'জোলমা কোথায়?'

'কী জানি। গুহার ভিতর কোথাও নিশ্চয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে শোওয়াইয়াই গুহার ভিতর চলিয়া গিয়াছে।'

'গুহাটা কত বড়?'

'প্রকাণ্ড। এখান হইতে লাফাই পাহাড় পর্যন্ত। সমস্তটাই ফাঁপা। ভিতরে ভিতরে কত গুহা যে আছে এক জোলমা ছাড়া আর কেহ জানে না বোধহয়।'

'গৌ কোথায় থাকে?'

'যেখানে যখন খুশি। লাফাই পাহাড়ের পিছনে প্রকাণ্ড একটা পাথর আছে দেখিয়াছ? দূর

হইতে অনেকটা মানুষের মুখের মতো দেখিতে। গৌ সেখানে প্রায়ই যায়।'

'কেন?'

'কি জানি। মনে হয় ওই পাথরটার সহিত কী যেন কথা কয়, পাথরের উপর তিত্তিরের রক্ত মাখায়। নিশ্চয় কিছু একটা ব্যাপার আছে, ঠিক জানি না। জানিতে ইচ্ছাও করে না।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। দুর্বল বোধ করিতেছিলাম। এলাহি ধীরে ধীরে আমার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমের মধ্যেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, জোলমাকে পাইয়াও বোধ হয় পাইলাম না। মনে হইতেছিল, প্রথম তাহার সহিত একা যেদিন আলাপ হইয়াছিল—সেই নৃত্যচঞ্চল ময়ূরবেষ্টিত জোলমা—সেদিনও সে যেমন দূরে ছিল আজও তেমনি দূরে আছে। একটুও কাছে আসে নাই। ক্ষুধিত পশুটার সম্মুখে খানিকটা খাদ্য ধরিয়া দিয়া যেন আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে।

.. গুহার অন্ধকারে জোলমার নিকট বসিয়া ছবি-আঁকা শিখিতেছিলাম। একটি ছোট প্রস্তরখণ্ডের ওপর জোলমা দেখাইয়া দিতেছিল ছবিতে কী করিয়া রং দিতে হয়। আমি আর একটি ছোট প্রস্তরখণ্ডে তাহার অনুকরণ করিতেছিলাম। জোলমার মধ্যে কোনো চঞ্চলতা ছিল না, আমি যে তাহার স্বামী এ বোধই যেন ছিল না, আমার সহিত তাহার দেখা হইত কেবল ছবি-আঁকার সময়। অন্য সময় সে যে কোথায় থাকিত আমি জানি না। অতি প্রত্যূষে প্রত্যহ একবার সে বনে যাইত জানি। রাত্রে কোথায় থাকিত জানি না। রাত্রে আমার কাছে থাকিত এলাহি এবং বিলচুর স্ত্রী টিনা। খানা এবং গোলগোলের স্ত্রীদের দখল করিয়াছিল বিতং। আমি আপত্তি করিলে দখল করিতে পারিত না, কিন্তু আমি আপত্তি করি নাই। এলাহি এবং টিনা যদি না থাকত, আমি নির্ভয়ে আমার নব সাধনায় অগ্রসর হইতাম। সত্যই আমি কম-পশু হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। জোলমার নিকট বসিয়া ছবি-আঁকা শিখিতেই বেশি ভাল লাগিত। রেখার ফাঁদে বর্ণের জালে বড় বড় হরিণ ধরা পড়িয়া যাইতেছে। কি অদ্ভুত। ওহালির মোহ আমার মনকেও আচ্ছন্ন করিতেছিল। ধীরে ধীরে একটা নতুন জগতে যেন আমি প্রবেশ করিতেছিলাম, যে জগতে জ্যোৎস্নার স্পর্শে কৃষ্ণমেঘের ভ[illegible]বহতা স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়, যে জগতে ছবির বল্‌গা হরিণ রক্তমাংসের বল্‌গা হরিণকে ডাকিয়া আনে, যে জগতে মাটির রং প্রস্তর-প্রাচীরকে প্রাণবন্ত করে চিত্তগৌরবে, কণ্টকবৃক্ষকে মহিমান্বিত করে পুষ্পশোভায়।

...বল্‌গা হরিণের পেটের কাছে যেখানে পেটের হরিদ্রাভ বাদামি রং সাদায় আসিয়া মিশিয়াছে, সেখনাটায় আমার বর্ণবিন্যাস ঠিক হইতেছিল না। জোলমা ঝুঁকিয়া নিজেই সেটা ঠিক করিয়া দিতেছিল। খিলখিল হাসির শব্দে উভয়েই চমকাইয়া উঠিলাম। নিঃশব্দচরণে গৌ কখন আসিয়াছ বুঝিতে পারি নাই। ঈষদালোকিত অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম।

'কী ছবি হইতেছে দেখি?'

আবছা অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, 'এ সব তো নকল ছবি। আসল ছবি কবে হইবে।'

জোলমা কোনো উত্তর না দিয়া উঠিয়া গেল এবং গুহার অন্ধকারে অন্তর্ধান করিল। গৌ কাছে আসিলেই সে চলিয়া যাইত।

'কত দূর?'

ভ্রূ নাচাইয়া গৌ আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। আমার উত্তরের উপর যেন

তাহার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আমি মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

'অপদার্থ অকর্মণ্য পাথর—'

দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি বক্র করিয়া সে আমার দিকে ছুটিয়া আসিল, মনে হইল বুঝিবা আমার মুখটা আঁচড়াইয়া দিবে। কিন্তু সে কিছুই করিল না, আমার মুখের কাছে আসিয়া তাহার বক্র অঙ্গুলি সোজা হইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে সে আমার গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

'হইবে হইবে সব হইবে, অধীর হইও না। এখন উপরে চল। শ্যেন সম্প্রদায়ের বহু লোক বাহিরে জমা হইয়াছে। বিতং একটা দল পাকাইয়া আনিয়াছে। জিকাটু পাহাড়ে শঙ্খচূড় নাকি মরে নাই, গুহার মধ্যে এখনও তাহার তর্জন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। উহারা জানিতে আসিয়াছে ইহার কী ব্যবস্থা তুমি করিবে। লাফাই পাহাড়ে আর স্থান নাই। জিকাটু পাহাড় যদি নিরাপদ হয়, শ্যেনপক্ষী সম্প্রদায়ের অনেকে গিয়া সেখানে বাস করিবে।'

'উহারা গিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলুক না।'

'সাপ বলিয়া মানিলে পূর্বেই মারিয়া ফেলিত। উহাদের ধারণা অন্যরূপ। আমারও। শ্যেন সম্প্রদায়ের কেহ উহার গায়ে অস্ত্রাঘাত করিবে না। তোমাকেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।'

'কী করিব?'

'তুমিই ঠিক কর।'

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম বিরাট জনতা আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহাদের কলরব থামিয়া গেল। আমি নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। কী যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। সহসা মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

বলিলাম, 'জিকাটু পাহাড়ে তোমরা যে যত পার শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া চল, তাহার পর আমি ব্যবস্থা করিব। শুষ্ক কাঠ পাহাড়ে জমা হইলেই আমাকে খবর দিও।'

জনতা ছত্রভঙ্গ হইতেছিল, বিতং সহসা জনতার ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'ছবি আঁকা কেমন চলিতেছে? বল্‌গা হরিণ কিন্তু আজকাল আর আসিতেছে না।'

বলিয়াই সে জনতার মধ্যে মিলাইয়া গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

গৌ আমার কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিল, 'বিতংকে সাবধান। ও যে কেবল ভাল হরিণের ডাক ডাকিতে পারে তাহা নয়, ভাল তীরও ছুঁড়িতে পারে। জোলমাকে না পাওয়ার অপমান ও ভোলে নাই, শীঘ্র ভুলিবেও না। মনে রাখিও তোমার মাথাটাই উহার লক্ষ্য।

আমার আত্মসম্মান আহত হইল।

বলিলাম, 'আমি ব্যাঘ্র, শ্যেনপক্ষী আমার কিছু করিতে পারিবে না। বড় জোর একটু আঁচড়াইয়া দিবে, তাহাতে আমার বিশেষ কিছু হইবে না।'

গৌ-এর চক্ষু নিষ্পলক হইয়া গেল। তাহার চোখের তারা দুইটির দিকে চাহিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম, মনে হইল যেন দুইটি বক্রখদ্যোত জ্বলিতেছে। গৌ সেই ভয়ঙ্কর নিষ্পলক দৃষ্টি আমার মুখের উপর কিছুক্ষণ নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার পর বলিল, 'তুমি যাহা বলিলে তাহা আর কখনও বলিও না। তুমি যদি জোলমার স্বামী না হইতে, জোলমার কোলে শিশু দিয়া বৃহার বংশরক্ষা করিবে এ আশ্বাস যদি তোমার নিকট না পাইতাম, তাহা হইলে তোমার এই উক্তির জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। তোমার ব্যাঘ্র-পরাক্রম তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না। আর একটা কথা মনে রাখিও, বিতং শোনপক্ষী নয়, বিতং সিংহ। সিংহ হইয়াও সে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে জোলমার জন্য। জোলমার জন্যই সে বনে বনে হরিণের

ডাক ডাকিয়া বেড়াইয়াছে এতকাল। বৃহার পাগলামির জন্য বিতংয়ের সহিত জোলমার বিবাহ হয় নাই, হইলে হয়তো জোলমার কোলে এতদিন শিশু দেখিতে পাইতাম।'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া গৌ তরতর করিয়া নামিয়া গেল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমারও রক্তে আগুন জ্বলিতেছিল, কানে কানে কে যেন বলিতেছিল, 'এত অপমান সহ্য করিবে? কেন, আর কিসের ভয়, জোলমাকে তো পাইয়াছ!' আমার কুলদেবতা ধীরে ধীরে চোখের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিলাম ব্যাঘ্রবদনা মানবীর নয়নযুগলে ধক্ ধক্ করিয়া কালাগ্নি জ্বলিতেছে। মনস্থ করিলাম বিতংকে অবিলম্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিব।

...এলাহি এবং টিনা দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি আমার বর্শা ও ধনুর্বাণ লইয়া নিঃশব্দে গুহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বিতং কোথায় আছে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হইবে না। খানা এবং গোলগোলের পরিবারবর্গের ভার সে যখন লইয়াছে তখন তাহাদের গুহায় গেলেই বিতংয়ের ঠিকানা পাইব। ঠিকানা যদি না-ও পাই তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিব, সমস্ত লাফাই পাহাড়, সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিব। বিতং সিংহ? সিংহের আস্ফালনে ব্যাঘ্র ভয় পাইবে? এ যে কল্পনাতীত। দেহের শিরায় উপশিরায় আমার ক্ষুব্ধ বন্য আভিজাত্য যেন তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। বিতংয়ের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতেই হইবে। নিবিড় অন্ধকারে নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া পড়িলাম।

...অন্ধকারে সেদিন বন্য শ্বাপদের মতোই আমি সন্তর্পণে বহুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। যদি বিতংয়ের দেখা পাইতাম—শ্বাপদের মতোই তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতাম। কিন্তু তাহার দেখা পাইলাম না। যখন ক্রোধভরে বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম তখন খেয়াল ছিল না যে, এত রাত্রে কেহই গুহার বাহিরে থাকিবে না, সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। লাফাই পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম সমস্ত গুহার মুখে ঝাঁপ লাগানো এবং প্রত্যেক গুহার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। জন্তু-জানোয়ারের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার ইহাই তখন একমাত্র উপায় ছিল। কেহ জাগিয়া নাই দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। যদি ইহারা জাগিয়াই থাকিত তাহা হইলেই বা কী হইত? ইহাদের নিকট হইতে বিতংয়ের খোঁজ লইয়া গিয়া তাহাকে হত্যা করিতাম? দলপতির পক্ষে এ আচরণ কি শোভন হইত? এ সমাজের দলপতি থাকা কি আর সম্ভব হইত সে ঘটনার পর? তাহাকে যদি হত্যা করিতেই হয় গোপনে করিতে হইবে, যেন কেহ জানিতে না পারে। সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

'হোই, হোই, হোই—'

ক্রমবর্ধমান উচ্চৈঃস্বরে তিনবার শব্দ হইয়া থামিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর নজর পড়িল দূরে অবস্থিত একটা বৃক্ষ হইতে কে যেন লাফাইয়া নিচে নামিল। আমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম সে আমার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। একটু কাছে আসিতে দেখিলাম তাহার হাতে বর্শা রহিয়াছে। স্কন্ধে ধনু ঝুলিতেছে।

'কে?'

আমিই প্রথমে প্রশ্ন করিলাম।

একটি যুবক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে চিনিতে পারিয়া বর্শা সন্নত করিল। শ্যেন সম্প্রদায়েরই যুবক একটি।

'তুমি কী করিতেছ?'

'পাহারা দিতেছি।'

'তিত্তির সম্প্রদায়ের একদল লোক একবার গভীর রাত্রে আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল। তখন হইতেই গৌ পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আজ আমার পালা।'

'তিত্তির সম্প্রদায় কি এখনও নিঃশেষ হয় নাই?'

'না, কিছু বাকি আছে এখনও। তাহাদের দলপতি মুনজুট্ খুব বড় জাদুকর। তাহারই শক্তির জোরে কিছু এখনও টিকিয়া আছে। সে না থাকিলে গৌ এতদিন সকলেই শেষ করিয়া দিত—'

'কি করে সে?'

'ঠিক জানি না, তবে শুনিয়াছি, সে শ্যেনপক্ষীদের জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। তাহার পর সেই ভস্মে মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহা নিচে পুঁতিয়া ফেলে।'

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। আমার ক্রোধ সহসা যেন খানিকটা কমিয়া গেল। আমি যে সম্প্রদায়ের দলপতি হইয়াছি সেই সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য এই যুবক একাকী রাত্রি জাগরণ করিতেছে, আর আমি...

'আপনি কি কাহাকেও খুঁজিতেছেন?'

'না, আমিও তোমাদের পাহারা দিতেছি। তোমাকে দেখিয়া খুব খুশি হইলাম। যাও, তুমিও নিজের কাজ কর।'

যুবক চলিয়া গেল। আমি একাকী অন্ধকারে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আর ক্রোধ ছিল না বটে, যে উত্তেজনার তাড়নায় নির্বোধের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম সে উত্তেজনাও অপনোদিত হইয়াছিল কিন্তু অপমানের জ্বালাটা কমে নাই। আমি যে সমাজে এতকাল বাস করিয়া আসিয়াছি, সে সমাজে কুলদেবতার অপমান সহ্য করা নিয়ম নয়। সে সমাজে কোনো পুরুষ কুলদেবতার নিন্দা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার প্রতিশোধ না লয় তাহাকে সকলে মিলিয়া শাস্তি দেয়। এজন্য এক অদ্ভুত শাস্তি প্রচলিত আছে আমাদের সমাজে। তাহাকে সকলে মিলিয়া চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখে এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে তাহার মুখে লাথি মারে। আমি অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিলাম। বিতং আমার কুলদেবতার অপমান করে নাই, অপমান করিয়াছে গৌ। শাস্তি দিতে হইলে গৌকেই শাস্তি দিতে হয়। তাহার পাকা চুলের ঝুঁটি ধরিয়া কুঠার দিয়া তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিতে আমার আপত্তি নাই, তাহার পা দুইটি ধরিয়া পাথরের ওপর আছড়াইয়াও তাহাকে আমি অনায়াসে মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু সেটা কি সমীচীন হইবে? সমস্ত শ্যেনপক্ষী সমাজ তাহা হইলে যে ক্ষেপিয়া যাইবে। জোলমাকে ফেলিয়া পলায়ন করা ছাড়া যে তখন আর গত্যন্তর থাকিবে না। আমার চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। বল্‌গা হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। লাফাই পাহাড় ছাড়িয়া কখন যে বনের ভিতর ঢুকিয়াছি, তাহা জানি না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিয়াছে, নৈশ অরণ্যের বিচিত্র শব্দে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। যে চাঁদ এবং যে শব্দ এতকাল আমাদের বন্য জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে সেই চাঁদ এবং সেই শব্দ মনে হইল আজ যেন কী একটা অভিনব বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। কাহার বার্তা? ওহালির না আমার কুলদেবতার? সহসা মনে হইল জোলমা যেন আমাকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে। অসংখ্য ঝিল্লির ঝঙ্কারে, জ্যোৎস্নার শান্ত আবেদনে সে যেন বলিতেছে—ফিরিয়া এস, ফিরিয়া এস। মনে হইতে লাগিল

শত শিখীকণ্ঠে বুঝি এইবার ওই কথা বিঘোষিত হইবে। উৎকর্ণ হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু ময়ূরেব ডাক শুনিতে পাইলাম না। ধীরে ধীরে আমার সেই পুরাতন বৃক্ষকোটরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ওই বৃক্ষকোটরকে কেন্দ্র করিয়াই আমার এই সম্পূর্ণ নতুন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, এত কাছে আসিয়া তাহাকে একবার না দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। কিছুদূর গিয়া আবার বল্‌গা হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার। এবার খুব কাছে। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতেছি সহসা বিতং একটা ঝোপ হইতে তুড়ুক তুড়ুক করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

'বিতং!'

ডাক শুনিয়া বিতং ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পর আমাকে চিনিয়া তুড়ুক তুড়ুক করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিল। কাছে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিল।

'বিতং, আমি তোমাকে খুঁজিতেই আজ রাত্রে বাহির হইয়াছি।'

'কেন?'

'তোমার সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে চাই। তুমি সুযোগ পাইলেই আমাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? যদি আমার প্রতি তোমার কোনো আক্রোশ থাকে, সম্মুখ যুদ্ধে তাহা প্রকাশ কর। আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি।'

বিতং তুড়ুক করিয়া আর একটু আগাইয়া আসিল, এবং আমার দিকে চোখ মিটমিট করিয়া চাহিতে লাগিল।

'আমি জোলমাকে চাহিয়াছিলাম—পাই নাই, তুমি তাহাকে পাইয়াছ। তোমার প্রতি আমার কিছু আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক, আছেও, কিন্তু সে জন্য আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নই। আমাকে হত্যা করিবার যদি বাসনা থাকে মাথা পাতিয়া দিতেছি, কুঠার বা খড়্গ যাহা চালাইতে চাও চালাও, কিন্তু ইহাও বলিয়া দিতেছি, বৃহা চলিয়া গিয়াছে, আমিও যদি না থাকি, বনে একটি হরিণ আর আসিবে না।'

এই বলিয়া সে সত্য সত্য মাথা পাতিয়া দিল। পরমুহূর্তেই মাথাটা তুলিয়া বলিল, 'মাথাটা স্কন্ধচ্যুত হইবার পূর্বে আর একটা কথা বলিয়া যাই। আমি সভায় তোমার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা গৌ-এর আদেশ অনুসারে। গৌ-এর আদেশ অমান্য করিবার সাহস আমার নাই, কারণ সে পিশাচী। আমি মৃত্যুভয় করি না, কিন্তু গৌ যদি আমাকে আজন্ম রুগ্‌ন করিয়া দেয়? লাফাই পাহাড়ের ফানঝাকে দেখিয়াছ? গালটা পচিয়া দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে? কারণ কি জান? গৌ উহার উপর চটিয়াছিল। এলাহির একটি ছেলেও ভূমিষ্ঠ হয় নাই, খাম্বার চোখ পচিয়া গিয়াছে, সব গৌ-এর অভিশাপ। উহাকে চটাইবার সাহস নাই। উহারই আদেশে তোমাকে কটু কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নাও, এইবার মার—'

আবার বিতং মাথা পাতিয়া দিল। আমি বিস্ময়ে যেন পাথর হইয়া গিয়াছিলাম, আমার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল, আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

'মারিবে না?'

'না। সব কথা না জানিয়া তোমার প্রতি অবিচার করিয়াছি, কিছু মনে করিও না। একটা কথা শুনিলে, হয়তো তুমি সান্ত্বনা পাইবে, জোলমাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। সে তখনও যেমন দূরে ছিল, এখনও তেমনি দূরেই আছে। আমি নামে মাত্র তাহার স্বামী—'

'তাই নাকি?'

বিতং হরিণের ডাক ডাকিয়া তুড়ুক করিয়া আবার ঘুরিয়া বসিল।

'চলিয়া যাইতেছ?'

'হাঁ, বনের ওধারটায় এখনও যাওয়া হয় নাই।'

'আচ্ছা, গৌ আমার সহিত এমন রহস্যময় ব্যবহার করিতেছে কেন বলিতে পার?'

'না। তবে একটা কথা জানি, তাহা গোপনে তোমাকে বলিতেও আপত্তি নাই। গৌ জোলমাকে বিনাশ করিতে চায়; কিন্তু গৌ যে পিশাচ-মন্ত্র জানে, তাহা আকাশ-কন্যা জোলমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাই গৌ অহরহ অন্য উপায় সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আমার বিশ্বাস, তোমাকে হয়তো অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে। আর কিছু জানি না, চলিলাম।'

'শোন, শোন।'

বিতংয়ের নির্বিকার ভাব দেখিয়া সত্যই আমি বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম, এমন আর কখনও দেখি নাই। আমার কুঠারের তলায় নির্বিকারভাবে মাথা পাতিয়া দিয়াছিল, আমি কিছু করিলাম না দেখিয়া ঠিক তেমনি নির্বিকারভাবে চলিয়া যাইতেছে। আশ্চর্য কাণ্ড।

'কী—'

'তুমি যে আমার কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছিলে, যদি সত্যই আমি মারিতাম—'

বিতং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'আমি জানিতাম, তুমি মারিবে না। আমি মানুষ চিনি। অন্য লোক হইলে তাহাকে এত কথা বলিতাম না। সাবধান, কিন্তু যাহা বলিলাম তাহার প্রতিটি কথাটি সত্যি।'

বিতং হরিণের ডাক ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমি প্রথম যেন সভ্যভাবে অনুভব করিলাম যে আমি বিদেশি, ইহাদের আমি বুঝিতে পারি নাই। বৃহা, গৌ, জোলমা, বিতং প্রত্যেকেই আমার কাছে রহস্যাবৃত, আমাকে দলপতি সাজাইয়া কেন যে ইহারা এই অভিনয় করিতেছে, তাহাও রহস্যাবৃত।

...বৃক্ষকোটরে গিয়া দেখিলাম সেখানে স্থানাভাব। একটি প্রকাণ্ড পেচক আমার স্থানটি দখল করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। তাহাকে অনায়াসে তাড়াইয়া অথবা শিকার করিয়া নিজের কোটর দখল করিতে পারিতাম, তাহার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তিও হইত, কিন্তু তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রবৃত্তির চেহারাই যেন বদলাইয়া গিয়াছিল। সমস্ত অন্তর দিয়া যাহা কামনা করিতেছিলাম তাহা যে ঠিক কী তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু তাহা আর যাহাই হউক বৃক্ষকোটর অথবা পেচক-মাংস নহে। ধীরে ধীরে আবার লাফাই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ জ্যোৎস্না নিবিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কালো মেঘ ঘিরিয়া জ্যোৎস্নার জরি জ্বলিতেছে। অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সত্যই কি ওহালি দিবারাত্র আকাশ-পটে নিত্য নব ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে? কেহ দেখুক বা না দেখুক, তাহার ছবি আকার কি সত্যই বিরাম নেই। সত্য কি ওহালি পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া বৃহাকে বরণ করিয়াছিল। জোলমা সত্যই কি ওই ওহালির কন্যা? সেদিন সেই জ্যোৎস্নামণ্ডিত কালো মেঘ দেখিয়া আমার মনে যেন প্রশ্নের বান ডাকিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে কত কথাই যে মনে হইল। মনে হইল বৃহা শুধু হরিণের ছবি আঁকিয়া হরিণদলকে আহ্বান করিত, ওহালি এত অসংখ্য ছবি আঁকিয়া কাহাদের আহ্বান করিতেছে? ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই উপল-বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। একটু পরেই মনে হইল অন্ধকারে বোধহয় পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। পাহাড়ে উঠিয়াছি, কিন্তু জনমানবের কোনো চিহ্ন নাই, কোথাও আগুন দেখা যাইতেছে না। কৃষ্ণ মেঘ

সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে মাঝে মাঝে। ওহালি নতুন ছবি আঁকিতেছে। স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, লাফাই পাহাড়টা কোন্ দিকে? পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, বিদ্যুতালোকে দেখিলাম দূরে দুইজন দাঁড়াইয়া আছে। একটি দীর্ঘকায় পুরুষ আর একটি নারী। দূরে একটি প্রস্তরের স্তূপ রহিয়াছে, তাহারই ওপর দাঁড়াইয়া আছে দুইজনে। পুনরায় বিদ্যুৎ চমকাইতেই দেখিলাম প্রস্তরস্তূপ হইতে তাহারা অবতরণ করিতেছে। নারীটিকে চিনিতে পারিলাম। গৌ। নিমেষের মধ্যে আমি শুইয়া পড়িলাম এবং বুকে হাঁটিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এলাহির কথা নিমেষে মনে পড়িয়া গেল। লাফাই পাহাড়ের পিছনে মানুষের মুখের মতো দেখিতে যে প্রকাণ্ড পাথরটা আছে, সেখানে গৌ যেন কী করে।

...পাথরটার কাছে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। মেঘ ফাটিয়া চাঁদ বাহির হইল, চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কোথাও কেহ নাই। সেই মনুষ্যৎ-মুখাকৃতি পাথরটার পাশেই আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। সহসা পাথরটাই পুরুষ কণ্ঠে কথা কহিয়া উঠিল।

'গৌ, আমি তোমার সহিত সন্ধি করিতে আসিয়াছি। তিত্তিরের সম্প্রদায়ের দলপতি কখনও কাহার নিকট নতজানু হয় নাই। আমি তোমার নিকট নতজানু হইয়াছি, ইহাতেও কি তুমি তুষ্ট হইবে না?'

'দেখ মুনজট্, আমার নাম গৌ, আমি বারংবার মত পরিবর্তন করি না। প্রথম যৌবনে তোমার সহিত আমর প্রথম ভাব হইয়াছিল, তখন যদি তুমি নতজানু হইতে এসব হয়তো কিছুই হইত না। কিন্তু তখন তুমি শ্যেনপক্ষী, আমাকে ত্যাগ করিয়া তিত্তিরপক্ষী রুরাকে বিবাহ করিলে। সে অপমান আমি ভুলি নাই, কখনও ভুলিব না।'

'কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইয়াছে? তোমার একটি পুত্রও তো বাঁচিয়া নাই।'

'থাকিবে কী করিয়া? আমার একটি পুত্রও কি মানুষের মত হইয়াছিল? ইহার জন্য তুমিই দায়ী। তাহার পর যতগুলি পুরুষের সংস্রবে আমি আসিয়াছিলাম তাহাদের প্রত্যেকটি ছিল কাপুরুষ। আমার তাই একটাও ভাল ছেলে হয় নাই। গিয়াছে ভাল হইয়াছে। বৃহাটাকে আমি হত্যা করিয়াছি, জোলমাকেও শেষ করিব কিন্তু তিত্তির বংশের কাহাকেও আমি রাখিব না। গৌ নির্বংশ হইয়াছে, রুরাও হইবে। তুমি নতজানু নতমস্তক যাহাই হও না কেন, আমার এই মত পরিবর্তন হইবে না।'

বুঝিলাম পাথরটা ফাঁপা, ভিতরে বসিবার স্থান আছে। প্রবেশপথও আছে নিশ্চয়ই কোথাও। পাথরের ছায়ায় গুঁড়ি মারিয়া বসিলাম।

'জোলমা শুনিয়াছি আকাশ-কন্যা। তাহাকে কি কুঠার দিয়া হত্যা করিবে? তোমার মন্ত্রে তো তাহার কিছু হইবে না, সে তো তিত্তিরপক্ষী নয়।'

'তাহার মারণ-যন্ত্র কী তাহাও আমি জানি। ওহালি বৃহাকে বলিয়া গিয়াছিল, আমি আড়ি পাতিয়া লুকাইয়া শুনিয়াছি একদিন।'

'কী সেটা?'

'তোমাকে বলিব কেন?'

যদিও গৌ-কে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু কল্পনা করিতেছিলাম যে, গৌ-এর নয়নে রক্তখদ্যোত জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

'আমাকে বলিবে কারণ আমি মুনজট্। ও কি, ও কি, আমাকে মারিতেছ কেন? রাক্ষসী,

পিশাচী—'

পাথরের ভিতর একটা হুড়মুড় শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পরেই গৌ-এর আর্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'ছাড়, ছাড় বলিতেছি।'

'তুই আগে বল্ তবে ছাড়িব। না বলিতে তোকে টুঁটি টিপিয়া এখনই শেষ করিয়া দিব ডাইনি—'

'প্রতিজ্ঞা কর কাহাকেও একথা বলিবে না।'

'করিলাম। বল এবার।'

'ওহ্যলি বলিয়াছিল জোলমা যদি কোনো দিন কোনো পুরুষের সংস্রবে আসে ভাসিয়া যাইবে।'

'ভাসিয়া যাইবে মানে?'

'মানে, মরিয়া যাইবে। মানুষ আর কতক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারে। ওহ্যলির ভাষাই ওই রকম অদ্ভুত। ছাড়।'

'আমি যে অনুরোধ আজ করিয়াছি তাহা রাখিবে না?'

'না।'

'যদি মারিয়া ফেলি?'

'তবু না। তিত্তির বংশ ধ্বংস না করিয়া আমি মরিব না। আমাকে যদি মারিয়াও ফেল আমি প্রেতিনী হইয়া রুরার বংশ লোপ করিব। মার আপত্তি নাই।'

মুনজাটের পুরুষ কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল।

'গৌ, ক্ষমা কর আমাকে। সন্ধি কর—'

'না, না, না, না—'

গৌ-এর চিৎকার এত তীব্র হইয়া উঠিল যে মনে হইতে লাগিল পাথরটা বুঝি চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইবে। সেখানে বসিয়া থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না, উহারা যে কোনো মুহূর্তে বাহির হইয়া আসিতে পারে। নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

আমার এই নৈশ অভিযানের কথা কাহাকেও বলি নাই, এমন-কি জোলমাকেও নয়। এখন মনে হইতেছে জোলমাকেও যদি বলিতাম তাহা হইলে হয়তো যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিত না। সে হয়তো ইহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে বলি নাই। আমার বন্যপ্রকৃতি তখনও অসাধারণ চরিত্রকে বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। দেবতায় বিশ্বাস করিতাম, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিতাম ভয়ে। তাহারা অদৃশ্যচারী। মনে করিতাম সেই জন্যই বুঝি তাহারা অপরিমিত শক্তির অধিকারী। তাহাদের বিশ্বাস করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই, এই ধারণাও আজন্ম মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। জোলমার অসাধারণত্ব সহজ আড়ম্বরহীন ছিল বলিয়া ভাবিয়াছিলাম তাহা বুঝি অসাধারণ নয়, মনে হইত কোনো বিশেষ কারণে ও একটা বিশেষ ধরনের জীবন-যাপন করিতেছে, কিছুদিন পরে আবার আমাদের মতো হইয়া যাইবে। বৃহাকেও বিশ্বাস করি নাই। বৃহা জোলমা যে জগতের জীব ছিল সে জগতে আমরা তখনও প্রবেশ করিতে পারি নাই। গৌ সে জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার হিংস্র প্রকৃতি নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া বৃহার আদর্শকে ধুলিসাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া উহারা যে পথে পা বাড়াইতেছে তাহা ধ্বংসের পথ। লতা বৃক্ষ পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ—দৃশ্যমান সমস্ত জীবজগৎ—যে চিরন্তন উপায়ে অবিরত

বংশবৃদ্ধি করিয়া জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতেছে, তাহাই সনাতন পথ। সংযম, ব্রহ্মচর্য, ছবির ধ্যানে জীবনকে নিঃসন্তান নিস্ফল করিয়া দেওয়া, ইহা অন্যায়, অসঙ্গত, অস্বাভাবিক এবং সেই জন্যই ইহা মৃত্যুরই নামান্তর। বৃহার সংযমকে সে কাপুরুষতা মনে করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল ওহ্বালি বুঝি তাহাকে নপুংসক করিয়া দিয়াছে, তাই ওহ্বালি-কন্যা জোলমাকে সে সুচক্ষে দেখে নাই। তাই বোধহয় তাহাকে বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিল।

...না, জোলমাকে আমি নৈশ অভিযানের কথা বলি নাই। তবে একটি বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলাম। জোলমা আর যে কোনো পুরুষের সংস্রবে আসে আসুক, আমি তাহাকে স্পর্শ করিব না। আমি তাহাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহা পালন করিব। আমি তাহার মৃত্যুর কারণ হইব না। অন্ধকার গুহায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া একটি হরিণের শিং এ রং লাগাইতেছিলাম। জোলমা আমার পাশে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মাঝে মাঝে মৃদু স্বরে উপদেশও দিতেছিল। আমি সাগ্রহে চেষ্টা করিতেছিলাম ছবিটি যাহাতে নিখুঁত হয়! সেদিন বিতং জনতার ভিতর হইতে যে কথাটা বলিয়াছিল তাহা আমি ভুলি নাই। বৃহার মৃত্যুর পর হইতে বনে আর বল্গা হরিণ আসিতেছে না...বৃহার জন্যই বল্গা হরিণ আসিত কি? ...বৃহার ছবির মতো ছবি আঁকিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে সেটা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলিতে দুলিতে ছবি আঁকিতেছিলাম, তাই বোধহয় ছবিও ঠিক হইতেছিল না।

জোলমা মৃদুস্বরে বলিল, 'ওইখানে আর একটু গাঢ় করিয়া রং দাও।'

গাঢ় করিয়া রং দিতে লাগিলাম। রং দিতে দিতে অবান্তর একটা কথা মনে হইল।

'আচ্ছা জোলমা, ময়ূরদের সঙ্গে তোমার ভাব হইল কী করিয়া?'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোলমা বলিল, 'কাহারও সহিত তো আমার ঝগড়া নাই। তবে ময়ূরদের আমি বেশি ভালবাসি!'

'কেন বল তো?'

'উহাদের রূপের জন্য। উহাদের প্রত্যহ না দেখিলে আমার সমস্ত দিনটা যেন ব্যর্থ হইয়া যায়'।

'আজও তুমি বনে গিয়াছিলে?'

'রোজই যাই।'

'আহা, আমিও যদি ময়ূর হইতাম!'

ঘাড় ফিরাইয়া জোলমার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম জোলমার নীল চক্ষু দুইটি হাসিতে ঝলমল করিতেছে।

'এ কথা বিতং বলিতে পারে, তুমি কেন বলিতেছ? আমি তো তোমারি সঙ্গিনী হইয়াছি।'

'কিন্তু তবু তোমাকে যেন পাই নাই। কেন বল তো?'

জোলমা চুপ করিয়া রহিল।

'বলিবে না?'

'যাহা বলিতে চাই তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে না।'

'বলিয়াই দেখ।'

'আমাকে তুমি পাও না কেন জান? আমাকে তুমি যেখানে চাও আমি সেখানে থাকি না। ওহ্বালি আকাশে যখন ছবি আঁকে তুমি যদি সেখানে যাও আমাকে ঠিক পাইবে, ফুলের পাপড়িতে যখন রং ফোটে আমি সেখানে থাকি, তুমি তো তখন সেখানে থাক না, তাই আমাকে পাও না।'

পরমুহূর্তেই অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। গৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দ চরণে কখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই।

'পাইবে, পাইবে, এইখানেই, এই অন্ধকার গুহাতে পাইবে। ফুলের পাপড়িতে যাইবার দরকার নাই। ফুলের পাপড়িতে দুইজনের কুলাইবেও না। হি, হি, হি—'

জোলমার মুখের ওপর সর্পদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৌ হাসিতে লাগিল। জোলমা প্রদীপটি নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জোলমার অনুসরণ করিতেছিলাম, গৌ বাধা দিল।

'ফুলের পাপড়ির আলোচনা পরে করিলেও চলিবে, এখন বাহিরে চল, খোতারি আসিয়াছে, সে তোমাকে কিছু বলিতে চায়।'

'কী?'

'আমি জানি না। আমি দলপতি নই, আমাকে সে বলিবে কেন? আমি জানিতে চাহি না। আমি যাহা জানিতে চাই তাহা এই—আমার কানে কানে গৌ ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিল, 'জোলমার মন পাইয়াছ কি?'

আমার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। গৌয়ের কথায় সহসা যেন লজ্জিতও হইলাম, আমার পৌরুষই যেন আমাকে ধিক্কার দিল। গৌ প্রশ্ন করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল, আমি তাহার চোখের দিকে চাহিতে পারিলাম না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। যে আমি কিছুক্ষণ আগে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, জোলমাকে কিছুতেই স্পর্শ করিব না, সেই আমিই এখন এই সঙ্কল্পকে অযৌক্তিক মনে করিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল জোলমার সম্বন্ধে আমার সঙ্কোচ হয়তো আমার অক্ষমতারই পরিচয়। দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম।

'ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেছ তো? লাফাই পাহাড় হইতে তোমার জন্য মাংস প্রচুর পরিমাণে আসে তো?'

'আসে।'

'আচ্ছা, আমি কাল নিজে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিব। তোমার জন্য নিজ হাতে মাংস সেঁকিয়া আনিব। এক রকম ফলও আনিব, খাইয়া দেখিও কেমন চমৎকার। এখন চল, খোতারি কী বলিতেছে শুনিবে চল—'

গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম খোতারি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ ভাবলেশহীন। আমাকে দেখিয়া সে বলিল—'

'জিকাটু পাহাড়ে প্রচুর শুষ্ক কাট সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইবার কী করিব?'

'শঙ্খচূড়ের গর্জন কি এখনও শোনা যাইতেছে?'

'যাইতেছে। ভাভা, বিতং, লোলো এবং আমি শুনিয়াছি। মনে হইতেছে পাহাড়ের ভিতরে সে যেন তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। ওই ক্রুদ্ধ নাগপ্রেতকে যদি অবিলম্বে শান্ত না করা যায় ভীষণ একটা কিছু অমঙ্গল ঘটিবে। শ্যেন সম্প্রদায়ের সকলেই খুব ভয় পাইয়াছে।'

আমি গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। তাহার পর বলিলাম, 'ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমি কাল জিকাটু পাহাড়ে যাইব। তোমরা কিছু আগুন লইয়া সেখানে উপস্থিত থাকিও।'

খোতারিও গম্ভীরভাবে আমার আদেশটা কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রণিধান করিল, তাহার পর চলিয়া

গেল।

গৌ প্রশ্ন করিল, 'সাপটাকে কি পোড়াইবে মারিবে?'

'দেখি—'

'একটা কথা কিন্তু মনে রাখিও, ও সাপ সাধারণ সাপ নয়। ও নাগরূপী প্রেত। উহাকে কী করিয়া তুমি যে গুহার ভিতরে বন্দী করিয়াছ তাহা জানি না। হয়তো স্বেচ্ছায় ও বন্দিত্ব বরণ করিয়াছে, ভীষণ কোনো প্রতিশোধ লইবে বলিয়া। উহাকে সন্তুষ্ট করিবার একটি উপায় আমি জানি, কিন্তু তাহা তো হইবার নয়।'

'কী উপায়?'

'জোলমাকে লইয়া গিয়া যদি উহার মুখে সমর্পণ করিয়া দাও, ও খুশি হইবে। একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছি ও যেন আসিয়া আমাকে বলিতেছে—আমি জোলমাকে চাই, আর কিছু চাই না। জোলমাকে পাইলে আমি জিকাটু পাহাড় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

সহসা আমার সেই ময়ূরবাহিনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। সত্যই তো, জোলমার ময়ূরেরাই তো উহাকে বন্দী করিয়াছে, জোলমার উপর উহার রাগ হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। গৌ স্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহা হইলে কি...। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, গৌ-এর কথায় আবার স্বস্থ হইলাম।

'জোলমাকে ছাড়িতে রাজি আছ?'

'না।'

গৌ আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'আমি ছাড়িতে রাজি নই। আগে জোলমার কোলে একটি সন্তান দেখিতে চাই, বেশি নয় একটি, তাহার পর জোলমা যদি না-ও থাকে আপত্তি নাই, আমি সেই শিশুকে মানুষ করিব। কুকুরছানাকে মানুষ করিয়াছি, মানুষের শিশুকে পারিব না? নিশ্চয় পারিব। শিশুর অধর স্পর্শে আমার শুষ্ক স্তনেও দুধ উথলাইয়া উঠিবে। উঠিবে না?'

গৌ-এর হিংস্র চোখের তীব্র দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আকুল প্রত্যাশায় যেন তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ অথচ নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা যেন মনে থাকে। সে প্রতিশ্রুতি যদি পালন করিতে না পার তোমার অশেষ দুর্গতি হইবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এলাহি আর টিনাকে আমি এখান হইতে দূর করিয়া দিয়াছি।'

'কেন?'

'আমার খুশি।'

স্পর্ধিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গৌ বলিল, 'বৃহা যখন দলপতি ছিল, তখনও আমি যা খুশি করিতাম, এখনও করিব, যতদিন বাঁচিয়া আছি আমার খুশি অপ্রতিহত থাকিবে।'

আমাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া গৌ চলিয়া গেল। পরমুহূর্তে ফিরিয়া আসিল আবার।

'মনে থাকে যেন আমি কাল সন্ধ্যায় তোমার জন্য মাংস আনিব। আগেই যেন পেট ভরাইয়া ফেলিও না, পেটে স্থান রাখিও, খুব ভাল খাবার আনিব, তেমন খাবার জীবনে কখনও খাও নাই।'

বলিয়াই আবার চলিয়া গেল। আমি সেই অন্ধকার গুহায় স্তিমিত দীপালোকে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্রীড়াচঞ্চল যে হরিণটি আঁকিতেছিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা শঙ্কা ঘনাইয়া আসিয়াছে মনে হইল। মনে হইল সে বুঝি আমার কানে কানে কিছু বলিবে। তাহার মুখের কাছে কানটা লইয়া গেলাম, কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

...প্রদীপ হাতে করিয়া অন্ধকার গুহায় জোলমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম। কোথায় গেল সে? প্রদীপের চকিত আলোকে প্রাচীরগাত্রে কখনও বাইসন, কখনও বন্য মহিষ, কখনও রল্গা হরিণ, কখনও বন্যশূকব মূর্ত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, গুহার অলিতেগলিতে বৃহার শিল্পী-জীবনের আয়োজন সম্ভার ক্ষণিক আলোকে প্রকাশিত হইয়া আবার অন্ধকারে লুপ্ত হইতেছিল, আলো-আঁধারিতে মনে হইতেছিল আমাকে দেখিয়া বুঝিবা কেহ সরিয়া গেল, মনে হইতেছিল বৃহার ছায়ামূর্তি হয়তো এখনই আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। প্রদীপহস্তে গুহার পর গুহা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম কিন্তু জোলমাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না। কোথায় গেল সে...!

জিকাটু পাহাড়ে খোতারির দল সত্যই প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়াছিল। আমি যখন গেলাম তখন দেখি প্রায় শতাধিক লোকও সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। অনেকের হস্তে মশাল জ্বলিতেছে। আমাকে দেখিয়া খোতারি অগ্রসর হইয়া আসিল।

'আপনার আদেশ অনুসারে আগুনও আনা হইয়াছে। এইবার কী করিব বলুন?'

শঙ্খচূড় গজর্ন করিতেছে কি না স্বকর্ণে শুনিতে চাই।'

আমি পর্বতারোহণ করিতে লাগিলাম। সকলে নীরবে আমার অনুসরণ করিল।

...পর্বতশৃঙ্গ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া যে গুহামুখ আমি বন্ধ করিয়াছিলাম, সেই গুহামুখে আসিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলাম। গুহার মুখটি দেখিলাম সম্পূর্ণরূপেই বন্ধই আছে। প্রস্তরে কর্ণসংলগ্ন করিয়া বসিলাম। বেশিক্ষণ বসিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খচূড়ের তর্জন শুনিতে পাইলাম। খোতারি ঠিকই বলিয়াছিল। মনে হইতেছে পাহাড়ের ভিতরটা কে যেন তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। আমার সন্দেহ হইতে লাগিল, বোধহয় একাধিক শঙ্খচূড় ওই গুহায় বন্দী হইয়াছে। একটি শঙ্খচূড়ের পক্ষে এত তর্জন করা কি সম্ভব? আমি কী করিব পূর্বেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

'চল, একবারে পাহাড়ে চূড়ায় উঠিতে হইবে।'

পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম—যে স্থান হইতে বৃহৎ প্রস্তরটিকে স্থানচ্যুত করিয়া নিচে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। তোমাদের বোধহয় মনে আছে প্রস্তরটি স্থানচ্যুত করার ফলে একটা গর্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, সেই গর্তে কান দিয়া আমি শঙ্খচূড়ের গর্জন শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাহাতেই বুঝিতেই পারি যে, নিচে গুহার সহিত এই গর্তের যোগ আছে। শঙ্খচূড় পাছে এই গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসে সেজন্য এই গর্তটিও দ্বিতীয় একটি প্রস্তর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। বন্ধ করিবার পূর্বে জ্বলন্ত শুষ্ক কাঠ উহার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম শঙ্খচূড়কে পোড়াইয়া মারিবার জন্য। কিন্তু দেখিতেছি সে মরে নাই।

'এই প্রস্তরটিকে এইবার সরাও।'

প্রস্তরটি ছোট ছিল, অনায়াসেই সরানো গেল।

'এইবার ওই শুষ্ক কাষ্ঠগুলিতে আগুন ধরাইয়া গর্তের ভিতর ঢুকাইয়া দাও।'

প্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। সেগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া গর্তের ভিতর ফেলিতে

অনেক সময় লাগিল। প্রায় সমস্ত দিনই লাগিয়া গেল। সমস্ত জ্বলন্ত কাষ্ঠগুলি গর্তে ঢুকাইয়া গর্তের মুখ আবার পাথর দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

খোতারির দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'কাল তোমরা আসিয়া শুনিও শঙ্খচূড়ের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে কি না। আমার বিশ্বাস আজই সে সবংশে নিহত হইল, আর সে তোমাদের ভয় দেখাইতে পারিবে না। এইবার আমরা জিকাটু পাহাড় অধিকার করিয়া বসবাস করিতে পারিব'।

খোতারি কিন্তু বিশেষ কিছু বলিল না। তাহার ভ্রূর ঈষৎ স্পন্দন হইতে অনুমান করিলাম যে, আমার কথা উপর সে খুব বেশি আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আরও অনেকের ভ্রূ স্পন্দিত হইতে লাগিল। যাহারা অল্পবয়স্ক যুবক তাহারাই কেবল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালায় আগুন জ্বলিতেছে। প্রথম যেদিন বৃহার নিকট গিয়াছিলাম, সেদিনও মেঘে এইরূপ অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আজ আবার করিলাম। রক্তের রঙে ওহালি এ কোন্ ছবি আঁকিতেছে? জোলমা কোথায়? তাহার পর হইতে জোলমার আর দেখা পাই নাই। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া সেই রুক্ষ পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

...জিকাটু পর্বত হইতে বৃহার গুহায় যখন ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি জোলমাকে খুঁজিতেছিলাম, মনে হইতেছিল তাহাকে আর বুঝি পাইব না। চতুর্দিকে অদ্ভুত একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। গৌ বলিয়া গিয়াছে, আমার জন্য মাংস আনিবে, কিন্তু কোথায় সে? ঝাউঝাউটা পর্যন্ত নাই, গৌ তাহাকে লইয়া গিয়াছে। গুহার ভিতরটা অন্ধকার। জোলমা তাহার প্রদীপটা কোথায় রাখিয়া গিয়াছে কে জানে! অন্ধকারকে এতদিন অসহ্য মনে হয় নাই, সেদিন মনে হইতে লাগিল আর যেন অন্ধকারকে সহ্য করিতে পারিতেছে না। গুহার ভিতর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া প্রদীপটা খুঁজিতেছিলাম, হঠাৎ কাহার গায়ে হাত ঠেকিল, চমকাইয়া উঠিলাম।

'কে?'

'আমি এলাহি। বেশি জোরে কথা বলিও না। গৌ হয়তো শুনিতে পাইবে। এটা রাখ।'

'কী?'

'সেই গাছের পাতা, যাহা দিয়া তোমার ঘা সারিয়াছিল। পাতাটা ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিও, খুব উপকারী পাতা।'

'এখন হঠাৎ পাতা আনিবার মানে? আমার ঘা তো সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে।'

পাতাটা তোমাকে চিনাইবার জন্য আনিয়াছি। সেদিন তুমি যে পাতাটার নাম জানিতে চাহিয়াছিলে, মনে নাই? ইহার নাম আমি জানি না।'

'কাল দিনের বেলা চিনাইয়া দিলেই হইত।'

'কাল আমি থাকিব না।'

'কোথায় যাইবে?'

'যেদিকে দুই চক্ষু যায়। এখানে আমাকে থাকিতে দিবে না। আমি আজই লাফাই পাহাড় ত্যাগ করিব। এটা রাখ, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগিবে, তা ছাড়া এটার জন্যই হয়তো আমাকেও মনে পড়িবে মাঝে মাঝে। আমি যাই— গৌ আসিতেছে— '

ত্রস্ত এলাহি সভয়ে বাহির হইয়া গেল। আমি কয়েকটা পাতা হাতে করিয়া মূঢ়ের মতো

দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঝাউঝাউয়ের ডাক শোনা যাইতেছিল। একটু পরেই গৌ আসিল। তাহার সাড়া পাইয়া আমি গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম আকাশে চাঁদ উঠিতেছে। জ্যোৎস্নার পটভূমিকায় জোলমাকেও সহসা দেখিতে পাইলাম। সে ওহালির কাঠে হেলান দিয়া চন্দ্রোদয় দেখিতেছিল। নিস্পন্দন নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল সে। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জ্যোৎস্না, তাহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। গৌ ঝাউঝাউকে পাথরে বাঁধিয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

'তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি। জোলমা কোথায়?'

অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিলাম। গৌ ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার চোখের দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। নিজেকে সম্বরণ করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠেই গৌ জোলমাকে আহ্বান করিল।

'জোলমা খাইবে এস।'

'আমার এখন খাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।'

'কেন?'

'জানি না।'

গৌ-এর চক্ষুর দৃষ্টিতে আবার আগুন ধরিয়া গেল। নীরবে সে জোলমার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। জোলমার কিন্তু কোনো ভাবান্তর হইল না, সে যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি দাঁড়াইা রহিল।

'ও থাক, তুমি চল।'

আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে গৌ আমাকে গুহার ভিতর লইয়া গেল। চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল, তাহার কটি-সংলগ্ন চর্মপেটিকা হইতে কিছু মাংস বাহির করিয়া আমার মুখে গুঁজিয়া দিল। চিবাইয়া বুঝিতে পারিলাম শুধু মাংস নয়, মাংসেব সহিত আরও কি যেন রহিয়াছে। কি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে না পারিলেও চিবাইয়া যাইতে লাগিলাম, এত সুস্বাদু মাংস ইতিপূর্বে কখনও খাই নাই।

'কেমন লাগিতেছে?'

'খুব ভাল। মাংসের সহিত আর কী আছে?'

'তিত্তিরের ডিম আর মধু। খাও, সবটাই তোমার জন্য আনিয়াছি।'

গৌ আমর মুখে মাংস তুলিয়া দিতে লাগিল, আমি লোভীর মত গ্রাস করিতে লাগিলাম। গৌ-এর চোখেমুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা অবর্ণনীয়। হিংস্রতা, কোমলতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিহুলতার সে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

'এইবার এই ফলগুলি খাও।'

'কী ফল?'

'মহুয়া। খাইয়াছ কখনও।'

'না।'

'খাইয়া দেখ, চমৎকার লাগিবে।'

খাইতে লাগিলাম। গৌ অনেকগুলি ফল আনিয়াছিল, সব নিঃশেষ হইয়া গেল। আরও থাকিলে তাহাও নিঃশেষ হইয়া যাইত। সমস্ত দেহমনে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। ক্রমশ অপূর্ব একটা উন্মাদনায় দেহের অণু পরমাণু স্পন্দিত হইতে লাগিল। গৌ আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। বাহিরে জ্যোৎস্নাও হাসিতেছিল। সহসা জোলমা

ভিতরে ঢুকিল, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর গুহার অপর প্রান্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভূগর্ভেই নামিয়া গেল সম্ভবত।

'তুমিও যাও।' গৌ হাসিয়া বলিল।

'জোলমা না ডাকলে—'

আমি ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেলাম। জোলমা না ডাকিলে জোলমার কাছে যাইব না—জোলমার অনুরোধেই এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

'জোলমা না ডাকিলে যাইবে না?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গৌ-এর চক্ষুর দৃষ্টি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

'কাপুরুষ, নপুংসক—'

গৌ আমার দুই গণ্ডে দুইটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি ক্ষণিকের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই লাফাইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্তে যদি গৌ-কে নাগালের মধ্যে পাইতাম হয়তো তাহাকে শেষ করিয়া দিতাম। কিন্তু বাহিরে আসিয়া গৌ-কে দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

...গুহার ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম ভূগর্ভ হইতে মৃদু আলোর আভা গুহার অপর প্রান্তের অন্ধকারকে স্বচ্ছ করিযাছে। বাহিরে দাঁড়াইযা এতক্ষণ নিজের সহিত যে তর্কে লিপ্ত ছিলাম ওই আলোর আভায় সেটা যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। জোলমা আমার স্ত্রী। তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে আমার বাধিতেছে কেন? ইহা কি সত্যই আমার কাপুরুষতা? একটা অজ্ঞাত ভয়ের বশবর্তী হইয়াই যে আমি এই অস্বাভাবিক আচরণ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিসের ভয়? ব্যাঘ্র-সমাজের কোনো নিয়ম অমান্য করিলে ভয়ের কারণ ছিল, শ্যেনপক্ষী সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ যদি কিছু করিতাম তাহার হইলেও তো শ্যেনপক্ষী দেবতা অসন্তুষ্ট হইতে পারিতেন, কিন্তু জোলমার সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহার হেতু জোলমার মধ্যেই আছে। জোলমাকেই কি আমি ভয় করিতেছি? জোলমার ক্ষমতা আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বিশেষত সে যখন বনে থাকে তখন তাহার ময়ূরের দল সত্যই ভীতিপ্রদ, কিন্তু এখানে এই অন্ধকার গুহার মধ্যে কিসের ভয? জামাইকিনার সঙ্গে যখন বিবাহ হইয়াছিল সে-ও কাছে ঘেঁষিতে দিত না। আঁচড়াইয়া দিত, কামড়াইয়া দিত, দূর হইতে পাথর ছুঁড়িত। বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বশ করিতে হইয়াছিল। জোলমাও নারী, সে-ও হয়তো নতুন রকম অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাকে প্রতিহত করিতেছে.. তা ছাড়া গৌ-কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। সহসা মনে হইল জোলমাকেও কি প্রতিশ্রুতি দিই নাই? ...জোলমা বলিয়াছিল প্রয়োজন হইলে গৌকে শিশু আনিয়া দিবে, ওহালির আঁকা সেই প্রস্তরখণ্ড লইয়া...হঠাৎ আবার একটা কথা মনে হইল, জোলমা লুকাইয়া কাহাকেও ভালবাসে না তো...হয়তো সেই জন্যই ছলনা করিয়া আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে, হয়তো পাথর লইয়া গভীর নিশীথে বৃক্ষতলে গিয়া সেই প্রণয়ীর সহিতই মিলিত হইবে...গৌ ঠিকই বলিয়াছে, আমি নির্বোধ নপুংসক। কথাটা মনে হইবামাত্র শরীরের শিরায়-উপশিরায় রক্তস্রোত উন্মাদ হইযা উঠিল।

ভূগর্ভে নামিয়া দেখিলাম জোলমা নাই। প্রদীপটা জ্বলিতেছে। প্রাচীরে বিশালশৃঙ্গ একটা বল্‌গা হরিণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—এই তো এইবার ঠিক পুরুষের মতো আচরণ করিতেছ।

'জোলমা!'

বিরাট গুহায় আমার চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত পশুর দলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল যেন। তাহারা জীবন্ত হইয়া যেন আমাকে ঘিরিয়া ধরিল, তাহাদের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে লাগিলাম। নীরব ভাষায় তাহারা যেন বলিল, 'রেখার বর্ণে আমাদের ইহারা বন্দী করিয়াছে, আমাদের বন্দিত্ব মোচন কর, তুমিও মুক্ত হও, চল আবার আমরা সেই উদ্দাম আরণ্য-জীবনে ফিরিয়া যাই। এই মোহ-কারাগার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দাও...

'জোলমা!'

গুহা-প্রান্তের অন্ধকারটা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তাহার পরই দেখিলাম জোলমা আগাইয়া আসিতেছে। তাহার অঙ্গে কোনো আবরণ নাই, ওহালির সেই বর্ণবিচিত্র পাথরটা কেবল সে বুকের কাছে ধরিয়া আছে। আমার কাছে আসিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'এখন আসিলে কেন, আমি তো তোমায় ডাকি নাই।'

'তুমি কোথা ছিলে? কি করিতেছ?'

'আমি এই পাথরটা লইয়া বনে যাইতেছিলাম।'

'কেন?'

'তোমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য। আমার কোলে গৌ যদি শিশু না দেখে তাহা হইলে---'

'তাহার জন্য তোমাকে বনে যাইতে হইবে না।'

আগাইয়া গিয়া আমি তাহার হাত ধরিলাম।

'ইহার অর্থ?'

তাহার হাত হইতে পাথরটা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

'এ কি? ছি ছি, ছাড়, ছাড়—'

আমার আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া জোলমা ছটফট করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমাকে ঘিরিয়া হরিণ, বাইসন, মহিষ, শূকরের দল জয়ধ্বনি দিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ শব্দ হইল। সেরূপ ভীষণ শব্দ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। তাহার পরই চতুর্দিক কাঁপিতে লাগিল, মনে হইল পাহাড়টা বুঝি এখনই ধসিয়া যাইবে। জোলমাকে ছাড়িয়া আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিয়াও দেখিলাম চতুর্দিক কাঁপিতেছে। আবার ভীষণ শব্দ হইল একটা। তাহার পর আবার। মুহুর্মুহুঃ যেন বজ্রপাত হইতে লাগিল। ছুটিয়া পাহাড় হইতে নামিতে গেলাম, কিন্তু নামিতে পারিলাম না। মাটি এত কাঁপিতেছিল যে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব ছিল না, নামিতে গিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলাম। শেষে গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া যখন সমতলে পৌঁছিলাম তখন দেখি সম্মুখেই বড় একটা গাছ রহিয়াছে। তাহাতেই আরোহণ করিতে লাগিলাম। সর্বপ্রকার আপদে-বিপদে যে বৃক্ষদেবতা চিরকাল আমাদের আশ্রয় দিয়াছে তাহার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

অন্ধকারে মধ্যেই একটা কলকল ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। প্রভাতের আলোকে যাহা দেখিলাম তাহা বিস্ময়কর। চতুর্দিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বহু দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া জাগিয়া আছে কেবল, আর কিছু নাই। লাফাই পাহাড়, বৃহার গুহা সমস্ত জলমগ্ন। চক্রবালরেখা পর্যন্ত কেবল জল, জল, জল। বহু জন্তু-জানোয়ার ভাসিয়া যাইতেছে। বন্য মহিষ, বাইসন, শূকর, বল্‌গা হরিণ...। সহসা গাছের চূড়া হইতে বল্‌গা হরিণের ডাক শুনিতে পাইলাম। ভাসমান বল্‌গা

হরিণেরা সে ডাক শুনিয়া ইতস্তত চাহিতে লাগিল। বিতং নাকি? উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—হাঁ, বিতংই বটে। আমাকে দেখিয়া বিতং নামিয়া আসিল।

'বিতং, সহসা এ কী হইল?'

'জিকাটু পাহাড় কাল রাত্রে ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে এই কাণ্ড। তোমরা নাগ-প্রেতকে পোড়াইয়া মারিবে ভাবিয়াছিলে। অত সহজ নয়। পাতাল হইতে জল উঠিয়া তোমাদের আগুন নিভাইয়া দিল। শ্যেনপক্ষীরা নাগদের ধ্বংস করিয়াছিল, নাগ দলপতি তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িয়াছে। আমি এবার চলি—'

'কোথায়?'

'ওই বল্‌গা হরিণদের সঙ্গে। উহারা যেখানে যাইবে আমিও সেখানে যাইব। চলি—'

বিতং ঝপাং করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সে দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। আমি কী করিব? কতদিন এই বৃক্ষশাখায় বসিয়া থাকিব : সহসা দেখিতে পাইলাম জোলমা ভাসিয়া চলিয়াছে। ঘোর রক্তবর্ণ ওহালির গাছের উপর নিস্তব্ধ হইযা বসিয়া আছে সে। তাহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। গৌ মুনজট্‌কে যাহা বলিয়াছিল মনে পড়িল। ওহালির ভবিষ্যাদ্বাণী সফল হইয়াছে, জোলমা ভাসিয়া চলিয়াছে। আমি নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার সমস্ত চেতনা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। আমিও জলে লাফাইয়া অনায়াসেই জোলমার অনুসরণ করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। জীবনে যে অনুভূতি ইতিপূর্বে কখনও আমাকে বিহ্বল করে নাই, সেই অনুভূতি আমার সমস্ত চিত্তকে বিকল করিয়া দিয়াছিল। আমি লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যে জোলমাকে লাভ করিবার জন্য আমি মিথ্যাচারণ, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ, এমন-কি হত্যা পর্যন্ত করিতে ইতস্তত করি নাই, যাহা লাভ করিলে আমার জীবন ধন্য হইয়া যাইত, সেই জোলমা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়া গেল, আমি তাহার কাছে গিয়া তাহার চোখের দিকে তাকাইবার সাহস পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমার বন্য জীবনে যে অপূর্ব স্বপ্ন বর্ণসমারোহে কিছুকালের জন্য মূর্ত হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইয়া গেল, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিলাম না। কেবল অস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলাম, স্থূল হস্ত দিয়া জোলমাকে ধরা যায় না। আমি আকাশ-কন্যাকে বাসনার ফাঁদে বন্দিনী করিতে গিয়া কেবল অপ্রস্তুত হইয়াছি মাত্র। নিজের এই শোচনীয় পরাভবের জন্য মনে কোনো গ্লানিও হইতেছিল না। অন্তরের অন্তস্তলে মনে হইতেছিল ঠিকই হইয়াছে! জোলমা যদি সামান্য রমণীর মতো আমার বাহুপাশে ধরা দিয়া আমার লালসার ইন্ধন জোগাইত, তাহা হইলে কেমন যেমন ছন্দপতন হইত, দেবতার অপমান হইত। একথা সেই অসভ্য যুগেও আমার বর্বর হৃদয়ে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছিলাম। আকাশ যেখানে আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে, জোলমা দেখিতে দেখিতে সেই দিগন্তরেখায় বিলীন হইয়া গেল। হয়তো বৃহা এবং ওহালি সেখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল।

আমি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আরও হয়তো অনেকক্ষণ থাকিতাম, কিন্তু জলের বেগ বাড়িয়া গাছ নড়িতে লাগিল। গাছে বসিয়া থাকা আর নিরাপদ মনে হইল না। জলে লাফাইয়া পড়িলাম এবং দূরবর্তী পর্বতচূড়া লক্ষ্য করিয়া সন্তরণ দিতে লাগিলাম।

...পর্বতচূড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখি বিরাট একটা গুহা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া তাহারই ভিতর অবশেষে অবতরণ করিলাম। সেই গুহার সুড়ঙ্গপথে কতকাল যে চলিয়াছি তাহার ঠিক নাই। কত শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই অন্ধকার যাত্রার স্মৃতি

অস্পষ্টভাবে কিছু মনে আছে। সমস্তই মুছিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ছবি স্পষ্ট হইয়া আছে। যদিও আমি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমি যেন সেই গুহার সুড়ঙ্গপথেই যুগযুগান্ত ধরিয়া চলিয়াছি। সুড়ঙ্গপথের বাঁকে বাঁকে যেন নতুন নতুন লোক ভিড় করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সহিত কিছুকাল কাটাইয়া আবার নতুন যাত্রা শুরু হইয়াছে। সমস্তটাই যেন স্বপ্নের মতো মনে হইতেছে।

...আবার সেই তুষার দেশ। এবার আমি পুরুষ নই। আমি ঝিলমের স্ত্রী জিতা। ঝিলম 'কোয়াক' নামক নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে তিমি শিকার করিতে গিয়াছে, আমি হরিণ-চর্ম নির্মিত তাঁবুর সম্মুখে বসিয়া চাটিয়া চাটিয়া আমার সন্তানদের অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছি। আমার পরিধানে শীলচর্মের পরিচ্ছদ। আমর স্বামীর সহিত আরও জনাকয়েক গিয়াছে। তিমি মাছ দেখা গেলে সকলে একসঙ্গে হার্পুন নিক্ষেপ করিবে, তাহার পর তিমিকে তাড়াইয়া অগভীর জলে লইয়া গিয়া তাহাকে শিকার করিবে। তিনি একটা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের শীত-ভবন এখনও প্রস্তুত হয় নাই, কুকুরের গাড়িটাও ভাঙিয়া গিয়াছে। তিমি পাওয়া গেলে শুধু যে তাহার মাংস এবং চর্বি আমাদের কাজে লাগিবে তাহা নয়, তাহার পঞ্জর দিয়া আমাদের শীত-ভবনের কড়ি বরগা হইবে, তাহার চোয়ালের হাড় দিয়া আমবা আমাদের কুকুরের গাড়ি নির্মাণ করিব। পুঠার কাছে শুনিয়াছিলাম টিট্রিভ সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকুরের গাড়ি চড়িত। আমি এখন যে সমাজে আছি সে সমাজের সহিত টিট্রিভ সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল কি কোনোকালে? কে জানে। বল্‌গা হরিণ এখনও আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু তাহাদের আমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রাচীর গাত্রে আর ছবি আঁকিতে হয় না। ঝিলম এবং তাহার সঙ্গীরা তাহাদের গমনাগমনের পথে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। গ্রীষ্ম আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে বল্‌গা হরিণের দল অরণ্যভূমি ত্যাগ করিয়া তুন্দ্রা পার হইয়া বরফের উপর দিয়া উত্তর দিকে চলিতে থাকে। তাহারা যখন আমাদের এলাকায় আসে তখন ঝিলম এবং তাহার সঙ্গীরা তাহাদের শিকার করে। গ্রীষ্ম পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলিয়া যায়। বল্‌গা হরিণের দল যে দ্বীপগুলিতে গিয়া আশ্রয় লয়, সেগুলি তখন আমাদের তটভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন আমরা বল্‌গা হরিণের নাগাল আর পাই না। গ্রীষ্মকালে দ্বীপগুলি তৃণাচ্ছাদিত হইয়া যায়, বল্‌গা হরিণরা তখন সেখানে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। সে সময় আমরা মাছ শিকার করি। জাল দিয়া অনেক রকম মাছ ধরিতে শিখিয়াছি। আমরাই, মানে মেয়েরাই মাছ ধরি। ছেলে-মেয়েরাও আমাদের সাহায্য করে। কিনাপা (আমার বড় ছেলে) এ বিষয় খুব পারদর্শী। অনেক রকম মাছ পাওয়া যায়। একরকম সাদা মাছ আমাদের খুব প্রিয়। আমরা উহাদের নাম দিয়াছি 'জলের বল্‌গা হরিণ'। পুরুষরা পাখিও শিকার করে। উড়ন্ত পাখিকে বর্ষা দিয়া গাঁথিয়া ফেলে। ভীষণ-দর্শন লোমশ কস্তুরী-বৃষও তাহারা শিকার করে। গ্রীষ্মের পর শীত আসে। সমুদ্রের জল আবার জমিয়া যায়। দ্বীপগুলিতে তৃণগুল্মও থাকে না। বল্‌গা হরিণের দল তখন আবার অরণ্যে ফিরিয়া আসে। ফিরিবার মুখে ঝিলমের দল আবার তাহাদের শিকার করে। পাথর গাঁথিয়া গাঁথিয়া প্রকাণ্ড দুইটি প্রাচীর হ্রদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করা আছে। ঝিলমের দল তাড়া দিয়া হরিণদের সেই প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। ঝিলম হ্রদের ওপর নৌকায় বসিয়া থাকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া। হরিণের দল হ্রদের সমীপবর্তী হইলেই তাহাদের শিকাব করে। এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতেছে, শীতের পর গ্রীষ্ম। এই ছবিটুকুই শুধু মনে আছে, আর সব ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে।

ইহার পব যে চিত্রটি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার পটভূমি তুষারের দেশে নয়। পর্বতও

নয়, অরণ্যও নয়। আমি ক্ষুদ্র একটি গ্রামে রহিয়াছি। এবার আমি পুরুষ, কিন্তু যুবক নহি। আমার বয়স মাত্র দশ বৎসর। যে বিশেষ দিনটির কথা মনে পড়িতেছে সেদিন আমার দীক্ষা। সেইদিনই আমি সমাজের দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হইব। আমি আমার মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। আমি যে সমাজে আছি সে সমাজে প্রথম সন্তানকে বাঁচিতে দেওয়া হয় না। ইহাদের ধারণা প্রথম সন্তানের দেহ অপুষ্ট থাকে, তা ছাড়া তাহার পিতার পরিচয়ও সুনির্দিষ্ট থাকে না অনেক সময়। সেই জন্য প্রথম সন্তান সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ আগ্রহ নাই। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই প্রথম সন্তানই দ্বিতীয় সন্তানরূপে মাতৃগর্ভে আবার আবির্ভূত হয়, ইহাই সকলের বিশ্বাস এবং জননীর সান্ত্বনা। আমি সেই দ্বিতীয় সন্তান। আমি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত জননীর স্তন্যপান করিয়াছি। আমাকে আনন্দ দান করিবার জন্য আমার পিতামাতা কত কী যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পাখি ধরিয়া দিয়াছেন, কড়ির মালা কিনিয়া দিয়াছেন, ছাগলের চামড়া দিয়া টুপি করিয়া দিয়াছেন। আমাকে পিঠে করিয়া বেড়াইয়াছেন, আমার সহিত ছাগল-ভালুক খেলা করিয়াছেন। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি যাহা চাহিয়াছি, যাহা খুশি করিয়াছি, কেহ বাধা দেয় নাই।

এইবার কিন্তু আমাকে নিয়মের বশবর্তী হইতে হইবে। দীক্ষা লইতে হইবে। আজ আমার সেই দীক্ষা-দিবস। প্রভাতেই গ্রামের লোকেরা আসিয়া আমাকে মায়েব নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। গান গাহিয়া বলিয়াছে, 'ওগো মা, তোমার ছেলেকে আর খোকা করিয়া রাখিও না, এবার সে পুরুষ হোক, এবার সে সমাজের হোক, এবার সে ভার বহিতে শিখুক, কষ্টসহিষ্ণু হোক, শিকারি হোক।' মা আমাকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন, মায়ের কোল হইতে তাহারা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেল। তাহাদের সহিত গিয়া নদীতে স্নান করিলাম। সকলে মিলিয়া আমাকে স্নান করাইল। আমার সমবয়সী বালিকারা জলে নামিয়া আমার অঙ্গ মার্জনা করিয়া দিল। আমার দীক্ষার পর তাহাদেরই ভিতর হইতে আমাকে ভাবী বধূ নির্বাচন করিতে হইবে।

স্নান শেষ করিয়া গ্রামপ্রান্তের বিরাট প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রান্তর পূর্বেই পরিষ্কৃত হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গ্রামের যুবকদল আমার অপেক্ষায় সমবেত হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহারা আমাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া তাহারা প্রত্যেকে কুকুর সাজিয়া আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদ কুকুরের মতোই চলিতেছিল, ছোট ছোট লাঠি কোমরে বাঁধিয়া প্রত্যেকে একটা করিয়া ল্যাজও বানাইয়া লইয়াছিল, মুখে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ শব্দও করিতেছিল। আমি মধ্যস্থলে নীরবে বসিয়া রহিলাম, মানুষ-কুকুরের দল আমাকে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। আমি তখন যে সমাজে ছিলাম সে সমাজে সকলের ধারণা ছিল যে, এরূপভাবে প্রদক্ষিণ করিলে কুকুরের সমস্ত সদ্‌গুণ আমার মধ্যে প্রবেশ করিবে। আমিও কুকুরের মতো শিকারি ও সাবধানী হইব। আমার ঘ্রাণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তিও কুকুরের মতো তীক্ষ্ণ তীব্র হইবে। প্রদক্ষিণকারীরা কুকুরের সমস্ত প্রকার হাবভাবের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ প্রদক্ষিণ করিবার পর মানুষ-কুকুরেরা চলিয়া গেল, আসিল মানুষ-ক্যাঙারুরা। তাহারাও ক্যাঙারুর ল্যাজের অনুকরণে খড়ের ল্যাজ পরিয়া আসিয়াছিল, ক্যাঙারুর মতো হাবভাব করিতে করিতে তাহারাও আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা অতিশয় বেদনাদায়ক ব্যাপার। একজন বৃদ্ধ আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। আমি তাহার কাঁধের উপর বসিয়া তাহার বুকের দুইধারে পা ঝুলাইয়া দিয়া তাহার মাথাটি ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। আর একজন পিছন

দিক হইতে আমার মাথাটা টানিয়া ধরিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি একটি পাথরের ছোট নোড়া আনিয়া আমার সম্মুখের দন্তে আঘাত করিতে লাগিল। দুই-তিন আঘাতেই আমার দাঁতটা ভাঙিয়া গেল এবং আমি তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ তখন বলিতে লাগিল—'কাঁদিও না, বেদনা সহ্য কর, বেদনায় অধীর হয় নারীরা, তুমি পুরুষ, তুমি সহ্য কর।'

ইহার পর তাহারা আমাকে ঘন একটা ঝোপের মধ্যে বসাইয়া দিয়া গেল। আমি ভগ্ন দন্তের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রচুর রক্তপাতও হইতেছিল, কিন্তু আমি ভয়ে কাঁদিতে পারিতেছিলাম না। যে বৃদ্ধের স্কন্ধে আমি বসিয়াছিলাম সেই বৃদ্ধও নিষ্পলক নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সম্মুখে বসিয়াছিল। তাহার ঠোঁট দুইটা নড়িতেছিল, কিন্তু সে কি বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। বৃদ্ধ লেহ্‌ন আমাদের গ্রামপতি, সকলে তাহাকে ভয় করে। যখন তাহার ঠোঁট নড়ে অথচ কথা শোনা যায় না তখন সে নাকি মনে মনে মন্ত্রপাঠ করে এবং সে মন্ত্র নাকি ভয়ানক। বৃদ্ধ লেহন যখন চটিয়া যায় তখনই নাকি ওইভাবে মন্ত্র পড়ে। তার মুখের দিকে চাহিয়া আমার উদ্‌গত অশ্রু চোখেই শুকাইল। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া লেহন চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিতে লাগিল। আমি অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি আমাদের গ্রামের পুরোহিত-চিকিৎসক ঝলক্‌নীল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ঝলক্‌নীলের নাগের ডগায় বিরাট একটা কালো আঁচিল, দুই কানে দুইটা বাঘের দাঁত গোঁজা, কপালে গালে নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র করা। তাহাকে দেখিয়া আমি ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিলাম। বাল্যকালে আমার অসুখের সময় সে একবার আসিয়াছিল, আসিয়া আমাকে একটা গাছের ডাল দিয়া আপাদমস্তক প্রহার করিযাছিল। মারের চোটে আমার অসুখ সারিয়া যায়। ঝলক্‌নীল বলিল, 'ভয় নাই। আমি যাহা বলিতেছি তাহা মন দিয়া শোন। এ উপদেশ যদি পালন করিতে পার জীবনে কখনও কষ্ট পাইবে না, মৃত্যুর পরও সুখে থাকিবে। শোন, খুব বেশি স্বার্থপর হইও না, যাহা শিকার করিবে তাহা একা ভোগ করিও না। সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বেশি আনন্দ পাইবে। কলহ্ করিও না, শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা করিবে। মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না। গুরুজনের কথা মান্য করিবে। তোমাদের কুলদেবতা বানরের মাংস কখনও খাইবে না। বানরের যাহাতে অপকার হয় তাহাও কখনও করিবে না। স্ত্রীলোকদের বেশি প্রশ্রয় দিও না। বেশি স্ত্রীলোকের সংস্রবেও আসিও না। গ্রামের সমস্ত লোককে নিজের লোক মনে করিবে। জানিবে তাহাদেব সম্মানে তোমার সম্মান, তাহাদের অপমানে তোমার অপমান। যাহা বলিলাম তাহা যদি পালন কর, হোমভূ তোমার সহায় হইবেন। হোমভূ সর্বত্র আছেন। আকাশে তাঁহার বাড়ি, কিন্তু থাকেন তিনি সর্বত্র, কে কি করিতেছে সব লক্ষ্য করেন। পাপ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। যত লুকাইয়াই পাপ কর না কেন, হোমভু দেখিতে পাইবেন। সুতরাং সাবধান। আমি যাহা বলিলাম তাহা মনে গাঁথিয়া লও। ভাল করিয়া গাঁথিয়া লও। একা একা বসিয়া প্রত্যেক কথাটি ভাব। আমি আবার কাল আসিব।...'

ঝলক্‌নীল চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল আমার মা আমার খাবার লইয়া। খাবার আমার কাছে রাখিয়াই মা চলিয়া গেল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না পর্যন্ত। দেখিবার নিয়ম নাই। আমি একা বসিয়া বসিয়া ঝলক্‌নীলের কথাগুলি মনে মনে রোমন্থন করিতে লাগিলাম। সহসা চোখে পড়িল একটি কাক সম্মুখের বৃক্ষে বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল---কা, কা। আমি শুনিলাম সে যেন

খা খা বলিতেছে। কেন জানি না একটা অদ্ভুত কথা মনে হইল। মনে হইল মায়ের মনের কথা বোধহয় কাকের মুখে ব্যক্ত হইতেছে। আমি যতদিন এই ঝোপে থাকিব মা আমার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতে পাইবে না। এই কাক বোধহয় তাই...। বিস্মিত দৃষ্টিতে কাকের দিকে আবার চাহিলাম। আবার বলিল, 'খা খা।' আহারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কিছু খাবার লইয়া কাককে ছুঁড়িয়া দিলাম। কাক মহানন্দে নামিয়া মাংসের টুকরাটি লইয়া ডালে বসিল এবং ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। ঝলক্‌নীলের কথাগুলি আবার যেন শুনিতে পাইলাম, 'খুব বেশি স্বার্থপর হইও না। সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বেশি আনন্দ পাইবে—।' সত্যিই আমার খুব আনন্দ হইতেছিল। আর একটু টুকরা মাংস কাককে দিলাম। আমি যতদিন ঝোপে ছিলাপ কাকটা রোজ আসিত। ঝলক্‌নলও আসিত এবং আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিয়া যাইত—'ভয় নাই, ভয় নাই। আমি যাহা বলিতেছি মন দিয়া শোন। এ উপদেশ যদি পালন করিতে পার জীবনে কখনও কষ্ট পাইবে না, মৃত্যুর পরও সুখে থাকিবে। শোন, খুব বেশি স্বার্থপর হইও না...'

এই এক কথা এক সুরে দিনের পর দিন সে আমাকে শুনাইয়া যাইত। আমি সেই ঝোপের মধ্যে তিন মাস ছিলাম। একা ছিলাম। রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া একা সেই ঝোপের মধ্যে বসিয়া ঝলক্‌নীলের উপদেশগুলি অন্তরে গাঁথিয়া লইতেছিলাম। দ্বিতীয় কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর আর শুনি নাই। পাখির স্বর শুনিতাম, তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতাম। একদল বক রোজ ঝাঁক বাঁধিয়া সন্ধ্যার পূর্বে উড়িয়া যাইত, একটা নীলকণ্ঠ প্রতিদিন বৈকালে সজিনা গাছের উচ্চতম শাখাটায় বসিয়া ল্যাজ দোলাইয়া ডা ডা শব্দ করিত, আকাশে মেঘের রূপ দেখিতাম। রাত্রে শ্বাপদেরা চিৎকার করিত। গ্রামের ভিতর ঢুকিতে সাহস করিত না। আমার কাছে কোনো দিন আসে নাই। পরে শুনিয়াছিলাম যে, গ্রামের যুবকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রতি রাত্রে আমাকে পাহারা দিত, কিন্তু একথা আমাকে তখন কেহ জানায় নাই। ঝলক্‌নীল আমার নিকট কিছু অস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিল। বলিয়াছিল বিপদে পড়িলে আমি যেন আত্মরক্ষা করি। বলিয়াছিল, 'তুমি নিজে যদি নিজের সহায়ও হও, হোমভু তোমার সহায় হইবেন। যাহারা পরমুখাপেক্ষী, তাহাদের হোমভু সাহায্য করেন না।' তোমরা যাহাকে ভগবান বল আমরা তখন তাহাকেই হোমভু বলিতাম। এই তিন মাস ধরিয়া হোমভুরই চিন্তা করিয়াছি। আকাশে দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছি, হোমভু যদি এখন একবার নামিয়া আসেন বড় ভাল হয়, তাহার সহিত আলাপ করি। পরমুহূর্তেই স্তূপীকৃত মেঘের রাশিতে অস্তমান সূর্যের রক্তিমাভা দেখিয়া মনে হইয়াছে হোমভু এখন মেঘ রাঙাইতে ব্যস্ত, আমার নিকট আসিবার তাঁহার বোধহয় অবসর নাই। ঝোপের ভিতর বসিয়া কত কি ভাবিতাম। টোনটু এবং লিমার কথাও মনে হইত। টোনটু এবং লিমা দুজনকেই আমার ভাল লাগে। ইহাদের মধ্যে কাহাকে বিবাহ করিব জানি না। আমার দুজনকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে। লিমার বাবা গরিব। সে দুইটি শঙ্খের মালা এবং একটি শৃগালের চর্ম দিতে পারে। আমার মা চারিটি শঙ্খের মালা এবং একটি ব্যাঘ্রচর্ম দাবি করিয়াছেন। টোনটুর বাবা হয়তো মায়ের দাবি মিটাইতে পারিবে। লিমার চোখ দুইটি মানসপটে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। লিমার চোখের তারায় আকাশের তারা জ্বলিত। কিন্তু মনে হইত—হায়, তাহাকে পাইব না বোধহয়।

...এখন কোথায় টোনটু, কোথায় লিমা, কোথায় ঝলক্‌নীল, কোথায় বা সেই গ্রাম? সব

হারাইয়া গিয়াছে। সামান্য ছবির টুকরাটুকু স্মৃতির কোঠায় পড়িয়া আছে। দুদিন পরে হয়তো ইহাও থাকিবে না।

...অন্ধকার গুহাপথে বিরামহীন চলিয়াছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইতেছে।

...নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। নৌকার উপর বর্শা হস্তে একা দাঁড়াইয়া আছি। জোরে বাতাস বহিতেছে। হ্রদের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাষা জাগিয়াছে। ঘো আমার পাশে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘো মানুষ নয়, কুকুর। আমরা কুকুর পুষিতে শিখিয়াছি। আগুন এবং পাথরের মতো কুকুরও আমাদের জীবন-সংগ্রামের সহায় হইয়াছে। জীবন-সংগ্রাম এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, অহরহ সচেষ্ট না থাকিলে প্রাণধারণ করা দুষ্কর। শিকার কমিয়া গিয়াছে। যথেচ্ছ শিকার করিবার সুযোগও নাই। যে সব বনে শিকার পাওয়া যায়, সবল মানুষেরা তাহা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা বিদূরিত হইয়াছি। আত্মরক্ষা করিবার জন্য হ্রদের মধ্যস্থলে বড় বড় নৌকায় বাস করিতেছি। হ্রদের মধ্যস্থলে নৌকার গ্রাম। সেই গ্রামের আমি দলপতি। নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ঘো-কে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ গোপনে শিকার করিয়া বেড়াই। ভৃঙ্গ সম্প্রদায় সমস্ত বনটা দখল করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে তাহারা উৎসবে মাতিয়া থাকে, সেই সময় আমি আর ঘো গিয়া তাহাদের বনে হানা দিই। ঘোর দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তির সাহায্য না পাইলে শিকার করিতে পারিতাম না। বনের মধ্যে কোথায় হরিণ লুকাইয়া আছে ঘো তাহা ঠিক বাহির করিতে পারে, তাহার পর সেটাকে তাড়াইয়া আমার নাগালের মধ্যে লইয়া আসে। ঘো এখন আমার জীবনে অপরিহার্য। আমার যে কুকুরটি ছিল তাহার নাম ছিল জিঘা। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের শরাঘাতে জিঘা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার দাঁতগুলি মালা করিয়া আমি গলায় পরিধান করিয়া রহিয়াছি।

...বাতাসের বেগ বাড়িতেছে। গোধা, অবহি, চোনা এখনও বাহির হইতেছে না কেন? গোধা, অবহি আমার দুই পুত্র। তাহারাও আমার সঙ্গে শিকারে বাহির হইবে। গোধার বয়স তেরো, অবহির এগারো। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিয়া কতরূপে তাহাদের বন হইতে শিকার সংগ্রহ করা যায় তাহার কৌশল তাহাদের শিখাইতেছি। চোনা আমার কন্যা, বয়স ষোল। সে-ও আমাদের সহিত বাহির হইবে। ঘোর মতো সে-ও আমাদের শিকারের একজন প্রধান সহায়, সে কিন্তু সহায়তা করে অন্যপ্রকারে। সে শঙ্খের গহনা পরিয়া, কড়ির মেখলা দুলাইয়া সর্বাঙ্গ নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, চোখেমুখে হাবভাব ফুটাইয়া ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের বন-রক্ষকদের ভুলাইতে যায়। চোনা গান গাহিতে পারে, নাচিতে পারে। ভৃঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দূর করিয়া দিয়াছে বটে। আমাদের সম্প্রদায়ের কোনো পুরুষকে তাহারা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে তাহাদের মোহের অন্ত নাই। আমরা তাহাদের এই দুর্বলতার সুযোগ লইতে ছাড়ি না। বনরক্ষক ভুরুষ ভয়ানক লোক। তাহার দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, শক্তিও তেমনি প্রচুর। অব্যর্থ হাতের লক্ষ্য। ভুরুষই জিঘাকে শেষ করিয়াছিল। ভুরুষ কিন্তু চোনাকে দেখিলে আত্মহারা হইয়া পড়ে। চোনা তাহাকে লইয়া যা খুশি করিতে পারে। এখনও কিন্তু উহারা বাহির হইতেছে না কেন? চোনার সাজসজ্জা করিতে দেরি হইতেছে নাকি? চোনা কিন্তু সাধারণত দেরি করে না। তবে কি গোধা অবহি ভয় পাইয়াছে? দুই দিন পূর্বে শিকার করিতে গিয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র লোহা ভুরুষের বর্শার আঘাতে নিহত হইয়াছে। ভুরুষের বর্শা তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছিল। কালই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সেই মুণ্ডটি আমরা সমাধিস্থ করিয়াছি। দেহটি ভস্মীভূত করিয়া

ভস্মগুলি হ্রদের জলে ছড়াইয়া দিয়াছি। গোধা অবহি নিজেরাই এসব করিয়াছে। লোহার মৃত্যু কি তাহাদের কর্তব্যে বাধা দিতেছে? লোহার প্রেতাত্মা তাহাদের কি শিকারে যাইতে বারণ করিয়া গিয়াছে? বহু প্রকার সম্ভাবনা মনেব মধ্যে ভিড় করিয়া আসিল। বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল। 'ঘউ, ঘউ, ঘউ'—ঘো অধীর হইয়া উঠিয়াছে। উহারা কেন বিলম্ব করিতেছে তাহার নির্ণয় করিবার জন্য আমিও হয়তো ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু আমার ফিরিবার উপায় ছিল না। আমি কুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলাম শিকারের সঙ্কল্প লইয়া। শিকার লইয়া না ফিরিলে কুলদেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন। যতক্ষণ শিকার করিতে না পারিব ততক্ষণ ঘরে ফিরিব না এই সঙ্কল্প লইয়া গৃহ ছাড়িয়া বাহির হই, শিকার লইয়া তবে গৃহে ফিরি। অনেক সময় দিনের পর দিন বাহিরে থাকিতে হয়। জঙ্গলে বা গুহায় লুকাইয়া থাকি। সুতরাং উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

..ওই যে চোনা আসিতেছে! গোধা, অবহি কোথা? চোনার পিছু পিছু চোনার মা শীলিনাও আসিতেছে দেখিতেছি। শীলিনা কখন ফিরল? সে হরিণের শিং লইয়া নাভা গ্রামে গিয়াছিল। তাহার বদলে রঙিন ঝিনুক কড়ি এবং শঙ্খ আনিয়াছে নিশ্চয়। তাহারা কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোধা অবহি কোথা? তাহারা আসিতেছে না কেন?'

শীলিনা বলিল, 'তাহাদের বদলে আজ আমি যাইব।'

'তুমি চল আপত্তি নাই। কিন্তু গোধা অবহি যাইবে না কেন?'

শীলিনা চুপ করিয়া রহিল। শীলিনার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সে-ও রণসজ্জায় সাজিয়া আসিয়াছে। তাহারও চোখে মুখে বর্ণের সমারোহ। কণ্ঠে হস্তে কটিদেশে রঙিন ঝিনুকের গহনা। কোমরে একটা ছোরা গোঁজা।

'গোধা অবহি কোথা?'

'তাহাদের আমি বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। যে যম আমার লোহাকে হরণ করিয়াছে, তাহার সহিত আগে বোঝাপড়া করিতে চাই—'

'ঘউ ঘউ ঘউ—'

ঘো পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া যেন শীলিনাকে সমর্থন করিল।

'তাহাদের বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছ? তাহারা কি এখনও শিশু আছে যে জলে পড়িয়া যাইবার ভয়ে তাহাদের বাঁধিয়া রাখিতে হইবে! লোহার বুকে যখন ভুরুষের বর্শা বিদ্ধ হয় তখন গোধা অবহি নিকটেই ছিল। লোহার মৃত্যু তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে; সে মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার সুযোগ তাহারাই বা পাইবে না কেন? উহাদের ডাকিয়া আন।'

শীলিনা তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

'যাও।'

শীলিনা তবু গেল না। আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে অনুভব করতেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাহাকে হার মানিতেই হইবে, তবু দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, সজোরে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলাম। আর্তনাদ করিয়া শীলিনা হ্রদের জলে পড়িয়া গেল। সেদিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। চোনার দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে আদেশ করিলাম, 'শীঘ্র উহাদের ডাকিয়া আন।' চোনা ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই দেখিলাম সে গোধা ও অবহিকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। গোধার চোখে জল, অবহির মুখ বিবর্ণ। চোনা যদিও মুচকি মুচকি

হাসিতেছিল, কিন্তু তাহার হাসির অন্তরালে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ভুরুষকে ভুলাইতে যাইবার ইচ্ছা তাহারও ছিল না। আমার ভয়ে সে সাজসজ্জা করিয়া আসিয়াছিল।

'তোমরা আগে আগে চল।'

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাহারা অগ্রবর্তী হইলে ঘো এবং আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় সাঁ করিয়া একটা ছোরা আমার পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল। আর একটু হইলেই আমার পাঁজরে বিঁধিয়া যাইত। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শীলিনা হ্রদের জল হইতে উঠিয়াছে। তাহার মুখের রং উঠিয়া গিয়া বীভৎস দেখাইতেছে। আমাকে ঘাড় ফিরাইতে দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল—

'আমি হরিণের মাংস চাই না, আমরা মাছ খাইয়াই থাকিব, আমার ছেলেমেয়েদের ফিরাইয়া দাও, উহাদের আমি যাইতে দিব না—'

উন্মাদিনীর কথায় কর্ণপাত করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। অগ্রসর হইয়া গেলাম। বাতাসের বেগ আরও বাড়িল।

...প্রবল বেগে ঝড় উঠিয়াছে। আকাশে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। বিরাট একটা বটবৃক্ষের তলায় গোধা, অবাহি, ঘো এবং আমি বসিয়া আছি। চোনা ভুরুষের সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। সহসা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। ঘো উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আমিও সন্তর্পণে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মনে হইল কে যেন আমাদের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। হরিণের দল কি?

না, তাহাদের পদশব্দ অন্যপ্রকার। ঝড়ে বেগে শীলিনা আসিয়া প্রবেশ করিল। আবার সে নতুন করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছে, নতুন করিয়া রং মাখিয়াছে।

'চোনা কোথায়?...'

'ভুরুষের সন্ধানে গিয়াছে।'

'আমি চলিলাম।'

শীলিনা ছুটিয়া গেল। বিস্মিত হইলাম। মনে হইল, শীলিনার সহিত এতকাল বাস করিয়াছি তবু তাহাকে বোধ হয় ভাল করিয়া চিনি না। সে রাক্ষসী, না জননী, না অভিসারিকা, না গৃহিণী? সহসা চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া বজ্রাঘাত হইল। শিহরিয়া উঠিলাম।

...না, নারীকে চিনতে পারি নাই। নারীকে কেন্দ্র করিয়াই যুগে যুগে আমার জীবন সুখদুঃখের ঘূর্ণায় আবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে চিনিতে ঠিক পারি নাই। বহু যুগ-যুগান্তরের পটভূমিকায় আজ তাহার যে মূর্তি দেখিতেছি তাহা রহস্যময়ী মূর্তি। সে কখনও কামিনী, কখনও জননী, কখনও রমণী, কখনও নারী। কখনও অবলা, কখনও শক্তিস্বরূপিণী। কখনও মধুরা, কখনও ভীষণা। বিচিত্ররূপিণী পৃথিবীর মতোই নানা প্রয়োজনে তাহার নানা অভিব্যক্তি। একটি চিত্র মনে পড়িতেছে। তোমাদের পুরাণে অন্নপূর্ণার একটি চিত্র আছে। শিব অন্নপূর্ণার নিকট অন্নভিক্ষা করিতেছেন। আমিও সেদিন রাহুলার নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু অন্ন নয় বিষ। যে রাহুলাকে আমি কিছু দিন পূর্বে দূর করিয়া দিয়াছিলাম, প্রয়োজনের তাগিদে সেই রাহুলারই দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। রাহুলা ছিল বিদ্রোহিনী। সে আমাদের সমাজের চিরাচরিত প্রথা মানে নাই। আমরা তখন হস্তী শিকার করিতাম। হস্তীই ছিল আমাদের প্রধান উপজীব্য। হস্তীর মাংস আহার করিতাম, হস্তীর দন্ত ও অস্থি দিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতাম,

তাহার বদলে ঝিনুক, মৎস্য, শঙ্খ, চকমকি পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করিতাম। হস্তীর চর্মে আমাদের পরিচ্ছদ হইত, তাহা দিয়া আমরা তাঁবুও প্রস্তুত করিতাম। এই হস্তী সহসা সংখ্যায় হ্রাস পাইতে লাগিল। যে দুই-চারিটি রহিল তাহারা এমন দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল যে, তাহাদের নাগাল পাইতাম না। আমাদের পুরোহিত জোনাফুদিন বলিল, পূজা করিতে হইবে। হস্তীর যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয়, এ দেশের জলহাওয়ায় যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে পূজা-দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিলে আমাদের আর কোনো অভাব থাকিবে না। আমরা সকলেই পূজা করিতে সম্মত হইলাম। রাহুলা হইল না। সে বলিল, 'পূজা করিয়া হাতি বশ মানিবে না। তীর মারিয়া তাহাকে বশ করিতে হইবে। দুর্গম স্থানে আমরা পৌঁছিতে না পারিলেও তীর পৌঁছিবে। সে তীর এমন হওয়া চাই যে, হাতির গায়ে বিঁধিলে হাতি আর নড়িতে পারিবে না। যদি বা নড়ে বেশি দূর যাইতে পারিবে না, আমাদের এলাকার মধ্যেই মুখ থুবড়াইয়া মরিবে।'

জোনাফুদিন প্রশ্ন করিল, 'তাহা কী করিয়া সম্ভব?'

'সম্ভব বই কি। আমাকে যদি পুরোহিত করিয়া দাও, আমি দেখাইয়া দিতে পারি—'

রাহুলার প্রদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে জোনাফুদিন সেদিন সহসা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল। পরদিন কিন্তু জোনাফুদিনের আদেশে আমি অশিষ্টা রাহুলাকে ত্যাগ করিলাম। না করিলে জোনাফুদিনকে ত্যাগ করিতে হইত। তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জোনাফুদিনকে ত্যাগ করিলে জোনাফুদিন যে সমাজের পুরোহিত সে সমাজও ত্যাগ করিতে হইত। সে সাহস আমার ছিল না। রাহুলাকেই ত্যাগ করিতে হইল। রাহুলা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

...জোনাফুদিনের পূজা-পদ্ধতিতে কিন্তু কোনো সুফল ফলে নাই। তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সে পূজা-পদ্ধতির কিছু বর্ণনা দিতেছি। সুদীর্ঘ পূজা, বহুদিন ধরিয়া করিতে হইত।

...আমাদের এলাকায় প্রকাণ্ড কালো একটা পাথর ছিল। দূর হইতে দেখিলে সহসা মনে হইত একটা হাতি বুঝি দাঁড়াইয়া আছে। যদিও ওই একটি পাথরকেই হাতি বলিয়া ভ্রম হইত কিন্তু ওই রকম সাতটি কালো পাথরের চাঙড় আমাদের এলাকায় ছিল। জোনাফুদিন বলিল, উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই হস্তী-দেবতার সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। উহাদের পূজা করিতে হইবে। নরনারী সকলকেই পূজায় যোগ দিতে হইবে। পূজার পদ্ধতি জোনাফুদিন ঠিক করিয়া দিল। পূজার পূর্বরাত্রে আমরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে আকাশের নিচে শয়ন করিয়া রহিলাম। জোনাফুদিন প্রত্যেক পুরুষের কানে কানে বলিয়া গেল, 'তুমি মনে মনে কেবল হস্তিনীর রূপ চিন্তা কর।' জোনাফুদিনের প্রধানা পত্নী অংঘী প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কানে কানে বলিয়া গেল, 'তুমি মনে মনে কেবল পুরুষ হস্তীর রূপ চিন্তা কর।' সকলে তাহাই করিতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে জোনাফুদিনের আহ্বানে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার আদেশে আমরা সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম। জোনাফুদিন বলিতে লাগিল, 'আমরা এইবার সকলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিব, যে জঙ্গলে হস্তীরা একদা বাস করিত কিন্তু যে জঙ্গল এখন ত্যাগ করিয়াছে, সেই জঙ্গলে হস্তী ও হস্তিনী সাজিয়া আমরা প্রবেশ করিব। সেই হস্তী-শূন্য অরণ্য আমাদের বৃংহতিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। হস্তীর মতো আমরাও গাছের ডালপালা আহার করিব। মদমত্ত হস্তীরা হস্তিনীর নিকট যেভাবে প্রণয় নিবেদন করে আমরাও তাহার অনুকরণ করিব। আমরা আর মানুষ থাকিব না, আমরা সকলে হস্তী হইয়া যাইব। আজ সমস্ত দিন ও

সমস্ত রাত্রি আমাদের অরণ্যেই কাটিবে। আমাদের এই অণ্যবাসের মুহূর্তগুলিতে আমরা কায়মনোবাক্যে যেন হস্তী-হস্তিনী হইয়া যাই। আমরা উলঙ্গ অবস্থাতেই অরণ্যে প্রবেশ করিব। গ্রামের বালক-বালিকারা আমাদের গাত্রের চর্মাবরণ অরণ্যের প্রান্তে রাখিয়া আসিবে। অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবে। চল এখন অরণ্য অভিমুখে অগ্রসর হই।'

মিছিল করিয়া সকলে আমরা অরণ্য অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গেলাম। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি সেই অরণ্যে হস্তী-হস্তিনীর অভিনয় করিয়া আমাদের কাটিয়া গেল। সত্য সেদিন আমরা মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে জোনাফুদিন আমাদের সকলকে পাথরা নদীতে লইয়া গেল। পাথরা নদী উপলবহুল। জোনাফুদিন প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটি করিয়া বড় উপলখণ্ড কুড়াইয়া লইতে বলিল। একটি উপলখণ্ড হস্তে লইয়া জোনাফুদিনের আদেশে তাহারা আবার অরণ্য অভিমুখে চলিতে লাগিল। আমরা অর্থাৎ পুরুষেরা গান গাহিতে গাহিতে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। জোনাফুদিন গানের একটি কলি গাহিতেছিল আমরা সেইটি সমস্বরে আবৃত্তি করিতেছিলাম। গানের ধুয়া—'প্রতি হস্তিনীর গর্ভে এবার হস্তি-শাবক আসিয়াছে, এস এইবার আমরা আনন্দ করি। মনুষ্য-হস্তিনীর গর্ভে এবার প্রস্তর-হস্তি-শাবক আসিয়াছে, আর আমাদের ভয় নাই, এস আমরা আনন্দ করি।' প্রভাত আলোকে আমাদের সমবেত কণ্ঠের এই গান আর্তনাদের মতো শুনাইতেছিল। আসন্ন অনশনের ভয়ে ভীত হইয়া আমরা চিৎকার করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। জোনাফুদিন আশা দিয়াছিল ইহাতে সুফল ফলিবে। অরণ্য প্রান্তে আসিয়া দেখিলাম বালকেরা আমাদের হস্তিচর্ম-নির্মিত গাত্রাবরণগুলি এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

জোনাফুদিন বলিল, 'প্রতি স্ত্রীলোকের পেটে একটি করিয়া চর্ম বাঁধিয়া দেওয়া হোক। সেই চর্মের ভিতর প্রত্যেকে নিজের নিজের উপলখণ্ড রাখিয়া দাও। তাহার পর হস্ত ও পদের সাহায্যে চতুষ্পদ হস্তীর মতো হাঁটিতে হাঁটিতে আমার অনুসরণ কর। আমরা এইবার সেই হস্তী-প্রস্তরের নিকট যাইব।'

প্রায় শতাধিক স্ত্রীলোক উদরসংলগ্ন চর্মাবরণের ভিতব উপলখণ্ড লইয়া চতুষ্পদ হস্তীর মতো জোনাফুদিনের অনুসরণ করিতে লাগিল। জোনাফুদিন গান গাহিতেছিল—'হস্তিনীরা এইবার হস্তিশাবক প্রসব করিবে, এস এইবার আমরা আনন্দ করি। মনুষ-হস্তিনীরা এইবার প্রস্তর-হস্তিশাবক প্রসব করিবে, আর আমাদের ভয় নাই, এস আমরা আনন্দ করি। হস্তী-প্রস্তর তাহার শাবকগুলির জন্য ধৈর্যভরে নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। চল চল, আমরা শীঘ্র যাই।' চিৎকার করিতে করিতে জোনাফুদিনের স্বরভঙ্গ হইয়াছিল, তাহর রুক্ষ কেশ, জটিল শ্মশ্রু বিস্রস্ত অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার রগের শিরাগুলি স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ. নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া তাহাকে উন্মত্তবৎ দেখাইতেছিল। তাহার অনুকরণ করিয়া আমরাও গান গাহিতেছিলাম। গান গাহিতে গাহিতে আমরা জোনাফুদিনকে এবং হস্তী রূপিণী নারীমুখকে প্রদক্ষিণও করিতেছিলাম।

অবশেষে আমরা যখন হস্তিবৎ সেই কৃষ্ণ প্রস্তরটার নিকটবর্তী হইলাম, জোনাফুদিন আদেশ করিল, 'হস্তিনী যেমন তাহাদের শাবক প্রসব করে, তোমরাও তেমনি ওই উপলখণ্ডগুলি প্রসব কর। প্রসববেদনাতুরা হস্তিনীর অনুকরণ কর সকলে। ঠিকমতো যদি করিতে পার, হস্তীর মতো বলশালী পুত্রলাভ করিবে...'

সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তখন সেই বৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তরের পাদমূলে সমবেত হইয়া কুন্থন করিতে করিতে উপলখণ্ডগুলি প্রসব করিবার ভান করিল। একটি প্রস্তরের পাদমূলেই আমাদের তিন দিন কাটিয়া গেল।

তাহার পর পুনরায় আমরা গান গাহিতে গাহিতে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে গেলাম, আবার তেমনি খোলা আকাশের নিচে শয়ন করিলাম, জোনাফুদিন ও অংঘী আবার আমাদের কানে কানে হস্তীর রূপ চিন্তা করিবার নির্দেশ দিয়া গেল, পুনরায় আমরা অরণ্যে গেলাম, অর্থাৎ প্রথমবার যাহা যাহা হইয়াছিল দ্বিতীয়বারও ঠিক সেই সবই হইল। তফাতের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা এইবার দ্বিতীয় কৃষ্ণপ্রস্তরের পাদমূলে সমবেত হইয়া উপল-প্রসব করিল। আমাদের এলাকার সাতটি কৃষ্ণ প্রস্তর ছিল। সাতটিকেই কেন্দ্র করিয়া আমরা ওই একই ধরনের পূজা সাতবার করিলাম। কিন্তু কোনো ফল হইল না। হস্তী আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে তাহাদের দূরে দেখা যাইত, কিন্তু আমাদের দেখিলেই তাহারা দুর্গম অরণ্যের ভিতর অন্তর্ধান করিত। আমরা তীর এবং বর্শার দ্বারা দুই-একবার দুই-একটা হাতিকে আঘাতও করিয়াছিলাম. কিন্তু সে আঘাতে তাহারা কাবু হয় নাই। পূর্বে তাহারা সংখ্যায় অনেক ছিল, একটা-না-একটাকে আমরা ঘিরিয়া ফেলিতে পারিতাম এবং একটা বড় হাতি শিকার করিতে পারিলে আমাদের অনেক দিন চলিয়া যাইত। কিন্তু যখন তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, ক্ষুধার তাড়নায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম।

অবশেষে একদিন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল। ক্ষুধিত জনতা জোনাফুদিনকে হত্যা করিয়া ফেলিল। শুধু জোনাফুদিনকে নয়, অংঘীকেও, তাহার পুত্রকন্যাদেরও। তাহাদেরই মাংস আমরা ভোজন করিলাম। তাহার পর সমবেত জনতা আমাকে দলপতি করিয়া বলিল, 'রাহুলা জোনাফুদিনকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে বলিয়াছিল পূজা করিলে হাতি বশ মানিবে না। তাহাকে তীর মারিয়া বশ করিতে হইবে। সে তীর এমন হওয়া চাই যে, হাতির গায়ে বিঁধিলে হাতি আর নড়িতে পারিবে না। আমাকে যদি পুরোহিত করিয়া দাও আমি দেখাইয়া দিতে পারি। রাহুলার এসব কথা মনে আছে।'

বলিলাম, 'মনে আছে—'

'তাহা হইলে চল আমরা রাহুলার শরণাপন্ন হই। আমাদের হইয়া তুমিই তাহার কাছে যাও। সে শকুন পাহাড়ের গুহায় বাস করে শুনিয়াছি। ধাঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকেরা রাহুলার নিকট হইতে তীর লইয়া হস্তী শিকার করিতেছে। রাহুলা নিশ্চয়ই কোনো নতুন প্রকার তীর আবিষ্কার করিয়াছে। তুমি তাহার নিকট যাও, আর বিলম্ব করিও না।'

দশ দিন দশ রাত্রি অবিরাম হাঁটিয়া শকুন পাহাড়ে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন বন-সমাচ্ছন্ন। কাছাকাছি মনুষ্যের বসতি আছে বলিয়া মনে হয় না, মাঝে মাঝে দুই-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। পাহাড়ের চূড়ার দিকে চাহিয়া মনে হইল একটা গুহার মতো কি যেন দেখা যাইতেছে। একটা পথও যেন বিসর্পিত রেখায় উঠিয়া গিয়া গুহার দ্বারে শেষ হইয়াছে। ভাবিলাম পাহাড়ের পাদদেশে ওই পথের আরম্ভ নিশ্চয়ই কোথাও আছে। চতুর্দিকে ঘুরিয়া কিন্তু তাহার কোনো সন্ধান পাইলাম না। পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে গেলেই কণ্টকময় দুর্ভেদ্য অরণ্য পথরোধ করে। তবু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কারণ নিরস্ত হইলে চলিবে না। সহসা দেখিলাম একটু দূরে রক্তবদনা রুক্ষকেশিনী একটি নারী গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল শোণিতবর্ণে রঞ্জিত, মস্তকের চুল চমরী-পুচ্ছের

ন্যায়। আমিও নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে সেই ঝোপের সমীপবর্তী হইলাম। সন্তর্পণে গলা বাড়াইয়া, দেখিলাম মেয়েটি মাকড়সা ধরিতেছে। ঝোপের মধ্যে অসংখ্য মাকড়সার জাল। দুইটি কাঠির সাহায্যে মেয়েটি অতি নিপুণতার সহিত মাকড়সা ধরিয়া একটি চামড়ার থলিতে পুরিতেছিল। আমি কোনো শব্দ করি নাই, কিন্তু তবু কী করিয়া জানি না সে আমার সান্নিধ্য টের পাইল। হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর কথা বলিল।

'কে তুমি?'

'আমি জলৌকা সম্প্রদায়ের দলপতি। রাহুলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তুমি কে?'

'আমি দুস্তীর্ণা। রাহুলার সহিত দেখা করিতে হইলে দুইটি বন্য মোরগ, ছয়টি বন্য কপোত এবং কিছু মধু দিতে হইবে।'

'কাহাকে দিতে হইবে?'

'আমাকে। আমার সাহায্য ব্যতীত কেহ রাহুলার নিকট যাইতে পারে না।'

'কেন?'

'কারণ আমি ছাড়া আব কেহ পথ জানে না।'

একবার ইচ্ছা হইল বলি, 'রাহুলাকে গিয়া বল যে তাহার স্বামী তাহার সহিত বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিয়াছে' —কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম। আশঙ্কা হইল ইহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে।

বলিলাম, 'যাহা তুমি চাহিতেছ তাহা দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি বিদেশি, সহসা বন্য কপোত, বন্য মোরগ, মধু কী করিয়া সংগ্রহ করিব?'

'উপায় বলিয়া দিতেছি। পাহাড়ের ওপারে খঞ্জন সম্প্রদায়ের গ্রাম আছে। তাহারা কপোত, মোরগ ও মধু আমার জন্যই সংগ্রহ করিয়া রাখে। তুমি যদি তোমার কণ্ঠের ওই ঝিনুকের মালা দুইটি তাহাদের দাও এখনই কপোত, মোরগ ও মধু পাইবে।

'তাহাতে কিন্তু বিলম্ব হইবে। আমি রাহুলার সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে চাই। আমি আমার ঝিনুকের মালা দুইটি তোমাকেই দিতেছি, তুমি তোমাব আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইও।'

দুস্তীর্ণার নাকের ভিতর হইতে ঘড় ঘড় করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর দন্তবিকাশ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

'সংগ্রহ করিয়া লইবার অবসর আমারও নাই। রাহুলার জন্য পোকামাকড় সংগ্রহ করিতেই আমার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। লেধুকে পাঠাইতে পারি কিন্তু সে কিছু না দিলে যাইতে চাহিবে না। তোমার বাহুলগ্ন মালা দুইটিও তাহা হইলে দাও।'

'লেধু কে?'

'আমার পুরুষ।'

তৎক্ষণাৎ ঝিনুকের মালাগুলি তাহাকে খুলিয়া দিলাম। লোভীর মতো হাত বাড়াইয়া দুস্তীর্ণা সেগুলি লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিধান করিল।

'চল এইবার তোমাকে রাহুলার নিকট লইয়া যাই। তুমি বুকে ভর দিয়া হাঁটিতে পারিবে তো?'

'পারিব।'

'আমার অনুসরণ কর।'

কিছু দূর গিয়া দুস্তীর্ণা বলিল, 'দাঁড়াও এইবার তোমার চোখ বাঁধিয়া দিব।'

'কেন?'

'পথের সন্ধান কাহাকেও জানাইবার ইচ্ছা নাই।'

একটি গাছে বৃহৎ পত্রসমন্বিত একটি লতা উঠিয়াছিল। দুস্তীর্ণা সেই লতা ছিঁড়িয়া আনিল। লতার বড় বড় পাতায় আমার চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া দিয়া লতা দিয়া সেগুলি বাঁধিয়া দিল।

'এইবার আমার হাত ধরিয়া চল।'

চলিলাম। বড় অদ্ভুত মনে হইতে লাগিল। এরূপ পরিস্থিতিতে জীবনে আর কখনও পড়ি নাই। কিছু দূর গিয়া একটা কথা মনে হইল। যে জন্য এত কষ্ট এত হীনতা স্বীকার করিতেছি, সে সম্বন্ধে দুস্তীর্ণাকে তো কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

'রাহুলা যে বিশেষ রকম তীর প্রস্তুত করিয়াছে শুনিয়াছি, তাহা কী উপায়ে পাওয়া যায়?'

'রাহুলার নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে। রাহুলার যদি ইচ্ছা হয় দিবে। অধিকাংশ লোককেই দেয় না। অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতি কিছু দিন আগে কয়েকটা তীর লইয়া গিয়াছে।'

'কী করিয়া সে তীর প্রস্তুত করিতে হয় জান তুমি?'

'কিছু কিছু জানি, সবটা জানি না।'

'যতটুকু জান বল না শুনি।

'বলিব না।'

বিদ্যার বলে সেদিন দুস্তীর্ণা আমাকে পরাভূত করিয়াছিল। আমি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ, আমার গায়ে অসুরের শক্তি। দুস্তীর্ণা তন্বী। তাহার ধৃষ্টতাব জন্য একটি চপেটাঘাতেই তাহাকে চিরদিনের মতো নীরব করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু সে সাহস ছিল না, বাধ্য হইয়া তাহার স্পর্ধা সহ্য করিতেছিলাম, কারণ যে জ্ঞানেব ওপর আমাদের সম্প্রদায়ের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল, সে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি ছিল দুস্তীর্ণার হাতে। তাহাকে হত্যা করিলে নিজেরই সমূহ ক্ষতি।

'তোমাকে যদি আরও ঝিনুকের মালা আনিয়া দিই, তাহা হইলেও বলিবে না?'

'একথা প্রকাশ করিলে রাহুলা আমাকে হত্যা করিবে। এইজন্য সে উৎকটাকে হত্যা করিয়াছে।'

'হত্যা করিয়াছে? কী প্রকারে?

'তীর মারিয়া। রাহুলার তীর অব্যর্থ এবং অমোঘ।'

'রাহুলা এসব কোথায় শিখিয়াছে?'

'জানি না।'

'রাহুলা তাহার এ বিদ্যা কাহাকেও শিখাইবে না?'

'একটি মাত্র লোককে সে শিখাইবে বলিয়াছে।'

'কে সে?'

'তাহার স্বামী, যে স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল। সে যদি আসিয়া তাহার গুহাদ্বারে নতজানু হইয়া ভিক্ষা করে..'

'তাহার স্বামী কোথায় থাকে জান তুমি?'

'জানি না। রাহুলা সে কথা কাহাকেও বলে না।'

'রাহুলা আর বিবাহ করে নাই?'

'না। কোনো পুরুষের সংস্রবেই সে আসে না। সে ওই গুহায় একা একা থাকে আর তীরে মাখাইবার ঔষধ প্রস্তুত করে। আমরা তাহাকে সাহায্য করি, উৎকটটা তো মরিয়া গিয়াছে, এখন আমি একাই সাহায্য করি।'

'তোমাদের সহিত রাহুলার সম্পর্ক কী?'

'কোনও সম্পর্ক নাই। আমরা পাহাড়ের উপর থাকি, রাহুলার ফরমাশ খাটি...'

'কেন?'

'এমনি।'

বুঝিলাম আসল কারণটা দুস্তীর্ণা প্রকাশ করিবে না।

আরও কিছুক্ষণ পথ অতিবাহন করিবার পর দুস্তীর্ণা বলিল, 'এইবার থাম তোমার চোখ খুলিয়া দিই।'

খুলিয়া দিল। দেখিলাম বনের ভিতর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত একটা স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তাহার পর আবার বন শুরু হইয়াছে। দুস্তীর্ণা বলিল, 'ওই বনের ভিতর সোজা হাঁটিবার উপায় নাই। অত্যন্ত ঘন কুলবন। গিরগিটির মতো বুকে হাঁটিয়া ওই বনটুকু পার হইয়া যাও, তাহা হইলে পাহাড় পাইবে। পাহাড়ের কাছাকাছি আসিলে পাহাড়ে উঠিবার পথও দেখিতে পাইবে। যাও—'

'তুমি আসিবে না?'

'না। আমি যে তোমাকে পথ বলিয়া দিয়াছি একথা যেন রাহুলাকে বলিও না। বলিবে না তো?'

দুস্তীর্ণার চোখের দৃষ্টি শঙ্কাতুর হইয়া উঠিল।

'তুমি যখন বারণ করিতেছ বলিব না। কিন্তু কেন বল তো?'

'রাহুলা চায় না যে লোকে গিয়া তাহাকে বিরক্ত করুক। যেদিন অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতিকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম, সেইদিনই রাহুলা আমাকে বারণ করিয়া দিয়াছিল। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলিও যে উৎকটার প্রেতাত্মা আসিয়া তোমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। আমার নাম বলিও না।'

'রাহুলার বারণ সত্ত্বেও তুমি পথ দেখাইলে কেন?'

'আমি পথ না দেখাইলে তুমি রাহুলার নিকট পৌঁছিতে পারিতে কি? আর আমিও কি বন্য মুরগি, বন্য কপোত, মধু পাইতাম?'

দুস্তীর্ণার হাসি সহসা আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

'রাহুলাকে আমার কথা বলিও না কিন্তু।'

'বেশ বলিব না। গুহার নিকট গেলেই কি তাহার সহিত দেখা হইবে?'

'তাহার সহিত দেখা হইবে না। গুহার বেশি নিকটেও যাইও না। বিষাক্ত সাপ, বিছে, মাকড়সা প্রভৃতি গুহার কাছে ছড়ানো আছে।'

'জীবন্ত?'

'জীবন্ত নয়, কিন্তু পায়ে যদি হাড়-টাড় ফুটিয়া যায় অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তাই সাবধান করিয়া দিলাম।'

'তুমি কি রাহুলার জন্যই মাকড়সা ধরিতেছিলে?'

দুস্তীর্ণার চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

'তুমি দেখিয়া ফেলিয়াছ নাকি! হ্যাঁ, রাহুলার জন্যই।'

'ইহাদের বদলে রাহুলা তোমাকে কী দেয়?'

'তীর। সেই তীর লইয়া লেধু হস্তী শিকার করে।'

'ও।'

কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। ব্যাপারটা ক্রমশ যেন স্পষ্টতর হইতেছিল।

'সাপ আর বিছে কি রাহুলা নিজেই ধরে?'

'না। সাপ আগে উৎকটা ধরিত, এখন হংকী ধরে।'

'কী করিয়া সাপ ধরে সে? ফাঁদ পাতে নাকি!'

'সে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে। তাহার হাত দুইটাই সাপের মতো লিকলিকে। তাহাতে সে যখন রং মাখায় তখন ঠিক সাপের মত দেখিতে হয়। হংকী ঘাসের মধ্যে লম্বা হইয়া শুইয়া তাহার হাত দুইটা ঠিক সাপের মতো আঁকাইতে বাঁকাইতে থাকে আর মুখে সাপের মতো শব্দ করে। কাছাকাছি সাপ থাকিলে সে সাপ তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়ে, তাহারা হাত দুইটাকে সাপই মনে করে। হংকী হাত দিয়া সাপের ফণার অদ্ভুত নকলও করিতে পারে, হাতের কাছে সাপ আসিলেই টপ করিয়া ধরিয়া ফেলে সে..'

এই পর্যন্ত বলিয়া দুস্তীর্ণা থামিয়া গেল।

'তুমি ভয়ানক লোক তো! কাথার পিঠে কথা বলিয়া আমাদের ভিতরের খবর সব জানিয়া লইতেছ! যাও, আর তোমার কথার জবাব দিব না। যাও, পাহাড়ে উঠিয়া যাও।'

'রাহুলা যদি আমার সহিত দেখা না করে কী করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিব?'

'তুমি গুহার কাছাকাছি আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিও, 'রাহুলা, রাহুলা, বড় বিপদে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, আমার কথা দয়া করিয়া শোন।' গুহার ভিতর হইতে রাহুলা উত্তর দিবে। গুহার দেওয়ালে একটা ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া রাহুলা তোমাকে দেখিতেও পাইবে।'

'রাহুলা যদি উত্তর না দেয়?'

'অনেক সময় রাহুলা ঘুমাইয়া থাকে। কয়েক 'র ডাকাডাকি করিয়াও যদি উত্তর না পাও বুঝিবে রাহুলা তোমার সহিত কথা কহিবে না। তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।'

'যদি না ফিরি?'

'রাহুলার অমোঘ তীর তোমাকে ফিরিতে বাধ্য করিবে।'

'ফিরিয়া তোমাকে আবার এখানেই পাইব তো?'

'পাইবে।'

পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। দুস্তীর্ণার কথাগুলি কানে বাজিতেছিল—'তাহার যে স্বামী তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল সে যদি আসিয়া গুহাদ্বারে নতজানু হইয়া ভিক্ষা করে...'

'রাহুলা'—গুহাদ্বারে পৌঁছিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলাম। ভিতর হইতে কোনো সাড়া আসিল না।

'রাহুলা—'

কোনো সাড়া নাই। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সাপের চামড়া, মৃত কাঁকড়াবিছা, গাছের শিকড় প্রভৃতি চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। গুহার ভিতর হইতে একটা তীর শাঁ করিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, দেখিলাম পাহাড়ের উপত্যকায়

গিয়া একটি রোমশ পাহাড়ি ছাগের গায়ে সেটি বিদ্ধ হইল। ছাগটাকে প্রথমে আমি দেখিতে পাই নাই, তীর দেখিয়া আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম তীরটি তাহার পিছনের একটা পায়ে গাঁথিয়া গিয়াছে এবং সে চিৎকার করিতে করিতে ছুটিতেছে। বেশি দূর কিন্তু ছুটিতে পারিল না, কিছু দূর গিয়া পড়িয়া গেল।

'আমি জানিতাম তোমাকে আসিতে হইবে।'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম গুহাদ্বারে রাহুলা দাঁড়াইয়া আছে। কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম, বাম হস্তে ধনু, দক্ষিণ হস্তে একটা তীর। শরীরের উপরার্ধ আবরণহীন। লক্ষ্য করিলাম তাহার নারিত্বের সমস্ত চিহ্ন অবলুপ্ত হইয়াছে। স্তনযুগল শুষ্ক, মুখভাবে নারীসুলভ কমনীয়তা নাই, মাথার চুল চূড়ার মতো করিয়া বাঁধা, চক্ষুর দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক তীব্রতা; আমি বিহ্বল হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

'কেন আসিয়াছ তাহাও জানি'—রাহুলাই পুনরায় কথা বলিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

'জোনাফুদিন মরিয়াছে?'

'হ্যাঁ।'

'মরিবে জানিতাম। কী করিয়া মরিল? অনাহারে?'

'সকলে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।'

'বেশ করিয়াছে। এখন দলপতি কে?'

'আমি। তোমার সাহায্য পাইব এই আশাতেই উহারা আমাকে দলপতি করিয়াছে। হস্তী-শিকার করিবার কৌশল তুমি যদি আমাকে না শিখাইয়া দাও আমাকেও হয়তো উহারা মারিয়া ফেলিবে।'

রাহুলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের তীব্র দৃষ্টিতে একটা চাপা কৌতুক মিশিয়া তাহাকে যেন আরও শাণিত করিয়া তুলিল।

'অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতি তোমার নিকট হইতে কিছু তীর লইয়া গিয়া হাতি শিকার করিতেছে। আমাকেও যদি সেই প্রকার তীর কিছু দাও—'

'অধিঙ্গা সম্প্রদায়ের দলপতি নিতান্ত না-ছোড় বান্দা বলিয়া কয়েকটি তীর দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছি। সেই তীরগুলি নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহাকে আবার বিপন্ন হইতে হইবে। কয়েকটি তীর লইয়া বিশেষ কিছু লাভ হবে না। তীর প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।'

'সেই প্রণালীটিই তাহা হইলে আমাকে শিখাইয়া দাও।'

রাহুলার দৃষ্টি হইতে পুনরায় কৌতুকবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাহুলা বলিল, 'সামান্য কুক্কুরীর মতো তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে। মনে আছে?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

'কথার উত্তর দাও। মনে আছে?'

'আছে। আমি ঘোর অপরাধ করিয়াছিলাম রাহুলা। কিন্তু কেন করিয়াছিলাম, তাহাও তুমি জান। জোনাফুদিনকে চটাইবার উপায় আমার ছিল না। প্রকৃত অপরাধী জোনাফুদিন। তাহাকে আমরা শাস্তি দিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হও—'

'তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম। আমার মা পুরোহিত ঘোনজার নিকট বিষক্রিয়ার রহস্য কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই আমি শুনিয়াছিলাম তীরে বিষ মাখাইয়া দিলে বড় বড় জন্তুকে অনায়াসে কাবু করা যায়। তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া আমি

নানাপ্রকার বিষ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি, পুরোহিত ঘোনজার বহু সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু জিনিস পাইয়াছি। তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম, তাই আমি শিখিয়াছি কোন্ বিষ দিয়া হস্তীকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলা যায়, কোন্ বিষ দিয়া হস্তীকে হত্যা করা সম্ভব। সামান্য একটু বিষ তীরের মুখে লাগাইয়া দিলেই হইল। সে বিষ হস্তীকে মারিবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সে বিষে মানুষের কিছু হইবে না। তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম, তাই ইহা যত্ন করিয়া এতদিন শিখিয়াছি। ওই ছাগটাকে দেখ, ওটা মরে নাই, চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, ওটাকে এখন অনায়াসে টানিয়া আনা যাইবে। বাঘে লইয়া যাইবার পূর্বে চল আমরাই গিয়া ওটাকে লইয়া আসি...'

রাহুলা ত্বরিতপদে পাহাড় বাহিয়া নামিতে লাগিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

...জীবন্ত ছাগটাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিতেছিলাম। রাহুলা আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিল। এতক্ষণ উভয়েই কোনো কথা বলি নাই। এইবার আমি কথা কহিলাম।

'রাহুলা, আমাকে শিখাইয়া দিবে না?'

'যদি বলি দিব না?'

আমরা গুহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রাহুলা প্রশ্নটা করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমৃত চলচ্ছক্তিহীন ছাগটাকে একধারে রাখিয়া আমি রাহুলার মুখের দিকে চাহিলাম। রাহুলার দৃষ্টিতে যেন ব্যঙ্গ ও কৌতুকের বহ্ন্যুৎসব হইতেছিল। সে দৃষ্টি যেন নীরব ভাষায় বলিতেছিল—'আমার কাছে না আসিয়া তুই যাইবি কোথায়? আসিতেই হইবে। একবার নয়, বার বার আসিতে হইবে।'

তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আমার পৌরুষ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মনে মনে অপমানিত বোধ করিলাম। কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না।

বলিলাম, 'আমার অবস্থা এখন এই চলচ্ছক্তিহীন ছাগের মতো। ইচ্ছা করিলে তুমি আমাকে মারিতেও পার, রাখিতেও পার।'

রাহুলা কোনো উত্তর দিল না।

'শিখাইয়া দিবে না?'

রাহুলা সহসা চিৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল যেন আর্তনাদ করিতেছে। কোনো কথা নাই, কেবল চিৎকার। পর্বত বিদীর্ণ করিয়া ঝরনাধারা যেমন নির্গত হয়, মনে হইল তেমনি একটা কিছু বিদীর্ণ হইয়া যেন এই শব্দধারা বাহির হইতেছে। সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন কাঁপিতে লাগিল।

'অমন করিতেছ কেন রাহুলা? কী বলিবে, বল। কথা বল, আমাকে কি শিখাইয়া দিবে না?'

সহসা যেমন সে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, সহসা তেমনি আমার প্রকৃতিস্থও হইল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমাকে শিখাইব বলিয়াই তো যত্ন করিয়া নিজে শিখিয়াছি। কিন্তু অত সহজে শিখাইব না। তোমার জন্য যে নিদারুণ কষ্ট আমি ভোগ করিয়াছি, যে অপমান, যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি তাহার কিছুটা তোমাকেও ভোগ করিতে হইবে।'

'কী করিতে হইবে বল?'

আদেশের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে রাহুলা বলিল, 'নতজানু হও। গুহার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া ক্রমাগত অহোরাত্র বলিতে থাক— 'রাহুলা, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে

শিখাইয়া দাও। আর কখনও তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিব না, আমাকে বাঁচাও।' তোমার এই প্রার্থনা শুনিয়া যদি আমার দয়া হয়, শিখাইয়া দিব, যদি না হয় দিব না—

রাহুলা গুহার মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

আমি গুহার সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলাম, 'রাহুলা, দয়া কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি দয়া না করিলে আমি বাঁচিব না...'

কোথায় সেই রাহুলা, কোথায় সেই হস্তী-মুখ, কোথায় সেই বিষের থলি যাহা লইয়া আমি একদা দিগ্বিজয় করিয়াছিলাম? কেহ নাই, কেহ থাকিবে না। থাকিব কেবল আমি। আমি! আমিই বা কে? তাহা জানি না। শুধু জানি আমিই চলিয়াছি। আমাকে কেন্দ্র করিয়া এক এক দল নর-নারী আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ কখনও সঙ্কীর্ণ কখনও প্রশস্ত হইয়াছে। কখনও পর্বত, কখনও নদী, কখনও অরণ্য, কখনও হ্রদ...প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের নানা বিবর্তন, পরিবর্তন... জোলমার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অবলুপ্ত হয় নাই... অন্ধকার গুহা-পথে জোলমাকেই যেন খুঁজিতেছি, জোলমাকে লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছি, জ্ঞাতসারে না অজ্ঞাতসারে...

...নতুন বাঁকে নতুন জীবন শুরু হইয়াছে আবার।

'হো, হো—হৈহৈ—হো-ও-ও।'

অন্ধকার প্রান্তরে সচকিত করিয়া অরণ্যপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছি। আমি যেই থামিলাম, অমনি কিছু দূরে একজন শুরু করিল, 'হো, হো, হৈহৈ—হো-ও-ও।' সে থামিলে আর একজন শুরু করিবে। সমস্ত বন ঘিরিয়া আমাদের দল দাঁড়াইয়া আছে। বন্য গরুর দল তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছি। বন বলিতেছি বটে, কিন্তু বন বলিতে যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহা নয়, এ বনে বৃক্ষ নাই। ঘাসের বন। লম্বা লম্বা ঘাসে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর পরিপূর্ণ। বনের মধ্যে গরুর দল রহিয়াছে, আর তাহাদের ঘিরিয়া রহিয়াছি আমরা। গরুগুলি সাধারণ গরু নয়, মহা-গরু। উচ্চতায় প্রায় হাতির সমান। প্রকাণ্ড শিং দুইটি মাথার উভয় দিকে। আমরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস ইহাদের অনুসরণ করিতেছি। আমাদের কৌশল আমরা ইহাদিগকে ক্রমাগত তাড়াইয়া লইয়া যাইব, একদণ্ড স্থির থাকিতে দিব না। অবিরাম চলিতে চলিতে এক-একটা গরু পরিশ্রান্ত হইয়া দল ছাড়া হইয়া যায়, ক্রমশ সে আর চলিতে পারে না, তখন সেটাকে আর দখল করি।

'হো হো-হৈহৈ—হো ও-ও।'

চিৎকার করিয়া আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। আমার পরেই যাহার চিৎকার করিবার কথা সে কিন্তু এবার আর চিৎকার করিল না। আমি তখন আর একবার চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গেলাম অনুসন্ধান করিবার জন্য। গিয়া দেখিলাম পরিশ্রান্ত নাভিলা শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিতেছে না, ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। পরমুহূর্তেই শুনিতে পাইলাম: 'হো হো-হৈহৈ—আগাইয়া চল—আগাইয়া চল।' দলপতির কণ্ঠস্বর। তাহার আদেশ মুখে মুখে চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাভিলা করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। [illegible] ফেলিয়া আমরা এবার চলিয়া যাইব। সে-ও অনেককে [illegible] উপায় নাই। আমরা নিজেরাও থামিব না, গরুর [illegible] অসমর্থ (মানুষই হোক বা গরুই হোক) সে পথের প্রান্তে

পড়িয়া থাকিবে। মৃত্যুই তখন তাহার একমাত্র গতি। যাহারা শক্তিমান তাহারা আগাইয়া যাইবে। অনুসৃত ও অনুসরণকারী এই একই নীতির খরস্রোতে সেদিন ভাসিয়া চলিয়াছিলাম। থামিবার উপায় ছিল না।

'হো-হো-হৈই—আগাও—আগাইয়া চল'—নাভিলাকে ফেলিয়া আগাইয়া গেলাম। খিংখু ও নিমার কথা মনে পড়িল। তাহাদেরও ফেলিয়া আসিয়াছি। খিংখু আমার ভাই, নিমা আমার স্ত্রী।

...সমস্ত রাত্রি চিৎকার করিতে করিতে আগাইয়া গেলাম। প্রভাতে আসিয়া যেখানে উপস্থিত হইলাম সেখানে দেখিলাম কিছু গাছও আছে। নিশ্চিন্ত হইলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারা যাইবে। দলপতি কাংড়া তাহার সহচরদের লইয়া প্রতি গাছে গাছে উঠিয়া এখন বিতাড়িত পশুর দলকে পর্যবেক্ষণ করিবে। তাহার পর তাহার নির্দেশ অনুসারে আমরা হয় এখানে অপেক্ষা করিব, কিংবা পুনরায় চলিতে শুরু করিব। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম দুই-চারিটা আসন্ন-প্রসবা গাভী যেন কাংড়ার চোখে পড়ে। আসন্ন-প্রসবা গাভী থাকিলে কাংড়া অপেক্ষা করিবে। বাছুরগুলি একটু বড় হইয়া ছুটিতে না পারা পর্যন্ত আমরা এখানে বিশ্রাম করিতে পাইব। আমরা সমস্ত স্থানটা ঘিরিয়া রাখিয়া তাহাদের আগলাইয়া রাখিব, রাত্রে মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিয়া তাহাদের পাহারা দিব, কিন্তু আর চলিতে হইবে না। ক্রমাগত হাঁটিয়া সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

'হো-হৈ-ই—হো-ও—হো-ও-ও—'

একস্থানে বসিয়াই মাঝে মাঝে চিৎকার করিতেছি। সহসা বিদা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে উলুমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সে এখনই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার আশা নাই। শ্বাস উঠিয়াছে। বলিয়াই সে চলিয়া গেল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। গিয়া দেখিলাম উলুম মারা গিয়াছে। পাশেই সদ্যোজাত শিশুটা পড়িয়া চিৎকার করিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছে, ইহার পর যে কি করিতে হইবে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। একটি গর্ত খুঁড়িয়া উলুমকে যথাবিধি কবর দিতে হইবে, সদ্যোজাত শিশুটাকেও তাহার বুকের উপর দিয়া দিতে হইবে। সেই ভ্রাম্যমাণ জীবনে একটা সদ্যোজাত মাতৃহীন শিশু লইয়া বিব্রত হইবার কল্পনা কেহ করিত না। বিদা কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। সে শিশুটাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'ইহাকে আমি ছাড়িব না। যতক্ষণ বাঁচিয়া আছে আমারই বুকে থাকিবে।' আমরা বিদার এই অসমসাহসিকতায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম মনে আছে। দলপতি কাংড়ার নির্দেশ অগ্রাহ্য করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার ছিল। দলের জন্যে সে যে সব নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম হইতে বড় একটা দেখা যায় নাই। কাংড়া বলিত, 'আমার নিয়ম যদি না মানিতে পার দল ছাড়িয়া চলিয়া যাও। নিয়ম বদলাইবে না। দলবদ্ধ হইয়া না থাকিলে সে যুগে জীবনধারণ করা অসম্ভব ছিল। একটা দল ত্যাগ করিয়া অন্য দলে ঢোকাও সহজ ছিল না। কারণ কোনো দলই আগন্তুককে সহসা প্রশ্রয় দিত না। বহু দূর উত্তরে শীতপ্রধান অঞ্চলে মীহার দল বাইসন শিকার করে। তাহার দলে ঢোকা না কি সহজ, কারণ বাইসনদের তাড়াইয়া লইয়া যাইতে বহু লোকের প্রয়োজন হয়, অনেক লোক মারাও যায়। কিন্তু মীহা কাংড়ার দলের কোনো লোককে লইতে চায় না। মীহার ধারণা যাহারা গরু তাড়াইয়া বেড়ায়, বাইসন তাড়ানো তাহাদের কর্ম নয়। সুতরাং কাংড়র দল ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। বিদার মুখের দিকে আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। সে এ কী করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহাকে এ পাগলামি করিতে আমরা সকলেই বারণ করিতে লাগিলাম। ঝুঝু বলিল, 'স্ত্রীলোকের

যখন অভাব নাই, সন্তানেরও অভাব হইবে না। ওটাকে কবরে ফেলিয়া দাও। উলুমের সন্তান উলুমের কাছেই থাকুক।' বিদা কিন্তু আমাদের কথা শুনিল না, কোনো প্রত্যুত্তর করিল না, সদ্যোজাত শিশুটাকে বুকে আঁকড়াইয়া অবুঝের মতো বসিয়া রহিল। তাহার পর সহসা উঠিয়া বনের মধ্যে আত্মগোপন করিল। আমরা তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়িয়া উলুমকে কবরস্থ করিলাম। কাংড়া ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ব্যাপারটা সমাধা হইয়া গেল। তখন আমরা সকলে মিলিয়া স্থির করিলাম কাংড়ার নিকট বিদার আচরণ আমরা গোপন রাখিব। কাংড়া নিজেই যদি আবিষ্কার করে করুক, আমরা কেহ বিদার নামে নালিশ করিব না। আমাদের মনে হইল দুই-একদিনের মধ্যেই শিশুটা অনাহারে মারা যাইবে, তখন তাহাকে লুকাইয়া পুঁতিয়া ফেলিলে কাংড়া জানিতেও পারিবে না। যে বিরাট অরণ্য পরিবেশে যেভাবে আমরা ছড়াইয়া থাকিতাম তাহাতে সামান্য একটা শিশুকে লুকাইয়া রাখা মোটেই অসম্ভব ছিল না। অনেক সময় দিনের পর দিন আমাদের কাংড়ার সহিত দেখাই হইত না। অনেকের সহিতই হইত না। অদৃশ্য শব্দের বন্ধনে আমরা বাঁধা ছিলাম। হো-হৈ-ই-হো-ও—হো ও ও—এই ডাক আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এই ডাক শুনিলেই আমাদের প্রত্যেকেই একে একে অনুরূপভাবে সাড়া দিতে হইত। সাড়া শুনিয়া আমরা বুঝিতাম কে সাড়া দিল। সকলের কণ্ঠস্বর আমরা সকলে চিনিতাম। কাংড়ার শ্রবণশক্তি এ বিষয়ে অতিশয় প্রখর ছিল। আমাদের ওই বিরাট দলের মধ্যে কেহ সাড়া না দিলে কাংড়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিত।

...কিছুক্ষণ পরে কাংড়া ও তাহার প্রধান অনুচরেরা ফিরিয়া আসিয়া যাহা ব্যক্ত করিল তাহাতে আমরা খুশি হইলাম! কাংড়া বলিল, 'অনেকগুলো আসন্ন-প্রসবা গাভী আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাহাদের তাড়া দিয়া লইয়া গেলেও একটাও বাঁচিবে না। তাহারা তো মরিবেই, তাহাদের পেটের বাছুরগুলোও বাঁচিবে না। অকারণে এতগুলি গাভী হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। একটি আসন্ন-প্রসবা গাভী শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে দেখিলাম। সেটাকে টানিয়া আনিতে হইবে। সেটা যদি মরিয়া যায়, তাহার মাংস আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিব। এখন আমাদের খাইবার মতো মাংস প্রচুর আছে। এই বনে দুই-চারিটা শশক এবং হরিণও আছে দেখিতেছি। সেগুলিও আমাদের কাজে লাগিবে। আমি ঠিক করিয়াছি যতদিন আসন্ন-প্রসবা গাভীগুলি প্রসব না করিতেছে, ততদিন আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব না। বাছুরগুলি যখন ছুটিতে পারিবে, তখন আমরা আবার তাহাদের তাড়া দিব। আপাতত যে গাভীটা শুইয়া পড়িয়াছে, সেটাকে দখল করিয়া আমরা এই স্থানটিকে ঘিরিয়া থাকি এবং শশক-হরিণ শিকার করিয়া আমাদের অবসর বিনোদন করি।'

আমরা সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া কাংড়ার প্রস্তাব সমর্থন করিলাম।

...অর্ধমৃত গরুকে কবলিত করিবার জন্য আমরা শক্ত লতা পাকাইয়া খুব মজবুত ধরনের লম্বা দড়ি প্রস্তুত করিতাম। তাহাতে একটা ফাঁসের মতো করিয়া দূর হইতে গরুর গলা লক্ষ্য করিয়া দড়িটা ছোঁড়া হইত। ফাঁসটা গরুর গলায় লাগিয়া গেলে আমরা সকলে মিলিয়া টানিতাম। অধিকাংশ সময়ে দমবন্ধ হইয়াই গরুটা মারা যাইত। কাংড়ার নির্দেশ অনুসারে সেদিন যখন আসন্ন-প্রসবা গাভীটাকে আমরা আনিতে গেলাম, সেদিন ফাঁসটা দৈবাৎ গলায় না লাগিয়া পিঠ এবং সম্মুখের পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া রহিল। টানিতেই ফাঁসটা পিঠ এবং কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে লাগিয়া গেল, গলায় লাগিল না। টানিতে টানিতে তাহাকে যখন আমরা নিজেদের আস্তানায়

লইয়া আসিলাম তখনও দেখি সে জীবিত আছে। কাংড়া বলিল, 'উহাকে এখন মারিও না। ও যদি বাছুর প্রসব করে তাহা হইলে বাছুরটাকে আমরা সঙ্গে রাখিব। একটা বাছুরকে সঙ্গে রাখা খুব বেশি অসুবিধাজনক হইবে না। একটু বড় করিয়া বাছুরটাকে যদি মারি বেশি মাংস পাওয়া যাইবে। গাভীটার পায়ে শিঙে কোমরে ভাল করিয়া দড়ি জড়াইয়া এই গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখ। দেখাই যাক না কী হয়।' প্রতিভাবান কাংড়া যে ব্যবস্থা করিয়া গেল সেই ব্যবস্থাটা যে ভবিষ্যতে মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে, সেদিন তাহা আমরা কেহ কল্পনা করি নাই। বন্য গরু যে আমাদের আত্মীয় হইবে, তাহাকে হত্যা না করিয়া পালন করিলে যে আমরা আরও বেশি লাভবান হইব, তাহাকে ঘিরিয়া যে নব নব ধর্ম, নীতি, সমাজ গঠিত হইবে একথা মনে করিবার তখন কোনো হেতু ছিল না। দলপতির আদেশ অমান্য করিবার সাহস ছিল না বলিয়াই সেই গাভীটিকে সেদিন আমরা হত্যা করি নাই, কাংড়ার এই অদ্ভুত খেয়ালে বরং বিস্ময়বোধই করিয়াছিলাম, অনেকে গোপনে হাস্যও করিয়াছিল।

...গাভীটি কিন্তু জীবন্ত বাছুর প্রসব করিল না। কিছুক্ষণ ছটফট করিবার পর গভীর রাত্রে সে প্রসব করিল বটে, কিন্তু বৎসটি জীবন্ত নহে, মৃত। মৃত বৎসটি আগুনে ঝলসাইয়া আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিলাম। কাংড়া বলিল, 'গাভীটা যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে থাক। এখন উহাকে হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিবে ততক্ষণ মাংসটা পচিবার ভয় থাকিবে না।'

সে যুগে পশু-মাংসই ছিল আমাদের প্রধান খাদ্য। সেই খাদ্যকে যথাসম্ভব সাবধানে আমরা খরচ করিতাম। পশু পাইলেই তাহাকে হত্যা করার প্রবৃত্তি আমাদের তত ছিল না। তাহাকে ঘিরিয়া আগলাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তিই প্রবলতর ছিল। সুতরাং কাংড়ার এই আদেশে আমরা তেমন বিস্ময়বোধ করিলাম না। বিস্মিত হইলাম আরও কিছুক্ষণ পরে।

...কাংড়া এবং তাহার অনুচরেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পশুচর্মনির্মিত তাহার তাঁবুর সম্মুখে পাহারা দিতেছিল নাটা। আমি এবং আমার বন্ধুবান্ধবেরা সেই গাভীটাকে পাহারা দিতেছিলাম। হা হা হা হা শব্দ করিয়া দূরে হায়েনা ডাকিতেছিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে দুইটি নৈশ কীট অন্ধকারকে সচকিত করিয়া পরস্পর আলাপ করিতেছিল। আমরা উৎকর্ণ সশস্ত্র হইয়া বসিয়াছিলাম। গাভীটিকে গ্রাস করিবার জন্য যে কোনো শ্বাপদ যে কোনো মুহূর্তে আসিয়া পড়িতে পারে, এই সম্ভাবনা আমাদের তন্দ্রা হরণ করিয়াছিল। দীর্ঘ ঘাসের জঙ্গল চতুর্দিকে, আশে পাশেই হয়তো কোনো ভীষণ জন্তু ওৎ পাতিয়া আছে। খস খস করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার পর একটা কান্না শুনিতে পাইলাম, পরমুহূর্তেই কান্নাটা চাপা কান্না হইয়া গেল। মনে হইল ক্রন্দমান ব্যক্তিটির মুখটা কে যেন চাপিয়া ধরিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাঘ বা নেকড়ে আসিল না, বিদা আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার বুকে সেই সদ্যোজাত শিশুটা। বিদা হাত দিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া রহিয়াছে। তাহার চোখেমুখে একটা অসহায় ভীত ভাব।

'ব্যাপার কী বিদা?' সকলেই প্রায় এক সঙ্গেই আমরা প্রশ্নটা করিলাম।

'ইহার কান্না কিছুতেই থামাইতেছে পারিতেছি না।'

ঝুঝু বলিল, 'থামাইতে পারিবে না। একটি মাত্র লোক উহার কান্না থামাইতে পারে।'

'কে?'

'উলুম। তাহার কাছেই উহাকে দিয়া দাও।'

বিদা বলিল, 'মুশকিল হইয়াছে কাংড়া যদি ইহার কান্না শুনিতে পায়, ধরা পড়িয়া যাইব। ইহাকে দুধ খাওয়াইতে পারিতাম তাহা হইলে কাঁদিত না। আহা, আমাদের দলে দুধ দিতে পারে এমন একটি মেয়েও যদি থাকিত!'

নীবারা আমাদের কাছে বসিয়াছিল। কিছুদিন আগে তাহার একটি সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে। বিদা তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল, 'আমার দুধ শুকাইয়া গিয়াছে, তবু দাও দেখি।'

বক্ষের চর্মাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া সে সদ্যোজাত শিশুটাকে স্তন্যপান করাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে শিশুর ক্রন্দন থামিল না, বরং বাড়িয়া গেল। নীবারার স্তনে দুধ ছিল না। বিদা বলিল, 'জোহু, টালা, বিজঘারা, টিমানী, কিরখো, বুভা সকলের কাছে আমি গিয়াছিলাম, কেহই ইহার কান্না থামাইতে পারিল না।'

ঝুঝু বলিল, 'উলুম পারিবে।'

বিদা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিশুর ক্রন্দন কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমরা সকলেই মনে মনে অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম, কাংড়া যদি জানিতে পারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

ঝুঝু বলিল, 'পাগলামি করিও না, ওটাকে উলুমের কবরের ভিতর পুরিয়া মাটি চাপা দিয়া উহাকে নিশ্চিন্ত কর, উলুমকে নিশ্চিন্ত কর, আমাদের নিশ্চিন্ত কর। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি...'

বিদার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল, চোখের দৃষ্টিতে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এক চপেটাঘাতে ঝুঝুকে সে ভূশায়ী করিয়া ফেলিল। ঝুঝুও ছাড়িবার পাত্র নয়, সে-ও নিমেষের মধ্যে উঠিয়া আক্রমণ করিল বিদাকে। বিদার বক্ষ হইতে শিশুটা ছিটকাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মশালটাও নিবিয়া গেল। শিশুটা কোথায় যে পড়িল তাহা আমরা কেহ লক্ষ্য করিলাম না, বস্তুত শিশুটার সম্বন্ধে আমাদের তেমন আগ্রহই ছিল না, ঝুঝু ও বিদার দ্বন্দ্বই আমরা উপভোগ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মশালটা নিবিয়া যাওয়াতে চতুর্দিকে অন্ধকার হইয়া গেল। সকলে নামিয়া নীবারাকে অনুরোধ করিলাম।

'নীবারা মশাল আন একটা।'

দূরে দূরে মশাল জ্বলিতেছে। তাহারই একটা হইতে আমাদের মশালটা জ্বালাইয়া আনিবার জন্য নীবারা উঠিয়া গেল। ঝুঝু ও বিদা অন্ধকারেই ঝুটাপুটি করিতে লাগিল। শিশুর ক্রন্দন কিন্তু বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল সে আর বাঁচিয়া নাই।

'কাংড়া আসিতেছে, কাংড়া কাংড়া—'

মশাল হস্তে নীবারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ঝুঝু ও বিদা নিমেষের মধ্যে পরস্পরকে ছাড়িয়া দিল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করা কাংড়ার আইনে ভীষণতম অপরাধ। এবং সে অপরাধের শাস্তি মৃত্যু। নীবারা মশালটা আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। মশাল-আলোকে কিন্তু আমরা যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই অদৃষ্টপূর্ব। বিদার শিশুটা সেই বন্য গাভীর স্তনে মুখ লাগাইয়া দুগ্ধপান করিতেছে। গাভীটাও ছট্‌ফট করিতেছে না, অর্ধনিমীলিত নেত্রে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। তাহার পিছনের একটা পা আমরা দড়ি দিয়া গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং তাহার স্তন উন্মুক্তই ছিল। বিদার শিশু ছিটকাইয়া বোধহয় তাহার স্তনের ওপরেই পড়িয়াছিল। আমরা সকলেই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম, এমন সময় কাংড়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

'কিছুক্ষণ হইতে একটা শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইতেছি, কাহারও ছেলে হইয়াছে নাকি?'

আমরা সকলেই প্রমাদ গণিলাম। নীবারা কাংড়ার প্রিয়পাত্রী, তাহারই মুখের দিকে আমরা মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। সে দৃষ্টির অর্থ—তুমি আমাদের উদ্ধার কর। কোনো একটা ছুতা করিয়া কাংড়াকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাও।

নীবারা বুদ্ধিমতী। কাংড়ার মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া সে বলিল, 'একটা শিশু আমরা কুড়াইয়া পাইয়াছি। ঘাসের মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। আমরা ওই গাভীটার স্তনে শিশুর মুখটা লাগাইয়া দেখিতেছিলাম দুধ খায় কি না। চমৎকার খাইতেছে। তুলিয়া লইব?'

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কাংড়া শিশুটার দিকে চাহিয়াছিল। নির্বাক হইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়াই রহিল, তাহার পর সহসা লাফাইয়া উঠিল। নীবারার কথা সে বোধহয় শুনিতেই পায় নাই।

'বাঃ বাঃ, চমৎকার চমৎকার! এ ঘটনা যদি আগে ঘটিত অনেক শিশুকে আমরা বাঁচাইতে পারিতাম। কত শিশু যে অকালে মরিয়াছে। গাভীটাকে ভাল করিয়া খাইতে দাও, ওটাকে আমরা মারিব না, পুষিব। চল নীবারা, সকলকে খবরটা দেওয়া যাক। কি আশ্চর্য!'

আনন্দের আতিশয্যে কাংড়া নীবারাকে তাহার পেশীসমৃদ্ধ বাহুদ্বয়ের উপর তুলিয়া লইল এবং হর্ষধ্বনি করিতে করিতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

...আর একটি ছবিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। মানবজীবনের আদিম সভ্যতার পত্তন হইয়াছিল যে দুইটি আবিষ্কারের ফলে তাহার একটি ঘটিয়াছিল কাংড়ার নেতৃত্বে, আর একটি ওবুকীর। তখন আমরা রিয়া নদীর তীরে বাস করিতাম। আমাদের দলপতি ছিল ওবুকী। ওবুকী নিতান্তই ভালো মানুষ লোক ছিল। প্রায় সমস্ত দিনই সে সূর্যপূজা করিত। সূর্যোদয় হইতে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আকাশের দিকে চাহিয়াই বসিয়া থাকিত সে। মধ্যে মধ্যে রিয়া নদীর জল অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিত। তাহার ধারণা ছিল আকাশ এই জল শতগুণ করিয়া বৃষ্টিরূপে ফিরাইয়া দিবে। বৃষ্টি হইলে আমরা তখন যে ঘাসের বীজ খাইয়া জীবনধারণ করিতাম সেই ঘাস বেশি করিয়া জন্মাইবে, আমাদের আর অন্নাভাব থাকিবে না। ওবুকী নাকি খুব বড় শিকারি ছিল এককালে। বন্য গরু শিকার করিত। যে বন্য গরুর দলকে ঘিরিয়া তাহার শিকার চলিত একবার অনাবৃষ্টির ফলে সে দল নাকি নিঃশেষ হইয়া যায়। ওবুকী এবং তাহার সহচরেরা গরুর দলকে যদি ঘিরিয়া না রাখিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই কোনো নদী বা ঝরনার নিকট গিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু গরুর দলকে ঘিরিয়া রাখাই তখন নিয়ম ছিল। ওবুকী সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই। ফলে সমস্ত গরু তৃষ্ণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। শুধু তাহাই নয়, ওবুকী একদিন প্রভাতে উঠিয়া আবিষ্কার করিল যে, তাহার সহচরেরাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু অরণ্য ত্যাগ করিল না। তৃণাচ্ছাদিত বিশাল অরণ্যে একা একা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ওবুকী কতদিন যে এরূপভাবে একা একা ছিল তাহা কেহ জানে না। লিনাপা বলে, এই সময়েই সে নাকি সূর্যদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। সূর্যদেব তাহাকে বলেন, 'তুমি রিয়া নদীর তীরে যে বড় বড় ঘাস আছে তাহার বীজ আহার করিয়া জীবনধারণ কর।' ওবুকী নিজে কিন্তু বলে অন্য রকম। সে বলে যে, কয়েক দিন অনাহারে থাকিবার পর সহসা তাহার মনে একটা প্রেরণা জাগিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল যে, গরুরা তো মাংস খাইয়া জীবনধারণ করে না, তাহারা ঘাস খাইয়াই বাঁচে। ঘাসের মধ্যেও তাহা হইলে নিশ্চয় এমন জিনিস আছে যাহা জীবের

প্রাণরক্ষা করিতে পারে। প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় ওবুকী অবশেষে ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিছুদিন ঘাস খাইয়াই বাঁচিয়াছিল সে। ক্রমশ ঘাস খাইয়া তাহার দেহে শক্তিও সঞ্চারিত হইয়াছিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ওবুকির জীবনে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। কিছুদিন হইতে তাহার উদরে সামান্য বেদনা হইতেছিল, একদিন সে বেদনা এমন এক নিদারুণ হইয়া উঠিল যে ওবুকী অস্থির হইয়া পড়িল। ওবুকী বলে যে, চিৎকার করিতে করিতে সে নাকি সারা বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার পর সে অজ্ঞান হইয়া যায়। যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল যে বৃষ্টি হইতেছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পর এই বৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে যেন অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিল। সে উদ্বাহু হইয়া নাচিতে শুরু করিল, নাচিতে নাচিতে বদন ব্যায়ত করিয়া জলধারা পান করিতে লাগিল। সহসা সে দেখিতে পাইল, একস্থানে মেঘ ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেই ফাটল দিয়া একটা আলোক-রেখা নামিয়া আসিয়া তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের খানিকটা অংশকে আলোকিত করিয়াছে। ওবুকী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, আলোকিত অংশের তৃণগুলির প্রত্যেকটির মাথায় শীষ রহিয়াছে। তাহার মনে হইল আকাশ হইতে সূর্যদেব যেন আঙুল দিয়া ওই পক্ক তৃণশীর্ষগুলির দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সে ছুটিয়া গেল এবং শীষগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিল। ওবুকী বলে যে, গরুদের ভক্ষ্য ঘাস লতাপাতা যদৃচ্ছ আহার করিয়া এতদিনে সে কোনোক্রমে জীবনধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পক্ক শীষগুলি আহার করিয়া একটা বিশেষ স্বাদ ও তৃপ্তি যেন সে অনুভব করিল। তাহার পর হইতে সে শীষ ছাড়া আর কিছু আহার করে নাই। শীষসমন্বিত তৃণ অনুসন্ধান করিতে করিতেই অবশেষে সে রিয়া নদীর তীরে আসিয়া লিনাপাকে দেখিতে পায়। কিশোরী লিনাপা রিয়া নদীর জলে তখন মৎস্য শিকার করিতেছিল।

বহুকাল পূর্বে এই লিনাপাকে লইয়া রিয়া নদীর তীরে ওবুকী যে শফরী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিল আমরা সে সম্প্রদায়ভুক্ত. মেয়েরা নদীর জলে মাছ ধরিত, আমরা তৃণশীর্ষ আহরণ করিয়া আনিতাম। মাঝে মাঝে শিকারও করিতাম। কিন্তু শিকার করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য প্রাত্যহিক কর্ম ছিল না। শিকারও বেশি মিলিত না সে সময়। শশক, শূকর, শজারু, পাখি মাঝে মাঝে আমরা শিকার করিয়া আনিতাম। কিন্তু ঘাসের বীজই আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ওবুকী যদিও কাহাকেও শিকার করিতে বারণ করিত না, কিন্তু শিকার করাটা সে খুব পছন্দ করিত না। সে বলিত, 'যে বীজ আহার করিয়া প্রাণীরা বাঁচিয়া আছে সেই সহজলভ্য বীজ আহার করিয়া আমাদেরও বাঁচিয়া থাকা উচিত। পশুর পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না।' লিনাপার কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। লিনাপা বলিত, 'সহজলভ্য তৃণবীজ আহার করিলে আমরাও ক্রমশ ওই তৃণদের মতো সহজলভ্য হইয়া পড়িব। তখন গরুরাও আসিয়া আমাদের মুড়াইয়া খাইবে।' ওবুকী আকাশের দিকে খানিক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিত, 'হস্তীকে গরু মুড়াইয়া খাইয়াছে এরূপ খবর তো কখনও শোনা যায় নাই। হস্তীরা শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য শশক বা শজারুর পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে এরূপ খবরও কখনও শুনি নাই।' লিনাপাও হটিবার পাত্রী ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত, 'তাহা শোনা যায় নাই বটে, কিন্তু বিশালাকায় হস্তীর মাথার উপর বসিয়া সিংহ যে তাহার মস্তক বিদীর্ণ করে এ খবর কাহারও অজানা নয়। আমরা হস্তী হইতে চাই না, আমরা সিংহ হইতে চাই।' ওবুকী একথা শুনিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত, দিনের পর দিন কোনো উত্তর দিত না। তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম, অনুভব করিতাম, শিকার না করিয়া তৃণবীজ

সংগ্রহ করিয়া আনিলেই ওবুকী খুশী হইবে, আবার হয়তো কথা কহিবে। লিনাপারও তাহাই মনে হইত, সে তখন আমাদের তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিতে উৎসাহ দিত, নিজেও সংগ্রহ করিয়া আনিত। কয়েকদিন পরে ওবুকীর দৃষ্টি আকাশ হইতে নামিয়া হঠাৎ আবার নিবদ্ধ হইত লিনাপার মুখের উপর। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ লিনাপার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ওবুকী বলিত, "মাংস অনেকদিন খাওয়া হয় নাই। লিনাপা, তুমি অনেকদিন মাছও তো ধরিতেছ না। তোমার সিংহ হইবার বাসনাটা কি তবে নিছক ভণ্ডামি নাকি?" লিনাপা হাসিত, ওবুকীও হাসিত। আমরা শিকারে বাহির হইয়া পড়িতাম। খুব সুখেই ছিলাম আমরা। রিয়া নদীর তীরে শাখাপ্রশাখা লতা পাতা ঘাস দিয়া আমরা ছোট ছোট কুটির প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেই সব কুটিরে আমরা তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। অনাবৃষ্টির সময় ঘাস যখন শুকাইয়া যাইত, রিয়া নদী যখন শীর্ণকায়া হইয়া আসিত, পশুপক্ষীরাও যখন অন্তর্ধান করিত, তখন ওই সংগৃহীত তৃণবীজের সাহায্যে আমরা জীবনধারণ করিতাম। আমাদের তখন আর একটা কাজ ছিল, রিয়া নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া ঝিনুক সংগ্রহ করা। ঝিনুক সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা অনেক সময় বহুদূরে চলিয়া যাইতাম। বহু বর্ণের বহু রকম ঝিনুক আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সব ঝিনুক দিয়া মেয়েরা নিজেদের অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। ঝিনুকের বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনীয় নানারকম দ্রব্যও সংগ্রহ করতাম। অরণ্যবাসী তরক্ষু সম্প্রদায়ের লোকেরা পশুচর্মের বিনিময়ে ঝিনুক লইয়া যাইত। আমরা পশুচর্ম দিয়া নিজেদের গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিতাম। এইভাবেই আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। একদিন রিয়া নদীর জলে সাঁতার দিতে দিতে অপরূপ লাবণ্যময়ী এক তরুণী আসিয়া আমাদের মধ্যে সহসা উপস্থিত হইল। সেরূপ লাবণ্যময়ী রমণী কেহই দেখি নাই। যে রমণীদের লইয়া আমরা ঘর করিতাম তাহাদের ক্ষুদ্র নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু, বৃহদ্দন্তশোভিত মুখমণ্ডলে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ছাড়া আনন্দজনক আর কিছুই ছিল না; বংশীনাসা, আয়তনয়না, কুন্দদন্তী লীরাকে দেখিবার পর শফরী সম্প্রদায়ের সমস্ত পুরুষেরা তাহা যুগপৎ অনুভব করিলাম। লীরাকে ঘিরিয়া আমাদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। লীরা কিন্তু আমাদের ভাষা বুঝিত না, আমরাও তাহার ভাষা বুঝিতাম না। তাহার নাম লীরা না আর কিছু তাহাও ঠিক জানিতাম না আমরা। আমরা তাহাকে লীরা নামে অভিহিত করিয়াছিলাম, কারণ নদীর জল হইতে উঠিয়া সে নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিল—লীরা! ওই একটিমাত্র শব্দই সে উচ্চারণ করিয়াছিল। যতদিন আমাদের মধ্যে ছিল, আর দ্বিতীয় কোনও কথা সে বলে নাই। আমরা তাহাকে লীরা বলিয়াই ডাকিতাম, আমাদের ডাকে সে ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি হাসিয়া সাড়াও দিত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের সে বশ করিয়া ফেলিয়াছিল, এমন কি ওবুকী পর্যন্ত তাহার মোহিনী শক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। প্রায়ই দেখা যাইত তাহার আকাশমুখী দৃষ্টি আর আকাশমুখী নাই, তাহা লীরাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। লীরা প্রত্যেকের কুটিরে যাইত, প্রত্যেকের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিত, প্রত্যেককে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া অরণ্যাভিমুখে লইয়া যাইত।

একদিন গভীর নিশীথে নিদারুণ চীৎকার শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া দেখি শফরী সম্প্রদায়ে নারীরা একত্রিত হইয়া রোষভরে চীৎকার করিতেছে। চক্রাকারে দাঁড়াইয়া হস্তপদ আস্ফালন করিয়া বলিতেছে, "শেষ করিয়া ফেল, টুকরা টুকরা করিয়া ফেল, কুটিকুটি কর।" চক্রের মধ্যস্থলে কয়েকজন নারী দেখিলাম ধস্তাধস্তি করেতেছে। মনে হইল একটা বিরাট নারী-পিণ্ড যেন ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে। সহসা সেই পিণ্ড ভেদ করিয়া লীরা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম তাহার মাথার কুঞ্চিত কেশ-দাম ছিন্নভিন্ন, একটি স্তন নাই, সমস্ত বক্ষঃস্থল রক্তাপ্লুত। লীরা ছুটিয়া গিয়া রিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহাকে

অনুসরণ করিয়া কয়েকটি শফরী-রমণীও রিয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা লীরাকে আর ধরিতে পারে নাই।

....আমাদের জীবন যেমন চলিতেছে, আবার তেমনি চলিতে লাগিল। ওবুকীর দৃষ্টি পূর্ববৎ আকাশমুখী হইয়া সূর্যবন্দনায় নিবিষ্ট হইল, অঞ্জলি ভরিয়া সে আবার আগের মতো মেঘের প্রত্যাশায় দিন যাপন করিতে লাগিলে। আমরাও আবার শিকার এবং তৃণবীজ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। লীরার স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল। লীরাকে ক্রমশ আমরা ভুলিয়াই গেলাম।

...সহসা আবার একদিন নৈশ নীরবতা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে বিঘ্নিত হইল। শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলাম---রিয়া নদীর জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ভাসিতেছে এবং প্রত্যেক গুঁড়ির উপর সশস্ত্র বহু লোক। পরে জানিয়াছিলাম ওগুলি নৌকা। গাছের গুঁড়িকে পোড়াইয়া তাহার মধ্যে খোলের মতো করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম নৌকায় দেখিলাম মশালহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এক-স্তনী লীরা। তাহার চোখের দৃষ্টিতেও আগুন জ্বলিতেছে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত। আমাদের কুটিরগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে কী যে বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সভয়ে চাহিয়া রহিলাম। সেই মোহিনী লীরা যে এমন ভয়ঙ্করী হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত ছিল। বেশিক্ষণ কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিবার অবসর পাইলাম না। সশস্ত্র পুরুষগুলি সগর্জনে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল এবং আমাদের কুটির গুলি আক্রমণ করিল। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম। কিছুদূরে একটা গাছ ছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেই গাছের উপরে উঠিয়া পড়িলাম। বৃক্ষশীর্ষে বসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার সর্বাঙ্গ বারম্বার শিহরিয়া উঠিল। দেখিলাম সেই সশস্ত্র পুরুষগুলি আমাদের কুটিরের ভিতর ঢুকিয়া মেয়েদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে এবং লীরার পদপ্রান্তে লইয়া গিয়া বিরাট প্রস্তর কুঠারঘাতে তাহাদের হত্যা করিতেছে। দেখিলাম উৎসাকারে উৎসারিত তাহাদের শোনিতধারা অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া লীরা তাহা নিজের বক্ষঃস্থলে সাগ্রহে লেপন করিতেছে। নারীকণ্ঠের আর্তনাদে রিয়া নদীর তীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে শত শত মশাল জ্বলিতেছে, সেই মশাল-আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম লীরাকে ঘিরিয়া নারী-মুণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আক্ষিপ্ত নারী-কবন্ধ শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া পুনরায় ভূশায়ী হইতেছে। সবিস্ময়ে ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে, প্রত্যেক কবন্ধে একটি করিয়া স্তন নাই। সশস্ত্র পুরুষগুলি আমাদের সংগৃহীত ঝিনুকগুলি বহন করিয়া নৌকায় তুলিতেছে দেখিলাম। সহসা আমার আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হইল। গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং উন্মাদের মতো ছুটিয়া গিয়া শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছে জানি না।

...যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম আমি ঘন ঘাসের বনে শুইয়া আছি। চতুর্দিকে কোন শব্দ নাই। প্রখর রৌদ্রে চরাচর যেন পুড়িয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উঠিবার সময় লক্ষ্য করিলাম, আমার পায়ে একটা দড়ি বাঁধা রহিয়াছে। আমার পায়ে দড়ি বাঁধিল কে? কখন বাঁধিল? ধীরে ধীরে ঘাসের বন হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, নির্জন প্রান্তর, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর বসিয়া পায়ের দড়িটা খুলিয়া ফেলিলাম। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। ঘাসের বনে ঢুকিয়া পড়িলাম আবার। আবার তৃণবীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। ওবুকী যে তৃণবীজ আমাদের সংগ্রহ করিতে শিখাইয়াছিল সে তৃণ দেখিতে পাইলাম না। অন্য আর এক প্রকার তৃণে প্রচুর শীষ ধরিয়াছিল, কিন্তু তাহা খাইতে

সাহস হইতেছিল না। যদি খাদ্য না হইয়া বিষ হয়? আমাদের দলের টিনা ভুল করিয়া অন্য কি একটা গাছের পাতা খাইয়াছিল। ফলে তাহার মৃত্যু হয়। আমি লুব্ধদৃষ্টিতে শীষগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, এমন সময় 'কুক' করিয়া একটা শব্দ হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি, আবার শব্দ হইল। পাখীর ডাক নয়, মানুষের কণ্ঠস্বর। সবিস্ময়ে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আবার অগ্রসর হইতে যাইতেছি, আবার শব্দ হইল। কিছুদূরে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল, মনে হইল শব্দটা সেই গাছের উপর হইতে আসিতেছে। ভাবিলাম তাহা হইলে নূতন ধরনের কোন পাখীই হইবে। কিন্তু যেই আবার অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইয়াছি আবার শব্দ হইল। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিতেছে নাকি? গাছটার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। কুক্ কুক্ উপর্যপুরি দুটি শব্দ হইল এবার। কৌতূহলী হইয়া তখন গাছের দিকেই অগ্রসর হইলাম। গাছের যত নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, শব্দটা তত যেন ঘন ঘন হইতে লাগিল। নিকটে গিয়া দেখি শাখাপত্র বহুল প্রকাণ্ড গাছ। প্রথমে কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহার পর গাছের নীচে গিয়া দাঁড়াইলাম তখন লালচুমের বাসাটা চোখে পড়িল। শবরী লালচুমকেও দেখিতে পাইলাম। গাছের কয়েকটি শাখাকে ঘাসপাতা দিয়া ঘিরিয়া চমৎকার একটি ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল সে। তাহাতে একটি বাতায়নও ছিল। বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া লালচুম আমাকে দেখিতেছিল। তাহার মাথায় নানাবর্ণের বহুরকম পাখীর পালক, অঙ্গেও পাখীর পালকের আবরণ। আমার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র লালচুম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কুক কুক কুক শব্দে কল কাকলী করিয়া উঠিল যেন। আমি সবিস্ময়ে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয় ছিলাম। লালচুম তরতর করিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং আমার দুই হাত ধরিয়া ইঙ্গিত করিল—চল, উপরে চল। কি একটা বলিল, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি উত্তরে বলিলাম, "কোথায় যাইব?" লালচুমও আমার কথা বুঝিতে পারিল না। হাসিমুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাত ধরিয়া পুনরায় আমাকে আকর্ষণ করিয়া আঙ্গুল দিয়া গাছের উপর তাহার বাসাটি দেখাইল। তাহাকে অনুসরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। সেই যে আরোহণ করিলাম, বহুকাল আর নামি নাই। নামিবার প্রয়োজনই হয় নাই। যদিও আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতাম না, তবু অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে বহুকাল একসঙ্গে বাস করিয়াছিলাম। পরস্পরের মনোভাব সহজেই আমরা পারিতাম। মনে হয় পরস্পরের ভাষা জানা না থাকিলে হয়তো এত সহজে বুঝিতে ম না। কারণ ভাষার দ্বারা আমরা মনোভাব প্রকাশও করি, আড়ালও করি। লালচুমের মনের ভাব মুখের মুকুরে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত, আমারও হয়তো হইত। লালচুমের সঙ্গে অতিশয় অভিনব সুন্দর জীবনযাপন করিয়াছিলাম। ভাষা বাধা সৃষ্টি করে নাই।

... লালচুম ছিল শবরী। গাছের উপরই নানারকম ফাঁদ পাতিয়া সে পাখী ধরিত। কাক, বক, টিয়া, শালিক, হাঁস, কত রকম পাখীই যে তাহার ফাঁদে পড়িত তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায় প্রতিদিন আট-দশটা বড় পাখী ধরা পড়িত। তাহাতেই আমাদের দুইজনের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। লালচুম গাছ হইতে নামিয়া গিয়া ফল এবং জলও সংগ্রহ করিয়া আনিত মাঝে মাঝে। জল আনিত মানুষের মথার খুলিতে। আমাকে কিন্তু সে কিছুতেই নামিতে দিত না। আমি নামিবার উপক্রম করিলেই দুই হাত বাড়াইয়া সে পথরোধ করিত। শুধু তাই নয়, ক্রোধে উত্তেজনায় তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিত। কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া আমি শেষে আর নামিবার চেষ্টাই করিতাম না। লালচুম কিন্তু নামিয়া যাইত। শুধু যে জল ও ফল সংগ্রহ করিবার জন্যই লালচুমকে নামিতে হইত তাহা নয়, ফাঁদের জন্য একরকম আঠাও সংগ্রহ করিয়া আনিত। আর একটা কারণেও সে নামিয়া যাইত মাঝে মাঝে। দূরে ঘাসের জঙ্গলে বা

আরও দূর প্রান্তরে মানুষ দেখিলে সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না। দ্রুতবেগে নামিয়া গিয়া সে তাহাদের কি যে বলিত জানি না, কিন্তু দেখিতাম যে তাহার সহিত কথা কহিবার পর আগন্তুকের দল আরও দূরে চলিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ তাহারা দৃষ্টির সীমা পার হইয়া চলিয়া না যাইত লালচুম ফিরিত না। কখনও কখনও দেখিতাম লালচুমও তাহাদের সহিত চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত হাসিতেছে, তাহাদের নাচও দেখাইতেছে। কি যে ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। লালচুমের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার জীবনের অধিকাংশ রহস্যই আমি সমাধান করিতে পারি নাই। লালচুম যখন গাছ হইতে নামিয়া দূরে চলিয়া যাইত তখন আমি অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিতাম। পাছে আমি পলায়ন করি সেইজন্য লালচুম অদ্ভুত একটা 'তুক' করিয়া যাইত প্রতিবার। একটি জীবন্ত পাখীকে আমার সর্বাঙ্গে ছোঁয়াইয়া পাখীটা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। তাহার 'তুক' সত্ত্বেও হয়তো আমি পলায়ন করিতে পারিতাম, কোথাও কোন বাধা অন্তত ছিল না, লালচুম অনেক সময় সমস্ত দিন অনুপস্থিত থাকিত আমি একাই গাছের উপর বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু আমার পলাইতে ইচ্ছাই করিত না। লালচুমের আন্তরিক যত্নই যে শুধু আমাকে বশ করিয়াছিল তাহা নয়, গাছের ডালে ডালে তাহার পাখী ধরিবার ফাঁদগুলিও আমাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। সেই বিশাল মহীরূহের কোন শাখায় কোন পত্রগুচ্ছের অন্তরালে সে যে কখন ফাঁদ পাতিয়া রাখিত তাহা আমাকে জানিতে দিত না। গাছের উপর যতক্ষণ থাকিত, অধিকাংশ সময়ই গাছের শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইত সে। সে যখন চলিয়া যাইত আমি উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিতাম, কোন ফাঁদে কোন পাখী পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে এই আশায়। কখনও দেখিতাম তীক্ষ্ণ নখ-চঞ্চু শ্যেনপক্ষী একটা শাখায় আটকাইয়া ঝটপট করিতেছে, কখনও মরকতাঙ্গী শুক, কখনও দুগ্ধ-ধবল বক। কখন কে যে কোথায় ধরা পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। নিশ্চয়তা ছিল না বলিয়াই ঔৎসুক্য প্রবল ছিল। প্রত্যাশিত অথচ অপ্রত্যাশিত, সুনিশ্চিত অথচ অনিশ্চিত এই ঘটনা-পরম্পরা আমাকে যেন মোহজালে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। লালচুমের যত্নও ছিল আর একটা মোহ। লালচুম আমাকে যে সেবাটা করিত তেমন সেবা জননীও বোধ হয় সন্তানকে করে না। যে খাদ্য সে সংগ্রহ করিয়া আনিত তাহার অধিকাংশই আমাকে খাইতে হইত, আপত্তি করিবার উপায় ছিল না, আপত্তি করিলে সে জোর করিয়া মুখে পুরিয়া দিত, আমি চিবাইতে অপারগ হইলে অনেক সময় চিবাইয়া দিত। ইহা ছাড়া আর একটা জিনিসও সে করিত যাহার সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। সে আমার সর্বাঙ্গ টিপিয়া দিত। ইতিপূর্বে এরূপভাবে কেহ আমার অঙ্গ-সেবা করে নাই, অননুভূত একটা আরামে আমার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিত। প্রতিদিন আমি মনে মনে অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম কখন সে আমার অঙ্গ-সেবা করিবে।

... একদিন লক্ষ্য কবিলাম মাতৃত্বের সমস্ত লক্ষণ লালচুমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিস্ফুট, হইয়াছে। লালচুম সন্তানসম্ভবা। আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলাম, লালচুম আমার সম্বন্ধে একটু যেন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। যত দিন যাইতে লাগিল তাহার ঔদাসীন্য বাড়িতে লাগিল। যে আগ্রহ লইয়া পূর্বে সে আমার সেবা করিতে উৎসুক হইত, দেখিলাম সে আগ্রহ তাহার আর নাই। গাছ হইতে নামিয়া যাইবার পূর্বে সে যে 'তুক' করিত, ক্রমশ তাহাও করা ছাড়িয়া দিল। আমার চিন্তা হইত, গাছের সংকীর্ণ নীড়ে লালচুম সন্তান প্রসব করিবে কি করিয়া! কিন্তু আমার ভাষা সে বুঝিত না। তথাপি অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহাকে একদিন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে সে মৃদু হাসিয়াছিল মাত্র। তাহার সেই বিষণ্ণ মৃদু হাসির অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। পারিলাম কয়েকদিন পরে। লালচুম যখন আসন্নপ্রসবা তখনও সে প্রতিদিন গাছ হইতে নামিয়া যাইত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর

হইতে লাগিল, কিন্তু লালচুম আর ফিরিল না। আমি চিন্তিত হইয়া বসিয়া রহলিাম। সমস্ত রাত্রিই হয়তো বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু আমার ঠিক মাথার উপরেই একটা পেচক হঠাৎ ফাঁদে আটকাইয়া গেল। তাহার পক্ষ-বিধূনন ও কর্কশ আর্তনাদ আমাকে যেন ঘাড় ধরিয়া গাছ হইতে নামাইয়া দিল। মনে হইতে লাগিল সমস্ত বৃক্ষটাই যেন বাঙময় হইয়া আমাকে লালচুমের সন্ধানে প্ররোচিত করিতেছে।

লালচুম যে পথ দিয়া রোজ চলিয়া যাইত, সে পথ আমার অজানা ছিল না। গাছের উপর বসিয়া রোজই লালচুমকে চলিয়া যাইতে দেখিতাম। ঘন দীর্ঘ ঘাসের মধ্য দিয়া তারার অস্পষ্ট আলোকে আন্দাজে সেই পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর ঘাসের বন শেষ হইয়া গেল, আমি একটা প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। বিরাট প্রান্তর আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নির্মেঘ আকাশে অগণিত নক্ষত্র উঠিয়াছে। মনে হইল তাহারা যেন আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে তাহাদের হাসি ভরা দৃষ্টি যেন ভাষাময় কিন্তু সে ভাষা আমি বুঝিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিলাম। বহুক্ষণ চলিবার পর প্রান্তর শেষ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল রাত্রিও বোধ হয় এইবার শেষ হইয়া যাইবে। প্রান্তরের পর আবার অরণ্য আরম্ভ হইয়াছিল। ছোট ছোট ঝোপ ও গুল্মই বেশি, মাঝে মাঝে এক-একটা বড় গাছ। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, একটা গাছে উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিয়াছিলাম একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইব। কিন্তু বিশ্রাম কপালে লেখ ছিল না গাছে উঠিয়া দেখিলাম অনতিদূরে কতকগুলি মশাল জ্বলিতেছে। মনে হইল কাহাকে ঘিরিয়া যেন কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে। গাছ হইতে নামিয়া সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া নিঃশব্দে তাহাদের নিকটবর্তী হইলাম। ঘন ঘাস থাকাতে কোনরূপ অসুবিধা হইল না। ঘাসের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া প্রথমে লালচুমকে দেখিতে পাইলাম। সে উপুড় হইয়া কাতর শব্দ করিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম প্রসব-বেদনাতেই সে কাতর হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মুখের দিকে তখন একে একে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রদীপ্ত মশাল-আলোকে দেখিলাম, অধিকাংশ লোকের চোখেমুখে একটা তীব্র লালসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা লোভনীয় কিছুর প্রত্যাশায় সকলেই যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ শোংছাকে দেখিতে পাইলাম। শোংছা আমাদের দলের লোক, ওবুকীর দৌহিত্র। এখানে কি করিয়া আসিল? শোংছার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লক্ষ্য করিলাম একমাত্র তাহারই চোখেমুখে লালসার কোন চিহ্নও নাই, বরং সমস্ত মুখমন্ডলে একটা বিষণ্ণতার ছাপ পড়িয়াছে সে যেন বাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বেচ্ছায় বা সানন্দে নহে। শোংছার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া ছিলাম, যদি সে আমাকে দেখিতে পায়। কিন্তু তাহার মুখ ভাব দেখিয়া মনে হইল না যে সে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। লালচুম সহসা নিদারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই দেখিলাম তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যাহা ঘটিল তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম লালচুমের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। কেবল শোংছাই প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া কোনও শব্দ নির্গত হইল না। একজন মশালধারী দেখিলাম ছুটিয়া আসিয়া সদ্যোজাত শিশুটাকে তুলিয়া লেহন করিতেছে। পরমুহূর্তেই দেখিলাম আর একজন তাহার হাত হইতে শিশুটাকে ছিনাইয়া লইল। তাহার পর কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। দেখিলাম জীবন্ত শিশুটাকে সকলে মিলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া আহার করিতেছে। লালচুম নিস্পন্দ হয়িা পড়িয়াছিল, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পরিলাম না। সদ্যোজাত শিশুটার আর্ত চীৎকার থামিয়া গেল, দেখিলাম একজন তাহার গলাটা কামড়াইয়া

ধরিয়াছে। আমি নিজেও যে একদিন নরভুক ছিলাম, ঠিক ওইভাবেই আমিও যে বহু শিশুমাংস আহার করিয়াছি তাহা আমার স্মরণ ছিল না। জন্মজন্মান্তরের আবর্তে আবর্তিত হইয়া আমি যে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, যে নবচেতনা লাভ করিয়াছিলাম, তাহার সহিত ওই নরভুক পশুগুলার কোন সাদৃশ্যই ছিল না। আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল, চক্ষু বুজিয়া আমিও নিস্পন্দের মতো পড়িয়া রহিলাম। নরভুক পশুগুলা শিশুমাংস লইয়া কোলাহল করিতেছিল। দেখিলাম সকলে চলিয়া গিয়াছে, লালচুমও নাই। একটু উঁচু হইয়া দেখিলাম, লালচুমকে কয়েকজন লোক স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। উহাকেও উহারা আহার করিবে নাকি? সহসা ভীত হইয়া পড়িলাম। আমাকে যদি দেখিতে পায় তাহা হইলে... মাথাটা পুনরায় নামাইয়া লইয়া সভয়ে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, কিছু দূর গিয়া কিন্তু থামিয়া গেলাম। শোংছার কথা মনে পড়িল, তাহার বিষণ্ণ মুখটা মনে পড়িল। মনে হইল শোংছার সহিত যদি কোন রকমে একবার দেখা করিতে পারি, সমস্ত সমস্যাটার হয়তো সমাধান হইয়া যাইবে। এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর পরিবেশ পরিত্যাগ করিবার উপায়ও সে বলিয়া দিতে পারিবে। সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া যেখানে ছিলাম আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম যতক্ষণ না শোংছার দেখা পাই ততক্ষণ জাগিয়া থাকিব, অনেকক্ষণ জাগিয়াও ছিলাম, কিন্তু কখন যে চোখের পাতা বুজিয়া আসিয়াছে জানি না, সেই ঘন ঘাসের বনেই হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা কাহার স্পর্শে ঘুমটা ভাঙিয়া গেল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম মুখের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়া শোংছা দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম কোনও কথা বলিতে বারণ করিতেছে। নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। শোংছা ইঙ্গিত করিয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। শোংছাও আমারই মতো বুকে ভর দিয়া সরীসৃপের মতো হাঁটিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা প্রান্তরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া হইলাম। নিকটেই একটা বড় গাছ ছিল। শোংছা এক ছুটে গিয়া সেই গাছটার উপর উঠিয়া পাড়িল। একটু পরে আমিও গিয়া উঠিলাম।

"শোংছা, তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?"

"লীবার দল আমাকে এবং আমাদের দলের অনেককে এই নরমাংসভুক পশুদের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে।"

"প্রতিশোধ কামনায়?"

"সম্ভবত আমাদের পরিবর্তে তাহারা অনেক ঝিনুক এবং কড়ির মালাও পাইয়াছে।"

"তোমাদের কি করিয়া এখানে লইয়া আসিল?"

"পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে।"

আমার তখন মনে পড়িল আমার পায়েও তো একটা দড়ি বাঁধা ছিল। আমার দড়িটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল সম্ভবত। তাই আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।

শোংছা প্রশ্ন করিল, "তুমি কি করিয়া এখানে আসিলে?"

আমার কাহিনী আনুপূর্বিক তাহাকে বলিলাম।

"তুমিই লালচুমের সহিত ছিলে?"

আমার বৃক্ষবাসিনী সঙ্গিনীর নাম যে লালচুম তাহা শোংছার নিকটই সেদিন প্রথম শুনিলাম।

"হ্যাঁ। ব্যাপার কি বল তো, লালচুমের ধরনধারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"লালচুম কে, কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, তাহা আমিও জানি না। শুধু এইটুকু জানি, মাঝে মাঝে একটি শিশু এবং একটি বয়স্ক মানব ইহাদের উপহার দিবে এই শর্তে লালচুম ওই বৃক্ষ এবং বৃক্ষের চতুর্দিকে জমি ভোগদখল করিতে পায়। অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুটিকে এবং শিশুর

জন্মদাতাটিকে লালচুম মাঝে মাঝে আসিয়া ইহাদের মুখে সমর্পণ করিয়া যায়। লালচুমের মতো আরও কয়েকটি বৃক্ষবাসিনী নারী এ অঞ্চলে আছে।"

"ইহারা বৃক্ষে বাস করে কেন?"

"অনেক দূর হইতে মানুষ দেখিতে পাইবে বলিয়া।"

"তাহা হইলে ইহারা তো এইবার আমার সন্ধানে বাহির হইবে নিশ্চয়।"

"হইবে না, হইয়াছে। মূৰ্ছিতা লালচুম ছাড়া কেহই এখন এ অঞ্চলে নাই। আমি সেইজন্যই ভরসা করিয়া তোমার খোঁজে বাহির হইতে পারিয়াছি। তুমি যখন ঘাসের মধ্যে লুকাইয়াছিলে, তখনই আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তখন হইতে আমি আশা করিয়া আছি— তোমার সঙ্গে আজ এখান হইতে সরিয়া পড়িব। সরিয়া পড়িবার এ রকম সুযোগ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু একা এদেশ হইতে পলায়ন করা সম্ভব নয়। চতুর্দিকেই নদী, কিছুদূরে সমুদ্র। নদীতে নৌকা আছে, গাছের বড় বড় গুঁড়ি করিয়া ইহারা নৌকা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই নৌকায় একজন না একজন লোক সদাসর্বদা বসিয়া থাকে। তাহার চক্ষু এড়াইয়া নদী পার হওয়া অসম্ভব। তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। কিন্তু একা তাহাকে হত্যা করাও সম্ভব নয়। অন্তত আর একজন লোক চাই। তুমি যখন ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িয়াছ, চল আর দেরি করা ঠিক হইবে না। আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্রও গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। সেগুলি লইয়া চল বাহির হইয়া পড়ি। চল চল—"

শোংছার চোখেমুখে একটা ত্রস্ত ভীত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমিও কম ভীত হই নাই, তবু আমি প্রশ্ন করিলাম, "তোমার সঙ্গে আরও যাহারা ছিল তাহারা কোথায়?"

"তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। ওই রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাহাদের একে একে নিঃশেষ করিয়াছে। আগামী পূর্ণিমায় আমাকেও শেষ করিয়া ফেলিবে। আমি কয়েকবার পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলিলাম তো, একা এখান হইতে পলায়ন করা সম্ভব নয়। চল দুইজনে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি যদি নৌকাব লোকটাকে হত্যা করিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য উপায নাই। চল..."

... নৌকার লোকটিকে হত্যা করা অসম্ভব হয় নাই। শোংছা যে প্রস্তরকুঠারটি গোপনে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার এক আঘাতেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল, সে চীৎকার করিবার অবকাশ পর্যন্ত পাইল না। তাহার নৌকাতে আরোহণ করিয়াই আমরা নদী পার হইলাম। আমরা তখনও নৌকা বাহিতে শিখি নাই। নৌকা জলের স্রোতে আপনি ভাসিয়া চলিল, আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ ভাসিবার পরে আমরা জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতে লাগিলাম। বেশ খানিকক্ষণ সাঁতরাইবার পর প্রভাত হইয়া গেল। শোংছা বলিল, "আর জলে থাকা নিরাপদ নয়, চল আমরা তীরে উঠিয়া পড়ি।" তীরে উঠিয়া শোংছা ছুটিতে লাগিল, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। মধ্যে মধ্যে একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা সমস্ত দিনই ছুটিয়াছিলাম। ছুটিয়া কোথায় চলিতেছিলাম তাহা তখনও জানিতাম না, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ওই নরভুক রাক্ষসদের নিকট হইতে পলায়ন করা। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল তাহারা বোধ হয় আমাদের অনুসরণ করিতেছে, আমাদের পিছনে বহুদূরে তাহাদের চীৎকার যেন শোনা যাইতেছে। সুতরাং দাঁড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার অবসর বড় একটা নাই। নিতান্ত শ্বাসকষ্ট যখন হইতেছিল তখন কোনও ঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হইয়া আসিল, তখন একস্থানে একটা বেড়ায় দুইজনেই আটকাইয়া গেলাম। শোংছা হোঁচট খাইয়া পড়িয়াই গেল। একটা সুদীর্ঘ বেড়া কে যেন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ নিশ্চয়ই। বিস্মিত হইলাম। এত বড় দীর্ঘ বেড়া তো কোনও মানুষকে কখনও দিতে দেখি নাই! কোনও ফাঁদ নয় তো!

আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। নিকটেই যে বড় গাছটি ছিল তাহাতেই আরোহণ করিয়া রাত্রিবাস করিব ঠিক করিলাম। শোংছা বলিল, "একসঙ্গে দুইজনেই ঘুমানো চলিবে না। একজনকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। তুমি আগে ঘুমাও, আমি জাগিয়া থাকিব। নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসিবে না।"

... শোংছা আমাকে একবারও জাগায় নাই। আমার যখন ঘুম ভাঙিল তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম শোংছা পাশে নাই। সম্মুখের দিকে চাহিয়া যাহা নজরে পড়িল তাহা এখন হয়তো কাহারও মনে বিস্ময় উৎপাদন করিবে না কিন্তু আমাকে তখন তাহা শুধু বিস্মিতই করিল না, মুগ্ধও করিল। আমি চমৎকৃত হইয়া বেড়া দেওয়া শ্যামল ক্ষেত্রটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইতেছিল যেন চোখ জুড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে পিশাচ-পিশাচীদের নিষ্ঠুরতা মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, এই দৃশ্য সেই ক্ষতস্থানে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া দিল। প্রকৃতির স্বাভাবিক শ্যামল বন্যশোভা বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষেতটির শোভা সে সব হইতে এত পৃথক, এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। চতুর্দিকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া এমন সুবিন্যস্ত করিয়া ঘাসের সারি কে লাগাইয়াছে? নিশ্চয় মানুষ। কে সে? শোংছা কোথায় গেল? অনুসন্ধান করিবার জন্যই নিশ্চয় সে নামিয়া গিয়াছে। আমিও নামিয়া পড়িলাম। বেড়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ওবুকী যে তৃণবীজ আমাদের সংগ্রহ করিতে-শিখাইয়াছিল, দেখিলাম সমস্ত ক্ষেত ভরিয়া সেই তৃণই রহিয়াছে। সহসা দূরে একজন মানুষ দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তাহার স্কন্ধে একটি প্রস্তর-কুঠার রহিয়াছে। সে হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে কি যেন একট বলিল, দূর হইতে ভাল শুনিতে পাইলাম না। আমার নিকটও একটা প্রস্তর-কুঠার ছিল। মনে হইল যদি লোকটা আমাকে আক্রমণই করে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভয়ও করিতেছিল না। সেই শ্যামল তৃণক্ষেত্র আমার মনে এমন একটা স্নিগ্ধ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই কেমন করিয়া যেন নির্ভয় হইয়াছিলাম, মনে হইতেছিল যে আসিতেছে সে শত্রু নয় মিত্র। কাছাকাছি আসিয়া লোকটি উপর্যুপরি তিনটি প্রশ্ন করিল, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও?" বহুকাল পরে নিজের ভাষা শুনিয়া মনে হইল দীর্ঘ বিচ্ছেদের শেষে যেন পরম আত্মীয়ের দেখা পাইলাম। এ লোকটি যখন আমার ভাষা বলিতেছে তখন নিশ্চয় আত্মীয়। ভাল করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পরিচিত মনে হইল না। শফরী সম্প্রদায়ের সকলকেই আমি চিনিতাম। এ লোকটি তাহা হইলে শফরী সম্প্রদায়ের নয়!

বলিলাম, "আমি একজন শফরী, ওবুকীকে খুঁজিতেছি। সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে? তাহার কোন খবর কি দিতে পার?"

"নিশ্চয় দিতে পারি। ওবুকী তো আমাদের দলপতি। তুমি একজন শফরী? ওবুকীর মুখে শুনিয়াছি, লীরার দল আসিয়া শফরী বংশকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।"

লোকটি বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। বলিলাম "ঠিকই শুনিয়াছ আমি আর শোংছা কেবল বাঁচিয়া আছি। আর কেহ আছে কিনা জানি না। তুমি কি শফরী নও?"

"না, আমি নীলগাই। ওবুকী আমার মাকে বিবাহ করিয়া এখানে নূতন দলের পত্তন করিয়াছে। আমার মা মৃন্তা নীলগাই। আমরা সকলে নীলগাই। ওবুকীর নির্দেশ অনুসারে আমরা এখানে ঘাসের চাষ করি।"

"ওবুকী কোথায়? তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

"ওবুকী মাটির নীচে গুহায় বাস করে। ক্ষেতের ওপারে ওই যে কুটিরের মতো দেখিতেছ, ওইটাই গুহার প্রবেশ পথ। দুইজন সশস্ত্র নীলগাই ওই গুহামুখে প্রহরায় নিযুক্ত আছে। তাহাদের

নিকট গিয়া তোমাদের পরিচয় দাও, তাহারা ওবুকীকে খবর দিবে। ওবুকী যদি তোমার সহিত দেখা করিতে চায় তাহা হইলে দেখা হইবে।"

"পূর্বে তো এরূপ ছিল না। পূর্বে ওবুকী রিয়া নদীর তীরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সূর্যপূজা করিত। রিয়া নদীর জল অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দিত, তাহার নিকটে আমরা যখন খুশী যাইতে পারিতাম, কোনও মানা ছিল না।"

"এখনও ওবুকী সূর্যপূজা করে, এখনও রিয়া নদীর জল সে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে, কিন্তু এখন তাহার চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। লীরার দল আক্রমণ করার পর হইতে ওবুকী এই সাবধনাতা অবলম্বন করিয়াছে। ওবুকীরই নির্দেশ অনুসারে আমরা সশস্ত্র হইয়া এই তৃণক্ষেত্রের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াই। লীরার দল শফরী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু নীলগাইদের কিছু করিতে পারিবে না। তুমি যদি ওবুকীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাও, ওই কুটির অভিমুখে যাও।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম শোংছা আসিতেছে। শোংছা হাত তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল। আমি তখন নীলগাই যুবককে বলিলাম, "ওই আর একজন শফরী। বোধহয় ওবুকীর খোঁজ পাইয়াছে। কি বলিতেছে শুনিয়া আসি।"

নিকটে যাইতেই শোংছা বলিল, "ওবুকী ডাকিতেছে, চল।"

"তুমি কি করিয়া ওবুকীর সন্ধান পাইলে?"

নীলগাই যুবকটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, সে বলিল, "আমিই উহাকে সন্ধান দিয়াছি।"

শোংছার সহিত আমি ওবুকীর গুহার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। গুহার নিকট গিয়া দেখিলাম, ওবুকী গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। যে কুটিরটি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহারই ছায়ায় সে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার পার্শ্বে দেখিলাম, একটি বলিষ্ঠকায়া নারীও একটি সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। নীলগাই মৃন্তা। আমাদের দেখিয়া ওবুকী বলিল, " তোমরা যে আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহা আশা করি নাই। আমি নিজেই যে ফিরিব, সে আশাও তো ছিল না। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাও অপ্রত্যাশিত এবং তাহা আমার মনে যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, সে প্রেরণাও অদ্ভুত। আমাদের আশা-প্রত্যাশা অতিশয় সীমাবদ্ধ, আমাদের কল্পনাও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। সেই সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে বিরাট একটা জগৎ আছে, সেই জগতে বহু অচিন্তপূর্ব ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। মাঝে মাঝে সেই জগতের দুই-একটা ঘটনা নূতন আলেকে প্রত্যক্ষ করি। লীরা অপ্রত্যাশিতভাবেই আমাদের মধ্যে আসিয়াছিল, অপ্রত্যাশিতভাবেই শফরী সম্পদায়কে বিনষ্ট করয়িা চলিয়া গেল। নূতন আলোকে আমরা নিজেদের অসংযম, নিজেদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলাম। লীরার দল আক্রমণ করিতেই আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। দুই দিন দুই রাত্রি অবিরাম হাঁটিবার পর তৃতীয় সন্ধ্যায় যে স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিব মনস্থ করিলাম, সে স্থানে বিশ্রাম করা সম্ভবপর হইল না। একটা করুণ ক্রন্দন দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। যদিও অতিশয় ক্লান্ত ছিলাম, তথাপি সেই করুণ শব্দ অনিবার্যভাবে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অন্ধকারে সেই শব্দকে অনুসরণ করিয়া শিংশপা-বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রান্তরের মধ্যস্থলে শাখা-প্রশাখা বহুল একটি বটবৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষতলে একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম ঊর্ধ্বমুখ হইয়া একটি নারী ক্রন্দন করিতেছে। হ্যাঁ, অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন নীলগাই মৃন্তার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—"

এই পর্যন্ত বলিয়া ওবুকী মৃন্তার দিকে চাহিল। মৃন্তা শিশুটিকে স্তন্যদান করিতেছিল,

দেখিলাম তাহার অধরে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলাম শিশুটি তাহার যে স্তনটি পান করিতেছিল না, সেই স্তন হইতেও দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে এবং মৃন্তা বাম হস্ত দিয়া তাহা প্রতিরোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

ওবুকী বলিল, "মৃন্তা, সেদিনের সমস্ত ঘটনা কি ইহাদের বলিব? ইহারা আমার আপন লোক। লিনাপার বংশ ইহারা। ইহাদের নিকট কোনও কথা গোপনে করিবার প্রয়োজন নাই। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে বলিব না।"

মৃন্তা বলিল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমারও আপত্তি নাই। তোমরা কথা বল, আমি ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইয়া আসি।" মৃন্তা উঠিয়া গুহার ভিতর চলিয়া গেল।

ওবুকী বলিল, "বটবৃক্ষতলে বসিয়া উর্ধ্বমুখে এই মৃন্তাই সেদিন ক্রন্দন করিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। উহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাহার স্বামীর শবদেহ বটবৃক্ষের শাখায় বাঁধা ছিল এবং উহাদের সামাজিক নিয়ম অনুসারেই মৃন্তা গভীর রাত্রিতে আসিয়া উর্ধ্বমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিতেছিল যে, সে পুনরায় বিবাহ করিবে কিনা। মৃন্তাদের পুরোহিত জাঝক্ষ বলিয়াছিলেন যে তাহার স্বামীর প্রেতাত্মা যদি অনুমতি দেয়, তাহা হইলে ওই গভীর রাত্রেই ওই বটবৃক্ষতলেই তাহার নূতন স্বামী আবির্ভূত হইবে। আমাকে দেখিয়া মৃন্তা ক্রন্দনাবেগ সম্বরণ করিল, তাহার পর নতমুখে বলিল, "বিদেশী, আমার গৃহে আজ আতিথ্য-গ্রহণ করিবে কি? আমি অনাথা হইয়াছি. জানি না তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লইতে পারিবে কিনা।"

এই পর্যন্ত বলিয়া ওবুকী আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল। আমরাও নীরব রহিলাম। তাহার পর ওবুকী আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "নীলগাই মৃন্তার চারিটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছিল। আমি ইহাদের সকলেরই ভার লইতে সম্মত হইলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, রিয়া নদীর তীরে ফিরিয়া আসিয়া যদি নূতন সমাজ পত্তন করিতে হয়, একাকী তাহা সম্ভব হইবে না। জনবল চাই। নীলগাই মৃন্তার চারিটি পুত্রই বলিষ্ঠ, অস্ত্রশস্ত্র চালনায় নিপুণ। তাহারাও আমার সহিত আসিতে সম্মত হইল। অপ্রত্যাশিত ভাবে নীল গাই মৃনতার সহিত যদি আমার সাক্ষাৎ না ঘটিত, তাহা হইলে আমি বিয়া নদীর তীরে, আমার পূর্ব বাসস্থানে আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতাম না। অপ্রত্যাশিতভাবেই আমি একদিন নীলগাই মৃন্তার পরিবারবর্গকে লইয়া রিয়া নদীর তীরে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাও অপ্রত্যাশিত। আশা করি তোমাদের মনে আছে যে, আমারই নির্দেশে তোমরা কুটিরে কুটিরে তৃণবীজ সংগ্রহ করিয়া আনিতে। মায়াবিনী লীবার নেতৃত্বে যে দস্যুদল আসিয়াছিল তাহারা আমাদের সকলকেই বিধ্বস্ত করিয়াছিল আমাদের ঝিনুক ও রঙীন প্রস্তরগুলি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সংগৃহীত তৃণবীজগুলি তাহারা স্পর্শও করে নাই। তাহারা মাংসাশী, তৃণবীজের মর্ম তাহাদের নিকট অজ্ঞাত কিন্তু যে স্থানে সেই তৃণবীজগুলি স্তূপীকৃত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তৃণ অঙ্কুরিত হইয়াছে। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। সেই লক্ষ লক্ষ তৃণাঙ্কুর যেন আমাকে বলিতে লাগিল, "একদিন আমরা বীজ ছিলাম, এখন তৃণ হইয়াছি, পুনরায় বীজ হইব, পুনরায় সেই বীজ তৃণে রূপান্তরিত হইবে। আমাদের তোমরা যদি রক্ষা কর, তোমাদেরও আমরা রক্ষা করিব।" আমার মনে হইল, দেবতাই বোধ হয় আমাকে নবজীবনের পথ পদর্শন করিতেছেন। নীলগাই মৃন্তার পুত্রচতুষ্টয়কে বলিলাম, "এস আমরা এই ভূমি খনন করিয়া তাহাতে তৃণবীজ বপন করি। একটি বীজ শত শত বীজ প্রসব করিবে, আমাদের খাদ্য-সমস্যা আর থাকিবে না।" মৃন্তার পুত্রচতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন আমিই নিজে উৎসাহী হইয়া ভূমি খনন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তোমরা স্বচক্ষেই দেখিয়াছ, তাহার ফল কি হইয়াছে। এখন আমাদের আর

খাদ্য-সমস্যা নাই। বন্যজন্তুর পিছনে পিছনে ঘুরিয়া এখন আমাদের আর অনিশ্চিত শিকারী জীবন যাপন করিতে হয় না। তৃণের লোভে বন্য গরু, বন্য ঘোড়া, বন্য মহিষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরং মাঝে মাঝে আমাদের তৃণক্ষেত্রে আসিয়া হানা দেয়, শুধু তাহাদের আক্রমণ হইতে আমাদের ক্ষেত্রগুলিকে রক্ষা করিবার জন্যই আমরা গাছের ডাল কাটিয়া বেড়া দিয়াছি। শুধু তাহাদের আক্রমণ নয়, মানুষেরও আক্রমণ আছে। নীলগাই মৃন্তার পুত্রগুলি দিবারাত্রি সেইজন্য কুঠার স্কন্ধে পাহারা দিতেছে। তোমরা আসাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। নীলগাই মৃনতার কন্যা দুইটি এখনও অনূঢ়া আছে। তোমরা তাহাদের লইয়া এখানেই নূতন গৃহস্থালি স্থাপন কর। যাহারা চলিয়া গিয়াছে, আর কখনও ফিরিবে না, তাহাদের জন্য দুঃখ করিতে হয় কর। লিপানার জন্য আমি মাঝে মাঝে দুঃখ বোধ করি, নীলগাই মৃন্তা তাহার বিগত দুই স্বামীর জন্য মাঝে মাঝে অশ্রুপাত করে। তোমারও ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পার। কিন্তু যাহারা চলিয়া গিয়োছে, আর কখনও ফিরিবে না, তাহাদের প্রত্যাশায় বসিয়া অমূল্য জীবন নিষ্ফল করিও না। রিয়া নদীর তীরে প্রত্যাবর্তন করিয়া অঙ্কুরিত তৃণবীজগুলির নিকট আমি যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহা এই —যাহা পুরাতন তাহাই আবার নূতন আকারে রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেই রূপান্তরিত পুরাতনকে নবনবরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। আর একটা কথা শুনিলেও তোমরা বোধ হয় আশ্বস্ত হইবে। নীলগাই মৃন্তার জননী নীলগাই কাম্বী একদা শফরী জল্লুকে বিবাহ করিয়া নীলগাই সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়াছিল। আমার প্রথম যৌবনে অনাবৃষ্টির ফলে আমাদের শিকার জীবনের যখন অবসান ঘটিল, যে বনে আমরা শিকার করিতাম জলাভাবে সেই বন যখন পক্ষীশূন্য হইল, তখন শফরী সম্প্রদায়ের বহুলোক বহু স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। জল্লুক তাহাদেরই একজন। নীলগাই কাম্বীর সহিত মিলিত হইয়া সে গুল্ম ও কন্দ ভোজন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। শফরী সম্প্রদায়ের লিনাপাকে লইয়া আমি নূতন সমাজের পত্তন করিয়াছিলাম, তোমরা তাহারই ফল। আশ্চর্যের বিষয় শফরী জল্লুকের বংশ আজ আবার নীলগাইরূপে আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখিতেছ আমাদের ভাষা এক, আচরণও অভিন্ন নহে। আমি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা তোমরাও কর। নীলগাই রুমিলা, নীলগাই শোহিলা উভয়েই স্বাস্থ্যবতী, তোমরা তাহাদের বিবাহ করিয়া তৃণবীজ উৎপাদনে মনোনিবেশ কর। নীলগাই মৃন্তার ভ্রাতাগণ ভগিনীগণ সকলেই আসিয়া আমার এই কৃষিকার্যে যোগদান করিয়াছে। শুনিতেছি ছাগ সম্প্রদায়ের লোকেরাও আসিবে। আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিবে; আমরা আমাদের সমবেত শক্তি দিয়া একটি তৃণবীজকে বহু তৃণবীজে রূপান্তরিত করিব, আমাদের খাদ্যাভাব আর থাকিবে না।"

ওবুকী আবার তাহার দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ করিল। মনে পড়িল, এই দৃষ্টি দেখিয়া আমরা পূর্বে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতাম। বুঝিলাম আমাদের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ওবুকী তাহার দৃষ্টি আকাশ হইতে নামাইবে না।

আমরা উভয়েই প্রায় যুগপৎ বলিয়া উঠিলাম, "তাহাই হইবে। রুমিলা শোহিলাকেই আমরা বিবাহ করিব।"

ওবুকী তখন তাহার ঊর্ধ্বমুখী দৃষ্টি গুহার দিকে ফিরাইয়া ডাক দিল— "রুমিলা শোহিলা, বাহিরে আসিয়া দেখ কাহারা আসিয়াছে।"

দুইটি পুষ্টকায়া যুবতী গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ওবুকী বলি,, "ইহারা তোমাদের বিবাহ করিবে।"

শুনিবামাত্র তাহারা আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ওবুকী তখন আমাদের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি কৌতুকদীপ্ত।

"এইবার তোমরা কে কোনটিকে লইবে বল। শোংছা তুমি যাহাকে চাও, তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াও।"

শোংছা একজনের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

ওবুকী তখন আমাকে বলিল, "শোংছা শোহিলাকে পছন্দ করিয়াছে, তুমি তাহা হইলে রুমিলাকে গ্রহণ কর। আশা করি ইহাতে তোমার আপত্তি নাই।"

"না।"

আমি গিয়া রুমিলার পিছনে দণ্ডায়মান হইলাম। আবার আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইয়া গেল।

...জোলমাকে হারাইয়া যে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে সুড়ঙ্গপথ তখনও শেষ হয় নাই। জোলমাকে কেন্দ্র করিয়া যে আশ্চর্য কল্পনা আমার পশুচিত্তকে বিচিত্রিত করিয়াছিল সে কল্পনারও অবসান ঘটে নাই। জন্মজন্মান্তরে আমি বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জীবনের আবর্তে আবর্তিত হইয়াছি, কখনও পুরুষরূপে, কখনও নারীরূপে বহু বিচিত্র নর-নারীর সঙ্গ-স্বাদ অনুভব করিয়াছি কিন্তু জোলমাকে ভুলি নাই। জোলমা নামক বিশেষ ব্যক্তিটিকে হয়তো ভুলিয়াছি, কিন্তু জোলমার আদর্শ আমার চেতনায় যে বর্ণবহুল ছাপটি আঁকিয়া দিয়াছিল তাহা লুপ্ত হয় নাই। জন্মজন্মান্তরের নানা স্বপ্নে প্রেরণায় তাহা কেবল নানারূপে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল মাত্র। দৈনন্দিন জীবনের অতি স্বাভাবিক গতিপথে প্রতি জন্মেই নিজের অজ্ঞাতসারে আমি যেন অলৌকিক অস্বাভাবিক জোলমার আবির্ভাব প্রত্যাশা করিতেছিলাম। শিল্পীমনের মানসীকে স্থূল দৈহিক সীমায় প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলাম। একদিন যাহাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, কামনার গভীর স্তরে আশা ছিল আবার তাহাকে পাইব। বস্তুত তাহাকে পাইবার আশাই যেন যুগে যুগে আমার অন্তর্জীবনে কাব্যশিল্পসুষমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, অসম্ভবকে সম্ভাবনার সীমায় মূর্ত করিয়া কল্পলোকে রূপকথা রচনা করিয়াছে। কামনার কলুষ যাহাকে ম্লান করিয়া দেয় তাহাকেই কামনা করিয়া আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আশা করিয়াছি যে কামনার পঙ্ককুণ্ডে পঙ্কজের মতই সে একদিন ফুটিয়া উঠিবে। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী জীবনে তাহার আভাস পাইয়াছিলাম শিলাঙ্গীর মধ্যে।

...অনাবৃষ্টি চলিতেছিল।

উন্নগা পর্বত হইতে যে ঝরনাধারা নামিয়া শীর্ণধারায় কন্যা নদীরূপে বহিয়া গিয়াছিল আমরা তখন সেই কন্যা নদীর তীরে বাস করি। ওবুকী একদা যে নবজীবনের প্রবর্তন করিয়াছিল সেই জীবনধারাই আমরা তখন অনুসরণ করিতেছি। ওবুকীর কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু কৃষিকার্য ভুলি নাই। বস্তুত কৃষিকর্মই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্যই আমর নদীর তীরে বসতি করিয়াছিলাম। অনাবৃষ্টির ফলে আর একটা কাণ্ড ঘটিয়াছিল। প্রাণীমাত্রেরই জলের প্রয়োজন হয়। পিপাসার তাড়নায় সর্বপ্রকার প্রাণীই কন্যা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইত। গরু, মহিষ, বাইসন, ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, ভল্লুক, ছাগ, মেষ, অশ্ব, সর্প, নকুল, শজারু, শশক প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণী উন্নগা পর্বতের অরণ্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত জলের আশায়। কন্যা নদীর শীর্ণধারা এই বিভিন্ন জাতীয় পরস্পর শত্রু পশুদলকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। আমরা নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা কন্যা নদীর উভয় তীরে বাস করিতাম। মধ্যে মধ্যে কন্যা নদীর শীর্ণধারা স্ফীত হইয়া উভয় কূল প্লাবিত করিয়া দিত। এই প্লাবন যে আমাদের চাষের পক্ষে হিতকর তাহা আমরা বুঝিয়াছিলাম। প্লাবন হইয়া যাইবার পর উভয় তীরে যে পলি পড়িত তাহাতে আমাদের ফসল ভাল হইত। তাই আমরা

কন্যা নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতাম—"হে নদী, তুমি স্ফীত হও, অঙ্গ বিস্তার কর।" কন্যা নদীর সহিত আমাদের যেন একটা আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। আমরা তাহাকে নিজের লোক মনে করিতাম। তাহার বিভিন্ন মনোভাবও যেন আমরা বুঝিতে পারিতাম। কখনও মনে হইত সে আনন্দিত, কখনও ভাবিতাম সে অভিমান করিয়াছে, কখনও অনুভব করিতাম তাহার শীর্ণধারায় তাহার রোষবহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার কলধ্বনিতে কখনও আশ্বাস, কখনও তর্জন, কখনও ঔদাসীন্যের সুর শ্রবণ করিয়া আমরা কখনও পুলকিত, কখনও আতঙ্কিত হইতাম। অঞ্জলি ভরিয়া তৃণবীজের ফসল তাহার তরঙ্গধারায় নিক্ষেপ করিয়া, ঋতুতে ঋতুতে অরণ্য কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া আমরা কন্যা নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতাম—"হে নদী, তুমি প্রসন্ন হও, প্রশস্ত হও, প্রসারিত হও। তোমার জলধারা জননীর স্তন্যধারার মতো আমাদের ক্ষেত্রকে সঞ্জীবিত করুক।" নিম্ব-জননীরা নিজেদের স্তন্যদুগ্ধ নিঙড়াইয়া কন্যা নদীর জলে নিক্ষেপ করিত। নিম্ব-পুরুষরা নিজেদের শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া শোণিত-অর্ঘ্যে কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইত। নিম্ব-দলপতি ধবল কন্যার তীরে অহরহ পর্যটন করিয়া বেড়াইত কন্যার মনোভাব জানিবার আশায়। তাহার আর কোন কাজ ছিল না। প্রখর দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্রে, গভীর নিশীথের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সে একা একা কন্যার তীর ঘুরিয়া বেড়াইত কন্যার সূক্ষ্ম কলধ্বনির ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য, মধ্যে মধ্যে সে কন্যার মনের গোপন বাসনা বুঝিতে পারিত। তদনুসারে আমাদের অদ্ভুত নির্দেশও দিত। আমরা হয়তো জমি খুঁড়িতেছি (তখন আমরা গাছের মজবুত শাখা সূক্ষ্মাগ্র কযিয়া লইয়া তাহা দিয়াই মাটি খুঁড়িতাম), দলপতি ধবল উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল, "আজ চল, আমরা পাহাড়ে গিয়া পলাশ ফুল সংগ্রহ করি। কন্যার পলাশফুলে সাজিবার সাধ হইয়াছে। আজ ভূমি খনন করিবার প্রয়োজন নাই।" দলপতির আদেশে আমরা সকলে পাহাড়ে গিয়া রাশি রাশি পলাশ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। কিছুক্ষণের জন্য কন্যার তরঙ্গে সহস্র সহস্র পলাশ ফুল ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত নদীটাই যেন লাল হইয়া গেল। ধবল আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল, "কন্যা এইবার আবার দুকূলপ্লাবিনী হইয়া উঠিবে, আর আমাদের কোথাও যাইতে হইবে না, কন্যা তাহার তীরে আমাদের বাঁধিয়া রাখিবে..."

এই উক্তির একটা বিশেষ অর্থ ছিল। বাধ্য হইয়া কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর আমাদের স্থান পরিবর্তন করিতে হইত। আমরা তখন জমিতে সার দিতে জানিতাম না। কিছুকাল চাষ করিবার পর জমি বন্ধ্যা হইয়া পড়িত, আর ফসল ফলিত না, আমর বাধ্য হইয়া তখন অন্যত্র চলিয়া যাইতাম। অন্যত্র চলিয়া যাওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কারণ চাষ করিবার উপযোগী জমি সেকালে প্রায়ই অনধিকৃত থাকিত না। জমির সন্ধানে আমাদের বহুদিন ধরিয়া বহু পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অনাহারে জলাভাবে পথে অনেকে মারা পড়িত। চাষ করিতে শিখিয়া আমরা খাদ্য উৎপাদন করিতে পারিতাম, আগেকার মতো অনিশ্চিত শিকারের আশায় আমরা ছুটিয়া বেড়াইতাম না, সুতরাং আমাদের বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। আমাদের শিকার-জীবনে বংশবৃদ্ধি হইলে আমরা বিব্রত হইয়া পড়িতাম। সীমাবদ্ধ এবং অনিশ্চিত পশুমাংসে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি প্রতিপালিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। শিকারজীবনে তাই আমাদের বংশবৃদ্ধি তেমন হয় নাই। অনেক সময় সদ্যোজাত শিশুকে আমরা ফেলিয়া দিতাম। কৃষিজীবন আরম্ভ করিবার পর হইতেই শিশু আমাদের প্রিয় হইয়াছিল, তাহাদের আমরা সযত্নে লালন পালন করিতাম, কারণ একটু বড় হইয়া তাহারা আমাদের কৃষিকার্যে সহায়তা করিত ; সুতরাং এক একটা দলে বহু বৃদ্ধ, বহু নারী, বহু শিশু থাকিত সে যুগে। এই বিরাট পরিবার লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ানো মোটেই সহজ ছিল না, তাই জমির ফসল কমিয়া গেলে আমরা ভীত হইয়া পড়িতাম। আশঙ্কা

হইত দেবতা বুঝি বিরূপ হইয়াছেন। বিরূপ দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমরা পূজা করিতাম, প্রার্থনা করিতাম। কখনও দেবতা প্রসন্ন হইতেন, কখনও হইতেন না। তখন আমাদের স্থানত্যাগ করিতে হইত। কন্যা নদীর তীরে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্বে আমরা জোলাবাহা নামক অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বাস করিতাম। তাহার নিকটে কোনও নদী ছিল না। অনেক দূরে হ্রদ ছিল একটা। জলাভাবেই আমাদের সে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কন্যা নদীর সন্ধান দিয়াছিল মীংরা। বাসোপযোগী জমি সন্ধান করিবার জন্য কিছুদিন অন্তর আমাদের এক একটা ছোট ছোট দল বাহির হইত। আমাদের মধ্যে যাহারা সাহসী এবং বলিষ্ঠ তাহারাই হইত এইসব দলের নেতা। অজানার সন্ধানে অনিশ্চিত পথে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাহির হইয়া পড়িত তাহারা। বহুদিন পরে কেহ সুসংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিত, কেহ আবার ফিরিতও না। মীংরা কন্যা নদীর সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কন্যা নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিতে আমাদের কতদিন যে লাগিয়াছিল তাহা গণনা করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না। তবে অনেকদিন লাগিয়াছিল। কত দিন কত রাত্রি যে আমরা হাঁটিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পথ চলিতে চলিতে বহু রমণী সন্তান প্রসব করিয়াছিল, পথেই তাহারা বড় হইয়াও উঠিয়াছিল। ধবলের তৃতীয় পত্নী গহীনা এই সময়ই মারা যায়। একটা পর্বতের উপত্যকায় আমর বিশ্রাম করিতেছিলাম, একটা বাঘ আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। আমাদের দলের দুইজন প্রবীণ ব্যক্তি—জম্বীর এবং খুখনও এই সময়ই মারা যায়। পথের কষ্ট তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া উপর্যুপরি কয়েকদিন জলাভাব ঘটাতে তাহারা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। একস্থানে কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া বিশ্রামের সুযোগ দিলে তাহারা হয়তো মরিত না, কিন্তু পথে সময় নষ্ট করিবার সাহস ধবলের ছিল না। বিলম্ব হইয়া গেলে অন্য কোনও দল আসিয়া কন্যা নদীর তীর দখল করিয়া ফেলিতে পারে এ সম্ভাবনাটা যে তুচ্ছ করিবার কতো নহে একথা আমরাও সকলে অনুভব করিতেছিলাম। জাম্বীরা খুখনও করিতেছিল। একটা নদীর তীরে আসিয়া বসবাস করিবার সুযোগ পাওয়া একটা দুর্লভ সুযোগ ছিল সে যুগে। উন্মুখ আগ্রহে আমরা সকলেই মীংরাকে অনুসরণ করিতেছিলাম। থামিবার অবকাশ ছিল না। দুই-একটা মৃত্যু বা ছোটখাটো বাধা আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নাই।

আমাদের লক্ষ্য ছিল যত শীঘ্র সম্ভব কন্যা নদীর তীরে উত্তীর্ণ হওয়া। বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিলাম। আমাদের সমস্ত শ্রম যেন সার্থক হইয়া গিয়াছিল। ধবল বলিয়াছিল, "একটা নদীর তীরে যখন আশ্রয় পাইয়াছি তখন আমাদের আর কোথাও নড়িতে হইবে না। নদী তীরে জমি কখনও নিস্ফলা হয় না শুনিয়াছি। মীংরা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কপোত সম্প্রদায়রা বাহা নদীর তীরে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। কন্যা নদীর তীরে আমরাও পুরুষানুক্রমে বাস করিব। কি বল মীংরা?" মীংরা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। সে কোনও উত্তর দিল না, মৃদু হাসিল মাত্র। মীংরা বহুদর্শী লোক, বহুদিন ধরিয়া বহু দেশ পর্যটন করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার যাহা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা তাহা সর্বসমক্ষে সেদিন সে ব্যক্ত করে নাই। যাইবার পূর্বে ধবলকে গোপনে বলিয়া গিয়াছিল। মীংরা, নীহু, রাবো, ঘংকা ইহারা আমাদের দলের পর্যটক ছিল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ দিত চাষ করিবার মতো জমি আর কোথাও আছে কিনা। ইহাদের আমরা অত্যন্ত খাতির করিয়া চলিতাম, কারণ ইহারাই ছিল বহির্জগতের বার্তাবহ। আমরা সীমাবদ্ধ স্থানে চাষ লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম, ইহারা নানা খবর সংগ্রহ করিয়া আনিত। ইহারা ছিল স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক, নিজেরাই শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত, খাদ্যের জন্য আমাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না, মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আসিত, কিছুদিন আমাদের মধ্যে বাস করিত, আবার চলিয়া

যাইত। তাহাদের আগমনের জন্য মনে মনে আমরা সকলেই উন্মুখ হইয়া থাকিতাম। আজকাল গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র তোমাদের যে পিপাসা মিটায় উহারাও আমাদের সেই পিপাসা মিটাইত। অনেক নূতন সংবাদ, অনেক কল্পনার খোরাক তাহাদের মাধ্যমেই আমরা পাইতাম। তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা বড় কথা, তাহারা অনধিকৃত নূতন জমির সন্ধান আনিয়া দিত। মীংরা কন্যা নদীর সংবাদ আমাদের আনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই আমরা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলাম। কারণ সেই অনাবৃষ্টির যুগে শিকারও সুলভ ছিল না, আমরা অনেকে শিকার করিবার দক্ষতাও হারাইয়াছিলাম।

...আমরা যখন কন্যা নদীর উভয় তীরের সমস্ত জমি দখল করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিলাম তখন মীংরা একদিন চলিয়া গেল। যেদিন চলিয়া গেল তাহার আগের দিন রাত্রে সে আর ধবল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া কি সব পরামর্শ করিয়াছিল। গোপন পরামর্শ। আমরা কেহ কিছুই জানিতাম না। আমাদের তৃতীয় ফসল যখন আশানুরূপ হইল না, তখন আমরা ইহার আভাস পাইলাম।

প্রথম দুই বৎসর ফসল আমাদের খুবই ভাল হইয়াছিল। আমর নদীর উভয় তীরই খুঁড়িয়া বীজ বপন করিয়াছিলাম, এত ফসল ফলিয়াছিল যে, আমাদের সকলের আহারের সংস্থান হইয়াও প্রচুর উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। মাটি খুঁড়িয়া মাটির নীচে সেই উদ্বৃত্ত শস্য আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। মাটির নীচে শস্য অতি চমৎকার থাকিত। আমাদের পর্যটক নীহু সঞ্চয় করিবার এই কৌশলটি আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিল। গর্তের মেঝেতে আমরা পুরু খড়ের আস্তরণ বিছাইয়া দিতাম, গর্তের দেওয়ালেও আমরা কাদা দিয়া লেপিয়া সেই কাদায় সারি সারি নলখাগড়ার নল এমনভাবে বসাইয়া দিতাম যে, শস্য মাটির সংস্পর্শে আসিতে পারিত না। সেই গর্তে শস্য জমা করিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া শুষ্ক খড় চাপা দিয়া গর্তের মুখটা আমরা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতাম। শস্য একটুও নষ্ট হইত না। নীহু কোথা হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া আমাদের শিখাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

...কন্যা নদীর তীরে প্রথম কিছুদিন আমরা অতিশয় আনন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলাম। শুধু আনন্দ নয়, নিত্য নব বিস্ময়ও আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। উন্নগা পর্বতের সানুদেশ অরণ্যময় ছিল এবং সেই অরণ্যে আমাদের পরিচিত-অপরিচিত বহুবিধ পশুপক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। এজন্য আমাদের অসুবিধাও কম ভোগ করিতে হয় নাই, বন্য গরু ছাগল মহিষের দল আসিয়া আমাদের ক্ষেত নষ্ট করিত, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা আসিয়া আমদের তৃণশীর্ষগুলি খাইয়া ফেলিত, তাহাদের তাড়াইবার জন্য অথবা শিকার করিবার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের বহু লোককে সতর্ক থাকিতে হইত, কিন্তু তবু ইহাতে একটা নূতন ধরনের বিস্ময় আমরা অনুভব করিতাম। ইতিপূর্বে এতগুলি পশুপক্ষীকে এত নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তাহাদের যে সব সময় তাড়াইতে হইত বা শিকার করিতে হইত তাহা নয়, আমাদের ক্ষেতগুলি সু-উচ্চ বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল, সব সময়ে তাহারা আমাদের ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে যখন তাহারা বেড়া ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িত তখনই আমরা তাহাদের আক্রমণ করিতাম, মাংসের প্রয়োজনেও মাঝে মাঝে শিকার করিতে হইত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা তাহাদের নজরে নজরে রাখিতাম। কন্যা নদীর তীরে দেবদারু বৃক্ষ অনেক ছিল। দেবদারুশীর্ষে বসিয়া বসিয়া আমরা ইহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতাম। তাহারাও আমাদের উপর লক্ষ্য রাখিত। বিশেষ করিয়া তাহারা যাহারা আমাদের অন্যমনস্কতা অসাবধানতার সুযোগ লইয়া আমাদের শস্যে ভাগ বসাইত। সেকালের কয়েকটি চিত্র এখনও মনে আছে।

...উন্নগা পর্বতের উপত্যকা রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। উপত্যকা সন্নিহিত অরণ্য হইতে

একদল গরু বাহির করিল। বিরাট ককুৎ ও গলকম্বল সমন্বিত একটি ষণ্ডের সমভিব্যাহারে কয়েকটি গাভী। ষণ্ডটি একবার ঘাড় তুলিয়া আমাদের ক্ষেত্রের দিকে চাহিল। আমাদের ক্ষেতে বালকবালিকারা সব সময়ই পাহারা দিত। সম্ভবত সে তাহাদের দেখিতে পাইল, বুঝিল এখন ওদিকে যাওয়া নিরাপদ হইবে নয়। দুষ্ট বালকেরা শিক্ষকের সাড়া পাইয়া যেমন পড়ায় মনোযোগ দেয় অনেকটা সেইভাবেই সে উপত্যকায় চরিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেখাদেখি গাভীরাও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উপত্যকার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং উপত্যকার ঘাসেই মনোনিবেশ করিল। গাভীদের সঙ্গে নানা বয়সের বাছুরও ছিল। নিতান্ত শিশু যাহারা তাহার মাতৃস্তন্য পান করিতেছিল। মাতৃস্তন্য-পাননিরত গোবৎস ইতপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। দেখিতে বড়ই ভাল লাগিত। পিছনের পা দুইটির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া স্তন্যপান করিতে করিতে তাহারা মায়েদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইত। কুকুর শাবকদের স্তন্যপান করিতে দেখিয়াছি, কারণ কুকুর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের সঙ্গেই অনেক কুকুর ছিল। তাহারা কি করিয়া কবে যে আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছিল তাহা মনে নাই। গৌ প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া অথবা স্নেহের তাড়নায় কেন যে ঝাউঝাউকে পুষিয়াছিল জানি না। তাহার পর হইতেই কিন্তু কুকুর আমাদের জীবনের সঙ্গী হইয়া আছে। দেবদারু বৃক্ষের শীর্ষে বসিয়া পাননিরত গোবৎসগুলিকে দেখিয়া তাহাদেরও পুষিতে ইচ্ছা করিত। সে ইচ্ছা যে কেবল আমারই হইত তাহা নয়, অনেকেরই হইত। কিন্তু সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার সঙ্গতিও আমাদের তখন ছিল না, সাহসও ছিল না। তাহারা আমাদের খাদ্যে ভাগ বসাইত বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিরূপতাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবু তাহাদের নিকটে পাইবার জন্য একটা লোলুপতা জাগিত, নিছক সৌন্দর্যপ্রীতির জন্যই জাগিত বোধ হয়। সুন্দর ফুল তুলিয়া আমরা মাথায় পরিতাম, রঙীন পাথর এবং ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতাম। যাহা কিছু সুন্দর তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের জীবনকে নিত্য নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আমার মনে হয়, পরবর্তী যুগে আমরা যে গোপলেনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম আপাতদৃষ্টিতে তাহার অন্য কারণ থাকিলেও আসল কারণের বীজ বোধ হয় আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন চেতনায় তখনই উপ্ত হইতেছিল। ক্রীড়াশীল গোবৎসগুলির দিকে আমরা ক্রীড়নকলুব্ধ শিশুর মতোই চাহিয়া থাকিতাম। এই আগ্রহ, এই সৌন্দর্যপ্রীতি, দুর্লভকে লাভ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা অবশেষে আমাদের জয়ী করিয়াছে, শত্রুকেও আমর মিত্র করিয়াছি। আর একদিনের একটা ঘটনা মনে পরিতেছে। মনে হয় সেদিন আমি আমার জীবনের চরমতম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। কোনও কিছু আবিষ্কার করার চেয়ে বড় আনন্দ তখন আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেদিন আমি যাহা আবিস্কার করিয়াছিলাম তাহা এখন অতিশয় সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু তখন তাহা আমার অতিশয় অভিনব মনে হইয়াছিল। সেদিন শিকারের আশায় উন্নগা পাহাড়ের উপর উঠিয়াছি। আমিই তখন আমাদের দলের মধ্যে সেরা শিকারী ছিলাম। গরুর মাংসে আমাদের অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল, ধবলের নূতন প্রিয়তমা নিনানির আদেশে আমি পাহাড়ী ছাগল শিকার করিতে বাহির হইয়াছিলাম। পাহাড়ী ছাগল শিকার করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। পাহাড়ী ছাগলের মতো অমন চতুর এবং পলায়ন দক্ষ জানোয়ার খুব কম দেখিয়াছি। পারতপক্ষে তাহারা সমতলভূমিতে নামিত না, পর্বতের দুর্গম স্থানেই অতিশয় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। খাড়া পাহাড় সোজা উঠিয়া গিয়াছে, তাহারও গায়ে পাহাড়ী ছাগলকে উঠিতে দেখিয়াছি। পাশাপাশি দুইটি পর্বতশৃঙ্গ, তাহার মধ্যস্থলে অতি সঙ্কীর্ণ পথ, পাহাড়ী ছাগল তাহার ভিতর অনায়াসে ঢুকিয়া পড়ে। বহুদূর হইতেই তাহারা শত্রুর আগমন টের পায় এবং টের পাইলে এমনভাবে আত্মগোপন করে যে শত্রুকে হার মানিতে হয়। অতর্কিতে

তাহাদের শিকার করা যায় না। হাওয়ায় তাহারা মানুষের গন্ধ টের পায় এবং টের পাইলে তাহাদের নেত্রী (ছাগীরাই প্রায় দলের নেত্রী হয়) সামনের পা দুটি ঠুকিয়া সামান্য একটু শব্দ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটি অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে লক্ষ্য করিলাম, উপত্যকার বাম ধারে পর্বতশৃঙ্গের ঈষৎ নিম্নে বারান্দার মত যে স্থানটুকু বাহির হইয়া রহিয়াছে তাহার উপর দুইটি ছাগশিশু দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত। পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহারা পরস্পরকে ঢুঁ মারিতেছে। একটী পা ফসকাইয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু উহাদের কখনও পা ফসকাইতে দেখি নাই। ছাগশিশু দেখিয়া বুঝিলাম যে দলটিও তাহা হইলে নিকটেই কোথাও আছে। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু থামিয়া গেলাম। হাওয়া ওই দিকেই বহিতেছিল। মনে হইল এখন আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, হয়তো ইতিমধ্যেই উহারাও আমার আগমন টের পাইয়া গিয়াছে। কোথাও কিছুক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকা যাক, হাওয়া ঘুরিলে তাহার পর অগ্রসর হওয়া যাইবে। উহারাও হয়তো নামিয়া আসিতে পারে। তীব্রবেগে হাওয়া বহিতেছিল। হাওয়া এড়াইবার জন্য আমি বৃক্ষবেষ্টিত একটা ঘন ঝোপে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা দেখিয়া দ্রুতগতিতে প্রথমেই একটি গাছে উঠিয়া পড়িতে হইল। ঝোপের অন্তরালে একটি বন্য গরু বসিয়াছিল। কোনও বন্য জন্তুর খুব কাছে থাকা নিরাপদ নয়, এই বোধটা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। বন্য গরুর সম্মুখীন হইবার মতো ভারী অস্ত্রও আমার কাছে ছিল না, তীর ধনুক লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। গাছে উঠিয়া দেখিলাম গরুটা চলিয়া গেল না, বসিয়াই রহিল। আমাকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, উঠিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠিল না, বসিয়া রহিল। তখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম ওটা একটা গাভী এবং তাহার পিছনের দিক হইতে কি যেন একটা বাহির হইয়া আছে। চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল— গাভীটি প্রসব করিতেছে। বিস্ময় ও আনন্দের একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার সমস্ত চিত্তকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। সেই বৃক্ষশাখায় চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া নীরবে রুদ্ধশ্বাসে আমি সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিলাম। মনে হইল অপরূপ একটা কিছু দেখিতেছি। মনুষ্যসন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বহুবার দেখিয়াছি, আমাদের বৃহৎ গোষ্ঠীতে এ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে কোন অভিনবত্ব আছে বলিয়া কখনও মনে হয় নাই। কিন্তু এই গো-জননীর প্রসব ব্যাপারটা আমাকে সেদিন বড়ই অভিভূত করিল। তাহার কারণ বোধ হয় আমাদের দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। জমি চাষ করিয়া বীজ বপন করা বীজ অঙ্কুরিত হইলে পাহারা দেওয়া, তাহার পর শস্য পাকিলে সেগুলি ঝাড়িয়া সঞ্চয় করা এবং এই সবেরই পুনরাবৃত্তি আমাদের কৌতূহলকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিত। যদিও কন্যা নদীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাবিধ নৃত্য গীত পূজা উৎসব আমাদের জীবনকে বিচিত্র করিত কিন্তু সে সবও একটা বিশেষ পদ্ধতির গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া অভিনবত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের সংঘাতে সমস্ত সত্তা অপূর্ব পুলকে মাতিয়া ওঠে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সেই অজানা বিস্ময়ের জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া থাকি। আজ তোমাদের কবি ও বৈজ্ঞানিকেরা নিত্য নূতন সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে আনন্দে অভিভূত হন আমিও তখন ঠিক সেই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। সেইদিন আর একটা বিস্ময়ও আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই দিনই আমি প্রথম শিলাঙ্গীকে দেখিয়াছিলাম। ওই সদ্যপ্রসূতা গভীটিই শিলাঙ্গীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল। বাছুরটি তখন সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, গাভীটি চাটিয়া চাটিয়া তাহার অঙ্গ পরিষ্কার করিতেছে, এমন সময় ঠিক আমার সম্মুখের একটি বৃক্ষ হইতে, একবোঝা কচি ঘাস গাভীটির মুখের সম্মুখে পড়িল। গাভীটি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় প্রথমটা একটু সচকিত হইয়া উঠিলেও বিশেষ বিচলিত হইল না, বরং

মুখের কাছে খাদ্য পাইয়া অবিলম্বে তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। বলা বাহুল্য, আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গিয়াছিল ওই কচি ঘাসের বোঝাটার দিকে চাহিয়া। ওগুলি যে আমাদের ক্ষেতের তৃণশস্য, ওগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সমস্ত দলটাই যে সর্বদা সজাগ হইয়া আছে, যে গরুকে আমাদের ক্ষেত হইতে দূরে রাখিবার জন্য আমরা নানাভাবে সচেষ্ট হইয়া রহিয়াছি, সেই গরুর মুখেই আমাদের তৃণশস্য এমনভাবে কে আনিয়া দিল! অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া সম্মুখের বৃক্ষটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। নিকষ কৃষ্ণাঙ্গী একটি কিশোরী অতি সন্তর্পণে বৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে নিঃশব্দে নামিয়া সে বনান্তরালে মিলাইয়া গেল। আমিও পরমুহূর্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আর তাহাকে দেখিতেই পাইলাম না। মনে হইল ঝোপের আড়ালেই সে কোথাও আছে, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সেই বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। সদ্যোজাত গো-শাবকটি আমাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিলাম তাহার মা তাহাকে চাটিয়া চাটিয়া প্রায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, সে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি মুগ্ধনেত্রে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম। সহসা একটা অসমসাহসিক স্পৃহা আমাকে পাইয়া বসিল। বাছুরটাকে চুরি করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়! উহাকে যদি আমর পুষি, ধবল কি খুব আপত্তি করিবে? ধবল যদি আপত্তি করে তখন না হয় ওটাকে মারিয়া আহার করিয়া ফেলিলেই চলিবে। কিন্তু এখন যদি একটা জীবন্ত বাছুর কাঁধে করিয়া হাজির হইতে পারি আমাদের দলের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু কি করিয়া ধরা যায়! উহার মায়ের নিকট যাওয়া তো অসম্ভব। একটা চিল আসিয়া একটু দূরে বসিয়াছিল, গাভীটা এমন তাড়া করিয়া গেল যে সে পলাইবার পথ পাইল না। ভাবিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার নামিলে হয়তো নিঃশব্দচরণে উহার নিকটবর্তী হইতে পারিব। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। উন্নগা পর্বতের আশেপাশে বহুরকম হিংস্র শ্বাপদ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাঘের গর্জন, এমন কি সিংহের গর্জনও মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। হায়েনার ডাক তো প্রায়ই শোনা যায়। তা ছাড়া আমাদের দলের জিগ্রা বন্যকুক্কুরও দেখিয়াছে নাকি। বন্যকুক্কুরের মতো ভয়ানক প্রাণী আর কিছু নাই। একবার তাহাদের কবলে পড়িলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। একা আসিয়াছি, একটা উদ্ভট খেয়ালের বশীভূত হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত হইবে কিনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। বাছুরটা উঠিয়া টলিতে টলিতে ঠিক আমার গাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মা যদিও তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিল, কিন্তু ঠিক কাছটিতে ছিল না, শিলাঙ্গী গাছের উপর হইতে তাহাকে যে ঘাসের বোঝা দিয়া গিয়াছিল সেইটিই সে তখন শেষ করিতেছিল। আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, আমার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইল, আমি টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাছুরটিকে কাঁধে তুলিয়া লইলাম এবং মুখ দিয়া তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি আবার গাছে উঠিয়া গেলাম। যতক্ষণ আমি গাছে উঠিতেছিলাম ততক্ষণ বাছুরটা আমার মুখ হইতে ঝুলিতেছিল চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। গাছে উঠিয়া বাছুরটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিলাম। কিন্তু সে এত ছট্‌ফট্‌ এবং চীৎকার করিতেছিল এবং ঊর্ধ্বমুখ হইয়া হাম্বারব করিতেছিল। বাছুরটাকে এক হাতে আঁকড়াইয়া বুকের কাছে ধরিয়াছিলাম, আর এক হাত দিয়া ধরিয়াছিলাম একটা গাছের ডাল। ভয় হইতেছিল যদি গাছের ডালটা ভাঙিয়া যায় তাহা হইলে নীচে পড়িয়া যাইব এবং নীচে পড়িয়া গেলেই সুনিশ্চিত মৃত্যু। বাছুরটাকে ফেলিয়া দিলেই সব গোল চুকিয় যাইত, কিন্তু বাছুরটাকে কিছুতেই

ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না, আসন্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে আমি তাহাকে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম কোথা হইতে ধোঁয়া আসিতেছে, এখানে আগুন জ্বালাইল কে? কাছেপিঠে তো কোনও মানুষ আছে বলিয়া জানা নাই। পরমূহুর্তে সেই কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরীর কথা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কাও ঘনাইয়া আসিল মনের ভিতর। উন্নগা পর্বত যদি মনুষ্য অধ্যুষিত হয় তাহা হইলে চিন্তার কথা। যে কোনও দিন অতর্কিতে তাহারা আসিয়া হানা দিতে পারে। ফিরিয়া গিয়াই ধবলকে কথাটা বলিতে হইবে। আমার চিন্তাধারা আর অগ্রসর হইবার অবসর পাইল না, কারণ পরমুহূর্তেই একটা বর্শা আসিয়া আমার মাথার ঠিক উপরের ডালটাতে বিঁধিল, একটুর জন্য আমার মাথাটা বাঁচিয়া গেল। কাহারও বর্শার লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে মন করিয়া যে-ই স্থান পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলাম অমনি বাছুরটা আমার কোল হইতে নীচে পড়িয়া গেল। বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু একটা গো-শাবকের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করা চলে না। গাছের আরও উপরে উঠিয়া ঘন পত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটা স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। অনেকক্ষণ আর কোন কিছু ঘটিল না। সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম বাছুরটার কি হইল। কিছুই হয় নাই, দেখিলাম তাহার মা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহারগা চাটিয়া দিতেছে। সে দিব্য মায়ের আশেপাশে ঘুরিতেছে, মাঝে মাঝে লাফাইবার চেষ্টাও করিতেছে। তাহাদের দিকে কিন্তু ভাল করিয়া আর মন দিতে পারিতেছিলাম না। বর্শাটা শুধু যে গাছের ডালেই বিঁধিয়াছিল তাহা নয়, আমার মনেও বিঁধিয়াছিল। বর্শাটাকে নিক্ষেপ করিল না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আস্তে আস্তে আবার উপর হইতে নীচে নামিলাম এবং বর্শাটা বৃক্ষশাখা হইতে খুলিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। চমৎকার পালিশ করা পাথরের বর্শা খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ তীক্ষ্ণ। সে যুগে আমরা সকলেই পালিশ করা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এমন চমৎকার পালিশ করা অস্ত্রশস্ত্র আমাদের ছিল না। আমি সবিস্ময়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অস্ত্রটিকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমন একটা চমৎকার অস্ত্র হস্তগত হওয়াতে অতিশয় পুলকিতও হইয়াছিলাম। একবার ইচ্ছা হইল এই অস্ত্রের দ্বারাই গাভীটিকে হত্যা করিয়া গো-শাবকটিকে হরণ করি। গাভীর কপালের ঠিক মধ্যস্থলে যদি এই বর্শা বিদ্ধ করিতে পারি তাহা হইলে তাহাকে আর উঠিতে হইবে না। আর একবার উঁকি দিয়া দেখিলাম তাহারা কোথায় কিভাবে আছে। এবার কিন্তু তাহাদের আর দেখিতে পাইলাম না। আরও খানিকটা উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তাহারা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপের বাহিরে বেশ খানিকটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের মতো স্থান ছিল। দেখিলাম তাহারা সেই মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। মাঠের অপর পারে একদল গরু চরিতেছে। সেই দিকেই তাহারা চলিয়াছে। একটা জীবন্ত গো-শাবক লইয়া গিয়া আমাদের দলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিব আশা করিয়াছিলাম তাহা বিসর্জন দিতে হইল। নামিতে যাইব এমন সময় দেখি নীচের একটা ডালে সেই কৃষ্ণা কিশোরীটি আমার দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া বসিয়া আছে। তাহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চোখের পলক পড়িতেছে না। আমিও নির্নিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। অমন নিঁখুত চোখমুখের গড়ন ইতিপূর্বে দেখি নাই। তাহা এত অপূর্ব যে সহসা আমি ভয় পাইয়া গেলাম। মনে হইল মানুষ নয়, কোনও দেবতা অথবা অপদেবতা। অপদেবতার নিশ্চয়ই আছে এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হইয়াছিল। একদিন ধবলের বৃদ্ধা জননী শানজিজাকি বলিতেছিল, উড্ডীয়মান শকুনদের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার মনে হয় যে উন্নগা পর্বতে প্রেতিনীরা বাস করে। আমাদের দলের আর একজন শিকারী রুতারু একদিন স্বচক্ষে নাকি এটা মায়ামৃগও দেখিয়াছিল। রুতারু মৃগটিকে অনুসরণ করিতেছিল, পরমূহূর্তে রুতারু দেখিতে পাইল অদূরবর্তী ঝোপটা নড়িতেছে। রুতারু ভাবিল হরিণটাই

হয়তো সেই ঝোপে ঢুকিয়াছে, ছুটিয়া সেখানে গেল কিন্তু হরিণ দেখিতে পাইল না। দেখিল বৃহচ্চক্ষু একটা বিরাট পেচক বসিয়া আছে। রুতারুর দৃঢ় ধারণা, মৃগটাই পেচকে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আমিও তাই প্রথমটা ভীত হইয়াছিলাম। আরও ঘাবড়াইয়া গেলাম যখন সে কোনও কথা না বলিয়া আমার দিকে হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া দিল।

"কে তুমি, কি চাও?"

আমার মুখ দিয়া কথাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। অনেকটা ধমকের মতো শুনাইল। কথাগুলি বলিয়া আমি আরও ভয় পাইয়া গেলাম, যদি প্রেতিনীই হয়, ধমক সহ্য করিবে না, হয়তো—।

"আমার বর্শা ফিরাইয়া দাও।"

শুনিয়া তাক লাগিয়া গেল। এ যে আমাদের ভাষায় কথা কহিতেছে!

"কে তুমি?"

"আমি শঙ্খীর কন্যা শিলাঙ্গী।"

"কোথায় থাক তুমি?"

"উন্নগা পর্বতের অপর পারে। আমার বর্শা দাও—"

"তুমি বর্শা ছুঁড়িয়াছিলে কেন?"

"তোমাকে আঘাত করিবার জন্য।"

"আমার অপরাধ?"

"তুমি আমার বাছুর চুরি করিয়াছিলে।"

"তোমার বাছুর? বাছুরটিকে তো আমি ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিলাম। তোমার হইল কখন?"

"উহার জন্মের পূর্ব হইতেই। ও যখন মায়ের পেটে আসে নাই, তখন হইতে। উহার মা যে আমার—"

"পুষিয়াছ?"

"না। উহাকে আমি অনেকদিন হইতেই পছন্দ করিয়াছি। সেইজন্য আমাদের দলের কেহ উহাকে কিছু বলে না। উহার নাম কি জান? দুধুনী, উহার বাছুরের নাম রাখিব মধুনী। আমার বর্শাটা দাও, আমি চলিয়া যাই।"

"তোমরা কাহার দল? দলপতির নাম কি?"

"রোহা।"

"তোমার কে হয়?"

"বাবা।"

"তোমরা কি চাষ কর?"

"না, আমরা গরু পালন করি। আমাদের গরুর দল এখন উন্নগা পাহাড়ে আসিয়াছে, তাই আমরাও এখানে আসিয়াছি।"

"পালন কর মানে? পোষ না অথচ পালন কর কিরূপে?"

"আমরা একদল গরুকে আগলাইয়া বেড়াই। কোন গাভীর যখন বাছুর হয়, তখন ফাঁস লাগাইয়া সেই গাভীটিকে আমরা ধরি, ধরিয়া তাহার দুধ খাই। দুধুনীকে কিন্তু কেহ ধরিবে না বলিয়াছে।"

"দুধ খাও!"

খবরটা শুনিয়া সত্যই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। খাদ্য হিসাবে বহুপ্রকার জিনিসের ব্যবহার আমরা নিজেরা করিতাম, অপরকেও করিতে শুনিয়াছি। একজন মানুষ

আর একজন মানুষকে আহার করে, এ সংবাদও বিস্ময়কর ছিল না। কিন্তু মানুষ গরুর দুধ খাইতেছে, এ সংবাদ ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া শিলাঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"আমার বর্শাটা দাও!"

"তোমার গরুর দুধ খাও কি করিয়া? গাভীর বাঁটে মুখ লাগাও নাকি! তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব?"

শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

"বল না, কি করিয়া দুধ খাও তোমরা?"

"নিজেই আসিয়া দেখিয়া যাও।"

পরমুহূর্তেই তাহার চোখে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। বলিল, "না, আসিবার দরকার নাই। আমাদের দলের ঝোন্‌ঝিরা বড় ভয়ানক লোক। বাহিরের কাহাকেও সে সহ্য করিতে পারে না। একবার একজন বিদেশী আমাদের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছিল, ঝোন্‌ঝিরা বর্শার এক আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহার যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। তোমার যাইবার দরকার নাই। আমার বর্শাটা দাও, আমি চলিয়া যাই এবার।"

আমার আত্মসম্মান আহত হইয়াছিল। মনস্থ করিলাম ঝোন্‌ঝিরা যত ভয়ানক লোকই হোক না কেন, শিলাঙ্গীদের আস্তানাটা একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ঝোন্‌ঝিরার সম্মুখীনও হইব। তখন কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিলাম না; কেবল বলিলাম, "আমাকে আগে বল, কি করিয়া তোমরা দুধ খাও। আমার তো কিছুতেই মাথায় ঢুকিতেছে না।"

"তুমি বোকা তাই ঢুকিতেছে না। গরুর পা চারিটি খুঁটিতে ভাল করিয়া বাঁধিয়া তাহার পর বাঁট হইতে টানিয়া আমরা দুধ বাহির করি।"

"দুধ মাটিতে পড়িয়া যায় না?"

"মাটিতে পড়িবে কেন? বাঁশ কাটিয়া জীবা যে চমৎকার কোঁড়ে প্রস্তুত করে। তাহাই একজন ধরিয়া থাকে, দুধ তাহাতেই পড়ে।"

রূপকথা শুনিয়া তোমরা যে আনন্দ পাও, আমি তখন সেই আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। আমরা তখনও পাত্র প্রস্তুত করিতে শিখি নাই। ঘাংকো অনেকদিন পরে সহসা একদিন আসিয়া আমাদের শিখাইয়া দিয়াছিল কি করিয়া মাটি হইতে পাত্র প্রস্তুত পরিতে হয়। সে সঙ্গে করিয়া একটা লাউ এবং কিছু লাউয়ের বীজও আনিয়াছিল। মাটি হইতে পাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে লাউয়ের খোলার প্রয়োজন। এইজন্যেই কিছুদিন পরে আমাদের লাউ চাষও করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বাঁশ কাটিয়া যে দুধের কেঁড়ে প্রস্তুত হইতে পারে, একথা শিলাঙ্গীর মুখেই প্রথম শুনিলাম এবং শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। একটা অপূর্ব পুলকও আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বাঁশ ইতপূর্বে আমিও বহুবার দেখিয়াছি, বাঁশ দিয়া বেড়া প্রস্তুত করিয়াছি, ঘরের চাল বানাইয়াছি, কিন্তু বাঁশের যে সম্ভাবনা ছিল তাহা কোন দিন ভাবি নাই। মনে হইল সত্যই তো, একটা গ্রন্থির সহায়তা লইলেই তো চমৎকার একটি পাত্র হয়। এই সহজ সত্যটি যাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধ আহরণ করিয়া যাহারা পান করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য লোক। তাহাদের সহিত যেমন করিয়া হোক আলাপ করিতে হইবে। কোনও অজানা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়াই তখন নিয়ম ছিল, তাহারা যে মিত্রভাবাপন্ন ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে শত্রু মনে করিতে হইবে, এই নীতি পালন করিয়াই চলিতাম, কিন্তু অজানা সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ না হইয়া পারিলাম না। সেকালে শ্রদ্ধার সহিত ভয়ও জড়িত হইয়া থাকিত। শিলাঙ্গীর মুখের দিকে আমি সভয়

সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। কোন্ সূত্রে ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা সম্ভব, মনে মনে তাহাও চিন্তা করিতেছিলাম, সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

"এইবার আমার বর্শাটা দাও—"

শিলাঙ্গী উঠিয়া আসিয়া বর্শাটা ধরিয়া টান দিল।

"দিতেছি। আমার আর একটি কথার জবাব দাও। গাছের উপর হইতে ওই গাভীটির মুখের সামনে ঘাসের বোঝা কে ফেলিয়াছিল? তুমি কে?"

"হ্যাঁ, আমিই।"

"ওই ঘাস কোথা হইতে পাইলে?" ও-ঘাস তো পাহাড়ে কোথাও হয় না।"

"কেন, তোমাদের ক্ষেতে তো প্রচুর হয়।"

"আমাদের ক্ষেত হইতে আনিয়াছে?"

শিলাঙ্গী মুচকি হাসিয়া মাথা নাড়িল।

"কি করিয়া আনিলে, আমাদের ক্ষেতে তো সর্বদা পাহারা থাকে।'

শিলাঙ্গী স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ওটা তোমার ভুল ধারণা। সর্বদা পাহারা থাকে না। গভীর রাত্রে সকলেই তোমরা ঘুমাইয়া পড়।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"আমি যে রোজ যাই।"

"রোজ যাও! বল কি!"

শিলাঙ্গীর চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কোন উত্তর দিল না।

"রোজ যাও?" কোন্ পথ দিয়া যাও? বেড়া ডিঙাইয়া?"

এবারও শিলাঙ্গী কোন উত্তর দিল না। তাহার হাস্যদীপ্ত চক্ষু দুইটি কেবল জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। পরমুহূর্তেই সে যাহা করিল, তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ভস্ করিয়া আমার হাত হইতে বর্শাটা কাড়িয়া লইয়া তরতর করিয়া সে গাছ হইতে নামিয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিলাম। এবারও কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। আশ্চর্যভাবে সে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঝোপের চতুর্দিকেই উন্মুক্ত উপত্যকা, লুকাইয়া থাকিবার মতো কোন আড়াল ছিল না, অল্প সময়ের মধ্যে অত বড় প্রান্তর ছুটিয়া পার হওয়াও সম্ভব নয়। গেল কোথায়? চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। সহসা সেই ধোঁয়াটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঝোপের মধ্যে পুনরায় ঢুকিয়া দেখিলাম, শুষ্ক খড়ের বাণ্ডিলটা তখনও জ্বলিতেছে। পূর্বে তো এটা এখানে ছিল না, শিলাঙ্গীই নিশ্চয় আনিয়াছে। চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম, কিছু দূরে দূরে দগ্ধ খড়ের অঙ্গার ও ভস্ম পড়িয়া রহিয়াছে। সেইগুলিকে অনুসরণ করিয়া অবশেষে একটি গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গর্তের মুখটি পাথর দিয়া ঘেরা। দূর হইতে সহসা বুঝিতে পারা যায় না যে এই স্থানে গর্ত আছে, মনে হয় ছোট বড় কতকগুলি পাথর বুঝি স্বভাবিকভাবে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুয়ি দেখিলাম। সন্দেহ রহিল না যে, শিলাঙ্গী এই পথেই অন্তর্ধান করিয়াছে। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। দেখিতে পাইলাম, গরুর দল চরিতে চরিতে আরও দূরে চলিয়া আসিয়াছে। ধবলের প্রিয়তমা পত্নী নিনানির আবদার-মাখা আদেশ মনে পড়িল। নিনানি কখনও রূঢ়ভাবে আদেশ করিত না ; তাহার আদেশ অনুরোধের মতো শুনাইত। "দেখ না বাপু একটা ছাগল যদি পাও, গরুর মাংস আর ভাল লাগে না।'—তাহার এই কথাগুলির সঙ্গে নয়নের দৃষ্টি ও অধরের ভঙ্গিমা মিলিয়া যাহা হইত তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিবার ক্ষমতা আর যাহারই থাক, আমার ছিল না। নিনানি ধবলের প্রিয়তমা পত্নী ছিল বটে, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসিত। আমিও তাহার জন্য বহু অসাধ্য সাধন করিতাম। কন্যা নদীর

অভিমুখে আমরা যখন আসিতেছিলাম, তখন মাঝে মাঝে নিনানি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল যে তাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া না আনিলে ফেলিয়া আসিতে হইত। মীংরা, ঘিসু এবং আমি—আমরা তিনজনই তাহাকে বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। নিনানি কিন্তু আমার স্কন্ধেই উঠিয়াছিল, যেন কৃপাপরবশ হইয়াই উঠিয়াছিল। ধবল নিনানিকে পত্নীরূপে দাবি করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে পাই নাই (দলপতির দাবি অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না), কিন্তু সে যে আমাকেই চায় তাহার অজস্র প্রমাণ দিতে সে কুণ্ঠিত হইত না। ছাগলগুলির দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব নাকি যদি একটাকেও অন্তত মারিতে পারা যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা অদ্ভুত যুক্তি আমাকে নিরস্ত করিল। ভাবিলাম এই অপরিচিতা মেয়েটির সংবাদ যতটা পারি সংগ্রহ করিয়া না লইয়া গেলে দলপতি ধবলের নিকট আমি অপরাধী হইব। বিশেষত ইহারা যখন আমাদের ক্ষেত হইতে ফসল চুরি করিয়া লইয়া যায় তখন ইহাদের সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন ইহা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে শিলাঙ্গী যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে আমার কর্তব্যবোধ আমাকে ওই গর্তে প্রবেশ করিতে প্ররোচনা দিত না। আমি বড় জোর সংবাদটা ধবলের কর্ণগোচর করিয়া দিয়া তাহার নির্দেশের অপেক্ষা করিতাম। সেযুগেও আমরা মোহের কবলে পড়িয়া মনকে চোখ ঠারিতে শিখিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাই নিনানির অনুরোধের মূল্যটা আমার নিকট কমিয়া গিয়াছিল।

...গর্তের ভিতর অবতরণ করিলাম। গর্তের মুখটা বেশ বড় ছিল, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই দেখিলাম তাহা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সর্পের মতো বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, আমার ধনুক লইয়া তাহা অসম্ভব। ফিরিয়া আসিলাম। যে বৃক্ষগুলি সেই ঝোপটাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারই একটাতে আরোহণ করিয়া আমার তীরগুলি ও ধনুকটি লুকাইয়া রাখিলাম। একটা লতা দিয়া একটা গাছের ডালে বেশ দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দিলাম সেগুলিকে। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া গর্তে প্রবেশ করিলাম। খেয়াল হইল না যে সন্ধ্যা আসন্ন, সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। গর্তের ভিতর কতক্ষণ যে বুকে হাঁটিয়াছিলাম তাহা জানি না, ঘণ্টা মিনিটের কোন আন্দাজই ছিল না তখন আমাদের। আকাশ দেখিয়া সময় নির্ণয় করিতাম, কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সে সুযোগও ছিল না। তবে বহুক্ষণ যে লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, শ্বাসকষ্ট হইতেছিল। সুড়ঙ্গর অপর প্রান্তে যখন উপস্থিত হইলাম কোনও আলো দেখিতে পাইলাম না, কারণ রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছিল। অসংখ্য ঝিল্লী ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম সুড়ঙ্গপথ শেষ হইয়াছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়াও আমাকে সেকথা জানাইয়া দিল। তাহার পর সহসা মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কে যেন আমাদের ভাষাতেই কথা বলিতেছে। আবার মনে বিস্ময় জাগিল। ইহারা আমাদের ভাষা জানিল কি করিয়া! ইহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক কি ছিল কখনও? স্মরণ করিতে পারিলাম না। এখন সে শক্তি থাকিলে যাহা শুনিলাম তাহাতেই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইতাম। কিন্তু তখন সে শক্তি ছিল না। জন্মান্তরে যে কাংড়ার দলে আমি নিজেই একদিন ছিলাম, বারংবার সেই কাংড়ার নাম শুনিয়াও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে আমরা এবং ইহারা একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা মাত্র। সেই জন্যই আমাদের ভাষা এক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আমরা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, ভাষা বিশেষ বদলায় নাই।

...সুড়ঙ্গমুখে উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল কে যেন রূপকথা বলিতেছে, অনেকে বসিয়া শুনিতেছে। যদিও আমি কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু একটা অস্ফুট কলরব হইতে বোধ হইতেছিল যে, কোনও কথক একদল লোকের সম্মুখে কথকতা করিতেছে।

কথক বলিতেছিল, "সাকুণ্ডা অরণ্যের প্রান্তে একটা পাথর আছে, অবিকল গাভীর মতো দেখিতে। আমাদের পূর্বপুরুষ কাংড়া সেই প্রান্তর গাভীর পঞ্জর ভেদ করিয়া পাতাল হইতে উঠিয়াছিল। তাহার হস্তে ছিল শ্যামল তৃণগুচ্ছ।" ...কথক এইবার গান গাহিয়া উঠিল। "কাংড়ার হাতে ছিল তৃণগুচ্ছ। যে গাভী তাহাকে প্রসব করিয়াছিল সেই গাভীর প্রাণই ছিল তাহার হস্তে শ্যামল তৃণগুচ্ছের রূপ ধরিয়া। যে শ্যামল তৃণগুচ্ছ গাভীর স্তনে শুভ্র দুগ্ধে রূপান্তরিত হয়, সেই শ্যামল তৃণগুচ্ছ ছিল কাংড়ার হস্তে। যে হস্তে কাংড়া পরে দলপতির নিষ্ঠুর দণ্ড ধারণ করিবে, সেই হস্তে তখন ধরিয়াছিল শ্যামল তৃণগুচ্ছ। যে শ্যামল তৃণগুচ্ছের সন্ধানে সমস্ত দলকে একদা ব্যাপৃত হইতে হইবে, সেই শ্যামল তৃণগুচ্ছ ছিল কাংড়ার হস্তে".. এই একই কথা নানাভাবে সুর করিয়া কথক বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিলাম, তাহার সহিত আরও অনেকে যোগ দিয়া তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঝিল্লী-ধ্বনির সহিত মিশিয়া সমবেত কণ্ঠের সুরলহরী অন্ধকার পর্বতের সানুদেশে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করিল। কিছুক্ষণ পরে গান থামিয়া গেল। কথক আবার বলিতে লাগিল, "সেই প্রস্তরগাভীর ঠিক পাশেই ছিল একটি গর্ত। গর্ত হইতে বাহির হইল একটি জীবন্ত গাভী এবং তাহার পিছু পিছু একটি গো-শাবক। গাভীটি ছিল ঘটোধ্নি, তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। কাংড়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি তোমার জন্য ঘাস আনিয়াছি তুমি আমাকে তোমার দুধ দাও। গাভী বলিল ঘাস তোমার নয় ঘাস ভূমির। ভূমি হইতে তুমিও যেমন ছিঁড়িয়া আনিয়াছ, আমিও তেমনি ছিঁড়িয়া লইতে পারি। কেবল ঘাসের জন্য তোমাকে দুধ দিব না, যে দুধ আমার বাছুরের জন্য সে দুধ আমি তোমাকে ঘাসের বদলে দিব না।" কথকের এই কথা শেষ হইতে না হইতে সমবেত নারীরা গান গাহিয়া উঠিল, "দুধ দিব না, বাছুরের জন্য যে দুধ রাখিয়াছি তাহা দিব না, তাহা দিব না।" এক কলি গাইয়াই তাহারা থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত কথকও কিছু বলিল না। ঝিল্লীর ঐকাঝঙ্কারটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল সহসা। মনে হইল তাহারাও এ বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য যেন বলিতেছে। একটু পরে কথক পুনরায় আরম্ভ করিল তাহার কথকতা। কাংড়া উত্তর দিল, "আমি তোমার দুধ লইবই। ঘারে শাবককে আমি বঞ্চিত করিব না, তোমার বিশাল স্তনে এত দুধ আছে, তোমার শাবককে দিয়াও অনেক উদ্বৃত্ত থাকিবে। তোমার সেই উদ্বৃত্ত দুধ আমি চাই। কিসের বদলে দিবে বল।" গাভী উত্তর দিল, "তোমার শক্তির বদলে। আমাকে যদি জয় করতে পার, তাহা হইলেই দুধ পাইবে, তাহা হইলেই তোমার আহরিত তৃণ আমি ভোজন করিব।"

আবার কথক গান গাহিয়া উঠিল, "তোমার শক্তির পরিচয় দিয়া আমাকে নতিস্বীকার করাও, আমাকে জয় কর। তোমার শক্তির বন্ধনে আমাকে বাঁধ, তোমার শক্তির আকর্ষণেই আমার স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন কর, আমাকে জয় কর, হে কাংড়া, শক্তির পরিচয় দাও, আমাকে জয় কর।" এবারও কথকের সহিত শ্রোতারা গাহিতে লাগিল। এবার কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, একবার পুরুষেরা একবার মেয়েরা গাহিতেছে। সঙ্গীতের সহিত মধ্যে মধ্যে হুড়াহুড়ি এবং কলহাস্যধ্বনিও শুনা যাইতেছে। সন্তর্পণে মাথা আর একটু তুলিয়া দেখিলাম গান নয়, গানের সহিত অভিনয়ও যুক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুরুষদের দিকে দুই হস্তে প্রসারিত করিয়া যখন গান গাহিতেছে 'আমাকে জয় কর, আমকে জয় কর'—তখন পুরুষদের মধ্যে দুই-চারিজন উঠিয়া তাহাদের জয় করিবার জন্যই সচেষ্ট হইতেছে। কলহাস্যধ্বনি এবং হুড়াহুড়ি ইহারই ফল। আবার পুরুষরা যখন উঠিয়া মেয়েদের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া গাহিতেছে—'আমাদের জয় কর, আমাদের জয় কর'—তখন মেয়েরাও তাহাদের আক্রমণ করিতে ছাড়িতেছে না। সমস্ত সভায় একটা আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে।

আমর সর্বাঙ্গও অবর্ণনীয় পুলকে বারংবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলিয়া গান ও অভিনয় থামিয়া গেল। কথক তাহার গল্প আরম্ভ করিল আবার।

কাংড়া বলিল, "তুমি যাহা দাবি করিয়াছ তাহা পাইবে। আমি যাহা দাবি করিয়াছি তাহাও আমি অর্জন করিব।" কাংড়া গাভীর দিকে অগ্রসর হইল, গাভী উর্দ্ধপুচ্ছে পলাইতে লাগিল। গো-শাবকটি কিন্তু কিছুদুর ছুটিয়া আর ছুটিতে পারিল না। কাংড়া তখন তাহাকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইল। গো-শাবককে স্কন্ধে লইয়াৎ পূর্ববৎ বেগে ছুটিতে লাগিল সে। গাভীটি পিছন ফিরিয়া দেখিল যে তাহার বৎসটি কাংড়ার বলিষ্ঠ স্কন্ধের উপর নিরপদে রহিয়াছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। নিশ্চিন্ত হওয়াতে তাহার গতিবেগ আরও বাড়িয়া গেল যেন। কাংড়াও তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিল। কত দিন তাহারা যে ছুটিয়াছিল, তাহার হিসাব রাখিয়াছিল আকাশের সূর্য, চন্দ্র, আর নক্ষত্রেরা। দিনের পর রাত্রি আর রাত্রির পর দিন একে একে আসিল এবং চলিয়া গেল। আশার পর নিরাশা এবং নিরাশার পর নূতন আশা আসিল এবং চলিয়া গেল। অবশেষে তাহারা যে স্থানে উপস্থিত হইল, সে স্থানের চতুর্দিক পর্বতপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশের একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, সেই পথ দিয়া তাহারা এক পর্বত-পরিবৃত উপত্যকায় প্রবেশ করিল। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাংড়া নিমেষের মধ্যে বুঝিতে পারিল আর ছুটিতে হইবে না। গো-বৎসটিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া কাংড়া ছুটিয়া একটি পর্বতের উপর উঠিয়া গেল এবং সেখান হইতে বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ড ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া সেই সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথটি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। গাভী বন্দিনী হইল।

কথক গান শুরু করিল আবার।

"গাভী বন্দিনী হইল। যে পর্বত-দেবতা চিরকাল মানুষের সহায়তা করিয়াছেন, তিনিই কাংড়ার সহায় হইলেন। দুরারোহ দুর্গম হইয়া তিনিই গাভীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। নির্গমনের একমাত্র পথটি বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তরখণ্ডও তিনি দিলেন। সেই পথটি বন্ধ করিবার বুদ্ধিও তিনি জাগাইয়া দিলেন কাংড়ার মস্তিষ্কে। কাংড়ার দুর্দম অধ্যবসায়ে প্রীত হইয়া স্বয়ং পর্বত-দেবতা তাহাকে সাহায্য করিলেন। গাভী বন্দিনী হইল।"

কথক গান থামাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল কিছুক্ষণ। শ্রোতারাও নির্বাক হইয়া রহিল। প্রকট হইয়া উঠিল কেবল ঝিল্লী-ধ্বনি। সেই ঝিল্লীধ্বনি ভেদ করিা একটা হাম্বারব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল সহসা। কথক সঙ্গে সঙ্গে কথকতা শুরু করিল।

"গাভী বন্দিনী হইল বটে, কিন্তু সহজে ধরা দিল না। কাংড়া ধরিতে গেলেই ছুটিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। সাত দিন সাত রাত্রি অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করিয়াও কাংড়া গাভীর নাগাল পাইল না। গাভী যখন ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে, কাংড়াকেও তখন বসিয়া পড়িতে হয়। কাংড়া দেখিল এভাবে গাভীকে জয় করা যাইবে না। একাধিক লোক থাকিলে হয়তো যাইত, কিন্তু একা সম্ভব নয়। কাংড়া তখন একটা বুদ্ধি বাহির করিল। গাভীকে দেখাইয়া সে তাহার শাবককে প্রহার করিতে লাগিল। প্রহার মানে প্রহারের অভিনয়। বস্তুত শাবকের কোনরূপ আঘাতই লাগে নাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে প্রহার করিয়া কাংড়া অবশেষে শাবকটিকে জড়াইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ঘুমের ভান করিতে লাগিল। যাহা প্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। গভীর রাত্রে গাভীটি চুপি চুপি কাংড়ার কাছে আসিয়া শাবকটিকে শুঁকিয়া শুঁকিয়া দেখিতে লাগিল যে সত্যই সে বাঁচিয়া আছে কিনা। কাংড়া ঘুমায় নাই। গাভীটি নিকটে আসিতেই সে একলম্ফে তাহার স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া বসিল এবং শিং দুইটি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। কাংড়াকে কাঁধে করিয়াই গাভীটি পরমুহূর্তেই ছুট দিল। লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কাঁধ ঝাড়া দিয়া নানাভাবে সে চেষ্টাও করিল কাংড়াকে ফেলিয়া দিতে, কিন্তু পারিল না। কাংড়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার শিং দুইটি ধরিয়াছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে ছুটিয়া গাভী অবশেষে

পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। কাংড়া সবলে তখন তাহার শিং দুইটা ধরিয়া পিছন দিকে টান দিতেই গাভীর মুণ্ডটি পৃষ্ঠের দিকে নীত হইল। তাহার চোখে চোখ রাখিয়া কাংড়া তখন প্রশ্ন করিল, 'বল, এইবার তোমাকে জয় করিয়াছি কিনা।' গাভী উত্তর দিল, 'করিয়াছ। আমি তোমার নিকট হার মানিলাম।' কাংড়া বলিল, 'এইবার তবে আমাকে দুধ দাও। বলিয়া দাও কি করিয়া আমি তোমার দুগ্ধ পান করিব। তোমার শাবক যেভাবে দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, সেই ভাবেই করিব কি?' গাভী বলিল, 'কর। কিন্তু তাহার পূর্বে আমাকে শাবকের কছে লইয়া চল। কারণ শাবকের ওষ্ঠ-স্পর্শ ব্যতিরেকে আমার স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিত হইবে না। আমার স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া গিয়াছে। শাবক পান করিতে আরম্ভ করিলে আবার স্তনে দুগ্ধ আসিবে। আমাকে শাবকের নিকট লইয়া চল।' কাংড়া গাভীকে শাবকের নিকট লইয়া গেল। শাবক আর শাবক ছিল না, তথাপি সে জননীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহার স্তন্যপান করিতে লাগিল। কাংড়াকে সম্বোধন করিয়া গাভী তখন বলিল, 'হে কাংড়া, এইবার তুমি আমার দুগ্ধ পান কর।' গো-শাবকের ন্যায়ই কাংড়া প্রথমে গাভীর দুগ্ধ পান করিয়াছিল। দুগ্ধ পান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তৃপ্ত হইলাম। আজ হইতে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব, তোমার খাদ্য সংগ্রহের ভার লইব, পরিবর্তে তুমি আমাকে দুগ্ধ দিও।' গাভী উত্তর দিয়াছিল, 'দিব। কিন্তু আমাকে একেবারে বন্দিনী করিও না, আমাকে বনে বনে বিচরণ করিবার অধিকার দিও। আমি তোমারই অধীনে থাকিব, কিন্তু একেবারে আমার স্বাধীনতা হরণ করিও না। আমাকে যখন চাহিবে ফাঁদ পাতিও, আমি আসিয়া ধরা দিব। যখন আমার দুগ্ধ চাহিবে আমার পদচতুষ্টয়কে খুঁটিতে বাঁধিয়া দিও, আমি দুগ্ধ দিব। হে কাংড়া, আমি হার মানিয়াছি, কিন্তু আমার স্বাধীনতা একেবারে হরণ করিও না।' কাংড়া বলল, 'বেশ তাহাই হইবে। তোমার যথেচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা আমি হরণ করিব না, কিন্তু আমার দুগ্ধপানের স্বাধীনতাও তুমি হরণ করিও না হে গাভী, শিকারের পিছনে পিছনে ছুটিয়া আমি আর খাদ্য সংগ্রহ করিতে চাহি না, তুমি দুগ্ধ দান করিয়া আমর খাদ্য সমস্যার সমাধান কর। হে গাভী, আমাকে দুগ্ধ দাও—'

কথক গান আরম্ভ করিল।

'হে গাভী, আমাকে দুগ্ধ দাও, দুগ্ধ দাও। জ্যোৎস্নার মত শুভ্র, ঝরনার মতো ফেনিল তোমার দুগ্ধ-ধারায় আমার দুঃখ দূর কর। আমাকে দুগ্ধ দাও। আমি তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে দুগ্ধ দাও, আমি তোমার পূজা করিব, আমাকে দুগ্ধ দাও। তোমার দুগ্ধের শুভ্রতা আমার সমস্ত মলিনতাকে শুভ্র করিয়া দিক, আমাকে দুগ্ধ দাও..."

শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সুড়ঙ্গের মুখটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল, শীতল বাতাস বহিতেছিল, গানের সুরে আমার ক্লান্ত দেহ কখন যে তন্দ্রাচ্চন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতেও পারি নাই। তন্দ্রার ঘোরেও আমি অস্পষ্টভাবে উহাদের সমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছিলাম, মনে হইতেছিল বহু দূর হইতে ঝরনার অস্ফুট কলধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। আমি যেন সেই ঝরনার উদ্দেশে চলিয়াছি, এই ধরনের একটা এলোমোলো স্বপ্নও যেন তন্দ্রার ঘোরে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। আচম্‌কা শ্বাসরোধ হইয়া ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার মুখের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

"কে, কে তুমি?"

"আমি শিলাঙ্গী। তুমি কে?"

শিলাঙ্গী তাড়াতাড়ি গর্তের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রি, চতুর্দিক নির্জন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শিলাঙ্গী বলল, "ও তুমি! এখানে কি করিয়া আসিলে?"

"সুড়ঙ্গ পথে।"

"কেন আসিয়াছ?"

"তোমাকে দেখিব বলিয়া।"

"মিথ্যা কথা। তুমি আমার বাছুর চুরি করিতে আসিয়াছ। কিন্তু বৃথা আসিয়াছ, বাছুর এখানে নাই। সে এমন জায়গায় আছে যে সহজে খুঁজিয়া পাইবে না।"

তাহার সরল চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"বাছুর চুরি করিতে আসি নাই, সত্যই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তোমাকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।"

শিলাঙ্গী নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল আমার কথাগুলি সে বিশ্বাস করিয়াছে।

"অমি তাহা হইলে যাহা চাহিব দিবে?"

নিতান্ত সরলভাবে কথাগুলি বলিয়া সে সোৎসুকে আমার মুখের দিকে আবার চাহিল।

"কি চাও বল, যদি অসম্ভব না হয় নিশ্চয়ই দিব।"

"মোটেই অসম্ভব নয়।"

"কি?"

"তোমাদের ক্ষেতের ঘাস। আমার দুধনী মধুনীকে খাইতে দিব। তুমি যদি দাও, তাহা হইলে রোজ আমাকে কষ্ট করিয়া আর চুরি করিতে হয় না।"

"তুমি কি রোজ চুরি করিয়া আন?"

"রোজ। এখনই তো চুরি করিতে যাইতেছিলাম।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"বল, দিবে?"

তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি তাহাকে পাল্টা আর একটা প্রশ্ন করিলাম। বস্তুত এ বিষয়ে আমার মনে কৌতূহলও কম হয় নাই।

"তুমি আমাদের ক্ষেতে যাও কি করিয়া?"

শিলাঙ্গী সরল সত্য কথাই বলিল। তাহাকে মিথ্যা বলিতে কখনও শুনি নাই।

"আমি সুড়ঙ্গ পথেই যাই। ইঁদুরের মতো আমরা মাটির নীচে গর্ত করিয়াছি। ইঁদুরের গর্তগুলিকে বড় করিয়া লইয়াছি। এই সুড়ঙ্গ পথে গিয়া আমি পাহাড়ের উপত্যকায় উপস্থিত হইব। সেখানে আর একটি সুড়ঙ্গ আছে কিছু দূরে। সেই সুড়ঙ্গটি একেবারে ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছে। এই সুড়ঙ্গটি খরগোশরা করিয়াছিল, তাহারা তোমাদের ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া কচি কচি ঘাস খাইয়া আসিত। আমিই প্রথমে সেটা আবিষ্কার করি, তারপর ঝোনঝিরা, রাঠা, বানন্দা এবং আরও অনেকে মিলিয়া গর্তটাকে বড় করিয়া দিয়াছে, এখন বেশ সহজে যাওয়া যায়। আমি রোজ যাই।"

আমি অবাক হইয়া শিলাঙ্গীর কথা শুনিতেছিলাম। আমাদের সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়া এই তস্করী প্রত্যহ আমাদের খাদ্য চুরি করিয়া আনে এবং তাহা এমনভাবে বলিতেছে যেন তাহা কোনও অন্যায় কার্য নহে! পরে জানিয়াছিলাম, তাহার ন্যায়-অন্যায়ের বোধটা একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

"কাজটা কি ভাল কর?" তাহার কথা শেষ হইবামাত্র আমি আবার প্রশ্ন করিলাম।

"কোন্ কাজটা—"

"এমন ভাবে আমাদের ঘাস চুরি করিয়া আনা!'

"চুরি করিয়া না আনিলে দুধনী মধুনীকে খাওয়াইব কি করিয়া? তুমি আমাকে যদি রোজ কিছু কিছু দাও, আমি আর চুরি করিব না। দিবে?"

"ওই ক্ষেত যদি আমার একার হইত, নিশ্চয় দিতাম। কিন্তু উহা যে সকলের। সকলের মত না লইয়া কি করিয়া দিব বল? আমাদের দলপতি ধবলকে যদি তোমাদের দলপতি গিয়া বলে এবং সে যদি রাজী হয়, তাহা হইলে নিয়মিতভাবে ঘাস পাইবে। কোন গোলমাল হইবার সম্ভবনা নাই।"

"রোহা কাহারও নিকট ভিক্ষা করে না। আমার দুধনী মধুনীর জন্য, কেনই বা সে নিজেকে নীচু করিবে? আমি যদি তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি, সে কি রাজী হইবে?"

"বোধ হয় না। একটুকরা ঘাসও সে নষ্ট করিতে চায় না। উহাই যে আমাদের খাদ্য। উহার বীজ আমরা সংগ্রহ করিয়া রাখি—"

"আমি বলিব অন্যায় কর। যাহা গরুর খাদ্য তাহাকে যদি তোমরা নিজেদের খাদ্যে পরিণত কর, গরুরা কি খাইবে?"

প্রশ্নটা এভাবে কোনও দিন ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করি নাই। তবু উত্তর দিলাম, "গরুরা কি খাইবে বা পাখীরা কি খাইবে, তাহা তো আমাদের সমস্যা নয়, তাহা লইয়া আমরা কখনও মাথা ঘামাই নাই। আমরা কি খাইব, সেই সমস্যা সমাধান করিতেই আমরা ব্যস্ত।"

"তোমরা কি মাংস খাও না।?"

"খাই বই কি। কিন্তু আমাদের দলে কত লোক, অত মাংস পাইব কোথায়?"

"আমরা যাহা করি, তাহাই করিলে পার। আমরা মাংস খাই, গরুর দুধও খাই। আমরা ঘাস খুঁজি গরুকে খাওয়াইব বলিয়া। তোমরা যখন আস নাই, তখন কন্যা নদীর তীরে আমাদের গরুরা আনন্দে চরিয়া বেড়াইত। তোমরা আসাতে মুশকিল হইয়াছে। বাধ্য হইয়া চুরি করিতে হইতেছে। আচ্ছা গরুর বেলায় আমরা যাহা করি, তোমরা তাহা করিলেও তো পার।"

"কি?"

"কোনও গরুর সব দুধটা আমরা খাই না, বাছুরের জন্যও রাখিয়া দিই, কারণ গরুর দুধ তো বাছুরে জন্যই, তোমরাও তাই কর না। ঘাস তো গরুর জন্যই, গরুর জন্য কিছু ঘাস তোমরা ছাড়িয়া দাও। তোমাদের দলপতিকে আমি যদি গিয়া বলি, তিনি কি রাজী হইবেন না?"

"তুমি বলিলে হইবেন না। তোমার বাবা রোহা যদি যান, তাহা হইলে কি করিবেন বলা যায় না। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে একজন দলপতির অনুরোধ আর একজন দলপতি উপেক্ষা করেন না। তোমার বাবাকে একদিন আসিতে বল—"

"রোহা কখনও কাহারও কাছে ভিক্ষা করিবে না। সে আমাদের কন্যা নদীর তীরে যাইতে বারণ করিয়া দিয়াছে। আমাদের গরুরা এখন নিগম বনে আছে, সেখানে খাদ্যেও অভাব নাই, আমরা কয়েকজন লুকাইয়া তোমাদের ক্ষেতে যাই আমাদের নিজেদের প্রিয় গরুগুলির জন্য ঘাস আনিতে। আমি যাই দুধনীর জন্য। ঝোনঝিরার একটি প্রিয় ষাঁড় আছে পিঙ্গল, ঝোনঝিরাও তাহার জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের ক্ষেতে গিয়া ঘাস আনে। বানন্দা রাঠাও যায়। তাহাদেরও নিজের গরু আছে। চার-পাঁচটি গরুর মতো ঘাস তুমি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে না?"

আমি মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী সোৎসুকে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিলাঙ্গীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে আমি খুবই আনন্দিত হইতাম। কিন্তু তাহা অসম্ভব ছিল। ধবলের অজ্ঞাতসারে এ ধরনের কিছু করিবার কল্পনাও আমরা করিতে পারিতাম না।

ধবলকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিলেও কিছু হইবে না, তাহাও আমি জানিতাম। খানিক্ষণ মাথা চুলকাইয়া তাই সত্য কথাটাই বলিতে হইল।

"আমি কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিব না।"

"তবে যে বলিলে আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে?"

"সে কথা মিথ্যা নয়। সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে? তোমাকে দেখিতেই এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমাকে বর্শা ছুঁড়িয়া মায়িা ফেলিতে পার, তাহা জানিয়াও আসিয়াছি।"

"তুমি যদি আমার বাছুর চুরি না করিতে আমি বর্শা ছুঁড়িতাম না। শুধু শুধু তোমাকে মারিতে যাইব কেন! তবে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সহিত বোধ হয় যুদ্ধই করিতে হইবে। ঝোনঝিরার তাহাই ইচ্ছা, সে তোমাদের কন্যা নদীর তীর হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়। তোমাদের বিরুদ্ধে সে একটা দল গঠন করিতেছে। রোহাকেও একথা বলিয়াছে। কিন্তু রোহা এখনও সম্মতি দেয় নাই। রোহা কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চায় না। কিন্তু ঝোনঝিরা যদি ক্রমাগত রোহাকে বলিতে থাকে, তাহা হইলে সে একদিন হয়তো রাজী হইয়া যাইবে। নিগম বনে এখন গরুদের প্রচুর খাদ্য আছে, সে খাদ্য যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন রোহাকে রাজী হইতে হইবে, কন্যার নদীর তীরে তখন গরুর দলকে লইয়া না গেলে তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? তাই বলিতেছি ভাল ভাবে আমাদের সহিত যদি একটা রফা করিয়া ফেল, তাহা হইলে উভয় পক্ষই শান্তিতে থাকিতে পারিবে, তাহা না হইলে যুদ্ধ অনিবার্য।"

"বেশ, আমি আমাদের দলপতি ধবলকে একথা বলিব। চেষ্টা করিব যাহাতে সে তোমাদের কিছু ঘাস দিতে রাজী হয়।"

"এখান হইতে তাহা হইলে সর, আমি যাই।"

"কোথায়?"

"এই সুড়ঙ্গে ঢুকিব। এখন তোমাদের ক্ষেতের প্রহরীরা ঘুমাইতেছে, এই সময় চুরি করিবার সুযোগ।"

"আমি যদি তোমাকে বাধা দিই?"

"আমি জানি, তুমি দিবে না।"

"দিব না! কেন?"

"তুমি বলিতেছ, আমাকে তোমার ভাল লাগিয়াছে।"

মুচকি হাসিয়া সে সুড়ঙ্গে গিয়া ঢুকিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

...গর্তের অপর প্রান্তে যখন উপনীত হইলাম তখন প্রভাতের আর বেশি দেরি নাই, পূর্ব দিগন্তে ঊষার রক্তিমাভা দেখা যাইতেছে। অন্ধকার সরিয়া গিয়াছে। চন্দ্র অস্তমিত। ঝিল্লী-ধ্বনিও নাই। একটা তীব্র হাওয়ায় সমস্ত উপত্যকা আলোড়িত হইতেছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শিলাঙ্গীকে দেখিতে পাইলাম না। যতক্ষণ সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণও তাহার নাগাল এমন কি সাড়া-শব্দ পর্যন্ত পাই নাই। অতিশয় দ্রুতগতিতে সে আগাইয়া গিয়াছিল। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিব। কোন সুড়ঙ্গ দিয়া সে আমাদের মাঠের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সেই গাছে উঠিয়া আমার ধনুর্বাণ পাড়িয়া আনিলাম এবং সেই ঈষৎ অন্ধকারে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বারংবার মনে হইতে লাগিল ওই কিশোরী মেয়েটির নিকট আমি পরাজিত হইয়া গিয়াছি।

...সহসা নিনানির কথা মনে পড়িল। মনে হইল সে হয়তো আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকার ক্রমশঃ স্বচ্ছতর হইতেছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম যদি পাহাড়ী ছাগল দেখিতে পাই, কিন্তু একটাও দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও দেখা

গেল না। নিনানির আবদার-মাখা মুখটা মনে পড়িল। তাহার বাসনা কখনও অপূর্ণ রাখি নাই। শিলাঙ্গীর আবির্ভাবে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও শিলাঙ্গীকে আর সেদিন দেখিতে পাইলাম না। নিজেদের আস্তানার অভিমুখেও রওনা হইলাম অবশেষে।

...নিনানি পথের ধারেই অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া আগাইয়া আসিল।

"তোমার এত দেরি হইল যে—"

"পাহাড়ী ছাগল খুঁজিতেছিলাম।"

"আন নাই তো একটাও!"

"পাইলাম না। কাল পাহাড়ী ছাগল একটাও বাহির হয় নাই।"

"ঘিসু কিন্তু দুইটা ছাগল কাল মারিয়া আনিয়াছে।"

"ঘিসু? সে কখন গিয়াছিল?"

"তুমি যাইবার একটু পরেই। তুমি আমার জন্য ছাগল মারিতে গিয়াছ শুনিয়া সে কি স্থির থাকিতে পারে?"

নিনানির চোখে-মুখে একটা দুষ্ট হাসি চকমক করিয়া উঠিল।

"কাল সমস্ত রাত্রি কোথায় ছিলে?"

"একটা গাছের উপর।"

"একা ছিলে?"

"দ্বিতীয় ব্যক্তি কোথায় পাইব?"

"মনে হইতেছে সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে—"

"তাই নাকি! জাগিয়াই ছিলাম, ভাল ঘুম হয় নাই।"

"তোমার জন্য কিছু ছাগলের মাংস রাখিয়াছি, চল, আগে সেটা খাইয়া লও। ঘিসু জানিতে পারিলে আর থাকিবে না।"

"ঘিসুর মাংস ঘিসুই খাক, আমার প্রয়োজন নাই।"

নিনানির মুখে আবার সেই দুষ্ট হাসিটা ফুটিয়া উঠিল।

"ঘিসুকে দিলেই ঘিসু খাইবে, কিন্তু আমার ইচ্ছা তুমি খাও।"

নিনানি আমার দিকে একটু ঢলিয়া এক হাত দিয়া আমার কোমরটা জড়াইয়া ধরিল। নিনানি এরূপ করিলে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিতাম। আমার ভয় হইত যদি ধবল দেখিতে পায় মুশকিলে পড়িব। আইনত যদিও ধবলের স্ত্রীর উপর আমার অধিকার ছিল, নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য যাহাতে না হয় সে বিষয়ে ক্রমশঃ আমরা সচেতন হইতেছিলাম। নিনানি কিন্তু ধবলকে অপমান করিবার জন্যই যেন যখন তখন আমাকে জড়াইয়া ধরিত। দলপতির বিশেষ অধিকারের জোরে বৃদ্ধ ধবল নিনানিকে বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। এ কথাটা নানা ছলে নিনানি ধবলকে জানাইয়া দিতে ছাড়িত না। মুশকিলে পড়িতাম আমি। কারণ দলপতির বিরাগভাজন হইয়া থাকা নিরাপদ ছিল না।

"কোমরটা ছাড়। ধবল যদি দেখিতে পায়—"

"পাইলেই বা। আমি যতক্ষণ আছি ধবল তোমার কিছু করিতে পারিবে না।"

"তবু ছাড়। ঘিসুকে চটাইয়াও লাভ নাই।"

"আসল কথাটা বলিতেছ না কেন?"

"কোন্ কথাটা?"

"আমাকে তোমার ভাল লাগিতেছে না। কাল পাহাড়ে অনেক ছাগল নামিয়াছিল, ইচ্ছা

করিলেই তুমি মারিয়া আনিতে পারিতে। কিন্তু কাল তুমি অন্য ব্যাপারে মাতিয়াছিলে, আমার কথা মনে ছিল না।"

"কি যা-তা বলিতেছ?"

"ঠিকই বলিতেছি।"

নিনানির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। যদিও সে হাসিতেছিল, কিন্তু সে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎচমক দেখিয়া বুঝিলাম তাহার মনের ভিতর অগ্নিগর্ভ মেঘ জমিয়াছে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর স্থির করিলাম সমস্ত ঘটনাটা নিনানির কাছে গোপন করা সমীচীন হইবে না। তাহাকে খানিকটা অন্তত বলা উচিত।

"চুপ করিয়া আছ যে"—নিনানিই আবার প্রশ্ন করিল।

"ভয় হইতেছে সত্য কথা বলিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না।"

"ভণিতা ছাড়িয়া কি বলিতে চাহ বল।"

"কাল আমি আবিষ্কার করিয়াছি যে উন্নগা পাহাড়ের অপর পারে একটা অদ্ভুত জাতি বাস করে। আমাদের মতো তৃণবীজ খাইয়া থাকে না, গরুর দুধই তাহাদের প্রধান খাদ্য।"

"গরুর দুধ? পায় কি করিয়া?"

"ফাঁদ পাতিয়া গরুকে, ধরে, তাহার পর তাহার বাঁট হইতে দুধ টানিয়া বাঁশের কেঁড়েতে ভরিয়া লয়। সেই দুধ তাহারা পান করে।"

"বল কি! কি করিয়া তুমি উহাদের সন্ধান পাইলে?"

এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইলাম। শিলাঙ্গীর কথাটা নিনানিকে বলিবার ইচ্ছা ছিল না। বলিলাম, "ছাগলের খোঁজে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ দেখিলাম। কৌতূহল হইল ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি কি আছে। আশা করিয়াছিলাম, শজারু শশক অথবা শৃগালের সন্ধান পাইব। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইহা মনুষ্য চলাচলের পথ। সেই পথ অনুসরণ করিয়া অবশেষে পর্বতের অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বিরাট এক সভায় একজন কথক কথকতা করিতেছিল। সে কথকতা অতি চমৎকার। সেই কথকতার মধ্যেই উহাদের পরিচয় পাইলাম। উহাদের পূর্ব-পুরুষ কাংড়া পাতাল হইতে উঠিয়াছিল একটি প্রস্তর ভেদ করিয়া। তাহার ঠিক পাশেই ছিল আর একটি গর্ত। সেই গর্ত হইতে উঠিয়াছিল একটি সদ্যপ্রসূত গাভী ও তাহার বৎস। কি করিয়া কাংড়া সেই গাভীকে বশ করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ কথক কখনও বক্তৃতা করিয়া, কখনও গান করিয়া বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই সভায় আর একটি ভয়ানক কথাও শুনিলাম। উহারা শীঘ্রই নাকি আমাদের আক্রমণ করিবে।"

"কেন?"

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। যে-কোনও প্রকার হুজুগে মাতিবার জন্য নিনানি সতত উৎসুক হইয়া থাকিত।

"তাহাদের গরুর জন্য ঘাস চাই। পূর্বে তাহাদের গরুরা কন্যা নদীর তীরে চরিত, এখন আমরা সেখানে ঘাস বুনিয়াছি। হয় তাহাদের গরুর ঘাস দিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে।"

"আমরা ঘাস দিব না। যুদ্ধ করিব। আমাদের সহিত উহারা পারিবে কি?"

"চল, ধবলের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা যাক।"

"ইহাতে আবার পরামর্শ করিবার কি আছে? যুদ্ধই করিতে হইবে এবং সে যুদ্ধে আমরা জিতবই। আমাদের দলের মেয়েরা যদি পবিত্রভাবে অগ্নিপূজা করিয়া যুদ্ধের নাচ নাচিতে

পারে, কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাদের হারাইয়া দেয়। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধের কথা মনে নাই?"

"আমরা অল্পদিন মাত্র এখানে আসিয়াছি। এ অঞ্চলের পথ-ঘাটও আমাদের ভাল করিয়া চেনা হয় নাই, এ অবস্থায় যুদ্ধ করাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

"উহাদের হুমকি সহ্য করিয়া থাকাটাও কি বুদ্ধিমানের কাজ হইবে? আজ যদি উহাদের ঘাস দাও, কাল জমি চাহিবে।"

"দেখাই যাক না কি করে! তবে উহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। ধবল কি বলে শোনা যাক।"

"ধবল যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। কারণ সে বুড়া হইয়াছে। তোমরা তাহার কথায় সায় দিও না। অপমান আমরা সহ্য করিব না।"

নিনানি যদিও একটু আদুরে আবদেরে গোছের ছিল, কিন্তু উত্তেজিত হইলে সে ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিত। খঞ্জনদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন নিনানি কুঠার ও বর্শা লইয়া রণক্ষেত্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে কোমল ও কঠিনের একটা অদ্ভুত সমন্বয় আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সেই জন্যই নিনানিকে চটাইতে সাহস করিতাম না।

তাহার প্রশ্নের উত্তরে তাই বলিলাম, "ঠিকই তো, অপমান সহ্য করিতে যাইব কোন্ দুঃখে? তবে ধবল যখন আমাদের দলপতি, তাহার অভিজ্ঞতা যখন আমাদের অপেক্ষা অধিক, তখন তাহার মতামত আমাদের শুনিতেই হইবে।"

"তবে তাই শোন গিয়া। ওখানে আবার ভিড় জমিয়াছে দেখিতেছি।" আমরা আমাদের আস্তানার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম ধবলের কুটিরপ্রাঙ্গণে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। তাহাদের ঠিক মধ্যস্থলে শালপ্রাংশু মহাভুজ এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে কি যেন বলিতেছে। কাছে গিয়া দেখিলাম লোকটি আগন্তুক, তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিতেছি বলিয়া মনে হইল না।

লোকটি ধবলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল, "আমাদের দলপতি উলম্ভন এই সমস্ত প্রদেশের অধিপতি। এ প্রদেশের সমস্ত নদী, বন, পর্বত, জমি, পশুপক্ষী তাহার অধিকারভুক্ত। উলম্ভনের প্রপিতামহ বন্‌জিরা নিজের বাহুবলে একদা এই সমস্ত অঞ্চলে একাধিপত্য করিয়া বেড়াইত। তাহারই বংশধর উলম্ভন এখন সরসরা নদীর তীরে বাস করিতেছে। উলম্ভনের আদেশ অনুসারে আমি তোমাকে বলিতে আসিয়াছি যে কন্যা নদীর তীরে এতদিন কেহ বসবাস করিতে আসে নাই বলিয়াই ইহা অনধিকৃত ছিল, তোমরা আসাতে উলম্ভন অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে, তোমরা কৃষিকর্ম করিয়া এখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কর ইহাই উলম্ভনের ইচ্ছা। কিন্তু একটি শর্ত আছে। তোমাকে উলম্ভনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।"

"বশ্যতা স্বীকার? সে আবার কি?"

ধবল সত্যই ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই। আমরা কেহই পারি নাই। দীর্ঘকায় লোকটি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "এ প্রদেশের সকল লোকই উলম্ভনকে দলপতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে।"

"তাহাতে আমাদের লাভ?"

"লাভ আছে। তোমরা যদি কোনপ্রকার বিপদে পড়, উলম্ভন সদলবলে আসিয়া তোমাদের সাহায্য করিবে। উলম্ভন বিপদে পড়িলে তাহাকেও তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে। ইহারই নাম বশ্যতা স্বীকার। অবশ্য ইহার পরিবর্তে তোমাদের উলম্ভনকে মধ্যে মধ্যে কিছু উপহারও প্রেরণ করিতে হইবে!"

"কি উপহার?"

'পশুপক্ষী শিকার করিয়া পাঠাইতে পার। তোমাদের তৃণবীজ দিতে পার। প্রয়োজন হইলে তোমাদের বাড়তি যুবক-যুবতীদের দান করিতে পার।"

ধবল নির্বাক হইয়া রহিল। আগন্তুক ভীষণদর্শন এবং বলিষ্ঠ, তাহার কথা, বলিবার ভঙ্গীও স্পর্ধা-ব্যঞ্জক, সহসা তাহর প্রতিবাদ করা নিরাপদ নহে ভাবিয়াই সে চুপ করিয়া ছিল। ভিড় ঠেলিয়া নিনানি কিন্তু আগাইয়া গেল এব আগন্তুকের মুখের দিকে নির্ভয়দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আমরা যদি বশ্যাতা স্বীকার না করি উলম্ভন কি করিবে?

আগন্তুক নিনানির দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "উলম্ভন কি করিবে তাহা উলম্ভনই জানে। আমি তাহার আদেশ তোমাদের শুনাইয়া দিলাম। তোমরা প্রত্যুত্তরে যাহা বলিবে তাহাও তাহাকে গিয়া বলিব। তবে এটা ঠিক, তোমরা যদি বশ্যতা স্বীকার না করিতে চাও, উলম্ভন তোমাদের সহিত শত্রুতা করিবে, অবশেষে তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

নিনানি বলিল, "বেশ, আমরা উলম্ভনের সহিতই গিয়া এ বিষয়ে আলাপ করিব। উলম্ভনের নিকট আমাদের প্রতিনিধি যাইবে। তুমি যখন এ বিষয়ে সঠিক কিছুই বলিতে পারিতেছ না তখন তোমার সহিত আলাপ করিয়া লাভ নাই। তুমি আসিয়াছ ইহাতে অবশ্য আমরা খুবই অনন্দিত হইয়াছি। এস, আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সমাদর করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই, তবু যাহা আছে তাহা দিয়াই তোমাকে অর্ভ্যর্থনা না করিব।"

নিনানি চিরদিন সপ্রতিভ। সকলে যেখানে ইতস্তত করে, নিনানি সেখানে আগাইয়া গিয়া স্পষ্ট কথা সহজভাবে বলিতে পারে। ধবল পর্যন্ত তাহার ভয়ে ভীত। পাছে নিনানি অপর কাহাকেও বিবাহ করিয়া সমস্ত দলের উপর কর্ত্রীত্ব করে সেই আশাঙ্কাতেই ধবল তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল। নিনানি অপরাজিতা বংশের মেয়ে। আমাদের দলের কলঞ্জা দূর দেশ হইতে একদা তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই নিনানিকে বিবাহ করিতে উৎসুক ছিলাম কিন্তু ধবল অবশেষে তাহাকে দাবি করিল বলিয়া আমরা বঞ্চিত হইলাম। বস্তুতঃ নিনানিই আমাদের দলের প্রাণ ছিল। ধবল দলপতি ছিল বটে, কিন্তু নিনানির ইচ্ছাতেই সমস্ত হইত। নিনানির দিকে চাহিয়া ধবল মৃদু হাস্যসহকারে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে লাগিল। ভাবটা আমার মনের কথাগুলি তুমি ঠিক গুছাইয়া বলিয়াছ!

আগন্তুক নিনানির মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। নিনানির বক্তব্য শেষ হইলে বলিল, "তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পূর্বে তুমি কে তাহা জানিতে পারি কি?"

"আমি? ইহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেই জানিতে পারিবে?"

নিনানি মৃদু হাস্যসহকারে আমাদের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কুরঙ্গীর মতো লীলায়িত গতিতে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ঘিসু আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিল।

"নিনানি আমাদের দলপতির প্রিয়তমা পত্নী।"

"ও। তাহা হইলে তো আমি পরম সম্মানিত হইলাম। নিশ্চয় উহার আতিথ্য গ্রহণ করিব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

ধবল সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমরা সকলে নিনানির ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...শালপাতার উপর কিছু তৃণবীজ-চূর্ণ, আগুনের ঝলসানো ছাগলের রাং, নারিকেলের

খোলে কিছু মধু, কন্দ ও ফল সাজাইয়া দিয়া নিনানি আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিল। নিনানির অভ্যর্থনা পদ্ধতিতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আগন্তুক সমস্ত খাদ্যগুলি একে একে পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটু একটু করিয়া তুলিয়া বলিল, "আপনারা অগ্রে আহার করুন, তাহার পর আমি আহার করিব। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের গৃহে যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তাহার অগ্রভাগ অন্নদাতাকে না খাওয়াইয়া আমরা খাইতে পারি না। ইহাই আমাদের নিয়ম। আপনারা খাদ্যগুলি গলাধঃকরণ করুন, তাহার পর আমি খাইব।"

নিনানি বলিল, "ইহাই যদি আপনাদের নিয়ম হয়, সে নিয়মের মর্যাদা আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা করিব। কিন্তু এই নিয়মের পশ্চাতে যে অবিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা আমাদের সম্মানকে আঘাত করিতেছে। অতিথিকে বিষপ্রয়োগ করিয়া হত্যা করিবার প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। যাই হোক, আপনাদের নিয়ম আপনি পালন করুন। আমাকেও কিছু দিন—"

নিনানি দুই হস্ত পাতিয়া আগন্তুকের মুখের উপর তাহার ব্যঙ্গদীপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। আগন্তুক নিনানির প্রসারিত হস্তে একটু মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আমাকে ব্যঙ্গ অথবা ভর্ৎসনা করা বৃথা, কারণ আমি আমাদের দলপতি উলম্ভনের নির্দেশ পালন করিতেছি মাত্র।"

"ঠিক ঠিক।"

ধবল সোৎসাহে তাহাকে সমর্থন করিল।

নিনানি নিপুণতার সহিত মধু চাটিতে চাটিতে প্রশ্ন করিল, "তোমার নামটি জানিতে পারি কি?"

"আমার নাম গজন্ধর।"

গজন্ধর উবু হইয়া বসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল এবং যতক্ষণ আহারে ব্যাপৃত রহিল, একটি কথা বলিল না। আহারান্তে ধবলের দিক চাহিয়া মন্তব্য করিল, "বহুদিন এ ধরনের খাদ্য আহার করি নাই। আহার করিতে করিতে মনে হইতেছিল, আবার যেন শৈশবে ফিরিয়া গিয়াছি।"

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত ধবল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতেছিল। আমরাও ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

নিনানি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "আমি তো পূর্বে বলিয়াছিলাম, প্রতাপশালী উলম্ভনের প্রতিনিধিকে সম্যকরূপে সম্বর্ধনা করিবার মতো উপকরণ আমাদের নাই। এখন কি কি দ্রব্য কি ভাবে ভক্ষণ করা তোমার অভ্যাস তাহা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে তদনুযায়ী আয়োজনের চেষ্টা করিব।"

গজন্ধর বলিল, "আমরা এই সব জিনিসই আহার করি, কিন্তু আমরা রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। মাটির পাত্র প্রস্তুত করিবার রীতি আমাদের মধ্যে বহুকাল পূর্বে প্রচলিত হইয়াছে। সেই সব মাটির পাত্রে আমরা তৃণবীজ সিদ্ধ করিয়া খাই। শাক-পাতা, কন্দ, ফল-মূলও সিদ্ধ করি। মাংসও সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য ও সুস্বাদু হয়। তোমরা যদি উলম্ভনের নিকট যাও, সবই দেখিতে পাইবে।"

"আমরা যাইব"—ধবল সোৎসাহে বলিল।

"তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাইতে চাও, তাহা হইলে অদ্যই সন্ধ্যার পর যাত্রা করিতে হইবে। কারণ আগামীকল্য সন্ধ্যায় উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিব এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছি।"

ধবল ঘিসুর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঘিসু, তুমি আমি এবং ভঙ্গা চল যাই।"

ঘিসু এবং ভঙ্গা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আপত্তি করিল না। আমার ভয় হইতেছিল,

পাছে ধবল আমাকেও যাইতে বলে। কিন্তু বলিল না। বলিলে মুশকিলে পড়িতাম, কারণ সেই রাত্রেই আমি শিলাঙ্গীর সহিত সাক্ষাৎ করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কি ভাবে যে তাহার সাক্ষাৎ পাইব তাহা জানিতাম না, কিন্তু তবু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম যে নিশ্চয়ই তাহার দেখা পাইব।

গজন্ধর নিনানির দিকে চাহিয়া বলিল—"দলপতির প্রিয়তমা পত্নীও যদি স্বামীর সঙ্গে গমন করে, উলম্ভন অতিশয় প্রীত হইবে।"

"বিনা আমন্ত্রণে আমি কোথাও যাই না।", নিনানি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

"আমি তো আমন্ত্রণ করিতেই আসিয়াছি। আমি সাদর নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিতেছি।"

ধবল ভীত হইয়া পড়িল। নিনানিকে লইয়া গজন্ধরের দেশে যাইবার সাহস তাহার ছিল না।

সে তাড়াতাড়ি বলল, "আমরা দুইজন অনুপস্থিত থাকিলে এখানে কাজের ক্ষতি হইবে।"

আমাদের দলের সমস্ত নারীরা একত্রিত হইয়া গজন্ধরকে দেখিতেছিল। গজন্ধর তাহাদের দিকে দেখাইয়া বলিল, "এতগুলি স্ত্রীলোক তো রহিয়াছে ইহারা কি দুই-চারি দিনের জন্য কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে না?"

ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি আগাইয়া আসিয়া বলিল, "নিনানি যখন আসে নাই তখন সমস্ত কাজ আমিই তো নির্বাহ করিতাম। জমির সমস্ত কাজ এখনও আমিই চালাই।"

নিনানি হাসিয়া বলিল, "এসব আলোচনা অতিশয় অবাস্তব। আমাদের দলপতির সহিত উলম্ভন কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। উলম্ভনের সহিত আমাদের শত্রু-সম্পর্ক অথবা মিত্র-সম্পর্ক হইবে, তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এ অবস্থায় আমি তোমার সহিত যাইতে পারি না। উলম্ভন যদি আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে তখন তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করিব।"

গজন্ধর ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে।"

...সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে গজন্ধরের সহিত ধবল, ঘিসু ও ভঙ্গা চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে আমাদের প্রথামতো আমাদের কুলদেবতা নিম্ববৃক্ষের নিকট তিনটি পারাবত বলি দেওয়া হইল। বলি দিবার জন্য আমরা বন্য পারাবত ধরিয়া রাখিতাম। ইহা ব্যতীত প্রত্যেকের গলায় এবং হাতে কুমীর এবং কাছিমের হাড়ের টুকরাও বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে কুমীর এবং কাছিম যেমন আত্মরক্ষায় দক্ষ, কেহ যদি তাহাদের অস্থি অঙ্গে ধারণ করে, সেও অনুরূপ দক্ষতা লাভ করিবে। কেহ বিদেশে গেলে আমরা তাহাদের গলায় ও হাতে তাই কমীর এবং কাছিমের হাড় বাঁধিয়া দিতাম। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কুমীর এবং কাছিমের হাড়ও সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ধবল, ঘিসু এবং ভঙ্গা অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর লইয়া গেল। তাহারা যখন চলিয়া গেল, তখন হইতে ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচি, ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভঙ্গার প্রবীণা পত্নী সাংরা উপবাস করিতে লাগিল। তাহাদের স্বামীরা না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহারা অন্ন গ্রহণ করিবে না—ইহাই আমাদের নিয়ম ছিল। তাহারা চলিয়া যাইবার পর নিনানি আর একটা কাজও করিল। আমাদের দলে চন্মনা নামে একটি দুঃসাহসিক যুবক ছিল। নিনানির আদেশে সে ধবল, ঘিসু ও ভঙ্গার অনুসরণ করিল। নিনানি তাহাকে বলিল, "তুমি দূরে দূরে উহাদের অনুসরণ করিবে। উহাদের গতিবিধি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিবে। গজন্ধরের আচরণে যদি কোনও প্রকার দুরভিসন্ধির প্রমাণ পাও, কিংবা ধবল, ঘিসু বা ভঙ্গার যদি কোনও বিপদ হইয়াছে বোঝ তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাদের খবর দিও। সর্বদা সজাগ থাকিও।" চন্মনা চলিয়া গেল। আমরা সকলেই নিনানির বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। চন্মনা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে আমাদের দলের বিঘাও এমন একটি কাণ্ড করিয়া বসিল

যাহাতে আমরা সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। বিঘাও সহসা মূর্ছিত হইয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে উপদেবতা ভর করিত। ইতিপূর্বে মূর্ছিত অবস্থায় সে একবার আতঙ্কজনক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সেগুলি ফলিয়া যাওয়াতে আমরা তাহার মূর্ছাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ করিবার মতো বুদ্ধি আমাদের তখন ছিল না। প্রথমবার বিঘাও বলিয়াছিল, "জিনার দিন ফুরাইয়াছে। অশ্বত্থদেবতা তাহাকে যদি সাহায্য না করে সে বাঁচিবে না।" জিনা ছিল আমাদের দলের একটি বৃদ্ধা। ভবিষ্যদ্বাণী করিবার কিছুদিন পরে সে মরিয়া গেল। যদি সে না মরিত, বিঘাও নিশ্চয়ই বলিত যে অশ্বত্থদেবতার সহায়তাতেই সে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এভাবে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতাই আমাদের তখন ছিল না। আমরা প্রত্যেকে ভূতপ্রেতের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতাম। শুধু যে তাহাদেরই ভয় করিতাম বা পূজা করিতাম তাহা নয়, যাহার যাহার মুখ দিয়া তাহারা নিজেদের প্রভিপ্রায় ব্যক্ত করিত তাহাদেরও আমরা ভয় করিতাম, তাহাদেরও আমরা সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইতাম। সেযুগে একটা অদৃশ্য প্রবল শক্তির নিকট আমরা সকলে যেন দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কল্পনা কেহ করিতে পারিত না। এইজন্যই নিনানি ধবলকে বিবাহ করিয়াছিল, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দলপতির কথা অমান্য করিলে কানা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে। ধবলের প্রমাতামহ কানা ছিল, তাহার প্রেতাত্মা ধবলের রক্ষণাবেক্ষণ করে ইহা সকলে জানিত এবং মানিত। ক্ষেতে ফসল না হইলে আমরা মনে করিতাম সেই একচক্ষু উপদেবতা রুষ্ট হইয়া আমাদের ফসল নষ্ট করিয়া দিতেছেন। রুষ্ট উপদেবতাকে তুষ্ট করিবার নানাবিধ পদ্ধতি ধবলের জানা ছিল বলিয়াই ধবল আমাদের দলপতি হইয়াছিল। দেবতা কিছুতেই তুষ্ট না হইলে অবশেষে আমরা সে জমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য জমিতে চাষ করিতাম, ভাবিতে পারিতাম না যে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। ধবলের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইত। মনে হইত জমিতে উপদেবতার যে পাপদৃষ্টি লাগিয়াছে তাহা দূর করা মানুষের সাধ্যাতীত। ধবলের অলৌকিক শক্তির উপর আমরা অগাধ বিশ্বাস পোষণ করিতাম। আমাদের দলে এ বিষয়ে ধবলের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিঘাও। কারণ তাহারও অলৌকিক শক্তি ছিল। সুতরাং বিঘাও মূর্ছিত হইয়া পড়াতে আমরা সকলেই খুব ভীত হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্যে প্রেতকে শান্ত করিবার যে উপায়টি সাধারণ লোকে জানিত সে উপায়টিই আমরা অবিলম্বে অবলম্বন করিলাম। বিঘাওকে ঘিরিয়া সকলে মিলিয়া গান করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে সুকণ্ঠী যে সকল রমণী ক্ষেতে কাজ করিতেছিল (তখন মেয়েরাই প্রধানত ক্ষেত্রে কাজ করিত) তাহাদেরও ডাকিয়া আনা হইল। তাহারা নদীতে স্নান করিয়া আসিল এবং আলুলায়িত সিক্ত কেশে বিঘাও-কে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। তারারাই হইল মূল গায়িকা, আমরা সকলে তাহাদের দোহারকি করিতে লাগিলাম। গায়িকাদের মধ্যে নিনানিও ছিল। কিছুক্ষণ গান করিবার পর বিঘাও বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "আমি ধবলের প্রমাতামহ। আমার ইচ্ছা নিনানি সিক্ত কেশ দিয়া আমার পা মুছাইয়া দিক। তাহার পর আমি ব্যক্ত করিব কেন আমি বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়াছি।"

নিনানির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বিঘাওয়ের দুই পায়ে কুষ্ঠের মতো একপ্রকার ঘা ছিল। কেশ দিয়া সেই পা মুছাইয়া দেওয়া সত্যই কঠিন কাজ। কিন্তু যতই কঠিন হউক নিনানি আপত্তি করিতে পারিল না। কোনও প্রেতাত্মার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও তখন ছিল না। মনে মনে থাকিলেও সে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহস পাইত না। আপত্তি করিলে সমস্ত দলের আক্রোশ তাহার উপর গিয়া পড়িবে। সমস্ত দলের হিতাহিত প্রেতাত্মারাই নিয়ন্ত্রণ করে এ বিশ্বাস আমাদের মনে তখন বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং দলের মঙ্গলের জন্য প্রেতাত্মার আদেশ আমাদের সকলকেই শিরোধার্য করিতে হইত। এখনও তোমরা সমাজের হিতার্থে

যেমন অনেক অপ্রিয় আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হও আমরাও তেমনি হইতাম। পরলোকই তখন ইহলোককে শাসন করিত এবং বিঘাওয়ের মতো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোকেরা পরলোকের প্রতিনিধি ছিল।

বিঘাওয়ের রক্ত পুঁজমাখা চরণ দুইটি নিনানি তাহার সিক্ত কেশ দিয়া মুছাইয়া ছিল। তাহার পর সে মূর্ছিত বিঘাওকে প্রশ্ন করিল, "এবার আমি স্নান করিয়া আসিব কি?"

"না। ধবল না ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তুমি তোমার কেশ ধৌত করিবে না।"

আমরা সকলে নির্বাক হইয়া রহিলাম।

বিঘাও বলিতে লাগিল, "তোমার অহঙ্কৃত উক্তিই ধবলকে উলম্ভনকে নিকট যাইতে বাধ্য করিয়াছে। ধবল যতক্ষণ না নিরাপদে ফিরিয়া আসে ততক্ষণ তোমাকে অস্নান থাকিতে হইবে। এইবার আমি কেন আসিয়াছি শুন। আমি সাবধান করিতে আসিয়াছি। তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তোমাদের নিকট সে কবে আসিবে তা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে তোমাদেরই চক্ষু। তাহার পদধ্বনি অভ্রান্তভাবে শ্রবণ করিতে পারে তোমাদেরই কর্ণ। তোমরা চক্ষু-কর্ণ খুলিয়া রাখ, তোমাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া বিঘাও নীরব হইল। আমরা আবার গান গাহিতে লাগিলাম, কারণ তখন পর্যন্ত বিঘাওয়ের মূর্ছা ভঙ্গ হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে বিঘাও আবার বিড়বিড় করিয়া কথা বলিতে লাগিল। "উলম্ভনের সহিত ধবল বন্ধুত্ব করিতে গিয়াছে বলিয়া তোমরা উল্লসিত হইও না। বন্ধুত্ব এবং দাসত্বের প্রভেদ অতি অল্প। স্বাধীনতার মূল্যে বন্ধুত্ব লাভ করিতে হয়, স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া লোকে দাসত্বও বরণ করে। ধবলের স্বাধীন বুদ্ধি যাহাতে আচ্ছন্ন না হয় তাহার জন্য তোমরা নিম্বদেবতাকে রক্তচর্চিত কর। আবার বলিতেছি, চক্ষুকর্ণ খুলিয়া রাখ, রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া তোমাদের সর্বনাশ ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।"

বিঘাও আবার নীরব হইল। নিনানি এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল, এইবার সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারের কোনও ভাষা নাই, তাহা কেবল চীৎকার মাত্র। মনে হইল, আকাশ বাতাস যেন সশব্দে ফাটিয়া গেল। আমরা সকলে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দুই হস্তে তাহার মাথার চুল মুঠি করিয়া ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টিতে মধুর বহ্নি দীপ্তি নাই তাহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অন্তরের স্বতোৎসারিত প্রতিবাদ যেন চোখের ভাষায় বলিতে চাহিতেছে—এ অন্যায় আদেশ আমি মানিব না। চীৎকার করিতে করিতে নিনানিও অজ্ঞান হইয়া গেল। আমরা যন্ত্রচালিতবৎ পুনরায় গান গাহিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—কেহ অজ্ঞান হইয়া গেলে গান গাওয়াই নিয়ম ছিল—আমরা মনে মনে ইহাও প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে নিনানির মুখ দিয়া আমরা হয়তো অন্য কোনও প্রেতাত্মার নির্দেশ শুনিতে পাইব, কিন্তু বিঘাও সহসা বলিল, "উহাকে তোমরা ঘরের ভিতরে লইয়া যাও।" সবিস্ময়ে দেখিলাম, বিঘাও উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার চোখেমুখে এক অদ্ভুত ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার সে হাসি দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। বিঘাওকে আমরা সকলেই ভয় করিতাম। কারণ সে ছিল যাদুকর। যাদুশক্তিবলে সে অঘটন ঘটাইতে পারে এই বিশ্বাস সে আমাদের সকলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ধবলের সহিত তাহার মূলত বিরোধও ছিল এইখানে। ধবলেরও অলৌকিক ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু তাহাকে আমরা ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম, তাহাকে লইয়া উপহাস বিদ্রুপ করিতেও আমাদের বাধিত না, তাহাকে কখনও ভয় করি নাই। কারণ ধবল কখনও নিজের শক্তির আস্ফালন করিত না। এক অদৃশ্য অমোঘ শক্তিকে প্রার্থনা করিয়া সে সমস্ত দলের কল্যাণ সাধন করিত। বিঘাও কিন্তু

নিজেই ছিল শক্তিমান। নিজের যাদুশক্তিবলেই সে যে কোন লোকের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে এই বিশ্বাস থাকাতে আমরা তাহার ভয়ে ভীত হইয়া থাকিতাম। মনে হইত, সে যেন মনুষ্যরূপী সর্প বা ব্যাঘ্র। ধবলকে সে মনে মনে অবজ্ঞা করে ইহাও আমরা জানিতাম। একদা সে গোধিকা-সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল শুনিয়াছিলাম। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে তাহারই অভিশাপে নাকি গোধিকা-সম্প্রদায় মহামারী-রোগে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর পর্যটক মীংরার সহিত ইহার দেখা হয়। মীংরাই ইহাকে আমাদের দলে আনিয়াছিল, ধবলকে বলিয়াছিল, 'বিঘাও শক্তিশালী লোক, ইহাকে দলে রাখিলে অনেক আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, ইহার যাদুশক্তি তুচ্ছ করিবার মতো নহে, ইহাকে আশ্রয় দাও।' মীংরার কথাতেই ধবল বিঘাওকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বিঘাও ধবলকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতেছে। অনেকের কাছে সে বলিল, 'যে লোক নিজে শক্তিমান নয়, কেবলমাত্র প্রার্থনা করিয়া দেবতার শক্তিকে কাজে লাগাইতে চায়, তাহার নেতৃত্ব নিরাপদ নয়। অক্ষম লোককে দেবতা দয়া করেন না, দেবতা কাহাকেও স্বেচ্ছায় দয়া করেন না, নিজের শক্তিবলে দেবতার দয়া আদায় করিয়া লইতে হয়। ধবলের সে শক্তি আছে কি-না সন্দেহ।' তাহার কথাবার্তা আমরা সভয় বিস্ময়ের সহিত শুনিতাম। অনেকের মধ্যে এ ধারণাও হইয়াছিল যে ধবলের পরিবর্তে সে যদি আমাদের দলপতি হয় তাহা হইলে আমরা বোধ হয় নিরাপদ হইব। ধবল কিন্তু এ বিষয়ে সচেতন ছিল না। সে ছিল আনমনা আপন ভোলা লোক। কন্যা নদীর তীরে তীরে আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রধান কাজ। পূর্বেই বলিয়াছি, সে কন্যা নদীর মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিত। তাহার আর একটি আকর্ষণও ছিল। নিনানি। নিনানিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল, নিনানিকে সে ভয়ও করিত, তাই নিনানির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। বিঘাও ঠিকই ধরিয়াছিল। নিনানির সম্মান রক্ষা করিবার জন্যই সে উলগুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। ...নিনানিকে ধরাধরি করিয়া আমরা কুটিরের ভিতর লইয়া গেলাম। কয়েকটি রমণী তাহাকে ঘিরিয়া গান গাহিতে লাগিল। আমিও কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত গান গাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকিতে পারিলাম। না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছে। শিলাঙ্গীর সন্ধানে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

...আকাশে অগণিত নক্ষত্র উঠিয়াছিল। আকাশে যে এত নক্ষত্র আছে নিবিষ্টচিত্তে এমনভাবে 'তাহা বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই, কারণ জীবনে এমনভাবে আর কখনও একাকী আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সুযোগই মেলে নাই। উন্মুক্ত প্রান্তরে ইতিপূর্বে বহুবার শয়ন করিয়াছি, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে কেহ না কেহ থাকিত, তাহাকে লইয়াই মগ্ন থাকিতাম, আকাশের দিকে চাহিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল ধবল উহাদের দিকে চাহিয়া গভীর রাত্রে প্রার্থনা করে, কিন্তু সে প্রার্থনা পৌঁছাইলেও কি তাহারা আমাদের মঙ্গল করিতে সক্ষম? অতগুলি নক্ষত্রের মধ্যে কে আমাদের বন্ধু কে শত্রু তাহা ধবল ঠিক করিতে পারে কি করিয়া? উহারা কত দূরে আছে কে জানে! উহারা আমাদের পরিচিত সূর্যের সগোত্র? সূর্যেরই কি সন্তান-সন্ততি উহারা? তাহা হইলে দিনের বেলা কোথা থাকে! বৃদ্ধা জিনা একটা গল্প বলিত তাহা মনে পড়িল। সে বলিত, সূর্যের দুইটি বিবাহ। তাহার একটি পত্নী দিবস। তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া সে সূর্যকে ছাড়িতে চাহে না, সন্তানকামনায় সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দ্বিতীয় পত্নী রাত্রি, তাহার অনেক সন্তান, সন্তানদের লইয়াই সে এত ব্যস্ত যে সূর্যের দিকে তাকাইবার অবসর পায় না। মাঝে মাঝে কিন্তু সে সূর্যকে দাবি করে। সন্ধ্যায় বা উষায় ঘনঘটা করিয়া ঝড়বৃষ্টি হইলে জিনা বলিত রাত্রির সহিত দিবসের কলহ বাধিয়াছে, রাত্রি দিবসের নিকট হইতে সূর্যকে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে। জিনার গল্পটা বড় ভাল লাগিত, ভাল লাগিত বলিয়াই বোধ হয় বিশ্বাস করিতাম।

বহু জন্ম পূর্বে আর একটা যে গল্প শুনিয়াছিলাম, ধর্ষিতা শবরী ওকার অশ্রুবিন্দুগুলি আকাশের গায়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া জাগিয়া আছে, সে গল্প আর মনে ছিল না। নূতন গল্পে নূতন আস্থা স্থাপন করিয়া নূতন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, বিঘাও যাহা বলে তাহাই হয়তো ঠিক। গাছের শাখা ধরিয়া সজোরে টান দিলেই গাছ অবনত হইতে পারে, প্রার্থনা করিলে হইবে না। বহুকাল পূর্বে রাহুলাও ঠিক এই যুক্তি, অনুসরণ করিয়া বিষের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু সে কথা মনে ছিল না। রাহুলা-জোনাফুদিনকে মনে না থাকিলেও জীবনযুদ্ধের তাড়নায় যুগে-যুগে জন্মজন্মান্তরে বারংবার আমরা যে দুইটি পথের সম্মুখীন হইতেছিলাম সে পথ দুইটিকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ তাহা মানব-সভ্যতার দুইটি দিক অলঙ্কৃত করিয়াছে। কোন্ পথটা সত্য তাহা আজও বোধ হয় সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত হয় নাই। একটি পথ শক্তির, আর একটি ভক্তির। এক পথের পথিক রাহুলা, কাংড়া, বিঘাওরা, আর এক পথের পথিক জোনাফুদিন, ওবুকী, ধবলরা। কখনও রাহুলরা জিতিয়াছে, কখনও জোনাফুদিনরা। কখনও মনে হইয়াছে, পুরুষকারই সত্য, কখনও আবার আমরা দৈবকে সত্যরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সেদিন গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছিল ওই অগণিত নক্ষত্রদলে ক্ষীণকণ্ঠ ধবলের প্রার্থনা কি দিশাহারা হইয়া পড়িবে না? মনে হইতেছিল ধবল বোধ হয় ভুল পথে আমাদের লইয়া চলিয়াছে। মন হইতেছিল শক্তিশালী বিঘাও-ই বোধ হয় চালক হিসাবে অধিকতর সক্ষম। তাহার ক্ষমতা আছে। বৃদ্ধা জিনার মৃত্যু-সংবাদ সে পূর্বেই টের পাইয়াছিল। আজই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম সে অহঙ্কৃতা নিনানির মস্তক তাহার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত চরণের উপর টানিয়া আনিয়াছে। অভিশাপ দিয়া গোধিকা-সম্প্রদায়কে সে ধ্বংস কবিয়া দিয়াছে। তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। ক্ষমতাবান নেতারই তো প্রয়োজন আমাদের। আরও কিছুদিন পূর্বে যদি বিঘাও আসিত তাহা হইলেও আমাদের এত কষ্ট করিয়া কন্যা নদীর তীরে আসিতে হইত না। সে হয়তো মন্ত্রবলে সেই সব জমিকে আবার শস্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিত।

...আমি মাঠের মাঝখানে ঘন ফসলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শুইয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া নানারূপ অসংলগ্ন চিন্তার ধারা মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু একটি চিন্তা অনড় হইয়া মনের কেন্দ্রে বসিয়াছিল। ঠিক চিন্তা নয়, আকাঙ্ক্ষা। মার্জার যেমন মূষিকের গর্তের নিকট ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, আমিও তেমনি আমাদের ক্ষেত্রমধ্যস্থ গর্তটির পাশে ওৎ পাতিয়া শুইয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তে আশা করিতেছিলাম শিলাঙ্গী ওই গর্ত দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আমার সমস্ত অন্তর ওই নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী আয়তনয়না উজ্জ্বল দৃষ্টি সরলা কিশোরীকে ঘিরিয়া যেন স্বপ্নলোকে আরতি করিতেছিল। গরবিনী বুদ্ধিদীপ্ত নিনানির মধ্যে নারীত্বের যে স্বাদ পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহাও অপরূপ, তাহার মাদকতায় আমার সমস্ত সত্তা অভিভূত হইয়া পড়িত, কিন্তু শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল এ রকমটি আর কখনও দেখি নাই। তাহার সরল সাহস, তাহার অকপট সত্যভাষণ, বন্য গাভীর মুখে সবুজ ঘাস তুলিয়া দিবার জন্য দুরূহ অভিযান, সর্বোপরি আমার পৌরুষ সম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য তাহাকে এমন একটা মহিমা দান করিয়াছিল যাহা আমি আর কখনও দেখি নাই। ইচ্ছা করিলে সে আমার পশুপ্রবৃত্তিকে অনায়াসে উত্তেজিত করিতে পারিত কিন্তু সেদিকে তাহার যেন লক্ষ্যই ছিল না। মনে হইতেছিল সে যেন তাহার উৎসুক কৌতুকশীলতা যুক্ত হইয়া এমন একটা অনন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল যে আমার বন্যপ্রকৃতি তাহাকে অধিকার করিবার জন্য অধীর উন্মুখ না হইয়া পারে নাই। আমার প্রকৃতির মধ্যেও একজন উৎসুক বালক বাস করিত। যে কারণে আমি সদ্যোজাত গোবৎসটি লাভ করিবার জন্য আগহান্বিত হইয়াছিলাম ঠিক সেই কারণেই আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। আমার ক্রীড়াপ্রবণ চরিত্র

তাহার মধ্যে একজন ক্রীড়াসঙ্গিনীকে আবিষ্কার করিয়াছিল, যে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ নয়, পাশবিক ক্ষুধার ক্রীড়নক মাত্র নয়, যাহার মন নিত্য নব ঔৎসুক্যে নিত্য নব উৎসাহভরে দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়াই আনন্দলাভ করে।

...কন্যা নদীর পশ্চিম তীরে আমাদের তৃণক্ষেত্রটি উন্নগা পর্বতের পাদমূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরিসরে নিতান্ত কম ছিল না। এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাইত না। এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে শিলাঙ্গীর গর্তটি খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শশক অথবা শজারুর গর্ত অনুসন্ধান করিতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, শিলাঙ্গীর গর্তের মুখ নিতান্ত ছোটও ছিল, একবোঝা সবুজ ঘাস দিয়া মুখটি কে যেন বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিল, যাহা সহসা দেখিলে মনে হয় উহা ক্ষেতের একটা অংশ। বোঝার তৃণগুচ্ছ কিন্তু জীবন্ত তৃণের মতো সতেজ ছিল না, তাহাদের ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়াই আমি সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর চাতুরী আমার নিকট ধরা পড়িয়া যাওয়াতে খুবই কৌতুকবোধ করিয়াছিলাম, ইহাতে তাহাকে পাইবার আগ্রহটা আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছিল।

...রাত্রি কত হইয়াছিল জানি না। অপেক্ষা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর স্পর্শেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল, "আমাকে ধরিবে বলিয়াই এখানে আসিয়া শুইয়াছ নিশ্চয়। কিন্তু আমি যদি চলিয়া যাইতাম তুমি জানিতেও পারিতে না। এই তো তোমাদের পাহারা দেওয়ার নমুনা—"

দেখিলাম শিলাঙ্গী কয়েকটি ছোট ছোট তৃণগুচ্ছ আলাদা আলাদা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার কোমরে একটা বড় লতা জড়ানো ছিল। সেই লতায় তৃণগুচ্ছগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে বাঁধিতে লাগিল।

"অমন করিয়া বাঁধিতেছে কেন?"

"বোঝা বড় হয়ে গেলে গর্তের ভিতর ঢোকে না। এইভাবে বেশ সহজে লইয়া যাওয়া যায়। লতাটা কোমরে বাঁধা থাকে, সুড়ঙ্গের ভিতর আমি যখন বুকে হাঁটিয়া চলি, ঘাসের ছোট ছোট বোঝাগুলি আমার পিছনে পিছনে আসে। আজ দেখিলাম বাছুরটাও একটু একটু ঘাস খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার জন্য কচি কচি ঘাস লইয়াছি কিছু। এই দেখ।"

তিনটি ছোট ছোট ঘাসের বোঝা সে তুলিয়া ধরিল। এমন সহজ আনন্দে সে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল যেন সে আমাদের তৃণশস্য এমনভাবে অপহরণ করিয়া কোনও অন্যায় করে নাই। আমি যে তাহার শত্রুপক্ষ, ইচ্ছা করিলে এখনই যে আমি তাহাকে বন্দী করিতে পারি বা মারিতে ফেলিতে পারি, এসবের আভাসমাত্রও তাহার চোখের দৃষ্টিতে বা কণ্ঠস্বরে ছিল না। পরিচিত বন্ধুর নিকট সে যেন মনের আনন্দে গল্প করিয়া চলিয়াছে। আমার কথায় সে কিন্তু বিস্মিত হইল। আমি বলিলাম, "এ ঘাস কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে দিব না।"

"কেন?"

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার বিস্মিত নয়নযুগল হইতে চন্দ্রালোকও যেন প্রতিফলিত হইয়া নীরব ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল—কেন?

"তুমিই বল না আমাদের ঘাস তোমাকে লইয়া যাইতে দিব কেন? এ ঘাস সাধারণ ঘাস নয়। ইহারা আপনাআপনি হয় নাই। ইহাদের উৎপন্ন করিতে আমাদের মেয়েদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহারা এই বিস্তৃত ভূমি খুঁড়িয়াছে—একবার নয়, বার বার খুঁড়িয়াচে—তাহার পর বীজ বুনিয়াছে। বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহার জন্য উপবাস করিয়া পূজা করিয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে আমরা বেড়া দিয়া সমস্ত মাঠটা ঘিরিয়াছি,

দিবারাত্রি পাহারা দিতেছি। সেই ঘাস তুমি আসিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইবে এ তো অদ্ভুত কাণ্ড!''

আমার কথা শুনিয়া সে একটুও অপ্রতিভ হইল না। বরং তাহার কণ্ঠস্বরে একটা তর্কের সুর ফাটিয়া উঠিল।

''অদ্ভুত কাণ্ড তো তোমরাই করিয়াছ। কোথা হইতে আসিয়া আমাদের গরুদের জমিগুলিতে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া নিজেদের দখল জমাইয়া বসিয়াছ। তাহারা এখন খাইবে কি বল? তুমি কি বলিতে চাও আমার দুধনী মধুনী না খাইয়া মারা যাইবে? এ জমি তাহাদের, এ জমির ঘাসও তাহাদের । তাহারাই জমির আদিম মালিক। তোমরা হঠাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বলিয়া কি তাহাদের দাবি লোপ পাইবে?

আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম, ''যাহার জোর বেশী তাহারই দাবি টিকিবে, গরুর দাবির চেয়ে মানুষের দাবি যে অনেক বেশী একথা কি তুমি জান না?''

''জানিলেও মানিতে রাজী নই''—শিলাঙ্গী হাসিয়া উত্তর দিল, ''তা ছাড়া আর একটা কথাও তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে দাবিটা ঠিক গরুর নয়, দাবিটা মানুষেরই। ওই গরুর দলের পিছনে আমরা আছি। আজ তুমি যদি আমার ঘাস কাড়িয়া লও এবং সে কথা আমি যদি রোহাকে গিয়া বলি, রোহা তোমাদের আসিয়া আক্রমণ করিবে, হয়তো তোমাদের এখান হইতে তাড়াইয়া দিবে। তোমাকে তো বলিয়াছি যে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমি গিয়া যদি আজ বলি—''

''মনে কর তোমাকেই যদি না যাইতে দিই—''

''আমাকে ধরিয়া রাখিবে? বেশ তো!''

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি আগ্রহে আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল। বিপজ্জনক একটা ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত প্রাণশক্তিই যেন উন্মুখ একাগ্র হইয়া উঠিল। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। শিলাঙ্গী একটুও ভয় পাইল না। আমার আশা ছিল ভয় পাইলে সে হয়তো আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। শিলাঙ্গীর প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া আমার এত ভালো লাগিল যে আমি আর কোনও কথা বলিতে পারিলাম না, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার দিকে কেবল চাহিয়া রহিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল—''বেশ চল, তোমাদের দলপতির সহিত আলাপ করিয়া ফেলি। এখন ফিরিয়া যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। চল তোমাদের কাছেই রাতটা কাটাইয়া যাই।''

''ফিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নয় কেন?''

''একটু আগেই যে ভীষণ শব্দ হইল, তাহা শুনিতে পাও নাই?''

''না। কিসের শব্দ?''

শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল।

''বাঘের গর্জনেও তোমার ঘুম ভাঙে নাই। সমস্ত পাহাড়টা কাঁপিয়া উঠিল আর তুমি ঘুমাইতেছিলে! চল তোমাদের দলপতিকে গিয়া বলি যে, তোমার মতো নিদ্রালু লোক যদি ক্ষেত পাহারা দেয় তাহা হইলে ক্ষেতের ফসল একটিও থাকিবে না। আমরাই আসিয়া সমস্ত চুরি করিয়া লইয়া যাইব।''

আমি মনে মনে সত্যই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু বলিলাম, ''আজ আমার পাহারা দেওয়ার পালা নয়, তাই আমি ঘুমাইতেছিলাম। এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম তোমাকে ধরিব বলিয়া।''

''কিন্তু আমি তোমাকে না জাগাইলে কি আমাকে ধরিতে পারিতে?''

''আমি জানিতাম, তুমি আমাকে জাগাইবে।''

"কি করিয়া জানিলে?"

"এ খবর তোমার চোখের দৃষ্টিতে কাল দেখিয়াছিলাম।"

"সত্য নাকি!"

তাহার বিস্ফারিত নয়নে সরল বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি ধরিয়া অকৃত্রিম আনন্দ সহকারে সে বলিল, "তুমি ঠিক ধরিয়াছ কিন্তু। তোমাকে আমার এত ভালো লাগিয়াছে যে, আজ বাহির হইবার পূর্বেই আমি মনে মনে ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে যেমন করিয়া হোক তোমার সহিত আমি দেখা করিবই। তোমাকে যদি এখানে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো তোমাদের পল্লীতে গিয়া তোমার অনুসন্ধান করিতাম। এ কথা আমার চোখ দেখিয়াই তুমি কাল বুঝিতে পারিয়াছিলে?"

"না জানিলে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতাম না। আমি ইহাও আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে আমাকে এখানে না পাইলে তুমি হয়তো পল্লীর ভিতরে যাইবে। তাই এখানে আসিয়া শুইয়াছিলাম।"

"তোমাদের পল্লীর ভিতরে গেলে ক্ষতি কি? তোমাদের দলপতি লোক ভাল নয়?"

"ধবল লোক ভাল, কিন্তু দলপতি ছাড়াও আরও নানা ধরনের লোক আছে তো। কাহার মাথায় কি কুমতলব জাগিবে কে বলিতে পারে! তোমার এমন রূপ, আমাদের দলে অবিবাহিত যুবকের সংখ্যাও কম নয়, কেহ হয়তো তোমাকে দখল করিয়া বসিবে।"

"ইস্, আমাকে দখল করা অত সহজ নয়। আমি বাঘকে পর্যন্ত ভয় করি না। এখনই তো বাঘের ঠিক পাশ দিয়া চলিয়া আসিলাম, বাঘ আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এমন আরও অনেকবার ঘটিয়াছে।"

"এখন তুমি বাঘের পাশ দিয়া আসিয়াছ? বল কি! কোথায় বাঘ?"

"উন্নগা পাহাড়ের উপত্যকায়। এই সুড়ঙ্গের অপর মুখটা যেখানে আছে ঠিক তাহার পাশেই একটা বাঘ হরিণ মারিয়াছে। আমি যখন উপত্যকার ঠিক মাঝখানে, তখন চাঁদও ঠিক পাহাড়ের মাথায়। জ্যোৎস্নায় সমস্ত উপত্যকায় ভরিয়া গিয়াছিল। আমি দেখিলাম সুড়ঙ্গের কাছে একদল হরিণ চরিতেছে। আমি গাছের ছায়ায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেকদিন ধরিয়া আমার একটা হরিণশাবক পুষিবার ইচ্ছা আছে, ভাবিলাম উহাদের দলে যদি হরিণশাবক থাকে তাড়া করিব। কচি হরিণশিশু নিশ্চয়ই আমার সহিত ছুটিয়া পাল্লা দিতে পারিবে না, ঠিক ধরিয়া ফেলিব। প্রায় যখন উহাদের কাছাকাছি আসিয়াছি তখন একটা গাছের উপর হইতে বাঘটা উহাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল এবং একটা হরিণকে ঘায়েল করিল। তাহার পর হরিণটাকে টানিতে টানিতে সুড়ঙ্গের ধারে আনিয়া একটা ভীষণ গর্জন করিল। তুমি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাইতেছিলে, তাই গর্জন শুনিতে পাও নাই। গর্জন করিয়া সেইখানেই বাঘটা বসিয়া পড়িল, তারপর হরিণের রক্ত পান করিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাঘ কিছুতেই ওঠে না। আমি দেখিলাম দাঁড়াইয়া থাকিলে সময়মতো এখানে পৌঁছিতে পারিব না, সকাল হইয়া যাইবে। তখন আমি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বাঘের কাছাকাছি যখন আসিয়াছি তখন বাঘটা ঘাড় তুলিয়া আমার দিকে একবার তাকাইল, আমি তাহার চোখে চোখ রাখিয়া তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাঘটা আবার আহারে মনোনিবেশ করিল। আমি ঠিক তাহার পাশ দিয়া আসিয়া সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম। আরও কয়েকবার বাঘের সামনে পড়িয়াছি। দেখিয়াছি তাহাদের ভয় না করিলে তাহারা কিছু বলে না।"

বলিতে বলিতে গর্বে তাহার চক্ষু দুইটি যেন আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মানুষ কিন্তু বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। বাঘকে বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করিও না।"

"নিশ্চয় বিশ্বাস করিব। বিশ্বাস করিয়া দুই-একবার ঠকিয়াছি বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতেও ছাড়ি নাই।"

তাহার কালো চোখের তারায় প্রতিফলিত জ্যোৎস্নালোক যেন কৌতুকে নাচিতে লাগিল।

"শাস্তি দিবার শক্তি তোমার আছে? কিন্তু মনে হয় না। ধর আমি যদি এখন তোমাকে আক্রমণ করি, তুমি কি করিবে?"

বহু জন্ম পূর্বে জোলমাকে ঠিক এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। জোলমা সমুচিত উত্তরও দিয়াছিল। কিন্তু সে প্রশ্ন আর সে উত্তর বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া গিয়াছিল। সেই পুরাতন আমি যে নূতন মঞ্চে পুরাতন নাটকেরই নব রূপ দান করিতেছি তাহা মনে ছিল না। তন্বী শিলাঙ্গীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, উহার গায়ে আর কত শক্তি থাকিতে পারে? হাতটা যদি সজোরে চাপিয়া ধরি ছাড়াইয়া লইতে পারিবে না!

"করিয়াই দেখ না।"

মৃদু হাসিয়া শিলাঙ্গী উত্তর দিল।

উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিলাম। পরমুহূর্তে কিন্তু যাহা ঘটিল তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শিলাঙ্গী ছিটকাইয়া সরিয়া গেল এবং পরমুহূর্তেই দেখিলাম একটা ফাঁস আমার গলদেশে লাগিয়া আমার শ্বাসরোধ করিতেছে।

"কি করিতেছ, ছাড় ছাড়, আমার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে?"

শিলাঙ্গী দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

"আর একটু জোরে যদি টানি চিরকালের মতো দম বন্ধ হইয়া যাইবে। বড় বড় গরু আমাদের এই ফাঁসে আটকাইয়া কাবু হইয়া পড়ে।"

"খুলিয়া দাও, বড় কষ্ট হইতেছে।"

"শপথ কর আর কখনও আমার গায়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত দিবে না।"

শপথ করিলাম।

"তিনবার কর।"

তিনবার করিলাম। তবু শিলাঙ্গী আমাকে বন্ধনমুক্ত করিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না, দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। ফাঁসটা এমনভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল এবং দড়িটা এত শক্ত যে আমি এত চেষ্টা করিয়াও তাহা খুলিতে পারিলাম না। আমার ব্যর্থ প্রয়াস কেবল শিলাঙ্গীর হাসির খোরাক যোগাইতে লাগিল। অবশেষে করুণকণ্ঠে আবার মিনতি করিতে হইল।

"শপথ তো করিয়াছি, এইবার খুলিয়া দাও।"

"তোমাকে আর একটা শপথ করিতে হইবে।"

"কি বল?"

"শপথ কর যে তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে।"

"তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সেরকম বন্ধুত্ব অনেকের সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই।"

সেদিন গভীর রাত্রে চন্দ্রালোকিত শ্যামল ক্ষেত্রে বসিয়া শিলাঙ্গীর এই দাবি বড় অদ্ভুত

মনে হইয়াছিল। আজও অদ্ভুত মনে হইতেছে। মনে হইতেছে ইহাই বোধ হয় পুরুষের কাছে নারীর চিরন্তন দাবি। তখনকার দিনে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি শস্যক্ষেত্র, তাহারই মধ্যস্থলে আমি বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম, আমার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছিল একটি অপরিচিত তন্বী কিশোরীর উপর, আর সে আমার জীবনের বিনিময়ে দাবী করিতেছিল প্রকৃত বন্ধুত্ব। আজও কি অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

"প্রকৃত বন্ধুত্ব বলিতে তুমি ঠিক কি বোঝ তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি সত্যই তোমার বন্ধু হইতে চাই তাহা শপথ করিয়া বলিতেছি। আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর।"

"আমার যাহাতে অপমান বা অমঙ্গল হয় তাহা তুমি ইচ্ছা করিয়া কখনও করিবে না— ইহাকেই আমি প্রকৃত বন্ধুত্ব বলি। এরকম বন্ধু আমার একজনও নাই। অনেকেই আমাকে বিবাহ করিতে চায়, অনেকে আমাকে লইয়া একটু মজা করিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু আমার একজনও নাই। তুমি হইবে?"

"হইব। তোমার নিকটও আমি এই দাবি করিতে পারি কি?"

"নিশ্চয়।"

শিলাঙ্গী আসিয়া আমার গলার ফাঁস খুলিয়া দিল। শুধু তাই নয়, ছুটিয়া আসিয়া বাহুদ্বারা কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সে আমার ক্রোড়র উপর উপবেশন করিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে এক অপূর্ব কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জোলমার নিস্পৃহতা আমার পৌরুষকে একদিন কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। শিলাঙ্গীর আগ্রহ সেদিন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। জোলমার নিস্পৃহতা তাহাকে রহস্যময়ীও করিয়াছিল, শিলাঙ্গীর অতি সরলতাও তাহাকে কম রহস্যময়ী করে নাই। আমি তাহার সম্বন্ধে আকুল হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। করেণ সে যুগেও মানব-চরিত্রের সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম তাহাতেও কপটতার খাদ থাকিত। পশুত্বের স্তর হইতে যতই আমরা সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইতেছিলাম ততই আমাদের সারল্য অবলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতির সহিত তাল রাখিয়া আমাদেব চরিত্রও জটিল হইতেছিল। কাহাকেও ভাল লাগিলে সে যুগেও আমরা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে পারিতাম না—"আমি তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি।" কাহারও উপর ক্রোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ আমরা করিতাম না। শত্রুর সহিত হাসিমুখে আলাপ করিবার পদ্ধতি আমরা শিখিয়াছিলাম। তাই শিলাঙ্গীকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তাহার সরলতার পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। শিলাঙ্গী যদি নারী না হইয়া পুরুষ হইত, তাহা হইলে তাহার এই আচরণে হয়তো আমি বিস্মিত হইতাম, হয়তো ভয় পাইতাম, হয়তো তাহাকে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতাম। শিলাঙ্গী নারী বলিয়া তাহার আচরণের একটি অর্থ সেদিন আমার চক্ষে প্রতিভাত হইল—সে আমার পৌরুষকে কামনা করিতেছে। প্রকৃত বন্ধুত্বের অন্য কোনও অর্থ করিতে পারি নাই সেদিন। তাই পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলাম, "তোমাদের দলের লোক যদি আমাদের সহিত শত্রুতা করে তাহা হইলেও তুমি আমার বন্ধু থাকিবে তো?

শিলাঙ্গী বলিল, "নিশ্চয়। আমাদের দলের সহিত তোমাদের যাহাতে শত্রুতা না হয় সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। রোহার সহিত যদি ভাব করিতে পার তাহা হইলে সহজেই তাহা হইয়া যাইতে পারে। রোহার কাছে চল না একদিন। রোহা যখন একা থাকিবে তখন তাহার সহিত দেখা করিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই। রোহা লোক খুব ভাল।"

"কি করিয়া জানিব কখন কোথায় সে একা থাকে।"

"সেটা জানা মুশকিল বটে। তবে প্রত্যহই সে খানিকটা সময় একা থাকে। আমাদের গরুরা নিগম বনে এখন আছে, সেখানে একা একা সে প্রায়ই যায়। সেইখানে আমি তোমাকে একদিন

লইয়া যাইব। কিন্তু কোথায় তোমাকে খবর দিব? উন্নগা পাহাড়ে যেখানে তোমার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল সেইখানে তুমি যদি দুপুরে যাও, আমিও আসিব। দূরে কে যেন আসিতেছে একজন—"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম। সত্যই দূরে একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছিল। সন্দেহ হইল হয়তো নিনানি।

শিলাঙ্গীকে বলিলাম, "তুমি এখন চলিয়া যাও। আমি কাল তোমার সহিত দেখা করিব।"

"যে আসিতেছে তাহার সহিত যদি দেখা করি ক্ষতি কি? তুমি যদি আমাকে নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দাও—" .

আমি শিলাঙ্গীকে কথা শেষ করিতে দিলাম না।

"কে আসিতেছে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি এখন যাও। আলাপের ব্যবস্থা পরে করিব। আমাদের দুই দলের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব হয় আলাপ তো হইবেই। এখন কিন্তু ও যদি তোমাকে আমাকে এইভাবে দেখে—বিশেষত তুমি আমাদের শস্য কাটিয়া লইয়াছ—তাহা হইলে সমূহ গোলমালের সম্ভাবনা। তুমি এখন যাও।"

"বেশ। তুমি তাহা হইলে ঘাস দিয়া গর্তের মুখটা বন্ধ করিয়া দাও।"

একটু অনিচ্ছাভরেই শিলাঙ্গী চলিয়া গেল। সরীসৃপের মতো গর্তের মধ্যে ঢুকিল, ছোট ছোট তৃণগুচ্ছগুলিও তাহার অনুসরণ করিল। যে ঘাসের বোঝাটা দিয়া আগের দিন গর্তের মুখ ঢাকা ছিল সেইটে দিয়াই মুখটা বন্ধ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু মনে হইল তাহা সমীচীন হইবে না, মুখটা খোলাই থাক। গভীর রাত্রে আমার এখানে অবস্থানের কারণটা তাহা হইলে দেখাইতে পারিব।

...নিনানিই আসিতেছিল। সে কাছাকাছি আসিতেই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিনানির চুল আলুলায়িত। আমাকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি এখানে! আমি কতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে খুঁজিতেছি। তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

বলিলাম, "দেখিলাম এখানকার তৃণগুলি খুব বেশি নড়িতেছে। ভাবিলাম হয়তো ছাগল বা গরু ঢুকিয়াছে। কিন্তু আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল এই গর্তটা দেখিতেছি। বোধ হয় ইঁদুর কিংবা খরগোসের গর্ত।"

নিনানি গর্তের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিল না।

বলিল, "আমি কন্যা নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াছি। ধবলের প্রমাতামহের আদেশ আমি মানিতে পারিলাম না। জানি সে প্রতিশোধ লইবে, তবু মানিতে পারিলাম না। বিঘাওয়ের পায়ের পুঁজরক্ত আমি মাথায় করিয়া থাকিতে পারিব না। ইহার অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল। যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো আমার মৃত্যু হইবে, তাই যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি তোমার কাছেই থাকিব।"

এই বলিয়া সে আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। দেখিলাম সে কাঁপিতেছে।

"কখন তুমি স্নান করিলে?"

"একটু আগে।"

"আর কেহ কি তোমাকে স্নান করিতে দেখিয়াছে।"

"না। আমার যখন মূর্ছা ভাঙিল তখন উঠিয়া দেখি সকলে ঘুমাইতেছে। তোমাকে খুঁজিলাম কিন্তু পাইলাম না। একাই তখন বাহির হইয়া আসিলাম। কেবল জিগা আমার সঙ্গে ছিল।"

ধবলের কুকুরের নাম জিগা।

"জিগা কোথায়?"

"তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। জিগার সঙ্গও আমার ভাল লাগিল না। বিঘাওয়ের পুঁজরক্ত মাথায় মাখিয়া আমি খোলা আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল আকাশের জ্যোৎস্নাও আমার কেশ স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করিতেছে, মনে হইল পৃথিবীর সর্বত্রই চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে আর সমস্ত অন্ধকার আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে আমার মাথায়, আমার পুঁজরক্তমাখা কেশে। মনে হইল ইহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ধবলের প্রমাতামহ যদি আমাকে মারিয়া ফেলিতে চায় মারিয়া ফেলুক। অপরাজিতা বংশের কন্যা আমি, এত গ্লানি বহন করিয়া বাঁচিতে চাই না। এই কথা মনে হওয়ামাত্র আমি কন্যা নদীতে নামিয়া অবগাহন করিলাম। এইবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না তো?

"না।"

নিনানি উৎসুক নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিলাম তাহার অধরে আবার মৃদু মৃদু হাসিও ফুটিতেছে।

"আমার চুলে হাত দিয়া দেখ, একটুও পুজরক্ত নাই। কন্যা নদীর জলে বার বার ধুইয়াছি। হাত দিয়া দেখ না একবার।"

তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাহার পর বলিলাম, "চল, এবার ফিরি—"

"কোথায় ফিরিব।"

"ঘরে চল।"

"সকলে যদি জানিতে পারে যে আমি বিঘাওয়ের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্নান করিয়াছি, তাহা হইলে কি তাহারা আমাকে ঘরে থাকিতে দিবে?"

"তুমি যদি ঘরে থাকিতে চাও তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার সাহস কাহারও হইবে না। তুমি দলপতি ধবলের পত্নী একথা ভুলিয়া যাইতেছ কেন?"

"ভানা, টুলা, কিম্বা, বেসু—ইহারও ধবলের পত্নী। তোমরা ইহাদের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছ তাহা মনে হয় না। সেদিন ঠেঠরা ধবলের সম্মুখেই টুলাকে প্রহার করিল, ধবল তো কিছুই বলিল না। তোমরাও সকলে চুপ করিয়া ছিলে। একমাত্র আমিই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে নির্যাতন করিলে কেহই প্রতিবাদ করিবে না জানি। কারণ আমি সকলেরই চক্ষুশূল।"

"আমি প্রতিবাদ করিব। আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহই তোমাকে অপমান করিতে পারিবে না। তা ছাড়া আর একটা কথা। তুমি যে স্নান করিয়াছ একথা কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন কি। কেহ যখন তোমাকে স্নান করিতে দেখে নাই তখন চুপচাপ থাকাই ভাল। দেখাই যাক না কি হয়।"

"আমার মাথার চুলই যে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। আমার চুল দেখিবামাত্র সকলে বুঝিতে পারিবে যে আমি স্নান করিয়াছি।"

সহসা আমার মাথায় একটা প্রেরণা আসিল।

আমি বলিলাম, "চল, তোমার মাথার চুল আমি ঢাকিয়া দিব—"

"ঢাকিয়া দিবে? কিরূপে তাহা সম্ভব।"

"গাছের সরু সরু ডাল ও পাতার সাহায্যে।"

কথাটা বলিয়া আমি নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। সহসা উদ্বুদ্ধ কল্পনা আমাকে নিমেষে যেন নূতন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। কল্পনা নেত্রে আমি নিনানির মস্তকে শাখা-পত্র-নির্মিত শিরস্ত্রাণটা যেন দেখিতে পাইলাম। নিনানিকে আমি যে ভালবাসি, শিলাঙ্গীকে ভাল লাগিয়াছে

বলিয়া সে ভালবাসা যে একটুকু ম্লান হয় নাই, সহসা তাহা যেন উপলব্ধি করিলাম। তাহার দুঃখ, তাহার আতঙ্ক, তাহার বিচূর্ণিত আত্মসম্মান, আমার উপর তাহার আকুল নির্ভরশীলতা আমার পৌরুষকে একাগ্র করিয়া তুলিল। সেই একাগ্রতাই বোধ হয় আমাকে স্রষ্টাপদেও উন্নীত করিল। প্রেমের প্রেরণায় আমি এমন একটা সৃষ্টিকর্মে মাতিয়া উঠিলাম যাহা ভবিষ্যতে যুগান্তকারী বলিয়া বিঘোষিত হইবে। তখন কিন্তু চুপড়ি বা ঝুড়ির সম্ভাবনা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। অপমানিতা নিনানিকে রক্ষা করিবার জন্য আমার কল্পনা তখন উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল, তাহার পরিণামের কথা ভাবে নাই। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে আমাদের জমির প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল। সেই গাছটা দেখাইয়া নিনানিকে বলিলাম, "চল আমরা ওই গাছের তলায় যাই, ওখানে গিয়া এখনই তোমার মাথা ঢাকিয়া দিব।"

নিনানি আবদার মাখা কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না। আমাকে তুমি তুলিয়া লইয়া চল।"

নিনানিকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। হাঁটিতে হাঁটিতেই ঠিক করিয়া ফেলিলাম কি করিয়া তাহার মাথার চুল ঢাকিব। চুলগুলি চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে। তাহার পর তাহার কপালে একটা লতার বেষ্টনী দিব, তাহার পর চুলের চূড়ায় সরু সরু গাছের ডাল বাঁধিয়া সেই ডালগুলি নোয়াইয়া আনিয়া সেই লতা বেষ্টনীতে আটকাইয়া দিব। খুব ঘন ঘন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে চুল না দেখা যায়। ডালের ফাঁকে ফাঁকে পাতা গুঁজিয়া দিলে একেবারেই দেখা যাইবে না। কল্পনার উন্মাদনায় আমি অতিশয় দ্রুতবেগে গাছের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গাছের তলায় পৌঁছিতে খুব বেশি সময় লাগিল না, স্কন্ধারূঢ়া নিনানির ভার আমাকে ক্লান্তও করে নাই, আমি স্বপ্নের পাখা মেলিয়া যেন উড়িয়া চলিয়া গেলাম। গাছের তলায় দেখিলাম ঘন অন্ধকার। কেবল একটি স্থানে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। নিনানিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া বলিলাম, "তুমি ওই চাঁদের আলোয় বস। আমি গাছের উপর উঠিয়া শাখা-পত্র সংগ্রহ করি। একটা লাতাও সংগ্রহ করিতে হইবে।"

"লতা? লতা লইয়া কি করিবে?"

"দেখিতেই পাইবে।"

"ও বুঝিয়াছি।"

নিনানির চোখে হাসির দীপ্তি ফুটিল। আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম, গাছে এক ঝাঁক বক বসিয়া ছিল। আমি গাছে উঠিতেই তাহার 'ওয়াক্ ওয়াক্' শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখি তাহারা মাথার উপর চক্রাকারে উড়িতেছে। কৃষ্ণ-আকাশের পটভূমিকায় চন্দ্রালোকে সেই শ্বেতপক্ষ বিহঙ্গম দল আমার মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিল। আমি মুগ্ধনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একটা উদ্ভট উপমাও মনে জাগিল। হঠাৎ মনে হইল জ্যোৎস্না বোধ হয় বিহঙ্গ-রূপ ধরিয়া এই বৃক্ষে আসিয়া বসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে বকের দল দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আমি ডাল ও পাতা সংগ্রহে মন দিলাম। ডাল ও পাতার বোঝা লইয়া নীচে নামিয়া দেখি নিনানি নাই।

"নিনানি—"

কোনও সাড়া পাইলাম না।

"নিনানি—"

তবু কোনও সাড়া নাই। কোথায় গেল সে? সহসা শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়িল। কাছেই কোথায় যেন বাঘ বাহির হইয়াছে।

"নিনানি—"

"আঃ, অত চীৎকার করিতেছ কেন। অমি লতা সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম। দেখ এই লতায় হইবে কিনা।"

"কোথায় গিয়াছিলে?"

"পাহাড়ের উপর। নীচে কোথাও পাইলাম না। পাহাড়ের উপর পাই নাই, একটি মেয়ে আমাকে দিল।"

"মেয়ে? কাহাদের মেয়ে?"

"তুমি যাহাদের কথা বলিতেছিল, পাহাড়ের ওপরে যাহারা থাকে, যাহারা গরুর দুধ পান করে তাহাদের মেয়ে। নাম বলিল শিলাঙ্গী। মেয়েটি একটি লতায় ঘাসের কয়েকটি ছোট ছোট আঁটি বাঁধিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, আমাকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার পর আমার কাছে আগাইয়া আসিল। আসিয়া প্রশ্ন করিল—আমি এমনভাবে একা দাঁড়াইয়া আছি কেন। আমি বলিলাম—আমার একটা লতার দরকার, তাহাই খুঁজিতে আসিয়াছি। সে বলিল—এখন পাহাড়ে লতা খোঁজা নিরাপদ নয়। বাঘ বাহির হইয়াছে। তোমার যদি বিশেষ দরকার থাকে আমার এই লতার খানিকটা অংশ লও। এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া খানিকটা লতা ছিঁড়িয়া আমাকে দিল। দিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। বেশ মেয়েটি। দেখ, এই লতায় হইবে কিনা।"

আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীর সহিত নিনানির দেখা হইয়াছে। এখন হইলে বলিতাম বিধাতার কি অদ্ভুত পরিহাস! কিন্তু তখন বিধাতার সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না, তাই এই ধরনের কথা মনে হইল না, কিন্তু এই অদ্ভুত যোগাযোগের বিস্ময়টা আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল, মনে হইল একটা অজানা ইঙ্গিত আমাকে কি যেন বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বহুকাল পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহাও অস্পষ্ট ভাবে।

"অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন?"

"বাঘ বাহির হইয়াছে কেন?"

আমার নীরব বিস্ময়ের হেতুটা বাঘের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া দক্ষু দুইটি আর একটু বিস্ফারিত করিলাম।

"তোমার তো বাঘকে ভয় পাইবার কথা নয়। তুমি বাহির হইয়াছ শুনিলে বাঘের বরং ভয় পাইবার কথা। কন্যা নদীর তীরে আসিবার পথে কুঠারের এক আঘাতে তুমি যে প্রকাণ্ড বাঘটাকে মারিয়াছিলেন তাহার প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই তোমার সম্বন্ধে সমস্ত বাঘেদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। নাও, এখন কি করিবে কর, আমার বড় ক্লান্তি লাগিতেছে।"

"যেখানে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ওইখানে বস।"

নিনানি গিয়া সেই আলোকিত স্থানটিতে উপবেশন করিল। সেই বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষতলে গভীর রাত্রে জমাট অন্ধকারের পটভূমিকায় নিনানিকে বড় অদ্ভুত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল সে-ই যেন মূর্তিমতী আলোক, জমাট অন্ধকারের বুকে বসিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। কন্যা নদীতে অবগাহন করিয়া সত্যই সেদিন সে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। তাহা যে কত বড় বিদ্রোহী মনের পরিচয় তাহার স্বরূপ কল্পনা করা আজ হয়তো তোমাদের পক্ষে শক্ত। মানব-মনের সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিগূঢ় প্রেরণায় সে স্বয়ং মৃত্যুকেই বরণ করিয়াছিল। বিঘাওয়ের আদেশ উপেক্ষা করিলে যে কানা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল, তবু সে মাথায় পুঁজরক্ত মাখিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার অন্তরের শুচিতাবোধ তাহাকে বিদ্রোহিনী করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধকার-পেরিবেষ্টিতা জ্যোৎস্নালোকিতা নিনানির দিকে চাহিয়া আম যে বিস্ময় অনুভব করিতেছিলাম তাহার মধ্যে

ভয়ও ছিল। কারণ আমিও বিশ্বাস করিতেছিলাম যে নিনানির অবাধ্যতার ভয়ঙ্কর পরিণাম এবার আসন্ন, কানা তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। নিনানি মৃত্যুর পর প্রেতিনী হইয়া হয়তো আমাদের কাছাকাছি কোথাও আশ্রয় লইবে। আমি যদি এখন নিনানিকে তুষ্ট করিতে পারি, নিনানির প্রেতিনীও আমার প্রতি তুষ্ট থাকিবে। আমি যে ঠিক জ্ঞাতসারে এসব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা নয়, নিনানির প্রতি প্রেমই প্রধানত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ইহাই সত্য, কিন্তু আজ আমার সন্দেহ হইতেছে যে নিনানিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি সেদিন যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার অন্তরালে হয়তো ভয়ও ছিল। কারণ সে যুগে আমদের সমস্ত কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক ছিল পরলোক। যে পরলোকে বিদ্রোহী প্রেতাত্মারা অসীম শক্তিলাভ করিয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ওঠে, যে পরলোকের রহস্য উদ্ভেদ করিয়া ইহলোকে জিঘাওরা আধিপত্য করে, সে পরলোককে উপেক্ষা করিয়া অথবা তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া সে যুগে কোনও কার্যই আমর করিতে পারিতাম না।

"তুমি মাথাটা একটু নীচু করিয়া বস। তোমার চুলগুলো আগে চূড়া করিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে।"

নিনানি মাথা নীচু করিল। আমি আমার শাখাপত্রের বোঝাটা লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলাম। বাধ্য বালিকার মতো নিনানি মাথা নীচু করিয়া রহিল।

...নিনানির মাথাটুকু ঢাকিতে আমার অনেকক্ষণ সময় লাগিল। তাহার মাথার কেশরাশি যে কত প্রকারে বাঁধিলাম ও খুলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। নিনানি কিন্তু ধৈর্যভরে বসিয়া রহিল, একটুও প্রতিবাদ করিল না। চন্দ্রালোকিত অংশটুকু ক্রমে ক্রমে স্থান পরিবর্তন করিতেছিল, আমরাও সরিয়া সরিয়া বসিতেছিলাম। উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়া বসিবার সাহস আমাদের ছিল না, সে যুগে আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই আমরা নিরাপদ বোধ করিতাম।

...নিনানির মস্তকের আবরণটা যখন শেষ হইল তখন কারুকর্ম দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেলাম। শাখাপত্রের শিরস্ত্রাণ পরিয়া নিনানিকে নূতন দেখাইতেছিল। রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতের কোমল আলোকে শ্যাম-শিরোভূষণ-শোভিতা নিনানিকে যেন অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল। অপূর্ব পুলকে ও গর্বে আমার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল আমি যেন নিনানিকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলাম। এ নিনানি আমার, একান্তভাবেই আমার। ইহাকে আমি ধবলের কাছে আর ফিরাইয়া দিব না। সহসা আবেগভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, তাহার পর স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আদরে নিনানির কখনও অরুচি ছিল না, সে পর্যন্ত বলিল, "জংলা, তুমি কি পাগল হইয়া গেলে নাকি! আমাকে নামাইয়া দাও, চল এবার ফিরিয়া যাওয়া যাক।"

"তোমাকে আমি ফিরিতে দিব না। তুমি এইখানেই থাক—"

"মানে?'

"এখন এইখানে থাক, তাহার পর তোমার জন্য আমি অন্য একটা বাসা ঠিক করিব। সকলে জানুক যে তুমি মরিয়া গিয়াছ, বিঘাওয়ের উপর ভর করিয়া কানা যে নিদারুণ আদেশ তোমাকে দিয়াছে সেই আদেশের ফলে তোমার মৃত্যু হইয়াছে। এই কথা আমি গিয়া এখনই সকলকে বলিয়া দিতেছি। আমি বলিব যে বিঘাওয়ের কথা অমান্য করিয়া তুমি কন্যা নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছিলে, কানা ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। নিনানি বলিল, "মৃত্যু তো আমার হইবেই। তখনই সকলে দেখিবে। এখন হইতে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লাভ কি?"

"লাভ এই যে যতক্ষণ তুমি বাঁচিয়া থাকিবে একান্তভাবে আমারই থাকিবে। বিঘাও জানুক যে তুমি আর নাই।"

"তাহাতে বা লাভ কি তোমার!"

নিনানির চোখে এক ঝলক আলো চকমক করিয়া উঠিল, মুখে মৃদু হাসি ফুটিল।

"তোমার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া জিঘাও কি করে দেখা যাক না। তোমার অন্তর্ধানে তাহার মনে কি ভাব জাগে দেখিতে চাই। লাভ হয়তো তেমন কিছু হইবে না, তবু কৌতূহল হইতেছে।"

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ব্যাপারটার অভিনবত্ব আমাকে ক্রমশ যেন পাইয়া বসিল। নিনানির মস্তক ঘিরিয়া শাখাপত্রের যে শিরস্ত্রাণ শোভা পাইতেছিল, আমিই যে তাহার স্রষ্টা এই বোধ আমাকে যেন নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল, মনে হইতেছিল আমি যাহা খুশি করিতে পারি, জীবন্ত নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করার দুঃসাহসিকতাও অসম্ভব নয় আমার পক্ষে। ইহার মধ্যে যে অভিনবত্ব ছিল তাহাই আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। নিনানি কিন্তু একটা অদ্ভুত খবর দিল। যদিও ঘটনাটা আমার নিকট স্বাভাবিক মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অদ্ভুত ঠেকিল।

মৃদু হাসিয়া নিনানি বলিল, "এ খবর শুনিয়া বিঘাওয়ের মনে কি ভাব হইবে তাহা আমি জানি।"

"জান?"

"হাঁ জানি। বিঘাও হতাশ হইবে।"

"হতাশ হইবে? কেন?"

"কারণ সে একাধিকবার আমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছে। তাহার আশা আছে যে আমি একদিন তাহার নিকট ধরা দিব। তাহার আকাঙ্ক্ষা ধবলকে সরাইয়া আমাকে বিবাহ করিয়া সে-ই একদিন নিম্ব-সম্প্রদায়ের দলপতি হইবে। সে এখনও বোধ হয় আশা করে যে আমি তাহার সহায়তা করিব। সুতরাং আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে সে হতাশই হইবে।"

"তবে সে তোমাকে এমনভাবে অপমান করিল কেন?"

কথাটা বলিয়াই আমি বুঝিলাম যে ভুল বলিয়াছি। নিনানি আমাকে সংশোধন করিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে।

"সে তো আমাকে অপমান করে নাই। আমাকে শাস্তি দিয়াছে ধবলের প্রমাতামহ কানা। জিঘাওয়ের উপর যদি কোনও প্রেতাত্মা ভর করিয়া কোন কথা বলে তাহার জন্য বিঘাওকে দায়ী করা চলে না।"

"ঠিক ঠিক।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। প্রেতাত্মাদের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলাম। বিঘাও-জাতীয় যাদুকরদের মারফতই যে তাহারা নিজেদের অভিপ্রায় কখনও সরল ভাষায় কখনও নিগূঢ় ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, ইহাতেও আমাদের কাহারও সন্দেহ ছিল না। তবু এই ধরনের কথা আমার মুখে যে কেন আসিল তাহা জানি না।

"বিঘাও তোমার কাছে প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল, একথা আমাকে তো বল নাই—"

নিনানির চোখেমুখে দুষ্টামি মাখা হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

"অনেক পুরুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কত লোক কত কথা বলে। সব কথা কি সকলকে বলিতে পারি? বলিলে তোমাদের নিম্ব সম্প্রদায় একদিন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত।"

আমি নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মাথার শাখা-পত্রময় শিরোভূষণটা আবার আমাকে উদ্দীপ্ত করিল, আবার মনে হইল আমি অসাধ্যসাধন করিতে

পারি। বিঝাওকে কঠোর শাস্তি দিবার অসমসাহসিক কল্পনাও একবার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল।

"বিঘাও যখন তোমার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছিল তখন তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে?"

"তাহা তোমাকে বলিব কেন?"

"বলিতেই হইবে।"

আগাইয়া গিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে নিনানির হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলাম। আমার মূর্তি দেখিয়া নিনানির মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

"বল তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে!"

"বলিয়াছিলাম যে, তোমার পায়ের ঘা আগে সারুক তাহার পর তোমার কথার জবাব দিব।"

"এই জবাব দিয়াছিলে? পায়ের ঘায়ের কথা বলিয়াছিলে?"

"হ্যাঁ।"

নিনানির চোখের দৃষ্টি ভাষাময় হইয়া উঠিল। আমার চোখেও হয়তো ভাষা ফুটিয়াছিল। আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে যাহা জাগিতেছিল, তাহা মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করা দূরে থাক, ভালভাবে চিন্তা করিতেও সাহস পাইতেছিলাম না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অবশেষে ঠিক করিয়া ফেলিলাম, নিনানিকে আর ফিরিয়া যাইতে দিব না, লুকাইয়া রাখিব। জিঘাওকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

"সত্যই তাহা হইলে আমরা আর ফিরিয়া যাইব না?"

"না। আপাতত তুমি এখানে গাছের উপর লুকাইয়া থাক। আমি উন্নগা পর্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখি, যদি থাকিবার মতো গুহা পাওয়া যায় একটা। নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।"

"গুহা? আমি গুহায় একা থাকিতে পারিব না।"

"একা থাকিবে একা, আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব। আমার তো ঘরে বউ নাই যে, তাহার জন্য প্রত্যহ ঘরে ফিরিতে হইবে। আমি দিনের বেলায় মাঠে কাজ করিব, তাহার পর রাত্রে পাহারা দিবার ছুতায় বাহির হইয়া পড়িব। তখন তোমার কাছে যাইব।"

"সমস্ত দিন আমি একা গুহায় বসিয়া বসিয়া করিব কি?"

"শিকার করিবে। তোমার হাতের লক্ষ্য তো অব্যর্থ। আমি তোমাকে তীর ধনুক দিয়া আসিব। চকমকি ও কিছু কাঠও লইয়া যাইব। তুমি শিকার করিয়া রাখিবে, আমি রাত্রে গিয়া সেগুলি ঝলসাইব। তাহার পর দুইজনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া খাওয়া যাইবে। ইহাতে ভয় পাইতেছ কেন? নূতন ধরনের জীবনযাপন করিয়া দেখা যাক না কি হয়।"

নিনানির মন যে ওই অভিনবত্বের প্রলোভনে উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মুখে সে আপত্তি করিতেছিল ছলনার বশে। তাহার মতো ছলনাময়ী রমণী আমাদের দলে আর ছিল না।

"ধবল ঘিসু যদি ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসে?"

"ফিরিয়া আসিলে তাহারাও তোমার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবে, তখন বোঝা যাইবে তাহারা তোমাকে কতটা ভালবাসে।"

নিনানির চোখ দুইটি আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"ভানা টুলা কিংবা বেসুও আমার মৃত্যু-সংবাদে কি করে তাহাও একটু লক্ষ্য করিও। আমার মনে হয় টুলাটা কাঁদিবে।"

"লক্ষ্য করিব। তুমি তাহা হইলে গাছে উঠিয়া বসিয়া থাক, আমি গুহার সন্ধানে চলিলাম।"

...উন্নগা পর্বতে গুহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার মন আর একটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিল। শিলাঙ্গীর কথা নিনানিকে বলিব কিনা, নিনানির কথাও শিলাঙ্গীকে বলা সমীচীন হইবে কিনা। একাধিক স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক রাখা, এমন কি অপরের বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যৌন-সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া সে যুগে পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। জননীর পরিচয়েই তখন পুত্রের পরিচয় হইত। আমার বয়সও তখন বেশি নয়, যে বালিকাটির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল সে বহুকাল পূর্বে মারা গিয়াছে, সুতরাং একাধিক স্ত্রীর সহিত যে আমি সংশ্লিষ্ট থাকিব ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই সকলে মনে করিবে, ইহার বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক আপত্তি উঠিবে না তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তবু নিনানির প্রতি আমার যে দুর্বলতা আছে তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার সাহস আমার ছিল না, ধবলের নিকট এ কথাটা গোপন করিয়া রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করিতাম। কারণ আমি জানিতাম যে, সামাজিক নিয়ম যাহাই থাক ঈর্ষা নামক সহজাত প্রবৃত্তিটি সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের নিয়মেই চলে। ধবল যদি টের পায় যে আমি নিনানির প্রতি আসক্ত সে কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করিবে না। সুযোগ পাইলেই সে প্রতিশোধ লইবে। নিনানির অথবা শিলাঙ্গীর মনোভাব যে ইহা হইতে বিভিন্ন হইবে সে প্রত্যাশা আমার ছিল না। নিনানির সহিত শিলাঙ্গীর যোগসূত্রের কথা আমি চিন্তা করিতেছিলাম প্রয়োজনের খাতির। নিনানিকে যদি উন্নগা পর্বতের গুহায় থাকিতে হয় তাহা হইলে শিলাঙ্গীর সহায়তা অতিশয় সুবিধাজনক হইবে। নিনানির সহিত পাহাড়ে একটু আগে শিলাঙ্গীর পরিচয় হইয়াছে, নিনানিকে গিয়া যদি বলি যে, শিলাঙ্গীর সহিত পাহাড়ে আমারও হঠাৎ দেখা হইয়া গেল তাহা হইলে নিনানি কোনও সন্দেহ করিবে না। শিলাঙ্গীকে কিন্তু কি বলিব? শিলাঙ্গীর সহিত আমার যে পূর্বে আলাপ হইয়াছে একথা শিলাঙ্গীকে যদি নিনানির নিকট গোপন রাখিতে বলি সে কি রাজী হইবে? এইসব কথা চিন্তা করিতে করিতে উন্নগা পর্বতে বিস্তীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দূরে অবস্থিত পর্বতস্তূপগুলির দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। দূর হইতে পাঁচটি শৃঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল বিরাটকায় উন্নতশীর্ষ পাঁচটি দৈত্যভ্রাতা যেন ঠেসাঠেসি করিয়া পাশাপাশি বসিয়া আছে। ইতিপূর্বে উপত্যকার অপর পারে কখনও যাই নাই, যাইবার প্রয়োজনও হয় নাই, একা যাইতে একটু ভয়-ভয়ও করিতেছিল, কারণ সঙ্গে একটি প্রস্তর ছুরিকা ব্যতীত অন্য অস্ত্র ছিল না। বাধ্য হইয়া তবু যাইতে হইতেছিল, কারণ উপত্যকার এধারে কোনও গুহা দেখিতে পাইলাম না। উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে দেখিলাম গরুর দল চরিতেছে, মনে হইল শিলাঙ্গীর দুধনী মধুনীও যেন উহাদের মধ্যে রহিয়াছে। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশাও উঁকি দিতেছিল যদি শিলাঙ্গীকে সহসা দেখিতে পাই। তাহার নিকট উন্নগা পাহাড়ের অনেক খবর পাওয়া যাইবে নিশ্চয়। শিলাঙ্গীকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। একাই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

...পঞ্চ-পর্বতের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলাম একটি ঝরনা রহিয়াছে। ঝরনাটা প্রথমে ঠিক দেখিতে পাই নাই, শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম। দুইটি পাহাড় পাশাপাশি খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, তাহাদের মাঝে রহিয়াছে প্রকাণ্ড একটা ফাটল, তাহার ভিতর দিয়া একটি জলস্রোতও বাহির হইতেছে, একটু পরে দেখিতে পাইলাম। জলধারা পাহাড় বেষ্টন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরবর্তী একটা ঘন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মনে হইল ইহাই তাহা হইলে কন্যা নদীর উৎস। ইহার নাম কন্যা নদী কে দিয়াছিল জানি না, মীংরার মুখে শুনিয়াছিলাম নদীটির নাম কন্যা। উৎসের কাছাকাছি কন্যা নদীকে দেখিয়া মনে হইল—নামটি সার্থক। দুরন্ত কিশোরীর মতোই কন্যা যেন পাহাড়ের ফাটল হইতে বাহির হইয় অরণ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। মনে হইল সে যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। জলস্রোতের দুই তীর শ্যাম-তৃণাচ্ছাদিত। অনেক বৃক্ষ, অনেক গুল্ম,

বহুপ্রকার লতা ও পুষ্পে বসিয়া আছে। গতরাত্রে যে বকের দলকে দেখিয়াছিলাম তাহাদের আবার এখানে দেখিতে পাইলাম। মাছরাঙা পাখীও ছিল কয়েক রকম। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল একটা নূতন দেশে আসিয়াছি। একটা অদ্ভুত বাসনাও মনের মধ্যে উঁকি দিয়া গেল। সেই আদিম যুগে যখন আমি সাধারণ বন্য পশুমাত্র ছিলাম তখন ইকাকে সবলে হরণ করিয়া নির্জনে গুহায় নিজস্ব গৃহ-স্থাপনের প্রেরণা যে স্বার্থবুদ্ধি আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, সেই বুদ্ধি আমার মনে নূতন বাসনারূপে আবার আবির্ভূত হইয়া কহিল, 'এই স্থানে তুমি যদি নিনানি ও শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজের ঘর বাঁধ কেমন হয়!' ইকার কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু সেই প্রবৃত্তিটা অন্তরের মধ্যে সুপ্ত ছিল, সহসা যেন আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কথাটা ভাবিয়াই কিন্তু আমি হাসিয়া উঠিলাম। সমাজ ছাড়িয়া একা বাস করিব কিরূপে? যে জীবনে আমি এখন অভ্যস্ত হইয়াছি সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া সে জীবনযাপন করা যায় না। একা আমি চাষ করিতে পারিব না। শিকার হয়তো করিতে পারি কিন্তু শিকারের মাংস ঝলসাইয়া দিবে কে? আমাদের দলের কতকগুলি নারী এই কার্যের জন্যই নিযুক্ত আছে। আরও কতকগুলি নারী পশুচর্ম পরিষ্কার করে। পশুচর্মগুলি চামড়ার সূতা দিয়া সেলাই করিবার দক্ষতা অর্জন করিয়াছে কয়েকজন। তাহারা সকলের জন্য অঙ্গচ্ছদ প্রস্তুত করে। তাছাড়া অস্ত্র পাইব কোথায়? আমাদের সম্প্রদায়ের বিবা, কাটমা, শাম্বো, তিনা, রিখ্‌লি, বিন্‌ধা দিবারাত্রি বসিয়া পাথর ঘষিতেছে, পাথর ফুরাইলে পাথর খুঁজিয়া আনিতেছে, পশুচর্ম বিনিময়ে, তৃণবীজের বিনিময়ে অন্যত্র হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে, ইহা কি আমার একার দ্বারা সম্ভব? তা ছাড়া যে অগ্নিপূজা, প্রস্তর-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, ভূমি-পূজা, নদী-পূজা আমাদের জীবনের প্রধান নির্ভর তাহা করিবে কে? ধবল নিশ্চয় আসিবে না। অদৃশ্যলোক-নিবাসী ভূতপ্রেতদেরই বা কে শান্ত করিয়া রাখিবে? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন বিপন্ন হইব তখন যাদুবিদ্যাবিৎ বিঘাও কি আমাকে রক্ষা করিতে আসিবে? না, একা বাস করা আর সম্ভব নয়। সহসা তখন মনে হইল তবে কি জন্য আমি গুহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি? মাত্র কয়েকদিনের জন্য নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া কি লাভ হইবে? তাহাকে মরিতে হইবে। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একান্তভাবে কয়েকদিন পাইবার জন্য কি আমি তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে চাই? লুকাইয়া না রাখিলেও তো তাহা অসম্ভব হইত না। নিশীথ রাত্রিই আমাদের জীবনে প্রত্যহ গোপনতার সৃষ্টি করে। এতদিন যে নিনানির সঙ্গলাভ করিয়াছি, তাহা কি কম নিবিড় কম ঘনিষ্ঠ ছিল?

যে প্রশ্নটাকে মন এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছিল আত্মবিশ্লেষণ করিতে করিতে অবশেষে তাহারই সম্মুখীন হইতে হইল। তবে কি বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বানীতে আমি সন্দিহান হইয়াছি? নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া আমি কি দেখিতে চাই যে বিঘাও সত্য শক্তিশালী কিনা? ধবলের প্রমাতামহ কানার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি সন্দিহান নাকি! কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পাখী একযোগে চীৎকার করিয়া উড়িতে লাগিল, চতুর্দিক যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি ভয় পাইয়া গেলাম, আমার আশঙ্কা হইল আমার অবিশ্বাসের কথা কানা বোধ হয় টের পাইয়াছে, অভাবিত উপায়ে এখনই হয়তো শাস্তিও দিবে। একবার ইচ্ছা হইল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করি। নিনানিকে গিয়া বলি যে গুহা পাওয়া গেল না, সে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল ফিরিয়া যাক। আমার পলাইবার ইচ্ছা হইল বটে কিন্তু আমি নড়িতে পারিলাম না। আর একটা প্রবলতর প্রবৃত্তি আমাকে সেইখানে অনড় করিয়া রাখিল। ভয়কে পরাভব করিয়া কৌতূহল জয়ী হইল। আমি সভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম পাখিরা সহসা এমনভাবে ডাকিয়া উঠিল কেন। দেখিলাম পাখি গুলি যে গাছ হইতে উড়িয়াছিল সে গাছে গিয়া আর বসিল না। কতকগুলি দূরের গাছে বসিল, কতকগুলি উড়িতেই লাগিল। তাহার

পর একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল একটা নিষ্পিষ্ট আর্তনাদ যেন ধীরে ধীরে বাঙ্ময় হইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার ভয় হইল, এসব কানার কারসাজি নয় তো! উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনিবার্য কৌতূহল আমাকে যেন ভীত শিশুর মতো টানিয়া লইয়া চলিল। সন্তর্পণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অবশেষে সেই জলধারার তীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও ব্যাপারটা দেখিতে পাই নাই। পরমুহূর্তেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম একটা ময়াল সাপ একটা হরিণকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। এ অঞ্চলে যে হরিণ আছে তাহা জানিতাম না। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। আরও বিস্ময়ের হেতু বনান্তরালে অপেক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধা যক্ষিণীকে তখনও দেখিতে পাই নাই। একটু পরেই সে বনের আড়াল হইতে একবোঝা শুষ্ক খড় লইয়া বাহির হইল। আবার চলিয়া গেল, একটু পরে আর এক বোঝা শুষ্ক খড় লইয়া আসিল। আবর গেল, আবার খড় আনিল। কয়েকবার গিয়া অনেক খড় সে জমা করিয়া ফেলিল। আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল, কিন্তু তাহা যেন সীমা অতিক্রম করিয়া গেল যখন দেখিলাম সে খড়ের বোঝাগুলি সাপটার চারিদিকে বৃত্তাকারে সাজাইতেছে। ময়াল সাপটা হরিণের সর্বাঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া একটা স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই স্তূপকে কেন্দ্র করিয়া বুড়ি বোঝাগুলি সাজাইয়া ফেলিল।

নির্ভয়ে সে ময়াল সাপটার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোঝাগুলি সাজানো হইয়া গেলে সে কোমরের চর্মপেটিকা হইতে চকমকি বাহির করিয়া আগুন জ্বালিল এবং একটি খড়ের স্তূপে আগুন ধরাইয়া দিল। তাহার পর আর একটা স্তূপে ধরাইল। তাহার পর পা দিয়া ঠেলিয়া সেই জ্বলন্ত স্তূপ দুইটি ময়াল সাপটার কাছে আগাইয়া দিতে লাগিল। বৃদ্ধার মুখটা প্রকাণ্ড, নাকটা খড়্গের মতো, চিবুকের নীচে গলা পর্যন্ত একটা চামড়ার মতো ঝুলিতেছে। গরুদের যেমন গলকম্বল থাকে অনেকটা তেমনি। কোনও কালে বোধ হয় চিবুকের নীচে প্রচুর চর্বি ছিল, এখন চর্বি নাই, লোল'চর্মটা ঝুলিতেছে তাহার পলিতকেশ পীতাভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি কোটরগত। দাঁত আছে। প্রকাণ্ড কয়েকটা দাঁত বাহিরে প্রকট হইয়াছে, ঠোঁটে ঢাকা পড়ে নাই। আমি রুদ্ধশ্বাসে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। মনে হইল সে কি যেন বলিল। বলিয়া খড়ের জ্বলন্ত স্তূপ দুইটিকে আর একটু আগাইয়া দিল। দেখিলাম ময়াল সাপ ধীরে ধীরে তাহার বন্ধন শিথিল করিতেছে। বৃদ্ধা ভর্ৎসনার সুরে আবার তাহাকে কি যেন বলিল, জ্বলন্ত খড়ের স্তূপ আর একটু আগাইয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, ময়াল সাপ হরিণটিকে ছাড়িয়া ধীরে ধীরে বনান্তরালে চলিয়া যাইতেছে। মৃত হরিণটা পড়িয়া রহিল। বৃদ্ধা তখন মৃত হরিণকে টানিয়া আনিয়া জ্বলন্ত খড়ের স্তূপের ভিতর ফেলিয়া আরও শুষ্ক খড় তাহার উপর চাপাইয়া দিল। দগ্ধ হরিণ-চর্মের গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম বৃদ্ধার জিহ্বাগ্র মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ময়াল সাপটা যেদিকে চলিয়া গিয়াছে, সেদিকে চাহিয়া বৃদ্ধা মৃদস্বরে মাঝে মাঝে কি যেন বলিতেছিল, সহসা একটা গাছের দিকে চাহিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, সু-উচ্চ বৃক্ষশাখায় একদল শকুনি বসিয়া রহিয়াছে। আমার এইবার ভয়-ভয় করিতে লাগিল, আশঙ্কা হইল ও আমাকে যদি দেখিতে পায়, হয়তো...। সন্তর্পণে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। কিছুদুর গিয়া গতিবেগ দ্রুত করিয়া দিলাম। উন্মুক্ত উপত্যকায় গিয়া যখন পড়িলাম, তখন আমি ছুটিতেছি। রৌদ্রের স্বর্ণকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করিতেছিল, নির্মেঘ নীল আকাশে চক্রাকারে চিলের দল উড়িতেছিল, একটা নামহীন পাখী তালে তালে চীৎকার করিতেছিল, দূরে বন্য গরুর দল চরিতেছিল, পাহাড়ের সানুদেশে পাহাড়ী ছাগলেরা নামিয়া আসিয়াছিল, আমার কিন্তু এসব দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না, আমি সেই বৃক্ষবেষ্টিত ঝোপটা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিলাম।

আমার আশঙ্কা হইতেছিল শিলাঙ্গী হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শিলাঙ্গীকে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিলে যে সমস্যার সমাধান হইবে না তাহা আমি অনুভব করিতেছিলাম। ঠিক করিয়াছিলাম তাহার নিকট কিছুই গোপন করিব না। নিনানি-সম্পর্কিত সমস্ত কথা তাহার কাছে অকপটে বলিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিব। সে আমার বন্ধু হইয়াছে। সে নিশ্চয়ই আপদে বিপদে আমার সহায় হইবে, কখনও এমন কিছু করিবে না, যাহাতে আমার অপমান বা অমঙ্গল হয়...

...শিলাঙ্গী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিলাম, হঠাৎ সে একটা গাছের ডাল হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল।

"তুমি অত হাঁফাইতেছ কেন"—নামিয়াই প্রশ্ন করিল সে।

"ছুটিয়া আসিয়াছি।"

মনে হইল কথাটা শুনিয়া শিলাঙ্গী খুশি হইল। তাহার সরল চোখের দৃষ্টিতে আনন্দের ছটা দেখিতে পাইলাম।

"ছুটিয়া আসিয়াছ? কি দরকার ছিল?"

"আমার ভয় করিতেছিল, যদি তুমি চলিয়া যাও।"

"বাঃ, আমি যখন কথা দিয়াছি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিব, তখন কি চলিয়া যাইতে পারি? আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতাম। তোমার জন্য একটা জিনিস আনিয়াছি—এই দেখ—"

শিলাঙ্গী তর তর করিয়া গাছে উঠিয়া গেল এবং একটি ছোট বাঁশের কেঁড়ে লইয়া নামিয়া আসিল।

"দুধ। খাইয়া দেখ।"

দুধ পূর্বে কখনও পান করি নাই। কেঁড়েটা মুখে তুলিয়া একটু চাখিয়া দেখিলাম প্রথম। স্বাদটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হইল, খুব ভাল লাগিল না।

"কেমন লাগিতেছে?"

"খুব ভাল নয়। কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি ফলের স্বাদ—মনে হইতেছে যেন তরল কোনও ফল"—আমি চাখিয়া চাখিয়া সন্দিগ্ধভাবে দুগ্ধপান করিতে লাগিলাম।

"শরীরের তেজ কিন্তু খুব বাড়ায়। ঝোনঝিরা প্রচুর দুধ খায় রোজ। তাই উহার গায়ে খুব জোর। ঝোনঝিরা মাংসও কম খায় না। ওটা একটা রাক্ষস। বাঃ, তুমি সবটা খাইও না, আমার জন্যও একটু রাখ। আমি আমার অংশের দুধটুকু তোমার জন্য আনিয়াছিলাম—আমাকে একটু দাও।"

আমার হাত হইতে দুধের কেঁড়েটা কাড়িয়া লইয়া বাকি দুধটুকু সে ঢক ঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

"আজ রোহার নিকট যাইবে? আজ রোহা বোধ হয় একা আছে। কারণ আসিবর সময় দেখিলাম ঝোনঝিরার দল অস্ত্রে শানে দিতে বসিয়াছে।'

"আজ আমার কোথাও যাইবার উপায় নাই। সর্বপ্রথম আমাকে তুমি একটা গুহা খুঁজিয়া দাও।"

"গুহা? তার মানে? গুহা লইয়া কি করিবে?"

"নিনানিকে রাখিব।"

"সে আবার কে?"

"তাহা হইলে চল এক জায়গায় বসি। সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। কিন্তু

তোমাকে শপথ করিতে হইবে যে একথা আর কাহাকেও বলিবে না। নিনানির কাছেও না। নিনানি যেন জানিতেও না পারে যে, তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে, তাহা হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে।"

"নিনানি কে?"

"চল সব বলিতেছি।"

সেই ঝোপের ধারে একটি বিস্তৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া শিলাঙ্গীকে আনুপূর্বিক সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। সমস্ত কথা শুনিয়া শিলাঙ্গী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর আমার মুখের উপর সরল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, "নিনানিকে তুমি বুঝি খুব ভালবাস?"

"তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না, বাসি। ধবল দলপতির অধিকার লইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহা না হইলে আমাকেই সে বিবাহ করিত।"

"সে-ও তোমাকে খুব ভালবাসে তাহা হইলে?"

"বাসে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে কানা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। তাই সে জীবনের শেষ কয়টা দিন একা আমার কাছে থাকিতে চায়। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে তাহাকে একটা গুহা খুঁজিয়া দিব। এ প্রতিশ্রুতি আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি আমাকে সাহায্য কর।"

"তাহা না হয় করিব। একটা গুহার খবর জানি। কিন্তু আগে তুমি আমার আর একটা কথার জবাব দাও।"

"বল—"

"আমাকে তুমি নিনানির নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেছ কেন? তুমি তো আমাকেও ভালবাস, আমাকে দেখিয়া সে রাগ করিবে কেন?"

"নিনানি বড় হিংসুক। আমি যে আর কাহাকেও ভালবাসি ইহা সে সহ্য করিতে পাতে না।—"

শিলাঙ্গী সহসা উভয় বাহু দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

"আমিও হিংসুক। নিনানির উপর আমারও হিংসা হইতেছে। কিন্তু আমি কখনও তাহার অনিষ্ট করিব না, কারণ তুমি যে তাহাকে ভালবাস।"

আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সে যুগে এমন কথা কাহারও মুখে শুনি নাই। শুনিব বলিয়া প্রত্যাশাও করি নাই। আমার পূর্ব জীবনে জোলমার আবির্ভাবও এমনি অপ্রত্যাশিত ছিল। সে-ও আমাকে ভালবাসিয়াছিল—কেন যে বাসিয়াছিল তাহা জানি না—হয়তো বা আমার মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ ছিল যাহার সম্বন্ধে আমি নিজে সচেতন ছিলাম না, কিন্তু আমি তাহাকে বুঝিতে পারি নাই, কারণ তখন সেরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব আমার ধারণার অতীত ছিল। বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তাহাকে পাইয়াও পাই নাই। অপ্রত্যাশিতকে বুঝিতে সময় লাগে, যখন তাহাকে বোঝা যায় তখন সে আয়ত্তাধীন হইয়া যায়। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনুষ্যত্ব জন্ম-জন্মান্তরে জোলমাকেই কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। আজ এতদূরের ব্যবধানে সেই প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানকে সমগ্রভাবে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে আজও আমি সেই অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত আছি। জোলমাকে নানারূপে বারংবার পাইয়াছি এবং হারাইয়াছি। শিলাঙ্গীর মধ্যেই জোলমা ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার মুখে এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক উক্তি শুনিয়া আমি অভিভূত চিত্তে তাহর দিকে চাহিয়া রহিলাম, আমার সন্দেহও হইল তাহার এ যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা। প্রথম দর্শনে তাহার সম্বন্ধে যে কথা মনে হইয়াছিল আবার সে কথা মনে হইল। সত্যই ও মানবী তো, না কোনও উপদেবতা আমার সহিত ছলনা করিতেছে। কিন্তু আমার সমস্ত বিস্ময়, সন্দেহ, ভয়কে

ছাপাইয়া অপূর্ব আনন্দ একটা আমার অন্তরে উথলিয়া উঠিল। আমার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব যেন ক্ষণিকের জন্য শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, আমি তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া শিলাঙ্গী প্রশ্ন করিল, "তোমার নিনানি দেখিতে কেমন?"

"তুমি তাহাকে দেখিয়াছ। কাল রাত্রে তুমি যে মেয়েটিকে লতা দিয়াছিলেন সে-ই নিনানি।"

"সে-ই নিনানি!"

শিলাঙ্গী তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হাঁ, সে-ই নিনানি। অমন করিয়া উঠিলে যে?"

"সে তো অপরূপ সুন্দরী। আমি তো প্রথমে তাহাকে জ্যোৎস্নাপরী ভাবিয়াছিলাম। আমাদের কথক মিনাহা বলে জ্যোৎস্নাপরী গভীর রাত্রে পৃথিবীতে ফুলের মধু খাইবার জন্য আসে। আমি ভাবিয়াছিলাম মধু খাইবার লোভেই কোনও জ্যোৎস্নাপরী বোধ হয় মহুয়া বনে আসিয়াছে। কিন্তু সে যখন আগাইয়া আসিয়া লতার খোঁজ করিল তখন অবাক হইয়া দেখিলাম অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। তাহার সহিত আলাপ করিয়াও বড় ভাল লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল বাঘের কথা, আমার কাছে যে লতা ছিল তাহারই অংশ দিয়া তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। নিনানি তো চমৎকার মেয়ে। আমার সেই লতা দিয়াই তাহার মাথার আবরণ প্রস্তুত করিয়াছ?"

"হ্যাঁ।"

শিলাঙ্গীর মুখভাবে আবার বিমর্ষতা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "নিনানিকে যখন তুমি ভালবাস তখন কি আর আমাকে তোমার ভাল লাগিবে?"

"নিশ্চয় লাগিবে। তুমি নিনানি নও, কিন্তু তুমিও অপরূপ"—আমার আবেগপূর্ণ এই কথাগুলি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিলাঙ্গী শুনিল। মনে হইল সে যেন বিস্ময়কর কিছু একটা শুনিতেছে। তাহার পর সহসা আবার সে আমার কণ্ঠলগ্না হইল।

"নিনানির সহিত আমার আলাপ করাইয়া দাও।"

"না, তাহা নিরাপদ নয়। নিনানি বড় হিংসুক, বড় প্রতিহিংসাপরায়ণ। হয়তো তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে। তা ছাড়া সে তো আর বেশি দিন বাঁচিবেও না। যে কয়টা দিন বাঁচে তাহার মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি। তোমার সহিত আমার ভাব হইয়াছে জানিতে পারিলে সে কষ্ট পাইবে। তাহার জন্য একটা গুহা দেখিয়া দাও। খালি গুহা আছে কি কোথাও?"

"আছে। উপত্যকায় পরপারে পঞ্চপর্বতে যক্ষিণী বুড়ীর দখলে কয়েকটা খালি গুহা আছে। বুড়ী আমাকে ভালবাসে খুব। আমি যদি বলি একটা গুহা দিতে পারে—"

পঞ্চপর্বতে আমার অভিযানের কথা তখনও শিলাঙ্গীকে আমি বলি নাই। শিলাঙ্গীর কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শিলাঙ্গী ওই বৃদ্ধাকে চেনে নাকি!

"গুহার খোঁজে আমিও পঞ্চপর্বতের দিকে গিয়াছিলাম। যক্ষিণী বৃদ্ধাকে দেখিয়াছি। বড় অদ্ভুত মনে হইল। একটা ময়াল সাপ হরিণ ধরিয়াছিল—"

"ও, ময়াল সাপেটাকেও তুমি দেখিয়াছ। ওটা ওর পোষা ময়াল সাপ। আমরা যেমন কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরি যক্ষিণী তেমন ময়াল সাপের সাহায্যে শিকার ধরে। ময়াল সাপটাকে শিশু অবস্থা হইতে ও নাকি পুষিয়াছে। ময়াল সাপের জন্য ফাঁদ পাতিয়া ও খরগোস, পাখী প্রভৃতি ধরিয়া রাখে। উহার জন্য একটা গুহা ও আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। যক্ষিণী বড় অদ্ভুত লোক। উহার ভাষাও অদ্ভুত। অধিকাংশ কথা ইঙ্গিতে বলে। মনে হয় ও জন্তু-জানোয়ারের ভাষা বোঝে। তাহাদের সহিত তাহাদের ভাষাতেই কথাও কয় মাঝে মাঝে।

"তুমি উহার কথা বুঝিতে পার?"

"পারি বই কি? তুমিও একটু চেষ্টা করিলে পারিবে।"

"তোমার সহিত উহার আলাপ হইল কি করিয়া? ও কে?"

"ও কে তা জানি না। দুধনীর জন্য ঘাস খুঁজিতে একদিন পঞ্চপাহাড়ে গিয়াছিলাম, তখন উহার চেহারা দেখি। প্রথমটা ভয় হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছি। মাঝে মাঝে উহাকে দুধ দিয়া আসি। যক্ষিণী যদিও মাংসাশী, কিন্তু দুধও খুব ভালবাসে।"

"উন্নগা পাহাড়ে ও কোথা হইতে আসিল, উহার বংশপরিচয় কি তাহা জান না?"

"না। তবে আমার মনে হয় ময়াল সাপই উহার বংশদেবতা। কারণ ও ময়াল সাপ ছাড়া আর সমস্তরকম জন্তু আহার করে। যত্ন করে কেবল ময়াল সাপকে।"

"উহার অধিকারে খালি গুহা আছে কিনা তুমি জান?"

"উহার অধিকারে কয়েকটি গুহাই আছে। একটিতে ও থাকে। আর একটিতে থাকে দুইটি ময়াল সাপ। তৃতীয় গুহাটিতে যক্ষিণী শশক, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুদের বন্দী করিয়া রাখে। মাঝে মাঝে এক-একটি জন্তু বাহির করিয়া ময়াল সাপদের খাইতে দেয়। এই তিনটি গুহা প্রায় পাশাপাশি আছে। আর একটু দূরে বেশ বড় গুহা আছে, সেটি খালি।"

"এই ভয়াবহ পরিবেশে নিনানি কি থাকিতে পারিবে?"

"যক্ষিণী যদি থাকিতে দিতে রাজী হয় অনায়াসেই পারিবে। কারণ যক্ষিণী লোক ভাল। সে নিনানিকে যত্নেই রাখিবে। কিন্তু যক্ষিণী যদি রাজী না হয় তাহা হইলে অন্য গুহার সন্ধান করিতে হইবে। আমি ঠিক যক্ষিণীকে রাজী করাইতে পারিব, চলই না চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।"

"বেশ, চল।"

"ব্যাপারটা তুমি উহাকে বুঝাইতে পারিবে তো?"

"আশা করি পারিব।"

...আমরা পুনরায় সেই উপত্যকা অতিক্রম করিতেছিলাম। শিলাঙ্গী ঠিক যেন হরিণীর মতো চলিতেছিল। তাহার সহিত কুরঙ্গিণীর অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। তাহার চক্ষু দুইটি ঠিক যেন কুরঙ্গ-নয়ন। তাহার চাল-চলন গতিভঙ্গী সমস্তই হরিণের মতো। চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে সে আমার স্কন্ধ ধরিয়া ঝুলিয়া লাফাইয়া নামিয়া আবার ছুটিয়া চলিতেছিল। মাঝে মাঝে ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোনও ঝোপে আত্মগোপন করিয়া আমাকে নাকাল করিবার চেষ্টাও করিতেছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া আমি তাহাকে খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি, তখন সহসা তাহার কলহাস্য শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম যে সে আমাকে ঠকাইয়াছে। আমি তাহাকে যেখানে খুঁজিয়াছে সেখানে সে নাই, অনেক দূরে আর একটা ঝোপের অন্তরাল হইতে সে উঁকি দিতেছে। এইভাবে আমরা যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি তখন একটা কথা কেন জানি না আমার মনে হইল। যে উত্তর কেহ কখনও দিতে পারে পাই নাই সেই প্রশ্নটাই শিলাঙ্গীকে আমি করিলাম।

"আচ্ছা শিলাঙ্গী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ঠিক উত্তরটি চাই কিন্তু।"

"কি কথা?"

"তোমার আমাকে ভাল লাগিল কেন?"

"কি জানি।"

টক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া সে আমার কাঁধ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। টপ করিয়া ঝুলিয়া নামিয়া পড়িল আবার। দুরন্ত বালক যেন।

"মনে পড়িয়াছে কেন তোমাকে ভাল লাগিয়াছিল। তুমি যখন সেদিন গাছ হইতে

লাফাইয়া মধুনীকে তুলিয়া গাছে উঠিয়া গেলে, তাহার একটা পা কামড়াইয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে শাখা ধরিয়া আরও উপরে চলিয়া গেলে, তখনই তোমাকে আমার ভাল লাগিয়াছিল।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে মারিবার জন্য বর্শা ছুঁড়িয়াছিলে—"

"বাঃ, ছুঁড়িব না? আমার মধুনীকে তুমি তুলিয়া লইয়া গেলে, তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব না? কিন্তু যখন দেখিলাম তুমি অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, এমন কি আমার বর্শাটাও হস্তগত করিলে, তখন তোমাকে আরও ভাল লাগিয়া গেল।"

শিলাঙ্গী ঘাড় ফিরাইয়া আমার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য নিবদ্ধ করিয়া আবার কিছুদূর ছুটিয়া গেল।

"শোন শোন—"

"কি?"

"তোমাদের ঝোনঝিরাও তোমাকে খুব ভালবাসে নাকি?"

"খুব।"

"তুমিও তাহাকে ভালবাস?"

"মোটেই না। ঝোনঝিরার ইচ্ছা আমাকে বিবাহ করিয়া আমাদের দলের দলপতি হইবে। আমি কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিব না।"

"তোমার ইচ্ছার উপরই তোমার বিবাহ নির্ভর করে নাকি? আমাদের সমাজে তো মেয়ের মা-ই এ বিষয়ে কর্ত্রী, ছেলের মা-ও।"

"আমাদের সমাজেও তাই। আমি দলপতি রোহার কন্যা, আমার মা শঙ্খী রোহাকে বলিয়া গিয়াছে, আমার অমতে রোহা যেন কাহারও সহিত আমার বিবাহ না দেয়। রোহাও শঙ্খীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।"

"শঙ্খী কোথায় গিয়াছে?"

"পরলোকে। সেইজন্যই তো আমার জোর আরও বেশি। শঙ্খী হয়তো মত পরিবর্তন করিতে পারিত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। এখন রোহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতেই হইবে। রোহা লোকও খুব ভাল। সে আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করিবে না।"

ইহার পর ঠিক যে প্রশ্নটি আমার মনে জাগিয়েছিল, তাহা কিন্তু আমি আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গীও কিছু বলিল না, সে কেবল আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

...পঞ্চপর্বতের নিকট সেই স্থানটিকে পৌঁছিয়া দেখিলাম যক্ষিণী নাই, ময়াল সাপ নাই, হরিণও নাই। খড়ের স্তূপগুলি ভস্মে পরিণত হইয়াছে, কোন কোনটার ভিতর হইতে ধূমও বাহির হইতেছে। পাখীগুলিও আর কলরব করিতেছে না, সকলেই স্ব স্ব স্থানে আবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে দেখিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "যক্ষিণী তাহা হইলে বোধ হয় ঝলসানে হরিণটা লইয়া নিজের গুহায় গিয়াছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি খোঁজ লইয়া আসি। আমি ডাকিলে তাহার পর তুমি যাইও। এখন এখানেই দাঁড়াইয়া থাক।"

শিলাঙ্গী চলিয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া একটা কথাই আমার মনে হইতে লাগিল। শিলাঙ্গী যদি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়, রোহাকেও সে যদি সম্মত করাইতে পারে, তাহা হইলে এই অভিনব গো-দগ্ধপায়ী সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু বন্ধুত্ব হইলেও আমাদের মঙ্গল হইবে কি? সে কথা স্থির করিবে ধবল কিংবা বিঘাও। তাহারা যদি আপত্তি করে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে না। নিতান্তই যদি বিবাহ

করিতে হয়, দলত্যাগ করিতে হইবে। রোহার দল কি আমাকে আশ্রয় দিবে? আশ্রয় পাইলেও কি শান্তিতে থাকিতে পরিব? ঝোনঝিরার কথা মনে পড়িল। ঝোনঝিরা যদি কিছু না-ও বলে তাহা হইলেও কি সুখে থাকিতে পারিব? আমাদের এই পুরাতন দল, যে দলের সহিত আমি আজন্ম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি, যে দলের জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া আমার পিতা সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে দলে আমার মায়ের একদা একাধিপত্য ছিল, যে দলে আমার সহোদর-সহোদরার সংখ্যা বাইশজন, যে দলের সহিত আমি কত দেশ-দেশান্তর পর্যটন করিয়াছি, আমার সর্বপ্রকার শিক্ষা-দীক্ষা যে দলের মধ্যে হইয়াছে, যে দলের কত কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়ার সহিত আজও আমার সম্বন্ধ নিবিড়, সে দল ত্যাগ করিয়া আমি কি থাকিতে পারিব? তাছাড়া নিনানি, নিনানির যদি মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? আর একটা কথাও মনে পড়িল। ধবল উলম্ভনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছে, তাহর ফলাফল কি হইবে তাহা অনিশ্চিত। যদি যুদ্ধ বাধে, সে যুদ্ধে আমাকেও যোগ দিতে হইবে। এ অবস্থায় দলত্যাগের কথা ভাবাই অনুচিত। শিলাঙ্গীকে স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য কিন্তু সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিতেছিল। পঞ্চপর্বতের শিখরলগ্ন একখণ্ড শুভ্র মেঘের মতো তাই আমার চিন্তা নানাভাবে নিজেকে প্রসারিত করিয়া আমার মনের মধ্যে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। সহসা শিলাঙ্গীর ডাক শুনিতে পাইলাম। ঘাড়া ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী একটি বৃক্ষের উপরে উঠিয়াছে। বৃক্ষশীর্ষ হইতে সে আমাকে ডাকিতেছিল। সেই দিকেই অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিতে পাইলাম, শিলাঙ্গী আমার দিকে আসিতেছে। ছুটিয়া আসিতেছে।

"যক্ষিণীর সহিত দেখা হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"তাহাকে সব কথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি। সে নিনানির জন্য গুহা দিতে রাজী আছে। নিনানি আসিবে শুনিয়া সে খুব খুশি। বলিতেছিল একা একা তাহার আর ভাল লাগে না। একজন সঙ্গিনী যদি তাহার কাছে থাকে, সে তাহাকে যত্ন করিয়া রাখিবে। তুমি চল না, আলাপ করিবে।"

যক্ষিণীর গুহাটি বেশ বড় এবং সুরক্ষিত। আমি গিয়া দেখিলাম, সে আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঝলসানো হরিণের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। আমার দিকে সে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল, তাহার পর শিলাঙ্গীর দিকে চাহিয়া অদ্ভুত ভাষায় কি বলিল বুঝিতে পারিলাম না।

শিলাঙ্গী বলিল, "যক্ষিণী জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি কি হরিণের মাংস খাইবে? খাইতে চাহিও না। চাহিলে হয়তো ও তোমাকে একটু মাংস দিবে কিন্তু খাদ্যে ভাগ বসাইলে যক্ষিণী মনে মনে খুব চটিয়া যায়। কারণ বড় পশুর মাংস ও আজকাল বড় একটা পায় না। ময়াল সাপ যদি কোনও দিন কিছু ধরে তবেই পায়। ফাঁদ পাতিয়া খরগোস ইঁদুর ধরে, তাহারও ভাগ ময়াল সাপকে দিতে হয়। আমি মাঝে মাঝে উহাকে খাদ্য আনিয়া দিই, তাই ও আমার উপর খুব খুশি।"

শিলাঙ্গীর কথা শুনিয়া যক্ষিণীর দিকে চাহিয়া আমি মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিলাম যে মাংস আমার চাই না। যক্ষিণী আপন মনে মাংস খাইতে খাইতে শিলাঙ্গীর সহিত মাঝে মাঝে কথা বলিতে লাগিল। বানরের কিচির-মিচিরের সহিত শালিকের ভাষা মিশিলে যেমন শোনয়, যক্ষিণীর ভাষা অনেকটা সেইরূপ শুনাইতে লাগিল। দেখিলাম শিলাঙ্গীও সে ভাষা কিছু কিছু শিখিয়াছে। বলিতে না পারিলেও বুঝিতে পারে। কথা বলিতে বলিতে যক্ষিণী সহসা ভীত শালিকের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর শিলাঙ্গীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পাহাড়ের গায়ে কি দেখাইতে লাগিল।

...আস্তানায় ফিরিয়া দেখিলাম, বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের

অনুপস্থিতির জন্য ততটা নয় ধবল এবং চম্মনা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া। তাহার যে সংবাদ আনিয়াছিল তাহা সত্যই চাঞ্চল্যকর। ধবলকে ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইয়া ছিল।

ধবল বলিতেছিল, আমরা যখন এখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন কিছুক্ষণ গজন্ধর কোনও কথা বলে নাই। কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করিল। আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেহ মরিয়া গেলে আমরা কিভাবে শব সৎকার করি। আমি উত্তর দিলাম, আমরা মৃতদেহকে পুঁতিয়া ফেলি। মৃতদেহের সহিত খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রও দিই। বিশেষ করিয়া যে জিনিস তাহার প্রিয় ছিল, সেই জিনিসগুলি আমরা যত্নের সহিত শবের নিকটে রাখিয়া দিই। তাহার পর প্রতি মাসে মাসে তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সেই কবরের পাশে বসিয়া প্রার্থনা করে যেন তাহার প্রেতাত্মা নিম্ব-সম্প্রদায়ের সহায়ক হয়। তাহাদের তুষ্ট রাখিবার জন্য আমরা তাহার কবরের পাশে পশুবলিও দিয়া থাকি।' আমার কথা শুনিয়া গজন্ধর একটু হাসিল মাত্র, কিছু বলিল না। ঘিসু নিম্নকণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল সহসা, এসব কথা তুলিবার অর্থ কি। ভংগা ফিসফিস করিয়া বলিল, মৃত্যু প্রসঙ্গ বড়ই অমঙ্গলসূচক। আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আবার কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর গজন্ধর বলিল, 'নিম্ব-সম্প্রদায় অনেক বিষয়ে এখনো অনেক পিছাইয়া আছে। তাহার প্রথম প্রমাণ পাইয়াছি তোমাদের খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া, দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলাম তোমাদের শবসৎকারের ব্যবস্থা শুনিয়া। প্রেতাত্মার প্রতি কি করিয়া সম্যক সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা এখনও তোমরা শিখ নাই। শবদেহকে কেবল মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই প্রেতাত্মা শান্ত হয় না, অশান্ত হয়। মাটির কীটপতঙ্গ যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খায়, তখন প্রেতাত্মা অস্থির হইয়া ওঠে। তাহারা অস্থির হইয়া উঠিলে চতুর্দিকে অমঙ্গল হয়। এই যে দেশব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিয়াছে তাহার কারণ ইহাই। অশান্ত ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মাদের উষ্ণ নিঃশ্বাসে দেশ জ্বলিয়া যাইতেছে। সেইজন্য উলম্ভন নিয়ম করিয়াছে যে, মাটির নিচে পাথরের ঘর প্রস্তুত করিয়া সেই ঘরে শবদেহকে স্থাপন করিতে হইবে, তবে সে শান্ত থাকিবে। মাটির কীটপতঙ্গদল যখন তাহার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে পশুবলি দিলে তাহার অশান্তি কমিবে না বাড়িবে। দলপতি উলম্ভন সেইজন্য স্থির করিয়াছে যে, তাহার রাজত্বে কাহাকেও সে শবদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে দিবে না। কি করিয়া শবদেহকে সৎকার করিতে হয়, তাহা হাতেকলমে সে সকলকে শিখাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছে। তোমরাও তাহা শিখিয়া আসিবে।'—এই পর্যন্ত বলিয়া গজন্ধর আবার চুপ করিয়া গেল। এসব আলোচনার কোনও তাৎপর্য আমি ধরিতে পারিলাম না। নীরবে গজন্ধরের অনুসরণ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না, মনে মনে নিম্ব-দেবতাকে স্মরণ করিয়া তাহাই করিতে লাগিলাম। বড়ই অস্বস্তি হইতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিবার পর দিগন্তবিস্তৃত এক বিরাট অরণ্য দেখা গেল। সে অরণ্য শুধু বিরাট নয়, তাহা অদ্ভুত। তাহা জীবন্ত নয়, মৃত। বিশালাকৃতি গগনচুম্বী মহীরূহদল প্রেতের মতো সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে রাশি রাশি শুষ্কপত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মাটিও ফাটিয়া গিয়াছে। মাটির বর্ণ কৃষ্ণ নয়, পিঙ্গল। কোথাও কোথাও বালুকা ধূ ধূ করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইয়া একটা চাপা কান্নার মত শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল বহুদূর হইতে বহুলোক আর্তনাদ করিতেছে। তাহার পরই একটা হাওয়া উঠিল, শুষ্কপত্রের রাশি হাওয়ায় আবর্তিত হইতে লাগিল, দেখিলাম বিরাটাকৃতি বৃক্ষ-কঙ্কালগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম, হাওয়ার জন্য অরণ্যের ভিতর হইতে ওই প্রকার শব্দ হইতেছে। কিন্তু তাহা মর্মরধ্বনি নহে, তাহা মৃত অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস। গজন্ধর সেই অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিল। একটু ইতস্তত করিয়া আমরাও করিলাম। মৃত অরণ্যে আর কখনও প্রবেশ করি নাই। মনে হইল যেন মৃত্যুপুরীতে প্রবেশ

করিয়াছি। অরণ্যের ভিতর অন্ধকার। শিহরিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই গজন্ধরের কথা শুনিতে পাইলাম। গজন্ধর বলিল, 'তোমাদের অনাচারের জন্যই নিদারুণ অনাবৃষ্টি হইয়াছে, সেই অনাবৃষ্টির ফলেই এই বিরাট অরণ্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার জন্য তোমরাই দায়ী। এই মৃত অরণ্যের ভিতরে দাঁড়াইয়া আজ তোমরা শপথ কর যে, এইবার মৃতের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। শপথ কর যে উলম্ভনের স্বীকার করিয়া তোমরা তাহার নিকট হইতে কবর প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিবে। যাহারা তোমাদের শিক্ষা দিবে, তাহারা তোমাদের লইতে আসিয়াছে, তোমরা ইহাদের সঙ্গে যাও। আমি দুই দিন পরে গিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি অরণ্যের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমাদের তিনজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। দেখিলাম প্রত্যেকটি লোকই বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকৃতি। সংখ্যাতেও তাহারা অনেক। যদিও আমরা তিনজনই সশস্ত্র ছিলাম, কিন্তু তবু দেখিলাম ইহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। গজন্ধর বলিল, 'কোনও ভয় নাই, ইহাদের অনুগমন কর। আপাতত তোমাদের প্রস্তর বহন করা ছাড়া আর কিছু করিতে হইবে না।' আমি বলিলাম, 'তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া আমরা আসিয়াছিলাম তোমাদের দলপতি উলম্ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। এখন আমাদের প্রস্তর বহন করিতে বলিতেছ কেন?' গজন্ধর বলিল, 'প্রস্তর বহন না করিলে উলম্ভন কাহারও সহিত দেখা করে না। তোমরা প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া গেলেই সে তোমাদের সহিত আলাপ করিবে।' ঘিসু এতক্ষণ নীরব ছিল। সে বলিল, 'প্রস্তর লইয়া উলম্ভন কি করিবে বুঝিতে পারিতেছি না।' গজন্ধর উত্তর দিল, 'প্রস্তর দিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। তাহা দেখিয়াই তোমরা শিক্ষালাভ করিবে কি করিয়া কবর প্রস্তুত করিতে হয়। যাও শোহান্‌কি পর্বত হইতে প্রস্তর বহন করিয়া লইয়া যাও, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবে।' ঘিসু প্রশ্ন করিল, 'প্রস্তর কি আমাদের মাথায় করিয়া বহন করিতে হইবে। গজন্ধর বলিল 'না, টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। শোহান্‌কি পর্বতে বহু কর্মী পর্বত গাত্র হইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিতেছে। সেই বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলিকে দড়ি বাঁধিয়া বহুলোক মিলিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যায়। যাও তোমরা গিয়া সেই দলে যোগদান কর।' ভংগা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'যদি আমরা না যাই!' গজন্ধর উত্তর দিল, 'তাহা হইলে ইহারা বলপূর্বক তোমাদের বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। নির্বোধের মতো আচরণ করিও না। ইহাদের অনুগমন কর।' গজন্ধরের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। আমি মনে মনে নিম্ব-দেবতাকে ডাকিতেছিলাম। চক্ষুর ইশারায় ভংগাকে প্রতিবাদ করিতে বারণ করিলাম। কারণ নির্বোধের মতো বাদানুবাদ করিয়া লাভ হয় না, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আকস্মিক কিছু করিলে ক্ষতিই হয়। গজন্ধর আর কিছু না বলিয়া বনান্তরালে অন্তর্ধান করিল। তাহার পর সেই লোকগুলি আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধিতে উদ্যত হওয়াতে আমি আপত্তি করিলাম। বলিলাম আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তোমাদের অনুসরণ করিব, দড়ি বাঁধিবার প্রয়োজন নাই। আমার এই কথায় তাহারা নিবৃত্ত হইল, নিম্ব-দেবতাই বোধ হয় তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন। তাহার পর তাহাদের অনুসরণ করিয়া আমরা গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার প্রার্থনা বিফল হয় নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই ব্যাঘ্রের গর্জন শোনা গেল। নিম্ব-দেবতাই ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া বোধ হয় গর্জন করিলেন। সহসা দেখিলাম সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি লোকগুলি সভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছে। আমরাও সকলে পলায়ন করিতে লাগিলাম। সেই গভীর অরণ্যে ছত্রভঙ্গ হইয়া কে যে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, আমি একা একটা কণ্টকবনের ভিতর আটকাইয়া পড়িয়াছি। চতুর্দিকে কেহ নাই। ভংগা ঘিসুর নাম ধরিয়া তিনবার ডাকিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না।

তখন একাই নিম্ন-দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে বনের মধ্যে যদৃচ্ছ চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চলিবার পর সহসা দেখিলাম বন শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রান্তরের অপর প্রান্তে অপ্রত্যাশিতভাবে চম্মনাকে দেখিতে পাইলাম। চম্মনাকে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিয়া নিনানি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। এখন যদি আমি চম্মনাকে দেখিতে না পাইতাম তাহা হইলে হয়তো এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। গজন্ধরের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়াছিলাম, রাত্রিও অন্ধকার ছিল, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়াছি, এইটুকু মনে ছিল শুধু, চম্মনাকে না পাইলে আমি হয়তো পথই চিনিতে পারিতাম না। নিনানি কোথায়, তাহাকে দেখিতেছি না—"

ধবল সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কোনও উত্তর দিতে সাহস করিল না। অবশেষে ধবলের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল এবং নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

আমি বলিলাম, 'নিনানি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল রাত্রিতে সে কন্যা নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

"কেন?"

ধবলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমি তখন তাহাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। সমবেত সকলেই রুদ্ধশ্বাসে আমার বর্ণনা শুনিল। জনতার মধ্যে বিঘাও ছিল, সে-ও শুনিল। দেখিলাম তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে তাহার মুখমণ্ডল হইতে এক অস্বাভাবিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমার বর্ণনা শেষ হইলে ধবল বিঘাওয়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, কোন কথা বলিল না। বিঘাওয়ের আচরণের প্রতিবাদ করিতে কেহই সাহস করিত না, এমনকি দলপতি ধবলও না। ধবলের মৌন দৃষ্টি কিন্তু নীরব ভাষায় যাহা বলিল, কথা দ্বারা তদপেক্ষা সে বলিতে পারিত না। সে চাহনি বিঘাওকেও বিচলিত করিল।

বিঘাও বলিল, "তুমি চলিয়া যাইবার পর আমি মূর্ছিত হইয়া পড়ি। তাহার পর আমার মধ্যে তোমার প্রমাতামহ আসিয়া আমার মুখ দিয়া কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আমি জানি না। আমার মূর্ছা যখন ভাঙিল তখন দেখিলাম নিনানিও মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া গান করিতেছে। আমি তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে বলিলাম। সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তাহার পর কি ঘটিয়াছে আমিও জানি না। জংলা যাহা বলিতেছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং মর্মান্তিক। জংলা, তুমি কি স্বচক্ষে দেখিলে সে ডুবিয়া গেল?"

আমি তখন মিথ্যা কাহিনীটা বিশদতর করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলাম।

বলিলাম, 'আমি গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। মনে হইল আমাদের ক্ষেতে বোধ হয় কোনও জানোয়ার আসিয়াছে। বাহির হইয়া কিন্তু কোনও জানোয়ার দেখিতে পাইলাম না। ক্ষেতের যে অংশটুকু আমাদের আস্তানা ছড়াইয়া কন্যা নদীর বাঁকের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, মনে হইল সেই অংশে কি যেন নড়িতেছে। আমার সন্দেহ হইল হয়তো খরগোষের দল আসিয়াছে। ক্ষেতের ভিতর দিয়াই আমি আগাইয়া যাইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে সহসা কন্যর নদীর জলে একটা আলোড়ন শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন ঝাপাৎ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। সন্দেহ হইল—হয়তো উদবিড়াল বা অন্য কোনও জলজন্তু। ছুটিয়া কাছে গিয়া কিন্তু দেখিলাম নিনানি। নিনানিও আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে বলিল—'কানার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমি স্নান করিতে আসিয়াছি। বিঘাওয়ের ঘায়ের পুঁজরক্ত মাথায় করিয়া আমি থাকিতে পারিব না। ইহার জন্য কানা যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় দিক।' এইটুকু বলিয়াই কিন্তু পরমুহূর্তে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, 'আমাকে

জলের তলায় কে যেন টানিতেছে, আমি তলাইয়া যাইতেছি, গেলাম, গেলাম।' নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। বহুবার ডুবিয়া ডুবিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহাকে আর ধরিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া আসিয়া সকলকে খবর দিই, কিন্তু আবার মনে হইল খবর দিতে গেলে দেরি হইয়া যাইবে, নিনানিকে পাইবার আশা তাহা হইলে একেবারেই আর থাকিবে না। আমার চক্ষুর সম্মুখে সে যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে, আমিও বরং সে স্থানটা ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখি। পাগলের মতো আমি ক্রমাগত ডুবিয়া ডুবিয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ মনে হইল, কন্যা নদীর স্রোতের বেগ বাড়িতেছে, তাহা যেন আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে। সেই স্রোতের বেগে গা ভাসাইয়া দিলে নিনানি যে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে সে স্থান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে এই আশঙ্কায় আমি স্রোতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলাম। কন্যা নদীর সহিত কাল সমস্ত রাত্রি মল্লযুদ্ধ করিয়াছি। আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু কন্যা যে অবশেষে আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল একটু আগে তাহার প্রমাণ পাইলাম। ওই বাঁকের মুখে যে গাছ তিনটি জলের উপর ঝুঁকিয়া আছে, চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমি সেই গাছের তলায় পড়িয়া আছি। ও স্থানে যে কি করিয়া আসিলাম তাহা জানি না। মনে হয় আমি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলাম, আমার দেহটাকে কন্যা নদী ভাসাইয়া আনিয়া তীরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। আমি এতক্ষণ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সকলে আমার এই কল্পিত কাহিনী নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছিল, আমার নিজের কাহিনী শুনিয়া আমি নিজেই মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিলাম। আমি যে রূপকথা সৃষ্টি করিতে পারি তাহা আমি নিজেও জানিতাম না। আমার কাহিনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একটা ভয়সূচক আর্তধ্বনি করিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল, পুরুষদের মধ্যে অনেকে বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। সকলেই যে শোকাক্রান্ত হইয়াছে তাহা মনে হইল ন, ধবলের তুষ্টি বিধানের জন্যই অনেকে শোকের অভিনয় করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ধবল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রবীণা পত্নী ইলচি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং বলিল, "তুমি যখন ওই অজ্ঞাতকুলশীলা বিধবাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছিলে তখনই আমি তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। অপরাজিতা বংশের নামও আমরা কেহ কখনও শুনি নাই। আমাদের কলঞ্জা জমির সন্ধানে বাহির হইয়া কোথা হইতে যে উহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিল তাহা কাহাকেও বলে নাই। উহাকে বিবাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কলঞ্জা মারাও গেল। আমার বিশ্বাস নিনানি মায়াবিনী ছিল, এখন তোমার না কোনও অমঙ্গল হয়। তাহার প্রেতাত্মার জন্য কিন্তু একটা ব্যবস্থা কর। ওঠ—"

ধবল উঠিয়া দাঁড়াইল। ইলচির জ্যেষ্ঠপুত্র মোকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নিনানি ফুল ভালবাসিত। তাহার তৃপ্তির জন্য তোমরা আজ কন্যা নদীকে ফুল দিয়া সাজাও। তুমি সকলকে লইয়া যাও, ফুল সংগ্রহ করিয়া আন।"

ঘিসুর প্রবীণা পত্নী নারো এবং ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিল।

নারো বলিল, "ঘিসু কবে ফিরিবে?"

সাংরা বলিল, "আমি আর কতদিন উপবাস করিব?"

ধবল বিপন্ন বোধ করিলে চক্ষু বুজিয়া ফেলিত। সে কোনও উত্তর না দিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল।

নারো বলিল, "আমি গোক্ষুর বংশের মেয়ে। আমি প্রতিশোধ লইব। ঘিসু দুই-এক দিনের মধ্যে যদি ফিরিয়া না আসে, আমরা সকলে উলম্ভনের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিব, উলম্ভনকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া আসিব।"

"আমরাও তোমারও সঙ্গে যাইব।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ঘিসুর দ্বাদশ পত্নী এবং চল্লিশটি পুত্র কন্যা নারো। -র পিছনে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সকলেরই দক্ষিণ বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত এবং হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। পরমুহূর্তেই সাংরা এবং সাংরার সপত্নীগণ পুত্রকন্যাসহ নারোর দলে আসিয়া যোগদান করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, "আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব।"

ধবল চক্ষু বুজিয়া ছিল, বুজিয়াই রহিল। তাহার পর কলরব যখন একটু প্রশমিত হইল তখন ধীরে ধীরে বলিল, "ঘিসু এবং ভাংগার জন্য আমিও কম চিন্তিত নই। তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমিও নিম্ন-দেবতার নিকট প্রতিমুহূর্তে প্রার্থনা প্রেরণ করিতেছি। চিন্তাও করিতেছি তাহারা যদি না ফেরে কি উপায়ে তাদের ফিরাইয়া আনা সম্ভব। কিন্তু গজন্ধরের আচরণ হইতে এবং অরণ্যমধ্যস্থ ওই লোকগুলির আকৃতিপ্রকৃতি হইতে এইটুকু আমি বুঝিয়াছি যে, হঠকারিতা করিতে হইলে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমার প্রমাতামহ কানাকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। বিঘাওয়ের ওপর ভর করিয়া নিনানিকে তিনি যে শাস্তিদান করিয়াছেন তাহাতে তাহার রোষেরই পরিচয় পাইতেছি। তিনি কেন রুষ্ট হইয়াছেন তাহা আগে আমাকে জানিতে দাও। আমাকে কিছু সময় দাও তোমরা। তোমরা যদি শোকাবেগে অধীর হইয়া এখনই উলস্তনের উদ্দেশে যাত্রা কর, তাহার একটি মাত্রই সুনিশ্চিত ফল হইবে। কয়েকদিন পরে তোমাদের জন্যও আমাদের শোক করিতে হইবে। তোমরা ধৈর্য ধরিয়া কিছুকাল অপেক্ষা কর। যে বৃক্ষ আমাদের কুলদেবতা, তিনি ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, তাই তিনি ফলবান। তোমরা অধীর হইও না। নিনানির প্রেতাত্মাকে তৃপ্ত করিবার জন্য মোকা ফুল সংগ্রহ করুক, কানাকে তুষ্ট করিবার জন্য এস আমরা সকলে নিজ নিজ শরীর হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া নিম্ন-বৃক্ষতলে উপহার দিই। ইহাতেই সুফল ফলিবে। অধীর হইলে কোন লাভ হইবে না। তোমরা এ সবরেই আয়োজন কর। আমি একবার আমাদের ক্ষেতগুলি পরিদর্শন করিয়া আসি।"

দলপতি ধবলের এই কথাগুলিতে কাজ হইল। সাংরা এবং নারোর দল ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। বিঘাও এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ধবল উঠিয়া যখন ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল তখন সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। হঠাৎ মাটির উপর সে ভেকের মতো শুইয়া পড়িল এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া অদ্ভুত একটা শব্দ করিতে লাগিল—"ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক।" বালক-বালিকারা তাহাকে ভয় করিত, তাহারা পলায়ন করিল। আমরাও অনেকে ভীত হইলাম, আবার কোন উপদেবতা আসিয়া ভর করিলেন নাকি! বিঘাও কিন্তু একটি কথাও বলিল না। সে কেবল ঘেক ঘেক ঘেক ঘেক শব্দ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। তাহার পর ভেকের মতোই লাফাইতে লাফাইতে সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। বিঘাও যে শব্দ করিতেছিল তাহা অনেকটা কুকুরের ডাকের মতো, কিন্তু ভেকের অনুকরণে সে কেন লাফাইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভীত হইয়া পড়িলাম।

...কিছুক্ষণের মধ্যেই কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে পুষ্পসম্ভার দুলিতে লাগিল। যে ক্ষুদ্র নিম্ব-বৃক্ষটি আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতাম সেই বৃক্ষের তলদেশ, কাণ্ড, এমন কি শাখা-প্রশাখা পর্যন্ত আমাদের রক্তে চর্চিত হইয়া গেল। আমরা যখন পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম তখন কয়েকটি নিম্ববৃক্ষের চারা এবং বীজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলি আমাদের ক্ষেতের ধারে ধারে রোপণ করা হইয়াছিল। আমাদের আশঙ্কা ছিল নূতন স্থানে নিম্নবৃক্ষ যদি না থাকে আমরা মুশকিল পড়িব। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইয়াছিল, উন্নগা পর্বতের সানুদেশে একটি ক্ষুদ্র নিম্নবৃক্ষ আবিষ্কার করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। বিপদে পড়িলে এই বৃক্ষতলেই আসিয়া আমরা পূজা করিতাম। আমাদের

ক্ষেতের ধারে যে ছোট ছোট চারাগুলি আমরা পুতিয়াছিলাম, ধবলের নির্দেশ অনুসারে সেগুলিকেও রক্তসিক্ত করা হইল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্গুলি বিদ্ধ করিয়া যে রক্ত বাহির হইল, সেই রক্তবিন্দুগুলি তাহাদের শাখায়-পত্রে চম্মনা লাগাইয়া দিল। চম্মনার উপরই এই ভার পড়িয়াছিল। সেই তীক্ষ্ণমুখ এক প্রস্তরছুরিকা দিয়া সকলের অঙ্গুলি হইতে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল। লক্ষ্য করিলাম এই সুযোগে সে কয়েকটি আসন্ন-যৌবনা কিশোরীর নিকট প্রণয়, দাবী করিতেছে, বলিতেছে তাহারা যদি অসম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহাদের অঙ্গুলিতে এমনভাবে ছুরিকাঘাত করিবে যে রক্ত আর বন্ধ হইবে না। উন্নগা পর্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র নিম্ন বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া যে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল সেখানে রক্তমোক্ষণ করিতেছিল ধবলের পত্নীরা। তাহাদের সহায়তা করিতেছিল সাংরা এবং নারো।

...নিম্ন-বৃক্ষতলে রক্তদান করিয়া আমি তাড়াতাড়ি ভিড় হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। উন্নগা পাহাড়ে ফিরিয়া গিয়া শিলাঙ্গীর সহিত দেখা করিবার জন্য আমার সমস্ত চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেখা পাইব কিনা কিছুই ঠিক ছিল না; তবু সেই উদ্দেশ্যই আমি উন্নগা পর্বতের দিকেই চলিয়াছিলাম। যাইতে যাইতে সহসা আবার বিঘাওয়ের কথা মনে হইল। সে ওরূপ করিল কেন? আমার মিথ্যাচরণ সে কি যাদুশক্তিবলে জানিতে পারিয়াছে? ভেকের মুখে কুকুরের ভাষা দিয়া সে কি এই কথাই বলিতে চাহিল, ভেকের মুখ হইতে কুকুরের ডাক বাহির হওয়া যেমন অসম্ভব, বিঘাওকে প্রতারণা করাও তেমনি অসম্ভব। সে কি যাদুশক্তিবলে সব জানিতে পারিয়াছে? ধবল চলিয়া যাইবার পরই সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল—"তোমাদের সর্বনাশ রাত্রির অন্ধকারের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে"—তাহা তো নিতান্ত মিথ্যা নয়। গজন্ধরের আচরণ, ঘিসু-ভংগার অন্তর্ধান সত্যই অমঙ্গল সূচক। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়াছিলাম। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যে ক্ষতি আমাদের হইয়াছিল তাহাও ভয়াবহ। আবার যদি যুদ্ধ বাধে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। মনে হইল বিঘাওয়ের খবরটা একবার লওয়া যাক। দেখা যাক আমাকে সে কিছু বলে কিনা। এখন তাহার কুটীরের কাছে কেহ নাই (তাহার কুটিরে কাছে কেহ থাকিতেও চাহিত না), আমাকে দেখিলে হয়তো সে কিছু বলিতে পারে। বিশেষত তাহার অদ্যকার অদ্ভুত আচরণের কারণ যদি আমি হই নিশ্চয় কিছু বলিবে। উন্নগা পর্বতে কিছুদূর উঠিয়া গিয়াছিলাম, পুনরায় নামিয়া আসিলাম।

...বিঘাও কুটিরের বাহিরে বসিয়াছিল, তাহার হস্তে ছিল মৃত বাঘের থাবাটা। এটি তাহার অতিশয় প্রিয় বস্তু ছিল। তবে কোথা হইতে কোন্ মৃত বাঘের দেহ হইতে যে সে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। বাঘের সম্মুখের একটা পা-কে সে যষ্টির মতো ব্যবহার করিত। তাহার ভিতরে মাংস ছিল না। হাড়টা ছিল, চামড়াটা ছিল আর ছিল নখগুলি। চামড়ার খোলটার ভিতর বিঘাও নানাপ্রকার মাটি, পাথরের টুকরা, গাছের শিকড় প্রভৃতি পুরিয়া রাখিত। অদ্ভুত জিনিস ছিল সেটা একটা। আমি দূর হইতে দেখিলাম, বিঘাও নিবিষ্ট চিত্তে বাঘের নখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতেছে। নখগুলিকে সে সূক্ষ্ম লতা দিয়া এমনভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে সেগুলি খুলিয়া পড়িয়া যায় নাই। আমি গিয়া তাহার সম্মুখে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিকে এইভাবেই তখন আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতাম। তাহার পর উঠিয়া অদূরে উপবেশন করিলাম। বিঘাও কিন্তু এমনভাবে ব্যাঘ্রনখগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল যেন সে আমাকে দেখেই নাই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর অবশেষে আমি কথা কহিলাম।

বলিলাম, "আমাদের এই বিপদে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।"

বিঘাও ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তাহার পর উত্তর দিল, "প্রস্তরের উপর বীজ বপন করিলে তাহা

অঙ্কুরিত হয় না। প্রস্তরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিলেও হয় না। প্রস্তরকে সরাইয়া দিয়া মাটি খুঁড়িয়া বীজ বপন করিলে অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা আছে।"

এই কথা কয়টি বলিয়া আবার সে বাঘের থাবাটা উলটাইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আমি আবার একটি প্রশ্ন করিলাম।

"নিনানির প্রেতাত্মা কিসে তৃপ্ত হইবে? শুধু ফুল দিলেই হইবে কি?"

"নিনানির মৃতদেহ যতক্ষণ না দেখা যাইবে, ততক্ষণ তাহার প্রেতাত্মা বিষয়ে কোনও আলোচনা করা বৃথা। আমার বিশ্বাস তাহার যদি কোনও কারণে অতৃপ্তি হয় সে নিজেই আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিবে।"

তাহার পর সহসা সে আমার উপর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বাঘের থাবাটি তুলিয়া ধরিল এবং নখরগুলি দেখাইয়া বলিল, 'ইহাদের তীক্ষ্ণতার মধ্যেই আমি প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছি। ইহারা মৃত নয়, জীবন্ত। ইহাদের নির্দেশ অমোঘ, লক্ষ্য সুনিশ্চিত।" আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, দ্রুতবেগে উঠিয়া পলায়ন করিলাম। বিঘাও অট্টহাস্য করিতে লাগিল।

...দূর হইতে দেখিতে পাইলাম ধবল নদীতীরে একা বসিয়া আছে। তন্ময় একাগ্র হইয়া বসিয়া আছে, কন্যা নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে যে কলধ্বনি জাগিয়াছে তাহারই নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিবার প্রয়াস করিতেছে মনে হইল। আর একটু কাছে আসিয়া দেখিলাম সে প্রার্থনা করিতেছে। তাহার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত, পাণিদ্বয় যুক্ত। ধবলও প্রতিকারের উপায় সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু ভিন্নপথে।

...শিলাঙ্গির সন্ধানে উন্নগার উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন সুরঙ্গের যে মুখটি দিয়া প্রবেশ করিয়া আমি কথকের অদ্ভুত কথকতা শুনিয়াছিলাম সেই মুখের ভিতর ঢুকিয়া বসিয়া রহিলাম। ঠিক করিলাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যদি তাহার দেখা না পাই নিনানির কাছে যাইব। নির্জন সুড়ঙ্গমুখে বসিয়া বসিয়া বিগত কয়েক দিনের ঘটনাবলীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে হইল কন্যা নদীর তীরে প্রথম ফসল বেশ নির্বিঘ্নে হইয়াছিল, ফলিয়াছিল প্রচুর। কিন্তু দ্বিতীয় ফসলের বেলায় একটা না একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অনাবৃষ্টির জন্য কন্যা নদীতে বান হয় নাই, ফসলও তাই এবার কম ফলিয়াছে। সহসা মনে হইল নিনানিকে এমনভাবে লুকাইয়া রাখা কি ঠিক হইয়াছে? তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটু আগে যে মিথ্যার জাল রচনা করিলাম, সেই জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িব না তো? আমাদের সমস্ত সম্প্রদায় জড়াইয়া পড়িবে না তো? বিঘাওয়ের কথা শুনিয়া মনে হইল নিনানির মৃত্যুসংবাদ সে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নাই। বাঘ নখের মধ্যে সে কিসের প্রতিকার সন্ধান করিতেছিল? আমাকে সন্দেহ করে নাই তো? একটা অনির্দিষ্ট ভয় আমার সমস্ত চেতনাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ভয় হইতে লাগিল কানা যদি ভীষণ প্রতিশোধ লয়? নিনানিকে এমনভাবে শুধু শুধু লুকাইয়া রাখিতে গেলাম কেন? ধবল এবং বিঘাওয়ের নিকট যদি সত্য কথা সরলভাবে স্বীকার করি, তাহা হইল কি হয়? তাহারা এখন এই সত্যের মূল্য দিবে কি? নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করিয়াছিল। সহসা শিলাঙ্গীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সে তাহার গাভীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল।

"দুধ—নী, দুধ—নী—"

মনে হইতেছিল কোনও অচেনা পাখীর ডাকে সমস্ত উপত্যকাটাই যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমি সুড়ঙ্গমুখ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম শিলাঙ্গী একবোঝা সবুজ

ঘাস লইয়া একটা গাছের ডালে বসিয়া আছে। সবৎসা গাভীটি মাঝে মাঝে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কিন্তু কাছে আসিতেছে না।

"আমি তাহা হইলে ঘাস এইখানে ফেলিয়া দিয়া চলিলাম। অন্য গরু যদি খাইয়া যায় আমি জানি না।"

শিলাঙ্গী তখনও আমাকে দেখিতে পায় নাই। গাভীর উদ্দেশে উক্ত কথাগুলি বলিয়া সে অধীরভাবে পা দুইটি দোলাইতে লাগিল। গাভী আর একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাছে আসিল না।

"দুধনী—আহ্—আহ্—আহ্। মধুনী, মধুনী—"

সহসা দুধনী মধুনী উর্ধ্বপুচ্ছে পলায়ন করিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। শিলাঙ্গীও ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং টপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। ঘাসের বোঝাটাও নীচে পড়িয়া গেল।

"উহাদের অদৃষ্টে আজ আর ঘাস নাই দেখিতেছি। এখনই অন্য গরু আসিয়া খাইয়া যাইবে।"

"তুমি গাছে উঠিয়াছিলে কেন? উহাদের কাছে গিয়া দিলেই পারিতে—"

"কাছে গেলে গুঁতাইতে আসে।"

"তুমি ঘাস দাও তবু গুঁতাইতে আসে?"

"বোকা যে।"

হাসির আভা তাহার চোখেমুখে ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল ভিতর হইতে কে যেন আলো জ্বালিয়া দিল। পর মুহূর্তে কিন্তু আবার গম্ভীর হইয়া গেল সে। চোখে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।"

বলিল, "একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে, জান? আমাদের হয়তো এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।"

"কেন?"

"উলম্ভন নামে এখানে কোথায় যেন একজন রাজা আছে। সে নাকি এ অঞ্চলে সমস্ত বন পাহাড় প্রান্তর নদীর অধিপতি। রোহার নিকট সে লোক পাঠাইয়া ছিল বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য। রোহা বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে, যদি প্রয়োজন হয় এস্থান পরিত্যাগ করিব তবু বশ্যতা স্বীকার করিব না। ঝোনঝিরা বলিতেছে, এস্থান পরিত্যাগই বা করিব কেন, যুদ্ধ করিব। রোহা কিন্তু যুদ্ধ করিতে চাহে না। রোহা বলিতেছে আমাদের জনবল কম, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর নাই, যুদ্ধ করিতে গেলে আমাদের গরুর দল এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িবে—"

"উলম্ভন আমাদের নিকটও লোক পাঠাইয়াছিল। লোকটির নাম গজন্ধর। ভীষণাকৃতি দৈত্য একটা। আমাদের দলপতি ধবল আমাদের দলের ঘিসু ও ভংগাকে লইয়া গজন্ধরের সহিত গিয়াছিল উলম্ভনের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবর জন্য। কিন্তু গজন্ধর তাহাদের উলম্ভনের কাছে না লইয়া গিয়া লইয়া গেল একটা গভীর অরণ্যের মধ্যে। সেখানে আরও কয়েকজন দৈত্যাকৃতি লোক লুকাইয়া ছিল। তাহারা ধবল ঘিসু ভংগাকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বন্দী করিতে চাহিল। বলিল তাহাদের কোন পাহাড় হইতে নাকি পাথর বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। উলম্ভন নাকি দেশের মঙ্গলের জন্য প্রস্তর নির্মিত কবর প্রস্তুত করাইতেছে। বনের মধ্যে হঠাৎ একটা বাঘ বাহির হইয়া পড়াতে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ধবল কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ঘিসু ভংগার এখনও কোন পাত্তা নাই।"

শিলাঙ্গী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার কথা শুনিতেছিল।

"তোমার এবার কি করিবে?"

"এখনও কিছুই ঠিক হয় নাই। ধবল বলিতেছে, কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা যাক কি হয়। যুদ্ধ করা তাহারও ইচ্ছা নয়। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের লোকবলও প্রচুর নয়। ক্ষেতের কাজ করিতেই বহু লোকের প্রয়োজন, যুদ্ধ করিবার লোক কই?"

শিলাঙ্গী বলিল, "আমরা দুই দল যদি একত্রিত হই তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা উলম্ভনকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি। তাহার এই স্পর্ধা সহ্য করা উচিত নয়।ধবল যদি রোহার কাছে যায়—"

"ধবল কোথাও যাইবে না; তুমি যদি রোহাকে আনিতে পারো—"

"রোহাও আসিবে না—"

আমরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর হাসিয়া উঠিলাম সহসা। জগদ্দলবৎ অনড় সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আজও উদীয়মান যৌবন যে অট্টহাস্য করে, আমাদের মুখ দিয়া সেদিন সেই হাসি নির্গত হইল।

শিলাঙ্গী বলল, "তুমিও রোহার কাছে চল; আমিও ধবলের কাছে যাই।"

"তাহার পর?"

"তুমি রোহাকে গিয়া সোজা বলিবে আমরা তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাই। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তোমাদের শিলাঙ্গীকে আমি বিবাহ করিব। উলম্ভন আমাদেরও অপমান করিয়াছে, প্রয়োজন হইলে আমরা উভয় দল একত্রিত হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া আসিব।"

"কিন্তু সব শুনিয়াও রোহা যদি আমাকে দূর করিয়া দেয়?"

"চলিয়া আসিবে।"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল।

"ধবলের কাছে যাইতে তোমার ভয় করিবে না?"

"একটুও না।"

"তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও, এ কথা তুমি ধবলকে বলিতে পারিবে?"

"স্বচ্ছন্দে। আমাকে বিবাহ করিলে তোমাদের কি কি সুবিধা হইবে তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিব। তোমাদের ধবল লোক কেমন?"

"লোক খুব ভাল।"

"রোহা?"

"রোহাও ভাল। তাহাকে একটি কথা বলিও তাহা হইলে সে খুব বেশী হইবে।"

"কি কথা।"

"বলিও যে তোমার বিশ্বাস গরুই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। ঝোনঝিরা এ কথা স্বীকার করে না বলিয়া রোহা ঝোনঝিরার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট। ঝোনঝিরা বলে কোন প্রাণীকে ছোট করিয়া দেখা বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ, প্রত্যেক প্রাণীই নিজ নিজ গুণে শ্রেষ্ঠ। বাঘের যে গুণ আছে তাহা গরুর নাই। শশকের যে গুণ আছে তাহা আবার বাঘেরও নাই, গরুরও নাই। গরুকে শ্রেষ্ঠ বলার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু এসব কথা বলিয়া রোহার মনে কষ্ট দেওয়া কি ঝোনঝিরার উচিত? তুমিই বল।"

আমি একটি মুচকি হাসিলাম শুধু।

শিলাঙ্গী বলিল—"এই সবের জন্য ঝোনঝিরাকে আমার ভালও লাগে কিন্তু। ঝোনঝিরা বেশ নূতন রকম করিয়া সব জিনিস ভাবিতে পারে। খুব বুদ্ধিমান—"

"ঝোনঝিরা তোমাকে তো বিবাহও করিতে চায়।"

"চায়। কিন্তু শুধু আমাকে নয়, আরও অনেককে। টংখীরা, মাজুম, মাদারী এই তিনজনকেসে ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়াছে। ভিদা, হৈনু, জাংটির সঙ্গেও বেশ ভাব হইয়াছে তাহার। হয়তো সে তাহাদেরও বিবাহ করিবে। আমি রাজী হইলে আমাকেও করিবে। কিন্তু আমি ওই ভিড়ে যাইতে রাজী নই।"

সে যুগের পক্ষে কথাটা অদ্ভুত। পুরুষের বহু স্ত্রী থাকাই নিয়ম ছিল সে যুগে।

"আমার যে স্ত্রী নাই তাহা তুমি জানিলে কিরূপে?"

"খবর লইয়াছি।"

"কি করিয়া খবর পাইলে?"

"তোমাদের দলের সকলকে আমি চিনি। খুব ভোরে দেবদারু গাছের উপর উঠিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেকের কুটীর লক্ষ্য করিয়াছি। কে কে কোন্ কুটীরে থাকে সব জানি। তোমার সহিত আলাপ হইবার পূর্বেও জানিতাম তুমি কোন্ ঘরটিতে থাক। তোমার ঘরে কখনও কোনও স্ত্রী লোক দেখি নাই। তুমি বিবাহিত হইলে নিশ্চয় স্ত্রীলোক থাকিত।"

ভুরু নাচাইয়া শিলাঙ্গী হাসিয়া উঠিল, তাহার পর লাফাইয়া আমার গলদেশে দুই বাহু বেষ্টন করিয়া ঝুলিতে লাগিল।

সব জানি, তোমার সম্বন্ধে সব জানি।"

"কিন্তু আমি যে নিনানিকে ভালবাসি।"

"বাসিলেই বা। তাহাকে বিবাহ তো করিতে পারিবে না।"

"তোমাকে বিবাহ করিলে আর কখনো বিবাহ করিতে পারিব না বলিতে চাও?"

"না, আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার ইচ্ছাও হইবে না। আমি একাই তোমার চতুর্দিকে পূর্ণ করিয়া রাখিব।"

"একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকাই তো নিয়ম। তুমি ইহাতে আপত্তি কেন করিতেছ?"

"বড় ঝগড়া হয়। টংখীরা, মাজুম, মাদারী অহোরাত্র কলহ করিতেছে। কাল মাজুম টংখীরার নাক কান কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, জান?" শিলাঙ্গী আমার কণ্ঠ ছাড়িয়া নীচে নামিয়া পড়িল এবং হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

"সে যে কি কাণ্ড যদি দেখিতে! মাজুম কিছুতেই টংখীরার নাক ছাড়ে না। ঝোনঝিরাও হিমসিম খাইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত প্রহার করিতে তবে ছাড়িল। টংখীরার নাকের খানিকটা একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। তোমাদের নিনানিরও নিশ্চয় সপত্নী আছে?"

"আছে বই কি!"

"মারামারি করে?"

"করে। সকলেরই নিনানির উপর আক্রোশ।"

"হইবেই। সে যে দেখিতে সুন্দর। টংখীরাও খুব রূপসী, তাই বেচারীর নাকটি গেল। আমি ওদের মধ্যে কখনও যাইব না। আমার মনে হয় তোমার নিনানিও পলাইয়া আসিয়াছে সপত্নীদের জ্বালায়—"

"সে স্বেচ্ছায় আসে নাই, আমিই তাহাকে আনিয়াছি। আমারই অনুরোধে সে যক্ষিণীর গুহায় আশ্রয় লইয়াছে।"

"সে কি আসিয়া গিয়াছে?"

"হাঁ। যক্ষিণীর সহিত তাহার ভাবও হইয়া গিয়াছে। যক্ষিণী তাহার দিদিমা হয়—"

"বল কি?"

শিলাঙ্গী ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"চল তাহার সহিত ভাব করিয়া আসি।"

"আমি আগে যাই, তুমি একটু পরে আসিও। দুইজনকে একসঙ্গে দেখিলে নিনানির মনে সন্দেহ জাগিবে। সে বড় হিংসুক।"

"আমি তাহা হইলে কিছু দুধ আনি। যক্ষিণীকে তো আমি প্রায়ই দুধ দিতে যাই, সেইভাবেই যাইব। আজ কিছু বেশি দুধ আনিব যাহাতে নিনানিও একটু ভাগ পায়। দেখিও দুধ খাওয়াইয়া ঠিক তাহাকে বশ করিয়া ফেলিব।"

"বেশ।"

"তুমি রোহার নিকট কখন যাইবে?"

"নিনানিকে আগে দেখিয়া আসি।"

"তোমার দেখা কখন পাইব?"

"সন্ধ্যায়।"

"কোথায়?"

"ওই ঝোপের নিকট আমি দেখা করিব।"

"আমি এখন যাই তাহা হইলে। রোহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিব। নিগম বন হইতে রোহা আজ আসিয়াছে। আবার হয়তো সেখানে চলিয়া যাইবে। তোমাকে হয়তো নিগম বনেই যাইতে হইতে হইবে। বেশি দূর নয়—"

"যত দূরই হোক যাইব। কিন্তু তাহার আগে ধবলের সহিতও এ বিষয়ে আলাপ করিতে হইবে একটু। তোমাদের দলের সহিত যোগ দিয়া আমরা উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব কিনা তাহা ধবলই ঠিক করিবে, কারণ সে-ই আমাদের দলপতি। ঘিসু এবং ভঙ্গা যদি ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে যুদ্ধ একটা করিতেই হইবে। ফিরিয়া আসিলেও করিতে হইবে, কারণ উলম্ভন যে আমাদের সহজে নিস্তার দিবে তাহা মনে হয় না।"

"দেখ দেখ, দুধনী মধুনী ফিরিয়া আসিয়া ঘাস খাইতেছে। প্রায় সবটাই খাইয়া ফেলিয়াছে। কখন চুপিচুপি আসিয়াছে আমরা জানিতেও পারি নাই।"

শিলাঙ্গী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। যে যুদ্ধপ্রসঙ্গ আমি তুলিয়াছিলাম, মনে হইল তাহা তাহাকে মোটেই বিচলিত করে নাই। সহসা বলিল—"খুব সুন্দর, নয়?"

"উহাদের ধরিয়া রাখিলেই পার।"

ঝোনঝিরা ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি রাজী হই নাই। ধরিলে কষ্ট হইবে না উহাদের? তাছাড়া আর একটা কথাও আমার মনে হয়।"

"কি?"

"ধরিলেই উহারা ফুরাইয়া যাইবে। এখন যেমন সকালে উঠিয়াই খোঁজে বাহির হই, কোথায় আছে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াই, উহাদের জন্য ঘাস সংগ্রহ করি, দূর হইতে ঘাস ছুঁড়িয়া দিয়া দেখি উহারা খাইতেছে কিনা—তখন আর এসব হইবে না। উহারাও ফুরাইয়া যাইবে, আমারও কাজ থাকিবে না।"

আমার মনে একটা কথা সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইল।

বলিলাম—"আমার সহিত তোমার যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে আমিও তো তোমার কাছে ফুরাইয়া যাইব।"

"তুমি কি গরু নাকি! তুমি যে মানুষ।"

"হইলই বা।"

"মানুষ অত সহজে ফুরায় না। প্রত্যেক মানুষ এক-একটি ধাঁধা। তাহাকে চিনিতেই অনেকদিন লাগে, বুঝিতে আরও বেশী দিন লাগে, তাহার আদি-অন্ত জানিতে জীবনই শেষ হইয়া যায়।"

শিলাঙ্গীর চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"এসব কথা অমার নয় কিন্তু, আমাদের কথক নীল-মিল একদিন বলিয়াছিল। আমার মনে হয় নীল-মিল ঠিকই বলিয়াছে। তোমাকে আমি মোটেই চিনিতে পারি নাই। ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু চিনিতে পারি নাই। তুমি আমাকে পারিয়াছ কি?"

"না।"

"কিন্তু একদিন আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিব। পারিব না?"

শিলাঙ্গী সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

"নিশ্চয়ই পারিব।"

সেদিন একথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু সত্যই কি শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারিয়াছিলাম? পারি নাই। আমার ভোগের নাগালের মধ্যে তাহাকে যতটুকু পাইয়াছিলাম ততটুকুই তাহাকে চিনিয়াছি। কিন্তু আমার ভোগের নাগাল কতটুকু? সেই ক্ষুদ্র পরিধিকে অতিক্রম করিয়া যে মহিমময়ী শিলাঙ্গী আমার ভোগাতীত লোকে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তাহার আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম যখন সে আমার নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল।

"তুমি তাহা হইলে নিনানির কাছে যাও। আমিও একটু পরে আসিতেছি। তুমি কতক্ষণ থাকিবে?"

"বেশিক্ষণ নয়। তাহার খবরটা লইয়া চলিয়া যাইব। আমাকে আজই আবার ধবলের সহিত দেখা করিতে হইবে। কাল সময় পাওয়া যাইবে না, কারণ কাল আমাদের খনিত্র পূজা, ধবল ব্যস্ত থাকিবে।"

"খনিত্র পূজা কি?"

"আমরা গাছের শাখা সচালো করিয়া তাহা দিয়াই জমি খুঁড়ি। কাল সেইগুলিকে একত্রিত করিয়া আমরা তাহাদের পূজা করিব। মেয়েরাই করিবে, আমরা কেবল উপবাস করিয়া থাকিব। আমাদের মেয়েরা এতক্ষণ বোধ হয় ইঁদুর খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। এবার আমাদের ফসল তেমন ভাল হয় নাই। প্রথম বৎসর খুব ভাল হইয়াছিল। এবার তাই পূজাটা ভাল করিয়া কহিতে হইবে—কাল ধবল হয়তো সমস্ত দিনই প্রার্থনা করিবে। আজই তাহার সহিত কথাবার্তা বলিব। নিনানির কাছে বেশীক্ষণ থাকা চলিবে না।"

"আমি সন্ধ্যার আগেই কিন্তু ঝোপের মধ্যে আসিয়া আসিয়া বসিয়া থাকিব। তুমি যেন বেশি দেরি করিও না।"

"না, দেরি করিও না। আমি তাহা হইলে যাই এখন।"

"বেশ—"

যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশে আমি যাত্রা করিলাম। শিলাঙ্গী কিন্তু গেল না। সে তাহার দুধনী মধুনীকেই দেখিতে লাগিল। আমি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম সে তাহাদের কি যেন বলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাদের ডাকিতেছে, কিন্তু দুধনী মধুনী কিছুতেই কাছে আসিতেছে না।

...যক্ষিণীর গুহার কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম যক্ষিণী একদল কাকের সহিত কাকের ভাষায় কথোপকথন করিতেছে। যক্ষিণী আমার আগমন টের পায় নাই, আমি একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। এমন বিস্ময়কর ব্যাপার আমি আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। মনে হইল কাকগুলি হরিণের মাংসে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে। বিদ্রোহী জনতা রাজশক্তির নিকট যেমন খাদ্যের দাবী করে তাহারাও যেন ঠিক তেমনিভাবে যক্ষিণীর নিকট দাবী জানাইতেছে। যক্ষিণীও তাহাদের দাবীর উত্তরে 'কা কা' 'ক-আ' 'ক্যাক্ ক্যাক্' শব্দ করিয়া বায়স ভাষায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখিলাম তাহার গুহার সম্মুখে

অনেক কাক উড়িতেছে, আশেপাশে যে সব বৃক্ষ ছিল তাহাদের শাখায় শাখায় বহু কাক বসিয়াছে এবং প্রত্যেকেই চীৎকার করিতেছে। যক্ষিণীও চীৎকার করিতেছে। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেস্থান হইতে যক্ষিণীর গুহার ভিতরটা সব দেখা যাইতেছিল না, যক্ষিণীর মুখের খানিকাট অংশ কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল তাহার চোখের দৃষ্টি ভীতত্রস্ত, তাহাতে ক্রোধ বা স্পর্ধার প্রকাশ নাই, তাহা যেন আর্ত অসহায়। যক্ষিণী কাকগুলিকে তাড়াইয়া দিতেছে না কেন এই কথাই বারংবার আমার মনে হইতেছিল। তাহার কাছে কি কোনও অস্ত্র নাই? এমনকি লাঠি পর্যন্ত নাই নাকি? যদি না-ও বা থাকে কাক তাড়াইবার মতো অস্ত্র সংগ্রহ করিতে কতটুকু সময় লাগে? উঠিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া লইলেই তো হইল। তা ছাড়া নিনানি কোথায় গেল? সে কি তাহার নিজের গুহায় চলিয়া গিয়াছে? সে থাকিলে নিশ্চয় কাকগুলাকে তাড়াইয়া দিত। এইসব চিন্তা-পরম্পরায় মগ্ন হইয়া আমি দূর হইতে কাক-কোলাহল শুনিতেছিলাম, এমন সময় আর একটা কাণ্ড ঘটিল। একটা প্রকাণ্ড শকুনি শোঁ করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল। এবং ডানা ঝটপট করিয়া যক্ষিণীর গুহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। যক্ষিণীর আর্ত চীৎকারে মনে হইল পঞ্চ-পর্বত বুঝি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। কাকেরা মহা উৎসাহে কলরব করিতে লাগিল, মনে হইল তাহারা যেন একজন নেতা পাইয়াছে। আমি আর নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া গিয়া একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া যক্ষিণীর গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলাম। শকুনি এবং কাকের দল নিমেষে ছত্রভঙ্গ হইয়া উড়িয়া গেল। তখন আমি দেখিলাম যক্ষিণী হরিণের কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে আবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, আরও জোর কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। আমি যে তাহার উপকারী বন্ধু ঐ কথা সে যেন বুঝিতেই পারিল না। মনে করিল আমিও একজন আততায়ী, তাহার হরিণটাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আমি সবিস্ময়ে যক্ষিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার মুখের চতুর্দিকে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে, দাঁতের অধরের আশেপাশে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নও দেখা যাইতেছিল। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, এমন অদ্ভুত বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। হয়তো আমার কোন পূর্বজন্মে এতদপেক্ষা বীভৎসতর কোন দৃশ্যের আমি সাক্ষী ছিলাম হয়তো বা কারণও ছিলাম, কিন্তু সে কথা আমার মনে ছিল না, মনে হইতেছিল এ দৃশ্য আর দেখি নাই, মনে হইতেছিল ইহা আকস্মিক এবং অভূতপূর্ব, ইহা যে আমারই অতীত জীবনের প্রেত-মূর্তি একথা কল্পনা করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে তখন। আমি সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলাম। দেখিলাম যক্ষিণীর অঙ্গে কোন আবরণ নাই, তাহার হরিণরক্তে রঞ্জিত, হরিণ বসায় পিচ্ছিলীকৃত। তাহার উদরদেশে অস্বাভাবিক রকম স্ফীত মনে হইল। তাহা শরীরেরর একটা অংশ বলিয়া মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল কে যেন বাহির হইতে একটা বোঝা বা স্তূপ তাহার বুকের নীচে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার উপর রক্ত এবং চর্বির দাগ। সহসা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, যক্ষিণী এত খাইয়াছে যে নড়িতে পারিতেছে না। প্রায় একটা গোটা হরিণ গলাধঃকরণ করিয়া সে চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। কাক এবং শকুনির নিকট তাই তাহাকে হার মানিতে হইয়াছে। আমার আচরণে যক্ষিণী কিন্তু একটুও আশ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমি যতক্ষণ তাহার কাছে ছিলাম সে চীৎকার করিতেছিল। কি যে বলিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে আমাকে গালি দিতেছে। নিনানি কোথায় গেল? ময়াল সাপটাই বা কোথায়? এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। শেষে গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, ভয় হইল ময়াল সাপটা নিনানিকে আক্রমণ করে নাই তো। তাড়াতাড়ি গুহার নিকট হইতে নামিয়া গেলাম। নামিয়া যাইবামাত্র কিন্তু কাকের

দল আবার আসিয়া গুহামুখে হানা দিল, তাহারা নিকটেই বৃক্ষশাখায় বসিয়া ছিল। দেখিলাম শকুনিটাও অপেক্ষা করিতেছে। তাহার পর সহসা আগড়টা নজরে পড়িল। সেটা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। আগড়টা তুলিয়া যক্ষিণীর গুহামুখ বন্ধ করিয়া দিলাম। আগড়টা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই যক্ষিণী বিপদে পড়িয়াছিল। হয়তো নিনানিই আগড়টা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে গেল কোথায়? তাহার পর মনে পড়িল, ময়াল সাপের গুহাও যক্ষিণী আগড় দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। উঁকি দিয়া দেখিলাম, সেটা বন্ধই আছে। ময়াল সাপ তাহা হইলে বাহির হয় নাই। নিঃসংশয় হইবার জন্য তবু সে গুহাটার কাছে গেলাম একবার, ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলাম সাপটা স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, একটা মৃদু শোঁ শোঁ শব্দও শোন যাইতেছে। নিশ্চিন্ত হইয়া তখন নিনানির খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলাম। নিনানির গুহায় গিয়া দেখিলাম সেখানে সে নাই। কোথায় গেল? যে শুষ্ক খড়ের বোঝা রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেগুলি দেখিয়া মনে হইল না যে নিনানি তাহার উপর শুইয়াছে। সহসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। মনে হইল কে যেন গান গাহিতেছে। উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিনানি কি? কিন্তু সেই দূরাগত সঙ্গীত এত মৃদু যে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রবলভাবে বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে সেই মৃদু সঙ্গীত ভাসিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে ভ্রম হইতেছিল তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর কিনা। বাতাসের আলোড়নে অরণ্যানি গর্জন করিতেছিল, সেই গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার মৃদু সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছিলাম। সহসা একটা অদ্ভুত কথা মনে হইল। মনে হইল উন্নতশীর্ষ পাষাণময় গম্ভীর পঞ্চ পর্বতই কি গান গাহিতেছে? তাহার আপাতকঠিন মূর্তির অন্তরালে যে কোমল হৃদয় প্রচ্ছন্ন আছে, এইমৃদু সঙ্গীত হয়তো সেই হৃদয়েরই প্রকাশ। বিস্মিত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিকক্ষণ। সে যুগে আমরা বিশ্বাস করিতাম যে সমস্ত জগৎই প্রাণময়। জড় ও জীবের বিশেষ পার্থক্য ছিল না আমাদের কাছে। পঞ্চ পর্বতের নিগূঢ় বাণী হয়তো শুনিতে পাইলাম, এই ধারণাটা কিছুক্ষণ আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিল, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর সঙ্গীতটাকে ধীরে ধীরে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অনুসরণ করিবার পরই কিন্তু ভুল ভাঙ্গিল, নিনানির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলাম, আরো অগ্রসর হইয়া তাহার গানের কথাগুলিও শুনিতে পাইলাম। কন্যা নদীর তীরে নিম্ন-সম্প্রদায়ের মেয়েরাও আজ এই গান গাহিতেছে। আজ খনিত্র পূজা। নিনানিও সেই পূজা করিতেছে নাকি? নিশ্চয়ই করিতেছে। নিনানি চরিত্রের একটা নূতন দিক সহসা আমার কাছে পরিস্ফুট হইল। বিদ্রোহ করিয়া সে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু দলের সহিত তাহার আন্তরিক যোগ ছিন্ন হয় নাই। দলের মঙ্গলের জন্য সে গোপনে গোপনে পূজাও করিতেছে। বিস্মিত হইলাম।

...একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া আমি নিনানির পূজা দেখিতেছিলাম। সে খনিত্র পূজাই করিতেছিল, কিন্তু নিজের পদ্ধতিতে করিতেছিল। খনিত্র পূজায় ইঁদুর বলি দেওয়া হয় কারণ ইঁদুর মাটিতে গর্ত খনন করে। খনিত্রের সঙ্গে ইঁদুরের রক্ত লাগাইয়া দিলে তাহাও ইঁদুরের মত খননশীল হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। তখন আমাদের খনিত্র ছিল সূচাগ্র গাছের ডাল। খনিত্র পূজার দিন প্রত্যেক নারীই একটি সূচাগ্র বৃক্ষশাখাকে মূষিক-রক্ত-চর্চিত করিয়া পূজা করিত। গানও গাহিত। নিনানিও একটি মোটা গাছের ডালকে পূজা করিতেছিল। দেখিলাম ডালটি সে একটি প্রস্তরের গায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে তাহার পাদদেশে ছোট একটি বেদীর মতও করিয়াছে। সেই বেদীর উপর দেখিলাম কয়েকটি ছিন্ন-মুণ্ড মূষিক ও শশক উপরিভাগে কয়েকটি রক্তবিন্দু দিয়া নিনানি সেটিকে মনুষ্য-মুখাকৃতি করিবার চেষ্টাও করিয়াছে। মূষিক এবং শশক শবগুলির পার্শ্বে কিছু সবুজ তৃণগুচ্ছ

এবং বন্য কয়েকটি মধুকর গুঞ্জন করিতেছিল। রক্তাক্ত বৃক্ষদণ্ডটির রক্তলোভী পতঙ্গ ও মক্ষিকা দল বসিতেছিল এবং উড়িয়া যাইতেছিল। দূরে শোনা যাইতেছিল একটা ঝর্ণার ঝরঝর শব্দ। এই পটভূমিকায় নিনানি নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছিল। তাহার অঙ্গে কোনও আবরণ ছিল না, এমন কি আমি তাহার জন্য যে শিরস্ত্রাণটি করিয়া দিয়াছিলাম সেটিও তাহার মাথায় ছিল না। তাহার কুঞ্চিত কেশদাম নৃত্যবেগে ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল কোনও বৃহৎ বন্যপুষ্পের অসংখ্য কেশর যেন তাহার মস্তক ঘিরিয়া আস্ফালন করিতেছে। আমাদের দলের পরিচিত সঙ্গীতটিই নিনানি গাহিতেছিল।

"ওগো বৃক্ষশাখা, যে শক্তিবলে তুমি একদিন বীজের কঠিন আবরণ বিদীর্ণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলে, তোমার যে শক্তি তোমাকে মাটির অন্ধকার হইতে আকাশের আলোকের দিকে লইয়া আসিয়াছিল, তোমার সেই শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি হোক। সেই শক্তি দিয়া আবার তুমি মৃত্তিকার কঠিন বক্ষ কর্ষ কর। তাহাকে বিদ্ধ কর, তাহাকে চূর্ণ কর, তাহাকে শিথিল কর—"

নিনানি নাচিতে নাচিতে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষশাখাটি তুলিয়া লইতেছিল। তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। তাহা দিয়া নিজের সর্বাঙ্গ বিদ্ধও করিতেছিল। মনে হইতেছিল সে যেন নিজেকেই মৃত্তিকার প্রতীকরূপে কল্পনা করিতেছে। তাহার অঙ্গের নানাস্থানে রক্তের দাগ লাগিয়াছিল, কিছু কিছু ক্ষতও হইয়াছিল, নিনানির কিন্তু সে-সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদিনীর মতো নাচিয়া গাহিয়া খনিত্র পূজা করিতেছিল সে। আমি নির্বাক বিস্ময়ে বসিয়া ছিলাম। পূর্বেও নিনানিকে খনিত্র পূজা করিতে দেখিয়াছি, তখন সে সকলের মতে চিরাচরিত রীতিতেই পূজা করিয়াছে। সে পূজাতে বৃক্ষশাখা, মূষিকরক্ত এবং সঙ্গীত ছিল, কিন্তু তাহাকে এ মহিমা ছিল না।

...নিনানির পূজা শেষ হইল। মনে হইল সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৃত্য বন্ধ করিয়া সে স্খলিতচরণে পাশের ঝোপটার ভিতর ঢুকিল এবং দুইটি জীবন্ত মূষিক লইয়া বাহির হইয়া আসিল। মূষিক দুইটির মুণ্ড ছিন্ন করিয়া সে বৃক্ষশাখাটিকে শেষবার রক্তে স্নান করাইল। স্নান করাইয়া জানু পাতিয়া লুটাইয়া পড়িল সেই রক্তাক্ত বৃক্ষশাখার সম্মুখে। ঝর্ণার ঝরঝর শব্দটা সহসা বেশি স্পষ্ট হইয়া পড়িল। দেখিলাম ফুলের উপর মধুকররবৃন্দও নিস্পন্দন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

"নিনানি—"

আমার ডাক শুনিয়া নিনানি উঠিয়া বসিল।

"তুমি আসিয়াছ?"

"অনেকক্ষণ। বসিয়া বসিয়া তোমার পূজা দেখিতেছিলাম।"

"আমি ঝর্ণায় স্নান করিব। আমাকে তুমি কোলে করিয়া লইয়া চল। বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

আমার দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। আমি উঠিয়া গিয়া তাহাকে তুলিয়া লইলাম।

আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া সে বলিল—"আমার ভয় হইতেছিল, তুমি বুঝি আসিবে না।"

"কাল কি তুমি সমস্ত রাত যক্ষিণীর কাছেই ছিলে?"

"হ্যাঁ, শালমিটিনাকে কোলে করিয়াই বসিয়াছিলাম। কাল কিছুক্ষণের জন্য অতীত আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল, শালমিটিনা আমার কোলের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর সহসা চাঁদ উঠিল, আবার বর্তমানে ফিরিয়া আসিলাম, মনে পড়িল আজ আমাদের খনিত্র পূজা। সেই মুহূর্তে শালমিটিনাও আমার কানে কানে বলিল, যাও, খরগোস ধরিয়া আন।

ময়াল সাপটাকে কিছু খাইতে দিতে হইবে। না দিলে ও শেষে আমাদেরই খাইয়া ফেলিবে। শালমিটিনা আমাকে শিখাইয়া দিল কি করিয়া কোথায় আত্মগোপন করিয়া ফাঁদ পাতিতে হইবে। তাহার নিজের গাত্রাবরণটাও খুলিয়া আমাকে দিল। বলিল, ঝোপের ধারে এইটা টাঙাইয়া রাখিলে খরগোসেরা সেদিকে যাইবে না, ফাঁদের দিকে যাইবে। খরগোস ধরিতে গিয়া ইঁদুরও অনেক ধরিয়াছি। শালমিটিনার ফাঁদগুলি চমৎকার। তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?"

"আমি ফিরিয়া দেখিলাম ধবল আসিয়াছে।"

"তাহার পর?"

যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বিশদরূপে বর্ণনা করিলাম।

"আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ধবল কাঁদিল না।"

"না।"

"কেহই কাঁদিল না?"

"মেয়েদের মধ্যে অনেকে আর্তনাদ করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহাদের এ শোকাচ্ছ্বাস আন্তরিক কিনা বলা শক্ত। দলপতির প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শোকপ্রকাশ না করিলে দলপতিকেই অপমান করা হয় যে—"

নিনানি চুপ করিয়া রহিল। তাহার মৃত্যুসংবাদ কাহাকেও বিশেষ বিচলিত করে নাই, এ সংবাদটা তাহাকে যেন বিচলিত করিল। তাহার নীরবতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিনানি বলিল—"ঘিসু থাকিলে ঘিসু ঠিক কাঁদিত।"

"সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

"আমি যখন মরিয়া যাইব, তুমি কাঁদিবে?"

"কি যে বল—"

নিনানি দুই বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। আরও কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিল—"আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে আর একজনও কাঁদিত। সে কিন্তু নাই।"

"মীংরার কথা বলিতেছ?"

"না, কলঞ্জা, যে আমাকে তোমাদের দলে আনিয়াছিল।"

একটা অদ্ভুত কথা সহসা মনে হইল। কলঞ্জার বিধবা, ধবলের পত্নী, ঘিসুর প্রণয়িণীকে আমি কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছি। নারী সম্বন্ধে আজ তোমাদের যে শুচিতা-বোধ প্রবল হইয়াছে তখন তাহা তত প্রবল ছিল না, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। যে প্রয়োজনের দাবী আমাদের পরস্ত্রীর সম্বন্ধে সংযত করিতেছিল সেই প্রয়োজনের দাবী ক্রমশ ধর্মরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। প্রয়োজনের দাবীতেই আমরা একদিন প্রস্তরকে বৃক্ষকে পূজা করিতাম, প্রয়োজনের দাবীই তাহাদের দেবতাপদে উন্নীত করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের শুচিতাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল। পরস্ত্রী সম্বন্ধেও আমরা ক্রমশ তেমনি সচেতন হইতেছিলাম। *আমার অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন বলিয়া উঠিল—তুমি অন্যায় করিতেছ। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছ। ধবলের সহিত মিথ্যাচরণ করিয়া তুমি পাপ করিতেছ। এখনও সময় আছে, এখনও নিনানিকে ত্যাগ কর, এখনও গিয়া ধবলকে সত্য কথা খুলিয়া বল...।*

"তুমি চুপ করিয়া আছ কেন, কথা বল। আমার সম্বন্ধে সকলেই তো চুপ করিয়া গেল, আমার মৃত্যুসংবাদে কেহ কাঁদিল না পর্যন্ত। তুমি চুপ করিও না, তুমি কথা বল। আমার ভয় হইতেছে, তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, চুপ করিয়া থাকিও না—

"কি কথা বলিব?"

"আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পর তুমি কি কি করিয়াছ সমস্ত বল—"

"সমস্তই তো বলিলাম।"

"মনে হইতেছে তুমি কিছু গোপন করিতেছ।"

"না, কিছুই তো গোপন করি নাই। তোমার ঝরণা কত দূরে?"

"এই চড়াইটা শেষ হইলেই দেখিতে পাইবে।"

"তুমি ঝরণাটা আবিষ্কার করিলে কিরূপে?"

"কাল রাত্র শালমিটিনার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা ঝরণার শব্দ শুনিতে পাইলাম। মনে হইল ঝরণা আমাকে যেন ডাকিতেছে। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না কিরণের মধ্যেও যেন সেই ডাক সঞ্চারিত হইয়াছে। আমার সর্বাঙ্গে যেন ঝরণার আহ্বান জ্যোৎস্নারূপে জড়াইয়া ধরিল। আমি অভিভূতের মতো শব্দ অনুসরণ করিয়া ঝরণার কাছে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া কি দেখিলাম জান?"

"দেখিলাম আমাদের কুল-দেবতা সেখানে বসিয়া আছেন। ঝরণার দুই পাশে অপরাজিতার কুঞ্জ আর তাহাতে অজস্র অপরাজিতা ফুল। দেখিলাম জ্যোৎস্নালোকে দেবতা ঘুমাইতেছেন, মনে হইল চক্ষু বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। ধবলকে মনে পড়িল। তাহাকেও কন্যা নদীর তীরে গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেবতা আমাকে দেখা দিলেন কেন, ঝরণার অশ্রান্ত শব্দে জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া আমাকেই কি তিনি ডাকিতেছিলেন? কেন? দেখিলাম তাঁহাকে ঘিরিয়া ঝরণার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা আবর্তিতত হইতেছে, প্রতিটি বুদ্বুদে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইয়াছে। মনে হইল আকাশের চন্দ্র যেন লক্ষ লক্ষ রূপে নামিয়া আসিয়া আমার দেবতাকে পূজা করিতেছে। আমিও প্রণত হইলাম। তুমি যে শিরস্ত্রাণটি আমার মাথায় পরাইয়া দিয়াছিলে তাহা খুলিয়া পড়িল, দেখিলাম তাহা জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি আর তাহা তুলিবার চেষ্টা করিলাম না। শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকিবার আর প্রয়োজনও তো নাই, সেইজন্য হয়তো দেবতাই উহা আমার মাথা হইতে খুলিয়া দিলেন—"

আমরা ঝরণার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। ঝরণা খুব বড় নয়, কিন্তু উচ্চ-পর্বতশিখর হইতে নামিতেছিল বলিয়া শব্দ বেশি হইতেছিল। ঝরণাধারা যেখানে সমতলে নামিয়াছে, তাহার আশেপাশে দেখিলাম সত্যই অনেক অপরাজিতা লতা। ফুলও অনেক ফুটিয়াছে। পর্বতগাত্রে ঝরণাধারায় দুইপাশেও অপরাজিতা দুলিতেছিল। সহসা মনে হইল এই অপরাজিতার দলই যেন পথ দেখাইয়া ঝরণা ধারাকে পর্বতশিখর হইতে নামাইয়া আনিয়াছে। যতদূর দেখিতে পাইলাম, ঝরণাধারার উভয় তীরে অপরাজিতার বনই দেখিলাম। কিছুদূর গিয়া জলস্রোত দিক পরিবর্তন করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছিল। তখন জানিতাম না যে ইহাই কিছুদূরে গিয়া সরসরা নদীতে পরিণত হইয়াছে, যে সরসরা নদীর তীরে গজন্ধরের দলপতি উলম্ভন রাজত্ব করে।

"আমাকে তুমি নিজ হাতে স্নান করাইয়া দাও—"

আবদারমাখা কণ্ঠে নিনানি অনুরোধ করিল। স্নান শেষ হইলে সে বলিল—"আমার মাথায় অপরাজিতা ফুল পরাইয়া দাও।" তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার ছিল না।

নিনানিও আমার মাথায় কানে ফুল পরাইয়া দিল।

আমি বলিলাম—"উলম্ভনের সহিত আমাদের হয়তো যুদ্ধ বাধিবে। পাহাড়ের অপর পারে যে জাতি থাকে—যাহারা গরু দুধ খায়—তাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাধিতে পারে।"

কথাটা অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছিলাম, বলিয়াই কিন্তু বিপদে পড়িলাম। নিনানি পরমুহূর্তে প্রশ্ন করিল—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে—"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সত্য কথাই বলিলাম।

"সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইয়াছিল।"

"কোন্ মেয়েটির?"

"যে তোমাকে সেদিন রাত্রে লতা দিয়াছিল।"

নিনানির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

"ও, কখন দেখা হইল তাহার সহিত?"

"যখন এখানে আসিতেছিলাম।"

নিনানি আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল—"মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখিতে, নয়?"

"সুন্দর বটে, কিন্তু তোমার চেয়ে নয়।"

আজ মনে হইতেছে, মুহূর্তে নিনানিকে যদি সরল সত্য কথা খুলিয়া বলিতাম, তাহা হইলে হয়তো যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ঘটিত না। তাহাকে অনায়াসেই বলিতে পারিতাম—"হ্যাঁ, শিলাঙ্গী খুবই সুন্দর, তাহাকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, হয়তো তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে।' সে যুগে একথা বলা মোটেই অশোভন ছিল না। সে যুগে প্রত্যেক পুরুষই প্রকাশ্যে একাধিক রমণীর প্রণয় কামনা করিত। আমি তাহা হইলে শিলাঙ্গীর কথা গোপন করিয়াছিলাম কেন? আজ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি, কারণ ছিল। সে যুগেও আমার অন্তরতম সত্তা অনুভব করিয়াছিল যে প্রেমাস্পদা একজনই হয়। যৌন-লালসায় আম একাধিক স্ত্রীলোককে কামনা করিতে পারি, কিন্তু ভালবাসিতে পারি মাত্র একজনকে। আমি নিনানির কাছে ভালবাসা ভান করিতেছিলাম, কারণ ভালবাসার ভান না করিলে গরবিনী নিনানিকে লাভ করা সম্ভব ছিল না। নিনানি সে পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কলঞ্জা তাহাকে লাভ করিয়াছিল প্রেমের অভিনয় করিয়াই। তাহাকে বিবাহ করিবার কিছুদিন পরে কলঞ্জার হৃদয় আমাদের কাংকা যুবতীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আকৃষ্ট হইবার পর কিন্তু বেশিদিন বাঁচিয়া থাকে নাই। সহসা একদিন তাহার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করে নিনানি কলঞ্জাকে বিষ খাইয়াইয়া হত্যা করিয়াছে। কাংকাও বাঁচে নাই, তাহারও কিছুদিন পরে মৃত্যু হইয়াছিল। বিঘাও বলিয়াছিল, কণ্টক কণ্টককে উৎপাটিত করিল। ছলনাময়ী নিনানিকে ঘিরিয়া যে রহস্যলোকে আমি কল্পনায় সৃজন করিয়াছিলাম, সে রহস্যলেকে দ্বিতীয় কোনও রমণীর অস্তিত্ব আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। শিলাঙ্গীর কথা তাই তাহার নিকট হইতে সযত্নে গোপন করিয়াছিলাম।

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া ওষ্ঠভঙ্গী সহকারে বলিল—"তুমি তো আমার চেয়ে সুন্দর কাহাকেও দেখ না, কিন্তু আমি যদি মরিয়া যাই?"

"ও কথা বলিও না।"

"আমি তো মরিয়াই গিয়াছি। তুমি নিজেই তো আমার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়াছ।"

নিনানির চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক ভয় পরিস্ফুট হইল। দেখিলাম মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে সে কৌতুকান্বিত হইয়াছে, ভীতও হইয়াছে। মৃত্যুকে লইয়া মিথ্যা রসিকতা করিতেও আমরা ভয় পাইতাম তখন। নিনানি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিল বলিয়াই কৌতুকও অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার এই সব গুণের জন্যই সে সকলকে আকৃষ্ট করিত।

"ওসব কথা ছাড়িয়া দাও। চল এবার ফেরা যাক। তুমি নিশ্চয় যক্ষিণীর কাছে ফিরিবে। বেচারীকে কাকের দল আবার হয়তো বিরক্ত করিতেছে।"

"হ্যাঁ, চল। ময়াল সাপটার জন্য কয়েকটা খরগোসও ধরিয়া রাখিয়াছি। সেগুলোকে লইয়া যাইতে হইবে।"

"কোথায় খরগোস?"

"ঝোপের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

সহসা আমি কয়েকটা পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। মনুষ্য পদচিহ্ন। মনে হইল একাধিক মনুষ্যের। কারণ কয়েকটা চিহ্ন বড় বড়, কয়েকটা ছোট ছোট।

"এসব পদচিহ্ন কাহার?"

নিনানির চোখের দৃষ্টি হইতে হাস্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

"কাল রাত্রে গজন্ধর এখানে আসিয়াছিল। আমি যখন ঝোপের মধ্যে খরগোসের ফাঁদ পাতিতেছিলাম তখন দেখি বিরাট প্রেতের মতো সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—"

"বল কি! সে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিল?"

"আমি নিজেই আগাইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি।"

"তাই নাকি, এতক্ষণ তো এসব কথা বল নাই।"

মুচকি হাসিয়া নিনানি উত্তর দিল—"সব কথা কি সবসময় বলিতে আছে? আলাপ করিয়া দেখিলাম, গজন্ধর লোক ভাল—"

"এখানে সে কি করিতে আসিয়াছিল?"

"এখানে আসিয়াছিল পাথরের খোঁজে। তাহাদের দেশে নাকি পাথরের বড় বড় মন্দির হইতেছে—"

"তোমাকে দেখিয়া কি বলিল?"

"খুব ভাল কথাই বলিয়াছে।"

"কি?"

নিনানি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমরা দুইজন পাশাপাশি হাঁটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর নিনানি বলিল—"যাহা বলিব তাহা আর কাহাকেও বলিও না। শুনিয়া তুমি বিচলিত হইবে না তো?"

"শুনিই না।"

"আমাকে দেখিয়া গজন্ধর কম বিস্মিত হয় নাই। ভয়ও পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল কোনও প্রেতিনি বোধ হয়। চিনিতে পারিবামাত্র কিন্তু হাসিমুখে আগাইয়া আসিল। বলিল—"ধবলের প্রিয়তমা পত্নী এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?" আমি উত্তর দিলাম—"স্বামীর মঙ্গলের জন্য আমি উন্নগাকে পূজা করিতে আসিয়াছি, প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি বিপদের সময় ধবল যেন উন্নগার মতো ধৈর্যশীল ও শক্তিশালী হয়। ধবল কোথায়, সে কি ফিরিয়া আসিয়াছে?" গজন্ধর বলিল—'ধবলের ফিরিতে এখনও কিছুদিন বিলম্ব আছে। আমার অনুচরেরা তাহাকে উলম্ভনের নিকট লইয়া গিয়াছে। উলম্ভনের সহিত আলাপ শেষ হইলে ধবল ফিরিবে। তাহার জন্য তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই।' এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর খানিকক্ষণ নীরব রহিল, তাহার পর আবার বলিল—'যদি তুমি রাগ না কর একটা কথা বলি।' আমি বলিলাম—'কথাটা না শুনিয়াই কি করিয়া বলিব যে রাগ করিব কিনা।' গজন্ধর তখন এক কাণ্ড করিয়া ফেলিল। সহসা আগাইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল—'ধবলের মতো দুর্বল ভীরু বৃদ্ধ তোমার উপযুক্ত স্বামী নয়। সে দলপতি বলিয়াই বোধ হয় তোমাকে দখল করিয়া রাখিয়াছে। তুমি আমাদের দেশে চল। উলম্ভন তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। উলম্ভন তোমাকে এ প্রদেশের রাণী করিয়া দিবে। যে তিনশত রমণী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিযাছে, তাহারা তোমার দাসী হইবে। তুমি যদি সম্মত হও, এখনই

তোমাকে আমি স্কন্ধে করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইব। আমার অকপট বিশ্বাসই তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি। তুমি অপূর্ব রূপসী, তুমি সুলক্ষণা, তুমি যে পুরুষের নিকট থাকিবে তাহার সৌভাগ্য বর্ধিত হইবে। ধবল তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি উলম্ভনের কাছে চল।' এই কথাগুলি বলিয়া গজন্ধর আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমি উত্তর দিলাম—'তোমার স্পর্ধা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত আর অধিক বাকবিতণ্ডা চাহি না। তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি ওই অসঙ্গত প্রস্তাব আর উত্থাপন করিও না। তুমি কি এই কথা বলিবার জন্যই আবার ফিরিয়া আসিয়াছ?' গজন্ধর বলিল—'একথা বলিবার জন্য একদিন তোমার নিকট আসিব ঠিক করিয়াছিলাম, এখন আসিয়াছি প্রস্তরের সন্ধানে, ভাগ্যক্রমে তোমার দেখা পাইয়া গেলাম।' তাহর পর গজন্ধর সাড়ম্বরে বর্ণনা করিতে লাগিল প্রস্তর দিয়া উলম্ভন কেমন বড় বড় সমাধিগৃহ বড় বড় মন্দির প্রস্তুত করাইতেছে। ধবলের মুখে তোমরা যাহা শুনিয়াছ, গজন্ধরের মুখে আমিও তাহাই শুনিলাম।"

এই পর্যন্ত বলিয়া নিনানি চুপ করিয়া গেল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম—"বড় বড় পায়ের দাগগুলি গজন্ধরের। কিন্তু ছোট ছোট পায়ের দাগগুলি কাহার?"

"ওগুলি আমার। গজন্ধর আর এক কাণ্ড করিয়াছিল।"

"কি?"

"আমি যখন কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না, তখন সে বলপ্রকাশ করিয়াছিল হঠাৎ আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়াছিল।"

"বল কি। তাহার পর?"

নিনানি হাসিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ণ দন্তগুলি সূর্যালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দন্তগুলি আরও বিকশিত করিয়া সে বলিল, "আমার এই দন্তের সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করিয়াছি। গজন্ধরকে রক্তাক্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে।"

নিনানির চোখে, মুখে, আলুলায়িত কেশপাশে, নগ্নদেহের বন্যশ্রীতে ক্ষণিকের জন্য যাহা প্রতিভাত হইয়া উঠিল তাহা ভয়ঙ্কর। মনে হইল কোন পুরুষের শৌর্যই তাহাকে পরাভূত করিতে পারিবে না, এই মূর্তি যে কোনও পুরুষকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাহার রূপান্তর ঘটিল। কোমলকণ্ঠে সে কহিল—"আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি জংলা। আমার ঘুম পাইতেছে। আমি আর চলিতে পারিতেছি না।"

আমি আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমার স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। একটু পরেই কিন্তু সে নামিয়া পড়িল আবার।

"ঝোপের মধ্যে খরগোসগুলিকে রাখিয়া আসিয়াছি। অন্য কোনও জানোয়ার আসিয়া আবার লইয়া না যায়। গর্তের মধ্যে রাখিয়াছি অবশ্য, কিন্তু শৃগালগুলা বড় চতুর—"

দ্রুতপদে সে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কে বলিবে একটু আগে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল!

খরগোসগুলি লইয়া কিছুক্ষণ পরেই আমরা যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গুহার মুখ বন্ধ। কাকের দল উড়িয়া গিয়াছে। হরিণ কঙ্কালটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যক্ষিণী ঘুমাইতেছিল, নিনানি চুপি চুপি বলিল—"এখন উহার ঘুম ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন নাই। ময়াল সাপটাকে খরগোসগুলো দিয়া চল আমরা আমাদের গুহায় যাই।"

ময়াল সাপের গুহায় উঁকি দিয়া দেখিলাম সে আার কুণ্ডলী পাকাইয়া নাই, দেহ বিস্তার করিয়াছে এবং আগড়টাকে ঠেলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটিতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। নিনানি ছয়টি খরগোস আনিয়াছিল। তিনটি

খরগোসকে আমরা গুহার মধ্যে ছুঁড়িয়া দিলাম। বাকী তিনটিকে নিনানি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

"চল এবার যাওয়া যাক—"

...নিনানির গুহার ভিতর খড় বিছাইয়া আমরা শয্যা রচনা করিয়াছিলাম। তাহার উপরই পাশাপাশি শুইয়াছিলাম দুইজনে। নিনানি আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া আমার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিতেছিল, "আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইও না জংলা। দেখ, আমি তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি। গজন্ধরের প্রলোভনপূর্ণ প্রস্তাবও উপেক্ষা করিয়াছি তোমারই জন্য। তুমি আমাকে ছাড়িবে না তো?"

বলিলাম—"না।"

শিলাঙ্গীর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সত্য কথাটা কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিলাম না। শিলাঙ্গী যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এ কথাটা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না বটে, কিন্তু নিনানিকে দেখিয়া কে বা কাহারা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে নিনানির তো একবারও বাধিতেছিল না। তাহা লইয়া সে বরং আস্ফালনই করিতেছিল। ভাবটা যেন—'দেখ, ইহারা সকলেই আমাকে চায়, কিন্তু আমি তোমার জন্য ইহাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।' আমিও তে বলিতে পারিতাম—'দেখ শিলাঙ্গী আমাকে চায় কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।' কিন্তু আমি একথা বলিতে পারি নাই। বলিতে পারি নাই, কারণ তাহা সত্য নহে। সত্যই আমি শিলাঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া নিনানির কাছে আসি নাই। নিনানি কি সত্য কথা বলিতেছিল? তাহার পরবর্তী আচরণ দেখিয়া আমারও পরে সন্দেহ হইয়াছিল যে নিনানি একান্তভাবে আমাকেই চাহিয়াছিল। আমাকে পাইবার জন্যই সে কখনও কোমলা, কখনও নিষ্ঠুরা হইতেছিল। আমি তাহার আন্তরিকতা অনুভবও করিয়াছিলাম, কিন্তু লোভের বশবর্তী হইয়া তাহার সম্পূর্ণ মূল্য দিতে পারি নাই। নিনানি কেবল আমাকেই চাহিয়াছিল, বহু বল্লভ-প্রার্থিতা সে, একান্ত আমাকেই নির্বাচন করিয়াছিল, আমাকে পাইবার জন্য সে নিজেকে নির্যাতিত নিপীড়িত করিয়াছিল। আমিও তাহাকে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আমি শিলাঙ্গীকেও চাহিয়াছিলাম। শিলাঙ্গীও আমাকে কম মুগ্ধ করে নাই। শিলাঙ্গীর উল্লেখ নিনানি সহ্য করিতে পারিবে না আমি জানিতাম, তাই সত্য গোপন করিতে হইতেছিল। নিনানির সে প্রয়োজন ছিল না, শিলাঙ্গীরও ছিল না।

"আমি এবার যাই, অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি। সকলে হয়তো আমাকে খুঁজিতেছি। খনিত্র পূজায় আমি অনুপস্থিত থাকিলে ইলচি দুঃখিত হইবে।"

আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। ধবলের প্রবীণা পত্নী ইলচিরও আমার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল। সুযোগ পাইলেই সে আমার ঘরে আসিয়া আমাকে খাইয়াইত, আমার পরিচর্যা করিত।

নিনানি বলিল, "তুমি যাইবার সময় ওই খনিত্রটিকে লইয়া যাও, আমি যেটির পূজা করিয়াছি, তুমি গিয়া ইলচিকে বলিও যে, আমি উন্নগা পর্বত হইতে এই খনিত্রটিকে মূষিক-রক্ত মাখাইয়া আনিয়াছি, তোমরা এইটির পূজা কর। মূষিক খুঁজিতেছিলাম বলিয়াই এত দেরি হইয়াছে।"

"কিন্তু নিয়ম যে অন্যরকম। মেয়েরা নিজের হাতে মূষিক ধরিয়া—"

অধীরভাবে নিনানি বলিল—"তাহা জানি। কিন্তু আমি চাই যে খনিত্রটি আমি পূজা করিয়াছি ইলচি সেইটিরই পূজা করুক। আমি যদি থাকিতাম, নিম্ব-সম্প্রদায়েরই সমস্ত নারী আসিয়া আমার খনিত্রকে পূজা করিত, এমন কি ইলচিও। ধবলের প্রিয়তমা পত্নীর খনিত্রকে অবহেলা করিবার সাহস কাহারও হইত না। আমার ইচ্ছা এবারও আমার খনিত্র যেন

অবহেলিত না হয়। তুমি ওটিকে লইয়া যাও। হয়তো আগামীবারে আমি আর পূজা করিতে পাইব না—"

কথাটা বলিয়াই নিনানি থামিয়া গেল! আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, কানা তো আমার কিছু করিল না। আমি তাহার আদেশ অমান্য করিলাম, কিন্তু আমাকে কোনও শাস্তিই তো সে দিল না। সকলে জানে কানার আদেশ অমান্য করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়, কেহই তাহা রোধ করিতে পারে না। কিন্তু আমার তো কিছুই হইল না—"

যে সন্দেহ আমি মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, যাহার জন্য আমি নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার মৃত্যু সংবাদ রটনা করিয়াছিলাম, নিনানির কথার তাহা যেন দৃঢ়তর হইল।

বলিলাম, "আমার বিশ্বাস তোমার কিছুই হইবে না, কারণ মূর্ছিত বিঘাওয়ের মুখ হইতে যে সব কথা আমরা সেদিন শুনিয়াছিলাম, তাহা কানার আদেশ নয়, তাহা বিঘাওয়ের আদেশ। বিঘাও তোমাকে শাস্তি দিয়াছে, কারণ বিঘাওয়ের বাসনা তুমি চরিতার্থ কর নাই।"

নিনানির চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার কথার তাৎপর্য যে তাহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ছলনাময়ী মুখে কিন্তু বলিল, "না, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক নয়। বিঘাও শক্তিশালী লোক। তাহার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গিয়াছে। মনে নাই সে বলিয়াছিল যে, অন্ধকারের সহিত মিশিয়া নিম্ব-সম্প্রদায়ের সর্বনাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে? উলম্ভন যদি নিম্ব-সম্প্রদায়ের আক্রমণ করে, তাহা হইল তাহার কথা ঠিক ফলিয়া যাইবে। কানা কবে কি ভাবে আমাকে শাস্তি দিবে তাহা কে বলিতে পারে? না না, বিঘাওকে অমনভাবে অবিশ্বাস করিও না, তাহা হইলে হয়তো আমাদের আরও অমঙ্গল হইবে—"

নিনানি শিহরিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম—যদি ফিরিয়া গিয়া দেখি সত্যসত্যই উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, অবিলম্বে আমাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, তখন তুমি কি করিবে?"

"আমি ওই দেবদারু বৃক্ষের নীচে আগুন জ্বালাইয়া যুদ্ধের নাচ নাচিব। ওই দেবদারু বৃক্ষকে উলম্ভন কল্পনা করিয়া তাহার বুকে তীর হানিব, অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করিব ধবল যেন জয়ী হয়—"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"কিন্তু প্রার্থনা করিবার পূর্বে অগ্নিদেবতাকে তোমার প্রণয়ীর নামগুলি উপহার দিতে হইবে, তাহা মনে আছে তো?"

"আছে বই কি? এই দেখ—নামের মালা আমি গাঁথিয়া রাখিয়াছি, এইটিই আমি অগ্নিকে উপহার দিব—"

নিনানি যে কড়ির মালাটি পরিত সেইটিই তুলিয়া দেখাইল।

হাসিয়া বলল—"জীবনে আমার যতগুলি প্রণয়ী জুটিয়াছে প্রত্যেকের নামে এক-একটি কড়ি গাঁথিয়া রাখিয়াছি। অগ্নিদেবতাকে এইটিই সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিব—ইহারা আমাকে ভালবাসিয়াছিল, ইহাদের স্মৃতি তোমার কাছে গচ্ছিত রাখিতেছি, এই স্মৃতিগুলিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, এইগুলি তোমাকে দিতেছি, ইহার বিনিময়ে হে দেবতা, তুমি ধবলকে জয়ী কর। আমাকে কিন্তু আরও কিছু কড়ি আনিয়া দিও, আর একটা মালা গাঁথিয়া রাখিব—

পাথরের সূচ দিয়া মেয়েরা সেকালে কড়ির মালা, ঝিনুকের মালা গাঁথিত। সূত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করিত লতা বা পশুর অন্ত্র।

"কড়ি কোথায় পাইব?"

নিনানির চক্ষু দুইটি আবার হাসিতে লাগিল।

"পাহাড়ের কাছে যে বড় নিমগাছটি আছে, তাহারই তলায় খুঁড়িয়া দেখিও, সেখানে কিছু কড়ি আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি।"

"তুমি কড়ি কোথায় পাইলে?"

নিনানি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"সত্য কথা যদি বলি, রাগ করিবে না তো?"

"না—"

"বিঘাও দিয়াছিল। মীংরাও দিয়াছিল কিছু। কড়িগুলি আমাকে আনিয়া দিও তুমি।"

"আচ্ছা।"

"তুমি আবার কখন ফিরিবে।"

"যত শীঘ্র পারি।"

"অনর্থক দেরি করিও না। তুমি কাছে না থাকিলে ভাল লাগে না। আমার মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া দিয়া তুমি জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছ। তাহা না হইলে তোমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতাম। এভাবে কতদিন থাকিব? সত্যই যদি আমার মৃত্যু না হয়, সত্যই যদি কানা আমাকে ক্ষমা করে, তাহা হইলে এই গুহাতেই চিরকাল বাস করিব নাকি?"

"করিলেই বা ক্ষতি কি। তুমি আমার একার হইয়া থাকিবে।"

"না, একা আমি বেশীদিন থাকিতে পারিব না। কোনও বুদ্ধি করিয়া তুমি আবার আমাকে বাঁচাইয়া দাও, আমি আবার ফিরিয়া যাই।"

"যক্ষিণীর কি দশা হইবে?"

"আমি যদি ফিরিয়া যাই, যক্ষিণীকেও লইয়া যাইব। ধবল আপত্তি করিবে না।"

"দেখি এখন ওদিকের অবস্থা কি রকম। তাহার পর যেমন বুঝি ব্যবস্থা করিব।"

...ফিরিয়া দেখিলাম ধবল কন্যা নদীর তীরে লম্বা হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। তাহার মুণ্ডটা জলের দিকে। চক্ষু দুইটি নিমীলিত। মনে হইল নিবিষ্টচিত্তে সে কন্যা নদীর ভাষা শুনিতেছে। কন্যা নদীতে পুষ্পগুচ্ছ ভাসিয়া চলিয়াছে। ধবলের কাছে কেহ নাই। নদীর বাঁকে একাই সে শুইয়া আছে। আমার বর্ণনা অনুসারে এখানেই নিনানির মৃত্যু হইয়াছিল। দূরে ক্ষেতের ভিতর মেয়েরা কাজ করিতেছে দেখিতে পাইলাম। নীরবেই কাজ করিতেছে। কোথাও কোন কলরব নাই। এমন কি শিশুদেরও গোলমাল নাই। সকলেই নিজ নিজ কুটিরের ভিতর ঢুকিয়াছে। একটা অজ্ঞাত ভয়ে চারিদিক যেন থমথম করিতেছে। আমি নীরবে ধবলের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। ধবলের কিন্তু কোন ভাবান্তরই লক্ষ্য করিলাম না। মনে হইল সে যেন কন্যা নদীর কলকলধ্বনিতে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি উপবেশন করিলাম। তাহার সহিত কথা না বলিয়া আমার কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কিচুক্ষণ পরে দেখিলাম, তাহার ঠোঁট দুইটি নড়িতেছে। কিন্তু কোন কথা শোনা যাইতেছে না। মনে হইল, নীরব ভাষায় সে যেন কাহারও সহিত কথা কহিতেছে। সহসা সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহাব পর আমাকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া বসিল।

"জংলা, তুমি কতক্ষণ এখানে বসিয়া আছ?"

"অনেকক্ষণ—"

"খনিত্র পূজার সময় তুমি কোথায় ছিলে, সকলেই তোমাকে খুঁজিতেছিল!"

"আমি ইঁদুরে সন্ধানে উন্নগা পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। ইঁদুর-রক্ত মাখাইয়া একটি খনিত্র প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, ইলচিকে পূজা করিবার জন্য দিব।"

নিনানির সেই রক্ত মাখা শাখাটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেটি ধবলকে দেখাইলাম।

ধবল সেটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, আমার মনে হইল সে যেন অন্য কিছু ভাবিতেছে। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিছু একটা বলিতে হয় বলিয়াই সে যেন বলিল—"চমৎকার হইয়াছে। ইলচিকেও দিও। সে তোমাকে খুঁজিতেছিল।"

তাহার পর সে আবার নীরব হইল। আমিও নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম।"

"ঘিসু বা ভংগার কোনও খবর কি পাওয়া গিয়াছে।"—কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম।

"ভংগা ফিরিয়াছে, ঘিসু ফেরে নাই। ঘিসুর মৃত্যু হইয়াছে। সেই অরণ্যে গজন্ধরের অনুচরেরা ঘিসু ও ভংগাকে পুনরায় বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঘিসু যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছে, ভংগা আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ভংগা বলিতেছে, উলন্তনের দল যে কোনও মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। সে আরও বলিতেছে যে তাহাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদেরই গিয়া তাহাদের আক্রমণ করা উচিত। তাহারা যখন ঘিসুকে হত্যা করিয়াছে তখন সে অধিকার আমাদের অবশ্যই হইয়াছে। আমি এতক্ষণ কন্যা নদীর নির্দেশ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া ছিলাম। নির্দেশ পাইয়াছি।" এই পর্যন্ত বলিয়া ধবল চুপ করিল এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"কন্যা নদী কি নির্দেশ দিল?"

"কন্যা যাহা বলিল তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। কন্যা বলিল, মূল্য না দিলে কোনও কিছুই পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। তোমরা নিনানিকে সম্যক মূল্য দাও নাই, তাই নিনানি তোমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। যে জমি তোমরা ভোগদখল করিতেছ তাহারও মূল্য দিতে হইবে। মূল্য না দিলে তাহা তোমাদের থাকিবে না, থাকিলেও তাহা তোমাাদের ফসল দিবে না। বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ধরনের মূল্য দিতে হইবে? কন্যা তাহার ছলছল কলধ্বনিতে কি যে উত্তর দিতে লাগিল প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে কান পাতিয়া রহিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম; শুনিলাম কন্যা বলিতেছে—যাহা তোমার প্রিয়তম মূল্যস্বরূপ তাহাই তোমাকে দিতে হইবে। প্রাণ দিতে হইবে, কারণ প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম মানুষের আর কিছু নাই। যাহা চাও তাহার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হও তবেই তাহা পাইবে। পাহাড় সমুদ্রকে কামনা করিয়াছিল, আমি তাহারই ফল। আমি জলধারা নাই, আমি পাহাড়োর বুকের রক্তধারা, আমিই তাহার প্রাণ। আমাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, আমাকে সে বিলাইয়া দিয়াছে, তাই আমিই তাহাকে সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়াছি। তোমাদের প্রাণ দিতে হইবে, রক্ত দিতে হইবে। কন্যার কলকলধ্বনিতে আমি ইহাই শুনিয়াছি।"

"তাহা হইলে আমাদের কি যুদ্ধই করিত হইবে?"

"যুদ্ধই করিতে হইবে।"

"আমরাই প্রথমে আক্রুরণ করিব?"

"ভংগা তাহাই বলিতেছে। কিন্তু আমি ভাবিতেছি, যুদ্ধ করিবার মতো অস্ত্রশস্ত্র আমাদের তো প্রচুর নাই। সমর্থ পুরুষের সংখ্যাও আমাদের দলে বেশী নাই। আমরা সকলে যদি যুদ্ধে চলিয়া যাই, আমাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে, এমনিই তো ফসল খুব বেশী হয় নাই।"

আমি তখন বলিলাম—"উন্নগা পর্বতের অপর পারে কিছুদিন হইতে একটা নূতন সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা গোদুগ্ধ পান করে। একদল বন্য গরুকে ঘিরিয়া তাহাদেরই তত্ত্ববধান করিয়া তাহারা বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের দলের একটি মেয়ের সহিত আজ আমার দেখা হইয়াছিল। শুনিলাম গজন্ধর তাহাদের দলেও হানা

দিয়াছে। হয়তো তাহাদের সহিতও উলম্ভনের যুদ্ধ বাধিবে। সেই মেয়েটি বলিতেছিল, আমাদের মধ্যে কেহ গিয়া যদি তাহাদের দলপতি রোহার সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে আলাপ করে, রোহা হয়তো আমাদের সহিত যোগদান করিবে। আমরা উভয় সম্প্রদায় যদি সম্মিলিত হই, তাহা হইলে উলম্ভনকে এখনই আমরা আক্রমন করিতে পারি।"

ধবল সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তাহারা গোদুগ্ধ পান করে? কি করিয়া?"

শিলাঙ্গীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম ধবলকে বলিলাম। ধবল আরও বিস্মিত হইল। তাহার পর বলিল—"তাহাদের সহিত মিত্রতা করা কি সম্ভব? গরু তৃণভোজী, আমরাও তৃণ ভোজন করিয়া থাকি। সে হিসাবে গরু আমাদের শত্রু। সেই গরু যাহারা পালন করে, তাহাদের সহিত মিত্রতা হইবে কিরূপে?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ধবল বলিল—"তাছাড়া তাহাদের নিকট এ প্রস্তাব লইয়া যাইবে কে?"

"আমি যাইতে পারি।"

"যে মেয়েটির সহিত তোমার আলাপ হইয়াছে, তাহার সহিত ওই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কি?"

"সে দলপতি রোহার কন্যা।"

"বিবাহিতা?"

"না।"

"বিবাহযোগ্যা?"

"হাঁ।"

ধবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—"যুবতী দেখিয়া আকৃষ্ট হওয়া পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি যুবক, তোমার পক্ষে আরও স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিও, যাহা স্বাভাবিক তাহাই নিরাপদ নয়। বজ্র স্বাভাবিক, সর্পও স্বাভাবিক, ঝঞ্ঝা, বন্যা—ইহারাও স্বাবাভিক, কিন্তু সব সময় নিরাপদ নয়। ইহাদের রূপ ধরিয়া অনেক সময় দেবতার রোষ আত্মপ্রকাশ করে, ক্ষুব্ধ প্রেতাত্মারা অনেক সময় ইহাদের রূপ ধরিয়া আমাদের শাস্তি দেয়। সুতরাং স্বাভাবিক বাসনার স্রোতে অবগাহন করিবার পূর্বে চিন্তা করিয়া রাখা উচিত তাহা নিরাপদ হইবে কিনা, তাহা কোনও দেবতার বা অপদেবতার বিশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে কিনা।"

আমি বলিলাম—"আমি সমস্তই অকপটে বলিয়াছি। তোমরা আমাকে যেরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপই আমি করিব। তবে আমর মনে হয়, রোহার সহিত আলাপ করিলে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নাই। ওই মেয়েটিকেও দেবতার ছদ্মবেশী রোষ বলিয়া মনে হয় না আমাার। মেয়েটি খুবই সরল—"

ধবল বলিল—"চল ভংগাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক সে কি বলে! একাধিক লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল।"

ভংগার পরামর্শ দিবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। পৃষ্ঠের কয়েকটি নিদারুণ ক্ষত তাহাকে কাতর করিয়াছিল। নিজের কুটিরে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল সে, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল তাহার পত্নীরা। সকলেই নিমপাতা চিবাইতেছিল। সেই চিবানো নিমপাতাগুলি লইয়া ভংগার প্রবীণা পত্নী সাংরা ক্ষতের উপর প্রলেপ দিতেছিল।

ধবলের কথা শুনিয়া ভংগা আর্তনাদ করিয়া শুধু একটি বাক্যই বলিল—"প্রতিশোধ চাই।"

ভংগার পত্নীরাও চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রতিশোধ চাই।"

ঘিসুর পত্নীদের মধ্যেও কয়েকজন ভংগার নিকটে বসিয়াছিল, তাহারাও বলিল, "প্রতিশোধ চাই।"

বিব্রত ধবল ভংগার কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা হইল ইলচির সঙ্গে

ইলচি ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আমার মনে হয় তোমর বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। তুমি নিজের বুদ্ধিতে আমাদের এখন চালিত করিতে চাহিও না। তুমি বিঘাওয়ের পরামর্শ লও। সে যাহা করিতে বলে তাহাই কর।"

ধবল চকিতে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর বলিল—"বেশ, তাহাই হইবে। জংগা পাহাড় হইতে তোমার জন্য এই খনিত্রটি মূষিক রক্ত মাখাইয়া আনিয়াছে। তাহার ইচ্ছা তুমি ইহার পূজা কর।"

"তাই নাকি, তাই নাকি?"

বৃদ্ধা ইলচি যেন বিগলিত হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত হইতে শাখাটি লইয়া বলিল—"আজ সকাল হইতে আমার কেবলই জংলার কথা মনে হইতেছিল, কেবলই ভাবিতেছিলাম আমার জংলা কোথায় গেল। জংলা যে আমার জন্য পাহাড়ে গিয়াছে তাহা কি জানিতাম—"

ইলচি আমার থুতনিতে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিল।

...বিঘাও তখন সেই বাঘের থাবাটি হাতে করিয়া বসিয়া ছিল। দেখিলাম সেটির সাহায্যে সে মাছি মারিতেছে। মাছি তাহাকে বড় জ্বালাতন করিত। পায়ের ক্ষতগুলি সর্বদাই সে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিত, তবু তাহাকে ঘিরিয়া একদল মাছি ভনভন করিত সর্বদা। অন্যান্য দিন সে গাছের পত্রসমেত ছোট একটা ডাল ভাঙ্গিয়া কাছে রাখিত এবং তাহা দিয়া মাছি তাড়াইত। সেদিন দেখিলাম বাঘের থাবা দিয়া মাছি মারিতেছে। মৃত মক্ষিকাগুলিকে সে কোথাও বৃত্তাকারে কোথাও ত্রিভুজাকারে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। পিপীলিকার দলও আসিয়া জুটিয়াছিল প্রচুর। তাহারা বিঘাওয়ের বৃত্ত এবং ত্রিভুজ নষ্ট করিয়া মৃত মক্ষিকাগুলিকে টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বিঘাও তাহাদের বাধা দিতেছিল না, পুনরায় নূতন মাছি মারিয়া বৃত্ত এবং ত্রিভুজ গঠন করিতেছিল। ধবল এবং আমি যখন তাহার নিকট গেলাম, তখন সে একবার মাত্র আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় বৃত্তগঠনে মন দিল। আমরা উভয়েই অদূরে উপবেশন করিলাম। বিঘাও আর একবার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনও কথা বলিল না। লক্ষ্য করিলাম, তাহার নাসিকাগ্র কম্পিত হইতেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ধবলই কথা কহিল। বলিল, "বিঘাও, আমাদের এই বিপদের সময় তোমার উপদেশ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। মীংরা যখন তোমাকে আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছিল, তখন বলিতেছিল যে তুমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি, বলিয়াছিল যে আমাদের বিপদের সময় তুমি সাহায্য করিবে। আজ বিপদে পড়িয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। উলম্ভনের সহিত আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। জংলা বলিতেছে যে, উন্নগা পর্বতের অপর পারে একটি গোপালক সম্প্রদায় আসিয়া বসবাস করিতেছে, তাহারা নাকি গোদুগ্ধপায়ী। তাহাদের সহিত৬ উলম্ভনের বিবাদ বাধিয়াছে। হয়তো যুদ্ধও বাধিবে। জংলা বলিতেছে যে আমরা যদি তাহাদের সহিত সম্মিলিত হই তাহা হইলে সুবিধা হইবে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কম। আমাদের লোকেরা এখনও কোনও বৃহৎ প্রস্তরখনি আবিষ্কার করিয়া দখল করিতে পারে নাই। সুতরাং ইদানীং নূতন কোনও প্রস্তরের অস্ত্রই আমরা প্রস্তুত করিতে পারি নাই। পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়াই চালাইতেছি। খঞ্জনদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া কিছু অস্ত্র আমাদের নষ্টও হইয়াছে। আমাদের লোকবলও কম। সুতরাং ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে

পারিলে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। আমাদের এই প্রস্তাব লইয়া জংলা উহাদের দলপতি রোহার নিকট যাইতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু আমার একটা ভয় হইতেছে। উহারা গো-পালক আমরা তৃণ-পালক। তৃণের সহিত গরুর ভক্ষ্য-ভক্ষণ সম্পর্ক। সেইজন্য আমার আশংকা হইতেছে যে, উহাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব নিরাপদ হইবে কিনা। আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, বিঘাও তুমি উপদেশ দাও, কি করিব।"

বিঘাও নীরবে বৃত্ত রচনা করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ কোনও উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে কেবল থাবা দিয়া মাছি মারিতে লাগিল। ধবল এবং আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। বৃত্তের পরিধিতে একটি মক্ষিকা নিপুণভাবে বসাইয়া সহসা বিঘাও ধবলের দিকে চাহিল এবং বৃত্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—"ইহার ভিতর কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?"

"আমি মৃত মক্ষিকা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

"মৃত মক্ষিকারা তো বাহিরে রহিয়াছে। এই বৃত্তের ভিতরে কিছু দেখিতে পাইতেছ কিনা?"

ধবল এবং আমি উভয়েই মনোনিবেশ সহকারে বৃত্তের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

ধবল বলিল—"আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাথতেছি না।"

"সামান্য ধূলিই যদি তোমার চক্ষু আচ্ছন্ন কবিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে দেখা শক্ত—ভাল করিয়া দেখ—"

"কি দেখিতে পাইব?"

"তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর; আমি এতক্ষণ সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিতেছিলাম। সহসা লক্ষ্য করিলাম, এই বৃত্তের মধ্যস্থলে তাহা মূর্ত হইয়াছে। ওই দেখ, ভাল করিয়া দেখ—"

বিঘাও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বৃত্তের দিকে চাহিয়া রহিল। আমরাও চাহিয়া রহিলাম। আমি কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ধবলও পাইল না, কারণ সে ক্ষণকাল পরে বিমর্ষকণ্ঠে বলল—"আমি তো ধূলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—"

বিঘাও যেন সর্পের মত তর্জন করিয়া উঠিল।

বলিল—"আমি কিন্তু পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, যেন বিরাট বন্যায় চতুর্দিক প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। কোথাও স্থল নাই, কোথাও বৃক্ষ ও গুল্ম দেখা যাইতেছে না। চতুর্দিকেই কেবল জল। সেই জলের ভিতর হইতে একটিমাত্র শাখা বিরাট অঙ্গুলির মতো উত্থিত হইয় আকাশের দিকে কি যেন নির্দেশ করিতেছে। শাখাটি সম্ভবত কোনও ভূপাতিত বৃক্ষের। আমি দেখিতেছি, সেই শাখার উপর একটি মূষিক এবং একটি সপ রহিয়াছে। মূষিকটি সর্পের নিকটই বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সর্প তাহাকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে না।...

বিঘাও চুপ করিল। আমরাও চুপ করিয়া রহিলাম।

সহসা ধবল আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বিঘাওয়ের উপদেশের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছি। জংলা তুমি অবিলম্বে রোহার নিকট গিয়া প্রস্তাব কর যে আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব কামনা করিতেছি—"

ধবল এবং আমি উঠিয়া পড়িলাম। বৃত্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিঘাও বসিয়া রহিল। কিছুদূর গিয়া শুনিতে পাইলাম, বিঘাও অট্টহাস্য করিতেছে।

...শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় ঝোপের ভিতর বসিয়াছিল। কতক্ষণ হইতে বসিয়াছিল জানি না, কারণ যখন ঝোপে উপস্থিত হইলাম তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, আমার কথা ছিল সন্ধ্যাবেলা আসিব, একটু আগেই আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি ঝোপে প্রবেশ করিবামাত্র শিলাঙ্গী একটা গাছ হইতে লাফাইয়া নীচে নামিল।

"তুমি আসিয়াছ? বাঁচা গেল। আমি ভাবিতেছিলাম না-জানি কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। নিনানিকে কেমন দেখিলে? সে ভালো আছে তো? আমি ভাবিয়াছিলাম তাহার জন্য দুধ লইয়া যাইব, কিন্তু গিয়া দেখি দুধ নাই, আমার দুধটা পর্যন্ত চিহাই খাইয়া বসিয়া আছে—

"চিহাই আবার কে?"

"চিহাই আমার একজন সৎমা। ভাবিলাম দুধ যখন পাওয়া গেল না তখন যক্ষিণীর কাছে যাওয়া বৃথা। যক্ষিণী কেমন আছে?"

"যক্ষিণী মহা বিপদে পড়িয়াছিল।"

"কি?"

তাহাকে আদ্যোপান্ত সব বলিলাম।

"ওরকম বিপদে যক্ষিণী মাঝে মাঝে পড়ে"—শিলাঙ্গী হাসিয়া বলিল—"আমি একদিন গিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম—সেদিনও যক্ষিণী একটা আস্ত ছাগল গিলিয়া নড়িতে পারিতেছিল না। সেদিনও কাক আর শকুনির দল উহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। নিনানি কেমন আছে?"

"বেশ ভাল আছে। যক্ষিণীর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে।"

"আমারও সঙ্গেও ভাব হইয়া যাইবে। তুমি রোহা সঙ্গে দেখা করিতে কখন যাইবে? ধবল কি বলিল?"

"ধবল রাজী হইয়াছে। তুমি আমাকে রোহার নিকট লইয়া চল, আমি ধবলের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার নিকট যাইব এবং গিয়া বন্ধুত্বের প্রস্তাব করিব।"

"রোহা নিগম বনেই আছে। তাহাকে তোমার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখনই কি যাইবে?"

"যাইতে পারি।"

"তাহা হইলে চল। ঝোনঝিরা এখন নাই, এখনই যাওয়া ভাল।"

সুরঙ্গপথে শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিলাম। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া যখন উন্নগার অপর পারে উপস্থিত হইলাম, তখন শিলাঙ্গী আমার কানে কানে বলিল—"তোমাকে কেহ যদি প্রশ্ন করে তুমি কেবল বলিও আমি নিম্ন-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রোহার নিকট বন্ধুত্ব কামনায় যাইতেছি, শিলাঙ্গী সব কথা জানে। ইহার বেশী আর কিছু বলিও না।"

পথে বিশেষ কাহারও সহিত হয় নাই। দেখা হইলাম সম্ভবনাও ছিল না, কারণ শিলাঙ্গী আমাকে গাছের আড়ালে আড়ালে লইয়া যাইতেছিল। একটা ছোটখাটো বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল। সে স্থানে সে সময়ে কাহারও থাকিবার কথা নয়। শিলাঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমি অন্ধকারে তাহা অনুসরণ করিতে পারিতেছিলাম না।

"শিলাঙ্গী একটু ধীরে ধীরে চল, আমি অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছি না। তুমি কোথায়—"

"এই যে আমি, তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এইযে গাছের তলায়।"

গাছের তলায় উপস্থিত হইবামাত্র শিলাঙ্গী আমার হাত ধরিল।

"আমি তোমার হাত ধরিতেছি, এইবার চল। একটু তাড়াতাড়ি চল, ঝোনঝিরা আসিয়া পড়িতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। ঝোনঝিরা আসিয়া পড়িলে সব গোলমাল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু রোহা যদি একবার তোমার প্রস্তাবে রাজী হইয় যায়, তাহা হইলে ঝোনঝিরা আর কিছু করিত পারিবে না। রোহার কথা মানিতে হইবে। ঝোনঝিরা নাই, এই সুযোগ। চল, চল—"

আমার হাত ধরিয়া শিলাঙ্গী আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে, শিলাঙ্গী এখনও থামে নাই। আমার হাত ধরিয়া এখনও সে ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহার স্পর্শটুকু আমার হাতে লাগিয়া আছে, তাহার অস্ফুট 'চল চল' ধ্বনি এখনও শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে, আজও তাহাকে আমি খুঁজিতেছি। ঝোনঝিরা আসিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ঝোনঝিরা আসিয়াছিল ভিন্নরূপে, ঝোনঝিরারূপে নয়, তাই তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই। শিলাঙ্গীও পারে নাই।

...অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া ঝিল্লীধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল, আমার বিক্ষুব্ধ চিত্তের আলোড়ন যন বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছে। সহসা একটা নূতন ধরনের তীক্ষ্ণ শব্দ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া দিল। শিলাঙ্গী দাঁড়াইয়া পড়িল সহসা।

"মনে হইতেছে হাতী আসিয়াছে। নিগম বনে মাঝে মাঝে হাতীর দল আসে। হাতী আসা খুব সুলক্ষণ। চল, চল, এখনও অনেকাট পথ যাইতে হইবে।"

আবার শিলাঙ্গী ছুটিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া শিলাঙ্গী বলিল "রোহা কিন্তু যাহা বলিবে তাহাতে তুমি আপত্তি করিও না। করিবে না তো?"

"রোহা কি বলিবে তাহা না শুনিয়া কি করিয়া প্রতিশ্রুতি দিব! তাহার প্রস্তাব যদি আপত্তিজনক হয়—"

"আপত্তিজনক হইবে না—"

"কি করিয়া জানিলে?"

"আমি জানি।"

শিলাঙ্গীর চোখের দৃষ্টি নিশ্চয়ই হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারে আমি তাহা দেখিতে পাই নাই।

"তাহা হইলে বল, শুনি—"

"আমি বলিব না, রোহার মুখে শুনিও।"

...রোহা চতুর্দিকে মশাল জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। একা বসিয়াছিল সে। তাহার সম্মুখে বাঁধা ছিল একটি গাভী, তাহাকেই সে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিল, তাহার পর আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—"ওই রোহা। আমি তোমাকে রোহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া চলিয়া আসিব। তাহার পর তুমি তোমার বক্তব্য বলিও। বেশী জোরে কথা বলিও না যেন, গাভীটা তাহা হইলে ভয় পাইবে রোহাও চটিয়া যাইবে। জোরে কথা বলা রোহা পছন্দ করে না। ঝোনঝিরার উপর এইজন্যই রোহা চটা, সে বেশী চিৎকার করে—"

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, নিগম বনের চতুর্দিকে মশাল জ্বলিতেছে এবং প্রত্যেক মশালকে কেন্দ্র করিয়া সশস্ত্র একদল লোক নীরবে বসিয়া আছে।

শিলাঙ্গী চুপি চুপি বলিল—"উহারা আমাদের গরুর দলকে পাহারা দিতেছে।"

দেখিলাম শিলাঙ্গীকে সকলেই চেনে। সকলেই তাহার সহিত সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিল। আমার দিকে চাহিয়া দুই-একজন ভ্রূকুটি করিল বটে, কিন্তু শিলাঙ্গীর সঙ্গে ছিলাম বলিয়া কেহ কোনও প্রশ্ন করিল না। রোহার নিকট গিয়া শিলাঙ্গী জানু পাতিয়া বসিল এবং নিম্নকণ্ঠে বলিল—"নিম্ন-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তোমার সহিত কথা কহিতে আসিয়াছে। উহারাও উলম্ভনের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। উলম্ভন উহাদের দলের একজনকে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর একজনকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছে। উহারা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনকে

আক্রমণ করিতে চায়! তোমার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য নিম্ব-সম্প্রদায়ের দলপতি ধবল এই যুবকটিকে পাঠাইয়াছে। তুমি ইহার সহিত কথা বল।"

রোহা গাভীটির দিকে যেমন চাহিয়াছিল তেমনি চাহিয়াই রহিল। শিলাঙ্গী আমাকে ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিতে বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল! কোথায় গেল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমিও রোহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম এবং অনুচ্চ কণ্ঠে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।

রোহা গাভীটির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল। মনে হইল চুপি চুপি সে যেন কোনও গোপন কথা বলিতেছে।

বলিল—"আমি শান্তিপ্রিয় লোক। অশান্তকে শান্ত করাই আমার ধর্ম। আমি বন্য গাভীকে ঘিরিয়া রাখিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া শান্ত করিতে চাই। ওই গাভীটিকে প্রথম যেদিন বন্দী করিয়াছিলাম, সেদিনও খুব বেশী ছট্‌ফট করিয়াছিল। এখন আর তত ছট্‌ফট করিতেছে না। কিন্তু আহার ত্যাগ করিয়াছে। কাল উহাকে ছাড়িয়া দিব, আবার কিছুদিন পরে ধরিব। আমার বিশ্বাস বন্দী অবস্থাতে ক্রমশঃ ওই গাভী আমাদের প্রদত্ত খাদ্য আহার করিবে। আমার বিশ্বাস, ক্রমশঃ উহার অশান্ত প্রকৃতি শান্ত হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমি এই নির্জন নিগম বনে গরুদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতেছি। তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি। আমি কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। ভাবিয়াছিলাম উলম্ভন যদি আমাকে বেশী বিরক্ত করে, আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া দলে লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। কিন্তু অন্য কারণে এখন আবার অন্যপ্রকার ভাবিতেছি। আমার কন্যা শিলাঙ্গীকে লইয়া আমি একটু বিব্রত হইয়াছি। তাহার জন্য আমার শান্তি বারম্বার বিঘ্নিত হইতেছে। প্রথমত আমার পল্লীদের মধ্যে যাহারা শিলাঙ্গীর সমবয়সী তাহারা কেউ উহাকে সুচক্ষে দেখে না। শিলাঙ্গী সুন্দরী এবং আমার প্রিয়পাত্রী বলিয়াই সম্ভবত তাহারা ঈর্ষান্বিতা। শিলাঙ্গীকে প্রায়ই তাহারা কষ্টই দেয়, প্রহার পর্যন্ত করে। দ্বিতীয়ত শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া আমাদের দলের একদল যুবক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য তাহাদের মধ্যে রক্তারক্তি হইতেছে। শিলাঙ্গী কিন্তু উহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে চায় না। শিলাঙ্গীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। আমার জননী যমক্ষী বলিত, যদি কোন মেয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই দলপতির কর্তব্য; যমক্ষী তাহার নিজের একটি কন্যাকে এজন্য হত্যাও করিয়াছিল। আমি কিন্তু যমক্ষীর এ নির্দেশ মানিতে পারিব না। শিলাঙ্গীকে হত্যা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, কিন্তু কাল তাহার মুখে একটি সংবাদ শুনিয়া মনে হইতেছে যে, হয়তো আমার মানসিক উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে, হয়তো আবার শান্তি ফিরিয়া পাইব। শিলাঙ্গী নাকি তোমাকে পছন্দ করিয়াছে, তোমাকেই বিবাহ করিতে চায়। সেইজন্য আমি ঠিক করিয়াছি যে, তোমরা সত্যই যদি আমাদের সহিত মিলিত হইতে চাও, দুইটি শর্তে মিলিত হইতে পার। প্রথম শর্ত, তুমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবে। দ্বিতীয় শর্ত, আমাদের গরুর জন্য তোমাদের তৃণশস্য দিতে হইবে। তোমরা যদি এই দুইটি শর্তে সম্মত থাক, আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। আমি নিজে করিব না, আমার সম্প্রদায়ের যুবকেরা করিবে; ঝোনঝিরার নেতৃত্বে একদল যুবক যুদ্ধ করিবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হইয়া আছে। তাহারা সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে। তুমি তোমার দলপতিকে গিয়া এই সকল কথা বল, তিনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন আমরাও সম্মত আছি জানিবে। আগামী পরশ্ব পূর্ণিমা। সেই দিনই তাহা হইলে তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দিব।"

রোহা নীরব হইল। আমিও নীরব হইয়া রহিলাম। আমি কি যে বলিব ভাবিয়া

পাইতেছিলাম না। এত সহজে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে শিলাঙ্গীকে পাইব তাহা কল্পনা করি নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহাকে পাইলে যে আনন্দলাভ করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা যেন পাইলাম না, বরং মনে হইল একটা নিগূঢ় ষড়যন্ত্রের জালে বোধহয় জড়াইয়া পড়িতেছি। ভয় হইল। সহসা নিনানির বিবর্ণ মুখটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। তাহার কথাগুলি আবার যেন আমি শুনিতে পাইলাম—"আমার ভয় হইতেছে তুমিও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তুমি কথা বল, তুমি চুপ করিয়া থাকিও না—।"

রোহা ফিসফিস করিয়া বলিল—"তোমার আর যদি কিছু বক্তব্য না থাকে তুমি যাইতে পার—আমি একা থাকিতে চাই।"

আমি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। বাহিরে শিলাঙ্গীকে দেখিতে না পাইয়া আমার অন্তরাত্মা যেন কাঁপিয়া উঠিল। একটু আগে আমার মনে যে ভয় জাগিয়াছিল, তাহা প্রবলতর হইয়া আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিল। সেই অন্ধকারে মূঢ়ের মতে একা দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, শিলাঙ্গীকে আমি কয়দিন দেখিয়াছি? তাহার কতটুকু চিনি আমি? সে যে আমাকে ভুলাইয়া আনিয়া একটা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিতেছে না তাহার প্রমাণ কি? তখন বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। নানারূপ অহেতুক ভয়ে ভীত হইয়া আমি জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। আজ বুঝিতে পারিতেছি, ভয়ের কোনও হেতু ছিল না, আমি ভয় পাইতেছিলাম শিলাঙ্গীকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই বলিয়া। কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবার শক্তি আমরা তখনও অর্জন করি নাই। আমরা সকলকেই সন্দেহ করিতাম, সকলকেই স্বার্থপর মনে করিতাম, এমন কি দেবতাকেও। পুরোহিতের সহায়তায় স্বার্থপর দৈবী শক্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের নিজেদের কার্যসিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতাম। দেবতার মহত্ত্বেও আমরা আস্থাবান ছিলাম না, মানুষের মহত্ত্বেও ছিলাম না। যে শিলাঙ্গীকে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এত ভাল লাগিতেছিল, তাহাকে ঘিরিয়া নানাবিধ বিভীষিকা আমাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পথ যদি জানা থাকিত আমি হয়তো পলায়ন করিতাম। কিন্তু অন্ধকারে পরিচিত পথে যাইবার সাহস ছিল না। দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিঘাওয়ের বর্ণিত চিত্রটি মনে পড়িল—বন্য বিধ্বস্ত মূষিক সর্পের মুখের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। শিলাঙ্গী কি সত্যই মনুষ্যরূপিনী সর্পিনী? আর আমি মূষিক?

শিলাঙ্গী কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিল।

"জংলা, জংলা, কোথায় গেলে তুমি?"

"এই যে এখানে, তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

"তোমার জন্য দুধ আনিতে গিয়াছিলাম। নাও, একটু দুধ খাও, চল একটা মশালের কাছে যাই।"

"শিলাঙ্গী একটা বাঁশের কেঁড়ে করে আমার জন্য দুধ আনিয়াছিল। পান করিয়া শরীরে যেন নূতন শক্তি সঞ্চার হইল। শুধু শক্তি নয়, একটা অনুভূতির বন্যায় আমার মনের সমস্ত গ্লানিও যেন ভাসিয়া গেল। শিলাঙ্গীকে ঘিরিয়া যে ভয় ভাবনা সন্দেহ আমাকে এতক্ষণ আকুল করিতেছিল, তাহা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে শিলাঙ্গীকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই শিলাঙ্গীকে আবার যেন ফিরিয়া পাইলাম। মশালের নিকট কয়েকজন সশস্ত্র যুবক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিল এবং আমাকে প্রশ্ন করিল—"উলম্ভনের দূত কি তোমাদের কাছেও আসিয়াছিল?"

"হাঁ।"

"তোমরা কি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে ঠিক করিয়াছ?"

"আমাদের দলপতি তোমাদের দলপতির নিকট প্রস্তাব করিয়াছে যে আমরা উভয় দল

মিলিত হইয়া যদি উলম্ভনকে আক্রমণ করি তাহা হইলে উভয় দলেরই সুবিধা হয়। রোহা দুইটি শর্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে রাজী আছে। আমাদের দলপতি ধবলকে গিয়া শর্ত দুইটি বলিব, ধবল যদি আপত্তি না করে, আমরা সম্মিলিতভাবে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব।"

"শর্ত দুইটি কি—"

"প্রথম শর্ত—"

শিলাঙ্গী ছুটিয়া আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল।

"না না, বলিও না।"

তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

যুবকটির দিকে ফিরিয়া আমি বলিলাম—"ধবল যদি রাজী হয়, কালই আমি আবার আসিব, তখন সমস্ত কথাই জানিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস ধবল আপত্তি করিবে না, কারণ উলম্ভনের স্পর্ধা আমাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।"

"আমাদেরও করিয়াছে। ধবল বা রোহা যদি যুদ্ধ না করে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

"আমাদেরও তাহাই ইচছা। দেখা যাক কতদূর কি হয়।"

শিলাঙ্গী বলিল—"চল, তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি। বেশী রাত হইয়া গেলে আবাার মুশকিল হইবে।"

"চল—"

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই আমরা বনের ভিতরে পড়িলাম। মনে হইল যেন সুরলোকে প্রবেশ করিলাম, ঝিল্লীদের সম্মিলিত ঝঙ্কার যেন আমাদের সম্বর্ধনা করিবার জন্য অরণ্যের অন্তরালে অপেক্ষা করিতছিল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। চমকাইয়া উঠিলাম যখন আমাকে শিলাঙ্গী জড়াইয়া ধরিল।

"রোহা কি শর্ত করিয়াছে আমি জানি। বলিব? প্রথম শর্ত, আমাকে বিবাহ করিবে, দ্বিতীয় শর্ত, আমাদের গরুর জন্য ঘাস দিতে হইবে। তুমি রাজী আছ তো?"

"আমি রাজী থাকিলে তো হইবে না, ধবল যদি রাজী হয় তবেই তো।"

"ধবল নিশ্চয় রাজী হইবে।"

"কি করিয়া জানিলে?"

"দেখিও।"

কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটিবার পর শিলাঙ্গী আবার বলিল—"ধবল ঠিক রাজী হইবে। সে ব্যবস্থা আমি করিয়াছি।"

"কি ব্যবস্থা?"

"আমাদের পুরোহিত নম্বরুকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিলাম। নম্বরু একটা তুক করিয়াছে। একটা বন্য মোরগ এবং একটা বন্য মুরগীর কানে কানে কি বলিয়া তাহাদের একসঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইয়াছে। নম্বরু বলিল ইহাতেই কাজ হইবে, ধবল আর অমত করিবে না। বন্য মোরগ এবং বন্য মুরগীর মিলন অগ্নিশিখার মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়াছে, তোমাদের মিলনও হইবে।"

শিলাঙ্গী আবার আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আমিও তাহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিলাম। সেদিন সেই ঝিল্লীমন্দ্রিত পরিবেশে অরণ্যের অন্ধকারে আমরা যেন পরস্পরের অন্তরতম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

শিলাঙ্গী বলিল, "ইহাতে তুমি সুখী হইয়াছ তো? তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে আমি যেন জোর করিয়া তোমাকে নিনানির নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতেছি। আমি জীবনে যাহা চাহিয়াছি, চিরকালই তাহা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছি, রোহা আমার বাসনা কখনও

অপূর্ণ রাখে নাই। কিন্তু তুমি যদি সুখী না হও তোমাকে আমি বিবাহ করিব না। বল, তুমি সুখী হইয়াছ তো?"

শিলাঙ্গীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া তাহার কাকে কানে বলিলাম—"খুব সুখী হইয়াছি। তোমাকে যে পাইব ইহা আমার আশার অতীত ছিল।"

শিলাঙ্গীকে মিথ্যা কথা বলি নাই। সত্যই আমি সুখী হইয়াছিলাম। আমার অন্তরতম সত্তা শিলাঙ্গীর অন্তরতম সত্তাকে আপন বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। যেদিন শিলাঙ্গীকে প্রথম দেখি সেই দিনই পারিয়াছিল। একটা কথা সেদিন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই। আমার অন্তরতম সত্তাকে ঘিরিয়া যে আর একটা প্রবলতর পশু-সত্তা আছে, যাহা লোভে লালায়িত হয়, ভয়ে ভীত হয়, স্বার্থে বিচলিত হয়, যাহা অন্তরতম সত্তার প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে যে কোনও দিকে চালিত করিতে পারে, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সেদিন আমি সচেতন ছিলাম না, তাই শিলাঙ্গীর পরবর্তী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আমার দ্বিধা হইল না। শিলাঙ্গী বলিল, "আমি পূর্বে যে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম, তাহা আশা করি ভুলিয়া যাও নাই?"

"কি কথা।"

"আমি তোমার বন্ধু হইতে চাই, কেবল স্ত্রী নয়। আরও চাই যে, তুমিও কেবলমাত্র আমার স্বামী হইও না, আমার বন্ধুও হও। এস আমরা শপথ করি যে সুখে-দুঃখে সুদিনে-দুর্দিনে আমরা কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিব না। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড় শিথিল, কেহ কাহারও মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করে না, বিপদের সময় পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে ইতস্তত করে না। তাহারা পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নয়, তাহারা কেবল স্বামী-স্ত্রী মাত্র। একজন স্বামীর বহু স্ত্রী থাকে, একজন স্ত্রীলোকের বহু পুরুষ থাকে, তাহারা কেহ কাহারও বন্ধু নয়। আমার ইচ্ছা আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হোক। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আরও বিবাহ করিতে পার, আপত্তি করিব না। তুমি নিনানিকে ভালবাস, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, আমি কেবল তোমার বন্ধুত্ব কামনা করি। তুমি আমার কাছে তোমার কোনও কথা গোপন করিও না, আমিও তোমার কাছে কোনও কথা গোপন করিব না। তোমার বিপদে আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করিব না, আমার বিপদের সময় আমাকেও তুমি কখনও ত্যাগ করিও না। আমাদের সম্পর্ক শুধু যেন দেহের সম্পর্ক না হয়। ইহাতে তুমি রাজী আছে তো?"

"যদি রাজী না হই, তুমি কি করবে?"

"আমি উন্নগার শিখর হইতে লাফাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। বুঝিব এ সমাজে আমার স্থান নাই, আমার সরিয়া যাওয়াই ভাল।"

শিলাঙ্গীর মুখে এ কথা শুনিয়া আমি সেদিন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলাম। স্বেচ্ছায় কেহ যে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, ইহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল তখন। যে জীবন রক্ষা করিবার জন্য এত আয়োজন, এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত আরাধনা, এত যুদ্ধবিগ্রহ—সেই জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিতেছে আমাকে পাইবে না বলিয়া? কি এমন আছে আমার মধ্যে? কি চায় ও? অন্ধকারে সেদিন তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই, বলিতে পারি না তাহার মুখে কি ভাব সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া আমারও মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব অবর্ণনীয় ভাব সঞ্চারিত হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন এক নতুন দেশে সহসা নীত হইয়াছি, যেখানে আত্মত্যাগ করাই নিয়ম। মনে হইতেছিল আদর্শের জন্য আমিও হয়তো উন্নগার শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারিব। সেই ঝিল্লীমুখরিত অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য এক অনাস্বাদিত পূর্ব রস আমার চিত্তকে আপ্লুত করিয়া দিল, চকিতের মধ্যে আমি যেন এক নূতন জগতের আভাস পাইলাম।

"উত্তর দিতেছ না কেন? বল না তুমি রাজী আছ কিনা?"

লক্ষ্য করিলাম শিলাঙ্গীর স্বর কাঁপিতেছে।

"নিশ্চয় রাজী আছি।"

পরমুহূর্তেই শিলাঙ্গী আমাকে জড়াইয়া ধরিল, আমিও তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মনে হইল যাহাকে খুঁজিতেছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি, বহুদিন পরে পাইয়াছি, জোলমার কথা তখন মনে থাকিবার কথা নয়, জোলমাই যে শিলাঙ্গীরূপে ফিরিয়া আসিতে পারে একথা মনে আসিবার কোনও সম্ভাবনাই তখন ছিল না, তখন অস্পষ্টভাবে এইটুকুই শুধু মনে হইয়াছিল, যাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম তাহাকেই পাইয়াছি। আজ মনে হইতেছে যে, জোলমা ওহালির রঙীন বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া ভাসিতে ভাসিতে দিগন্তসীমায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল, সেই জোলমাই বহু শতাব্দী পরে অন্ধকারে সেদিন শিলাঙ্গীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে সেদিন আমি চিনিতে পারি নাই।

আমরা কতক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া ছিলাম জানি না, ব্যাঘ্রের নিদারুণ গর্জনে আমাদের চমক ভাঙ্গিল। নিগম বনের মশালধারী প্রহরীরাও চীৎকার করিতেছে শুনিতে পাইলাম।

শিলাঙ্গী বলিল—"সেই বাঘটা বোধহয় আজও বাহির হইয়াছে। গরু মরিবার জন্য নিগম বনে আসিয়া প্রায়ই হানা দেয়। কিন্তু রোহার প্রহরীরা খুব সতর্ক, এখনও পর্যন্ত একটাও গরু মারিতে পারে নাই। চল আমরা যাই।"

"যদি বাঘের মুখে পড়ি?"

"বাঘ আমাদের কিছু বলিবে না। চল না, আমি তোমাকে পাশ কাটাইয়া ঠিক লইয়া যাইব। একবার সুড়ঙ্গে ঢুকিতে পারিলে বাঘ আমাদের আর কি করিবে?"

শিলাঙ্গীর অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আর আমাদের মধ্যে কোনও বাক্য-বিনিময় হইল না। বাঘের ভয়েই যে আমি কথা কহি নাই তাহা নয়, একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি আমাকে নির্বাক করিয়া দিয়াছিল, মনে হইতেছিল কথা কহিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। শিলাঙ্গীর হয়তো তাহাই মনে হইতেছিল সে-ও একটা কথা বলে নাই। কিন্তু আমাদের নীরবতা আমাদের উভয়ের অন্তরে যে বার্তা বহন করিয়া আনিতেছিল বাক্য দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না। একটু পরে আমরা উভয়ে আসিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সুড়ঙ্গের ভিতরও আমাদের একটি কথা হইল না। শিলাঙ্গী প্রথম কথা কহিল সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইবার পর। চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভাসিয়া যাইতেছিল। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার পরও আমরা নীরবে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম। শিলাঙ্গী বাম বাহু দ্বারা আমার কটি বেষ্টন করিয়াছিল। সহসা শিলাঙ্গী দাঁড়াইয়া পড়িল।

"গাছের উপর ও কে! মানুষ কি?"

তাহার অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটি বৃক্ষচূড়ায় সত্যই মনুষ্যমূর্তির মতো কি যেন দেখা যাইতেছে। আমরা দাঁড়াইয়া পড়িতেই কিন্তু তাহা অন্তর্হিত হইল।

শিলাঙ্গী বলিল—"বোধহয় কোনও শিকারী হরিণের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।"

"আমাদের দেখিয়া তবে লুকাইয়া পড়িল কেন?"

"আমাদের বোধহয় হরিণ ভাবিয়াছিল, কিন্তু আমরা হরিণ নয় দেখিয়া আবার আত্মগোপন করিয়াছে। আমরা হরিণ হইলে তীর ছুঁড়িত। আমাদে দলের ঘীটা প্রায়ই হরিণ-শিকার করিতে আসে—হয়তো ঘীটাই গাছে চড়িয়া বসিয়া আছে।"

"তবু চল, একবার দেখিয়া আসি।"

গাছটা খুব কাছে ছিল না। তাহার নিকট পৌঁছিতে বেশ কিছু সময় লাগিয়া গেল। শিলাঙ্গী হরিণীর মতো ছুটিয়া চলিতেছিল, পাহাড়ের চড়াই উতরাই অবলীলাক্রমে পার হইয়া

যাইতেছিল। আমিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতেই চলিয়াছিলাম, তবু সেই বৃক্ষতলে পৌঁছিতে অনেকাট সময় লাগিল। সেখানে গিয়া কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। গাছের উপরে উঠিয়াও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোথাও কেহ নাই। শিকারই যদি হয়, কোথায় সে আত্মগোপন করিল? কেনই বা করিল? আমরা পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। শিলাঙ্গী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"তাহা হইলে ভূত বোধহয়। চল পালাই—। তুমি তোমার ধবলের কাছে যাও. আমি রোহার কাছে যাই। রোহা আমার প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। এবার বোধহয় তুমি একা যাইতে পারিবে?"

"পারিব।"

আবার দুইজন পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিলাম; বৃক্ষচূড়ালগ্ন সেই মনুষ্যমূর্তিটা কিন্তু আমার মনের মধ্যে অনড় হইয়া রহিল। শিলাঙ্গীর কথাই যদি সত্য হয়, উহা যদি ভূতই হয়, তবে কাহার ভূত, কেন এভাবে দেখা দিল, বৃক্ষচূড়ায় আবির্ভূত হইল কেন, নানা প্রশ্ন মনে জাগিতে লাগিল, কিন্তু কোনটারই সদুত্তর আমার মাথায় আসিল না।

"কি ভাবিতেছ"—শিলাঙ্গী প্রশ্ন করিল সহসা।

"ওই ভূতটার কথা। কেমন যেন ভয়-ভয় করিতেছে। তোমার?"

"আমার ভয় করে না। কেন করে না জান?" আমি মরণকে মানিয়া লইয়াছি। মরণকে যখন কিছুতেই এড়ানো যাইতে না. তখন তাহাকে মানিয়া লওয়াই ভাল। মানিয়া লইলে আর ভয় থাকে না। দেখ দেখ, কি সুন্দর ফুলগুলি! জ্যোৎস্না উঠিলে ওগুলি ফোটে বলিয়া আমি উহাদের নাম জ্যোৎস্নামণি দিয়াছি।"

শিলাঙ্গী লাফাইয়া ফুলগুলি পাড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। আমি তখন গাছে উঠিয়া লতাসুদ্ধ ফুলগুলি তাহাকে পাড়িয়া দিলাম।

"আমাকে পরাইয়া দাও।"

আমি তাহার চুলে, গলায়, বাহুমূলে, কোমরে ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে অলঙ্কারগুলি পরিল। তাহার পর বলিল—"এস তোমার মাথাকে আমি ফুলের চূড়া করিয়া দিই।"

আমি মাথা পাতিয়া বসিলাম। সে আমার মাথায় পুষ্পচূড়া রচনা করিতে লাগিল। সহসা আমার মনে হইল, কয়েকদিন পূর্বে নিনানির মাথাতেও আমি শাখাপত্র দিয়া আবরণ রচনা করিয়াছিলাম এমনি জ্যোৎস্নালোকে, এই উগো পাহাড়েই তাহার সে শিরস্ত্রাণ নদীর জলে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নিনানিও কি ভাসিয়া যাইতেছে না? সে-ও কি আমার নাগালের বাহিরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবে? নিনানির জন্য সমস্ত চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহসা মনে হইল সে আমার জন্য তাহার স্বামী, তাহার প্রতিপত্তি, তাহার সমাজ ত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় আসিয়া বাস করিতেছে, কিন্তু আমি কি করিতেছি? এমন সময় আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল, শিলাঙ্গী কি করিয়া জানি না আমার মনের কথা টের পাইয়া গেল।

বলিল—"তুমি কি ভাবিতেছ বলিব? নিনানির কথা। নয়?"

"তুমি কি করিয়া টের পাইলে?"

"এমনি মনে হইল। নিনানির সঙ্গে আলাপ করাইয়া দাও, আমি ঠিক তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিব।"

"আমাদের বিবাহ হইয়া যাক তখন দিব।"

"এইবার চল, আমরা যাই। রোহা নিশ্চয় আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।"

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতেই একদল হরিণ সচকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। তাহারা বোধহয়

কিছুদূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে আমাদের নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিমেষের মধ্যে তাহারা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

...ধবল আমার অপেক্ষায় সাগ্রহে বসিয়াছিল। ঠিক পথের ধারে বসিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অগ্রসর হইয়া আসিল।

"জংলা, শীঘ্র বল তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ। তুমি চলিয়া যাইবার পর উলম্ভনের নিকট হইতে আর একজন লোক আসিয়াছিল। সে আসিয়া দাবী করিতেছিল, শোনান্‌কি পর্বতে প্রস্তর বহন করিবার জন্য আরও লোক দিতে হইবে। এ লোকটিও দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। আমি তাহাকে বলিয়াছি কয়েকদিন পরে লোক পাঠাইতে পারিব। এখন আমাদের মাঠের কাজ আছে। মাঠের কাজ শেষ হইলে লোক দিব। আমার স্তোকবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া লোকটি চলিয়া গিয়াছে। ঘিসু এবং ভংগার পরিবারবর্গ উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। তাহারা উলম্ভনের লোকটিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি অনেক বুঝাইয়া তাহাদের নিরস্ত করিয়াছি। আমি এখন দেখিতেছি, যুদ্ধ না করিয়া উপায় নাই। নিম্ব-দেবতারও হয়তো হইাই ইচ্ছা। কারণ আমি লক্ষ্য করিলাম, বাতাসের বেগে নিম্ববৃক্ষের শাখা-প্রশাখা হইতে যে ধরনের শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা শান্তিসূচক নয়। কিছুপূর্বে তাহার মধ্যে আমি তর্জনগর্জনের আভাস পাইতেছি। তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ শীঘ্র বল।"

আমি সমস্ত কথা ধবলকে খুলিয়া বলিলাম। ধবল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহর পর বলিল—"রোহার প্রথম শর্ত আমি সম্মত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পার, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের তৃণশস্য তাহাদের গরুর মুখে সমর্পণ করিব কি করিয়া? তুমি তো জান, আমাদের শস্য এবার ভাল জন্মায় নাই। প্রথম ফসলের সঞ্চিত শস্য আহার করিয়া আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। ইহার উপর যদি উহাদের গরুদের জন্য শস্য দিতে হয়, একদিনেই হয়তো আমাদের ক্ষেত্রগুলি শস্যশূন্য হইয়া যাইবে। আমরা তখন কি আহার করিব?"

আমি বলিলাম—"সে কথা আমিও চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু রোহার সহিত আলাপ করিয়া আর একটি কথাও আমার নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। রোহা কিছুতেই তাহার মত পরিবর্তন করিবে না। আমরা যদি যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার সাহায্য চাই, এই দুইটি প্রস্তাবেই আমাদের রাজী হইতে হইবে। রোহার চরিত্রে আর একটি আশ্বাসজনক বৈশিষ্ট্যও আমি লক্ষ্য করিলাম, সে শান্তিপ্রিয় লোক। কাহারও সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি তাহার নাই। আমরা যদি আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাহার নিকট খুলিয়া বলি সে আমাদের ক্ষেত্রগুলি শস্যশূন্য করিয়া দিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তবে আমাদের তৃণশস্যের কিছু অংশ তাহাকে দিতেই হইবে। পরিবর্তে সে হয়তো তাহার দুগ্ধের কিছু অংশ আমাদের দিতে পারে।"

ধবল অসহায়ভাবে বলিল—"দুগ্ধ আমরা কখনও খাই নাই। দুগ্ধ খাইয়া কি আমরা বাঁচিতে পারিব?"

"উহারা তো বাঁচিয়া আছে।"

"কি জানি।"

ধবল অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম—"আর একটা কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। রোহার প্রিয়তমা কন্যা শিলাঙ্গী যখন আমাদের আপন লোক হইতেছে, তখন রোহা এমন কিছু করিবে না যাহাতে আমাদের অনিষ্ট হয়।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া ধবল সহসা প্রশ্ন করিল—"শিলাঙ্গী দেখতে কেমন?"

"সুন্দরী।"

"বয়স কত।"

"অল্পই হইবে। নিনানির অপেক্ষাও ছোট মনে হয়।"

ধবলের চোখের অসহায় দৃষ্টি সহসা জীবন্ত হইয়া উঠিল।

"আমি একটা কথা ভাবিতেছি—"

"কি?"

"আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি কেমন হয়? নিনানি তো চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী যদি আমার পত্নী হয়, উহাদের উপর তাহার প্রভাব বেশী হইবে?"

এইবার বাধ্য হইয়া আমাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল।

বলিলাম—"সে প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম, কিন্তু রোহা তাহাকে সম্মত নয়। শিলাঙ্গীর মতের বিরুদ্ধে রোহা কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিবে না। উহাদের দলেরই বহু যুবক শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু এই কারণেই রোহা কাহারও সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ দেয় নাই। শিলাঙ্গী বলিয়াছে, আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

ধবল নির্নিমেষে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার মনে হইল, তাহার শান্ত দৃষ্টির অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন বহ্নির আভাস যেন ফুটিয়া উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধবল অবশেষে বলিল—"চল বিঘাওয়ের সহিত পরামর্শ করি। সে কি বলে শোনা যাক।"

আমরা বিঘাওয়ের কুটিরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমার বিঘাওয়ের নিকট যাইবার ততটা ইচ্ছা ছিল না, কারণ বিঘাওয়ের রহস্যময় কথাবার্তা হয়তো সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে, আমার এইরূপ একটা আশঙ্কা হইতেছিল। তবে একটা আমার আশা ছিল, হয়তো গিয়া দেখিব বিঘাও ঘুমাইতেছে। নিদ্রিত বিঘাওকে তুলিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার সাহস ধবলের হইবে না। কারণ ধবল বিঘাওকে মনে মনে বেশ ভয় করিত। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, বিঘাও জাগিয়া আছে। আগুনের ধারে বসিয়া একটা কাঠবিড়ালী পুড়াইতেছে। তাহার পুচ্ছটাকে কাটিয়া মাথায় চুলে পরিয়াছে দেখিলাম। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার মেজাজটাও ভাল আছে। আমাদের সে সাদর সম্ভাষণ করিল।

"এস এস, তোমরা যে আসিবে তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেইজন্য তোমাদের অপেক্ষায় জাগিয়া আছি।"

"কি করিয়া বুঝিতে পারিলে?"

"এই যে—"

কাঠবিড়ালীর কর্তিত পুচ্ছটি সে মাথা হইতে নামাইয়া দেখাইল।

"অনেক কষ্টে আজ জানোয়ারটিকে ধরিয়াছি। ইহারা পুচ্ছের সাহায্যে অনেক দূরের খবর পায়, সেইজন্য পুচ্ছটিকে সর্বদাই তুলিয়া রাখে। আর একটা যদি ধরতে পারি তোমাকেও একটা পুচ্ছ দিব। মাথায় পরিয়া থাকিও, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি আব একটু খুলিবে।"

অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বিঘাও ধবলের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"কাঠবিড়ালীর মাংস একটু খাইবে? খাও। জংলাকেও একটু দাও।"

অগ্নিকুণ্ড হইতে সে ঝলসানো কাঠবিড়ালীটিকে টানিয়া বাহির করিয়া বলিল—"মুণ্ডটি এবং বুকটি আমি খাইব, বাকীটা তোমরা দুজনে ভাগ করিয়া খাও।"

ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীটিকে খাইতে বেশী সময় লাগিল না। আহার শেষ করিয়া ধবল বলিল—"একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমার নিকট আসিয়াছি। জংলা রোহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছে। তাহার মুখ হইতে সব কথা শোনে, শুনিয়া এখন কি করা উচিত তাহা বল।"

"রোহা কে?"

"উন্নগার অপর পারে যাহারা থাকে তাহাদের দলপতিদের নাম রোহা। তাহারা গরুর দুধ খায়। তোমার পরামর্শ অনুসারেই তো জংলা সেখানে গিয়াছিল। জংলা, সব কথা বিঘাওকে বল।"

আমি সমস্ত ঘটনা বিঘাওকে পুনরায় বিবৃত করিয়া বলিলাম। বিঘাও বিস্ফারিত নেত্রে সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ধবল পুনরায় প্রশ্ন করিল—"বল, এখন কি করা উচিত?"

বিঘাও সহসা মাটিতে দুই বাহু বিস্তারিত করিয়া আবার ভেকের মতো বসিল এবং বলিতে লাগিল—"ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্ ঘেক্।" বলিতে বলিতে সে ঘুরিতেও লাগিল।

ধবল ভয় পাইয়া গেল, চক্ষু দিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিল, চল আমরা সরিয়া পড়ি। আমরা উভয়ে পরমুহূর্তে তাহার কুটির হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিঘাও অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার কথাও শোনা গেল।

"শোন শোন, ভয় পাইও না, আমার উত্তরটা বুঝিতে পারিলে কিনা বলিয়া যাও।

আমরা পুনরায় তাহার কুটিরে প্রবেশ করিলাম। ধবলের কথা শুনিয়া মনে হইল, সে একটু চটিয়াছে।

ধবল বলিল—"এইটুকু শুধু বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিপদের সময় তোমার পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ভয় দেখাইয়া আমাদের তাড়াইয়া দিতেছ।"

বিঘাও আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"ভয় দেখাই নাই, উত্তরই দিয়াছি। আমি যে সম্প্রদায়ে মানুষ হইয়াছিলাম সেখানে ইঙ্গিতের ভাষায় গোপন কথাবার্তা বলায় নিয়ম ছিল। ভেকের অনুকরণ করিয়া আমি তোমাদের জানাইয়াছিলাম যে, ভেকের মতো আচরণ করাই এখন আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। স্থলে যদি অসুবিধা হয়, জলে নামিতে হইবে। জলে অসুবিধা হইলে স্থলে উঠিব। কিন্তু ভেকের মতো আচরণ করিয়াও আমাদের কুকুরের মতো সতর্ক থাকিতে হইবে—ঘেক্ ঘেক্ শব্দ করিয়া আমি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি।"

"রোহার শর্তে তাহা হইলে আমি সম্মত হই?"

বিঘাও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কি যেন শুঁকিতে লাগিল।

"বাতাসে আমি যেন বিপদের গন্ধ পাইতেছি। কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে যুগপৎ ভেক এবং কুকুর না সাজিলে উপায় নাই।"

পুনরায় সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বাতাস শুঁকিতে লাগিল। আর কোনও উত্তর দিল না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

ধবল বলিল—"যতদূর বুঝিতেছি বিঘাও সম্মত আছে। কিন্তু আর একটা কথা তো বিঘাওকে জিজ্ঞাসা করা হইল না—"

ধবল আবার বিঘাওয়ের কুটিরে প্রবেশ করিল।

"আচ্ছা বিঘাও, জংলার পরিবর্তে আমি যদি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করি তাহা হইলে শর্তটা কি আর একটু জোরালো হইবে না? শিলাঙ্গী যদি দলপতির পত্নী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাব আরও একটু বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভবনা।"

বিঘাও পুনরায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"প্রস্তরকে যাহারা আরও কঠিন করিতে চায় তাহারা মূর্খ। জলকে যাহারা আরও তরল করিতে চায় তাহারাও মূর্খ। শিলাঙ্গীর কথা ভাবিবার আগে চিন্তা কর নিনানি কোথায় গেল? কেনই বা গেল?"

বিঘাও আবার হাসিয়া উঠিল।

পাংশুমুখে ধবল বাহিরে আসিয়া বলিল—"ইহার নিকট আসাই অবিবেচনার কার্য হইয়াছে! লোকটা পাগল। মীংরা যে কোথা হইতে এটাকে আনিয়া জুটাইয়া দিয়া গেল জানি না। চল এখন বিশ্রাম করা যাক, কাল সকালে উঠিয়া যাহা হয় ঠিক করিয় ফেলিব।"

আমি ঘরে গিয়া দেখি প্রৌঢ়া ইলচি আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমার জন্য আহার শয্যা সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

"আমি জানিতাম তুমি আসিবে, সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। ধবলের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তুমি সারা হইয়া গেলে। দিবারাত্রি ক্রমাগত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেছে। এখন খাইয়া একটু বিশ্রাম কর। আমার নিজের ভালুকের চামড়াটা তোমাকে পাতিয়া দিয়াছি। ওটা যেমন নরম তেমনি গরম। আরামে ঘুমাইবে। এখন খাও কিছু। কন্যা নদী আজ আমাকে একটা কাছিম উপহার দিয়াছে। সেটা তোমার জন্য ঝলসাইয়াছি। উহাদের সহিত কি ঠিক হইল?"

"উহারা আমাদের সহিত যোগ দিতে রাজী আছে, কিন্তু দুইটি শর্তে।"

শর্ত দুইটি বলিলাম।

"ধবল কি বলে?"

"ধবল নিজেই শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে চায়।"

"তাই নাকি?"

ইলচির চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—"তুমি এক কাজ করিতে পার?"

"কি?"

"একটা পাথর বাঁধিয়া আমাকে কন্যা নদীতে ডুবাইয়া দাও। এ দুর্বহ জীবন আমি আর বহিতে পারিতেছি না।"

ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"ধবল শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। কারণ শিলাঙ্গী তাহাকে বিবাহ করিবে না।"

"কিন্তু শিলাঙ্গী তোমাকে তো বিবাহ করিবে? তাহাও কি আমার পক্ষে কম মর্মান্তিক?"

ইলচির কান্না কিছুতেই আর থামে না।

তাহার নিকট বারম্বার শপথ করিতে হইল যে, শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিলেও তাহাকে আমি অবজ্ঞা করিব না।

"নিম্ব-দেবতার নামে শপথ করিতেছ?"

"তাহাই করিতেছি।"

ইলচির মুখে হাসি ফুটিল। তাহার পীতবর্ণ অসম বৃহদ্দন্তগুলি মশাল-আলোকে চকচক করিয়া উঠিল। আমাকে সযত্নে সে আহার করাইতে লাগিল।

"সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিশ্চয় তোমার পায়ে ব্যথা হইয়াছে।।"

"না, তেমন ব্যথা হয় নাই।"

"নিশ্চয় হইয়াছে। আমার কাছে কি লুকাইতে পারিবে? তুমি খাইয়া শোও, আমি তোমার পা টিপিয়া দিতেছি।"

...কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না নিদারুণ কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম ইলচি পাশে পাই, ভোর হইয়াছে। কোলাহলের কারণ কি জানিবার জন্য ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম কন্যা নদীর তীরে একটা ভিড় জমিয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে অনেকেই চীৎকার করিতেছে। আমিও সেদিকে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ধবল তাড়াতাড়ি ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আজ সকালে কন্যা আমাদের কি উপহার দিয়াছে দেখ!

নিনানির জন্য শাখাপত্র দিয়া আমি যে শিরস্ত্রাণটি রচনা করিয়াছিলাম, সবিস্ময়ে দেখিলাম ধবলের হাতে সেই শিরস্ত্রাণটি রহিয়াছে। আমার সৃষ্টি আমার কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছে আবার। নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল নিনানিও কি ফিরিয়া আসিবে আবার? অনেকক্ষণ নিনানির সহিত দেখা হয় নাই। সে এখন কি করিতেছে? তাহার জন্য মনটা উন্মুখ হইয়া উঠিল। অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা কানে গেল ধবল বলিতেছে—'ইচ্ছা করিলে শাখাপত্র দিয়া আমরাও এইরূপ জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি, ইহাকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখিতে পারি।"

ঘেসু বলিল—"ইহার চতুর্দিকে যদি কাদার প্রলেপ দেওয়া যায়, চমৎকার একটি পাত্র হইবে।"

আর একজন বলিল—"ঠিক বলিয়াছ!"

আমাদের সমাজে এই শিরস্ত্রাণটি বাসন সৃষ্টির প্রেরণা যোগাইতেছিল। ধবলের কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সহসা সে শিরস্ত্রাণটি মাটির উপর রাখিয়া করজোড়ে তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার দেখাদেখি সকলেই করজোড়ে বসিল। আমিও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, আমিও নিজের সৃষ্টির সম্মুখে করজোড়ে বসিয়া পড়িলাম। কন্যার তরঙ্গে তরঙ্গে একটা মৃদু কলতান জাগিয়া উঠিল।

ধবল বলিতে লাগিল—"নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়া কন্যা আজ আমাদের একটি সুপরামর্শ দিয়াছে। শাখাপত্রময় এই বস্তুটি শুধু যে আমাদের পাত্র প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিতেছে তাহা নয়, আমাদের এই বিপদের সময় কন্যা আমাদের যেন বলিতেছে, একত্রিত হইলে সামান্য শাখাপত্র যেমন অসামান্য বস্তুতে রূপান্তরিত হইতে পারে, একত্রিত হইলে তোমরাও সেইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে পার। উলম্ভনের যে শক্তি তোমরা দুর্জয় মনে করিতেছে, একত্রিত হইলে তাহা আর দুর্জয় থাকিবে না। কলস্বরা কন্যা যেন বলিতেছে, তোমরা একত্রিত হও, তাহা হইলে আর কোনও ভয় থাকিবে না।"

আমি চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলাম। মনে হইল, সুদূর অতীত হইতে কে যেন কথা বলিতেছে। তোমরা একত্রিত হও, একত্রিত হও, এই বাণী যেন নূতন নয়। মনে হইল, এই বাণী আশ্রয় করিয়া আমরা কবে কোথায় যেন কোন দুস্তর সমুদ্র পার হইয়াছিলাম। তুষারযুগের কথা মনে ছিল না, কাচিনের স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরপারের সাহায্য ব্যতিরেকে যে আমরা বাঁচিতে পারি না এই সত্য মনের প্রচ্ছন্ন স্তরে যেন সুপ্ত ছিল, ধবলের কথায় তাহা যেন আবার জাগ্রত হইল। পুরাতন কথা যেন নূতন করিয়া শুনিলাম।

ধবল সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ওই দেখ, কন্যার পরপারে যে কুয়াশা

জমিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে কেমন কাটিয়া যাইতেছে। ওই শোন কলস্বরা কন্যা বলিতেছে, তোমরা যদি একত্রিত হও, তোমাদের ভয়ও কাটিয়া যাইবে।"

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, সত্যই নদীর পরপারে কুহেলি-যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। আমরা সকলেই সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রত্যহ যেমন হয়, প্রভাতসূর্যের স্বর্ণ-কিরণ জালে সেদিনও ধীরে ধীরে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেদিন তাহা অপূর্ব মনে হইল। একটু পরেই কিন্তু সভয়ে আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কুহেলিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, পরপারে অরণ্য প্রান্তে দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহী এক ব্যক্তি বিরাট একটা প্রস্তরশূল হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটি যে উলম্ভনের চর তাহাকে কাহারও সন্দেহ রহিল না। লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া সহসা অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইল। আমরা সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। নারীরা আর্তনাদ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পরিবেশটি যেন পরিবর্তিত হইয়া গেল।

· "জংলা, আমি মতিস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। রোহার শর্তে আমি রাজী আছি। তুমি এখনই গিয়া তাহাকে সংবাদ দাও। আমরা সম্মিলিতভাবে অবিলম্বে উলম্ভনকে আক্রমণ করিব। তুমি এখনই চলিয়া যাও—জংলা, আর দেরি করিও না—' ধবল আমার দুই হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। দলপতি হিসাবে সে আমাকে আদেশ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া অনুনয় করিতে লাগিল। শুধু সে নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমাাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বীর হিসাবে দলের মধ্যে আমার খ্যাতি ছিল, ধবলের আচরণ দেখিয়া সকলে মনে করিল, বর্তমান বিপদে আমিই বোধ হয় একমাত্র উদ্ধারকর্তা। সকলেই যুগপৎ বলিতে লাগিল—'জংলা আর দেরি করিও না, চলিয়া যাও।' আমি আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, উন্নগা পর্বতের উদ্দেশে আমাকে যাত্রা করিতে হইল।

...উন্নগা পর্বতে উঠিয়াছিলাম। কিছুদূরে উঠিয়া দেখিলাম পাহাড়ের ছাগলের দল উপত্যকায় নামিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিনানির কথা মনে পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বে যেমন শরীরী জনতা আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, অশরীরী স্মৃতিসমূহ তেমনি আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। নিনানির অসংখ্য স্মৃতি আমার মানসপটে অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া যেন বলিতে লাগিল—'জংলা, তুমি এ কি করিতেছ? আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছে তুমি? তোমার জন্যই যে আমি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন গুহায় বাস করিতেছি তাহা কি ভুলিয়া গেলে? শিলাঙ্গী কি আমার চেয়েও বিশী সুন্দর? সে কি তোমার প্রতিশ্রুতির চেয়েও বড়?"

রোহার কাছে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম পঞ্চপর্বতের উদ্দেশে। ঠিক করিলাম, নিনানির সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার পর রোহার সহিত দেখা করিব; ইহাও ঠিক করিয়া ফেলিলাম. নিনানিকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিব, শিলাঙ্গীর কথাও তাহার কাছে গোপন করিব না। তাহাকে বলিব যে, আমাদের দলের হিতার্থে উলম্ভনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া আমি শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতেছি। কথাটা মিথ্যা হইবে না এবং দলের জন্য বাধ্য হইয়া কিছু করিলে নিনানি আপত্তিও করিতে পারিবে না। আজও যেমন তোমরা সত্যকে নানা মুখোস পরাইয়া আবৃত করিবার প্রয়াস পাও, আমরাও ঠিক তেমনই পাইতাম। আমরা আরও বেশী করিয়া পাইতাম, কারণ যে ষড়রিপু আমাদিগকে সত্য পথ হইতে বারম্বার ভ্রষ্ট করে, সেযুগে আমরা সে ষড়রিপুর দাস ছিলাম। তাহাদেরই নির্দেশে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। সামাজিক প্রয়োজনে আত্মত্যাগমূলক যে সকল আইন আমরা

করিয়াছিলাম, সেই আইনকেই অনেক সময় আমরা মুখোস করিতাম, তখন আমি যেমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে হইতেছে, তখন নিনানি আইনত কিছুই বলিতে পারিবে না। তাহার অন্তর্যামী মন হইতে সব কথা জানিত পারিবে। কিন্তু সে মনকেও কালক্রমে আমি প্রতারিত করিতে পারিব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কি করিয়া তাহার কাছে কথাটা পাড়িব, তাহাকে কি কি বলিব, তাহার প্রতি আমার ভালবাসা যে অটুট আছে এবং চিরকাল যে অটুট থাকিবে তাহার কি প্রমাণ দিব, এইসব ভাবিতে ভাবিতেই আমি উন্নগা পর্বতের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত বাসনা আমার গতিরোধ করিল। মনে হইল, নিনানি ছাগলের মাংস খুব ভালবাসে। তাহার জন্য একটা ছাগল শিকার করিয়া লইয়া গেলে কেমন হয়! যদিও সঙ্গে তীরধনুক ছিল না, তবু মনে হইল পর্বতের নাতি উচ্চ চূড়াটার উপরে উঠিতে পারি তাহা হইলে প্রস্তর ছুঁড়িয়াই একটা ছাগলকে বোধ হয় ঘায়েল করিতে পারিব। একটা ছাগলের মাথায় কিংবা পায়ে যদি মারিতে পারি...। সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িলাম এবং লোলুপ সরীসৃপের মতো পর্বতের সানুদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

...আমার চেষ্টা বিফল হয় নাই। প্রস্তরের আঘাতেই একটা বড় ছাগলকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ছাগলটা মরে নাই। তাহাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। তাহার আর্তস্বরে পার্বত্য বনস্থলীকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। আমার অন্তর পুলক সঞ্চারিত হইতেছিল, আমি আশা করিতেছিলাম আমার অদর্শনে নিনানির মনে যদি কোনও ক্ষোভ সঞ্চিত হইয়া থাকে, এই পুষ্টদেহ বন্য ছাগটি তাহা নিশ্চয়ই নিঃশেষে বিদূরিত করিবে। সে যখন প্রসন্ন হইবে তখনই শিলাঙ্গীর সহিত বিবাহের প্রসঙ্গটা তাহার নিকট উত্থাপন করিব। সমস্ত কথা শুনিয়াও কি সে আপত্তি করিবে? হয়তো সে মুখে কিছুই বলিবে না, কিন্তু ভয় হইতে লাগিল, তাহার অনুরাগ-ভরা চাহনি, আবদারমাখা ওষ্ঠভঙ্গী নীরব ভাষায় হয়তো এমন কিছু বলিবে যে আমি বিপন্ন হইয়া পড়িব। শিলাঙ্গী আমার মনের কথা বুঝিয়াছে, তাহারও প্রথমে ইচ্ছা ছিল না যে আমি একাধিক স্ত্রীর সহিত যুক্ত থাকি, কিন্তু এখন সে মত পরিবর্তন করিয়াছে। বলিয়াছে, আমি যদি নিনানিকে বিবাহ করি তাহাকে সে আপত্তি করিবে না, নিনানিকে সে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। নিনানিই বা শিলাঙ্গীকে সহ্য করিবে না কেন? নিনানি অবুঝ, তাহাকে বুঝাইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক বুঝাইতে হইবে যে শিলাঙ্গী যদিও আমার জীবনে অপরিহার্য, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও আমি থাকিতে পারিব না। তাহাকে বুঝাইতে হইবে শিলাঙ্গীকে আমি বাধ্য হইয়া নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলপতি ধবলের আদেশে বিবাহ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহাকেই ভালবাসি। শিলাঙ্গী নামে মাত্র আমার পত্নী থাকিবে, নিনানিই হইবে আমার হৃদয়েশ্বরী। এই সব তাহাকে বুঝাইতে হইবে। কত কথাই সেদিন ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত ভয়-ভাবনা আশঙ্কা-সংশয়ের মধ্যে একটা বিশ্বাস অবিচলিত ছিল—নিনানি আমার প্রস্তাবে রাজী হইবে, সে রাগ করিবে, কাঁদিবে, অসম্মত হওয়ার ভান করিবে, হয়তো আমাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হইবে সে।

যক্ষিণীর গুহার নিকটবর্তী হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম খানিক্ষণ। প্রথম দিন গিয়া গাছে গাছে যে বিচিত্রবর্ণ পক্ষীকুল দেখিয়াছিলাম, সেদিনও তাহারা ঠিক তেমনিভাবে বসিয়াছিল। আর কাহাকেও কিন্তু দেখিতে পাইলাম না,

এমন কি ময়াল সাপটাকেও না। এলোমেলো হাওয়ায় দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর শাখাপত্রে একটা অদ্ভুত মর্মরধ্বনি উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল বহুদূরে কে যেন রোদন করিতেছে। অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার সমস্ত চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে যক্ষিণীর গুহার উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। গুহার দ্বারের কাছে আসিতেই দুইটি শকুনি ডানা ঝটপট করিয়া গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। গুহার ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম যক্ষিণী নাই। মৃত হরিণের কঙ্কাল ও অস্ত্রগুলো চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল আছে। শকুনি দুইটা এইগুলার লোভেই আসিয়াছিল। কিন্তু যক্ষিণী কোথায় গেল? ময়াল সাপের গুহার আগড়টাও দেখিলাম খোলা রহিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখি, ময়াল সাপটাও নাই। কোথায় গেল সব? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নিনানির গুহার কাছে গেলাম। নিনানিও নাই। গুহার ভিতর ঢুকিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। খড়ের স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, নিনানি নাই।

"নিনানি—"

কেহ সাড়া দিল না।

"নিনানি—"

পরিচিত উত্তরের আশায় উৎকীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

"নিনানি—নিনানি—নিনানি—"

আমারই আহ্বানের প্রতিধ্বনি বারম্বার আমার কাছে ফিরিয়া আসিল, নিনানি আসিল না।

উন্মত্তবৎ চতুর্দিকে সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু নিনানিকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। যেখানে নিনানি খনিত্র পূজা করিয়াছিল সেখানে গেলাম। ভূমিতে প্রস্তরে মূষিকরক্তের চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে, দুই একটা শুষ্ক ফুলের পাপড়িও পড়িয়া আছে, কিন্তু নিনানি নাই। যে ঝরনায় নিনানিকে স্নান করাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, ছুটিয়া সেখানে গেলাম, কিন্তু সেখানেও নিনানি ছিল না। অপরাজিতা পুষ্পদল আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক রহস্যময় হাসি হাসিতে লাগিল। মনে হইল, তাহারা বুঝি নিনানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অপরাজিতা কুঞ্জ ছিন্নভিন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু নিনানিকে পাইলাম না। নদীতট অরণ্য উপত্যকা সর্বত্র খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। যক্ষিণী অথবা নিনানি কাহারও সন্ধান না পাইয়া শুধু যে বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা নয়, ভীতও হইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল, যে অনির্দিষ্ট অদৃশ্য শক্তি নিনানিকে এমনভাবে অপহরণ করিয়াছে, সে কি আমাকেও নিস্তার দিবে? দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূর ছুটিয়া আবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম। সহসা মনে হইল, নিনানিকে এই নির্জন অরণ্যে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইতেছি! আমি যে তাহাকে এ স্থানে আনিয়াছিলাম, আমারই প্ররোচনায় সে যে এই ভয়াবহ স্থানে নির্জন গুহায় বাস করিতে সম্মত হইয়াছিল! এখন তাহাকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি? আবার ফিরিলাম। নিনানির গুহায় ফিরিয়া আসিলাম আবার।

"নিনানি—নিনানি—নিনানি—নিনানি—নিনানি—"

আমার চীৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পক্ষীকুল চঞ্চল হইয়া কলরব করিয়া উঠিল। কিন্তু নিনানির সাড়া পাইলাম না। আমি তখন সেই শূন্য গুহায় সেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শুষ্ক খড়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে হইল আমার হৃৎপিণ্ডকে দুই হাতে কে যেন মুচড়াইয়া দিতেছে, কোন অদৃশ্য হস্ত আমাকে নির্মমভাবে প্রহর করিতেছে।

অসহায়ভাবে আমি সেই পরিত্যক্ত গুহায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না, তর্জন শুনিয়া আবার আমাকে তড়িৎ-পৃষ্ঠবৎ উঠিয়া বসিতে হইল। দেখিলাম গুহার সম্মুখে গাছের যে প্রকাণ্ড শিকড়টা বাহির হইয়াছিল, সেই শিকড়টাকে বেষ্টন করিয়া ময়াল সাপটা আমার দিকে দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আমি আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলাম। গুহার মধ্যে কয়েকটা প্রস্তর-খণ্ড পড়িয়াছিল, সেগুলি তুলিয়া তুলিয়া আমি তাহার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ময়ালের মুখে কয়েকটা লাগিল, কিন্তু তাহাতে সে নিরস্ত হইল না। দেখিলাম ধীরে ধীরে সে গুহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি এক লম্ফে গুহা হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া আবার একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। আহত ময়ালটা আমাকে অনুসরণ করিতেছে নাকি? ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া প্রথমটা কিছুই দেখিতে পাই নাই, তাহার পর পাইলাম। দেখিলাম আর একটা ময়াল। আমি যে ছাগলটাকে যক্ষিণীর গুহার সম্মুখে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, দেখিলাম আর একটা ময়াল সেটাকে পাকে পাকে জড়াইয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছে। আমি আবার ছুটিতে লাগিলাম আমার মনে হইল আশেপাশে বোধ হয় আরও ময়াল-সাপ আছে, তাহারা হয়তো এইবার আমাকে আক্রমণ করিবে।

...সুড়ঙ্গের অপর পারে শিলাঙ্গী আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি বাহির হইতেই সাগ্রহ সে ছুটিয়া আসিল।

"তুমি কত দেরি করিলে! কতক্ষণ যে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি—"

আমি যে নিনানির খোঁজে গিয়াছিলাম, সেকথা তাহাকে বলিলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন বলি নাই!

"চুপ করিয়া আছ যে? ধবল কি বলিল?"

"রোহার শর্তে ধবল রাজী হইয়াছে।"

"হইয়াছে?"

শিলাঙ্গী হাততালি দিতে দিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিল। তারপর সহসা আমাকে জড়াইয়া ধরিল।

"ঝোনঝির এখন ফেরে নাই। চল রোহার কাছে যাওয়া যাক। রোহা নিশ্চয় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে।"

"চল।"

...রোহা আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত শুনিয়া সে চুপি চুপি বলিল—"সুখী হইলাম। কাল তোমার সহিত শিলাঙ্গীর বিবাহ হইয়া যাক। তাহার পর আমাদের লোক তোমাদের ক্ষেত্রে তৃণশস্য কাটিয়া আনিতে যাইবে।"

"তাহারা কত তৃণশস্য কাটিবে কি ঠিক হইয়াছে?"

আমাদের দুইজন লোক সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যত তৃণ কাটিয়া আনিতে পারে, প্রতি পূর্ণিমায় তত তৃণ তোমাদের দিতে হইবে, আপাতত ইহাই আমি ঠিক করিয়াছি! ইহাতে ধবল আশা করি আপত্তি করিবে না। সমস্ত দিনে দুইজন লোকে কত তৃণই বা সংগ্রহ করিবে! তোমাদের কথা ভাবিয়া আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমার আশা করি ইহাতে আপত্তি নাই।"

"না।"

"বেশ, তাহা হইলে আমি বিবাহের আয়োজন করি। আমাদের বিবাহের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে। তুমি ধবলকে লইয়া কাল সকালেই এখানে চলিয়া আসিও। শিলাঙ্গী কিন্তু কাল সকাল হইতে লুকাইয়া থাকিবে। তুমি আসিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে তাহাকে। যতক্ষণ না খুজিয়া বাহির করিতে পারিবে ততক্ষণ বিবাহ হইবে না। এই ব্যাপারটাতেই একটু বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া পাইবার পর অবশ্য বেশি বিলম্ব হইবে না। তোমরা তখন উভয়ে এক পাত্র হইতে দুগ্ধ পান করিবে। তাহার পর আমি এবং তোমাদের দলপতি ধবল উভয়ে মিলিয়া তোমাদের একসঙ্গে বাঁধিয়া দিব। দীর্ঘ বন্যলতা দিয়া তোমার হাতের সঙ্গে শিলাঙ্গীর হাত, তোমার কোমরের সঙ্গে শিলাঙ্গীর কোমর, তোমার পায়ের সঙ্গে শিলাঙ্গীর পা বাঁধিয়া দিয়া আমরা দুইজনে সরিয়া যাইব। তাহার পর আমাদের পুরোহিত নম্বরু আসিয়া তোমাদের কানে কানে কি বলিবে। কি যে বলিবে তাহা নম্বরু ছাড়া আর কেহ জানে না, জানিবেও না, কারণ নম্বরু তাহা তোমাদের প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিবে। তাহার নিষেধ অমান্য করিলে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। নম্বরু বেশী সময় লইবে না। তাহার পর আসিবে কথক এবং আমাদের দলের যুবক-যুবতীরা। তাহারা তোমাদের ঘিরিয়া নৃত্যগীত করিবে। তোমাদেরও তাহাদের সহিত নৃত্যগীত করিতে হইবে। নৃত্যগীত শেষ হইলে তাহারা মশাল জ্বালিয়া তোমাদের সঙ্গে করিয়া কন্যা নদীর তীরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। ইহাই হইল আমাদের বিবাহের পদ্ধতি। কাল একটু সকাল সকাল আসিও।"

আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া রোহা ফিসফিস করিয়া কথাগুলি বলিল। মনে হইল সে যেন বিবাহের কথা বলিতেছে না, ষড়যন্ত্রের কথা বলিতেছে। আমি রোহার কাছে একাই ছিলাম, শিলাঙ্গী বাহিরে কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ আর একটি কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া রোহার কোলের উপর গিয়া বসিল। তাহার পর এক হাত দিয়া রোহার কণ্ট বেষ্টন করিয়া তাহকে চুম্বন করিল সে। রোহা বিব্রত বোধ করিতেছিল, কিন্তু শান্তিপ্রিয়তার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, সে মেয়েটির এই আচরণের কোনও প্রতিবাদ করিল না।

মেয়েটি বলিল—"রোহা, শুনিতেছি নাকি শিলাঙ্গীর বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে?"

"হাঁ। এই যুবকটির সহিত কাল তাহার বিবাহ হইবে।"

মেয়েটি এমনভাবে আমার দিকে চাহিল যেন এতক্ষণ সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। একবার মাত্র আমাকে দেখিয়া তাহার পর এমন বিশ্রী মুখভঙ্গী করিল যাহার অর্থ ভাষায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—'আহা, কি পছন্দ!'

রোহা আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"এটি আমার কনিষ্ঠা পত্নী হিং।"

হিং তর্জন করিয়া উঠিল, "কেবল কনিষ্ঠা পত্নী? আর কিছু নই নাকি?"

"হাঁ, প্রিয়তমা পত্নীও।"

হিং আবার তাহাকে চুম্বন করিল। এবং পরমুহূর্তে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রোহা তখন চুপি চুপি বলিল—"ইহারাই শিলাঙ্গীর শত্রু। তুমি ইহাদের সহিত সাবধানে কথাবার্তা বলিও।"

"আমি কোন কথাই বলিব না।"

"সেই ভাল। নীরবতাই শান্তিলাভের সহজ উপায়।"

আমি তখন রোহাকে একটি প্রশ্ন করিলাম। কারণ ফিরিয়া গেলেই ধবল আমাকে এই প্রশ্নটি করিবে।

"বিবাহ হইয়া গেলেই কি আমরা সম্মিলিতভাবে উলন্তনকে আক্রমণ করিব?"

"সেটা নির্ভর করিতেছে ঝোনঝিরার উপর। সে ফিরিয়া আসুক, তখন এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। আমি নিজে যুদ্ধের পক্ষপাতী নই। তুমি কি যুদ্ধ চাও?"

"না। এখন যুদ্ধ হইলে শিলাঙ্গীকে ফেলিয়া আমাকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। তাহা আমার ইচ্ছা নয়।" গম্ভীর রোহাকে এতক্ষণে হাসিতে দেখিলাম। আমার এই কথায় তাহার দন্তরাজি নীরবে বিকশিত হইল এবং কিছুক্ষণ বিকশিত হইয়াই রহিল।

"আমি চেষ্টা করিব যাহাতে যুদ্ধ এখন না হয়। ঝোনঝিরা ফিরিযা না আসা পর্যন্ত তো কিছুই স্থির হইবে না।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হিং আর একবার উঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

রোহা বলিল—"তোমার আর যদি কোনও বক্তব্য না থাকে, তুমি যাইতে পার। ধবলকে লইয়া কাল খুব ভোরেই এখানে চলিয়া আসিবে। কারণ শিলাঙ্গী যে কতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই।"

আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। শিলাঙ্গী বাহিরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"রোহার নিকট সমস্ত শুনিলে তো? কাল সকাল সকাল আসিও, আমি এমন জায়গায় লুকাইব যে সহজে আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তোমাকে নাকাল করিয়া তাহার পর ধরা দিব।"

"ঠিক তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিব দেখিও।"

"আচ্ছা দেখা যাইবে। শেষে খোসামোদ করিতে হইবে, শিলাঙ্গী কোথায় আছ দেখা দাও, যাহা চাও তাহাই দিব, দেখা দাও।"

"তোমাকে খোশামোদ করিতে আপত্তি নাই। তুমি কি চাও বল না, তাহাও তোমাকে আনিয়া দিব। মীংরা এবার আসিবার সময় আমার জন্য কুমীরের দাঁতের হার আনিবে বলিয়া গিয়াছে। যদি আনে তাহাই তোমাকে দিব।"

"তাহা দিও। কিন্তু সত্যসত্যই যে জিনিসটি আমি প্রাণ দিয়া চাই তাহা দিবে তো?"

"কি সেটি?"

"তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।"

"নিশ্চয় দিব।"

"কাল আমাকে খুঁজিবার সময় বারংবার এই প্রতিশ্রুতিটি চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে কিন্তু। নিগম বনের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী সকলে সাক্ষী থাকিবে, উন্নগা পর্বত সাক্ষী থাকিবে, আমাদের দলের সকলেও সাক্ষী থাকিবে। বলিবে তো?"

"নিশ্চয় বলিব।"

"কাল কখন আসিবে তোমরা?"

"ধবলকে গিয়া বলি। তাহাকে সঙ্গে করিয়া যখন আনিতে হইবে তখন তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছি না। তবে চেষ্টা করিব, খুব সকাল সকাল যাহাতে

আসিতে পারি। আর একটা কথা, ধবল এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়া কি আসিতে পারিবে? এখানে আনিবার আর কোন পথ আছে?"

"আছে। কিন্তু তাহাতে অনেকটা ঘুরিতে হইবে। চল, সেটাও তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

আমরা উভয়ে উন্নগা পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলাম।

...আমি চলিয়া আসিবার পর কন্যা নদীর পরপারে শূলধারী ব্যক্তিটিকে আবার নাকি দেখা গিয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম, নিম্ব-সম্প্রদায়ের সকলেই উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল। ধবলের মুখ দেখিলাম ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

"কি হইল? রোহা কি বলিল?"

ধবল ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল আমাকে।

"রোহা সম্মত হইয়াছে। কাল প্রত্যুষে উঠিয়া আমাদের দুইজনকে রোহার নিকট যাইতে হইবে। কালই সে শিলাঙ্গীর সহিত আমার বিবাহ দিতে চায়। আমাদের শস্যও সে অধিক লইবে না। তাহাদের দলের দুইজন লোক প্রতি পূর্ণিমায় আসিবে। আমার মনে হইল এ দাবী অন্যায় নয়, তাই আমি সম্মত হইয়া আসিয়ছি।"

"আমিও সম্মত। কালই বিবাহ হোক। আমাকেও যাইতে হইবে?"

"তাহাদের বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে দলপতির থাকা প্রয়োজন।"

"কিন্তু উলস্তনের লোক যেরূপ ঘন ঘন হানা দিতেছে, তাহাতে আমার অনুপস্থিত থাকা কি সঙ্গত হইবে?"

এমন সময় বোঁ বোঁ বোঁ বোঁ করিয়া একটা শব্দ হইল। এরূপ শব্দ আমরা আর কখনও শুনি নাই। সকলেই ভীত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। শব্দটা ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। মেয়েরা এবং শিশুরা সবেগে নিজ নিজ কুটিরের দিকে ধাবিত হইল। ধবল আদেশ করিল—"সকলে নিজ নিজ কুটিরের দ্বারে গিয়া অবস্থান কর। বিপদ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে সন্ধান করিয়া দেখি। তোমরা সকলে প্রস্তুত হইয়া থাক।"

ধবল সবেগে নিম্ব বৃক্ষটির দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিপন্ন হইলে সে নিম্ব-দেবতারই আশ্রয় লইত। আমিও আমার নিজের কুটিরের দিকে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম সেখানে ইলচি এবং ধবলের অন্যান্য পত্নীগণও সন্তান-সন্ততিসহ সমবেত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এই কথা—"এইবার আমাদের সর্বনাশ হইল, এইবার আমরা সদলে সবংশে নিহত হইলাম। আর ধবল আমাদের বাঁচাইতে পারিল না। জংলা, চল তোমার সহিত পলায়ন করি।"

বিশেষ করিয়া ইলচি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত এই কথা বলিতে লাগিল। আমি দ্বার প্রান্তে বিব্রত বিপন্ন হইয়া সবলে প্রস্তরকুটারটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমারও মনে হইতেছিল, এইবার বুঝি সব শেষ হইয়া গেল। শিলাঙ্গীকে আর দেখিতে পাইব না। নিনানির মুখটাও মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন সুদূরলোকে বসিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহস্যময় হাসি হাসিতেছে। যেন বলিতেছে—'আমাকে প্রতারণা করিয়া শিলাঙ্গীকে বিবাহ করিতে যাইতেছিলে, দেখ এইবার কি হয়। বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে অবিশ্বাস করিয়া আমাকে লুকাইয়া রাখিয়া আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়াছিল, ভাবিয়াছিলে যে আমার কিছু হইবে না, কানা কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে ভোলে নাই, আমার মৃত্যুই হইয়াছে। এইবার তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তোমার এবার আর শিলাঙ্গীকে লাভ

করা হইল না। শিলাঙ্গীর পরিবর্তে কঠোর মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রস্তুত হও।"

হঠাৎ বোঁ বোঁ শব্দটা থামিয়া গেল। আমার হৃৎস্পন্দনও সহসা থামিয়া গেল যেন। কুঠারের হাতলটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছিল, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কাহারও মুখ দিয়া একটি শব্দ নির্গত হইতেছিল না, অন্ধকার ঘরে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমরা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। একটু পরেই একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। মনে হইল গল্প করিতে করিতে কাহারা যেন আমাদের কুটিরের দিকেই আসিতেছে। ধবলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। আর একটু পরেই ধবল আমার কুটিরের সম্মুখে আসিয়া ডাক দিল।

"জংলা, বাহির হইয়া এস। মীংরা আসিয়াছে—"

আশঙ্কা মুহূর্তেই আনন্দে রূপান্তরিত হইল। আমরা সকলে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

ধবল বলিল, "এখন মীংরা আসিতে আমার একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। কাল আমাকে রোহার নিকট যাইতে হইবে, ভাবিতেছিলাম কাহাকে এখানে রাখিয়া যাইব। মীংরা থাকিলে চিন্তার কোনও কারণ নাই। তোমরা মশাল জ্বাল, মীংরাকে খাবার দাও—"

মীংরাকে ঘিরিয়া আমাদের উৎসব জমিয়া উঠিল। আমাদের প্রত্যেকের জন্যই মীংরা কিছু না কিছু উপহার আনিয়াছিল। কাহারও জন্য রঙীন ঝিনুক, কাহারও জন্য কড়ি, কাহারও জন্য অদ্ভুতাকৃতির প্রস্তরখণ্ড, কাহারও জন্য পাখীর পালক, কাহারও জন্য পশু-চর্ম। আমার জন্য কুম্ভীর দন্তের মালা আনিতে সে ভোলে নাই। নিনানির জন্য সে একটি ভাল্লুক-চর্ম আনিয়াছিল, কিন্তু ইলচি সেটি অধিকার করিল।

মীংরা প্রশ্ন করিল—"তোমাদের ফসল কেমন হইতেছে?"

"প্রথম প্রথম ভাল হইয়াছিল, এবার কিন্তু তেমন ভাল হয় নাই। আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।"

ধবলের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মীংরা বলিল—"চিন্তার কোনও কারণ নাই। জমিকে ভাল করিয়া পূজা করিতে হইবে। পূজা করিবার নূতন পদ্ধতি আমি তোমাকে শিখাইয়া দিয়া যাইব। আমি নানাস্থানে ঘুরিয়া নূতন জিনিস শিখিয়া আসিয়াছি।"

আমরা সকলে সবিস্ময়ে মীংরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মশাল-আলোকে তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে চতুরতা সেদিন পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহার অর্থ সেদিন বুঝিতে পারি নাই। অনেক পরে পারিয়াছিলাম।

"বোঁ বোঁ করিয়া শব্দটা কিসের হইতেছিল—"

আমি আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ধবলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মীংরা বলিল—"ওটি একটি প্রেতাত্মা, উহাকে আমি বশ করিয়াছি। উহার অদ্ভুত ক্ষমতা, উহা তোমাকে নির্ভুলভাবে চালিত করিতে পারে। আমি এখানে আসিবার পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ওই প্রেতাত্মাই শব্দ করিতে করিতে আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। উহার শব্দ অনুসরণ করিলে ভুল হইবার উপায় নাই। ওটি আমি ধবলকে উপহার দিয়া যাইব। আমি আর একটিকে বশ করিয়া লইব। বশ করিবার মন্ত্রটি আমি শিখিয়াছি—"

মীংরা বলিল—"অনেক নূতন জিনিস আমি শিখিয়াছি, সব তোমাদের শিখাইয়া দিব।

ঝিনা নদীর তীরে যে শাল-সম্প্রদায় বাস করে তাহারা চমৎকার বাসন প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। কয়েক দিন তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া প্রণালীটি আয়ত্ত করিয়াছি। অনেকেই আজকাল বাসন প্রস্তুত করিতেছে। নীহু রাবো, ঘংকাও হয়তো ইহা শিখিয়াছে। তাহারাও হয়তো একদিন আসিয়া তোমাদের ইহা শিখাইতে চাহিবে। তাৎপূর্বে আমিই তোমাদের শিখাইয়া দিব; একটি পাথরের খনির সন্ধানও আনিয়াছি। কিন্তু সর্বপ্রথমে উলন্তনের সহিত বিবাদের একটা নিষ্পত্তি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আরও অনেক স্থানে উলন্তনের কথা আমি শুনিয়াছি। মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া বিরাট বিরাট প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া সে নিজের কবর প্রস্তুত করিতেছে। যাদুকর টম্ভা তাহাকে বলিয়াছে, সে যদি শৃঙ্গধী পর্বতের উপর প্রস্তরনির্মিত একটি কবরগৃহ নির্মাণ করিতে পার তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হইবে। সে আরও বলিয়াছে, সেই কবরগৃহের প্রাচীরে এমন একটি ছিদ্র যদি থাকে যে ছিদ্র দিয়া প্রভাতের প্রথম সূর্যালোক তাহার সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহা হইলে উলন্তন অমর হইবে। যাদুকর টম্ভা বলে, যদি কোন আবৃত স্থানে কেহ নিজের কবর খনন করিয়া রাখে এবং সেই কবরে যদি প্রথম সূর্যালোক প্রত্যহ প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেখানে আর কোন মনুষ্যের শবদেহ স্থান পাইবে না, কারণ স্বয়ং সূর্যদেবতা এই স্থানটি নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। টম্ভার পরামর্শ অনুসারে উলন্তন তাই নিজের জন্য ওইরূপ একটি কবরগৃহ প্রস্তুত করিতেছে। টম্ভার নির্দেশে সে দূরবর্তী এক পর্বত হইতে বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড সংগ্রহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রস্তরগুলি কাটিয়া শৃঙ্গধী পর্বত শীর্ষে লইয়া যাইতে হইলে অনেক লোক চাই। সেইজন্য উলন্তন লোকের সন্ধান করিতেছে। ছলে বল কৌশলে যেমন করিয়া হোক বহুলোক তাহাকে একত্রিত করিতে হইবে। সেইজন্য সে তোমাদের এখানে হানা দিয়াছিল। আরও অনেক সম্প্রদায়ে সে হানা দিয়াছে। শুনিয়াছি লোকটি অত্যন্ত বলশালী এবং অত্যন্ত কামুক। বহু সুন্দরী নারীকেও সে হরণ করিয়াছে। তোমরা উহার কবলে পড়িও না, পড়িলে তোমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। রোহার সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ করাই উচিত। রোহার গরুর জন্য কিছু তৃণশস্য দিলে আমরা তেমন ক্ষতিগ্রস্থ হইব না। আরও বেশী জমি চাষ করিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া আমরা লইতে পারিব। কিন্তু মুশকিল হইবে শিলাঙ্গী যদি অপয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে আমি ঈগল সম্প্রদায়ের বর্তমান দলপতি মংখীর সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। ভালভিরা অরণ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঈগল সম্প্রদায় বাস করে। মংখী খুব ভাল লোক। মংখীর মুখে শুনিলাম, তাহার পুত্র টাকা শিকারে বাহির হইয়াছিল। দুই দিন পরে সে একটি মৃত ব্যাঘ্র এবং জীবন্ত যুবতী লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। বলিল, যুবতীটি তাহার মোহিনীশক্তি দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে অবশ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই টাকা ব্যাঘ্রটিকে শিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে নাকি অঙ্গভঙ্গী সহকারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ব্যাঘ্রের গুহার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিল, তাহাকে ব্যাঘ্র এমন মুগ্ধ হইয়া যায় যে টাকা কুঠারঘাত করিবার পরও সে কিছুমাত্র শব্দ করে নাই। যুগতীটি পাপিয়া সম্প্রদায়ভুক্তা। গভীর জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষেই তাহারা সাধারণতও বাস করে, ফলমূল-পোড়মাকড় ধরিয়া খায়। যুবতীর নাম হুঁ হুঁ। অপরূপ রূপসী। মংখী বলিল, হুঁ, হুঁ কেবল ব্যাঘ্রকেই মুগ্ধ করে নাই, তাহার শার্দূল পরাক্রম পুত্রকেও বশ করিয়াছিল। মংখী এই অজ্ঞাতকুলশীলার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত ছিল না। টাকার আগ্রহাতিশয্যেই অবশেষে বিবাহ হইল। বিবাহর পর কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা শোচনীয়। বিবাহের পরদিন বজ্রঘাতে টাকার মা মারা গেল। তাহার কয়েকদিন পরে মংখীর কুকুর ঘর্ঘর

পাগল হইয়া দলের কয়েকজনকে দংশন করিল। যাহাদের দংশন করিল তাহারাও পাগল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অজ্ঞাতকুলশীলকে বিবাহ করা বিপজ্জনক। রাক্ষসী প্রেতিনীরা অনেক সময় মানবীর ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লয়। এই শিলাঙ্গী যে কেমন হইবে তাহা আমাদের জানা নাই, তথাপি আমাদের এখন বিঘাওয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। কুকুরের মতো সতর্ক থাকিয়া ভেকের মতো যখন যাহা সুবিধা তখনই তাহা করিতে হইবে। ধবল, তুমি কাল প্রত্যুষেই জংলাকে লইয়া চলিয়া যাও। ইহার পর যদি আমরা কোনও বিপদে পড়ি, আমি যে প্রেতাত্মাটিকে আনিয়াছি সে আমাদের নির্ভুল পথে চালিত করিবে। কোন ভয় নাই, নিম্বদেবতা আমাদের ঠিক মঙ্গল করিবেন্?"

...সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত মীংরা নানারূপ গল্প করিল। তাহাকে ঘিরিয়া মশাল-আলোকে সেদিন আমরা অনেক অদ্ভুত কথা শুনিলাম। বিঘাও মীংরাকে পাইয়া খুবই খুশী হইয়াছিল। সে তাহার ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় জানাইতেছিল যে মীংরা যখন আসিয়া পড়িয়াছে তখন আর চিন্তার কোন কারণ নাই। সে কখনও বলিতেছিল—'হাওয়া যখন আসিয়াছে, তখন গাছের পাতা নিশ্চয় নড়িবে।' কখনও বলিতেছিল—'সূর্য যখন দেখা দিয়াছে, তখন অন্ধকার আর থাকিবে না।'

...পরদিনই প্রত্যুষেই আমরা রোহাঁর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সমস্ত পথ ধবল আমার সহিত একটি কথা বলিল না। আমি নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি কথাও বলে নাই। রাত্রে আমরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িবার পর বিঘাওয়ের কুটিরে গিয়া মীংরা, বিঘাও এবং ধবল আরও অনেক গল্প করিয়া নানারূপ পরামর্শ করিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ ধবল গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখন আমি তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। ধবলের গাম্ভীর্যে আমি মনে মনে হাসিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম নিনানিকে হারাইয়া ধবল শিলাঙ্গীর মতো আর একটি তরুণী ভার্যা লাভ করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ সে স্বপ্ন সফল না হওয়াতে সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাই গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

উম্নগার উপত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলাম বন্য গরুর দল চরিতেছে। মনে হইল শিলাঙ্গীর দুধনী মধুনী উহার মধ্যে আছে। ধবলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলাম। ধবল কিন্তু বিশেষ কোনও উত্তর দিল না। গরুগুলির দিকে চাহিতে চাহিতেই আমি পথ অতিবাহন করিতেছিলাম, গরুগুলি আমার মনে এক অপূর্ব ভাব সঞ্চার করিতেছিল। এতদিন গরু দেখিয়া মনের মধ্যে হিংসা ছাড়া অন্য কোনপ্রকার ভাব উদ্রিক্ত হয় নাই, এখন কিন্তু তাহাদের দেখিয়া মন স্নেহ-রসে সিক্ত হইতে লাগিল। মনে মনে এ বাসনাও জাগিল যে, শিলাঙ্গীর মতো আমিও একটি গরু পুষিব। আমার মনে এই কোমল ভাব বেশীক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হইতে পাইল না। আমরা একটি তরু-বীথির ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম, অকস্মাৎ একটি গাছের উপর হইতে কুঠার হাতে এক যুবক লাফাইয়া পড়িল এবং আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল মানুষ নয়, যেন মনুষ্যাকৃতি একটি নেকড়ে বাঘ। ভ্রূকুটি কুটিল মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল সে খানিকক্ষণ, তাহার পর বলিল—"আমি ঝোনঝিরা। আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ শিলাঙ্গীকে লাভ করিতে পারিবে না।"

আমাদের কথা বলিবার পর্যন্ত অবসর না দিয়া ঝোনঝিরা আমাকে আক্রমণ করিল।

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের সহিতও কুঠার ছিল এবং আমরা দুইজন ছিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের কুঠারযুদ্ধ হইল। ঝোনঝিরা আমাকেই আক্রমণ করিয়াছিল, আমিই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম। দেখিলাম ঝোনঝিরা কুঠার চালনায় খুবই দক্ষ। আমারও এ বিষয়ে পারদর্শিতা কম ছিল না। সুতরাং অনেকক্ষণ কেহই কাহাকেও আঘাত করিতে পারিলাম না। ধবল একটু দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে আমাদের যুদ্ধ দেখিতেছিল, সহসা সে পিছন দিক হইতে আসিয়া ঝোনঝিরার মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে সজোরে কুঠারঘাত করিল। তাহার মস্তক চৌচির হইয়া গেল। ধবলের হাতের কব্জিতে যে এত শক্তি আছে তাহা আমার ধারণা ছিল না। তাহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেই সে বলিল—"আমি কখনও দুইবার আঘাত করি না। এখন চল, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া শীঘ্র ফিরিতে হইবে। ইহার দেহটাকে আপাতত ওই ঝোপের মধ্যে গুঁজিয়া রাখ। কেহ যেন দেখিতে না পায়। কোন জন্তু-জানোয়ারে যদি টানিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে তো চুকিয়াই গেল, তাহা না হইলে উহাকে কবর দিবার ব্যবস্থা কাল কোন সময় আসিয়া করিতে হইবে। এ যুদ্ধের কথা তুমি যেন কাহাকেও বলিও না।" ঝোনঝিরার রক্তাক্ত দেহটাকে টানিয়া একটা ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর আবার আমরা রোহার উদ্দেশে পথ চলিতে লাগিলাম। ধবল পুনরায় মৌন হইয়া গেল।

...শিলাঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করা সত্যই একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কোথায় লুকাইয়াছিল কিছুতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। রোহা ধবলের সহিত আলাপ করিতেছিল, আমি একা একা শিলাঙ্গীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। জটিল অরণ্যের ভিতর ঢুকিয়া চীৎকার করিতেছিলাম—"শিলাঙ্গী তুমি কোথায়, বাহির হইয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে আমি চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব।" আমার চীৎকার শুনিয়া কখনও একঝাঁক সচকিত টিয়া কলরবে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া উড়িয়া গেল, কখনও কয়েকটা শৃগাল একটা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া আর একটা ঝোপে অন্তর্ধান করিল, কখনও ঘন পত্রপল্লবের একটা অদ্ভুত মর্মরে দূরাগত রোদন ধ্বনির মতো কিসের যে আভাস দিতে লাগিল তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না। অরণ্যের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইলাম একটি জলাশয় রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য জলজ পুষ্প ফুটিয়া আছে। জলাশয়ের এক অংশ মরকত শ্যাম শৈবালে আচ্ছন্ন, তাহাতেও স্বর্ণকান্তি অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। জলাশয়ের অপর পারে সারস জাতীয় এক পক্ষী দম্পতী ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল। আমার চীৎকার শুনিয়া তাহারা প্রথমে বিচলিত হয় নাই। বরং মনে হইল, আমার বক্তব্যটা তাহারা প্রণিধান করিতেছে। একটি সারসের মুখভাবে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও যেন আমি লক্ষ্য করিলাম। আমি ক্রমাগত চীৎকার করিতেছিলাম—"শিলাঙ্গী, তুমি কোথায় ফিরিয়া এস, আমি শপথ করিতেছি যে চিরকাল তোমার বন্ধু থাকিব, তোমাকে বিপদে ফেলিয়া কখনও পলায়ন করিব না। আমি শপথ করিতেছি, শোন, তুমি দেখা দাও, বড়ই বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে—" আমার চীৎকারে বিরক্ত হইয়াই সারসদম্পতি অবশেষে বোধ হয় উড়িয়া গেল। জলাশয়ের পুষ্পগুলি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। অরণ্যে বহুক্ষণ আমি ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু শিলাঙ্গীর দেখা পাইলাম না। অরণ্য পার হইয়া গিয়া পর্বত সংলগ্ন একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম, দূরে দেখিতে পাইলাম কয়েকটি বন্য গরু চরিতেছে। একটি বলিষ্ঠাকৃতি ষণ্ড আমার চীৎকার শুনিয়া তাড়া করিয়া আসিল। একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। ষণ্ডটি যে ঝোনঝিরার প্রিয় ষণ্ড তাহা তখন

জানিতাম না, পরে শিলাঙ্গীর মুখে শুনিয়াছিলাম। আমিই যে ঝোনঝিরার মৃত্যুর কারণ, ঃগুটি কি তাহা বুজিতে পারিয়াছিল? অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় চীৎকার করিতে লাগিলাম। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ লতা গুল্ম, প্রতিটি পশু পক্ষী আমার শপথ একাধিকবার শ্রবণ করিল। শিলাঙ্গী কিন্তু দেখা দিল না। সহসা আমার ভয় হইল, শিলাঙ্গী বোধ হয় আর আসিবে না। ঝোনঝিরার মৃত্যুসংবাদ সম্ভবতঃ তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমার নিষ্ঠুর আচরণে মর্মাহত হইয়া সে হয়তো আমাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়াছে। আর হয়তো তাহার দেখা পাইব না। কথাটা মনে হইবামাত্র আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া গেল। চলচ্ছক্তিহীন হইয়া আমি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলাম। সহসা আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল! আমি নীরবে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এখন ভাবিতেছি, আমি রোদন করিয়াছিলাম কেন? শিলাঙ্গীকে না পাওয়ার দুঃখটা কি শিলাঙ্গীর অভাবে, না আমার আত্মাভিমান ক্ষুন্ন হইল বসিয়া? আমার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও কি আমি শিলাঙ্গীকে চাহিয়াছিলাম? ইহার সত্য উত্তর কয়েকদিন পরেই মূর্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাকে চিনিতে পারি নাই।

...আমি কতক্ষণ রোদন করিয়াছিলাম জানি না, সহসা পিছন হইতে কে যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিল। ফিরিয়া দেখি শিলাঙ্গী। "ছি, ছি, তুমি কাঁদিতেছ! চল, আর বিলম্ব হইবে না। তুমি কোথায় কোথায় গিয়াছ আমি জানি, কি কি বলিয়াছ তাহাও আমি শুনিয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম, কেবল লুকাইয়া ছিলাম। ধবল রোহা বোধ হয় এতক্ষণ অস্থির হইয়া আমার বিবাহ হইয়া গেল। ধবল কিন্তু সমস্তক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। রোহাও বিশেষ কিছু বলে নাই। আমার মনে হইল, উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর কি যেন একটা হইয়াছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হইল পরদিন। রোহা ধবলকে দুগ্ধপান করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ধবল সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। ধবল বলিল, যে পানীয় সে স্পর্শ করিবার কল্পনা পর্যন্ত করে নাই তাহা পান করিতে অনুরোধ করিয়া রোহা তাহাকে অপমান করিয়াছে। রোহা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ধবল তাহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে। উভয় দলপতির মনোমালিন্যের পটভূমিকাতেই সেদিন আমার সহিত শিলাঙ্গীর সামাজিক মিলনের চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রথা অনুসরণ করিয়া মেয়েরা যদিও নৃতগীত করিয়াছিল, কথক গানর সুরে সুরে লাল পাখীর সহিত নীল পাখীর প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু মৌন দুই দলপতির সৌহার্দ্যের অভাব একটা অজানিত আশঙ্কায় সমস্ত উৎসবকে যেন ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিল। এই আশঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হইল আর একটু পরে, যখন আমি শিলাঙ্গীকে লইয়া নিজেদের আস্তানার উদ্দেশে পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম।

উহাদের প্রথা অনুযায়ী উহারা আমাদের সঙ্গে নিজেদের সীমানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আসিল। রোহা নিজের সীমানায় শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছিল। সীমানার শেষপ্রান্তে আসিয়া সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"এইবার তুমি শিলাঙ্গীর ভার বহন কর।" আমি শিলাঙ্গীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। রোহা তখন ধবলের হস্তে একটি জ্বলন্ত মশাল দিয়া বলিল—'অন্ধকারে তুমি উহাদের পথ দেখাও—"

...জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। একটা পার্বত্য পেচকের চীৎকার মধ্যে মধ্যে নৈশ নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিতেছিল। শিলাঙ্গী আমার স্কন্ধারূঢ়া থাকিয়াই আমাদের পথ নির্দেশ করিতেছিল। প্রথা অনুসারে তাহার নামিবার উপায় ছিল না। রাত্রে আমরা পার্বত্য পথ ভাল চিনিতে

পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর ধবল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল—"রোহা নিজে উলম্ভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহে না। সে বলিল, ঝোনঝিরা ফিরিয়া আসিলে সে-ই যুদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। রোহার নিজের যুদ্ধ করিবার স্পৃহা নাই। উলম্ভন যদি তাহাকে বেশী বিরক্ত করে, সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে বলিতেছে। রোহার নিকট হইতে এ আচরণ প্রত্যাশা করি নাই। সে অবিলম্বে যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করিবে এই আশাই করিয়াছিলাম। ঝোনঝিরার সহিত আমাদের শর্তের কি কোন সম্পর্ক ছিল?"

"রোহা আমাকে বলিয়াছিল যে ঝোনঝিরা আসিলে যুদ্ধের ব্যবস্থা হইবে।"

"তাহা হইলে তো মুশকিল হইল। তুমি তো একথা আমাকে ঘুণাক্ষরে বল নাই।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, শিলাঙ্গীও কিছু বলিল না। নীরবে আমরা পথে অতিবাহন করিতে লাগিলাম। উন্নগা পর্বতের উপত্যকায় অরণ্যে বৃক্ষশীর্ষে জ্যোৎস্না রহস্যময়ী হইয়া উঠিল। মনে হইল সে কি যেন একটা গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর ওই কর্কশ-কণ্ঠ পার্বত্য পেচকের চীৎকার যেন হাতুড়ির মতো তাহার রহস্যপুরীর দ্বারে আঘাত হানিতেছে। আমরা একটা ঘন তরুশ্রেণীর ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম, সহসা ধবল মশালটা ঊর্ধ্বে তুলিয়া আতঙ্কিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নিনানি, নিনানি—"

আমিও মুখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম, একটি বৃক্ষের চূড়া হইতে ঘন পত্রপল্লব ফাঁক করিয়া নিনানি যেন আমাদের দেখিতেছে। নিমেষের মধ্যেই কিন্তু সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শিলাঙ্গী তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

"নিনানির প্রেতাত্মা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। আর বোধ হয় আমাদের নিস্তার নাই। সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ সে এইবারে লইবে..."

ধবল মশাল লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। আমিও কম ভীত হই নাই, আমিও ছুটিতে লাগিলাম।

শিলাঙ্গী কেবল একবার বলিল—"আমাকে কাঁধে করিয়া ছুটিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, আমাকে নামাইয়া দাও," কিন্তু তাহাকে আমি নামাইয়া দিলাম না, আমার ভয় হইতে লাগিল নামাইয়া দিলে নিনানির প্রেতাত্মা হয়তো তাহাকে আক্রমণ করিবে। আমার সঙ্গে শিলাঙ্গীর প্রকৃত সম্পর্ক যে কি হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই নিনানির প্রেতাত্মা হয়তো তাহাকে আক্রমণ করিবে। আমার সঙ্গে শিলাঙ্গীর প্রকৃত সম্পর্ক যে কি হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই যে নিনানির প্রেতাত্মা ওই বৃক্ষে ওত পাতিয়া বসিয়াছিল তাহাকে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিনানির অকস্মিক অন্তর্ধানে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। এখন মনে হইল, সে মারাই গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই দেখা দিত। কোনও বন্য পশুই হয়তো তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। কিংবা সেই সর্বগ্রসী ময়াল সাপগুলা....। যক্ষিণী কি মরিয়াছে? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল শুধু শিলাঙ্গী নয়, নিনানিও যেন আমার স্কন্ধের উপর উঠিয়া চাপিয়া বসিয়াছে এবং শিলাঙ্গীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

...পরদিন প্রভাতে রোহার প্রেরিত দুইজন লোক আসিয়া আমাদের তৃণশস্য কাটিয়া লইয়া গেল। সমস্ত দিনে তাহারা অনেক তৃণশস্য সংগ্রহ করিল। নিম্ব-সম্প্রদায়ের সমস্ত নার-নারী ইহাতে বেশ অসন্তুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। ধবল নিম্ববৃক্ষের নিম্নে সমস্ত দিন বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। শিলাঙ্গীর দিকে বা আমার দিকে একেবারও ফিরিয়া চাহিল

না। মীংরা প্রভাতে উঠিয়াই যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, সমস্ত দিন তাহার আর সাক্ষাৎ পাই নাই। শিলাঙ্গী হাসিমুখে আগাইয়া গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে আমল দিল না। ইলচির চোখের দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিল। সাংরা প্রকাশ্যেই বলিল—একটা পাহাড়ী ডাইনী আমাদের জংলার উপর ভর করিয়াছে। কেবল কয়েকটি শিশু শিলাঙ্গীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মায়েরা তাহাদের তাহার নিকট আসিতে দিল না। আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু শিলাঙ্গী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। মনে হইল, এরূপ ব্যবহারে সে অভ্যস্ত। এখন মনে হইতেছে সে যেন সারাজীবন ধরিয়াই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার মর্মমথা শুনিতে চাহে নাই। তাহার শ্রীমণ্ডিত দেহটাই হইয়াছিল, ইহার প্রধান অন্তরায়। তাহার আসন্ন যৌবনপুষ্ট দেহটা কাহাকেও মুগ্ধ, কাহাকেও লুব্ধ, কাহাকেও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মোহ, লোভ অথবা ক্ষোভের স্রোতে আসল শিলাঙ্গী বারংবার ভাসিয়া গিয়াছিল, শিলাঙ্গীর স্বরূপ কাহারও চোখে পড়ে নাই। তাহার জীবনে একমাত্র আমিই বোধ হয় তাহার বন্ধুত্বের দাবী মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আমিও কি সত্যই তাহা মানিয়াছিলাম? আমি মানিবার ভান করিয়াছিলাম মাত্র। অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া উচ্চকণ্ঠে আমি যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিলাম, সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমিও তাহার দেহটা দেখিয়াই প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম, প্রলোভনের বশবর্তী হইয়াই তাহার নিকট মিথ্যা শপথ করিয়াছিলাম, তাহাকে পাইবার জন্যই নিনানির সহিতও মিথ্যাচরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে পাই নাই। সেদিন বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, আজ কিন্তু বুঝিয়াছি শঠতার দ্বারা মহৎ কিছু লাভ করা যায় না। নাগালের মধ্যে পাইয়াও তাহাকে হারাইতে হয়। শিলাঙ্গী বিঘাওয়ের নিকটও আলাপ জমাইতে ধরিয়াছিল। শিলাঙ্গী আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল—"ও বিঘাও নয়, বাঘ। এখনই আমাকে খাইয়া ফেলিত। চল আমার দুধনী-মধুনীকে দেখিয়া আসি—।"

"চল।"

যে ঝোপে শিলাঙ্গীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই ঝোপের ভিতর আমরা দুইজন পাশাপাশি বসিয়া ছিলাম। দুধনী-মধুনীর দেখা পাওয়া যায় নাই। দুধনী-মধুনীও ঝোপটিতে প্রায়ই নাকি আসিয়া ঢোকে, তাই আমরা আশা করিয়া বসিয়াছিলাম। নিনানির কথা হইতেছিল। শিলাঙ্গীও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

"আমি স্পষ্ট দেখিলাম, নিনানি গাছের ডাল ফাঁক করিয়া আমাদের দেখিতেছে। সত্যই কি নিনানি মরিয়া গিয়াছে?"

"কিন্তু গেল কোথায়? যক্ষিণীও নাই।"

"খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! ঝোনঝিরাও উলম্ভনের নিকট হইতে এখনও ফিরিল না কেন বুঝিতে পারিতেছি না। এক হিসাবে অবশ্য ভালই হইয়াছে, ঝোনঝিরা থাকিলে নির্বিঘ্নে বিবাহ হইত না, একটা-না-একটা ঝঞ্ঝাট বাধাইত সে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ঝোনঝিরার মৃত্যুসংবাদটা তাহাকে দিতে পারিলাম না। একটা শাখা আমার চোখের সম্মুখে বাতাসে দুলিতেছিল। মনে হইল সে যেন দুলিয়া দুলিয়া নীরব ভাষায় বলিতেছে—'এই কি তোমার বন্ধুর মতো আচরণ? প্রথম দিন হইতেই কপটতার আশ্রয় লইলে!' সহসা আর একটা কথা মনে হওয়াতে ভীত হইয়া পড়িলাম। ঝোনঝিরার প্রেতাত্মা আসিয়া ওই শাখাটা আশ্রয় করে নাই তো? ওই শাখাটাই এত বেশী দুলিতেছে

কেন? শিলাঙ্গীর দিকে ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দূর দিগন্তে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়, অধরে স্মিত মৃদু হাসি। আমি নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যে আকস্মিক ভয়ে ভীত হইয়াছিলাম, তাহা যেন আকস্মিকভাবেই অপনোদিত হইল। মনে হইল শিলাঙ্গী যতক্ষণ আমার কাছে আছে ততক্ষণ কেহই আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমার নির্নিমেষ দৃষ্টির আকর্ষণেই শিলাঙ্গী যেন মুখ ফিরাইল, আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "কি দেখিতেছ?"

"তোমাকে।"

শিলাঙ্গীও আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিল, "জংলা, বল, তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে তো?"

"থাকিব।"

কম্পমান শাখাটা দেখিলাম নিষ্কম্প হইয়া গিয়াছে। আমি নির্ভয় হইলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ভয় নূতন মূর্তিতে দেখা দিল আবার। আকাশ হইতে উড়িয়া আসিল। একটা সোঁ সোঁ শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পর দেখিলাম পঞ্চ-পর্বতের শিখর অতিক্রম করিয়া একটা মেঘ দ্রুতবেগে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মনে হইল ঝড় আসিতেছে নাকি?

"পঙ্গপাল, পঙ্গপাল—!"

শিলাঙ্গী আতঙ্কিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"চল বাড়ি যাই, চল, চল পঙ্গপাল বড় ভয়ানক পতঙ্গ।"

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আমরা যখন উন্নগা পর্বত হইতে নামিয়া আসিলাম, তখন দেখিলাম লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল আমাদের তৃণক্ষেত্রে আসিয়া বসিয়াছে। ধবল, মীংরা উন্মাদের মতো চীৎকার করিতেছে—"মার, মার, নিঃশেষে মার।" আমাদের দলের সকলে—এমন কি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত—পঙ্গপাল-নিধনে ব্যাপৃত হইয়াছে। বিঘাও দেখিলাম জীবন্ত পঙ্গ পাল মুখে পুরিয়া চর্বণ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া বিঘাও দন্ত বাহির করিয়া হাসিল। বলিল, "কানা এইবার প্রতিশোধ লইতেছে। দেখা যাক কতক্ষণে তাহার রাগ কমে। তোমরা দাঁড়াইয়া আছ কেন? এক-একটাকে ধর আর খাও।"

...আমাদের সমস্ত তৃণশস্য নিঃশেষ করিয়া পঙ্গপালের দল উড়িয়া গেল। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের কয়েক সহস্রকে হয়তো নিধন করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আমরা আমাদের তৃণশস্যগুলি বাঁচাইতে পারিলাম না। সমস্ত মাঠ শূন্য হইয়া গেল। নিম্ব-সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা কন্যা নদীর তীরে সমবেত হইয়া হাহাকার করিতেছিল। ধবল বলিতেছিল, "এবার আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কন্যা আমাদের উপর বিরূপ হইয়াছে। জমি আর তেমন শস্য দিতেছে না। এবার একে শস্য কম হইয়াছিল তাহার উপর পঙ্গপাল আসিল। কোন পাপে নিম্ব দেবতা আমাদের এ শাস্তি দিল? বিঘাও বলিতেছে, কানা প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু কানার ক্রোধেরই বা হেতু কি? আমি তো কোনও অপরাধ করি নাই। তোমরা কেহ যদি কোনও পাপ কোনও মিথ্যাচরণ করিয়া থাক বল, অকপটে স্বীকার কর। আমাদের জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, এখন কেহ কপটতার আশ্রয় লইও না। যদি কেহ কিছু করিয়া থাক, স্বীকার করিতে ভয় পাইও না, আমি তাহার হইয়া কানার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিব, আমি নিজে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। কেহ যদি কিছু করিয়া থাক, স্বীকার কর—"কেহ কোন উত্তর দিল না। কেবল বিঘাওয়ের

অট্টহাস্যে সান্ধ্য অন্ধকার প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মীংরা ভিড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা লইয়া আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার আমরা ভবিষ্যতে কি করিব তাহাই স্থির করা প্রয়োজন। আমি কাল প্রভাতেই উঠিয়া নূতন স্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িব। তৎপূর্বে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহা তোমাকে বলিয়া যাইতে চাই। নাঙ্গা নদীর তীরে নকুল সম্প্রদায়েরা বাস করে। তাহাদের ক্ষেত্রগুলি যখন শস্য দান করিতে পরাঙমুখ হইল তখন এক অভিনব উপায়ে নকুল-দলপতি ডোডো ক্ষেত্রগুলিকে পুনরায় উর্বর করিয়া তুলিয়াছিল। ধবল, সে উপায় আমি তোমাকে বলিয়া যাইব, তুমি বিচলিত হইও না, আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন চল আমরা নিজ নিজ কুটিরে যাই। কন্যা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া এমনভাবে সকলে যদি হাহাকার করি কন্যার শান্তি বিঘ্নিত হইবে, তাহাতে আমাদের আরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

মীংরার কথা শুনিয়া আমরা সকলে নিজ নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলাম। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিল। আর একটু পরে সেই অন্ধকার জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত হইল। সেই আলোক কিন্তু আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না। একটা নামহীন অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমর মুহ্যমান হইয়া রহিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল আমিই যেন সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দায়ী। আমার কপটতা, আমার মিথ্যা আচরণ, আমার শঠতাই আমার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। যেদিন হইতে আমি শিলাঙ্গীকে দেখিয়াছি সেইদিন হইতেই আমি সরলতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এমন কি যে নিনানির মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া আমি ধবলের সহিত প্রতারণা করিয়াছিলাম, সেই নিনানির সহিতও আমি সরল ব্যবহার করি নাই। শিলাঙ্গীর কথা তাহাকে বলিবার সাহস সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাহাকে ক্রমাগত মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

...গভীর রাত্রি। কেন জানি না সহসা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। চতুর্দিক নীরব। কেবল বহুদূরে একটা টিট্টিভ পক্ষী চীৎকার করিতেছিল। আর কোথাও কোন শব্দ ছিল না। মনে হইল টিট্টিভের অশ্রান্ত চীৎকার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিতেছে, একটা আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আমাকে যেন সাবধান করিতেছে। কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া সেই দূরাগত চীৎকারধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গী পাশেই শুইয়াছিল তাহাকে জাগাইলাম না। টিট্টিভ ক্রমাগত বলিতে লাগিল—'কি-যে-করিস, কি-যে-করিস, কি-যে-করিস!' মনে হইল সে যেন আমাকে বলিতেছে ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ, বাহিরে আসিয়া দেখ কি হইতেছে! তবু আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে পাখীর ডাকটা আমাকে যেন পাইয়া বসিল। সম্মোহিত হইয়া আমি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলাম। শিলাঙ্গী একা শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

...কন্যা নদীর তীরে সেদিন অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন জীবন্ত। মনে হইতেছিল কোন জাদুকরী যেন সম্মোহন মন্ত্রবলে সকলের নয়নপল্লবে কালনিদ্রা বিছাইয়া সঙ্গোপনে নিগূঢ় কিছু করিতেছে। টিট্টিভ পক্ষীটা যেন সে কথা জানে, তাই সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে। চতুর্দিক রহস্যে পরিপূর্ণ। আমি আমাদের শস্যপূর্ণ মাঠের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল ধর্ষিতা নারীর মতো সে যেন মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন নীরব ভাষায় আমাকে বলিতে লাগিল—'আমার এ দুর্দশা কেন

হইয়াছে জান? শিলাঙ্গীর জন্য। ধবলই ঠিক বলিয়াছিল, তৃণভোজী গরুরা আমাদের শত্রু, সেই গরু যাহারা পালন করে, তাহারা কখনও আমাদের মঙ্গল করিতে পারে না। শিলাঙ্গী এখানে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাই পঙ্গপালের দল আসিয়া আমাদের লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল। শিলাঙ্গী অপয়া, শিলাঙ্গী, অলক্ষ্মী, শিলাঙ্গী ছদ্মবেশিনী প্রেতিনী। তুমি এখনও সাবধান হও। তুমি নিম্ন-সম্প্রদায়ের সমর্থ যুবক, ভবিষ্যতে হয়তো তুমিই দলপতি হইবে, তুমি সামান্য একটা নারীর জন্য সকলের স্বার্থকে বিনষ্ট করিও না। যে অত্যাচার আমরা সহ্য করিলাম তোমার নিকট তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি। এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।"

..ঘিসু এবং ভংগার স্ত্রীরা বলিয়াছিল 'প্রতিশোধ চাই'। তাহাদেরই সরব দাবী যেন জ্যোৎস্নালোকে নীরব ভাষায় আমার অন্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সহসা দেখিতে পাইলাম দূরে নিম্ববৃক্ষতলে কাহারা যেন বসিয়া আছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। নিম্ববৃক্ষটির ঠিক পশ্চাতেই একটি ঘন ঝোপ ছিল। ঠিক করিলাম সেই ঘন ঝোপের ভিতর হইতে প্রথমে দেখিব কাহারা বসিয়া আছে, তাহার পর যদি প্রয়োজন মনে করি আত্মপ্রকাশ করিব। সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর শুইয়া পড়িলাম এবং সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া ঘন ঝোপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। টিট্টিভ অবিচ্ছিন্ন সুরে বলিতে লাগিল— 'কি-যে-করিস', 'কি-যে-করিস , 'কি-সে-করিস'! স্বপ্নের ঘোরেই আমি সরীসৃপের মতো সেই ঝোপের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিলাম। কোন এক অদৃশ্য শকিতআমাকে যেন এক নিদারুণ সত্যের সম্মুখীন করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বপ্নের ঘোর বেশীক্ষণ কিন্তু রহিল না।

...নিম্ববৃক্ষতলে ধবল, মীংরা এবং বিঘাও বসিয়াছিল। ঝোপের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ধবলের যে কথাগুলি আমার কর্ণগোচর হইল তাহা এতই ভীতিকর যে, ঝোপের মধ্যে একা বসিয়া থাকাই শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে শক্ত হইল। ধবল বলিতেছিল,— "আমি একটু আগে স্বচক্ষে আবার নিনানির প্রেতাত্মাকে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে তাহার কথাও শুনিয়াছি। নিনানি বলিল, "শিলাঙ্গীকে তোমরা যদি অবিলম্বে দূর করিয়া না দাও, তাহা হইলে তোমাদের আরও বিপদ হইবে। শিলাঙ্গী মানবী নয়, রাক্ষসী।"

বিঘাও বলিল, "সাধারণ মানবী যে নয় তাহার প্রমাণ আমি পাইয়াছি।'

"কি প্রমাণ?"

"তাহা এখন বলিব না।"

"কিন্তু কি করিয়া এখন উহার কবল হইতে আমরা উদ্ধার পাই তাহা বল।"

মীংরা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। সে এইবার কথা বলিল। সে বলিল, "তোমার ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা তো তোমাকে বলিয়াছি। শিলাঙ্গীকে তুমি ব্যবহার করিতে পার।"

"তাহা তো পারি, কিন্তু সে কথা শিলাঙ্গীকে বলিব কি করিয়া?"

"শিলাঙ্গীকে পৃথক করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কাল সকালে ঘোষণা করিয়া দাও যে কন্যা নদীর কলকল ধ্বনিতে তুমি কর্তব্যের নির্দেশ পাইয়াছ। তুমি আমাকে যাহা বলিতেছিলে সকলকে তাহাই বল। বল কন্যা বলিতেছে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না। উপর্যুপরি শস্য দান করিয়া জমি ক্লান্ত ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়াছে। নর-রক্ত না দিলে সে তৃপ্ত হইবে না। তাহার পর তুমি ঘোষণা করিবে মীংরা যে ভূতটি আমাকে দিয়া গিয়াছে সেই ভূতটির উপরই আমি নির্বাচনের ভার দিলাম। সে-ই ঠিক করিবে কাহার রক্ত আমরা ভূমিতে

সেচন করিব। তাহার পর গভীর রাত্রে সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িবে তখন যে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডটি তোমাকে উপহার দিয়াছি সেইটি মাথার উপর বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিলাঙ্গীর কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিবে।"

ধবল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—"জংলা যদি বাধা দেয়?"

"জংলাকেও হত্যা করিবে—সঙ্গে অস্ত্র লইয়া যাও। বিঘাওকে সঙ্গে রাখিও।"

বিঘাও বলিল, "জংলাকে হত্যা করিতে আমার আপত্তি নাই। আমার ধারণা জংলাই নিনানির মৃত্যু কারণ। ন্যায়ত এইজন্যই তাহার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।"

একথা শোনার পর আমি আর সেই ঝোপের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার পৃষ্ঠে যেন কাহার স্পর্শ অনুভব করিলাম; মনে হইল অশরীরী নিনানি আমাকে যেন উহাদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া নিনানিকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যাহা দেখিতে পাইলাম তাহাতেই আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। ঘন পত্রপল্লবাচ্ছন্ন একটি চারার পত্রপল্লবের মধ্যে দুইটি ছোট ছোট ফাঁক ছিল। তাহার ভিতর জ্যোৎস্না প্রবেশ করাতে মনে হইতেছিল যেন দুটি জ্বলন্ত চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া আছে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া কোনও প্রেতিনী ঝুঁকিয়া যেন আমাকে নির্নিমেষে দেখিতেছে। আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বুকে ভর দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ছুটিতে লাগিলাম। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। শিলাঙ্গীর কথা আর মনে রহিল না, তাহার নিকট যে শপথ করিয়াছিলাম সে কথাও আর মনে রহিল না।

...উন্নগা পর্বতের যে গুহায় যক্ষিণী থাকিত সেই গুহায় আত্মগোপন করিয়া বসিয়া ছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হইতেছিল ময়াল সাপের মূর্তি ধরিয়া মৃত্যু বুঝি আতর্কিতে পিছন হইতে আসিয়া আক্রমণ করিবে। গুহার ভিতর খস খস শব্দ শুনিয়া বার বার ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার গুহায় প্রবেশ করিতে হইতেছিল, ভয় হইতেছিল বাহিরে কেহ যদি আমাকে দেখিতে পায়! অনাবিল জোৎস্নায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে আলোকে বাহির হইবার সাহস আমার ছিল না। গুহার অন্ধকারেও আমি স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আলোক অন্ধকার উভয়ই আমার নিকট ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। আমি খস খস শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছিলাম, আবার একটু পরেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি এইরূপ ছুটাছুটি করিয়াই কাটিয়া গেল। ভোরের দিকে গুহার ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা সববেত একটা কলরবে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বুঝিতে পারিলাম, মানুষ নয়, পাখী ডাকিতেছে। লক্ষ লক্ষ পক্ষীর প্রভাতী কলরবে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গুহার ভিতর আবার খস খস শব্দ হইল, ঘাড় ফিরাইয়া এবার দেখিতে আগড়টা। ঠিক নিচেই পড়িয়াছিল। তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া সেটাকে তুলিয়া আনিয়া গুহামুখে লাগাইয়া ভিতরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম। ভয় কিন্তু মানুষকে কখনও নিশ্চিন্ত হইতে দেয় না। মনে হইল আগড়ে ফাঁক আছে, সেই ফাঁক দিয়া কেহ হয়তো আমাকে দেখিতে পাইবে, ফাঁক দিয়া সাপও ঢুকিতে পারে। আবার বাহির হইলাম, গাছের ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আগড়ের ফাঁক বন্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলাম। আমার মধ্যে যে ভীত পশুটা আত্মরক্ষার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকক্ষণ সে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া রহিল। শিলাঙ্গীর কথা একবারও

তাহার মনে পড়িল না যতক্ষণ না সে নিরাপদ হইয়া রহিল। তুষারযুগে যে পশু আত্মরক্ষার জন্য নিজের সঙ্গিনীকে হত্যা করিয়া আহার করিয়াছিল, সে পশু আমার মধ্যে তখনও বাঁচিয়া ছিল। আমার মানসপটে শিলাঙ্গীর যে ছবিটি ফুটিয়া উঠিল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অনুভব করিতেও পারি নাই। বরঞ্চ ইহাই আমার মনে হইতেছিল যে শিলাঙ্গীকোনও মোহিনী প্রেতিনী, আমাকে মুগ্ধ করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার পর হইতেই যেন আমাদের সমাজে উপর্যুপরি দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। ইহাও মনে পড়িল প্রথম দিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে সেইদিনই আমার মৃত্যু হইত। মনে হইল শিলাঙ্গী বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে সাধারণ অস্ত্র দিয়া সহজে আমাকে কাবু করা যাইবে না, তাই সে মোহিনী অস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাকে নিধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ধবল বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক, সে ঠিকই বুঝিয়াছিল যে যাহাদের গরু পালন করাই ধর্ম, তৃণ-পালকদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হইতে পারে না। আর একটা কথা মনে হওয়াতে আমার ধারণা আরও বদ্দমূল হইল যে, শিলাঙ্গী নিশ্চয়ই প্রেতিনী। সাধারণত যুবকেরাই যুবতীদের প্রণয় কামনা করিয়া তাহাদের খোহামোদ করে, যুবতীরা তাহাদের এই প্রচেষ্টায় হয় বাধা দেয়, না হয় বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু শিলাঙ্গী ঠিক বিপরীত আচরণ করিয়াছে। সে নিজেই যাচিয়া আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে। আমার সহিত কি উপায়ে তাহার বিবাহ হইতে পারে তাহা আমি আবিষ্কার করি নাই, শিলাঙ্গীই করিয়াছে। কাঙালিনীর মতো সে বারংবার আমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিয়াছে। মনে হইল ইহা মানবী যুবতীর পক্ষে স্বাভাবিক নয়, ইহা ঠিক প্রেতিনীর কারসাজি। নিনানিকেও হয়তো ওই প্রেতিনী কোনও উপায়ে নিধন করিয়াছে। এইভাবে নির্জন গুহায় বসিয়া পলাতক কাপুরুষ আমি আমার ভীরুতার সমর্থনে নানা যুক্তির জাল বয়ন করিতে লাগিলাম, মনে হইল আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে নিজেকে ত্রাণ করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করি নাই। সেই অসভ্য প্রস্তরযুগে আমি যাহা করিয়াছিলাম, আজও তোমাদের মধ্যে অনেকে কি তাহাই করিতেছে না? ভীরুতার সহিত অহমিকা যুক্ত হইয়া আজও কি তোমাদের পথভ্রান্ত করিতেছে না? যে নারী সভ্যতার জননী, যাহাকে ঘিরিয়া পুরুষের সর্ববিধ প্রচেষ্টা যুগে যুগে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রেমে মানবজীবন ধন্য, মানবসভ্যতা পুষ্ট, সেই নারীকে সম্যকরূপে চিনিবার শক্তি আমার তখন ছিল না, আজও তোমাদের অনেকের নাই। আজ কিন্তু আমি জানিয়াছি নারীই শক্তি। পুরুষের ভোগ-লালসার শিখায় নিজেদের সমর্পণ করিয়াও নারীরা যুগে যুগে অগ্রগতির পথ আলোকিত করিয়াছে। পুরুষেরা যাহা কিছু করিয়াছে নারীর জন্যই করিয়াছে। তাহার উৎসাহ, তাহার প্রেরণা, তাহার প্রতিভা উদ্দীপ্ত হইয়াছে নারী-প্রেমেই। পুরুষের ভোগলালসার শিখায় বারংবার পুড়িয়া ওই নারীরাই অবশেষে পুরুষদের ভোগের কবল হইতে উদ্ধারও করিয়াছে। নারীর সহায়তা না পাইলে পুরুষেরা নিরাসক্ত হইতেও পারিত না। যাঁহারা শক্তিকে নারীরূপে পূজা করিয়াছেন তাঁহারাই সতদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু আমার এ জ্ঞান তখনও হয় নাই, তাই আমি জোলমাকে পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, শিলাঙ্গীকে চিনিতে পারি নাই।

...কত রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হইয়াছিল জানি না, হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। অন্ধকার গুহায় উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল একটা আর্তনাদ যেন চতুর্দিকে গুমরিয়া উঠিতেছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া যেন কাঁদিতেছে। আর্তধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর

হইতে লাগিল। আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মনে হইল ওই আর্তধ্বনির প্রবল বন্যায় আমার অস্তিত্ব বুঝি এবার ভাসিয়া যাইবে, আমি কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিব না। কিসের শব্দ কোথা হইতে আসিতেছে, অনেকক্ষণ তাহা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিবা মাত্র কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। মনে হইল যে বদ্ধ ঘরে আমি এতক্ষণ বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম সেই বদ্ধ ঘরটা যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, যে বন্ধন আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছিল সেই বন্ধনটা যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। আমার অন্তরনিবাসী যে নির্ভীক সত্তা পশুত্বের কারাগারে ছট্‌ফট করিতেছিল, যে সত্তা জোলমা শিলাঙ্গীর স্বরূপ চিনিতে পারিয়াছিল, যে সত্তা সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়া মহত্তর প্রেরণায় যুগে যুগে কর্তব্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে আমার সেই সত্তা সহসা যেন মুক্তি পাইল। আমি যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম যে শব্দটা মীংরার মেকি-প্রেতিনীর শব্দ, ধবল ষড়যন্ত্র অনুসারে রজ্জুবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুটিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই মুহূর্তে কেমন করিয়া জানি না আমি নিঃশঙ্ক হইলাম, শিলাঙ্গীর সহিত বহুদিন পূর্বে আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা যেন সহসা আবার সজীব হইয়া আমার শ্রবণে ধ্বনিত হইল।

"শপথ কর যে তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে!"

"তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য আমি নিজেই উৎসুক, ইহার জন্য শপথ করিবার প্রয়োজন নাই।"

"তবু শপথ কর। মুখের বন্ধুত্ব আমি চাই না, সে রকম বন্ধুত্ব অনেকের সহিত আছে, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধুত্ব চাই।"

মনে পড়িল আমি শপথ করিয়াছিলাম। একবার নয় বার বার করিয়াছিলাম, তারস্বরে করিয়াছিলাম। আমার শপথ এ অঞ্চলে তরুলতা পশুপক্ষী পর্বত-উপত্যকা সকলেই শুনিয়াছিল। আমি গুহা হইতে বাহির হইয়া আমাদের পল্লীর দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে যে শশকটিকে ভক্ষণ করিয়াছিলাম সে-ই আমাকে শক্তি যোগাইতে লাগিল।

...অন্ধকারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিলাম। তখনও চাঁদ ওঠে নাই। উন্নগা পর্বতের উপত্যকায় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু ছুটিতেছিলাম। প্রস্তরে কঙ্করে কণ্টকে পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছিল, পদস্খলিত হইয়া দুই-একবার পড়িয়াও গেলাম, তবু কিন্তু থামিতে পারিলাম না। একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে অন্ধকারের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল। আমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে। মনে হইল আমার এই মহৎ অভিযান আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা উদ্ভাসিত নয়নে দেখিতেছে, ঝিল্লীর ঝঙ্কারে তাহা সঙ্গীতে রূপায়িত হইতেছে। অন্ধকারকে সচকিত করিয়া একটা ব্যাঘ্র গর্জন করিয়া উঠিল, আমি ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেলাম, কিন্তু ভীত হইলাম না। আমার মনে হইল, শক্তিমান শার্দূল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে—'সাবাস!' আরও কিছুক্ষণ ছুটিবার পর হায়েনার হা-হা ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। অন্য সময় হইলে হয়তো আমি অবিলম্বে কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিতাম, কিন্তু তখন আমার মনে হইল হায়েনার দল বলিতেছে—'বাহা, বাহা, বাহা।' বোঁ -বোঁ শব্দটা লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিলাম। সহসা শব্দটা থামিয়া গেল। আমি আমার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলাম।

...চাঁদ উঠিয়াছিল। আমি আমাদের শস্যশূন্য ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া একটা গাছের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। চতুর্দিক নীরব, নির্জন। আকাশে বাতাসে একটা নির্বাক আতঙ্ক যেন মূর্ত হইয়া ছিল। যে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলাম একটু পরে সেই গাছের তলায় একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। সহসা মনে পড়িল এই গাছের তলাতেই আমি নিমানির মাথায় মুকুট পরাইয়া দিয়া ছিলাম জ্যোৎস্না ফালির মুখে যে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহা যেন আমাকে তিরস্কার করিয়া সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিল। আমার মনে হইল আর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে জ্যোৎস্নার টুকরাটি বোধ হয় প্রশ্ন করিবে—'সেদিনের কথা কি মনে পড়ে?' গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া আমি আমাদের শস্যক্ষেত্র প্রবেশ করিলাম। কোথাও কেহ নাই, চতুর্দিক ধু ধু করিতেছে. মনে হইল তবে কি কাল আমার শুনিতে ভুল হইয়াছিল? কিন্তু বোঁ বোঁ শব্দটা তো একটু আগেই শুনিয়াছি! আর একটু অগ্রসর হইলাম। সেই টিট্টিভ পক্ষীটা কোথা হইতে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল—'কি-যে-করিস', 'কি-যে-করিস', 'কি-যে-করিস!' নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম কিছুক্ষণ। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলাম এবং পরমুহূর্তেই দেখিতে পাইলাম শিলাঙ্গীর ছিন্ন মুণ্ডুটা একটু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে কবন্ধটা রহিয়াছে। বুঝিলাম কবন্ধটা টানিয়া টানিয়া ধবল ক্ষেত্রের প্রতি ক্ষেত্রের প্রতি অংশে রক্ত ধারা সেচন করিয়াছে। প্রভাতের অরুণাভা তখনও পূর্বদিগন্ত রঞ্জিত, করে নাই, অন্ধকার তখনও উন্নগার উপত্যকাকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সেই অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মতো আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। স্থির করিলাম প্রতিশোধ লইব, ধবলকে হত্যা করিব। ইচ্ছা ছিল অন্ধকারেই কাজ শেষ করিয়া সকলের অগোচরে আবার শিলাঙ্গীর কাছে ফিরিয়া আসিব। শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার নিকট আর শবমুণ্ড মাত্র ছিল না। তাহা আমার কল্পলোকে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি অনেকক্ষণ তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইব। আর একটা অদ্ভুত বাসনাও আমার মনে জাগিয়াছিল। বাল্যকালে ধবলের মাতামহীর মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। জিহ্বা পর্বতের কন্দরে নাকি এক জাদুকরী আছে। সে নাকি কাটামুণ্ড কবন্ধের সহিত জোড়া লাগাইতে পারে। ঠিক করিয়াছিলাম, ধবলকে হত্যা করিয়া শিলাঙ্গীর কবন্ধটাকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিব। তাহার পর যাত্রা করিব জিহ্বা পর্বতের উদ্দেশে, যেমন করিয়া পারি সেই ক্ষমতাময়ী যাদুকরীকে খুঁজিয়া বাহির করিব।

...ধবলকে হত্যা করিতে হইলে প্রথমেই আমার প্রস্তরকুঠার সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কুঠারটা ছিল আমার কুটিরে। আমি যখন কুটির ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম, সঙ্গে কোন অস্ত্র লই নাই। আমি সেই জন্য দ্রুতপদে আমার কুটিরের উদ্দেশেই ধাবিত হইয়াছিলাম। কুটির পর্যন্ত কিন্তু পৌঁছিতে পারিলাম না। উন্নগা পর্বতের পাদদেশেই উলম্ভনের লোকেরা আমাকে বন্দী করিল। বলিষ্ঠাকৃতি আট-দশজন লোক আমাকে ঘিরিয়া নিমেষের মধ্যে আমার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। আমি শুনিতে পাইলাম, কন্যা নদীর তীরে হাহাকার উঠিয়াছে। বহনকারীদের আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কে?"

"আমরা উলম্ভনের লোক। উলম্ভনের আদেশে আমরা তোমাদের আক্রমণ করিয়াছি।"

"আমাকে এখন কোথায় লইয়া যাইতেছে?"

"পাহাড়ে। তোমাকে প্রস্তর বহন করিতে হইবে।"

আরও কিছুক্ষণ পরে আমি প্রশ্ন করিলাম—"কিন্তু এমনভাবে আমাদের আক্রমণ করিবে, উলম্ভনের দূত গজস্কন্ধ তো সে কথা বলে নাই!"

"আক্রমণের ইচ্ছা উলম্ভনের ছিল না। সহসা উলম্ভনের মত পরিবর্তন করিয়াছে।"

"কেন?"

"ঠিক জানি না।"

ইহার পর আমি অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু আর একটাও উত্তর পাই নাই।

...প্রস্তর বহন করিতেছিলাম। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, তাহা আজ তোমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। আজকাল পশুকেও তোমর বোধ হয় অত কষ্ট দাও না। বড় বড় বৃক্ষকাণ্ডকে মসৃণ করিয়া তাহার উপর বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড চাপাইয়া আমাদের সেগুলি টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হইতেছিল। প্রস্তরখণ্ডে এবং বৃক্ষকাণ্ডগুলিতে চর্মনির্মিত বহু রজ্জু সংলগ্ন ছিল। সেই রজ্জুগুলি আমাদের কোমরে এবং কক্ষে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, আমরা টানিতে লাগিলাম। ঠিক টানিতেছি কিনা তদারকি করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পর্যবেক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের হস্তে চাবুকও ছিল এবং সেই চাবুকের ব্যবহার করিতে তাঁহারা কার্পণ্য করেন নাই। অন্তত পাঁচশত লোক মিলিয়া আমরা একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ কশাঘাতে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে এক একজন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে সরাইয়া পর্যবেক্ষকগণ আর একজনকে কোমরে এবং বৃক্ষে চর্মরজ্জু বাঁধিয়া দিতেছিলেন। আমি মূর্ছিত হইয়া পড়ি নাই, দন্তে দন্তে চাপিয়া আমি নীরবে সেই গুরুভার টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলাম। উপর্যুপরি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনাপরম্পরায় আমি শুধু একটি জিনিসই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। দেবতার রোষ। সমস্ত অন্তর দিয়া আমি অনুভব করিতেছিলাম, যে শাস্তি আমি ভোগ করিতেছি তাহা ন্যায়ত আমার প্রাপ্য। আমি বিঘাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অবিশ্বাস করিয়াছি, ধবলকে ঠকাইয়াছি, নিনানির সহিত বিশ্বাসঘাতকা করিয়াছি, শিলাঙ্গীর নিকট বারংবার যে শপথ করিয়াছি সে শপথের মর্যাদা রক্ষা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, সকলেকে ফাঁকি দিয়া নিজের লালাসাময় স্বার্থকে চরিতার্থ করিতে পারিব. ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে সর্বদ্রষ্টা দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সুতরাং পর্যবেক্ষণকারীদের কশা যখন আমার নগ্নপৃষ্ঠের উপর পড়িতেছিল তখন আমি বিদ্রোহ করি নাই। অবনত মস্তকে সমস্ত সহ্য করিতেছিলাম। একটিমাত্র ক্ষীণ আশা কেবল মনের মধ্যে জাগিয়া ছিল, প্রায়শ্চিত্ত অবসানে দেবতা হয়তো প্রসন্ন হইবেন।

...সরসরা নদীর তীরে উলম্ভনের রাজধানীতে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে। দেখিলাম একটি নাতিউচ্চ পর্বতের বিরাটকায় প্রস্তরখণ্ড সকল একত্রিত হইয়াছে। মশাল জ্বলিতেছে। সেই মশাল-আলোকে বহু শ্রমিক প্রকাণ্ড গর্ত খনন করিতেছে, শুনিলাম সেই সব গর্তে এই প্রস্তরগুলি নাকি প্রোথিত হইবে। পর্যবেক্ষণকারীদের কশাঘাতের শব্দে নৈশ অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছিল। শ্রমিকদের আর্তনাদে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। বাল্যকালে এক বৃদ্ধার মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, মনে হইল সেই নরকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

"উলম্ভন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সহিত শ্রমিকদের পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন, তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াও।"

পর্বতের উপর হইতে একজন পর্যবেক্ষণকারী উচচকণ্ঠে এই আদেশ ঘোষণা করিবামাত্র

মুখে মুখে তাহা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। আমর সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরেই দেখিতে পাইলাম মশাল-আলোকে পরিবৃত হইয়া উলম্ভন দম্পতী পর্বত হইতে অবতরণ করিতেছে। তাহারা যখন নিকটস্থ হইল, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আমার নিজের চক্ষুকেই আমি যেন বিশ্বাস করিতেছিলাম না। গজন্ধরই যে উলম্ভন এবং নিনানিই যে উলম্ভনের প্রিয়তমা পত্নী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও সন্দেহাকুল হইতেছিলাম। তাহারা যখন আরও নিকটে আসিল, তখন আর সন্দেহ রহিল না। সবিস্ময়ে দেখিলাম প্রায় নগ্না নিনানির দক্ষিণ বাহু গজন্ধরের কটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে নিনানির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য আমার মুখের উপর নিবদ্ধ হইল, তাহার পর আবার সরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরিদর্শন করিয়া উলম্ভন অবশেষে আমাদের বিশ্রাম করিতে আদেশ দিল। অল্পক্ষণ পরেই আমি একটি ক্ষুদ্র কুটিরে নীত হইলাম। উলম্ভনের অনুচরেরা আমাকে কিছু খাদ্য ও পানীয় দিয়া গেল। আমার সমস্ত দেহমন অবশ হইয়া গিয়াছিল। খাদ্য-পানীয় আমি স্পর্শ পর্যন্ত করিলাম না। আমি চক্ষু বুজিয়া কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"হে দেবতা, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, মৃত্যুদণ্ড দিয়া আমার পাপের চরম শাস্তি দাও এবার। আমি পাপী, ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার অধিকার আমার নাই, আমাকে তুমি চরম শাস্তি দাও, মৃত্যুর জন্যই আমি প্রস্তুত হইয়াছি..."

...কাহার স্পর্শে গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, নিনানি বসিয়া আছে। দূরে মশাল জ্বলিতেছিল, সেই মশাল-আলোকে দেখিতে পাইলাম, নিনানির অধরে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটিয়াছে।

"তুমি ভাবিয়াছিলে আমাকে সরাইয়া দিয়া শিলাঙ্গীর সহিত ঘর করিবে, কিন্তু জানিয়া রাখ, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা হইবে না। যক্ষিণীর মুখে প্রথম যখন কথাটা শুনিয়াছিলাম বিশ্বাস করি নাই। তাহার পর স্বচক্ষে দেখিলাম, তাই আমি প্রেতিনী সাজিয়া ধবলকে প্ররোচিত করিয়াছি যাহাতে সে শিলাঙ্গীকে দূর করিয়া দেয়, তাই আমি উলম্ভনের লালসাবহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছি, যাহাতে সে তোমাদের আক্রমণ করিয়া তোমাদের বন্দী করিয়া আনে। আমি জানিতাম, বন্দী করিয়া না আনিলে তোমার নাগাল পাইব না। এইবার আমার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। যক্ষিণীর প্রতি আমার কর্তব্যও শেষ হইয়াছে। আমার অনুরোধে উলম্ভন তাহার ভার লইয়াছিল, গতকল্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার আর কোন বন্ধন নাই। তোমাকে চাহিয়াছিলাম, পাইয়াছি—অধিকার করিয়াছি। চল—"

"কোথায়?"

"আমার সঙ্গে। আমি এখনই তোমাকে সঙ্গে লইয়া উলম্ভনের এলাকা ত্যাগ করিব। এস—

নিনানি হাত বাড়াইয়া দিল।

...নিনানি আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল। কত প্রান্তর, কত অরণ্য, কত পর্বত যে পার হইলাম! জোলমা শিলাঙ্গীরাও যুগে যুগে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হাত ধরিয়া চলিবার যোগ্যতা আমার ছিল না। তাই বার বার তাহাদের পাইয়াও হারাইয়াছি। নিনানি কিন্তু আমাকে ছাড়ে নাই, যুগে যুগে নব নব রূপে সে-ই আমাকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ঈর্ষা-লোভ-কামনা কণ্টকিত

সর্বগ্রাসী প্রেমের নিকট বারম্বার আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহার উদ্ধত অহঙ্কারের মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার যুক্তিহীন দাবীকে বারংবার মানিয়া লইয়াছি। আমার প্রচণ্ড পৌরুষ বারংবার তাহার পেলব যৌবরেন নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমি যুগে যুগে তাহার মায়াজালে বন্দী হইয়াছি। ইহাকে আমি একদিন সবলে অধিকার করিয়াছিলাম বটে, ক্ষুধার তাড়নায় একদিন আমি জীবন-সঙ্গিনীকে আহারও করিয়াছি। কিন্তু আমার এই অপ্রতিহত প্রতাপ বেশী দিন অক্ষুন্ন থাকে নাই। জমুনির হস্তে পৌরুষের লাঞ্ছনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পুঠা এবং লুংয়ের হস্তে আমি নিজে ক্রীড়ানক মাত্র হইয়াছিলাম, গৌয়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের নিকট আমাকে হার মানিতে হইয়াছিল। শীলিমা, রাহুলা, লীরা, লালচুমের নিকট আমি বারংবার নতশির হইয়াছি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছে যে শক্তি একদা সশঙ্ক মিনতির মূর্তি ধরিয়া কাচিন, এলাহি, টিনা, নিমার রূপে আমার নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিল, নিনানি সেই শক্তিরই প্রখর প্রকাশ। আমি নিজেও মাঝে মাঝে নারীজীবন যাপন করিয়াছি, অস্পষ্টভাবে তাই নিনানির মনোভাব যেন বুঝিতে পারি। মাঝে মাঝে জোলমা, শিলাঙ্গীর কথা মনে পড়ে, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। মনে হয় আমার অন্তরতম সত্তা যেন জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিনারি হাত ধরিয়া জোলমা-শিলাঙ্গীকেই অনুসন্ধান করিতেছে, আর সেই অনুসন্ধানের ফলেই বুঝি মানব সভ্যতা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আশা করিয়া আছি, সে বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে, যেদিন নিনানির সহিত জোলমা-শিলাঙ্গীর প্রভেদ থাকিবে না, নিনানিই সেদিন বিবর্তিত হইয়া জোলমা-শিলাঙ্গীতে পরিণত হইবে, কল্পলোকের স্বপ্নসঙ্গিনী যেদিন মর্ত্যলোকের মানবীরূপে দেখা দিবে। কিন্তু সে যুগ এখনও আসে নাই। সেই অনাগত যুগের উদ্দেশেই আমার যাত্রা। আমার যাত্রার যতটুকু ছবি কালের পটভূমিকায় স্থাবর হইয়া রহিয়াছে, তাহারই সামান্য একটু অংশ বীভৎসতায়, নগ্নতায়, নিষ্ঠুরতায়, ছন্দে, গানে, শিল্পে তোমাদের ইতিহাস রচনা করিয়াছে, কিন্তু সে ইতিহাস অতিশয় সীমাবদ্ধ ইতিহাস। আমার যাত্রাপথ অনন্ত অসীম। আমি চলিয়াছি, চলিতেছি এবং চলিব— ইহাই সত্য। আমি মরি নাই, আমি মরিব না। নিনানিকে লইয়া আমি নীলাম্বু নদীর তীরে বিশাল অপরাজিতা বংশ স্থাপন করিয়াছিলাম। নিনানির পরও আরও কত নারী আসিয়াছিল, আরও কত নারীর তীব্র মধুর সঙ্গ-মদিরা আমার কল্পনাক উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে আমি ধরিতে চাহিয়াছিলাম সেই অধরাকে, যাহাকে আমি পাইয়াও পাই নাই। আজও তাহাকেই চাহিতেছি। দূরদিগন্ত সীমায় দেখিতে পাইতেছি জোলমা-ভাসিয়া যাইতেছে, বুঝিতে পারিতেছি বৃক্ষ কোটরে শিলাঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড আমার পথ চাহিয়া আছে, নিনানি কিন্তু আমার হাত ধরিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আশা আছে, মুক্তি একদিন আসিবেই আসিবে। হয়তো অভাবিতরূপে, কিন্তু আসিবে।

প্রথম গরল

উৎসর্গ

আমার ছোট বউমা
শ্রীমতী চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু

মানুষের স্মৃতি বেশি দিন থাকে না। এক জন্মেই তাহা ক্রমশ ঝাপসা হইয়া যায়। জন্মান্তরে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। আমি কিন্তু ভুলি নাই। ইকা-জোলমা-শিলাঙ্গি-নিনানিকে লইয়া যে ব্যক্তি মাতিয়া উঠিয়াছিল সেই ব্যক্তিই যে আবার নবজন্মে নতুন মোহে নতুন নারীর জন্য তপস্যা করিতেছে এবং তাহারই অন্তরলোকে বসিয়া আমি যে সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের মত নির্বিকারভাবে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহা আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য। আমি জন্ম-জন্মান্তরে নানাভাবে আবর্তিত হইয়াছি কিন্তু বিস্মৃতির কবলে পড়ি নাই। যাহা দেখিয়াছি সমস্ত আমার মনে আছে, তাহার কিছুটা আজ তোমাদের শুনাইব। যাহার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া আমি দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, অনুভব করিয়াছি সে ব্যক্তি আমি নহি, সে শরীরী। মৃত্যুর করাল কবলে বারংবার সে শরীর অবলুপ্ত হইয়াছে। পুরাতন গৃহের মত তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেই সব গৃহের মধ্যে আমি বায়ুর মত বাস করিয়াছি। গৃহ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমি লুপ্ত হই নাই। বহু গৃহের বহু লীলা আমার স্মৃতির স্তরে স্তরে অক্ষয় হইয়া আছে। আমার নিজের জবানীতে তাহার কিছুটা আজ তোমাদের শুনাইব।

নদীর ক্রোড়েই মানব সভ্যতা লালিত হইয়াছে। কখনও সে নদীর নাম নিল, কখনও ইউফ্রেটিস, কখনও তাইগ্রিস, কখনও আমাজন, কখনও ভল্‌গা, কখনও গঙ্গা। বহু নামহীন নদীও মানব সভ্যতাকে লালনপালন করিয়াছে। এক জন্মে, যখন আমার নাম জংলা ছিল, আমরা কন্যানদীর তীরে তৃণ বপন করিয়া জীবনধারণ করিতাম। ধবল আমাদের দলপতি ছিল। ধবলের পত্নী নিনানি ছিল আমার প্রণয়িনী। তাহারই কৃপায় ও কৌশলে প্রবল পরাক্রান্ত উলন্তনের প্রবল অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। এখন নিনানিও নাই, উলন্তনও নাই। এখন আমার নতুন নাম টালা। এখন আমাদের সে দুর্দশাও আর নাই। আমরা চাষবাসের প্রভূত উন্নতি করিয়াছি, গৃহস্থ হইয়াছি। মানুষের বাঁচিবার তাগিদই মানুষকে নিত্যনব উদ্ভাবনে নিযুক্ত করিয়াছে। লৌহ তাম্র প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়া মানব সমাজ এখন প্রকৃতির নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। আমরা চাষের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছি, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি, নৌকাযোগে বিদেশের হাটেবাজারে যাতায়াত করিতেছি। এসব করিতে বহু যুগ লাগিয়াছে, নিরন্তর চেষ্টাই মানুষকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। এখন আমাদের শস্যক্ষেত্র দিগন্তবিস্তৃত। ছোট ছোট গ্রামে আমাদের পরিবারবর্গ সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সকলেই— বিশেষ করিয়া মেয়েরা, এমন কী ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত, চাষবাসের কর্মে নিযুক্ত। আমাদের অনেক গরু, অনেক মহিষ, অনেক ছাগল, অনেক ভেড়া। কুকুর আমাদের পরিজনের মত হইয়া গিয়াছে। জন্তু-জানোয়ার এবং পক্ষী শিকারে আমরা দক্ষ হইয়াছি। বল্লম বর্শা তীর-ধনুক ছোরা কুঠার এবং খড়্গ এখন আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের গরু-মহিষ-ছাগল-ভেড়া বিরানি নামক বিরাট জঙ্গলে থাকে। দোহা এবং তাহার সাঙ্গপাঙ্গোরা তাহাদের দেখাশোনা করে। অনেক দুধ হয়। কত হয় ঠিক জানি না। শুধু জানি, ছয় মাস পর্যন্ত কোনো গাভীর দুধ আমরা খাই না। ছয় মাস পর্যন্ত বাছুরেরাই মায়ের দুধ খাইবার সুযোগ পায়। শুধু বাছুরদের নয়, বাছুরের মায়েদেরও দোহা

দুধ খাওয়ায়। এ সত্ত্বেও অনেক দুধ উদ্বৃত্ত হয়। কিছু দুধ দোহা আমাদের খাওয়ার জন্য পাঠাইয়া দেয়। বড় বড় মাটির কলসি করিয়া সে দুধ দোহার ভৃত্যগণ আমাদের কাছে প্রত্যহ বহন করিয়া আনে। আমাদের খাইবার পরও যাহা বাঁচে তাহা লইয়া দোহা ব্যবসা করে। দুধের বদলে চাষের জন্য লাঙল, লোহার ফাল, তামার বাসন, মাটির জালা, বল্লম, তীর প্রভৃতি সংগ্রহ করে সে। দুধ লইয়া বৎসরে একটা করিয়া উৎসবও হয় একদিন। তাহাকে শুদ্ধ ভাষায় দুধ-ভূমি বলা যাইতে পারে। চলিত ভাষায় আমরা তাহাকে দুধভুঁইয়া বলি। সেদিন আমাদের জমিতে আমাদের বৃক্ষগুলির নিচে কলসি কলসি দুধ ধালা হয়। সেদিন আমরা বা বাছুরেরা, কেহই দুধ খাই না। সমস্ত দুধ জমিতেই ঢালা হয়। দোহা সেদিন মহানন্দে নৃত্য করে। আমরাও সকলে নৃত্য করি। বাহুর উৎক্ষেপে, সর্বাঙ্গের দোলনে, আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে, উচ্ছ্বসিত অঙ্গভঙ্গীতে সে নৃত্যের যে প্রকাশ, তাহা উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত নৃত্যবিধির মানদণ্ডে মাপা যাইবে কিনা জানি না কিন্তু তাহা যে আমাদের অন্তরের স্বতোৎসারিত আনন্দের প্রকাশ তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্দকে মাপিবার অথবা মাপিয়া আনন্দ করিবার কোনো উপায় তখনও আমাদের জানা ছিল না। দোহার প্রাণ প্রাচুর্যের হিল্লোলে আমরা সকলে ভাসিয়া যাইতাম, আমরা সকলে হাবুডুবু খাইতাম, আমরা সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। দোহা আমাদের মধ্যে একটি অদ্ভুত লোক। সে মাছ-মাংস খাইত না। দুধ, শাক সবজি আর ফল তাহার আহার ছিল। বিশাল চেহারা ছিল তাহার। দৈত্যের মত সে বিরানির বিরাট অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। অদ্ভুত শক্তিধরও ছিল সে। বাঘ, সিংহ, ভালুক, নেকড়ে বাঘকে সে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিত। শৃগাল প্রভৃতি ছোট জানোয়ারকে সে সামান্য ঢিলের মত শূন্যে ছুঁড়িয়া দিত। বেজি, খরগোসদের সে গ্রাহ্যই করিত না। তাহারা পারতপক্ষে তাহার সম্মুখে আসিত না। একবার সে একটা বন্য বরাহের পিঠে চড়িয়া তাহার সূচাগ্র মুখটা ধরিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিয়াছিল। বিরাট বিরানি অরণ্যের যোগ্য অধিপতি ছিল দোহা।

আমরা তখন যেন একটা রূপকথালোকে বাস করিতাম। আমাদের চারিদিকের প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস, জন্তু-জানোয়ার, পাখি, মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, আমাদের মাঠের ফসল, আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই যেন একটা অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতাম। বিশ্বাস করিতাম, আমরা যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত। সেই শক্তিই আমাদের নিয়ামক, তাহার বিধান অব্যর্থ, তাহার আইন ন্যায়সঙ্গত। তাহার আইন ন্যায়সঙ্গত এই বিশ্বাস থাকাতে আমরা সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতাম, পাছে সে আইন লঙ্ঘন করিয়া ফেলি। মাঝে মাঝে ফেলিতামও কারণ সব সময় সম্পূর্ণভাবে ন্যায়পথে চলা কি সম্ভব মানুষের পক্ষে? এমনকি যাহা জীবনধারণের পক্ষে অনিবার্য তাহা তো করিতেই হইত। সম্পূর্ণ ন্যায়পথে চলা যে অসম্ভব। বন্যপশুকে যখন শিকার করি তখন কি অন্যায় করা হয় না? ফসল কাটিয়া যখন আহার করি তখন কি সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়? অন্তরের অন্তঃস্থলে আমরা অনুভব করিতাম অন্যায় করিতেছি, কিন্তু না করিয়াও বা বাঁচিব কী প্রকারে। তাই মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ জাগ্রত হইয়া থাকিত। মনে মনে একটা ভয়ও হইত। ভাবিতাম যাহাকে আমরা হনন করিতেছি তাহার আত্মা কোনো না কোনো ভাবে ইহার প্রতিশোধ লইবে। আমরা বিশ্বাস করিতাম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব লোপ পায় না, আত্মা বাঁচিয়া থাকে, সে আত্মা দুর্বল নয়, শক্তিশালী। ভয় হইত হয়ত সে প্রতিশোধ লইবে। তাহার ক্রোধ প্রশমনের জন্য আমরা তাই তাহাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতাম।

একটা ঘটনার বর্ণনা দিতেছি। ইহা হইতেই আমাদের মনোবৃত্তির কিছু পরিচয় হয়ত পাইবে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

সেদিন সকালে দোহা প্রকাণ্ড একটা ভালুক স্কন্ধে লইয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড কালো ভালুক। প্রায় একটা মহিষের মত আকৃতি। দোহা সেটাকে আছড়াইয়া মারিয়াছিল। দোহা নিরামিষাশী, কিন্তু সে জানে ভালুকের মাংস আমাদের খবু ভাল লাগে। আমরা সকলেই মাংসাশী, তাই কিছু শিকার করিলেই আমাদের জন্য সে জানোয়ারটি বহিয়া আনে। দোহা আসিয়া প্রথমেই একটি বিকট চিৎকার করিল। সে চিৎকার অনেকটা রোদনের মত। সে চিৎকার যেন অনেকটা ভালুকেরই আর্তনাদের অনুরূপ। দোহা নিকটে আসিলে আমরা দেখিলাম দোহা কাঁদিতেছে। তাহার বিরাট শ্মশ্রু-গুম্ফ অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া যাইতেছে। দোহা আমাদের কাছাকাছি আসিয়া ধপাস করিয়া ভালুকটা মাটিতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর আমাদের জমির মাঝখানে দুইটা মোটা খুঁটি পুঁতিয়া ভালুকটাকে তাহার পিছনের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। ভালুকের ঘাড়টাকেও একটা কাঠ দিয়া সোজা করিয়া দিল সে। ঘাড়টা একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ঘাড়টা সোজা করার পর দেখা গেল জিভটা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। নাকের ছিদ্র দিয়া ও চোখের কোণ হইতে রক্ত পড়িতেছে। মৃত চোখ দুইটা যেন বিস্মিত-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে আমাদের দিকে। দোহাও খানিকক্ষণ নির্নিমেষে সেদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল তাহাকে। অনেকক্ষণ প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিল, জোড়হস্তে অনেকক্ষণ বসিয়াই রহিল তাহার পর। আমরাও সকলে জোড়হস্তে নীরবে বসিয়া রহিলাম। একটু পরে সে যাহা বলিল তাহার অনুবাদ তোমাদের ভাষায় দিলাম। কিন্তু এ অনুবাদে দোহার স্বতঃস্ফূর্ত বাচনভঙ্গীর, তাহার শ্রদ্ধাপ্লুত মুখমণ্ডলের, তাহার ভক্তি-স্নিগ্ধ দৃষ্টির পরিচয় নাই।

দোহা বলিল, হে বীরবর তোমাকে আমি সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বধ করিয়াছি এ অহঙ্কার আমি করি না। আমি জানি, স্বেচ্ছায় তুমি আমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছ। আমাদের ক্ষুধাকে তৃপ্ত করিবার জন্য বার বার তুমি আত্মদান করিয়াছ। আমাদের অহঙ্কারকে স্ফীততর করিবার জন্য মহাবলী হইয়াও তুমি বার বার আমাদের মত দুর্বল হস্তে পরাজয় বরণ করিয়াছ। তোমার দেহকে আমরা পাতিত করিয়াছি কিন্তু তোমার অমর আত্মা বিরানির অরণ্যে এখনও স্বমহিমায় বিরাজ করিতেছে। তোমার সেই আত্মাকে আমরা প্রণাম করি। তাহার নিকট আমরা আশীর্বাদ ও অভয় ভিক্ষা করি। তোমার শৌর্য, বীর্য, মহিমা আমাদের যেন নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে। আমাদের ক্ষুধাকে শান্ত করিবার জন্য, আমাদের লোভকে তৃপ্ত করিবার জন্য, আমাদের জীবনধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য, হে বীরেন্দ্র, বার বার তুমি আমাদের নিকট আসিও, এই প্রার্থনা। আমরা বার বার তোমাকে পূজা করিয়া ধন্য হইব।...

এই ধরনের প্রার্থনা দোহা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিল। তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা পবিত্র আছে, যাহারা সম্প্রতি মৈথুন হইতে বিরত থাকিতে পারিয়াছ, তাহারা আসিয়া ইহার সৎকার কর। যাহারা অপবিত্র, অসংযমী, তাহারা এখন উহাকে স্পর্শ করিও না। করিলে আমাদের ঘোর অমঙ্গল হইবে।

দোহার কথা শুনিয়া দুই জন পুরুষ— রম্ভা ও জিকট্ আগাইয়া গেল। মেয়েদের মধ্যে গেল কিংকা ও রুলকি। আমি যাইতে পারিলাম না কারণ যদিও আমি কৃষি বিভাগের অধিকর্তা, এ ব্যাপারে আমারই অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি সংযমী ছিলাম না। কিছুক্ষণ পূর্বেই আমি কণ্টাকার আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কণ্টকা শয়তানী কিন্তু সে এত লোভনীয়া, তাহার

সান্নিধ্য এমন উন্মাদনাকর যে সে যখন তাহার ছলাকলা লইয়া, সর্বাঙ্গে হিল্লোল তুলিয়া, আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন আমার পক্ষে আত্মসংযম করা কঠিন হইয়া উঠে। দোহা যখন সকলকে আহ্বান করিতেছিল তখন অনাবৃত-স্তনী পীবরবক্ষা কণ্টকা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিতেছিল। কণ্টকা সত্যই মোহিনী, কিন্তু সে দুষ্টা, সে প্রগলভা।

রম্ভা, জিকটু, কিংকা ও রুলকি ছাড়া যখন কেহ গেল না, তখন দোহা বলিল, গাছের তলায় ইহার জন্য একটি ঘর নির্মাণ কর।

আমাদের বসতির মধ্যস্থলে সেই বিরাট গাছটি ছিল। সে গাছের আমরা নাম জানি না। চেনাশোনা কোনো গাছের সহিত তাহার সাদৃশ্য নাই। শুধু জানি তাহা অতি বৃহৎ, তাহা আকাশচুম্বী। তাহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, বিপুল পত্রসম্ভার। পাতাগুলি বেশ বড় বড়, অতিশয় চিক্কণ এবং ঘন সবুজ। পাতাগুলি যখন কিশলয়রূপে থাকে তখনও তাহা ঘন সবুজ। তখন মনে হয় অসংখ্য ঘন সবুজ গুটিকা যেন গাছের সর্বাঙ্গে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ক্রমশ তাহারা নিজেদের বিস্তার করিয়া ঘন সবুজ পাতায় পরিণত হয়। যখন পাতায় পরিণত হয় তখনও পাতাগুলি যেন উন্মুখ হইয়া থাকে। সমস্ত গাছটারই কেমন যেন একটা উন্মুখ ওতপাতা ভাব। আমরা সকলেই গাছটাকে ভয় করি, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে যখন সে গাছে ফুল ফুটিয়া ওঠে। মনে হয় সমস্ত গাছটায় যেন আগুন জ্বলিতেছে। অগ্নিশিখার মত এ রকম ফুল আমরা আর কোনো গাছে দেখি নাই। প্রায় এক পক্ষকাল ওই ফুলগুলি সমানে ফুটিয়া থাকে। সে সময় আমরা সকলে আতঙ্কিত হইয়া থাকি। ভয় হয় কখন কী অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো অনিষ্ট হয় নাই। বরং দেখা যায় ওই গাছে যখন ফুল ফোটে, তখন আমাদের বংশবৃদ্ধি হয়।

দোহার জন্ম ওই ফুল ফুটিবার সময় হইয়াছিল। ওই গাছের তলাতেই দোহার মা দোহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। প্রসব করিবার সময় চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, এই গাছই মানুষরূপে আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা ছেলে মেয়ে যাহাই হউক, এই গাছের আত্মাই তাহার মধ্যে আছে। আমি যেদিন বুঝিতে পারিলাম আমার স্বামী নপুংসক, সেদিন আমি এই মহাবৃক্ষকেই স্বামীরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম।

এসব অনেকদিন আগেকার গল্প। তখন আমার জন্মও হয় নাই। আমার বাবা তখন দলপতি ছিলেন। তাঁহার মুখেই এ গল্প শুনিয়াছি। দোহা বিরাটাকায় শিশু হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সে আরও বৃহত্ হইয়া উঠিল। শুধু আকারে নয়, চরিত্রেও। তাহার ধৈর্য, তাহার বীর্য, তাহার মহাশক্তি দেখিয়া সত্যই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল, সে ওই মহাবৃক্ষের সন্তান। কিন্তু পলিত-কেশ ঝাঝার ধারণা অনারূপ ছিল। সে বলিত, দোহার মা বিষকুম্ভা যখন যুবতী তখন এক অশ্বারোহী ডাকাত না কি তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অনেকদিন পরে বিষকুম্ভা হাঁটিতে হাঁটিতে ফিরিয়া আসে। আসিয়া বলিয়াছিল, আমি ঘোড়ার মাংস খাইয়াছি, ভেড়ার লোম ও তুলার আঁশ দিয়া তৈরি ঘরে বাস করিয়াছি। যাহারা আমাকে হরণ করিয়াছিল তাহারা ডাকাত, চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়ানোই তাহাদের পেশা। আমাকে যে লোকটা লইয়া গিয়াছিল, আমি তাহার দাসী হইয়া ছিলাম। হয়ত চিরকাল দাসী হইয়াই থাকিতে হইত কিন্তু সহসা তাহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হইল। আমাকে যে লোকটা লইয়া গিয়াছিল তাহার বক্ষে তাহার দাদা একটা বল্লম বিদ্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইল তাহার। জ্ঞাতিদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমি সেই সুযোগে এখানে পালাইয়া আসিয়াছি। আমাকে তোমরা কেহ ছুঁইও না, আমি একধারে এক পাশে থাকিয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিব। এই গাছের তলায় থাকিব,

ইহাই আমার আশ্রয়। এই গাছই এখন আমার স্বামী, আমার প্রভু। এই গাছের তলায় তিন বৎসর বাস করিবার পর দোহার জন্ম হয়। ঝাঝা বলিত, ছেলেটা তিন বৎসর পেটের মধ্যে ছিল বলিয়া অত বড় হইয়াছে। ঝাঝা আমার প্রপিতামহী ছিলেন। তিনি আরও অনেক গল্প বলিতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহু পূর্বে না কি জিগাসা নদীর তীরে বসবাস করিতেন। সে নদীতে যখন বান আসিত তখন নাকি কূল-কিনারা দেখা যাইত না। আমাদের ফসল, ঘর-বাড়ি ডুবিয়া যাইত, গরু-বাছুর ভাসিয়া যাইত, অনেক লোকের প্রাণহানীও হইত। তখন সকলে মিলিয়া বানের পূর্বে নদীর তীরে বিরাট বাঁধ দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন। বাঁধের মাটি কাটিবার সময় আমাদের পূর্বপুরুষ ডঙ্কার সহিত উঁহাদের বিবাদ বাধে। বিবাদের কারণ একটি গাছ। একটি বিরাট গাছকে উৎখাত করিয়া সকলে যখন নদীতে বাঁধ দিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন তখন ডঙ্কা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, ওই গাছ সামান্য গাছ নহে। উহা বৃক্ষরূপী দেবতা, আমি ওই দেবতার মহিমা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি, উহার নিকট প্রার্থনা করিলে মনের বেদনা দূর হয়। ওই গাছকে উৎখাত করিলে আমাদের অনিষ্ট হইবে। ডঙ্কার কথা কিন্তু কেহ গ্রাহ্য করিল না, গাছটি কাটিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া তাহার উপর মাটি দিয়া বাঁধ বাঁধিল তাহারা।

ডঙ্কা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়াছিলেন। আকাশের দিকে দুই বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আর এখানে থাকিব না। দেবতার মহারোষে এ দেশ ছারখার হইয়া যাইবে।

ডঙ্কা নিজের পরিবারবর্গ ও কয়েকটি গরু ভেড়া লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কিছু দূর আসিয়া কিন্তু একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিল। তিনি বনপথেই হাঁটিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন বনের খানিকটা অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাহার মাঝখানে একটি শিশু বৃক্ষ রহিয়াছে। ডঙ্কার মনে হইল শিশু বৃক্ষটি যেন তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কাছে গিয়া ডঙ্কা আশ্চর্য হইয়া গেল। যে বৃক্ষটি উহারা উৎখাত করিয়াছিল এই শিশু বৃক্ষটি তাহারই চারা। শুধু তাহা নহে পাশেই একটি কোদাল এবং ঝুড়িও রহিয়াছে। কী করিয়া ওই বনের মধ্যে ওই শিশু বৃক্ষটির পাশে কোদাল ও ঝুড়ি আসিল, তাহা লইয়া ডঙ্কা মাথা ঘামাইলেন না। তিনি দেবতার নিগূঢ় ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিলেন। অনেকখানি মাটির সহিত সেই গাছের চারাটি তুলিয়া তিনি ঝুড়িতে রাখিলেন এবং ঝুড়িটি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিলেন। অনেকদিন হাঁটিয়া অবশেষে তিনি বিরানি জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হন। বিরানির পাশ দিয়া যে নদী বহিতেছিল সেটির নাম জমানি। ডঙ্কা যখন প্রথম আসেন তখন বিরানি জঙ্গলের বা নদীটির কোনো নাম ছিল না। দুইটি নামকরণই ডঙ্কা করিয়াছিলেন। এ প্রদেশে তখন মানব বসতি ছিল না। জন্তু-জানোয়ারগণই রাজত্ব করিত এ অঞ্চলে। বহু বৎসর পূর্বে ডঙ্কা মহাসমারোহে এই গাছটি স্বহস্তে এই স্থানে পুঁতিয়া গিয়াছেন। তখন হইতেই ক্রমশ বর্ধিত হইয়া সেই গাছ এখন মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি বহুকাল পূর্বে এই গাছের তলায় পশুবলি হইত। বহু বন্যপশুর শোণিতে এই বৃক্ষের মূলদেশ সিঞ্চিত হইয়াছে। এই গাছ সত্যই এখন বিশাল। একশত জন হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলেও ইহার কাণ্ডের পরিধি সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত করিতে পারে না। ইহার চূড়া গগনচুম্বী। নানারকম পাখি ইহার ডালে বাসা বাঁধে। নীলকণ্ঠ, ফিঙে প্রভৃতি সাধারণ পাখিরা গাছের নিম্নাংশে নীড় নির্মাণ করে। একটু উঁচু দিকে থাকে হলদে পাখিরা। মাঝে মাঝে হরিয়ালের ঝাঁক আসিয়া বসে। আর আসে একজোড়া ধনেশ পাখি। প্রতি

বছর আসিয়া তাহারা এই গাছের মগডালে বসে। দুই একদিন থাকে, তাহার পর উড়িয়া যায়। তাহাদের আমরা অতিথির মত অভ্যর্থনা করি। তাহাদের উদ্দেশে ফল ফুল শস্যের অর্ঘ্য নিবেদন করি, নৃত্যগীত দিয়া তাহাদের সংবর্ধনা করি। তাহাদের কৃষ্ণাভ ছাইয়ের মত রং, বিশেষ করিয়া তাহাদের বিরাট অদ্ভুত ঠোঁট আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। মনে হয় তাহারা কোনো সুদূর দেশের দূত, সেখানকার বার্তা বহন করিয়া যেন গাছের কানে কানে বলিয়া যায়। সে বার্তা শুনিয়া গাছের পাতাগুলি আরো ঘন সবুজ আরো রহস্যময় হইয়া ওঠে। আর একটা আশ্চর্যের বিষয়, কাক, চিল বা শকুনি ওই গাছে কখনও বসে না। ও গাছে তাহারা বাসাও বাঁধে না। কিন্তু একজোড়া পেচক-দম্পতি এই গাছের কোনো কোটরে বাস করে। বেশ বড় পেঁচা। গায়ের রং কালো ও বাদামি মেশানো। মাথা দুইটিতে পালকের শিং আছে। তাহারা গভীর রাত্রে বাহির হইয়া ডাক দেয়, বু বুওও। মনে হয় কোনো প্রহরী যেন পাহারা দিতেছে। যেদিন তাহাদের ডাক শুনিতে পাই না, সেদিন আমাদের মনে ভয় হয়। মনে হয় বুঝি কোন্ বিপদ ঘটিবে। আরও দুই প্রকার পাখি জমানির তীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটির নাম মুন্ডক। সারস জাতীয় পাখি, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড় মুরগির মত। দেখিতে অতি সুন্দর। সর্বাঙ্গ সাদা, ডানার কাছে বাদামি, মাথা ও মুখটি কালো। ঠোঁটটি বেশ লম্বা। কেন জানি না এই পাখিটি দেখিলেই মনে একটি পবিত্র ভাবের উদয় হয়। সকলেই আমরা শ্রদ্ধা করি মুন্ডককে। মুন্ডক প্রতি বছর আমাদের গাছের পূর্বদিকের অংশটাতে বাসা বাঁধে। শাবকগুলি বড় হইলে কিন্তু বেশি দিন মা-বাবার কাছে থাকে না, উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। জানি না কোন্ দেশে যায় তাহারা। জানি না সে দেশেও এমন মহাবৃক্ষ আছে কিনা। দ্বিতীয় পাখিটি আরো বড়। এটিও দেখিতে চমৎকার। তীক্ষ্ণকণ্ঠে উক্ উক্ উক্ উক্ করিয়া ডাকে বলিয়া ইহার নাম উকনা বা হুকনা। আকার শকুনি অপেক্ষা বড়। পা দুইটি বেশ বলিষ্ঠ এবং পীতবর্ণের। বুকটা সাদা, পিঠে কালো বাদামি রং। ডানার কাছে কালো রঙের ফুল কাটা। জমানি নদীর যেখানটা নির্জন এবং বালুকাময় সেইখানেই ইহারা থাকে। মাঝে মাঝে আমাদের গাছে আসিয়া বসে। যেদিন বসে সেদিন আমাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। উকনা কিন্তু গাছে বাসা বাঁধে না। নদীর চরে ঝোপের মধ্যে ডিম পাড়ে। তাহার ডিম আমরা খাইয়া দেখিয়াছি, খুব সুস্বাদু।

এসব কথা এত বিস্তারিত বলিলাম, কারণ ইহাদের লইয়াই তখন আমাদের জীবন ছন্দিত হইত। ওই বিরাট গাছটাই ছিল আমাদের সমস্ত জীবনের কেন্দ্র এবং প্রেরণা। তাহাকে আমরা ভয় করিতাম, ভক্তিও করিতাম। আমাদের পূর্বপুরুষ ডঙ্কার তিনটি স্মৃতি আমাদের মধ্যে এখনও বর্তমান। একটি স্মৃতি বিরানি জঙ্গল যেখানে দোহা থাকে, যেখানে আমাদের গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। এই বিরানি অরণ্যের নামকরণ ডঙ্কা নিজের মায়ের নামে করিয়া গিয়াছে। ডঙ্কা যখন জিগাসা নদীর তীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছিল তখন পথে তাহার মা বিরানি এবং জ্যেষ্ঠা পত্নী জমানি মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি এবং করকাপাতের ভিতর পড়িয়া অনেক গরু-বাছুর এবং আত্মীয়-স্বজন মারা যায়। এই সময় বিরানি ও জমানিরও মৃত্যু হয়। কিন্তু ডঙ্কা তাহাদের অমর করিয়া গিয়াছে। বিরানি অরণ্য এবং জমানি নদীর মধ্যে তাহারা বাঁচিয়া আছে। আমরা চাষ-বাসের উপর নির্ভর করি। আমাদের নিকট নদী, অরণ্য এবং ভূমি এই তিনটিই অপরিহার্য জীবন-ভিত্তি। আর আমাদের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে ওই বিরাট বনস্পতি। ডঙ্কা ইহাকে মাথায় বহিয়া আনিয়া রোপণ করিয়াছিল বটে কিন্তু কোনো নামকরণ করিয়া যায় নাই। হয়ত ইহার কোনো নামকরণ করিতে পারে নাই। তাহার হয়ত মনে

হইয়াছিল এই অনন্ত সম্ভাবনাময় বহুরূপী বৃক্ষকে একটা কোনো নামের সীমাবদ্ধতায় বাঁধা যাইবে না। আমরা উহার নাম দিয়াছি 'টুকচুম্বা'। আমাদের ভাষায় ইহার অর্থ দেবতা।

এইখানে আমাদের আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। কারণ, তোমাদের যে গল্পটি বলিব বলিয়া ঠিক করিয়াছি সে গল্পটির মূল তাহার মধ্যে নিহিত আছে। জমানি নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে আমাদের বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। খেতের মাঝে মাঝে ছোট ছোট পল্লী। সে সব পল্লীর কোনোটা আমাদের কামারশালা, কোনোটাতে আমাদের কুম্ভকারেরা থাকে। শুধু কুম্ভ নয়, নানাবিধ সুদৃশ্য তৈজসপত্রাদি নির্মাণ করে তাহারা। সে সব আমরা নৌকায় করিয়া বিদেশের হাটে পাঠাই এবং সে সবের বদলে অনেক বিদেশি জিনিস লইয়া আসি। কিন্তু আমাদের নদীর পশ্চিম তীর খুব নিরাপদ নয়। যেখানে আমাদের শস্যক্ষেত্র শেষ হইয়াছে সেখানে শুরু হইয়াছে আমাদের সমাধিক্ষেত্র। জায়গাটা পাহাড়ে গোছের। চারিদিকে বড় বড় পাথরের স্তূপ। সে স্তূপ হইতে আরও পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা যায়। বর্ষাকালে সে পর্বতশ্রেণীর বর্ণ নীল, গ্রীষ্মকালে ধূসর। এই পর্বতশ্রেণীর ওপারে আছে মরুভূমি। ঝাঝার মুখে শুনিয়াছি ডঙ্কার প্রপিতামহেরা ওই পর্বতশ্রেণীর ওপারে মরুভূমিতে বাস করিতেন। তাঁহারাই নাকি বহুপূর্বে পাহাড় ডিঙাইয়া একদা সপরিবারে জিগাসা নদীর তৃণশ্যামল সৈকতে চলিয়া যান। জিগাসা নদী ওই পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। পর্বতমালা হইতে আর একটি নদী বাহির হইয়াছে, তাহার নাম কলকলা। জমানি নদী কলকলা নদীর শাখা। কিন্তু জমানি জিগাসা নদী হইতে অনেক দূরে। তাহা পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া পূর্ববাহিনী হইয়াছে এবং উপর্যুপরি কয়েকটা অরণ্য পার হইয়া বিরাট একটা জলাশয় সৃষ্টি করিয়াছে। সে জলাশয় বহুদূরে। তাহা আমরা দেখি নাই। মরুভূমি হইতে জিগাসা নদীর তীরে আমাদের যে পূর্বপুরুষ দুইজন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের একজনের নাম ছিল থানথিবা, আর একজনের নাম ছিল বানমুখ। ঝাঝা বলে, দুইজনের চরিত্র নাকি দুইরকম ছিল। থানথিবা ধীর স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। মরুভূমির অনিশ্চয়তা এবং রুক্ষতার মধ্যে বাস করিয়া থানথিবা সুখ পান নাই। তাঁহার মনে সুখশান্তির যে স্বপ্ন জাগিত, তাহাই পাইয়াছিলেন জিগাসা নদীর তীরে। তিনি একদা মরুবাসী বেদুইন ছিলেন, কিন্তু সেই ভয়াবহ অনিশ্চিত দস্যুর জীবন তাঁহার ভাল লাগিত না। জিগাসা নদীর তীরেই তিনি নতুন ধরনের গৃহস্থালী স্থাপন করিলেন। মরুভূমিতে আর ফিরিয়া গেলেন না। ওই অঞ্চলে যে সব নিতান্ত বর্বর অরণ্যবাসীরা আসিত তাহাদের মধ্য হইতে তিনি গোবংশীয়া মনমনকে, ছাগবংশীয়া বুলাকে এবং অশ্ববংশীয়া অংঘ্রোকে বিবাহ করিলেন। ইহাদের মধ্যে অংঘ্রোই নাকি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিল। সে যখন হাসিত তখন অংঘ্রো, অংঘ্রো শব্দ হইত। মনে হইত তাহার গলার ভিতর কোনো বাজনা বাজিতেছে। তাহার পা দুইটিও অদ্ভুত ধরনের ছিল, অনেকটা অশ্বক্ষুরের মত। সে ঘোড়ার মত স্ফূর্তিতেও পারিত। ঘোড়ার পিঠের উপর তাহার দক্ষতাও অসাধারণ ছিল। ঘোড়ার পিঠের উপর দাঁড়াইয়াও সে ঘোড়া হাঁকাইতে পারিত। ঘোড়ারাও অতি সহজে বশীভূত হইত তাহার। বস্তুত থানথিবা এবং বানমুখ যতগুলি ঘোড়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন অংঘ্রোই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিত। অংঘ্রো ডাক দিলেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিত তাহার কাছে।

বানমুখ অস্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্বদাই বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইতেন। গৃহস্থালীর শান্ত পরিবেশ তাঁহার ভালো লাগিত না। দুর্গম গিরিসঙ্কটের আহ্বান, মরুভূমির নিষ্করুণ স্পর্ধা তাঁহাকে বেশি আকর্ষণ করিত। দুর্দমনীয়কে দমন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে

সর্বদা কোনো না কোনো বিপজ্জনক অভিযানে টানিয়া লইয়া যাইত। একবার বিরাট একটা হস্তীযূথের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। আর একবার মরুভূমির একটা ক্ষুধার্ত সিংহের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখের খানিকটা ওই সিংহ খাবলাইয়া লইয়াছিল। বাম দিকের গালে মাংস ছিল না। শূন্য গহ্বর দিয়া মুখের দাঁতগুলি এবং জিভের খানিকটা দেখা যাইত। সে অতি বীভৎস চেহারা। কোনো ছেলে বা মেয়ে পারতপক্ষে তাঁহার নিকট যাইত না।

থানথিরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। বানমুখকেও তিনি বন্য স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু বানমুখ তাঁহার সে উপদেশ কর্ণপাত করিতেন না। শুধু তাহাই নয়, যে শান্তি তিনি পাইতেছিলেন না, যে শান্তি পাইবার যোগ্যতাই তাঁহার ছিল না, সে শান্তি থানথিরা পাইয়াছিলেন বলিয়া থানথিরার প্রতি তাঁহার কেমন যেন একটা আক্রোশ ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি বিনা কারণেই থানথিরার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। থানথিরা যদিও ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গায়ে শক্তি কম ছিল না। পিশাচ প্রকৃতির বলশালী বানমুখকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া বলিয়াছিলেন — তোমাকে এখনই আমি মারিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ভ্রাতৃহত্যায় আমার প্রবৃত্তি নাই। এখানে যখন তোমার ভাল লাগিতেছে না, যে সামাজিক জীবন আমরা এখানে যাপন করিতেছি তাহা যখন তোমার পছন্দ নয়, তখন তোমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন কী? তুমি যেখানে সুখে থাকিবে মনে কর, সেইখানে চলিয়া যাও। কাল প্রভাতে তোমার মুখ যেন আর না দেখি।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল সমস্ত ঘোড়াগুলি লইয়া বানমুখ অন্তর্ধান করিয়াছে। অংঘ্রোও নাই। সেও সম্ভবত তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

সেইদিন হইতে থানথিরা আর ঘোড়া পোষেন নাই। তাঁহার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল। ঘোড়া জানোয়ারটার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ যেন যুক্ত হইয়া আছে। তাঁহার বেদুইন জীবনে যখন তিনি মরুদস্যু ছিলেন তখন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াই তিনি লুটপাট করিয়া বেড়াইতেন। ওসবে তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে ঝঞ্ঝা আমাদের শস্যকে ছিন্নভিন্ন করে, আমাদের ঘরের চাল উড়াইয়া লইয়া যায়, শান্ত নদীকে উন্মাদ করিয়া তোলে সেই ঝঞ্ঝা যে বায়ুর রুদ্ররূপ সেই বায়ুটিরই আর এক রূপ ঘোড়া। বানমুখ এবং অংঘ্রোও অশ্ব-প্রেত, অশ্ব-প্রেতিনী। মানুষের রূপ ধরিয়া তাহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি অশ্ব বর্জন করিয়াছিলেন। অশ্ব যদিও খুব উপকারী জন্তু, অশ্বের মাংস যদিও খুব সুস্বাদু, তবু আতঙ্কবশত থানথিরা অশ্বের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। থানথিরা ডঙ্কার পূর্বপুরুষ। তাই ডঙ্কাও অশ্ব পোষেন নাই। তাই থানথিরার বংশধরেরা কেহ অশ্বপালন করে না। অশ্বের সম্বন্ধে তাহাদের একটা ঘৃণামিশ্রিত ভয় ছিল। দোহার মা বিষকুম্ভাকে একজন অশ্বারোহী ডাকাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহাতে অশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আতঙ্ক আরও বাড়িয়াছিল। বিষকুম্ভা যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল সে ঘোড়ার মাংস খাইয়াছে, যাহারা অশ্বপালন করে তাহাদের চলন্ত তাঁবুতে তাহাদের সহিত বাস করিয়াছে, তখন সে নিজেই নিজেকে অস্পৃশ্যা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল, তাই সে আমাদের সঙ্গে মেশে নাই। ওই বৃক্ষতলাতেই সে নিরামিষ খাইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। হয়ত সেই জন্যই দোহা মাছ-মাংস খায় না।

দোহার বয়স যখন দশ বৎসর তখন বিষকুন্ডা মারা যায়। তখনই দোহার চেহারা বলিষ্ঠ যুবকের মত। একাই সে মায়ের মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া কবর দিয়া আসিয়াছিল। আর কাহাকেও যাইতে দেয় নাই। বলিয়াছিল, আমার মা চিরকাল তোমাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া একা বাস করিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পর আমি একাই যেন তাঁহার শবদেহ বহন করিয়া তুঙ্গালি পর্বতে তাঁহাকে কোনো গুহার ভিতর সমাহিত করি। সে গুহা আমি নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছি। মায়ের নির্দেশ মত আমি সেখানে একাই গিয়া তাঁহার সমাধি রচনা করিব। তোমরা কেহ আমার সঙ্গে আসিও না। আসিলে মায়ের আত্মা হয়ত শান্তি পাইবে না।

তখন আমাদের দলপতি ছিলেন আমার বাবা। তাঁহার নাম ছিল মহোরি। আমাদের ভাষায় মহোরি মানে সিংহ। তিনি দোহাকে খুব ভালবাসিতেন। তাই দোহার অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। দোহা একাই গিয়া তাহার মাকে তুলাঙ্গি পর্বতের কোনো গুহায় কবরস্থ করিয়া আসিয়াছিল। দোহাকে বাবা খুব ভালবাসিতেন। দোহার মা বিষকুন্ডা ছিল বাবার ভগ্নী। একমাত্র ভগ্নী। দোহার সামর্থ্য ও চরিত্র দেখিয়া বাবা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঠিক করিয়াছিলেন দোহাকে আমাদের দলপতি করিয়া যাইবেন। কিন্তু দোহার জন্মের সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা ছিল বলিয়া বৃদ্ধা ঝাঝা তাঁহাকে এ কাজ করিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল, তোমার পুত্রদের মধ্যেই কাহাকেও দলপতি নির্বাচন কর। মহোরির বহু পুত্র কন্যা। আমার চল্লিশ জন ভাই ছিল। মহোরির যখন বার্ধক্য উপস্থিত হইল, একদিন যখন তিনি উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন, সেইদিনই স্থির করিলেন নতুন দলপতি এইবার নির্বাচন করিতে হইবে, আমি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। পরদিনই তিনি সমবয়স্ক কুড়ি জন পুত্রদের মধ্যে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ঘোষণা করিলেন যে সকলকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইবে, তাহাকেই তিনি দলপতি নির্বাচন করিবেন। দোহা অবশ্য এ প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল না। মহোরি তাহাকে বিরানি বনের একাধিপত্য দিয়া বলিলেন, তুমি বিরানি বনকে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেহ পারিবে না। তুমি ওই বনে সর্বেসর্বা হইয়া থাক। আমাদের জমি, ফসল ও সমাজের শাসনভার রহিল দলপতির উপর। প্রতিযোগিতার দ্বারাই সে দলপতি নির্বাচিত হইবে।

আমিই মল্লযুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া দলপতি নির্বাচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দলপতি হইয়াও আমি সর্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতাম। সর্বদাই মনে হইত আমার জীবন নিরাপদ নয়। বিশেষ করিয়া ভয় করিতাম আমার সৎভাই ভিংড়াকে। ভিংড়ার মা ছিলেন ক্রীতদাসী। কোনো এক দূরের হাট হইতে বাবা তাঁহাকে অনেক শস্যের বিনিময়ে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত একটা বন্য সৌন্দর্য ছিল। স্বভাবও ছিল বন্য। সাপের মাংস প্রিয় খাদ্য ছিল তাঁহার। সাপের মুণ্ডুটা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার চামড়া ছাড়াইয়া ফেলিতেন। তাহার পর সেটাকে পোড়াইয়া খাইতেন। তাহার ভাষাও আমরা বুঝিতাম না। বাবা কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মেয়েটি অনেকরকম তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্র জানিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভিংড়াকেও তিনি এসব শিখাইয়াছিলেন। ভিংড়া আমাদের সহিত মিশিতও না। তাহাকে মল্লযুদ্ধে হারাইয়া দিয়া আমি দলপতি হইয়াছিলাম ইহাতে সে খুশি হয় নাই। আমার কেমন যেন ভয় করিত। যদিও আমাকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সশস্ত্র দাস আমার চারিদিকে পাহারা দিত তবু আমার ভয় ঘুচিত না। পায়ে সামান্য একটা কাঁটা ফুটিলেও মনে হইত ভিংড়া হয়ত আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া পথের কাঁটাকে আমার পায়ের পাতায় দংশন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে। সেই কাঁটার কানে কানে হয়ত কোনো সাংঘাতিক মন্ত্রও বলিয়া দিয়াছে। ভিংড়া

আমার সহিত গায়ের জোরে পারিবে না, কিন্তু মায়ের পথ অনুসরণ করিয়া যে শক্তিতে সে শক্তিমান হইতে চাহিয়াছিল তাহা ভয়ঙ্কর। সে শক্তির নিকট আমার শক্তি তুচ্ছ। সকলে বলিত সে দৈবিশক্তিতে বলীয়ান। সে-ও প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইত ঝঞ্ঝা, বজ্র, সূর্য, চন্দ্র তাহার আজ্ঞা পালন করে, বর্ষার মেঘমালা তাহার নির্দেশেই সঞ্চরণ করে। আমাদের ফসলের প্রাণশক্তিও না কি তাহার নিয়ন্ত্রণে বাড়ে কমে। সমস্ত প্রকৃতিই না কি তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলে।

ভিংড়া যে জীবন যাপন করে তাহাও আমাদের মতো স্বাভাবিক গৃহস্থ জীবন নয়। আমরা আদিম অসভ্য যুগ পার হইয়া আসিয়াছি, আমরা কৃষি সভ্যতার পত্তন করিয়াছি, শুধু প্রস্তরের অস্ত্র-শস্ত্র নহে, ধাতুর অস্ত্র-শস্ত্রও আমরা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। পদব্রজে এবং নৌকা করিয়া আমরা আমাদের এলাকার বাহিরে যাতায়াত করি, শস্যভাণ্ডার লইয়া আমাদের কর্মীরা বিদেশের হাটে যায়, শস্যের বদলে লোহা, তামা, কাঠ ও আরও নানারকম পণ্য কিনিয়া আনে। আমরা এখন গুহায় থাকি না। মাটির ঘরে বাস করি, নলখাগড়া এবং লম্বা লম্বা ঘাস দিয়া আমাদের ঘরের চাল যে ভাবে প্রস্তুত হয় তাহাতে শিল্প নৈপুণ্য আছে। আমরা তাঁত বসাইয়াছি। আমাদের মেয়েরা চরকায় সূতা কাটে। আমাদের চম্পা নামে মেয়েটি চিরকুমারী, কোনো পুরুষের সংস্রবে আসে না। সে চমৎকার ছিট বানাইতে পারে। সে শিল্পী। নানা রঙের সুতা দিয়া কাপড়ের উপর ফুল-লতা-পাতার সুন্দর নক্সা আঁকে। তাহার জন্য বিদেশি হাট হইতে বিশেষ ধরনের সূঁচ দোহা আনাইয়া দেয়। শুধু ফুল-লতা-পাতা নয়, পাখির ডানার বর্ণ-বৈচিত্র্য, এমন কী সাপের গায়ের বর্ণলীলাও আকর্ষণ করে তাহাকে। দোহা তাহার জন্য চিমটা দিয়া সাপ ধরিয়া আনে মাঝে মাঝে এবং সাপটাকে দুইটা কাঠির কৌশলে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে যে সাপটা আর নড়িতে পারে না। চম্পা সাপের গায়ে বার বার হাত বুলাইয়া সেই হাত নিজের চোখের উপর বুলায়। এই আশ্চর্য উপায়ে সে সাপের গায়ের রঙ নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লয়। তাহার পর কাপড়ের উপর সেটা তুলিবার চেষ্টা করে। সাপটাকে সে মারে না। কয়েকবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

আমাদের এই পরিবেশে ভিংড়া বড় বেমানান। সে আমাদের পল্লীতে মাটির ঘরে থাকে না। থাকে পাহাড়ের পাথর ঘেরা একটা গুহায়। তাহার বেশবাসও অদ্ভুত। মাথার চুল, মুখের দাড়িতে সে নানারকম জন্তুর হাড়, নখ, নানাজাতের পাখির পালক, ঠোঁট ঝুলাইয়া রাখে। একটা শকুনির ঠোঁট তাহার মাথার জটার মাঝখানে উদ্যত উদগ্র হইয়া আছে। সকলের মনে একটা রহস্যময় বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া সে নিজেকে অসাধারণ করিয়া তুলিতে চায়। পর্বত গুহায় বসিয়া সে যাহা করে তাহাও ভীতিকর। প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড করিয়া সে সেখানে নানারকম জিনিস পোড়ায়। নানা রঙের নানা আকারের পাথর, বুনো লতা-পাতা, নানারকম জন্তু-জানোয়ার, দুই একটা লোহা বা তামার টুকরা, আরও কতরকম জিনিস সে ওই অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেয়। অগ্নিকুণ্ডের আগুন সে কখনও নিবিতে দেয় না। নিজেও যে সব জন্তু-জানোয়ার বা গাছপালা খায় ওই আগুনেই ঝলসাইয়া লয়। তাহার খাওয়া-দাওয়াও আমাদের মত নহে। আমরা সাধারণত রুটি, যবচূর্ণ, বার্লির মণ্ড, নানারকম ফল খাই। ভেড়া গরু ছাগও আমাদের খাদ্য। বন্যবরাহ বা ভালুকের মাংস পাইলে, কিংবা বন্যহরিণ শিকার করিতে পারিলে আমাদের মধ্যে একটা উৎসব পড়িয়া যায়। মাংস আমাদের প্রতিদিন জোটে না। মাছও খাই আমরা। মাছও রোজ পাওয়া শক্ত। ছিপ বা জালের তখনও চলন হয় নাই। মেয়েরা কাপড় দিয়া মাছ ধরে মাঝে মাঝে। কেহ কেহ বড় বড় মাছ সাঁতার দিয়াও ধরে। মাছ-পোড়া আমাদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু

ভিংড়া এসব খায় না। সে খায় বাদুড় চামচিকা কাছিম ঝিনুক ইঁদুর— এই সব। শুনিয়াছি মাঝে মাঝে শকুনি বা বাজের মাংসও খায়। তাহার আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জন্তু-জানোয়ার ঝলসাইবার সময় যে চর্বি নির্গত হয় সেগুলি সে ফেলে না, একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। কাঠ খড় এবং সুতা দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট মশালও সে তৈয়ারি করিয়াছে। কোনো কোনো মশালের সহিত সে বিশেষ বিশেষ লতা এবং পাতাও বাঁধিয়া দেয়। কোনো কোনো মশালে পাখির পালক এবং নাড়িভুঁড়িও বাঁধা থাকে। এই মশালগুলি জ্বালাইয়া সে মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে এবং আকাশের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া কী সব বলে। কী বলে বোঝা যায় না কিন্তু চিৎকারটা আদেশের মত শোনায়, মনে হয় অন্তরীক্ষবাসী কাহাকেও সে যেন ধমক দিয়া হুকুম জারি করিতেছে।

সকলে ভয় করে ভিংড়াকে। সকলে মনে করে ভিংড়া রুষ্ট হইলে যে কোনো লোকের অনিষ্ট করিতে পারে। আকাশের দেবতা-অপদেবতার সঙ্গে তাহার নাকি যোগাযোগ আছে। একদিন গোন্দা নাম্নী মেয়েটি মাঠে ফসল কাটিতে কাটিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। তাহার কাপড় খুলিয়া গেল। সে দুইটা প্রস্তরখণ্ড লইয়া নিজের স্তন দুইটিকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তাহার পর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে লাগিল। ফেনার সহিত রক্তও পড়িল অনেক, পড়িয়া গিয়া ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল। একটু পরে মারা গেল সে। সকলেই মনে করিল ভিংড়ার ক্রোধই এই মৃত্যুর কারণ। এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা গোন্দাকে ভিংড়া তাহার পর্বত-গুহায় যাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু সে যায় নাই। না যাইবার কারণ ভয়। ভিংড়া নাকি নারীদের নির্যাতন করিয়া আনন্দ পায়। উলঙ্গ করিয়া তাহাদের চাবুক মারে, তাহার পর তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে নৃত্য করিতে বাধ্য করে। যখন তাহারা নাচে তখনও সে নির্মমভাবে চাবুক চালায়। সে বলে উলঙ্গিনী যুবতী নারীদের আর্ত হাহাকারে তাহার দেবতা নাকি তুষ্ট হয়। তাহাদের আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিংড়াও আকাশের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিতে থাকে। ভিংড়ার এই অমানুষিক আচরণের জন্য সকলে তাহাকে ভয় করে। আমিও করি।

আমার মনে হয় আমাকে এবং দোহাকে সে তাহার দৈবশক্তির সাহায্যে মারিয়া ফেলিতে চায়। তাহার পর আমাদের সমস্ত দলটার উপর আধিপত্য করিতে চায় সে। এই জনাই দৈববলে সে নিজেকে বলীয়ান করিতেছে। তাহার শক্তি যে মিথ্যা প্রতারণা একথা বিশ্বাস করিবার সাহস আমাদের নাই। এ বিষয়ে একটা অন্ধ ভয় আমাদের সর্বদা ভীত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা তখন একটা রূপকথালোকে বাস করিতাম। রূপকথায় যেমন যে-কোনো অপ্রত্যাশিত আশ্চর্যজনক ঘটনা যে-কোনোও সময়ে ঘটিতে পারে আমরাও তেমনি যে-কোনো অত্যাশ্চর্য ঘটনার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইয়া থাকি। কোনো কিছুকেই আমরা অসম্ভব মনে করি না। আমাদের স্বপ্নের সহিত ভয়, আশার সহিত আশঙ্কা, জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া, সম্পদের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা সর্বদা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে। তাই আমরা কোনো কিছুকেই উপেক্ষা করিতে পারি না। পাথরের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করি, কর্কশ কণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে কর্করা পক্ষীর দল যখন অর্ধবৃত্তাকারে আকাশে উড়িয়া যায় তখন তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার জন্য আমরা সবাই ব্যাকুল হই, আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে অথবা আত্মরক্ষার জন্য যখন পশুকে হত্যা করিতে বাধ্য হই তখন সেই মৃত পশুর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সেদিন দোহা যে ভালুকটি মারিয়া আনিয়াছিল তাহার কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। সেটা আগে শেষ করি। সেদিন আমরা মহাসমারোহে ভালুকটিকে নব নির্মিত

কুটিরটিতে লইয়া গেলাম। সংযমী রম্ভা, জিকট, কিংকা ও রুলকি ভালুকটিকে বহন করিয়া লইয়া গেল। আমরা তাহাদের পিছু পিছু নৃত্যগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। গানের মর্ম, ওগো ভালুক, তুমি আর আমাদের পর নও, তুমি আমাদের আত্মীয়, তুমি আর বনের নও তুমি ঘরের। ঘরের ভিতর গিয়া ভালুকের ছাল ছাড়াইয়া তাহার মাংস রম্ভা ও জিকট কাটিয়া কাটিয়া বাহির করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসটি কিংকা ও রুলকি গাছের তলায় পুঁতিয়া দিল। তাহার মুণ্ডুটা কিন্তু অক্ষত রহিল। তাহার পর খড়ের একটা ভালুক বানাইয়া তাহার উপর মুণ্ডটি স্থাপন করিয়া কিংকা ও রুলকির সাহায্যে দোহা সেটিকে মাঠের মধ্যে আনিয়া কয়েকটা বাঁশের উপর টানাইয়া দিল। মুণ্ডের উপর সিঁদুর দেওয়া হইল, তাহার গলায় ফুলের মালা দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আবার আমাদের নৃত্যগীত শুরু হইল। গানের সেই একই মর্ম, ওগো ভালুক, ওগো ভালুক, তুমি আর আমাদের পর নও। তাহার পর কিংকা, রুলকি, রম্ভা, জিকট অগ্নিকুণ্ড বানাইয়া ভালুকের টুকরা করা মাংসগুলি সেকিতে লাগিল। মাংস সেকা হইয়া গেলে সেগুলি কলাপাতার উপর সাজাইয়া ভালুকের সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, ভালুক তুমি আমাদের অনুমতি দাও আমরা তোমার মাংস ভক্ষণ করি। মৃত ভালুক অনুমতি দিতে পারে না, অনুমতি কিন্তু আসে। হয়ত কাকেরা একসঙ্গে কাকা করিয়া উঠিল, হয়ত অপ্রত্যাশিতভাবে মেঘের গর্জন শোনা গেল, কিংবা হয়ত অকস্মাৎ শোঁ শোঁ করিয়া হাওয়া উঠিল, আমরা বুঝিলাম, ভালুকের আত্মা আমাদের অনুমতি দিয়েছে। সেদিন কিন্তু কিছুই হইল না। চারিদিক নীরব নিথর। গান গাহিয়া গাহিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, ক্ষুধার উদ্রেক হইল, মাংসের লোভনীয় গন্ধ আমাদের আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল, কিন্তু তবু কোথাও এমন কোনো নির্দেশ মিলিল না যাহাকে আমরা অনুমতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

একটু পরে দেখা গেল ভিংড়া আসিতেছে। ভিংড়া সাধারণত আমাদের মধ্যে আসে না, দূরে দূরে থাকে। তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনকে আমরা অনুমতি হিসাবে গণ্য করিব কি? সকলে আমরা দোহার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম দোহা চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। দোহা হাত না তুলিলে আমরা মাংস স্পর্শ করিতে পারিব না। কন্টকা লোলুপ দৃষ্টিতে মাংসখণ্ডগুলির দিকে চাহিয়াছিল। সে হঠাৎ চোখ তুলিয়া ভিংড়াকে দেখিতে পাইল এবং দোহাকে বলিল, আমাদের জাদুকরই হয়ত আজ অনুমতিরূপে আমাদের কাছে আসিয়াছে। ভিংড়া নিকটে আসিয়া দোহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি একটি বড় ভালুক মারিয়াছ শুনিলাম। ভালুকটি আমার বন্ধু ছিল। আমি প্রায়ই তাহাকে খাম-আলু, শাখ-আলু খাওয়াইতাম। কন্দ উহার প্রিয় খাদ্য ছিল। উহার জন্য কিছু কন্দ আনিয়াছি। সেগুলি উহার সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে বল, তোমার জন্য কন্দ আনিয়াছি, খাও। তাহার পিছনে পিছনে এক সহচরী কন্দের বোঝাটা বহিয়া আনিতেছিল। বোঝা খুলিয়া দোহা ভালুকের সম্মুখে সেগুলি সাজাইয়া দিল। আমরা সকলে মনে মনে ভালুককে অনুরোধ করিতে লাগিলাম, তোমার কন্দ আসিয়াছে, তুমি খাও। প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম কন্দ দেখিয়া ভালুকের আত্মা প্রসন্ন হইবে, আমাদের অনুমতিও শীঘ্র আসিয়া পড়িবে। কিন্তু কোনো নির্দেশ আসিল না।

কন্টকা ভিংড়ার দিকে চাহিয়া বলিল, কই অনুমতি তো আসিতেছে না। তোমার বন্ধুকে অনুমতি দিতে অনুরোধ কর। আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিব?

ভিংড়া কন্টকার দিকে লোলপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রাহিল খানিকক্ষণ। কন্টকার চোখে-মুখে একটা আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল। সে সরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল এবং মাটিতে দুই হাত রাখিয়া

মনে মনে ধরিত্রী মাতার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল। বিপদে পড়িলে আমাদের সমাজে সকলেই ইহা করে।

ভিংড়া বলিল, অনুমতি এখনই আসিবে। কিন্তু সে অনুমতি দিবে ভালুকের কোনো শত্রু। মেঘ, জল, আকাশ, অরণ্য ভালুকের বন্ধু। ইহারা অনুমতি দিবে না। দেখিতেছ না চারিদিক কেমন থমথম করিতেছে। আমিও কাহাকেও অনুমতি দিতে অনুরোধ করিব না।

এই সময়ে হঠাৎ একটা বড় বাদামি রঙের পাখি আসিয়া আমাদের সেই মহাবৃক্ষের ডালে বসিল। দেখিলাম তাহার নখরে একটা সবুজ সাপ কিলবিল করিতেছে। টুকচুম্বার ডালে বসিয়া সে সেই সাপটাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল। খাওয়া শেষ হইবামাত্র তীক্ষ্ণস্বরে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, কেক্, কেক্, কেক্ কী-ই-ই।

দোহা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিল। ভিংড়াও সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল একটা। তাহার সঙ্গে ধনুর্বাণ ছিল। কিন্তু তাহার বাণ পাখির গায়ে লাগিল না। পাখিটা লাফাইয়া ওপরে উঠিয়া গেল এবং ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল যেন— কেক্ কেক্ কেক্ কেক্ কী-ই-ই। ভিংড়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাহার দিকে। তাহার পর বলিল, লক্ষণ শুভ নয়। আমাদের বিপদ আসন্ন। ও পাখি এদেশের নয়, আমাদের রাজারা যেখানে থাকে সেই দেশের। বাজপাখি। সাপ ধরিয়া খায়। এ অঞ্চলে ক্বচিৎ আসে, যখন আসে তখন অমঙ্গল হয়। উহাকে মারিয়া উহার দেহটাকে যদি আমার অগ্নিকুণ্ডে ঝলসাইয়া লইতে পারিতাম, উহার চর্বি দিয়া যদি আকাশের দিকে মশাল জ্বালিয়া দিতে পারিতাম, উহার ঠোঁট ও নখর যদি আমার অঙ্গে ধারণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অমঙ্গলটা আমাদের এলাকায় আসিতে পারিত না। কিন্তু আমার বাণ লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। তাই মনে হইতেছে অমঙ্গলটা আসিবেই। এই কথাগুলি বলিয়া ভিংড়া আর একবার কন্টকার দিকে চাহিল। কন্টকা মাটিতে দুই হাত রাখিয়া এবং মাটির দিকেই দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া আমার পাশেই বসিয়াছিল। ভিংড়া আর কিছু বলিল না। চলিয়া গেল।

আমাদের সে সমাজে যদিও সতীত্ব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু বলাৎকার মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পুংশ্চলি কামুকী রমণীদেরও আমরা প্রশ্রয় দিতাম না। এরূপ ঘটনা ঘটিলে আমাদের সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সমবেত হইয়া দোষীদের বিচার করিতেন। ধর্ষণকারীদের তাঁহারা দূর করিয়া দিতেন সমাজ হইতে। আমাদের প্রহরীরা তাহাদের কলকলা নদী পার করিয়া আমাদের এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিত। সে লুকাইয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। তাহাকে আমাদের কবরস্থানে লইয়া গিয়া জীবন্ত কবর দেওয়া হইত। তবে এরূপ ঘটনা বেশি ঘটিত না। আমি একবার মাত্র দেখিয়াছি। যে রমণী তিনবারের বেশি ধর্ষিতা হইয়াছে তাহাকেও সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইত। তাই তিনবারের বেশি ধর্ষিতা হইলে কোনো রমণী সে কথা সমাজপতিদের কানে তুলিতেন না। স্বেচ্ছায় কেহ যদি একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিত তাহা তেমন দোষণীয় বলিয়া গণ্য হইত না। কেবল সে এবং তাহার সন্তানসন্ততি স্বামীর ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত— এই নিয়ম ছিল। সেকালে সমাজের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর এবং তাহার চারিপাশের চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। সে জমিতে সে নিজেই চাষ করিত. সে ঘরটি সে নিজেই মেরামত করিত, নিজের রুচি অনুসারে সাজাইত, গুছাইত। আমরা প্রত্যেকেই অনেকখানি জমির মালিক ছিলাম। সে জমিতে অনেক কুটির প্রস্তুত করিতাম কারণ অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। স্ত্রীরা ভালও হইত, মন্দও হইত। তোমাদের সমাজে এখন যেমন সতী-অসতী দুইই আছে, আমাদের সমাজে তেমনি ছিল।

সেদিন ভিংড়ার কথা শুনিয়া আমি একটু ভয় পাইয়া গেলাম। তাহার ভবিষ্যৎবাণী মাঝে মাঝে সত্যই ফলিয়া যায়। একবার মনে আছে নীল নির্মল আকাশের দিকে চাহিয়া সে বলিয়াছিল, তোমরা যে সব ফসল রোদে শুকাইতে দিয়াছ তাহা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেল, একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামিবে। আকাশে বৃষ্টির কোনো লক্ষ্মণ ছিল না। কিন্তু সত্যই কিছুক্ষণ পরে আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দেখা দিল, চতুর্দিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এত বৃষ্টি হইল যে আমাদের অনেকের ঘর ভাঙিয়া পড়িল। জমানি নদীতে জল বাড়িয়া গেল। ভিংড়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বিরানি জঙ্গলের উপর কয়েকটি শকুনিকে চক্রাকারে উপর্যুপরি কয়েকদিন উড়িতে দেখিয়া ভিংড়া একবার বলিয়াছিল এবার গো-মড়ক হইবে। সত্যই সেবার অনেক গরু মারা গিয়াছিল। আমাদের অবশ্য ক্ষতি তেমন হয় নাই। আমাদের দাস-দাসীরা গরুর চামড়া ছাড়াইয়া নৌকা করিয়া সেগুলি বিদেশের হাটে বেচিয়া আসিয়াছিল। গরুর হাড় দিয়াও অনেক রকম অস্ত্র-শস্ত্র বানাইয়াছিলাম আমরা। কিছু হাড় বিদেশে পাঠাইয়া তাহার পরিবর্তে গরুও কিনিয়াছিলাম। ভিংড়ার ভবিষ্যদ্বাণীকে তাই আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। একবার আমাদের দেশে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সমস্ত ফসল যখন বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি একদিন ভিংড়াকে গিয়া বলিলাম, তুমি তো শক্তিধর পুরুষ। মেঘ, বজ্র, সূর্য, আকাশ সবাই তোমার আদেশ মান্য করিয়া চলে একথা তুমি অনেকবার বলিয়াছ। অনাবৃষ্টিতে আমাদের ফসল শুকাইয়া যাইতেছে। নদীতে বান আসে নাই। তুমি ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পার? ভিংড়া বলিল, পারি। কিন্তু ইহার জন্য অন্তত চৌদ্দজন কুমারী মেয়ে দরকার। তাহারা প্রত্যেকেই সুকেশিনী হইবে। তাহাদের মধ্যে চারজন সাজিবে জলমুরগি, তিনজন বুড়িপাখি, তিনজন বাবাজি এবং চারজন জলপিপি। ইঁহাদের সকলকে চুল এলো করিয়া জমানি নদীতে ডুবিয়া স্নান করিতে হইবে। তাহার পর নদী তীরে বসিয়া ওই জলচর পাখিদের ডাকের নকল করিয়া ডাকিতে হইবে। ডাকটা যেন প্রার্থনার মত হয়। জলমুরগি, বুড়িপাখি, বাবাজি, জলপিপি সকলেই জলচর পাখি। জলের অভাবে তাহারা যেন বিধাতার কাছে আর্তকণ্ঠে অভিযোগ করিতেছে, জল দাও জল দাও, আমরা মারা গেলাম। পাখিদের প্রার্থনা দেবতা পূর্ণ করেন। উহাদের আলুলায়িত কুন্তল হইবে মেঘের প্রতীক। ভিজা চুলগুলি রোদে শুকাইয়া গেলে তাহারা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে নদীর জলে লাফাইয়া পড়িয়া আবার চুলগুলি ভিজাইয়া লইবে এবং মুখে জল পুরিয়া ফোয়ারার আকারে তাহা আকাশের দিকে ফুৎকার দিয়া ছুঁড়িয়া দিবে। কিছু জোঁক শামুক কচ্ছপ এবং মাছও প্রতিদিন চাই তাহাদের জীবন্ত অবস্থায় আগুনে সেকিতে হইবে। ওই সব জলচর প্রাণীদের নির্বাক যন্ত্রণা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সহিত আকাশে উঠিয়া মেঘদের মনে করুণা সঞ্চার করিবে।

আমরা সব ব্যবস্থাই করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সমাজের কুমারী মেয়েরা জলচর পাখির ভূমিকায় অভিনয় করিতে রাজি হইল না। ক্রীতদাসীরা সে অভিনয় করিয়াছিল। তাহারা কিন্তু সকলে কুমারী ছিল না। জোঁক শামুক এবং কচ্ছপ অনেক পোড়ানো হইয়াছিল, মাছ বেশি পাওয়া যায় নাই। ভিংড়া বলিল ব্যবস্থায় খুঁত আছে, বৃষ্টি হইবে না। হইলও না। আকাশে কালো মেঘ না আসিয়া একটা রক্তবর্ণ মেঘ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল। কিন্তু একফোঁটা বৃষ্টি হইল না। ভিংড়া বলিল, আমাদের সমাজের মেয়েরা ইহাতে যোগ দেয় নাই বলিয়াই এরূপ হইল। ক্রীতদাসীরা নানাদেশ হইতে আসিয়াছে, বৃষ্টি হইয়া থাকিলে তাহাদের দেশেই হইয়াছে। ভিংড়া পর্বতশৃঙ্গে চড়িয়া রক্তবর্ণ মেঘের উদ্দেশে চিৎকার করিয়া নানারূপ দুর্বোধ্য অভিশাপ উচ্চারণ

করিল, সারি সারি মশাল জ্বালিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। মেঘটা সরিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার বদলে কালো মেঘ আসিল না। একফোঁটা বৃষ্টি হইল না।

দোহা সেই সময়ে একটা নতুন ধরনের কাজ করিয়াছিল। সে বলিল, আমাদের জমানি নদী একটি শাখানদী। যে বৃহত্তর কলকলা নদী উত্তরবাহিনী হইয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিশিয়াছে, জমানি নদী তাহারই শাখা। কলকলা নদীও নাকি আর একটি প্রকাণ্ড বড় নদীর শাখা। সে নদীর নাম গাং-গাং। তাহার পার দেখা যায় না। তাহার দুই কূল বার বার ভাঙিয়া যায় বলিয়া তাহার তীরে কেহ বাস করিতে পারে না। এই গাং-গাং নাকি মরুভূমি বেষ্টন করিয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। গাং-গাং নদীর কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু সে নদী কখনও দেখি নাই। দোহা বলিল, আমরা সকলে মিলিয়া যদি চেষ্টা করি, একটা খাল কাটিয়া আমরা কলকলা নদীর কিছু জলকে আমাদের অঞ্চলে আনিতে পারি। আনিতে পারিলে আমাদের জলকষ্ট দূর হইবে। দোহা নিজেই সর্বপ্রথমে একটা কোদাল লইয়া অগ্রসর হইল। দেখা গেল চম্পাও তাহার অনুবর্তিনী হইয়াছে। তাহার কাঁধেও একটা কোদাল। চম্পা দোহাকে ভালবাসিত। মনে মনে তাহাকে পূজা করিত। দোহাও হয়ত ভালবাসিত তাহাকে। কিন্তু এ ভালবাসার কোনোও বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আরও অনেকে গেল তাহাদের সঙ্গে। খেতখামারে যে সব ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা ছিল, তাহারা গেল। আর গেল দোহার বিরানি জঙ্গলে যাহারা কাজ করিত তাহারা। তাহারাও অনেকেই ক্রীতদাস। দোহা বিরানি জঙ্গলে স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিত না। ক্রীতদাস-দাসীদের কথা আগেও দুই-একবার উল্লেখ করিয়াছি। তখন শস্যের বিনিময়ে অনেক দাস-দাসী আমরা কিনিতাম। তখন বিভিন্ন অঞ্চলের হাটে বা মেলায় গরু-বাছুরের মত ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীও ক্রীত বিক্রীত হইত। এইভাবে বহু বিভিন্ন দেশের স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময় তাহাদের ভাষা আমরা বুঝিতাম না। ইঙ্গিতের ভাষা দিয়া তাহাদের সহিত প্রথম প্রথম আলাপ চলিত। ক্রমশ আমাদের ভাষা তাহারা শিখিয়া ফেলিত। তাহাদের চেহারাও নানারককম ছিল. কেহ পীতবর্ণ, কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বা গৌরবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণও ছিল অনেকে। আমরা নিজেরাই ছিলাম কৃষ্ণকায়। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের মধ্যে রূপসী এবং রূপবানও থাকিত অনেকে। তাহাদের কিনিয়া আনিতাম বটে কিন্তু কিছুকাল পরে সকলের সহিতই অন্তরের যোগ স্থাপিত হইত। কিছু কিছু অবশ্য পলাইয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশই পলাইত না। কালক্রমে আমাদের সুখ-দুঃখের সহিতই তাহারা নিজেদের জড়াইয়া ফেলিত। সুন্দরী ক্রীতদাসীদের আমরা মাঝে মাঝে বিবাহও করিয়াছি। আমার কনিষ্ঠ পত্নী সুলমা কোন দেশের মেয়ে তাহা ঠিক জানি না। সে তন্বী, তাহার চোখের তারা মিশকালো, গোছা গোছা বাদামি রঙের কোঁকড়ানো চুলে তাহার মাথা ভর্তি। মুখখানি লম্বা গোছের। দাঁতগুলি দুগ্ধধবল এবং ছোট ছোট। গাল দুটি লাল, ঠোঁটও লাল। কিন্তু যাহা সবাপেক্ষা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা তাহার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি। সুলমা স্বল্পভাষিণী। আমাদের কথা হয়ত ভালো বোঝেও না। কিন্তু মনে হয় চোখের দৃষ্টি দিয়া সে সব বুঝিয়া লইতেছে। আমাদের ভাষা তাহাকে কিছু কিছু শিখাইয়াছি। তাহাকে একথাও বলিয়াছি, সে যদি নিজের দেশে ফিরিয়া যাইতে চায় আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। সে যদি স্বেচ্ছায় আমার কাছে না থাকে তাহাকে বন্দিনী করিয়া রাখিতে চাই না। সে কিন্তু যাইতে রাজি নয়। তাহার বাবা তাহাকে নাকি হাটে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। বাবার কাছে সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। মাঝে মাঝে সে আমার ছোরা লইয়া তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করে এবং আমার দিকে

চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসে। তাহার এই রহস্যময় আচরণে আমি মনে মনে একটু ভয় পাইয়া যাই। কন্টকা সে ভয়টা আরও বাড়াইয়া দেয়। সে বলে, সুলমা একদিন আমাকে হত্যা করিয়া সরিয়া পড়িবে। সুলমাকে খোলাখুলি আমি একদিন এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল (কিছুটা আমাদের ভাষায় এবং কিছুটা আকার-ইঙ্গিতের সহায়তায়) সে এদেশের কাহাকেও কখনও হত্যা করিবে না। যদি সে নিজের দেশে সসম্মানে ফিরিবার কোনো সুযোগ পায়, সে হত্যা করিবে তাহার বাবাকে এবং তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীকে, যাহারা শস্যের হাটে নিলামে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল। বলিতে বলিতে তাহার চোখের দৃষ্টিও ছুরিকার মত চকচক করিয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে আমি আর তাহার সহিত আলাপ করি নাই। কন্টকা আমাকে প্রায়ই সাবধান করিত, আমি যেন উহার সহিত বেশি না মিশি। কিন্তু তাহার এ সাবধান বাণী সত্ত্বেও আমি মিশিতাম, আত্মসংবরণ করিতে পারিতাম না। তাহার রূপই যে শুধু আমাকে আকর্ষণ করিত তাহা নয়, যৌন আকর্ষণই যে সুলমার একমাত্র আকর্ষণ ছিল এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাহার মধ্যে যে রহস্যময়ী ছিল তাহাকে আমি উপেক্ষা করিতে পারিতাম না। মনে হইত সে যেন আমাকে ভালও বাসে এবং সে ভালবাসা ঠিক যৌন ভালবাসা নয়। সে যুগে যৌন লালসা তৃপ্ত করিবার উপকরণ আমাদের সমাজে প্রচুর ছিল। তাহার জন্য কাঙালের মত কাহারও পিছনে পিছনে ঘুরিবার প্রয়োজন হইত না। যদি কাহারও মধ্যে এমন কোনো গুণ দেখিতাম যাহা পশুত্ব ছাড়া আরও কিছু, তাহাই আমাকে আকৃষ্ট করিত। যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না, যাহা আকুল করে কিন্তু কেন আকুল করে বোঝা যায় না— তাহাই সুলমার মধ্যে ছিল। তাহার জন্যই তাহাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। আমার শতাধিক পত্নী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কন্টকা এবং সুলমাই আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে। বাকি সকলের আমি খবরও রাখি না। তাহারা আমার অনুগত দাসীমাত্র। কাহারও পুত্র কন্যা হইয়াছে, কাহারও হয় নাই। সকলেই আমার জমিতে কাজ করে। কন্টকাকেও আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। সে উগ্র, কিন্তু তাহার উগ্রতাতেও একপ্রকার মাদকতা আছে। সে যেন সর্পিণী, কিংবা বাঘিনী, কিন্তু ভয়ঙ্করী নহে, মোহিনী। তাহার প্রেমের তীব্রতা এবং প্রচণ্ডতা আমাকে যেমন অভিভূত করে তেমনি করে সুলমার সংযত, শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যময় আমন্ত্রণ। কন্টকা একদিন ব্যাঘ্রিনীর মত সুলমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কন্টকা শক্তিশালিনী গাঢ়-যৌবনা, বন্যপ্রখর্যে প্রখরা সে। আশঙ্কা হইয়াছিল সে হয়ত সুলমাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া গেলাম, তন্বী সুলমার শক্তিও কম নয়। দেখিলাম একটু পরেই সুলমা কন্টকাকে চিত করিয়া তাহার বুকের উপরে বসিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছে। আমিই উঠিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া আসি। সেইদিনই উভয়ে ওই মহাবৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া আমার নিকট শপথ করে যে, ভবিষ্যতে কেহ কাহারও অঙ্গস্পর্শ করিবে না।

কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। দোহা কলকলা নদী হইতে যে খাল কাটিয়া আনিয়াছিল তাহা দুঃসাধ্য কার্য তো বটেই, তাহাতে দোহার বাস্তববুদ্ধির পরিচয়ও আমরা পাইয়াছিলাম। সে যুগে এরূপ একটা দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা কেহই ভাবিতে পারিত না। কাজটি কিন্তু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই। ভিংড়া ইহাতে মত দেয় নাই। বলিয়াছিল, কলকলা নদীকে জোর করিয়া একটা খালের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিলে ফল ভালো হইবে না। নদীর অভিশাপই আমাদের ওপর পড়িবে। ভিংড়া পর্বতের শিখরে চড়িয়া কর্কশকণ্ঠে অবিরাম চিৎকার করিত। কী যে বলিত তাহাও অনেক সময় বোঝা যাইত না। হঠাৎ

একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। নদীর খাল যখন খানিকটা কাটা হইয়াছে, দোহা যখন নদীর মধ্যে নামিয়া খালটাকে গভীরতর করিতেছিল এমন সময় একটা বিরাট কুমির তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার পায়ে কামড়াইয়া কুমিরটা তাহাকে জলের তলায় টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। অন্য কেহ হইলে সেই বিরাট কুমিরের কবলমুক্ত হইতে পারিত না। কিন্তু দোহাও বিরাট শক্তিশালী পুরুষ। সে সেই কুমিরকেই ডাঙায় টানিয়া তুলিল, তাহার পর কোদাল দিয়া কোপাইয়া তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলল। দোহার পায়ে কয়েকটা ক্ষত হইয়াছিল, রক্তও পড়িতেছিল খুব। দোহা নিজের চিকিৎসা নিজেই করিয়াছিল। সে নানারকম গাছ-গাছড়া, পাতা-শিকড় বাটিয়া একটা মলম প্রস্তুত করিল, মলমের সহিত ওই কুমিরটার পিত্তি এবং চর্বি মিশাইল এবং চম্বার স্বহস্তে প্রস্তুত একটি ছিটের উপর তাহা মাখাইয়া ক্ষতগুলির উপর বাঁধিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাজও করিতে লাগিল। প্রায় সহস্র নর-নারী কাজে লগিয়াছিল। কাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলকলার জল কল কল বেগে সেই খালের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিল। মধ্যে একটা ঢালু উপত্যকার মত ছিল, সেখানে খাল কাটিতে হইল না। কলকলা সে উপত্যকা প্লাবিত করিয়া বিরাট একটা জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। উপত্যকাটির আকার অনেকটা প্রকাণ্ড গামলার মত। যে দিক দিয়া কলকলা প্রবেশ করিয়াছিল সে দিকটাই কেবল নিচু ছিল। অন্য তিন দিক উঁচু। সেই উঁচু অংশটা অতিক্রম না করিলে আমাদের অঞ্চলে জমানি নদীতে কলকলাকে আনা যাইবে না। এই ভাবিয়া দোহা পাহাড়ের মত একটা উঁচু টিলাকে কাটিয়া খুব বড় একটা খাল বানাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। টিলাটার ওপর অনেক বড় বড় গাছ ছিল। প্রত্যেক গাছের গায়ে সিঁদুর লেপিয়া দোহা প্রথমে প্রত্যেক গাছকে পূজা করিল। মেয়েরা প্রত্যেক গাছকে ঘিরিয়া নৃত্যসহকারে যে গীত গাহিল তাহার মর্ম . ওগো গাছ তোমরা আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চল। তোমাদের সাহায্য আমরা চাই। আমাদের বিরানি জঙ্গলে তোমাদের নবজন্ম লাভ হোক, তোমবা আমাদের সহায় হও, আমাদের উপর বিরূপ হইও না। একটা বিরাট গাছ যখন ভাঙিয়া পড়িল তখন দেখা গেল গাছটা একক নয়, জোড়া গাছ। দুইটি ভিন্ন জাতীয় গাছ পরস্পর জড়াইয়া মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। একটি গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া ছিল। ছোট ছোট ফুল, কিন্তু অপরূপ। চম্বা বলিল, আমি ওই গাছে চড়িব, ওই ফুলগুলিকে ভালো করিয়া দেখিব। তাহাদের উপর হাত বুলাইয়া সেই হাত আমার চোখের উপর বাব বার বুলাইব। খানিকক্ষণ এইরূপ করিলে ওই ফুলগুলির ছবি আমার মনে আঁকা হইয়া যাইবে। নতুন ধরনের একটা ছিট প্রস্তুত করিব অমি। চম্বা তর-তব করিয়া গাছটার ওপর উঠিযা গেল এবং ফুলগুলির উপর চোখ রাখিয়া বার বার তাহাদের যেন চুম্বন করিতে লাগিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নতুন কোনো প্রকাশ দেখিলে চম্বা যেন আত্মহারা হইয়া যাইত। এজন্য অনেকে তাহাকে পাগলি বলিত, অনেকে সন্দেহ করিত সে ডাইনি। কিন্তু কেহ তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না, সকলেই ভয় করিত তাহাকে। ভিংড়া একদা তাহাকে নিজের সহচরী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। চম্বা উত্তর দিয়াছিল, তুমি যে দেবতার উপাসনা কর সে দেবতা ভীষণ। আমার দেবতা সুন্দর। তোমার সহচরী হইতে পারিব না। ভিংড়া এ কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া ছিল, তাহার পর উত্তর দিল, ভীষণের মধ্যেও সুন্দর আছে একথা জান না? চম্বা কোনো উত্তর দেয় নাই। ভিংড়ার চোখের একটা তির্যক দৃষ্টি চম্বাব মুখের ওপর অনেকক্ষণ নিবদ্ধ হইয়াছিল। চম্বা কিন্তু তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই। তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। ভিংড়া চম্বাকে আর কিছু বলে নাই।

সেদিন চম্বা যখন গাছের উপর উঠিয়া ফুলের রাশির মধ্যে তন্ময় হইয়াছিল তখন কিন্তু একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। চম্বা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল। যে গাছে ফুল ফুটিয়াছিল তাহার সহিত অন্য যে গাছটি জড়িত ছিল তাহারা পাতাগুলি ছোট ছোট এবং ঘন সবুজ রঙের। প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার ডালপালাগুলির বিন্যাসও জটিল। তাহার ডালপালার মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ আত্মগোপন করিয়া ছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। চম্বাও পারে নাই। সাপটা হঠাৎ যখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল তখন সে চেঁচাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছুটিয়া গেল। দোহার হাতে একটা বড় ছোরা ছিল। সেই ছোরা দিয়া সে ময়াল সাপটাকে কাটিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে পাকে সাপটা চম্বাকে জড়াইয়াছিল সেই পাকটা শিথিল হইল না। পাছে চম্বার গায়ে আঘাত লাগে এই ভয়ে সে পাকটার উপর ছুরি চালাইতে সাহস করে নাই। কিন্তু চম্বার আর্তস্বরে বিচলিত হইয়া দোহা শেষে সেই পাকটার ওপরেই ছোরা চালাইতে লাগিল এবং সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া নিচে ফেলিয়া দিল। দেখা গেল চম্বার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। তাহার গায়ে স্তনের নিচে ছোরার আঁচড়ও লাগিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে। দোহা চম্বাকে ছোট শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইল এবং ঘাস-পাতার একটি মোটা বিছানা করাইয়া তাহার উপর তাকে শোওয়াইয়া দিল। তাহার পর গাছ-গাছড়া পিষিয়া মলম প্রস্তুত করিল ওই ময়াল সাপের চর্বি দিয়া। সে মলম সে স্বহস্তে তাহার ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিল। তাহার পর চম্বারই প্রস্তুত (একটি গোক্ষুর সর্পের অনুকরণে প্রস্তুত) ছিট দিয়া সেটি বাঁধিয়া দিল। তাহার পর দোহা বলিল, ওই সাপটারই চামড়া খানিকটা ছাড়াইয়া আনিয়া এটির উপর বাঁধিয়া দিতেছি। আমার বিশ্বাস তাহা হইলে তুমি তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিবে। সাপের টুকরাগুলি কুড়াইয়া দোহা সেগুলিকে সমাধিস্থ করিল এবং সমাধির পাশে অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিল।

প্রায় মাসখানেক শয্যাগত ছিল চম্বা। দোহাই তাহার সেবা করিত। অনেকের ধারণা হইল, ভিংড়ার চক্রান্তেই এই সব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। দোহা এ সম্বন্ধে কিছু বলিত না। সে রোজ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিত।

কলকলা নদীর জল যখন আমাদের জমানিতে প্রবেশ করিয়া আমাদের শস্যক্ষেত্রগুলির উপর প্রবাহিত হইল তখন আমাদের কিছু ফসল বাঁচিল বটে, কিন্তু অনেক ফসল ডুবিয়াও গেল। আমাদের অনেকের ঘর-বাড়িও জলমগ্ন হইল। বস্তুত কলকলা নদীর প্রবল বন্যায় আমরা হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। তখন আমাদের মনে হইতে লাগিল, ভিংড়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল কলকলার অভিশাপে আমাদের অনিষ্ট হইবে। হঠাৎ এই সময় প্রচুর বৃষ্টিপাতও হইয়া গেল। ভিংড়া বৃষ্টিপাতের জন্য কিছুদিন আগে যে সব প্রক্রিয়া করিয়াছিল, আমাদের মনে হইল, তাহাই হয়ত এতদিন পরে সফল হইল। এ কথাও মনে হইল যে কলকলাকে এ অঞ্চলে এমন জবরদস্তি করিয়া না আনিলেই বোধহয় ভালো হইত। মেঘ তো আসিলই, আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। বৃষ্টিতেই আমাদের ফসল রক্ষা পাইত। দোহা কিন্তু অক্লান্তকর্মী লোক। সে দমিল না। উপত্যকার যে মুখটা কাটিয়া সে কলকলাকে আমাদের জমির উপর বহাইয়াছিল সে মুখটা সে আবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। ইহার জন্য আরও কিছু মাটি কাটিতে হইল। কাছের একটা পাহাড় হইতে কিছু পাথরও আনাইল সে। খালের মুখটা বন্ধ হইয়া গেল। উপত্যকাটা প্রকাণ্ড একটা জলাশয়ে পরিণত হইল। দেখা গেল জলাশয়ে মাছও আছে। আমাদের মেয়েরা গিয়া সেখানে মাছ ধরিত। ইহার পর হইতেই কিন্তু ভিংড়ার প্রভাব আমাদের মধ্যে খুব প্রবল হইল। ভিংড়া যে একজন অসাধারণ শক্তিধর একথা আমাদের মধ্যে

অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিল। আমার মনেও ক্রমশ এই ধারণাটা বদ্ধমূল হইল যে ভিংড়া অসাধারণ লোক, যে কোনো উপায়েই হোক সে এমন একটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, যে শক্তি প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, যে শক্তির ইঙ্গিতে হিংস্র কুম্ভীর কলকলার জলে দোহাকে আক্রমণ করে, যে শক্তির প্ররোচনায় ময়াল সাপ আসিয়া চম্বাকে নিষ্পেষিত করিতে চায়, যে শক্তির আদেশে আকাশে মেঘ না আসিয়া আমাদের প্লাবিত করে। এ শক্তিকে উপেক্ষা করা শক্ত। এ শক্তিকে দমন করিব এমন শক্তি আমার নাই। লোকে বিপদে পড়িলে আমার কাছে আসিত না, ভিংড়ার কাছে যাইত। একদিন নাম্‌নাকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। নাম্‌না বন্ধ্যা ছিল। বহু পুরুষের সংস্রবে আসিয়াও তাহার সন্তান হয় নাই। আমাদের সমাজেও বন্ধ্যা নারীকে সকলেই কৃপার চক্ষে দেখিত। অনেকে তাহাদের ডাইনি মনে করিত। অনেক বন্ধ্যা নারী আত্মহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। কেহ বিষ খাইত, কেহ পাহাড়ের ওপর হইতে লাফাইয়া পড়িত, কেহ জমানির জলে ডুবিয়া মরিত। সকলে ভাবিয়াছিল, নাম্‌নার এইরূপই কিছু একটা পরিণতি ঘটিবে। হঠাৎ দেখিলাম নাম্‌নার গায়ে মুখে পিঠে সর্বাঙ্গে কালো কালো দাগ। কে যেন তাহাকে চাবুক মারিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি, তোমাকে এমন করিয়া মারিয়াছে কে? নাম্‌না উত্তর দিল, ভিংড়া। আমি সন্তান কামনায় অনেকের নিকট গিয়াছি, কিন্তু কেহই আমাকে সন্তান দিতে পারে নাই। ভিংড়া বলিল, তোমার শরীরে একটা পিশাচী বাস করে। সে-ই তোমার সন্তানকে খাইয়া ফেলে। তাহাকে চাবকাইয়া না তাড়াইলে সে যাইবে না। তুমি যদি মার খাইতে প্রস্তুত থাক, আমার নিকট আসিও। আমি কাল ভিংড়ার নিকট গিয়াছিলাম। অমি অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম, ভিংড়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে আরও অবাক হইতে হইল। সকলে দেখিল নাম্‌নার গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়াছে। দশমাস পরে নাম্‌না সত্যই একটি সুস্থ পুত্র প্রসব করিল। ভিংড়ার শক্তি সম্বন্ধে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। এই দৈবীশক্তির নিকট নতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, এই কথাই সকলের মনে হইতে লাগিল। আমি একদিন দোহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম, আমার আর দলপতি থাকিবার ইচ্ছা নাই। যদিও একদা আমি পিতার আদেশে ভিংড়াকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলাম, যদিও পিতাই আমাকে দলপতি নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তবু এখন আমার মনে হইতেছে ভিংড়াই আমার অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। দৈবীশক্তি তাহার সহায়। এ অবস্থায় আমাদের সমাজের দলপতিত্ব ভিংড়াকে দেওয়াই উচিত। দোহাকে বলিলাম, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, চল আমরা দুইজনে একদিন তাহার কাছে যাই এবং তাহাকেই দলপতি পদে বরণ করি।

দোহা তখন দুগ্ধ দোহন করিতেছিল। চারিদিকে গাভীর পাল, একপাশে কয়েকটি জালা। দোহা একটি কলসিতে দুধ দুহিতেছিল। যাহারা দুগ্ধ বহন করে তাহারা দূরে দাঁড়াইয়াছিল। দোহা আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। দুধের কলসিটা যখন ভরিয়া গেল তখন সেটা একটা বড় জালায় ঢালিয়া দিয়া সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, আজ 'ফানডি'তে যাইব। সেখানকার জন্তুগুলিকে দুধ খাওয়াইব। 'ফানডি'তে কয়েকটি হায়না ধরা পড়িয়াছে। চল, সেখানেই সব কথাবার্তা হইবে।

ফানডি দোহার একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। এখানে সে অবসর বিনোদন করে। ফাঁদে যে সব জন্তু-জানোয়ার ধরা পড়ে, জীবন্ত থাকিলে দোহা তাহাদের এই 'ফানডি'তে রাখিয়া দেয়। একটা দীর্ণ জায়গাকে বড় বড় গাছ ও লম্বা লম্বা খুঁটি দিয়া সে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ভিতরও

খুঁটি-দিয়া ঘেরা ছোট বড় অনেক কক্ষ আছে। কক্ষগুলির মধ্যেও ছোট ছোট গাছপালা এবং প্রচুর ঘাস। এই সব কক্ষের মধ্যে দোহা নানারকম জন্তুদের কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখে। তাহার পর নানাভাবে তাহাদের পর্ববেক্ষণ করে। এ বিষয়ে তাহার কৌতূহল অসীম। সে তাহাদের জন্য নানা রকম খাবার সংগ্রহ করে, তাহাদের সহিত কথা বলে। তাহার পর যখন তাহার কৌতূহল মিটিয়া যায় তখন তাহাদের ছাড়িয়া দেয়। অনেকগুলি কুকুর পুষিয়াছেন। খরগোশও অনেকগুলি। সম্প্রতি সে আবিষ্কার করিয়াছে যে, সমস্ত জানোয়ারই দুধ খায়। যাহারা স্তন্যপায়ী জীব নয়, যেমন সাপ, পাখি, তাহাদেরও দুধে অরুচি নাই। অবশ্য সব পাখিদের কথা সে জানে না।

দোহা একটি জালা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার দুই বিশ্বস্ত সহচর নাগা ও বাঘার মাথাতেও একটি করিয়া জালা চড়িল। তাহাদের পিছনে ছোট বড় জালা বহিয়া অনেক অনুচর চলিতে লাগিল। বিরানি অরণ্যে দোহা কোনো স্ত্রীলোক দাসী নিযুক্ত করে না। তাহার অনুচরেরা সবাই পুরুষ। দোহা নীরবেই পথ চলিতে লাগিল। আমিও তাহার পাশে পাশে যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ দোহা বলিল, তোমার বাবা তোমাকে দলপতি করিয়া গিয়াছেন। সে পদ ত্যাগ করিবার তোমার অধিকার নাই। ভিংড়ার দৈবীশক্তি যে কী ধরনের শক্তি তাহা আমার ধারণাতীত। সে যখন মেঘকে আহ্বান করে মেঘ তখন আসে না, আসে ছয় মাস পরে। আহ্বান না করিলেও হয়ত সে মেঘ আসিত। একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া নানারকম জন্তু-জানোয়ার পোড়াইয়া এবং কয়েকটা মেয়েকে নির্যাতন করিয়া সে যে কী শক্তি কেমন করিয়া অর্জন করে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মার খাইয়া বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী কেমন করিয়া হয় তাহা জানি না। শুধু জানি অনেক মেয়ের কিছুদিন ছেলে হয় না, তাহার পরে আপনিই হয়। ভিংড়া চমকপ্রদ একটা কিছু করিয়া তোমাদের ঘাবড়াইয়া দিতে চায়, তোমরা অতি সহজে তাহার ভাঁওতায় ভোল। একটা কথা নিশ্চয় জানিও সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতি কিন্তু তাহার ভাঁওতায় ভোলেন না। তাহার চিৎকারে সাড়া দেন না, তাহার উৎকট চেহারা দেখিয়া ভয় পান না। প্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। তাঁহার কাছে আমরা প্রার্থনা করিতে পারি, নতজানু হইতে পারি, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে পারি, নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারি, ইহাতে আমাদের তৃপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃতি প্রসন্ন হইবেন কি না তাহা জানি না। আমরা কেবল আশা করিতে পারি তিনি দয়া করিবেন। এ আশা করিয়া সুখ আছে, মাঝে মাঝে সান্ত্বনাও পাওয়া যায়। কিন্তু ভিংড়া যাহা করে তাহা বীভৎস, তাহা নিষ্ঠুর, তাহাতে শক্তি বা সৌন্দর্যের পরিচয় নাই। ভিংড়া গায়ে নানারকম রং মাখে, আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া মাথা নাড়ে, বহুরূপী গিরগিটিও রং বদলায়, সে-ও আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া মাথা নাড়ে। তাহা দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হয়, কেহ ভয় পায়। শুনিয়াছি পাহাড়ের ওপারে একটা সম্প্রদায় আছে, তাহারা না কি গিরগিটিকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। আর একটা সম্প্রদায় আছে, তাহারা আবার বহুরূপী গিরগিটিকে শয়তান বলিয়া মনে করে। দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলে। ভিংড়াও অনেকটা বহুরূপী গিরগিটির মত। তাহার ভড়ং দেখিয়া তুমি ভয় পাইও না। উহাকে লইয়া মাথা ঘামাইও না। তোমার বাবা তোমাকে যে ভার দিয়া গিয়াছেন সুপুত্রের মত তাহা বহন কর। ভিংড়া যদি সমাজের কোনো অনিষ্ট করে তখন তাহাকে লইয়া মাথা ঘামাইও, এখন কিছু করিবার দরকার নাই।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া দোহা নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল এবং বাকি পথটাও নীরবেই অতিক্রম করিল। আমিও ভাবিয়া দেখিলাম, দোহা যাহা বলিতেছে তাহাই সমীচীন।

'ফানডি'র কাছাকাছি আসিবামাত্র ব্যাঘ্রের চীৎকার ও হায়েনাদের হা-হা-রব শুনিতে পাইলাম। দোহার একজন অনুচর বলিল, বাঘটা দুধ খায় নাই। ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে, আর বার বার লাফাইয়া বেড়াটা পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। হায়নাগুলা পরস্পর মারামারি করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সব ক'টাই পুরুষ হায়না। উহাদের বোধ হয় রাখা যাইবে না। উহারাও দুধ খায় নাই।

দ্বিতীয় অনুচর বলিল, বাদামি রঙের যে বড় বাজপাখিটা ধরা পড়িয়াছে, সে-ও দুধ খাইতেছে না। ঠোঁট এবং নখ দিয়া দুধের বাটি বার বার উল্টাইয়া দিতেছে। উহার জন্য কি কয়েকটা ইঁদুর ধরিয়া দিব? দোহা জালাটা নামাইয়া বলিল, মহিষটাকে আন এবং শঙ্কর মাছের চাবুকটা আমাকে দাও।

মহিষ মানে মহিষের চামড়া। মৃত মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া সেটাকে শুকাইয়া বোরখার আকারে এক অদ্ভুত পোশাক প্রস্তুত করিয়াছে দোহা। শিং সুদ্ধ মহিষের মুণ্ডটাও পোশাকে সংলগ্ন হইয়া আছে। মুণ্ডের ভিতর আছে খড়। সেটা যখন দোহা পরিধান করে মনে হয় একটা মহিষ যেন পিছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দোহা হাত দুইটিও মহিষের চামড়ায় ঢাকিয়া রাখে। দক্ষিণ হস্তে থাকে শঙ্কর মাছের শুষ্ক ল্যাজটি।

এই পোশাক পরিয়া দোহা যখন দুর্দান্ত বাঘটির কক্ষে প্রবেশ করিল তখন বাঘটি প্রথমে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া গেল। দোহা আগাইয়া গিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। প্রথমে বাঘটা কিছু বলিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল যে ওই ভীষণদর্শন জিনিষটা সত্যই তত ভীষণ নয়, তখন সে স-গর্জ্জনে ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহার ওপর। প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল দোহা। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া দুই হাতে তাহার মুখ ফাড়িয়া তাহার মুখের মধ্যে খানিকটা দুধ ঢালিয়া দিল। দোহা একটা দৈত্য। তাহার পর সে হায়নার ঘরে ঢুকিল। হায়েনারা তাহার চেহারা দেখিয়া ভয় পাইল না। দলবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে আক্রমণ করিল। কিন্তু মহিষের শুষ্ক চর্মে তাহাদের নখ-দন্ত বসিল না। দোহা নির্মমভাবে চাবুক চালাইয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। বলিল, তিন দিন উহাদের খাইতে দিও না। তাহার পর কেবল দুধ দিও। তখনও যদি না খায় আরও তিন-চার দিন কিছু খাইতে দিও না। তাহার পর আবার দুধ দিও। সাত দিন পরেও যদি না খায় উহাদের ছাড়িয়া দিও।

দোহা বাহিরে আসিয়া মহিষটা দূরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর যাহা করিল তাহা অপ্রত্যাশিত। একটা গাছের নিচে বসিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিরানির ক্রীতদাসরা ইহাতে বিস্মিত হইল না। তাহারা প্রতি কক্ষে কক্ষে দুধ দিয়া আসিতে লাগিল। দোহার এসব ভাবান্তরে তাহারা অভ্যস্ত। দোহা কখনও কাঁদে, কখনও অট্টহাস্য করে, কখনও বড় বড় বাছুরকে কাঁধে তুলিয়া নৃত্য করে। এসব আমিও জানিতাম। কিন্তু তাহার বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া আমি আবার বিচলিত হইলাম। বলিলাম, তুমি কাঁদিতেছ কেন? যদি কাঁদিবেই তবে এসব কাণ্ড কর কেন? দোহার যুক্তি কিন্তু অদ্ভুত। সে বলিল, কাঁদি, কারণ না কাঁদিয়া পারি না। আর এসব করি, কারণ এসব কর্তব্য। বিরানি অরণ্যে আধিপত্য করিতে হইলে হিংস্র পশুদের শাসন করিতে হইবে। তাহাদের আমি মারিয়া ফেলিতে চাহি না, কারণ তাহারা এ অরণ্যের শোভা। তাহাদের আমি ভালবাসা দিয়া খাবার দিয়া দুধ খাওয়াইয়া বশ করিতে চাই। যখন বশ মানিতে চায় না তখনই শাসন করি। এটা আমার কর্তব্য, কিন্তু বড় দুঃখজনক কর্তব্য। তাই মাঝে মাঝে কাঁদিয়া ফেলি।

আমরা তখন সভ্যতার যে স্তরে ছিলাম, সে স্তরে আমাদের সমাজ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। অনেক উন্নতি হইয়াছিল। আমাদের খাদ্যের অভাব ছিল না, আমরা খাদ্য সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছিলাম, আমরা বাহির হইতে খাদ্য আমদানিও করিতে পারিতাম। মোটামুটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও ছিল আমাদের। যদিও আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলাম না, তবু বাহিরের শত্রু হানা দিলে আমরা বর্শা, বল্লম, কুঠার, খড়্গ, তরবারি, ঢাল দিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম বহুদূরে একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজা নাকি আমাদের অধিপতি। তাঁহাকে আমরা কখনও দেখি নাই। ইহাও শুনিয়াছিলাম, তিনি নাকি পোড়ামাটির ইট দিয়া বিরাট একটি শহর নির্মাণ করিয়াছেন। শহরের মধ্যস্থলে তাঁহাদের দেবতার প্রকাণ্ড মন্দির আছে। সে মন্দিরে ধুমধাম করিয়া সে দেবতার পূজা হয়। আমরা সে দেবতা বা মন্দির কখনও দেখি নাই। মর্দন নামে আমাদের ভৃত্যটি প্রতি বছর কিছু শস্য খাজনা স্বরূপ তাহার তহশিলদারকে দিয়া আসে। তহশিলদারের সহিতও আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। ধর্ম সম্বন্ধেও আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, রাজার ধর্ম আমাদের পালন করিতে হইত না। তখন প্রত্যেক জনপদের আলাদা আলাদা দেবতা ছিল। একটা নয়, অনেক। গাছে গাছে, নদীতে তড়াগে, পর্বতে ঝর্ণায়, এমন কী জন্তুতেও অনেকে দেবতার প্রকাশ অনুভব করিত এবং পূজা করিত। আমাদের দেবতা ছিল টুকচুম্বা, যদিও অনেকে জীবজন্তুকেও পূজা করিত। এই পরিবেশে দোহা ছিল একটি অনন্য পুরুষ। ভিংড়ার অনন্যতাও অনেকে স্বীকার করিত। কিন্তু দুইজনের মধ্যে তফাত ছিল অনেক। ভিংড়া মনে করিত শাসন করিয়া সে প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিবে। তাহার এই শক্তিকে সকলের সম্মুখে আস্ফালন করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে ভণ্ডামিরও আশ্রয় লইত। এমন একটা ভাব করিত যে যদিও তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়ে সফল হইতেছে না, কিন্তু এই না হওয়ার মধ্যেও এমন একটা নিগূঢ় কিছু আছে যাহা আমাদের মত সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে। আমরা যেন অন্ধভাবে তাহার কথায় বিশ্বাস করি। অনেকে করিত। দোহা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার দেহের শক্তি প্রচণ্ড, মনের শক্তিও প্রচণ্ড। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রচণ্ডতা তাহাকে নিষ্ঠুর করে নাই, উগ্র করে নাই। দোহা শক্তিধর, কিন্তু কোমল। প্রকৃতিকে স্ববলে আনিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার স্পর্ধা তাহার নাই। সে জানে, প্রকৃতির শক্তি অমিত, তাহার নানারূপ, নানা প্রকাশ। তাহা অগ্নিতে জ্বলন্ত, প্রস্তরে কঠিন, আলোকে জ্যোতির্ময়, বন্যায়, ভূমিকম্পে, মেঘগর্জনে অশনিপাতে ভয়ঙ্কর। তাহার বহু রূপ, অসংখ্য প্রকাশ। এ সবের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার সাধ্য মানুষের নাই। সে বাধ্য যদি কখনও হয়ও, তবু প্রকৃতির শক্তি অদম্য থাকিবে, সে নিগূঢ় শক্তি বিস্তার করিয়া নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেই। মানুষ এ শক্তির নিকট নতজানু হইয়া কেবল প্রার্থনা করিতে পারে এবং এই প্রার্থনা তাহাকে এমন একটা অবর্ণনীয় শক্তি দেয় যাহা লাভ করিলে মানুষের আর ভয় থাকে না। দোহা প্রার্থনা করিত। সকলকে প্রার্থনা করিতে বলিত। এই বিরাট শক্তির নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, ইহাই তাহার মত ছিল। প্রতি মাসে শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন টুকচুম্বার তলায় প্রার্থনাসভা বসিত। সে সভায় কোনো বক্তৃতা হইত না। সকলেই চোখ বুজিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত। দোহা উঠিয়া পড়িলেই সভা ভাঙিয়া যাইত। তাহার পর শুরু হইত নৃত্য গীত। নাচ-গান শেষ হইয়া গেলে আমরা প্রত্যেকে এক কলসি করিয়া জল টুকচুম্বার তলায় ঢালিয়া দিতাম।

সেদিন দোহা সেই বাজপাখিটার ঘরে যখন গেল তখন আমরা দু'জনেই চমকাইয়া উঠিলাম। দোহা বলিল, এ পাখি তো এ প্রদেশের নয়। যেদিন ভালুকটাকে মারিয়াছিলাম সেইদিন এই

পাখিটাই আসিয়া আমাদের গাছে বসিয়াছিল না? আমিও বলিলাম, হ্যাঁ, এইটাই তো টুকচুম্বার ডালে বসিয়া আমাদের মাংস খাইবার অনুমতি দিয়াছিল। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তীর ছুঁড়িয়াছিল ভিংড়া। এ পাখি কী করিয়া ধরা পড়িল? দোহার একটা অনুচর বলিল, পাখিটা একটা প্রকাণ্ড সাপ ধরিয়াছিল। সেই সাপটার সহিত ঝটাপটি করিতে করিতে পাখিটা একটা মস্ত কাঁটাঝোপে পড়িয়া যায়। সেই ঝোপে উহার ডানা আটকাইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতেই আমরা উহাকে ধরিয়াছি। সাপটাকে ধরিতে পারি নাই, সেটা পলাইয়া গিয়াছিল। পাখিটাও দুধ খায় না। ঠোঁট দিয়া রোজ দুধের বাটি উল্টাইয়া দেয়। উহার ঘরে একটা ইঁদুর ঢুকিয়াছিল। সেটাকে ধরিয়া খাইয়াছে। আমাদের ফাঁদে অনেক ইঁদুর ধরা পড়িয়াছে। উহাকে ইঁদুর দিব কি? দোহা একটু ভাবিল। তাহার পর বলিল, না, উহাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার আগে উহার গায়ে গাঢ় সবুজ রং মাখাইয়া দাও। এবার বিদেশের বাজার হইতে যে রং আসিয়াছে, সেটা খুব পাকা রং। ও পাখি যদি আবার দেখা দেয় তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব একই পাখি বার বার ফিরিয়া আসিতেছে কি না। পাখিটাকে ধরিয়া রঙের চৌবাচ্ছার কাছে লইয়া গেল অনুচরটি। গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়াকে চিহ্নিত করিবার জন্য বিরানীতে নানা রঙের চৌবাচ্ছা থাকিত। সবুজ রঙের চৌবাচ্ছায় পাখিটাকে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। পাখিটার গায়ের রং বাদামি। মাঝে মাঝে সাদা রং ছিল কিছু কিছু। পেটের কাছে গোল গোল কয়েকটি সাদা বৃত্তের মত ছিল। ল্যাজেরও খানিকটা সাদা। সাদা অংশগুলি সবুজ হইয়া গেল। বাদামির ওপরও সবুজের ছোপ লাগিয়া একটা অদ্ভুত রং হইল। মোট কথা, পাখিটা যেন রূপান্তরিত হইয়া গেল। ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র সে সোঁ করিয়া অনেক ওপরে উঠিয়া গিয়া একটা ঘুরপাক খাইল। তাহার পর তীক্ষ্ণকণ্ঠে সেই চীৎকারটা করিল কেক্ কেক্ কেক কেক — কী-ই-ই। মনে হইল যেন ব্যঙ্গ করিয়া গেল। তাহার পরই অন্তর্হিত হইয়া গেল মহাশূন্যে। তাহাকে আর দেখা গেল না। তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া দোহা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, পাখিটাকে বশ করিতে না পারিয়া সে যেন ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহার মুখে-চোখে কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল, কে জানে ইহা কোনো অমঙ্গলের সঙ্কেত কিনা। মনে পড়িল ভিংড়াও এ কথা বলিয়াছিল। বলিলাম, চল কাল টুকচুম্বার পূজা করি। দোহা বলিল, বেশ। পরদিনই সেই মহাবৃক্ষের তলায় পূজার আয়োজন হইল। সমস্ত জনপদ নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। হঠাৎ একজন বলিল, টুকচুম্বার কুঁড়ি হইয়াছে। দেখিলাম অগ্নিগোলকের ন্যায় একটি কুঁড়ি একটি শাখার প্রান্তে দেখা দিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরেই অগ্নিশিখার মত অজস্র ফুল ফুটিল। মনে হইল সমস্ত গাছটাই যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। গাছটায় ফুল ফুটিলেই আমার কেমন যেন আতঙ্ক হইত। এবারও হইল। এবারও আমাদের সমাজে অনেক জননী সন্তান প্রসব করিল। প্রতিবারেই ফুল ফুটিলে আমাদের বংশবৃদ্ধি হয়, এবারও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

এবারে কিন্তু বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিল একটি। শুধু তাই নয়, বিস্ময় ক্রমশ আতঙ্কে রূপান্তরিত হইল।

প্রথমে একটি গুজব শোনা গেল, আমাদের অঞ্চলে কেহ কেহ নাকি ঘোড়া দেখিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ঘোড়া জানোয়ারটার সহিত আমাদের পূর্বপুরুষ বাণমুখ ও অংস্রোর অপ্রীতিকর স্মৃতি বিজড়িত ছিল। তাহাদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের জন্য থানথিরার বংশধরেরা ঘোড়ার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিল। আমাদের অঞ্চলে বহুকাল ঘোড়া দেখা যায় নাই। ঘোড়ার আবির্ভাবে আমরা

সকলেই বেশ বিচলিত হইয়া পড়িলাম। আমি নিজেই একদিন স্বচক্ষে দেখিলাম আমাদের খেতের মাঝখানে বেশ একটা বড় ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। যাহারা আমাদের খেত পাহারা দেয় তাহার ঘোড়াটাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া পালাইয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিল, ঘোড়াটাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহার কাছাকাছি যাইতেই ঘোড়াটা কান দুইটি পিছন দিকে বাঁকাইয়া তাহাদের কামড়াইতে গিয়াছিল। অমরা অনেকে বাহির হইয়া খেতের চারিদিকে সমবেত হইলাম। দেখা গেল, অনেক দূরে আরও দুইটি ঘোড়া চড়িতেছে। এই অবস্থায় কী করা উচিত আমরা চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় আমার কনিষ্ঠা পত্নী সুলমা আমার পাশে দাঁড়াইল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা সোৎসুক দীপ্তি দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম, কী ব্যাপার, হাসিতেছ কেন? সে বলিল একটা লম্বা দড়ি দিয়া উহাকে যদি ধরিয়া দাও, আমি উহার পিঠে চড়িতে পারি। আমার বাবার ঘোড়া ছিল। সুলমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, একটু বিব্রতও হইলাম। যাহার বাবার ঘোড়া আছে এবং যে ঘোড়ায় চড়িতে পারে তাহাকে আমি, থানথিরার বংশধর, বিবাহ করিয়াছি এ কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে লোকে কী ভাবিবে! এ আশঙ্কাও মনে জাগিল সুলমা অংঘ্রোর বংশের কেহ নয় তো? কাহাকেও কিছু বলিলাম না। শেষে ঠিক কিরলাম দোহার নিকট গিয়া সব বলিব। সে হয়ত এখনও ঘোড়ার খবর শোনে নাই, শুনিলে আসিত।

সব শুনিয়া দোহা বলিল, ঘোড়া তিনটিকে ধরিতে হইবে। সুলমার জন্য চিন্তিত হইও না। সে অংঘ্রোর আত্মীয় কিনা এ চিন্তা অনর্থক। সে ঘোড়ায় চড়িতে পারে এটা তাহার বিশেষ গুণ, দোষ নহে। তবে কথাটা কাহাকেও বলিও না। কারণ অনেকেই অল্পবুদ্ধি, কথাটা শুনিলে অমূলক জল্পনা-কল্পনা করিবে। এখন কথাটা গোপন রাখ। ঘোড়া তিনটিকে আগে ধরা যাক।

দোহা পশু-পক্ষী বিষয়ে খুব উৎসাহী, সে আমাদের ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সমবেত করিয়াছিল। তাহার পর নির্দেশ দিল বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঘোড়া তিনটিকে ঘিরিয়া ফেলিতে। বৃত্তটি প্রথমে বৃহদাকার হইবে, পরে সেটি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিবে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হইল। কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে লগুড়, কাহারও হাতে তরবারি, কাহারও হাতে ছোরা। অনেকের হাতেই দড়িও রহিল। সুলমা একটা লম্বা দড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইল ঘোড়া যদি আক্রমণ করিতে আসে তাহারা তাহাকে যেন আঘাত কবিতে ইতস্তত না করে। সুলমাও ওই বৃত্তের মধ্যে রহিল। দোহাও নিজের শঙ্কর মাছের চাবুকটা লইয়া সকলের সহিত যোগ দিল।

তিনটি ঘোড়াকে লইয়া তিনটি বৃত্ত হইয়াছিল। আমিও একটা বৃত্তের মধ্যে ছিলাম। বৃত্তগুলি ক্রমশ ছোট হইয়া ঘোড়াগুলির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ঘোড়াগুলি বুঝিতে পারিল যে তাহাদের ঘিরিযা ফেলা হইতেছে। তাহারা সচকিত হইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। সুলমা যে বৃত্তের মধ্যে ছিল সেই বৃত্তের ঘোড়াটা সবেগে সুলমার দিকে ছুটিয়া আসিয়া বৃত্ত ভেদ করিতে চেষ্টা করিল! সুলমা কিন্তু বিচলিত হইল না। সে দড়িতে একটা ফাঁস বানাইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল। ঘোড়াটা কাছে আসিবামাত্র সে দড়িটা ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার গলায় ফাঁসটা পরাইয়া দিল। ঘোড়াটা কিন্তু থামিল না। সুলমাকে টানিয়া অনেক দুরে লইয়া গেল। কতদূর লইয়া যাইত কে জানে, কিন্তু দোহা ছুটিয়া গিয়া ঘোড়াটার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মুখের উপর শপাশপ চাবুক মারিতে লাগিল। তাহার পর আরও আগাইয়া গিয়া তাহার সামনের ঝুঁটিটা ধরিয়া এক ঝটকায় মাটিতে ফেলিয়া দিল। ঘোড়াটা মাটিতে পড়িতেই সে যাহা করিল তাহা

সাধারণ মানুষে পারে না। সে ঘোড়ার চার পা ধরিয়া তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও লোকজন ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়াটাকে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ফেলিল। ঘোড়াটা সত্যই যখন বন্দী হইল তখন সুলমা বলিল, আমি ঘোড়াটার পিঠে চড়িব। আমি ঘোড়ায় চড়িতে জানি। সুলমা একটা শক্ত দড়ি পাকাইয়া লাগামের মত করিল এবং তাহার এক অংশ ঘোড়ার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া বাঁধিয়া দিল। ঘোড়াটা কামড়াইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম সুলমা জানে কী করিয়া ঘোড়াকে জব্দ করিয়া যায়। লাগামটা যখন ঠিক মত বাঁধা হইয়া গেল তখন সুলমা একলাফে ঘোড়াটার পিঠে চড়িয়া বসিল। বলিল, ঘোড়ার মুখের লাগাম সাধারণ চামড়ার হয়। মুখের ভেতরের অংশটায় লোহার শিকল থাকে। এ লাগাম বেশীক্ষণ টিকিবে না। তখন আমি উহার ঘাড়ের চুল মুঠো করিয়া ধরিব, উহার গলা জড়াইয়া ধরিব। ঘোড়াটা লাফাইয়া আমাকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। তোমরা একটা শক্ত দড়ি দিয়া ঘোড়াটার পেটের সঙ্গে আমার কোমর ও উরু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দাও। দোহা আপত্তি করিল না, যদিও আমি মনে মনে বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। দোহা নিজের চাবুকটাও সুলমাকে দিল। সুলমা বলিল, এবার ঘোড়াটাকে খুলিয়া দাও। খুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুলমা ও ঘোড়াটা দিগন্তরেখায় অন্তর্ধান করিল। আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কন্টকা আমার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, পাপ বিদায় হইল, ও আর ফিরিবে না।

বাকি ঘোড়া দুইটাও কিছুক্ষণ পরে ধরা পড়িল। দোহা সে দুইটিকে তাহার 'ফার্নাডি'তে লইয়া গেল।

পরদিন দোহা আমাকে বলিল, দুইজন বিশ্বস্ত লোককে বিদেশের বাজারে পাঠাও। ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম কিনিয়া আনুক। আমাদেরও ঘোড়ায় চড়া শিখিতে হইবে। আমরাও সুলমার অনুসরণ করিয়া দেখিব ঘোড়ারা কোথা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের খুশিমত চলিতে দিলে তাহাদের নিজেদের দেশেই ফিরিয়া যাইবে। দোহার মতলব শুনিয়া আমার ভয় হইল।

বলিলাম, আমাদের পূর্বপুরুষ থার্নথিরা ঘোড়া বর্জন করিয়াছিলেন। তুমি ঘোড়ার সহিত কোনো সাহসে ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহিয়াছ? দোহা বলিল, আমরা ঘোড়াকে ডাকিয়া আনি নাই। ঘোড়া নিজে আসিয়াছে। আজকাল অন্যান্য দেশে শুনিয়াছি ঘোড়াকে মানুষ নানা কাজে লাগাইতেছে। বাহন হিসাবে ঘোড়া যে বেশি দ্রুতগামী তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই। দেখিলে না সুলমা কেমন সবেগে চলিয়া গেল? হয়ত থার্নথিরার আত্মাই আমাদের উপকারের জন্য ঘোড়া তিনটিকে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হয়ত ইঙ্গিতে আমাদের বলিয়া দিলেন, এইবার তোমরা ঘোড়া ব্যবহার করিতে পার। ঘোড়া ব্যবহার না করিলে বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবে না। আত্মরক্ষাও হয়ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে। শত্রু যদি ঘোড়ায় চড়িয়া আসে তখন ঘোড়ায় চড়িয়াই তাহাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে। তিনটি ঘোড়াকে আমাদের রাজ্যে পাঠাইয়া থার্নথিরা হয়ত এই ইঙ্গিতই করিতেছেন। আর একটা কথা, সকলেই যখন ঘোড়া ব্যবহার করিতেছে তখন আমরা পিছাইয়া থাকিব কেন? ঘোড়ার সমস্ত খবর আমাদের জানিতে হইবে। দেখিলাম ঘোড়ার ব্যাপারে দোহা এত উৎসাহিত হইয়াছে যে তাহাকে বাধা দেওয়া শক্ত। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের তাহা হইলে কী করিতে বল তুমি?

দোহা বলিল, যাহারা ঘোড়ার জিন লাগাম কিনিতে বিদেশের হাটে যাইবে, তাহাদের বলিয়া দিব দুইজন ভালো অশ্বারোহীরও তাহারা যেন সন্ধান করিয়া আনে। তাহাদের আমরা বেতন

দিয়া এখানে রাখিব। আমাদের সকলকেই ঘোড়া-চড়া শিখিতে হইবে। ঘোড়া-চড়া শিখিয়া আর একটা কাজ করিতে হইবে আমাদের। আমার ইচ্ছা, যে ঘোড়া দুইটা আমরা ধরিয়াছি, তাহাদের পিঠে চড়িয়া তুমি এবং আর একজন বাহির হইয়া পড়। ঘোড়াকে নিজের মতে চলিতে দিলে তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে সেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। সে দেশের হালচাল কিরূপ, আমাদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব কিনা, এ সব খবর জানা দরকার। তুমি আমাদের দলপতি, তুমিই তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে, তাই তোমাকেই যাইতে বলিতেছি।

প্রশ্ন করিলাম, আমার সহিত আর কাহাকে যাইতে বলিতেছ?

সেটা তুমিই ঠিক কর।

তুমিই চল না।

না, আমি যাইব না। প্রথমত, এই ঘোড়া আমার ভার বহন করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা দুইজনেই চলিয়া গেলে ভিংড়া যে কী করিবে তাহা অনিশ্চিত। সে হয়ত রটাইয়া দিবে ঘোড়া দুইটি আমাদের হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা আর ফিরিব না। সে-ই তখন দলপতি হইয়া আবও পশু পক্ষী পুড়াইতে থাকিবে। আমাদের এই জনপদ নষ্ট হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত, আমি চলিয়া গেলে বিরানিতে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। তাই আমি যাইব না। আমাকে এখানে থাকতে হইবে। সেই দিনই আমাদের দুইজন লোক নমরি নামক বিখ্যাত মেলায় ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম কিনিতে চলিয়া গেল। অনেক জিনিষপত্র, শস্যসম্ভার, ফল, চামড়া লইয়া সাতটি নৌকাও তাহাদের সঙ্গে গেল। সেকালে আমাদের মুদ্রা ছিল না, দ্রব্যের বিনিময়েই আমরা জিনিসপত্র কেনা-বেচা করিতাম।

ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার জন্য যে দুইজন শিক্ষক আসিয়াছিলেন তাহাদের একজনের নাম আবিদ, আর একজনের নাম শরিফ। দুইজনেই বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ। তাঁহারা আরব অঞ্চলের লোক। বেদুইনদের রক্ত নাকি তাহাদের ধমনীতে প্রবাহিত। আরব দেশের জনৈক অশ্ব ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস তাহারা। খুব প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী। তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার চালচলন বেশ আভিজাত্যপূর্ণ। কটিবন্ধে সর্বদা ছোরা ও অসি। তাহাদের ঘোড়া দুইটিও চমৎকার। আমাদের ঘোড়ায় চড়া শিখাইবার জন্য তাহাদের প্রচুর গম, অনেক চামড়া, কিছু হরিণের শিং এবং দুইটি বাঘের চামড়া অগ্রিম দিতে হইয়াছিল। তাহাদের মালিক গিয়াসুদ্দিনকে তাহা তাহারা দিয়া আসিয়াছিল। আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আরও কিছু তাহাদের দিব। এ প্রতিশ্রুতিও আমরা দিয়াছিলাম।

দেখা গেল আবিদ এবং শরিফ দুইজনেই ভাল শিক্ষক। তাহারা দুইটি বেশ বড় বড় ঘোড়া আনিয়াছিল। আমাদের দুইটা ঘোড়া আগে হইতেই ছিল। দেখা গেল আমাদের ঘোড়াগুলি বুনো ঘোড়া নয়। বোঝা গেল তাহারা ইতিপূর্বে মানুষের সংস্পর্শে ছিল। আবিদ ও শরিফ তাহাদের মুখে লাগাম এবং পিঠে জিন দিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর আমাদের শিক্ষা শুরু হইল। আমরা অনেকেই তাহাদের নিকট ঘোড়ায় চড়া শিখিলাম। দোহাও তাহাদের বড় উঁচু ঘোড়াটায় চড়িল একদিন। কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো ঘোড়সওয়ার হইয়া উঠিল সে। আবিদ এবং শরিফ দুইজনেই তাহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করিল। কিন্তু এ-কথাও বলিল, দোহা ছোট ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে না। তাহার জন্য বড় বলিষ্ঠ ঘোড়া চাই। বলিল, তাহারা বড় ঘোড়া আনিয়া দিবে কিন্তু তাহার পরিবর্তে দুইটি বাঘের চামড়া এবং ভালুকের চামড়া দিতে হইবে। দোহার ভাণ্ডারে চামড়ার অভাব ছিল না। কিন্তু দোহা এখনই বড় ঘোড়া কিনিতে রাজি হইল

না। বলিল, এখন আমি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইব না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখন গিয়াসুদ্দিনের নিকট লোক পাঠাইব।

আমরা অনেকেই ঘোড়ায় চড়া শিখিলাম। শুধু পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও। আমাদের একঘেয়ে জীবনযাত্রায় ঘোড়া যেন একটা নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। দলে দলে ছেলেমেয়েরা আবিদ ও শরিফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল। কন্টকা অল্প দিনের মধ্যেই ভালো অশ্বারোহিণী হইল একজন। সে ধনুর্বাণেও খুব দক্ষ ছিল। উড়ন্ত পাখিকে সে তীরবিদ্ধ করিয়া মাটিতে নামাইয়া আনিতে পারিত।

মাস তিনেকের মধ্যে আমাদের শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত হইল। দম নামক যুবকটিও ঘোড়ায় চড়া ভালো করিয়া শিখিয়াছিল। দোহা আর একদিন যখন আমাকে তাগাদা দিল, এইবার তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়, দেখ ঘোড়া তোমায় কোথায় লইয়া যায়, তখন ঠিক করিলাম দমকে সঙ্গে লইয়াই বাহির হইয়া যাইব। কন্টকা কিন্তু কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, আমা' সঙ্গে সেই যাইবে। আর কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই। দোহা আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া পথা চলা নিরাপদ নহে। কন্টকা কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। বলিল, তুমি চলিয়া গেলেই ভিংড়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তখন আমাকে রক্ষা করিবে কে? দোহা যদি আমাকে তাহার বিরানি জঙ্গলে লুকাইয়া রাখে তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে থাকিতে পারিব। এই বলিয়া দোহার পানে চাহিয়া সে মুচকি হাসিতে লাগিল। দোহা এ প্রস্তাবে রাজি হইল না। সুতরাং তাহাকে সঙ্গেই লইতে হইল। দম আমাদের পিছু পিছু হাঁটিয়া চলিল। প্রায় শতখানেক ক্রীতদাসও দমের সহিত রহিল। আমি আর কন্টকা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিলাম। কন্টকার পিঠে তীর-ধনুক বাঁধা, কোমরে ছোরা, মাথায় বাজপাখির পালক দিয়া প্রস্তুত একটা শিরস্ত্রাণ। সে পুরুষের বেশই ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু পীবর স্তন দুইটিকে লুকাইতে পারে নাই।

আমরা ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; ঘোড়া দুইটি নিজের খুশিমত চলিতেছিল। দেখিলাম তাহারা পশ্চিম দিকেই চলিতেছে। দূরে আকাশের গায়ে পর্বতশ্রেণী দেখা গেল। শুনিয়াছি পর্বতের ওপারে মরুভূমি আছে। একটু পরে ঘোড়া দুটি পাহাড়ের দিকেই মুখ ফিরাইল। দেখিলাম তাহারা পাহাড়ের ক্রমোচ্চ ঢালু পথ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। খুব সাবধানে পদক্ষেপ করিয়া তাহারা ক্রমশ উপরে উঠিতে লাগিল। আমরা তাহাদের বাধা দিলাম না। খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা উপত্যকার মত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড়, মাঝখানটা সমতল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, ঠিক করিলাম রাত্রে আর পাহাড়ে উঠিব না। ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। কাছেই ঘাস ছিল, ঘোড়া দুটি চরিতে লাগিল। কন্টকা আমার পাশে বসিয়াছিল। হঠাৎ সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়া একটি নাতি-উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিলাম শৃঙ্গের ঠিক নিচেই একটি পৃষ্ঠিকায় রোমশ ছাগল দাঁড়াইয়া আছে। কন্টকা আমার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া মাটিতে শুইয়া সরীসৃপের মত ছাগলটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম তাহার শিকারের স্পৃহা জাগিয়াছে। খুশিই হইলাম; যদি ছাগলটাকে মারিতে পারে কিছু ভালো টাটকা মাংস পাওয়া যাইবে। দমের সহিত ক্রীতদাসরা আমাদের জন্য যে খাদ্য আনিতেছে, তাহাতে মাংস নাই। কন্টকা একটু পরে একটি উঁচু টিলার অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গেল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। একটু পরে দলবল লইয়া দম আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে বলিলাম, কন্টকা ছাগল শিকার করিতে গিয়াছে। তুমি এইখানেই আমাদের তাঁবুটা ফেল আর আগুন জ্বালাও। রাতটা এখানেই কাটানো যাক। দম বলিল, আমাদেব তাঁবুর গাড়িটা পিছাইয়া পড়িয়াছে। আসিয়া পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইবে। আমি ততক্ষণ কাঠ যোগাড় করিয়া, আগুন জ্বালাই। নিকটেই একটি শুষ্ক গাছ ছিল, সে তাহারই ডালপালা কাটিতে লাগিল। আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ছাগলটা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে নাই। কন্টকাকেও দেখা যাইতেছে না। ঘনায়মান অন্ধকারে উপত্যকার চতুর্দিক হইতে নানারকম অদ্ভুত শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সম্ভবত পাহাড়ি কীটপতঙ্গ ও নিশাচর পাখিদের শব্দ। মনে হইল, যেন একটা ভিন্ন জগতে আসিয়াছি। কয়েকটা পাখির তীব্র চীৎকার শুনিলাম। এ ডাক আগে কখনও শুনি নাই। মনে হইল পাখিগুলি বোধ হয় এ অঞ্চলেরই বিশেষ অধিবাসী। একটা তীব্র গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। গন্ধটা সম্ভবত ফুলেরই গন্ধ, কিন্তু অচেনা। কিন্তু কন্টকা কোথায় গেল? টিলার ওপারে সহসা একটা আর্ত চিৎকার শুনিতে পাইলাম। আমাদের তাঁবুর গাড়ি তখনও আসে নাই। সে গাড়িতে কিছু মশাল ছিল, অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। অমি কিন্তু গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিক হইতে চিৎকারটা অসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিয়া গেলাম। দমকে বলিলাম একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আমার অনুসবণ করিতে। টিলার ওপারে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম বাণবিদ্ধ মৃত ছাগলটা পড়িয়া আছে এবং তাহার পাশে দুই জন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছে। জ্বলন্ত মশালের আলোকে দেখিলাম কন্টকা একটি দাড়ি-গোঁফওলা লোকের বুকে চড়িয়া বসিয়া আছে। তাহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত।

এ কী কাণ্ড কন্টকা?

আমি ইহার বুকে ছুরি বসাইয়া দিযাছি।

সে কী? লোকটা কে?

আমি জানি না। আমি যখন ছাগলটাকে মারিয়াছি তখন লোকটা হঠাৎ ওই পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, এ আমাদের ছাগল, তুমি মারিয়াছ কেন? তোমাকে এবং এই ছাগলটিকে লইয়া আমি আমাদের দলপতির কাছে যাইব। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের দলপতি কোথায় থাকেন? সে বলিল, পাহাড়ের ওপারে যে মরুভূমি আছে সেই মরুভূমির তিনি মালিক। সেইখানে তোমাকে যাইতে হইবে। এই বলিয়া, সে আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। বুঝিলাম তাহার মতলব ভালো নয়। এক ধাক্কায় তাহাকে সরাইয়া দিলাম। তাহার পরই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ঠিক যুদ্ধ নয়, আমি ছুটিয়া পালাইতেছিলাম সে আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ একবাব সে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি তাহার হাতে কামড়াইয়া দিতেই সে আবার আমার হাত ছাড়িয়া দিল। তখন আমি ছুটিয়া গিয়া একটা বড় পাথর তুলিয়া তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিলাম। পাথরটা মাথায় লাগিতেই লোকটা পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার বুকে চড়িয়া বসিয়া ছোরা বসাইয়া দিয়াছি। ভাল করি নাই? এ ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল? আমি বলিলাম, এখন উঠিয়া এস। দম ছাগলটাকে টানিয়া লইয়া চলুক এবং ওটাকে আগুনে ঝলসাইয়া ফেলুক। লোকটা ওখানেই পড়িয়া থাক।

তাঁবুর গাড়িটা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাঁবুটা আমরা বিদেশের হাট হইতে আমদানি করিয়াছিলাম। পশুর লোম ও মোটা সুতা দিয়া প্রস্তুত। অন্ধকার হইলে তাঁবুটা খাটাইয়া রাত্রিবাস করিব বলিয়াই তাঁবুটা আনিয়াছিলাম। কিন্তু কন্টকা যে কাণ্ডটা করিয়া বসিয়াছে তাহার পব এখানে তাঁবু খাটাইয়া থাকা নিরাপদ মনে হইল না। গাড়িতে মশাল ছিল তাহাই বাহির করিয়া

জ্বালানো হইল। দম একটু দূরে একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া গোটা ছাগলটাকেই ঝলসাইতে লাগিল। লোমপোড়ার বিশ্রী গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কেহ না আসিয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ঘন অন্ধকারে একটা শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

দম বলিল, দূরে বোধহয় একটা ঝর্ণা আছে। তাহারই শব্দ।

কন্টকা সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, রক্তে আমার সর্বাঙ্গ মাখা। আমি ঝর্ণায় স্নান করিয়া আসি। দম তুমি আমার সঙ্গে চল। কন্টকাকে মানা করা বৃথা। সে মানা শুনিবে না। সে খামখেয়ালী। তাহার সাহসেরও অভাব নাই। তাহার চরিত্রে সামান্য দূরদর্শিতা থাকিলে সে এই অজানা জায়গায় অন্ধকার রাত্রে ঝর্ণায় গিয়া স্নান করিতে চাহিত না। বিশেষত, যখন একটু আগে একটা খুন হইয়া গিয়াছে এবং যে ছাগলটার পোড়া-গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে সেটা আমাদের সম্পত্তি নহে, তখন আমাদের একটু সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু অসমসাহসিকা কন্টকা বিপদের মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। সম্ভবত মনে করে তাহার যৌবন তাহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। যৌবন যে বিপদকে ডাকিয়াও আনিতে পারে এ জ্ঞান যে তাহার নাই তাহা নহে, কিন্তু সে বোধহয় মনে করে যৌবনের ছলা-কলার সাহায্যে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতাও তাহার আছে।

কন্টকা চলিয়া যাইবার পর আমি খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আমাদের ক্রীতদাসবাও আগুনের চারপাশে বসিয়া রহিল। আমাদের ঘোড়া দুইটি নিকটেই চরিতেছিল। আমার হঠাৎ মনে হইল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া লাভ কী? বরং একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া জায়গাটা কী রকম দেখা যাক। আমারা পর্বতের একটা উপত্যকার মধ্যে ছিলাম। কাছে দূরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। শুনিয়াছিলাম পর্বতের ওপারে মরুভূমি আছে। আমি একটা ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দুইজন ক্রীতদাসকে বলিলাম আমার অনুসরণ করিতে। উপত্যকার প্রান্তে আসিয়া দেখিলাম সেই মৃত লোকটি নাই। ঘোড়াটা একটা পাহাড়ের পথ ধরিয়া ওপরে উঠিতে লাগিল। . কিছু দূর ওপরে উঠিয়া মনে হইল দূর হইতে একটা সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে। পুরুষকণ্ঠের সঙ্গীত। সঙ্গীতের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। দূর হইতে সঙ্গীতের সব কথাও শোনা যাইতেছিল না। কিন্তু সে সঙ্গীতের আবেগ এমনই প্রবল এবং সে আবেগের আবেদন এত মর্মস্পর্শী যে, তাহা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমার ঘোড়াটাও আমাকে সেই দিকে লইয়া চলিল, মনে হইল সঙ্গীত তাহাকেও যেন আকর্ষণ করিতেছে।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দেখিলাম চাঁদ উঠিতেছে। আর পাহাড়ের চূড়ার ঠিক নিচেই রহিয়াছে একটি তাঁবু। তাঁবুর চারিদিক খোলা, তাঁবুর ছাদ গম্বুজাকৃতি হইয়া আকাশকে যেন খোঁচা মারিতেছে। চারিদিক চারটি মোটা কাঠের থাম, তাঁবুর মাঝখানেও একটি মোটা কাঠের থাম। পাঁচটি থামের ওপরই মনে হইল তাঁবুটি বিস্তৃত রহিয়াছে। দেখিলাম তাঁবুর মধ্যে যে থামটি রহিয়াছে তাহাতে ঠেস দিয়া বসিয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি গান গাহিতেছে। তাহার হাতে একটি একতারা। একতারার নিম্নভাগটা একটু অদ্ভুত ধরনের। সহসা মনে হয় মানুষের খুলি দিয়া প্রস্তুত। আমরা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গান থামিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, সম্ভবত জানিতে চাহিল, আমরা কে। কিন্তু তাহার ভাষা আমরা বুঝিলাম না। কোনো উত্তর দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমাদের রীতি অনুসারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলাম। সে-ও ঝুঁকিয়া অভিবাদন করিল আমাকে। তাহার পর মুখে তর্জনী ঠেকাইয়া এবং

দূরে লইয়া গিয়া সে ইঙ্গিতে যাহা জানাইল তাহা হইতে অনুমান করিলাম সে আমাকে কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছে। কথা বলিলাম এবং পর মুহূর্তেই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সে আমাদের ভাষাতেই উত্তর দিল। দেখিলাম সে আমাদের ভাষা জানে এবং আরও কয়েক রকম ভাষা তাহার আয়ত্ত। তাহাকে বলিলাম, আপনার গান শুনিয়াই আমরা এখানে আসিয়াছি। গানের ভাষা বুঝি নাই, গানের সুরই আমাদের টানিয়া আনিয়াছে। আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। আপানার পরিচয় জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

তখন সে বলিল, আমার নাম তিরখন। সর্দার মালেকের আমি ভৃত্য।

সর্দার মালেক কে?

তিনি এই মরুভূমির অধিপতি।

কোন্ মরুভূমি?

যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া দেখুন। এ সমস্তই সর্দার মালেকের। দৃষ্টির ওপারেও খানিকটা জমি তিনি সম্প্রতি দখল করিয়াছেন। সেখানে এখনও লড়াই চলিতেছে। তেমুজিন খাঁ বন্দী হইয়াছে কিন্তু তাহার স্ত্রী শিকারা এখনও লড়িতেছে। তাহার সাহায্যে নাকি খেকুন সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়াছে।

আপনি এখানে কী করিতেছেন?

আমি সীমান্তরক্ষী। সীমান্তে শত্রু হানা দিলে আমি তূর্যধ্বনি করি।

মরুভূমির মধ্যে বালিয়াড়ির আড়ালে কিছু সৈন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। তূর্যধ্বনি শুনিলেই তাহারা ছুটিয়া আসে। এই দেখুন আমার তূর্য।

পাশেই প্রকাণ্ড বাঁশীর মত একটা জিনিস রাখা ছিল। সেইটা তুলিয়া দেখাইল।

আপনি এতক্ষণ যে গান গাহিতেছিলেন তাহার সুর অতি চমৎকার। কিন্তু সে গানের ভাষা আমি বুঝিতে পারি নাই। বিষয়টা কী, যুদ্ধ নাকি? কিন্তু অনুমান করিতেছি যুদ্ধের উদ্দীপনা উহাতে নাই। আছে কোমল মধুর ভাব একটা।

তিরখন কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার গানের বিষয় আমার অন্তরের হাহাকার। একদিন যাহা ছিল এখন যাহা নাই, তাহার জন্য হাহাকার। অতি বাল্যকালে মঙ্গোলিয়ায় দিগন্তবিস্তৃত পীতাভ উঁচু-নিচু বালিয়াড়ি আর লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে, মরুভূমির ঘূর্ণিঝড়ের তপ্ত আবহাওয়ায় মরীচিকাময় স্বাধীনতার মধ্যে আমি দিন কাটাইয়াছি। ওই আবহাওয়াতেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এক হুন পরিবারের ক্রোড়ে। হুনরা যুদ্ধপ্রিয়। পরস্পরের মধ্যে মারামারি করাই তাহাদের স্বভাব। অপরের ধনসম্পত্তি লুটপাট করিয়া জীবিকানির্বাহ করে তাহারা। একদল হুন আর একদলকে আক্রমণ করিতেছে ইহা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই রকম একটা মারামারির সময় আমি শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পরি। তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলে নাই। অনেক ক্ষুধার্ত হুন মানুষের মাংসও খায়। তাহারা ইচ্ছা করিলে আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মারে নাই। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর। আমাকে যাহারা হরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহারা আর একটি যুদ্ধে আর একটি পরিবার হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছিল বিবিকে। দশ বছরের মেয়ে বিবি। চোখ দুটি ছিল হরিণীর চোখের মত। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। গায়ের রং অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল বাদামি। সে রকম উজ্জ্বল বাদামি রং দেখা যায় না। আমি তো আর দেখি নাই। ফরসা নয়, কালো নয়, সে ছিল উজ্জ্বল বাদামি। মাথায় কালো ভ্রমরকৃষ্ণ চুল। মাথার চুল মুখের খানিকটা ঢাকিয়া গুচ্ছে

গুচ্ছে নামিয়া আসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে। অদ্ভুত সুন্দরী ছিল রিরি। কিন্তু ওই সুন্দর সুকোমল রিরির উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইত তাহা যেমন অশ্লীল, তেমনি নিষ্ঠুর। রিরি একদিন গভীর রাত্রে আমাকে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, চল পালাই। সেদিন খুব শীত ছিল। একটা তীব্র হাওয়াও বহিতেছিল। অন্ধকারে মরুভূমির উপর দিয়া আমরা ছুটিতে লাগিলাম। না ছুটিলে সেই শীতে জমিয়া আমার মৃত্যু হইত। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না, তবু ছুটিতেছিলাম। অবশেষে একটা জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। জঙ্গলের ভিতর কিছুদূর গিয়া দেখিলাম রিরি নাই। আস্তে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কোনো সাড়া পাইলাম না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে আসিল না। একটু পরেই কিন্তু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম হুনের দল ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের ধরিবে বলিয়া। একটু পরেই রিরির আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর আর্তনাদটা হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহারা উহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, কী মারিয়া ফেলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে ধরিবার জন্যও তাহারা বনটা তোলপাড় করিয়া বেড়াইল খানিকক্ষণ। কিন্তু আমাকে ধরিতে পারিল না। সেই ঘাসের জঙ্গলে আমি এমনভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলাম যে তাহারা আমাকে ধরিতে পারে নাই। আমার নাগাল পাইলে ধরিত, কিন্তু নাগালই পায় নাই। আমি বালির মধ্যে নিজের দেহটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহার উপর ঘাসের জঙ্গল ঘন হইয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। তাহারা যখন চলিয়া গেল তখনও আমি অনেকক্ষণ সেই বালু-স্তূপের নিচে পড়িয়া রহিলাম। মনে হইতেছিল শীতে বুঝি জমিয়া যাইব। কিন্তু যাই নাই, বালুর আবরণ আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। চতুর্দিক যখন নিস্তব্ধ হইয়া গেল তখন আমি সন্তর্পণে বালুর স্তর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। মাথার উপর দিয়া একঝাঁক পাখি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। বুঝিলাম প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। ভাবিলাম অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই এই হুনদের এলাকা পার হইয়া অন্য এলাকায় যাইতে হইবে। কাল বিলম্ব না করিয়া আবার ছুটিতে শুরু করিলাম। কিছুদিন পরে আবার একদলের হাতে ধরা পড়িলাম। হুনেরা নানা দল মরুভূমিকে নানাভাগে ভাগ করিয়া বাস করে। এক এলাকা পার হইলে অন্য এলাকার লোকেদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সেখানে ক্রীতদাসের মত থাকিতে হয়। থাকিতে পারিলে আহার আশ্রয় দুই পাওয়া যায়। কিন্তু এক জায়গায় বেশি দিন থাকা যায় না। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় বার বার পালাইতে হইয়াছে। কারণ কোথাও স্নেহের সাগ্রহ বাহু আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে নাই। একমাত্র রিরিই আমাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তাহা শেষ হইয়া গেল। সারা জীবনটাই কষ্টে কাটিয়াছে। জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক হাহাকার জমিয়া আছে। সেই সবই মাঝে মাঝে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গান রূপে মূর্ত হয়। আজ রিরির কথা মনে পড়িতেছিল। আর মনে পড়িতেছিল আমার বাল্যজীবনের কথা। মনে পড়িতেছিল সেই গোবি মরুভূমিকে, যাহার ক্রোড়ে একদা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বড় বড় হ্রদের পাশে নলখাগড়ার বন, সেখানে নানারকম পাখিদের আনা-গোনা, মনে পড়িতেছিল। সেই বৈকাল হ্রদের তীরে কী বড় বড় পাখিই না দেখিয়াছিলাম। মনে পড়িতেছিল সেই দিগন্তবিস্তৃত বিস্তারকে বালিয়াড়ির উঁচু-নিচু, অদ্ভুত সৌন্দর্যকে, মেঘহীন আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীকে। আমার গানের সুরে [illegible]দের কথাই ধ্বনিত হইতেছিল। তাহা ভীষণ অথচ সুন্দর, মৃদু অথচ কঠিন। ভাষায় তাহা অবর্ণনীয়, সুরেই তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আর মনে পড়িতেছিল আমার মাকে। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। আমার মুখ তিনি কখনও দেখেন নাই।

সর্বদাই আমার মুখে হাত বুলাইয়া দেখিতেন, সর্বদাই আমাকে বুকে আঁকড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার বুক হইতেই একবার এক দস্যু আমাকে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। আমার বাবাকে আমি দেখি নাই। আমার জন্মের পূর্বেই এক খণ্ডযুদ্ধে তিনি মারা যান।

তিরখন চুপ করিল।

আমি তখন বলিলাম, আমি আপনার নিকট একটি পরামর্শ চাই।

তিরখন উত্তর দিল, তৎপূর্বে আপনার পরিচয় দিতে হইবে।

'আমার নাম টালা। এই পাহাড়ের নিচে পূর্বদিকে নদী তীরে যে সমস্ত জমি আছে সেখানে আমাদের দল বহুদিন হইতে বাস করিতেছে। আমি তাহাদের দলপতি। আমরা জমিতে ফসল ফলাই। আমাদের নৌকা সে ফসল দূরদেশে লইয়া যায়। কয়েকদিন আগে কয়েকটি ঘোড়া আমাদের অঞ্চলে আসিয়াছিল। আমরা তাহাদের ধরিয়াছি, তাহাদের পিঠে চড়িয়াই এখানে আসিয়াছি। তাহাদের লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছিলাম তাহারাই আমাদের এখানে লইয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা এই পাহাড়ে উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার স্ত্রী কন্টকা শিকার-প্রিয়। এই উপত্যকায় সে একটি ছাগল দেখিয়া সেটিকে তীরবিদ্ধ করে। তাহার পরই পাহাড়ের অন্তরাল হইতে একজন আসিয়া বলে, আমার ছাগল তুমি মারিলে কেন? এই লইয়া উভয়ের কলহ হয়। লোকটি নাকি কন্টকাকে আক্রমণ করিয়াছিল। বলিয়াছিল তাহাকে বন্দী করিয়া দলপতির কাছে লইয়া যাইবে। কন্টকা আত্মসমর্পণ করিবার পাত্রী নয়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কন্টকা ছুরিকাঘাতে লোকটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। সব শুনিয়া সেখানে গেলাম, দেখিলাম মৃতদেহটি নাই। হয় সে মরে নাই, কিংবা তাহার মৃতদেহ কেহ তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

তিরখন প্রশ্ন করিল, মৃত ছাগলটা কোথা?

সেটাকে আমরা ঝলসাইতেছি। আপনি যদি অনুমতি করেন কিছু মাংস আপনাকেও আনিয়া দিব। ছাগলটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আপনি এখন পরামর্শ দিন এ অবস্থায় আমাদের এখন কী করা উচিত।

তিরখন নিজের দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিল না। আমি সোৎসুকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। অবশেষে সে যাহা বলিল তাহা দুশ্চিন্তা আরও বাড়াইয়া দিল, কমাইল না।

বলিল, আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহা যদি সর্দারের কর্ণগোচর হইয়া থাকে তাহা হইলে ভয়ানক কাণ্ড হইবে। আপনাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাঁহার রাগ কমিবে না। তিনি অত্যন্ত রাগী লোক। আমি আপনাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি একথা তিনি যদি শোনেন তাহা হইলে আমারও সমূহ বিপদ।

হয়ত আমার মুণ্ডচ্ছেদেরই আদেশ দিবেন।

প্রশ্ন করিলাম, এ ছাগলটা কি সর্দারের?

সম্ভবত তাঁহারই। তাঁহার একটি সদ্য বিবাহিতা বেগমের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে আজ একটি উৎসব হইতেছে। সে জন্য কিছু ছাগল বাহির হইতে আনানো হইয়াছে। সর্দার এখন যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু কথা আছে রাত্রে যুদ্ধ শেষ করিয়া সর্দার আসিয়া সদলবলে উৎসবে যোগ দিবেন। বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। অনেক মাংস চাই। দুইটি উটও মারা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, দল হইতে একটি ছাগল ছিটকাইয়া বোধহয় পলাইয়া আসিয়াছিল। আপনার

পত্নী সেইটাই মারিয়াছেন। ছাগলের রক্ষকটি মরে নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। একটু আগে এই পথেই তাহাকে তাঁবুতে লইয়া গিয়াছে। সম্ভবত তাহার মুখেই সর্দার সব খবর পাইবেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোক আসিয়া হাজির হইল। বলিল, ছাগলের রক্ষকটি মারা গিয়াছে।

তিরখন তাহাকে প্রশ্ন করিল, সর্দার কখন আসিবেন?

খবর আসিয়াছে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইয়াছেন। শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন।

আচ্ছা তুমি যাও, সর্দার আসিলে আমাকে খবর দিও। লোকটি সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল। তাহার পর চলিয়া গেল।

তিরখন তখন আমাকে বলিল, আপনাকে দেখিয়া আমার ভাল লাগিয়াছে। আপনার কথাবার্তাও ভালো। সুতরাং আপনার প্রাণরক্ষার চেষ্টা আমি করিব। আমাদের সর্দার অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক। বন্দীদের প্রতি তিনি কিছুমাত্র দয়া করেন না। সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলেন। আমার আশঙ্কা, আপনারও সেই দশা হইবে। কারণ, আপনি যখন আমার নাগালের মধ্যে আসিয়াছেন তখন আপনি আর পালাইতে পারিবেন না। পালাইতে চেষ্টা করিলে আমি তূর্যধ্বনি করিব। সঙ্গে সঙ্গে সেনারা আসিয়া আপনাকে বন্দী করিয়া ফেলিবে। আপনাকে আমি ছাড়িয়াও দিতে পারি না কারণ, মালিকের কাজে ফাঁকি দেওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আপনি যদি কয়েকটি মিথ্যা কথা বলিতে প্রস্তুত থাকেন এবং আপনার পত্নীও যদি তাহা সমর্থন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে বাঁচাইবার একটা উপায়। সম্ভবত, বাহির করিতে পারিব। যে ছাগলটা মারিয়াছেন সেটা কোথায়?

সেটা ঝলসানো হইতেছে।

সেটাকে গোটাই লইয়া আসুন। আপনার পত্নীকেও আনুন। তাহার পর ওই ঝলসানো ছাগলটা লইয়া আমরা সর্দারের দরবারে যাইব। আমি বলিব, আপনার এই উৎসবে ইনি একটি ঝলসানো ছাগল উপহার আনিয়াছেন। ইনি পাহাড়ের ওপাশের জনপদের মালিক। ইনি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করেন। পাহাড়ের ওপাশে বিস্তৃত সমতল আছে সেখানে ইঁহারা চাষ করেন। ইনি দলপতি। আমাদের দলের একটি লোক ইঁহার পত্নীর সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছে। সে নাকি ইঁহাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার হাতে শাণিত অস্ত্র ছিল। আত্মরক্ষার জন্য তিনি লোকটির বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়াছেন। লোকটি মারা গিয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু তবু ইঁহারা আশা করিতেছেন যে, সমস্ত শুনিয়া আপনি ইঁহাদের ক্ষমা করিবেন। আমি এই সব কথা যখন বলিব তখন আপনি ও আপনার পত্নী মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

এ সব কথা আমার ভাল লাগিতেছিল না। আমার আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। কিন্তু দেখিলাম এ অবস্থায় এই দুর্ধর্ষ সর্দারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিরুদ্ধাচরণ করাটাও সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। আমাদের লোকবল কম। তাছাড়া আমরা যুদ্ধেও পারদর্শী নই। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য আমাদের সমগ্র জনপদকে বিপন্ন করা উচিত নয়।

তিরখন বলিল, আপনি ফিরিয়া যান। ছাগলটাকে আর আপনার পত্নীকে লইয়া আসুন। বেশি বিলম্ব করিবেন না। আমি আপনার ওপর বিশ্বাস করিয়াই আপনাকে যাইতে দিতেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে সৈন্য ঢুকিয়া আপনাকে ধরিয়া আনিবে।

আমি আবার অশ্বারোহণে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া দেখি কন্টকা দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া সর্বাঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতেছে। ঝর্ণায় স্নান করিয়া খুব আনন্দ হইয়াছে তাহার।

কি সুন্দর ঝরণাটা। সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া গিয়াছে। এস এবার খাওয়াদাওয়া করা যাক।

খাইব কী, মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ছাগলটাকে স্পর্শ করিও না। মহা বিপদে পড়িয়াছি। সর্দারের ছাগল মারিয়াছ। এখন খাওয়াদাওয়া থাক, চল সকলে সর্দারের কাছে যাই। তিনি যদি ক্ষমা করেন তবেই আমারা রক্ষা পাইব। চল দেরি করিও না—

তিরখন যাহা বলিয়াছিল কন্টকাকে সব বলিলাম। কন্টকা বলিল, আমি যাইব না।

না গেলে বিপদ আছে। সমূহ বিপদ। সর্দার যদি সসৈন্যে আমাদের তাড়া করেন আমরা ধরা পড়িয়া যাইব। ধরা পড়িলে শাস্তি মৃত্যু। সর্দার নাকি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য দণ্ড দেন না। চল না, দেখিয়াই আসি ব্যাপারটা কী।

চল, কিন্তু আমি যাহা করিব তাহাতে বাধা দিও না।

কী করিবে?

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিব।

বিরাট মরুভূমির মধ্যে সর্দারের সভা বসিয়াছিল একটা প্রকাণ্ড সামিয়ানার নিচে। সর্দার প্রশস্ত একটা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে বসিয়াছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরা। অগ্নিশিখার মতো চেহারা। ধবধবে ফরসা রং, গায়ে লাল রঙের ওড়না। সর্বাঙ্গে লাল পাথরের গহনা চকমক করিতেছে। দেখিলাম, সর্দারের সম্মুখে কিছু দূরে নরমুণ্ড স্তূপীকৃত রহিয়াছে। যুদ্ধে কিছু পূর্বে যাহাদের বন্দী করা হইয়াছিল, তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে। মুণ্ড-নিঃসৃত রক্তের ধারায় খানিকটা জায়গা ভিজিয়া গিয়াছে। সর্দার গম্ভীর মুখে বসিয়া ছিলেন। মুখে সামান্য একটু ভ্রূকুটি। চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত। কোমরে প্রকাণ্ড একটা বাঁকা তলোয়ার। অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ চাপদাড়ি এবং গুম্ফ সত্যই ভীতিপ্রদ। মনে হইতেছিল একটা মনুষ্যরূপী সিংহ যেন বসিয়া আছে। সর্দারের দুই পাশে এবং পিছনে বহু সশস্ত্র সৈনিক।

তিরখন কুর্নিশ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গেল এবং আমাদের কথা তাঁহার কাছে নিবেদন করিল। আমার কয়েকজন ক্রীতদাস ঝলসানো ছাগলটা লইয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগলটি রাখিবার জন্য তিরখন প্রকাণ্ড একটি কারুকার্যমণ্ডিত থালা দিয়াছিল। তিরখন ইঙ্গিত করিতেই তাহারা সেটি আনিয়া সর্দারের পদপ্রান্তে স্থাপন করিয়া আমাদের প্রথামত প্রণাম করিল। দেখিলাম সর্দারের মুখভাব কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছে। তিনি ঝলসানো ছাগলটি দেখিলেন এবং হাত নাড়িয়া সেটি অন্যত্র লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারই কয়েকজন ভৃত্য ছাগলটি স্থানান্তরে লইয়া গেল। তখন তিরখন আমাদের দুইজনকে ডাকিল। আমরা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া রহিলাম। সর্দারের দৃষ্টি দেখিলাম কন্টকার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে। তিরখন যে ভাষায় সর্দারকে আমাদের কথা বলিতেছিল, সে ভাষা আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য। সর্দার মাঝে মাঝে কেবল বলিতেছিলেন, 'খো'। পরে জানিয়াছি 'খো' মানে 'ঠিক'। সব শুনিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া সর্দার যাহা বলিলেন তিরখন তাহার অর্থ আমাদের বুঝাইয়া দিল।

তিরখন বলিল, সর্দার বলিতেছেন যে এই আগন্তুকদের সদ্ব্যবহারে আমি প্রীত হইয়াছি। যে পাষণ্ড লোকটা এই বিদেশিনীর উপর বলাৎকার করিতে গিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়া তিনি শুধু যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নয়, সুরুচিরও পরিচয় দিয়াছেন। যে রমণী পশুর নিকট

আত্মসমর্পণ করে সে-ও পশু। আপনাদের উপহার পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বলাভ করিলেও আমি খুশি হইব। কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব। আপনারা ভূমি চাষ করিয়া যে সম্পত্তি আহরণ করেন, আমাদের কাজ তাহা লুণ্ঠন করা। সুতরাং আমাদের উভয়ের ধর্ম বিপরীত। যে তেমুজিনের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হইতেছে তাহারাও কৃষক সম্প্রদায়, জমি চাষ করিয়া প্রভূত সম্পত্তি উৎপাদন করে। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা প্রচুর সৈন্য এবং প্রচুর যুদ্ধোপকরণও রাখিয়াছে। তাহাদের অশ্ববাহিনী বিপুল, তাহাদের রণকৌশলও প্রশংসাযোগ্য। তেমুজিনের পত্নী শিকারা নিজেই একজন যোদ্ধা। তিনি নিজেই এখন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহাদের দেশ হইতেই আমি আমার কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরাকে সংগ্রহ করিয়াছি। আশা করিতেছি, এইবার আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হইবে। আমি আত্মীয়দের সহিত যুদ্ধ করি না। ভুলেরা শিকারার নিকট একটা শান্তি প্রস্তাব পাঠাইয়াছে, দেখা যাক কী হয়। আমি জানিতে চাই আপনারা যদি আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করেন, কী শর্তে সেটা হইবে?

আমি বলিলাম, বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই কামনা করি। আমি আমাদের সম্প্রদায়ের দলপতি। তবু শর্তের কথা আমার দলের অন্য লোকদের সহিত পরামর্শ না করিয়া বলিতে পারি না।

সর্দার বলিলেন, শর্ত দুই প্রকার হইতে পারে। এক, সম্পত্তি বিনিময় করিয়া, না হয় বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া। কন্টকার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, আপনাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজন রূপসীকে আমার পরিবারভুক্ত করিতে পারিলে আমি খুশি হইব। আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু রমণীকে আপনারাও বিবাহ করুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। সহসা কন্টকার দিকে ফিরিয়া তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, এ বিষয়ে আপনার কি মত?

কন্টকা ইহা শুনিয়া যাহা করিল তাহা বিস্ময়জনক। সে কিছু বলিল না। সে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সর্দারের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া আগাইয়া গেল। সর্দার হাতের ইঙ্গিতে তাহাকে আরও নিকটে ডাকিলেন। তখন সে বলিল, আমি যাহা করিতে চাই তাহাতে কেহ বাধা দিবে না তো?

তিরখন তাহার বক্তব্য অনুবাদ করিয়া সর্দারকে শুনাইল। সর্দার মাথা নাড়িয়া জানাইলেন না, কেহ বাধা দিবে না। তখন কন্টকা সর্দারের কনিষ্ঠা পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, আপনিও অনুমতি দিন। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা দেখা গেল, তাঁহার দুই চোখে জল টলমল করিতেছে। সর্দার বলিলেন, আমার হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। আমার সহস্র পত্নী। প্রত্যেকের মতামত শুনিয়া যদি আমাকে চলিতে হয়, আমি এক পা-ও চলিতে পারিব না। আপনি যাহা করিতে চান তাহা নির্ভয়ে করুন। কেহ আপনাকে বাধা দিবে না। ইহার পর কন্টকা যাহা করিল তাহা আরও বিস্ময়কর। সে সোজা গিয়া সর্দারের কোলের উপর বসিয়া পড়িল এবং দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

সর্দার বলিলেন, খো।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। সর্দার সোচ্ছ্বাসে কী যেন বলিতে লাগিলেন। তিরখন তাহার অনুবাদ করিল। বলিল, সর্দার বলিতেছেন আপনার পত্নী আচরণ দ্বারা যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহার অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। আমি ইহাতে খুব আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইনি আপনার পত্নী। আপনার এ বিষয়ে অভিমত কী? আপনি যদি বলেন আমি এখনই ইহাকে আমার কোল হইতে নামাইয়া দিব। আমি বলিলাম, আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা আছে। তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের পতি নিজেরাই নির্বাচন করিতে পারে। কন্টকা যদি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করে আমার কোনো আপত্তি নাই।

কন্টকার চোখে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল। তাহার পরই সহসা চতুর্দিকে একটা গোলমাল শুরু হইয়া গেল। সকলেই আমরা সামিয়ানার তলা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সেদিন পূর্ণিমা ছিল। দেখিলাম চাঁদের খানিকটা কালো হইয়া গিয়াছে। গ্রহণ লাগিয়াছে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হইলে আমরা সকলে টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিতাম। তাহার পর আগুনের প্রজ্বলিত মশাল আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতাম। উদ্দেশ্য, আমাদের দেওয়া আগুন হইতে সূর্য বা চন্দ্র তাহার জ্যোতি সংগ্রহ করুক। কিন্তু ইহাদের আচরণ দেখিলাম অন্যরূপ। ইহারা দেখিলাম তীরে কাপড় জড়াইয়া এবং সেগুলি চর্বিতে ভিজাইয়া ছোট ছোট মশাল জ্বালাইতেছে, এবং সেই মশালগুলি ধনুকে লাগাইয়া আকাশে দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। আকাশে অসংখ্য জ্বলন্ত মশাল উড়িতে লগিল। তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, ইহাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি ইহাই করিতেন। ইহাদের বিশ্বাস, জ্বলন্ত মশালগুলি হইতে চন্দ্র পুনরায় তাহার জ্যোতি সংগ্রহ করিতে পারিবে। ভাবিয়া দেখিলাম, আমরা যাহা করি তাহা ইহারই রকমফের। উদ্দেশ্য একই।

যাই হোক, সেই জনারণ্যে কন্টকা হারাইয়া গেল। সর্দার এবং তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরাকেও আর কোথাও দেখিলাম না।

তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন আমরা কী করিব? তিরখন বলিল, কিছুক্ষণ এইখানেই থাকা যাক। আপনার পত্নীকে না লইয়া কোথায় যাইবেন?

বলিলাম, আমার পত্নীর যে ব্যবহার দেখিলাম তাহাতে মনে হয় না যে সে আমার সহিত ফিরিয়া যাইবে। তিরখন হাসিয়া উঠিল।

বলিল, নারীদের চরিত্র অতি জটিল। আপনি অত সহজে উহাদের বিচার করিবেন না। আপনার পত্নীর কি উদ্দেশ্য তাহা এখনই বোঝা যাইবে না। কিছুদিন সবুর করিতে হইবে।

আমরা দুইজনেই সেই জনারণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। চারিদিকেই চিৎকার আর কোলাহল। চন্দ্রগ্রহণ সকলকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ছোট অসংখ্য মশাল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কিছু দূর আসিয়া দেখিলাম একদল লোক উবু হইয়া বসিযা কী একটা কাজে যেন ব্যস্ত রহিয়াছে। আকাশের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এরা কারা? এরা আকাশের দিকে মশালের তীব ছুঁড়িতেছে না কেন? তিরখন বলিল, উহারা ক্রীতদাস। অত্যন্ত বীভৎস এবং হিংস্র। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রত্যেকের পায়ে শিকল বাঁধা আছে। হিংস্র প্রকৃতির জন্য সর্দার ইহাদের কিনিয়া আনিযাছেন। উদ্দেশ্য, ইহাদের হিংস্র সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করা। ইহারা নরমাংস খায়। আজ যে সব যুদ্ধবন্দীদের মাথা কাটা গিযাছে, যে সব মাথা আপনি সর্দারের দরবারে স্তূপীকৃত দেখিলেন ---- সেই সব মাথার কবন্ধগুলি এই নরমাংসভক্তদের দেওয়া হইযাছে। প্রত্যেক যুদ্ধের শেষেই দেওয়া হয়। উহারা কবন্ধগুলি টুকরা টুকরা করিতেছে। পরে আগুনে ঝলসাইয়া খাইবে। অনেকে কাঁচাও খায়।

আমি নির্বাক বিস্ময়ে রহিলাম। ইহাদের কাহারও আকাশের দিকে দৃষ্টি নাই, চন্দ্রে কি হইতেছে না হইতেছে সে বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহাদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ

কতকগুলি ছিন্নভিন্ন কবন্ধের উপর। শুনিতে পাইলাম ইহারা একটা হিস্ হিস্ শব্দও করিতেছে। সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না।

চলুন অন্য কোথাও যাই।

কিছু দূরে একটা টিলা আছে। চলুন সেইখানেই যাওয়া যাক। আপনাকে গান শুনাইব।

চলুন।

টিলাটি সত্যই নির্জন স্থানে অবস্থিত। চারিদিকে মরুভূমি যেন সাগরের মতো দিগন্ত বিস্তৃত। মাঝখানে নাতি-উচ্চ টিলাটি।

সেই টিলার উপর বসিয়া তিরখন গান ধরিল।

সে গানের ভাষা আমার নিকট দুর্বোধ্য, তবু তাহার সুর আমার মনে একটা বেদনা জাগাইয়া তুলিল। আমি মুগ্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। গান শেষ হইলে তিরখনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গানের অর্থ কী?

তিরখন বলিতে লাগিল, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে। অত্যাচারের তরবারি মানুষকে মরিয়া ফেলে। কিন্তু মানুষের দেহটাই মরে, আর কিছু মরে না। সে অন্য দেহে অন্য রূপে জন্মগ্রহণ করে। বৈকাল হ্রদের তীরে বড় বড় নলখাগড়ার অন্তরালে ক্ষুদ্র বৃহৎ কত বর্ণের পাখিরা নামে। বৈকাল হ্রদের জলে বড় বড় শ্বেতহংস ভাসিয়া বেড়ায়। মনে হয় তাহারা রূপান্তরিত মানুষ। অত্যাচরিত নিহত মানুষরাই বোধহয় পক্ষীর রূপ ধরিয়াছে। বৈকাল হ্রদের তীরে একবার বাদামি রঙের একটি চমৎকার পাখি দেখিয়াছিলাম। তাহার মুখটা সাদা, পুচ্ছটি নীল। সেই পাখিটার ছবি মনে জাগিল। সে পাখি কি এখনও বৈকাল হ্রদে আসে? আমার রিরি কি সেই পাখির রূপ ধরিয়া বৈকাল হ্রদের উদার পরিবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? সে কি গান গায়? তাহার গানে আমার কথা থাকে? আমার স্মৃতি কী তাহার মন এখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে? আমার গানে এই সব কথাই সুর করিয়া বলিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি হুন?

হ্যাঁ, এক হুন পরিবারেই আমার জন্ম। চিরকাল আমি হুনদের সঙ্গেই আছি। সর্দার মালেক একটি হুন সম্প্রদায়েরই দলপতি।

হুনদের বিশেষত্ব কী?

তিরখন কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, আমাদের প্রধান বিশেষত্ব, আমরা যাযাবর। আমরা কোথাও ঘর বাঁধি না। পথই আমাদের ঘর। সে পথ চিরপরিবর্তনশীল। আমাদের খাদ্যদ্রব্য, আমাদের তাঁবু, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, আমাদের পরিবারবর্গ, আমাদের সৈন্যদল, আমাদের ক্রীতদাসেরা, আমাদের ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, হরিণের দল— সবই চলন্ত। সকলকে লইয়া আমরা পথে পথেই ঘুরিয়া বেড়াই। অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করাই আমাদের জীবনধারণের উপায়। সে জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিতও আমরা যুদ্ধ করি। রোদে পুড়ি, জলে ভিজি, বরফে কাঁপি, কখনও জমিয়া যাই, কখনও মরিয়া যাই। তবু আমরা দমি না, থামি না। বন্য জন্তু শিকার করি আর লুণ্ঠন করি সেই সব মূর্খদের, যাহারা ঘর-বাড়ি বানাইয়া ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া একস্থানে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে।

বলিলাম, আমরা তো সেই দলের—

তোমরাও একদিন হুনদের পাল্লায় পড়িবে। কিন্তু আমাদের সহিত তোমরা যদি বন্ধুত্ব কর

সর্দার তোমাদের রক্ষা করিবেন। হুনদের বন্ধুপ্রীতি অসাধারণ। আমার ঠাকুমার মুখে গল্প শুনিয়াছি। তিনি এ গল্প শুনিয়াছিলেন তাঁহার ঠাকুমার মুখে। চীন সাম্রাজ্যের সহিত হুনদের চিরশত্রুতা। অহি-নকুল সম্পর্ক। চীন সম্রাটরা অধিকাংশই অত্যন্ত বিলাসী। বিলাস মানুষের মনুষ্যত্বে ঘুণ ধরাইয়া দেয়। ক্রমশ তাহারা অপদার্থ কামুক ননীর পুতুল হইয়া পড়ে। তাহাদের এই অপদার্থতার সুযোগ লইয়া হুনরা তাহাদের আক্রমণ করে। চীন সম্রাটরা নিজেদের মধ্যেও মারামারি করে। এক বংশ আর এক বংশকে উচ্ছেদ করিয়া সিংহাসন জবরদখল করিয়া নিজেদেব প্রভুত্ব স্থাপন করে কিছুদিন। আবার তাহাদের মধ্যেও পচ্ ধরে। একবার এক রাজ্যচ্যুত চীনা রাজকুমার চীন-উই হুনদের আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের নিকট গিয়া বলিয়াছিল, আমি কোমল জীবনযাপন করিতে চাই না, তোমাদের মতো কঠোর জীবনযাপন করিতে চাই। তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও। হুনরা যদিও চীনদের শত্রু, তবু ওই রাজকুমারকে তাহারা মারিয়া ফেলে নাই। সাদরে আহ্বান করিয়া নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল—

ঠিক এই সময় গোলমালটা তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিলাম আমাদের সম্মুখ দিয়া কয়েকটি ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে। অশ্বারোহী নাই। তাহার পরে দেখিলাম কয়েকটি অশ্বারোহীও ছুটিয়া চলিয়াছে। তিরখন বলিল, এ তো আমাদেরই সৈন্য। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কী, তোমরা পালাইতেছ কেন?

শিকারার কাছে আমরা হারিয়া গিয়াছি। অগণিত খেখুন সৈন্য আমাদের পিছনে আসিতেছে। না পালাইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। তুমিও পালাও আর দেরি করিও না।

তিরখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দুটি অশ্বারোহীহীন ঘোড়া আমাদের সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, তিরখন দুইটাকেই ধরিয়া ফেলিল। সে যে এত ক্ষিপ্র, তাহা অনুমান করিতে পারি নাই।

তিরখন বলিল, চল পালাই। একটাতে আমি চড়িতেছি আর একটাতে তুমি চড়।

পালাইয়া কোথা যাইবে?

আপাতত চল তোমাদের দেশে যাই।

আমাদের এলাকায় যখন পৌঁছিলাম তখন ভোর হইতেছে। দূর হইতে টুকচুম্বার শিখর দেখিতে পাইলাম। রক্তবর্ণ পুষ্পের সমারোহে সে শিখর যেন বিরাট একটা অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতেছে। একটু ভয় হইল। একজন অপরিচিত হুনকে সঙ্গে আনিয়া অন্যায় করিলাম না তো? কিন্তু তখনই মনে হইল, এই সর্বত্রচারী হুনের গতিরোধ করিবার শক্তি আমার নাই। ইহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেই বরং লাভ আছে। আমার ক্রীতদাসরাও একটু পরে তাঁবু লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল তাহারা। তাহারা ভাবিয়াছিল, আমি যখন মরুপতি সর্দারের কবলে পড়িয়াছি তখন আমার রক্ষা নাই। আমার নিধনবার্তাই তাহারা বহন করিয়া আনিতেছিল। আমাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত এবং পুলকিত হইল তাহারা। কন্টকার সম্বন্ধে কেহ কোনো প্রশ্ন করিল না। আমি যদিও জানিতাম কন্টকা হুন সর্দারের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে তবু তাহার জন্য আমার মনে মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাহিরে সে কষ্ট প্রকাশ করিলাম না।

আমাদের প্রথা অনুসারে আমরা দামামায় ঘা দিলাম। সকলে সমবেত হইলে বলিলাম, আমার সঙ্গে একজন অতিথি আসিয়াছেন। ইঁহার সংবর্ধনা কর। সকলে তিরখনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর গান গাহিতে গাহিতে তাহাকে নদী তীরে লইয়া গেল। সেখানে তাহাকে স্নান করাইল। স্নানের পর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। তাহার পর নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনিয়া সাজাইয়া দিল তাহার সম্মুখে।

আমি দোহার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম। একটু পরেই দোহা প্রচুর দুগ্ধ, নানারকম ফল এবং একটি মৃত হরিণ লইয়া উপস্থিত হইল। হরিণটি সে কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়াছিল। সেটি আমাদের সম্মুখে ফেলিয়া সে আদেশ করিল ইহার সৎকার কর।

মৃত ভালুকের সৎকারের কথা আগেই বলিয়াছি। সেই ভাবেই এই হরিণটিকেও বন্দনা করিয়া আমরা তাহার মাংস টুকরা টুকরা করিয়া আগুনে ঝলসাইতে লাগিলাম। তিরখন নীরবে সব দেখিতেছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, হরিণকে মারিয়া তাহার পর হাতজোড় করিয়া তাহার গুণগান করা আমার নিকট হাস্যকর বোধ হইতেছে। ইহার মধ্যে তোমাদের যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে তাহা অসঙ্গত। হয়ত ইহার মধ্যেই তোমাদের বিনাশের বীজ নিহিত আছে। যাহা আমরা নিজেদের শক্তিবলে জয় করি, তাহার জন্য কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন কী? বাঘ বা ভালুক বা হরিণ যখনই সুযোগ পায় তখনই আমাদের মারিবার চেষ্টা করে। এজন্য তাহারা কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। আমরাই বা হইব কেন?

দোহা বলিল— কারণ আমরা বাঘ, ভালুক বা হরিণ নই, আমরা মানুষ। তাই বাধ্য হইয়া যখন আমরা অন্যায় করি তখন আমাদের দুঃখ হয়।

তিরখন বলিল, যে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তি ও সাহস দিয়াছেন যাহাতে আমরা লুণ্ঠন করিতে পারি। অপরকে না মারিয়া আত্মরক্ষার কোনো উপায় নাই। অপরকে লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি ভগবানই আমাদের মধ্যে দিয়াছেন। সেই প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। ইহার জন্য কুণ্ঠার কোনো প্রয়োজন নাই। যে সবল শক্তিমান সে-ই বাঁচিয়া থাকিবে, অশক্ত দুর্বলের বাঁচিবার অধিকার নাই, বলিয়া তিরখন একটি সুমিষ্ট হাসি হাসিল। তাহার পর বলিল, আমার জীবনে বহুবার আমি বহুভাবে বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু কখনও কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করি নাই। কারণ অপরাধটা যে আমার। আমি দুর্বল। এখন যে সর্দারের ক্রীতদাস আমি, তাঁহার অনুগ্রহের উপরই জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার শক্তি আমার নাই, তাই তাঁহার অবিচার অত্যাচার সব মানিয়া লইয়াছি। কাহারও বিরুদ্ধে কোনো নালিশ আমার নাই। কারণ অপরাধ আমার, আমি দুর্বল। এই যুদ্ধের পরিণাম কী হইবে তাহা জানি না। মরুভূমির ওপারে বিবাট পিরালা রাজ্য আছে। তেমুজিন সে রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইঁহারাও আপনাদের মত কৃষিকর্ম করেন, বাণিজ্য-ব্যবসা করেন। আত্মরক্ষার জন্য ইঁহারা বিশাল সৈন্যবাহিনীও গঠন করিয়াছেন। হিংস্র এবং দুর্ধর্ষ খেখুন সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের মিত্রতা আছে। আমাদের সর্দার মালেক ইঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। অপরের রাজ্য আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়াই হুনদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। পিরালা রাজ্যের রাজা তেমুজিন যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী শিকারা দোর্দণ্ড-প্রতাপশালিনী। তিনি খেখুনদের সাহায্য লইয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদের সৈন্যরা পালাইয়া যাইতেছে দেখিলাম। জানি না যুদ্ধের ফলাফল কী হইবে। আমার অদৃষ্টে কী আছে, তাহাও অনিশ্চিত।

দোহা বলিল, আপনি আমাদের অতিথি হইয়া আসিয়াছেন, আমাদের দলপতি আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন. আপনি যতদিন খুশি আমাদের এখানে থাকুন। আপনি সবল ও দুর্বলের যে সংজ্ঞা ও পরিণতির কথা বলিলেন আমরা তাহার সহিত একমত নই। আমরা মনে করি আজ যে দুর্বল, জন্মান্তরে সে-ই হয়ত সবল হইবে। দুর্বলের প্রতি অযথা অত্যাচার করা তাই আমরা নিরাপদ মনে করি না। যখন বাধ্য হইয়া জীবনধারণের জন্য তাহা করিতে হয়, তখন আমরা তাই অত্যাচারিতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি। করিয়া তৃপ্তি পাই। আপনি নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন, আপনার কোনো অসুবিধা আমরা হইতে দিব না। একজন ক্রীতদাস এবং একজন ক্রীতদাসী সর্বদাই আপনার সঙ্গে থাকিবে। আপনার ইচ্ছামত যে কোনো কাজ আপনি করিতে পারেন। আমাদের এখানে নানা রকম কাজ হয়।

তিরখন অভিবাদন করার ভঙ্গীতে দোহাকে নমস্কার করিয়া কহিল, আপনাদের ভদ্রতায় আমি খুব মুগ্ধ। কিন্তু আপনাদের এই ভদ্রতা আমাকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আমার ধারণা. ভদ্রতা একপ্রকার দুর্বলতা। ভদ্রলোকেরা জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। নির্মম দস্যুদের হস্তে তাহারা বিনষ্ট হইবে। আপনারা সৈন্যবাহিনী গঠন করুন। শক্তিশালী রাজাদের সহিত বন্ধুত্ব করুন। বিষয়-সম্পত্তি করিলেই দস্যু আসিবে, দস্যুদের ঠেকাইতে হইলে সৈন্য চাই। আমরা হুনরা তাই কখনও বিষয়-সম্পত্তি করি না, আমরা যাযাবর, আমাদের সম্পত্তিও যাযাবর। কিন্তু আপনারা যখন যাযাবর হইতে পারিবেন না. তখন আপনাদের সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি আপনাদের হিতৈষী হিসাবেই এ পরামর্শ দিতেছি।

দোহা বলিল, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। কোনো শক্তিশালী রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আপত্তি নাই। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত রাখা যে উচিত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। কিন্তু কীভাবে তাহা সম্ভবপর হইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। সামরিক শিক্ষা দিবার মত লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? আমরা তো এ বিষয়ে অজ্ঞ।

হুনদের ভিতর হইতেই লোক পাওয়া যাইবে। আপনারা যদি যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেন তাহা হইলে আমি লোক জোগাড় করিয়া দিতে পারি। তবে এ কথাও আপনাদের বলিয়া দিতেছি, হুনরা খুব লোভী, খুব অসভ্য, বর্বরতাই তাহাদের স্বভাব। তবে প্রচুর পারিশ্রমিক দিলে তাহারা আপনাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাহাদের বর্বর আচরণ আপনাদের সহ্য করিতে হইবে। তাহারা অত্যন্ত কামুক। হয়ত আপনাদের সমাজের স্ত্রীলোকদের টানাটানি করিবে। এ সব সহ্য করিতে পারিবেন কি? যদি পারেন তাহা হইলে আমি ঘুরঘুট খাঁকে খবর দিই। সে সর্দার মালেকের বিরাগভাজন হইয়া সদলবলে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত সে যোগাযোগ রাখিয়াছে। আমি খবর দিলে সে আপনাদের এখানে আসিবে এবং আপনাদের সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।

ঘুরঘুট খাঁ এখন কোথায় আছেন?

তিনি এক পার্বত্য প্রদেশের জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এখান হইতে দুই দিনের পথ। আপনাদের সম্মতি থাকিলে আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে পারি।

দোহা জিজ্ঞাসা করিল, সর্দার মালেকের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল কেন?

আসল কারণ ভুলেরা। ভুলেরা আসলে ঘুরঘুটেরই পত্নী। সে তাহাকে যখন বিবাহ করিয়া আনিতেছিল তখন সর্দার মালেক তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, ইহাকে আমিই বিবাহ করিব। তুমি অন্য মেয়ে দেখ। জোর করিয়া ভুলেরাকে তিনি বিবাহ করিয়া ভুলেরাকে বলিলেন.

তুমি যদিও আমার কনিষ্ঠা পত্নী হইলে কিন্তু তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠার অধিকার দিলাম। তোমার সম্মানার্থে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিব। যদিও যুদ্ধ চলিতেছিল তবু সর্দার ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই ভোজেই আপনাদের দলপতি টালা উপস্থিত ছিলেন। ইহার কয়েকদিন পূর্বেই ঘুরঘুট দলত্যাগ করিয়াছিল। যাইবার পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছিল, কোথায় সে থাকিবে। আপনারা যদি বলেন অমি তাহার নিকট চলিয়া যাই, তাহাকে লইয়া আসি—

সহসা ভিংড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম সে সর্বাঙ্গে লাল ও কালো রং মাখিয়াছে। তাহার হাতে একটি জীবন্ত বাজপাখি। মাথার সামনে শকুনের মুণ্ডটা বীভৎস দেখাইতেছে।

ভিংড়া বলিল, শুনিতেছি তোমরা বিদেশিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছ। এই বাজপাখি আসিয়া আমাকে খবরটি দিল। বাজপাখি বজ্রের দূত। বজ্রের সহিত আমি বন্ধুত্ব করিয়াছি। বাজপাখির মুখে বজ্রই আমাকে খবরটি পাঠাইয়াছে। আরও বলিয়াছে, তোমরা যদি বিদেশির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা কর, বজ্র তোমাদের দলপতিকে নিধন করিবে। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে তাহার।

এই বলিয়া সে বাজপাখির কানের কাছে বিড় বিড় করিয়া কী বলিতে লাগিল আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর বাজ পাখিটিকে সে ছাড়িয়া দিল। সোঁ করিয়া উড়িয়া গেল পাখিটা।

তিরখন ভিংড়ার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল। ভিংড়ার শেষ কথাগুলি শুনিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, বজ্রের সহিত যদি সত্যই আপনার বন্ধুত্ব হইয়া থাকে তবে তো আপনি পৃথিবীর সম্রাট হইতে পারেন। তাহা না হইয়া আপনি এ রকম অদ্ভুত বেশে প্রায় উলঙ্গ হইয়া সর্বাঙ্গে পাখির নখ পালক ও ঠোঁট ঝুলাইয়া উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কেন বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কে?

দোহা বলিল, উনি আমাদের আত্মীয়। সম্পর্কে আমাদের দলপতির বৈমাত্র ভাই। কিন্তু উনি আমাদের জীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের স্বতন্ত্র একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জগতের সহিত আমাদের জগতের কোনো মিল নাই। উনি মনে করেন নিজের শক্তিবলে উনি প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিবেন। সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, ঝঞ্ঝা, বর্ষা, বন্যা সকলেই উঁহার আজ্ঞা অনুসারে চলিবে। আমরা তাহা সম্ভব মনে করি না। তাই উনি আমাদের সঙ্গে থাকেন না। দূরে একটা পাহাড়ে একাই থাকেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া মন্ত্রোচারণ করেন।

তিরখন বলিল, শুনিয়াছি আমাদের পূর্বপুরুষরা যে দেশে বাস করিতেন সে দেশকে সকলে দানব-দৈত্য, ভূত-প্রেতের দেশ বলিত। সে দেশের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। সে দেশের বিরাট তৃণ-প্রান্তর, সে দেশের প্রকাণ্ড মরুভূমি, সে দেশের প্রচণ্ড শীত-গ্রীষ্ম, সে দেশের প্রবল ঝঞ্ঝা, বস্তুত সে দেশের তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে সে দেশে কোনো মানুষ বাস করিতে পারে, ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। সভ্যদেশ হইতে কোনো মানুষ সে দেশে গেলে আর ফিরিয়া আসিত না। সকলে মনে করিত দৈত্য-দানবরা তাহাদের খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে দেশে কাহারা ছিল জানেন? হুনরা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা। দৈত্য-দানব ভূত-প্রেত নয়। এই হুনদের কোনো অলৌকিক শক্তি ছিল না। তাহাদের সম্বল ছিল তাহাদের ঘোড়া, তাহাদের শাণিত অসি, তাহাদের দুর্জয় সাহস, তাহাদের কষ্ট সহ্য করিবার অসীম ক্ষমতা। প্রতিকূল প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই তাহারা বাঁচিয়া থাকিত, কিন্তু সে যুদ্ধ তাহারা করিত তাহাদের অদম্য চরিত্রবলে, কোনো মন্ত্রের সাহায্যে নয়।

ভিংড়ার মুখে একটা ভ্রূকুটি-কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, অদম্য চরিত্রবলেই প্রকৃতিকে বশ করা যায়। কিন্তু সে অদম্য চরিত্র কেবল ঘোড়া বা তলোয়ার থাকিলেই হয় না। তাহা লাভ করিবার আরও নানা উপায় আছে। আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা সাধারণ লোকের নাগালের বাহিরে। আমি চলিলাম। কিন্তু আমি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া গেলাম, তাহা যেন ভুলিও না।

ভিংড়া চলিয়া গেল। আমি একটু ভয় পাইয়া গেলাম। ভিংড়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ফলিয়াছে। আমি কি সত্যই বিদেশিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছি? আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারি, তাহার ব্যবস্থাই তো করিতেছি আমি। ইহার জন্য বজ্র আমাকে মারিয়া ফেলিবে?

সহসা চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম আকাশে ধূলা উড়াইয়া অনেক অশ্ব আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহীদের চিৎকারে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা আসিয়া পড়িল। দেখিলাম সকলেরই হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা, প্রত্যেকেরই কটিবন্ধ হইতে তরবারি ঝুলিতেছে। প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ সৈন্য। সৈন্যদের পুরোভাগে যে দুইজন ছিল তাহারা ঘোড়া হইতে নামিয়া আমাদের দিকে আগাইয়া আসিল। কাছে আসিতেই কন্টকাকে চিনিতে পারিলাম। চিনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সৈন্যের বেশ পরিয়া এ কাহাদের সঙ্গে কন্টকা আসিয়াছে? কন্টকা বলিল, তোমার জন্য একটি উপহার আনিয়াছি। ঘোড়ার জিনের পিছন দিকে একটি পুঁটুলি বাঁধা ছিল। কন্টকা সেটি আনিয়া আমার হাতে দিল। বলিল, খুলিয়া দেখ।

খুলিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। এ কী, এ যে সর্দার মালেকের মুণ্ড।

কন্টকা হাসিয়া বলিল, আমি স্বহস্তে উহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছি। পাষণ্ডটা যখন আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল তখন কৌশলে আমি উহার কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া উহার গলায় বসাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর বাহির হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলাম, সর্দার মালেকের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে সকলে ভীত হইয়া পড়িল। মালেকের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্তত ছুটিতে লাগিল। তখন শিকারা সুযোগ পাইলেন। সৈন্য লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন সর্দারের সৈন্যদের উপর। শিকারার সহিত আলাপ কর, তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিতেই আসিয়াছেন।

কন্টকার সহিত অপর যে সৈনিকটি ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়াছিল তিনি অভিবাদন করিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন। শিকারাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মুখটাও ঠিক যেন ব্যাঘ্রিনীর মুখ। দেহটাও বেশ লম্বা-চওড়া। স্ত্রীলোক বলিয়া মনেই হয় না। শিকারা আমাকে বলিল, সে আমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য আসিয়াছে। কন্টকার সহিত সে 'সেহলা' পাতাইয়াছে। 'সেহলা'র স্বামী তাহার বন্ধু। কন্টকা সর্দার মালেককে বধ করিয়াছিল বলিয়াই তাহার পক্ষে নাকি যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে। এ জন্য কন্টকার কাছে সে কৃতজ্ঞ। দোহা নিকটেই নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল। শিকারা দোহার বিশাল দেহের দিকে নির্নিমেষে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর প্রশ্ন করিল, উনি কে?

উনি আমাদেরই লোক। উনি আমাদের বিরানি অরণ্যের অধিপতি।

শিকারা দোহাকেও অভিবাদন করিল।

সহসা আবিষ্কার করিলাম তিরখন অন্তর্ধান করিয়াছে। কখন কীভাবে সে অন্তর্ধান করিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। সম্ভবত তাহার ভয় হইয়াছিল শিকারা যদি বুঝিতে পারে সে সর্দার

মালেকের ভৃত্য, তাহা হইলে তাহাকে বন্দী করিবে। আমার সন্দেহ হইল তিরখন হয়ত ঘুরঘুটের সন্ধানে সেই পার্বত্য প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে।

শিকারাকে প্রশ্ন করিলাম, সর্দার মালেকের কনিষ্ঠা পত্নী ভুলেরাকে আপনারা কি বন্দী করিয়াছেন?

তাহাকে আপনি চিনিলেন কিরূপে?

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই। দূর হইতে সর্দার মালেকের সভায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। কন্টকা সর্দার মালেকের একটি ছাগল মারিয়া ফেলিযাছিল বলিয়া আমাদের সে সভায় যাইতে হইয়াছিল। সেই সভাতেই কন্টকার প্রতি সর্দারের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। তাহার পরিণাম যে কী হইয়াছে তাহা আপনার অবিদিত নাই। সেই সভাতেই দেখিয়াছিলাম ভুলেরাকে। পরে শুনিয়াছি, তাহাকে সর্দার নাকি তাহার স্বামী ঘুরঘুট খাঁ-র নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। ঘুরঘুট খাঁ সর্দারের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন। ইহাও শুনিয়াছি এই অপমানের পর ঘুরঘুট খাঁ সদলবলে সর্দারকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাকি ইচ্ছা ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে এ অপমানের প্রতিশোধ দিবেন। তাই কৌতূহল হইতেছে ভুলেরার কী হইল? তাহাকে কি আপনারা বন্দী করিয়াছেন?

শিকারা বলিল, আপনি যে সব খবর দিলেন তাহা সবই সত্য। আমার গুপ্তচরেরাও এই খবর আনিয়াছে। সর্দার মালেকের অনেক পত্নী ছিল, তাহাদের প্রত্যেককে আমি বধ করিয়াছি, কিন্তু ভুলেরাকে করি নাই। আমি ঘুরঘুট খাঁ-র কাছে খবর পাঠাইয়াছি সে যদি আসিয়া আমার দলে যোগ দেয় এবং আমার বাধ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ভুলেরাকে সে ফিরিয়া পাইবে। ভুলেরা এখন বাঁদী হইয়া আমার কাছে আছে।

বলিলাম, ভুলেরা বাঁচিয়া আছে জানিয়া সুখি হইলাম। শিকারার ব্যাঘ্রবদনে একটা কৌতুকের হাসি ঝলমল করিয়া উঠিল। বলিল, ভুলেরা অপূর্ব সুন্দরী। মনে হইতেছে তাহাকে আপনার পছন্দ হইয়াছে। আমার 'সেহলা' যদি আপত্তি না করে তাহা হইলে ওই রূপসীকে আপনার হাতে সমর্পণ করিতে আমার আপত্তি নাই। আপনাদের বন্ধুত্ব আমি কামনা করি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, কন্টকা আপত্তি না করিলেও আমার আপত্তি আছে। কোনো স্ত্রীলোককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি ভোগ করিতে চাই না। তাহাতে কোনো আনন্দ হয় না।

কন্টকা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

দোহা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিকারার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনারা অতিথি। আপনাদের জন্য কোনো আয়োজনই করা হয় নাই এখনও। আমি চলিলাম। আপনাদের সঙ্গে কত লোক আছে?

দুই শত। বেশি ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। আমাদের সঙ্গে খাবারও আছে।

তবু আমাদের খুদ-কুঁড়া যাহা আছে তাহা সসম্ভ্রমে আপনাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত না করিলে আমাদের কর্তব্যচ্যুতি হইবে। টালা তুমি নাচগানের ব্যবস্থা কর। আমি বিরানি হইতে এখনই কিছু দুধ, আটা এবং চাল পাঠাইতেছি।

দোহা চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে শিকারা চাহিয়া রহিল। সে যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল তখন বলিল, ইনি প্রচণ্ড স্বাস্থ্যবান। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য বড় একটা দেখা যায় না। উনি বিবাহ করিয়াছেন?

না। দোহা নারীসঙ্গ বর্জন করিয়া চলে। বিবাহ করে নাই।

আশ্চর্য!

আমি একজন ক্রীতদাসকে আদেশ করিলাম, নাচ-গানের ব্যবস্থা করিতে।

শিকারা আদেশ করিল তাহার সেনাদের অধ্যক্ষকে।

আপনারা ঘোড়া হইতে নামিয়া এখানেই বিশ্রাম করুন। গায়ের পোশাক খুলিবার দরকার নাই। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সর্দার মালেকের আস্তানা জুনজিরায় যাইব।

আমাদের গায়ক-গায়িকাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর একটু পরেই দূরে শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই নানা সাজে সাজিয়া নানা বয়সের ছেলেমেয়েরা নৃত্য-গীতে মাতিয়া উঠিল। শিকারাও তাহাদের সহিত যোগ দিল। কন্টকাও চুপ করিয়া রহিল না। সে নানারকম নাচ জানিত, তাহাই একে একে দেখাইতে লাগিল। শিকারার সৈন্যদল টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া করতালি দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিল কন্টকাকে। মনে হইতেছিল তাহারা সকলে কন্টকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। ... একটু পরেই দোহার অনুচরবৃন্দ প্রচুর খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। একটু দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুন কাটাইয়া দোহা বড় বড় ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দিল। রম্ভা, জিকট, কিংকা, রুলকি এবং তাহাদের সঙ্গিনীরা লাগিয়া গেল রুটি প্রস্তুত করিতে। হাত দিয়া চাপড়াইয়া মোটা মোটা রুটি করিতে লাগিল তাহারা।

শিকারা বলিল, আমাদের সঙ্গে শুকনো মাংস আছে। শুকনো ফলও আছে। সুতরাং আর কিছু করিবার দরকার নাই।

দোহা কিন্তু ইহাতে সম্মত হইল না।

বলিল, আপনাদের প্রত্যেককে একবাটি করিয়া দুধ খাইতে হইবে। তাছাড়া বিরানি জঙ্গলে একপ্রকার কন্দ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। সেই কন্দ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কাঁচালঙ্কা মাখিয়া দিলে উত্তম ব্যঞ্জন হয়। তাহাও আপনাদের খাইতে হইবে।

শিকারা মুগ্ধদৃষ্টিতে দোহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে বলিল, আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। যাহা বলিলেন তাহাই করিব—

আহারাদির পর শিকারা বলিল, আমরা এখনই জুনজিরার উদ্দেশে যাত্রা করি।

জুনজিরা কোথা? সেখানে কেন যাইতেছেন? একটু বিশ্রাম করুন না।

আমার কথায় শিকারা হাসিয়া উঠিল।

বিশ্রাম? বিশ্রাম করিবার সময় কই। এখন বিশ্রাম করিতে গেলে জুনজিরা হাতছাড়া হইয়া যাইবে। ঘুরঘুট খাঁ জুনজিরার খবর জানে। জানি না সে এতক্ষণ সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে কিনা!

জুনজিরা কোথায়?

এখান হইতে সোজা উত্তরে মরুভূমির ওপারে যে পর্বতশ্রেণী আছে, তাহারই নাম জুনজিরা। গুপ্তচর খবর আনিয়াছে ওই জুনজিরা পর্বতের গুহায় গুহায় সর্দার মালেকের লুণ্ঠিত প্রচুর ধনরত্ন নাকি স্তূপীকৃত হইয়া আছে। গুপ্তচর আমাদের সেখানে লইয়া যাইবে। সর্দার মালেককে যখন পরাজিত করিয়াছি তখন তাহার ধনরত্ন আমি অধিকার করিব। সে ধনরত্ন যদি পাই তাহা হইলে এই অঞ্চলের সমস্ত, যতদূর দৃষ্টি চলে সমস্ত, আমি বিরাট এক রাজ্যে পরিণত করিব। তোমরা সে রাজ্যের অংশীদার হইবে, বন্ধু হইবে। এখন আমাদের যাইতে দাও। শিকারা সদলবলে চলিয়া গেল। অশ্বক্ষুরের শব্দে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দোহা আর আমি সবিস্ময়ে তাহাদের প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

দোহা বলিল, আমাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসন্ন। আরও ঘোড়া সংগ্রহ করি। আমাদেরও একটা সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিরখন সাহায্য করিবে বলিয়াছিল। সে কোথায় গেল?

সে অন্তর্ধান করিয়াছে। সম্ভবত শিকারার ভয়েই করিয়াছে। তবু মনে হয় সে কোনো সময়ে ফিরিয়া আসিবে। লোকটি ভালো। শিকারা মেয়েটিকে তোমার কেমন মনে হয়?

প্রথম দৃষ্টিতে ভালো মনে হয় নাই। পরে কী রকম লাগিবে জানি না। প্রথম পরিচয়ে সবটা বোঝা যায় না।

কয়েকদিন বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়া গেল। সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া শিকারার আগমন অনেকেরই মনেই একটা ত্রাসের সঞ্চার করিল। দুঃসাহসী কন্টকাও একদিন আমাকে বলিল, শিকারার সহিত বন্ধুত্ব করিলে হয়ত আমরা নিরাপদে থাকিব, কারণ তাহার অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবল প্রচুর। কিন্তু আমার সন্দেহ শিকারার সহিত তোমরা বন্ধুত্ব রাখিতে পারিবে কি না—

তোমার এ সন্দেহ কেন?

কন্টকা মুচকি হাসিয়া বলিল, তাহার রোজ একটি করিয়া নতুন পুরুষ চাই। তাহার স্বামী তেমুজিন পাহাড়ের মতো জোয়ান ছিল একজন। তবু শিকারার গোপন অনেক প্রণয়ী ছিল শুনিলাম। তোমরা কি তাহার চাহিদা মিটাইতে পারিবে?

কোনো পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় তাহার নিকট যায় আমরা আপত্তিই বা করিব কেন?

শিকারা যদি এখানে তাহার অধিপত্য বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে সে যাহা চাহিবে তাহাই করিতে হইবে। স্বেচ্ছার বা অনিচ্ছার কোনো প্রশ্নই থাকিবে না তখন। কামোন্মাদিনী শিকারা ব্যাঘ্রিনীর মতো ভয়ঙ্করী। তাহার সে মূর্তি আমি দেখিয়াছি, তাই সাবধান করিয়া দিতেছি—

তুমি এত কথা জানিলে কিরূপে?

আমি যে কয়েকদিন উহার সঙ্গে ছিলাম। আমাকে সে নিষ্কৃতি দেয় নাই। হঠাৎ একদিন রাত্রে একটা জোয়ানকে আমার তাঁবুতে ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, এ লোকটা তোমাকে দেখিয়া ক্ষেপিয়াছে, ইহার মনোরঞ্জন কর। লোকটা আমাদের সেনাপতি—

তুমি কী করলে—

সব কথা খুঁটাইয়া নাই বা শুনিলে!

কন্টকা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

তাহার পর বলিল, বোরিলার সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?

না

বোরিলা জাল পাতিয়া অনেক হাঁস ধরিয়াছিল। নানারকমের হাঁস। সে হাঁসগুলিকে লইয়া আসিতেছিল, পথে ভিংড়ার সহিত তাহার দেখা হয়। ভিংড়া তাহার নিকট হইতে হাঁসগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। বোরিলার জালটাও কাড়িয়া লইয়াছে সে। অনেকদিন ধরিয়া বেচারি জালটি বুনিয়াছিল।

শুনিয়া বড় রাগ হইল। বোরিলার নৈপুণ্যের জন্যই আমরা মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের মাংস খাইতে পারিতাম।

বোরিলা কোনো দেশের মেয়ে তাহা জানি না। কিন্তু জাল পাতিয়া হাঁস ধরিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহার। সে জালে আঠা লাগাইয়া মাঠে বিছাইয়া দেয়। আঠা-লাগানো জালের

উপর ঘাস-পাতা-খড় কুটা দিয়া তৈরি একটা মেকি হাঁস স্থাপন করে এবং পাশের ঝোপ হইতে হাঁসের ডাক ডাকে। আকাশচারী হাঁসেরা মনে করে তাহাদের কোনো সঙ্গী বুঝি মাঠে নামিয়াছে। তাহারাও দলে দলে নামিয়া পড়ে এবং জালের আঠায় আটকাইয়া পড়ে। তখন বোরিলা তাড়াতাড়ি জালটা গুটাইয়া জালের ভিতরই তাহাদের বন্দী করিয়া ফেলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বোরিলা কোথায়?

সে ভিংড়ার ভয়ে লুকাইয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ কাল আমার সহিত দেখা হয়। সে আমাকে দেখিয়াই একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিতেই কিন্তু সে বাহির হইয়া আসিল এবং ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, ভিংড়া তাহাকেও জোর করিয়া লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে হাত ছিনাইয়া পালাইয়া আসিয়াছে। তাহার ভয় ভিংড়া তাহাকে একদিন ধরিবেই এবং ধরিয়া নির্মমভাবে চাবকাইবে। তোমরা উহাকে রক্ষা না কর, ও একদিন হয়ত এ দেশ ছাড়িয়াই চলিয়া যাইবে। এখানে ও ছাড়া আর তো কেহ হাঁস ধরিতে পারে না। ও চলিয়া গেলে হাঁসের সুন্দর মাংস আর আমাদের ভাগ্যে জুটিবে না। বড় ভাল লাগে হাঁসের মাংস।

উহার নিকট হইতে হাঁস ধরিবার কৌশলটা শিখিয়া লও।

মন্মন জাল প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু যে আঠাটা বোরিলা জালে লাগায় সে আঠা যে যে জিনিস দিয়া প্রস্তুত করে, তাহা কাহাকেও শিখায় না বোরিলা। বলে ও আঠা মন্ত্রপূত। যবদ্বীপের এক ডাইনির নিকট সে উহা শিখিয়াছিল। সেই ডাইনির অনুমতি না পাইলে সে উহা কাহাকেও শিখাইতে পারিবে না। শিখাইলে ডাইনির অভিশাপে উহাকে বোবা হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমি মন্মনকে বলিয়াছি সে গোপনে গোপনে লক্ষ্য রাখুক কিভাবে আঠা প্রস্তুত করে বোরিলা। সে লক্ষ্য রাখিতেছে। কিন্তু তবু দলপতি হিসাবে তোমার বোরিলাকে রক্ষা করা কর্তব্য। ভিংড়া তাহার নিকট হইতে হাঁস কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, ইহার একটা প্রতিবাদ না করিলে অন্যায় হইবে। তুমি দোহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিছু একটা কর।

কন্টকার কথাটা সঙ্গত মনে হইল। কিন্তু এ কথাটাও মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিলাম না যে, আমিও ভিংড়াকে মনে মনে ভয় করি। তাহা দৈবশক্তিকে অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিব, এতটা মনের জোর তখন আমাদের ছিল না। নানাবিধ অলৌকিক এবং অযৌক্তিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়াই তখন আমাদের মন আবর্তিত হইত। অনেক অযৌক্তিক অলীক ব্যাপারকেই তখন আমরা ধর্ম বলিয়া মনে করিতাম। সুতরাং ভিংড়াকে বেশি ঘাঁটানোটা সুযুক্তি মনে হইল না।

কন্টকা দেখিলাম আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বলিলাম, তোমাকে যদি ভিংড়ার নিকট দূত করিয়া পাঠাই, তুমি যাইতে রাজি আছ?

দলপতি হিসাবে যদি আদেশ কর নিশ্চয় যাইব। কিন্তু স্বামী হিসাবে যদি বল, তাহা হইলে বলিব ওই পিশাচের কাছে আমার যাইবার ইচ্ছা নাই। ওই সাপটার কাছে গেলেই সে আমাকে জাপটাইয়া ধরিবে। ছোবল দিবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে রক্ষকরূপে যাও, আমি নিশ্চয়ই যাইব। কিন্তু আমার পরামর্শ, অবিলম্বে দোহার সহিত দেখা কর। সে যাহা বলিবে তাহা করাই সমীচীন।

দোহার নিকটেই অবশেষে গেলাম।

গিয়া দেখিলাম বিরানির সংলগ্ন যে বিরাট প্রান্তরটি ছিল, দোহা সেখানে বহু লোকজন লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। অনেক বড় বড় গাছের ডাল কাটিয়া একস্থানে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। বড় গড় গাছের গুঁড়িও কয়েকটা রহিয়াছে দেখিলাম।

দোহা আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ-সব কী করিতেছ?

এই মাঠটাকে উঁচু বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিব। এখানে আমাদের ঘোড়ারা থাকিবে। বিদেশের বাজারে লোক পাঠাও। তাহারা ঘোড়া কিনিয়া আনুক। ঘোড়া আমাদের পুষিতেই হইবে। কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি।

কী রকম?

দেখিলাম যেন আমার মা বিষকুম্ভা একটা বিরাট ঘোড়ার উপর চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক অশ্বারোহী। মা যেন তাহাদের এই স্থানটা দেখাইয়া বলিতেছেন, তোমরা সবাই এখানে থাকিবে। আমার ছেলে দোহা তোমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। এ কথা শুনিয়া ঘোড়ারা সমস্বরে হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। আমার যখন ঘুম ভাঙিল তখনও মনে হইল যেন বহু অশ্বের হ্রেষাধ্বনি অন্ধকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল, আমার মা বিষকুম্ভা যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে একটা নীরব অনুরোধ যেন আমার অন্তরে আসিয়া পৌঁছিল। সে অনুরোধ, তুমি ঘোড়াকে অবহেলা করিও না। অশ্বপালন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের মূর্তি মিলাইয়া গেল। সকালে উঠিয়াই তাই এ স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিব ঠিক করিলাম। তুমি আবিদ ও শরিফকে খবর দাও। তাহারা ঘোড়ার বিষয়ে অনেক কিছু জানে। তাহাদেব উপদেশ অনুসারে আমরা চলিব।

বেশ, তাহাই হইবে। আমি কিন্তু ভিংড়ার ব্যাপারে তোমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। ভিংড়ার আচরণ ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম।

সব শুনিয়া দোহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, ভিংড়ার আচরণ যদি মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে শাসন করিতে হইবে। তুমি কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক পাঠাইয়া তাহার নিকট হইতে হাঁসগুলি কাড়িয়া আন। বোরিলা যে হাঁস ধরিয়াছে তাহা কাড়িয়া লইবার কোনো অধিকার ভিংড়ার নাই। বোরিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যদি তাহার উপর বলাৎকার করে তাহা হইলে আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়া তাহার প্রতিবাদ কবিব এ কথা তাহাকে বলিয়া পাঠাও।

বলিলাম সে যদি তাহার দৈবীশক্তি দিয়া আমাদেব শক্তিকে প্রতিহত করে কিংবা যদি আমাদের উপর প্রতিশোধ লয় তখন আমরা কী করিব সেটাও ভাবিয়া দেখ—

ভিংড়া যে দৈবীশক্তি লইয়া আস্ফালন করে, যে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করিয়া সে সকলকে ভয় দেখায়, তাহার মর্ম আমরা বুঝি না, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানও আমাদের নাই। আমরা দেবতাকে বিশ্বাস করি। সেই সর্বশক্তিমান যে সর্বত্র আছেন একথাও আমরা মানি কিন্তু তিনি যে আমার, তোমার, বা ভিংড়ার আদেশে চলিবেন--- এ কথা বিশ্বাস করি না। ভিংড়া করে। করুক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের সে যদি অনিষ্ট করিতে চায়, আমাদের সামাজিক নিয়ম যদি সে লঙ্ঘন করে, আমরা তাহা সহ্য করিব না। আমরা যে শক্তিতে বিশ্বাস করি সেই শক্তি

দিয়াই আমরা তাহাকে বাধা দিব, প্রয়োজন হইলে তাহাকে উৎখাত করিব। এ কথা তাহাকে জানাইয়া দাও। জন কয়েক বলিষ্ঠ লোক লইয়া তুমি নিজে গেলেই ভাল হয়। সে যদি তোমার কথা না শুনিতে চায়, কিংবা মারমুখী হইয়া তোমাকে তাড়া করিয়া আসে, তুমি সদলবলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া আমাদের এলাকা হইতে তাড়াইয়া দাও। আমাদের এলাকার বাহিরে গিয়া সে যাহা ইচ্ছা করুক, আমাদের এলাকায় তাহাকে থাকিতে দিব না।

দোহার চোখ-মুখে একটা ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলাম, তুমিও ভাই আমার সঙ্গে চল না—

তুমি আমাদের দলপতি, ভিংড়া তোমার ভাই, তোমারই প্রথমে যাওয়া উচিত। তুমি যদি কিছু না করিতে পার তখন আমি তো আছিই। তুমি সশস্ত্রে স-সৈন্যে ভিংড়ার বিরুদ্ধে যাও, তাহার পর দেখা যাক কী হয়।

আমার কিন্তু ভয় করিতেছিল। কিন্তু সে কথা দোহাকে বলিতে পারিলাম না। দৈহিক বলপ্রয়োগ করিয়া অবশ্যই আমি ভিংড়াকে কাবু করিতে পারিব। কিন্তু তাহার দৈবীশক্তি? কখন যে সাপ হইয়া কামড়াইবে, বজ্র হইয়া মাথায় পড়িবে, বিষ হইয়া কন্টকার মুখে মৃত্যুকে লেলাইয়া দিবে, তাহার তো স্থিরতা নাই।

... তবু গেলাম।

আমর সশস্ত্র সহচরদের লইয়া ভিংড়া যে পাহাড়ের গুহায় থাকিত সেই পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। পাহাড়ে ওঠার একাধিক রাস্তা ছিল। যে গুহায় ভিংড়া থাকিত, একটা রাস্তা সেই গুহার পিছনে গিয়া শেষ হইয়াছে। আমি সেই রাস্তা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। আমার হাতে বড় একটা ছোরা ছিল। সহচরদের বলিলাম, তোমরা ভিন্নপথে পাহাড়ে ওঠ। সকলেই গুহার নিকটে গিয়া সমবেত হও। আমি ভিংড়ার সহিত প্রথমে আলাপ করিব। সে যদি রূঢ় আচরণ করে, তাহা হইলে তোমাদের ডাকিব।

আমি গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়ঙ্কর।

ভিংড়া গুহার সামনে হাঁসগুলির পায়ে ও ডানায় দড়ি জড়াইয়া তাহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে। দেখিলাম সে একটা হাঁসের গলা কাটিয়া তাহার রক্ত আর একটা হাঁসকে জোর করিয়া পান করাইতেছে। পায়ে চাপিয়া ধরিয়া বাঁ-হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সহায়তায় সে জোর করিয়া একটা জীবন্ত হাঁসের ঠোঁট দুইটা ফাঁক করিয়া ছিন্নমুণ্ড হাঁসের রক্তাক্ত কবন্ধটা তাহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া চীৎকার করিতেছে, পি পি পি পি। তাহার গলার শির ফুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ।

আমি ধমক দিয়া উঠিলাম, তুমি এ কী করিতেছ! ভিংড়া তড়াক করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বসিল। রক্তাক্ত হাঁসটা ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু উড়িয়া পলাইতে পারিল না, কারণ তাহার পা ও ডানা দুই-ই বাঁধা ছিল।

ভিংড়া আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার পর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

আমি কী করিতেছি, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি তোমার নাই। তুমি লাঙল চষিয়া গম ফলাইতে পার, তাহাই কর গিয়া। এখানে আসিয়াছ কেন?

তোমার পাগলামির প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি। তুমি বোরিন্দার হাঁস কাড়িয়া আনিয়াছ কেন? তাহার জালটা কাড়িয়া আনিয়াছ। সেটা কোথায়?

ভিংড়া তর্জনী তুলিয়া দেখাইয়া দিল, ওই দেখ। দেখিলাম নিকটস্থ পর্বতশৃঙ্গ দুইটিতে যে বড় বড় গাছ ছিল তাহাতে জালটা টান করিয়া টাঙানো আছে। জালের ভিতর দিয়া অকাশ দেখা যাইতেছে। আমি বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া ভিংড়া আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

বলিল, তোমার মাথায় ঢুকিবে না কেন ওই জাল টাঙাইয়াছি—

বলিয়াই দেখ না, বুঝিতে পারি কি না।

ভিংড়া হাসিয়া বলিল, বেশ, তবে শোন। তোমাদের বোরিলা মন্ত্রপূত আঠা জালে মাখাইয়া হাঁস ধরিয়াছে ইহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। আমি ওই জালে আরও কিছু মন্ত্র পড়িয়া আকাশে টাঙাইয়া দিয়াছি, আর একরকম হাঁস ধরিব বলিয়া।

কিরকম হাঁস?

তাহাদের তোমরা দেবতা বলিয়া পূজা কর। কিন্তু আমি জানি উহারা দেবতা নয়, হাঁস। হাঁসের মত উহারাও আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। খানিকটা হাঁস বটে, কিন্তু খুব শক্তিমান হাঁস। ধরিতে পারিলে তাহাদের শক্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিব। তাহার পর আবার তাহারা শক্তি সংগ্রহ করিয়া যখন আসিবে, তখন আবার তাহাদের ধরিব। ধরা পড়িলেই মুক্তির মূল্যস্বরূপ তাহাদের খানিকটা শক্তি তাহারা আমাকে দিবে। না দিলে ছাড়িবই না।

আবার ভিংড়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কি রকম হাঁস তাহা তো বলিলে না—

তোমরা যাহাকে চন্দ্র সূর্য বল আসলে তাহারা হাঁস। নক্ষত্ররাও হাঁস, কিন্তু তাহারা অনেক দূরে ওড়ে। এ জালে হয়ত ধরা পড়িবে না। চন্দ্র সূর্য কিন্তু ধরা পড়িবে। কাল সূর্যকে ধরিয়াছিলাম, খানিকটা শক্তি সে আমাকে দিয়াছে। চাঁদ এখন ছোট, নিজেই দুর্বল। যে দিন সূর্যের মত বড় হইবে, সেদিন তাহাকেও ধরিব—

ভিংড়া উঠিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল সে যেন স্পর্ধা করিয়া আমাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিতেছে।

বলিলাম, বোরিলার হাঁস এবং জাল তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। তুমি যদি জাল ফেলিয়া আকাশের সূর্য চন্দ্র ধরিতে চাও তাহা হইলে সে জাল নিজেই প্রস্তুত কর। আর এই হাঁসগুলিকে লইয়া কী করিতেছ?

একটা হাঁসের রক্ত আর একটা হাঁসকে খাওয়াইতেছি। তাহার পর সে হাঁসের রক্ত আর একটা হাঁসকে খাওয়াইব। এইভাবে রক্ত খাওয়াইতে খাওয়াইতে যে শেষ হাঁসটি থাকিবে, সে হাঁসটি আমি খাইব। সমস্ত হাঁসের শক্তি তখন আমার মধ্যে আসিবে। তখন আমিও আকাশে উড়িতে পারিব।

ভিংড়া দুই হাত আকাশে তুলিয়া এমন একটা ভঙ্গি করিল যে সে এখনই আকাশে উড়িয়া যাইবে। বলিলাম, নিজে হাঁস ধরিয়া তুমি সে শক্তি সংগ্রহ কর। বোরিলার হাঁস বোরিলাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

দিব না। আমার বেশি জোর আছে আমি তাহার হাঁস কাড়িয়া আনিয়াছি। দিব কেন?

বলিলাম, কিন্তু ইহা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তোমার চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশি। আমি তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব।

কাড়িয়া লইবে?

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ভিংড়া উন্মত্তের মত আমার উপর লাফাইয়া পড়িল। আমরা হাতের ছোরাটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। ভিংড়ার মুখে যত প্রকোপ গায়ে তত শক্তি নাই। তাহাকে সহজেই চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলাম আমি। তাহার পর আমার অনুচরদের ডাকিলাম। ভিংড়াকে তাহারা বন্দী করিয়া ফেলিল। হাঁসগুলিকে লইয়া দুইটি লোক বোরিলার নিকট চলিয়া গেল। বোরিলার জালটাও গাছ হইতে খুলিয়া লইয়া গেল তাহারা।

বন্দী ভিংড়াকে টানিতে টানিতে আমরা দোহার নিকট উপস্থিত হইলাম। ভিংড়ার হাত-পা বাঁধিয়া সমস্ত রাস্তাটা তাহাকে ছ্যাঁচড়াইয়া ছ্যাঁচড়াইয়া আনিতে হইয়াছিল তাই তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। দোহার 'ফানডি'তে পাথরের বড় বড় চাঙড় দিয়া প্রস্তুত একটি বড় ঘর ছিল। দোহা সেই ঘরে ভিংড়াকে বন্দী করিয়া রাখিল।

তাহার পরদিনই তিরখন ঘুরঘুট খাঁকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহারা যে ঘোড়া দুইটির পিঠে চড়িয়া আসিয়াছিল তাহাদের দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঘুরঘুট খাঁ-এর চেহারাটাও দেখিবার মতো। কপালের উপর প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্ন। ঘনকৃষ্ণ গুচ্ছ গুচ্ছ শ্মশ্রু-গুম্ফে সমস্ত মুখ সমাচ্ছন্ন। চক্ষু দুইটি আকর্ণবিস্তৃত, দৃষ্টি নির্ভীক। বলিষ্ঠ স্কন্ধ, বলিষ্ঠ বাহু, বিস্তৃত বক্ষ, চওড়া পিঠ। বৃকোদর, ক্ষীণকটি। পা দুইটি লোহস্তম্ভের মতো। কথায় কথায় অট্টহাস্য করে। তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াও বিস্মিত হইয়া গেলাম আমরা। চামড়ার পোশাক। কিন্তু সে পোশাকে মখমল এবং উজ্জ্বল ধাতুর সমাবেশে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখি নাই। ঘুরঘুট খাঁকে দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়া গেলাম। ঘুরঘুট খাঁ যেদিন আসিল সেদিন আমরা ভিংড়ার সম্বন্ধে কী করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য টুকচুম্বার নিচে সমবেত হইয়াছিলাম। দোহা বলিয়াছিল, সকলে একসঙ্গে বসিয়া এ বিষয়ে মীমাংসা করা উচিত এবং সকলের অভিমত শুনিয়া আমরা স্থির করিব ভিংড়ার এই অত্যাচার আমরা সহ্য করিব, না, তাহাকে আমাদের এলাকা হইয়া দূর করিয়া দিব। কন্টকা বলিয়াছিল উহাকে মারিয়া ফেলা হোক, আপদের শেষ হইয়া যাক। দোহা কিন্তু তাহাকে হত্যা করিতে চায় না। অনেকের মত, তাহাকে নির্বাসিত করিলে দূর হইতেও সে আমাদের অনিষ্ট করিবে। উহার জাদু, উহার মন্ত্রতন্ত্র বড় ভয়ঙ্কর। উহাকে বিনাশ করিয়া ফেলাই উচিত। দোহা কিন্তু বলিতেছে উহাকে মারিয়া ফেলিলে ও আরও ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িবে।

কারণ, আমার মতে মৃত্যুই মানুষের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষ শুধু যে বাঁচিয়া থাকে তাহা নয়, বেশি শক্তিশালী হয়। এই জন্যই আমরা পূর্বপুরুষদের আত্মাকে প্রীত রাখিবার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করি। যে সব জানোয়ারকে আমরা হত্যা করিতে বাধ্য হই তাহাদেরও আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করি আমরা। পৃথিবীতে কেহই মরে না। সুতরাং ভিংড়াকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা হাস্যকর হইবে। এই সব আলোচনা হইতেছিল এমন সময় তিরখন ও ঘুরঘুট খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়লাম।

এ কিসের জমায়েত?

আমাদের ভাষাতেই প্রশ্ন করিলেন ঘুরঘুট খাঁ। প্রশ্ন করিয়া তিনি ও তিরখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। আমাদের দুইজন ক্রীতদাস অশ্ব দুইটির লাগাম ধরিতে যাইতেছিল। ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন, কিছু করিতে হইবে না। ধরিবার দরকার নাই। উহারা এমনই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কোথাও পালাইয়া যাইবে না।

ঘোড়া দুইটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিরখন পরিচয় করাইয়া দিল. ইনিই ঘুরঘুট খাঁ। আপনাদের নিমন্ত্রণে এখানে আসিয়াছেন। আপনারা যদি ইঁহার শিক্ষায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিতে চান, ইনি আপনাদের সাহায্য করিবেন। কী শর্তে করিবেন তাহা আপনারা আলোচনা করুন। আমাকে এখানে কোথাও যদি একটু স্থান দেন, আমি বাঁশি বাজাইব, গান গাহিব, প্রয়োজন হইলে তূর্যধ্বনিও করিব। একটা ফাঁকা জায়গা আর কিছু খাবার পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিব আমি। কোনো পাহাড়ের উপর আমার যদি স্থান করিয়া দেন, আরও খুশি হইব। প্রকৃতির বিরাট বিস্তার চোখের সম্মুখে না থাকিলে আমি স্বস্তি পাই না। আপনারা যদি আমাকে না রাখিতে চান, আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব। এখানে এত জনতা কেন?

দোহা এবং আমি অগ্রসর হইয়া ঘুরঘুট খাঁকে অভিবাদন করিলাম।

দোহা বলিল, আমাদের সম্প্রদায়ের একটি লোক উন্মাদ হইয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে। তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে। এখন তাহাকে লইয়া কী করিব সেই আলোচনা সকলে মিলিয়া করিতেছি।

ঘুরঘুট খাঁ হাসিয়া বলিলেন, সকলে মিলিয়া? সকলে মিলিয়া কলহ হয়, নানা লোক নানা মত প্রকাশ করে, কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আপনাদের যিনি দলপতি তিনিই স্থির করুন কী করিবেন। তাঁহার হুকুমই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। আমার সমর কৌশলের ইহাই মেরুদণ্ড, নির্বিচারে সেনাপতির আদেশ পালন করিতে হয়। আপনাদের এই লোকটি কী ধরনের উন্মাদ?

দোহা ভিংড়ার অদ্ভুত চরিত্রের কথা বিশদ করিয়া বর্ণনা করিল। শেষে বলিল, মুশকিল হইয়াছে ভিংড়া আমাদের জনপদবাসী অনেকের উপর অত্যাচার করিতেছে। মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। বোরিলা নামে একটি মেয়ে হাঁস ধরিত, সেদিন সে তাহার সব হাঁসগুলি কাড়িয়া লইয়াছে। হাঁস ধরিবার জালটাও লইয়া গিয়াছে। বলিতেছে ওই জাল দিয়া আকাশের সূর্য চন্দ্র ধরিবে।

ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন, উহার কি সত্যই কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে? যদি থাকে উহাকে সেই ক্ষমতার অনুপাতে সম্মান করা উচিত।

দোহা বলিল, ভিংড়া বলে সে বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, অগ্নি, বন্যা, পশু, পক্ষী সকলকে বশ করিতে পারে। আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করি না। এসব বলিয়া ও শুধু লোকের মনে ভয় সঞ্চার করে।

ঘুবঘুট খাঁ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলেন, খুব ছেলেবেলায় আমার বাবার মায়ের মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি আবার সেটা শুনিয়াছিলেন তাঁহার দিদিমার মুখে। আমরা হুন। আমাদের কোথাও ঘর-বাড়ি নাই। ঘোড়ার পিঠেই আমাদের বাড়ি। চলন্ত জানোয়াররাই আমাদের সম্পত্তি। আমাদের সমস্ত পরিবারও থাকে চলন্ত তাঁবুর ভিতরে। সে তাঁবুর নাম আমাদের ভাষায় 'ইয়ুর্ত'। বিরাট চুনকাম করা ছবি আঁকা তাঁবু, বিরাট বাঁশের গাড়ির উপর অবস্থিত। দশ-বারোটি গরু সেই 'ইয়ুর্তের' সঙ্গে চলে, চাকার ধুরির সঙ্গে বাঁশ বাঁধিয়া 'ইয়ুর্ত'গুলি সংযুক্ত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ইয়ুর্তেই জন্মলাভ করিয়াছেন, ইয়ুর্তেই মানুষ হইয়াছেন। পুরুষদের কাজ ছিল ঘোড়ায় চড়িয়া লুণ্ঠন করা। মাঙ্গেলিয়ার ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে তাঁহারা দানবের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সুবিদা পাইলেই তাঁহারা চীন সাম্রাজ্যের জনপদ

লুণ্ঠন করিতেন। বস্তুত সেই প্রাচীন যুগে চীনাদের সহিত আমাদের প্রায়ই সঙ্ঘর্ষ হইত। তাহা নিদারুণ সঙ্ঘর্ষ। শান্তিপ্রিয় চীন সম্রাটরা আমাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। আমরা তাঁহাদের সাম্রাজ্য যথেচ্ছ লুটপাট করিয়া সরিয়া পড়িতাম। সম্রাটের সৈন্যেরা আমাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পরিত না। কারণ তাহারা ছিল বিলাসী। একবার কিন্তু আমাদের বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এই গল্পটাই আমার বাবার মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। তখন চীন দেশের রাজা ছিলেন হোয়াংটি। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর। আকৃতিও ছিল ভয়ানক। মুখ ছিল পাথরের মতো, আমাদের মতো গোঁফ-দাড়ি ছিল না তাঁহাদের। তাঁহারা গোঁফ-দাড়ি গজাইতে দিতেন না। বাল্যকাল হইতে অস্ত্র দিয়া তাঁহারা মুখের চামড়া ছুলিয়া ফেলিতেন। কোনোও চুল গজাইত না। ক্ষিপ্র অশ্বারোহী ছিলেন তাঁহারা। সর্বদা ঘোড়ার পিঠেই থাকিতেন। ঘোড়ার জিনের তলায় তাঁহাদের উরুর নিম্নে থাকিত কাঁচা মাংস। তাহাই আহার ছিল তাঁহাদের। আর যখন সুবিধা পাইতেন 'কুমিস' খাইতেন। চামড়ার থলিতে তাঁহারা দুধ রাখিতেন, সেই দুধ পচিয়া গাঁজিয়া কুমিসে পরিণত হইত। তাহাই তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তাঁহারা একবার হোয়াং-টির রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হোয়াংটির মাহিনা করা মোটা মোটা সৈন্যরা দলে দলে আসিল, কিন্তু আমাদের মারের চোটে ছত্রভঙ্গ। হইয়া গেল। বিরাট হুনবাহিনী চীন রাজ্যের অনেকটা দখল করিয়া যখন রাজধানীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে তখন হোয়াংটি বুঝিতে পারিলেন যে সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র বা সেনাসামন্ত দিয়া দুর্ধর্ষ হুনদের গতিরোধ করা যাইবে না। তাঁহার একটি ছোট লাল রঙের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। সেই গাড়ি চড়িয়া তিনি বনের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রকাণ্ড একটি অরণ্য ছিল সেকালে। ছোট লাল রঙের গাড়ি চড়িয়া তিনি সেই অরণ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি যখন তাঁহার ছোট লাল গাড়ি চড়িয়া অরণ্য হইতে বাহির হইলেন তখন দেখা গেল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহ, বাঘ, চিতা, হাতি, নেকড়ে, হায়না, শৃগাল চিৎকার করিতে করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, বড় বড় বিষাক্ত সাপও ফণা তুলিয়া আসিতেছে তাঁহার সঙ্গে। আকাশ জুড়িয়া অনেক বাজ, চিল, শকুনি, এমন কি ঈগল পাখিও উড়িয়া আসিতেছে দলে দলে। এই অদ্ভুত বন্য বাহিনীর সম্মুখে হুনরা দাঁড়াইতে পারিল না। অনেকে মারা গেল, পালাইয়া গেল অনেকে। হোয়াংটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি শুধু যে বন্য জন্তুদের অনায়াসে বশ করিতে পারিতেন তাহাই নয়, তাহাদের দ্বারা অনেক দুঃসাধ্য কাজও করাইয়া লইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এ ক্ষমতা ছিল, হিংস্র বন্যপশুরাই খেলার সঙ্গী ছিল তাঁহার। তিনি যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন হুনরা তাঁহার রাজত্ব আক্রমণ করিতে পারে নাই। আপনাদের ভিংড়ার সত্যই যদি কোনো ক্ষমতা থাকে, সে ক্ষমতার সুযোগ আপনাদের গ্রহণ করা উচিত।

দোহা বলিল, ভিংড়া কিন্তু আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চাহে না। সে শত্রুভাবাপন্ন—

ঘুরঘুট খাঁ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তাহা হইলে উহাকে মারিয়া ফেলুন।

দোহা আপত্তি করিল।

বলিল, মারিয়া ফেলিলেই শত্রুর বিনাশ হয় না। আমার বিশ্বাস, দেহহীন শত্রু আরও বেশি শক্তিশালী আরও বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। আমার মতে ভিংড়া যে অঞ্চলটায় থাকে সে অঞ্চলটা তাহাকে দান করিয়া দেওয়া উচিত। যাহারা উহার সহিত গিয়া ওই অঞ্চলে বাস করিতে চাহিবে। তাহাদের আমরা বাধা দিব না। কিন্তু ভিংড়ার সহিত একটি শর্ত থাকিবে, সে

আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করিবে না। আমাদের কাহারও উপর সে অত্যাচার করিবে না। এই শর্তে সে যদি রাজি থাকে—

ঘুরঘুট খাঁ বলিলেন, যাহারা অত্যন্ত ধূর্ত, অত্যন্ত শঠ, তাহারা মুখে শর্ত করে, কাজে তাহা মানে না, যাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী তাহারাও ইহা করে। সৈনিক জীবনের ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। সুতরাং শত্রুকে যদি বিনাশ করিতে চান, তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিন। মৃত্যুর পর তাহার প্রেতাত্মা কী করিবে তাহা লইয়া যদি মাথা ঘামান তাহা হইলে ইহলোকের সমস্যা মিটিবে না। বৈষয়িক ব্যাপারে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। ভিংড়ুর প্রেতাত্মা যদি আপনাদের পীড়ন করে তখন তাহাকে ঠেকাইবার জন্য ভালো ওঝা ডাকিবেন। যাই হোক, আমাকে যে জন্য ডাকিয়াছেন সে কথাটার আলোচনা এইবার শুরু করুন। আপনাদের সামরিক প্রথায় শিক্ষা দিয়া আপনাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কয়েকটি শর্ত আছে।

কী শর্ত বলুন।

যে সামরিক বাহিনী আমি প্রস্তুত করিব সেই বাহিনীর আমি সর্বেসর্বা হইব। আমার আদেশ ছাড়া অন্য কাহারও আদেশ সেখানে চলিবে না।

দোহা বলিল, কিন্তু সে আদেশ দিবার আগে আপনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন তো?

আপনাদের, মানে কাহাদের? এই বিরাট জনতার?

না। আমাদের দলপতি টালার। তাহার সম্মতি ব্যাতীত আমরা কিছুই করি না।

কিন্তু আপনাদের দলপতি কী যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন?

যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না, কিন্তু কিসে আমাদের হিত বা অহিত হইবে তাহা বোঝেন। তাছাড়া, আপনি যখন এখানে থাকিবেন তখন যুদ্ধ সম্বন্ধেও সে আপনার নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া ফেলিবে। আমাদের দলপতি বুদ্ধিমান ও বলবান লোক।

ঘুরঘুট খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

তাহার পর বলিলেন, আপনাদের দলপতির সহিত যদি আমার মতের মিল না হয় তখন কী হইবে?

দোহাও কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর উত্তর দিল, আমাদের দলপতির আদেশই সর্বদা আমাদের নিকট গ্রাহ্য হইবে। তবে আপনার বিরুদ্ধাচারণ করিবার পূর্বে আমাদে দলপতি নিশ্চয়ই তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আপনি আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করুন, আপনি যাহাতে সুখে-সাচ্ছন্দে এবং সসম্মানে থাকিতে পারেন সে ব্যবস্থা আমরা করিব।

ঘুরঘুট খাঁ হা হা শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, আমি যদি ভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাদের জনপদ অধিকার করিয়া বসি, আপনারা কি বাধা দিতে পারিবেন? তখন তো আমিই সর্বেসর্বা হইব। আপনাদের অধীনে আপনাদের দলপতির মুখাপেক্ষী হইয়া আমি থাকিব কেন?

তখন আমি কথা বলিলাম। এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। বলিলাম, থাকা না থাকা আপনার ইচ্ছা। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে পারি আপনাকে শিক্ষকরূপে পাইলে আমরা আনন্দিত হইব। আরও বলিতে পারি, মানীকে কী করিয়া সম্মান করিতে হয় তাহাও আমরা জানি। আপনি এখনই বলিলেন, অন্যত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের সর্বেসর্বা হইবার শক্তি

রাখেন। খুব সম্ভব রাখেন, কিন্তু একটি কথা আপনাকে বলিতে চাই। বিজরিনী তেমুজি'র পত্নী শিকারা আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের বন্ধুত্ব কামনা করিয়াছেন, আমার স্ত্রী কামুক সর্দার মালেককে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া অত সহজে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছেন এই কথা তিনি বারবার বলিলেন। আমার স্ত্রীর সহিত তিনি 'সেহলা' পাতাইয়াছেন। সুতরাং কোনো বহিঃশত্রু যদি আমাদের এখন আক্রমণ করে, শিকারা এবং খেখুন সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সাহায্য করিবে এ বিশ্বাস আমার আছে। শিকারা বন্ধুত্বের জন্য কোনো শর্ত আরোপ করে নাই, তাহার নিকটই আমরা যদি বলি আমরা একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে চাই আপনি সাহায্য করুন— আমার বিশ্বাস তিনি করিবেন। আপনার সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত কিছু আলোচনা হইয়াছিল। আপনার যে পত্নীকে সর্দার মালেক ছিনাইয়া লইয়াছিলেন বলিয়া আপনি তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করেন, আপনার সেই পত্নী শিকারার নিকট বন্দিনী হইয়া আছে। শিকারা সর্দার মালেকের সমস্ত পত্নীদের হত্যা করিয়াছেন, করেন নাই কেবল ভুলেরাকে। তাঁহার বাসনা, আপনি যদি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সৈন্যবিভাগে সেনাপতিরূপে যোগদান করেন, তাহা হইলে ভুলেরাকে তিনি আপনার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। আপনি যদি ইহাতে সম্মত হন, আমার বিশ্বাস, তাঁহার পিরালা রাজ্যে আপনি সেনাবিভাগে একটা সম্মানের আসন পাইবেন। আমার মনে হয় শিকারার অনুরোধ রক্ষা করিলে সব দিকই রক্ষা হয়। আপনাকেও আমরা হয়ত শেষ পর্যন্ত পাইতে পারি। সবই অবশ্য আপনার সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে।

মনে হইল ভুলেরার খবর পাইয়া ঘুরঘুট খাঁ যেন একটু উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলেন, শিকারা আমার প্রভুর শত্রু। আমার প্রভু আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম। ইহাতে বিশ্বাসঘাতকতার নামগন্ধও নাই। কিন্তু আমি যদি এখন সেই শত্রুর অধীনে গিয়া চাকরি করি তাহা হইলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে গিয়া পড়িবে। সর্দার মালেক কামুক ছিলেন বলিয়া আমার স্ত্রী ভুলেরাকে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, শিকারাও কামুকী, সে হয়ত আমাকেই দখল করিতে চাহিবে। সর্দার মালেক কামুক ছিলেন, কিন্তু অনেক গুণ ছিল তাঁহার। তিনি আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যদলে আমাকে উচ্চপদ দিয়াছিলেন, আমার অধীনে যে সৈন্যদল থাকিত সেখানে আমার আদেশই সর্বদা বলবৎ থাকিত। সেইজন্যই আমি স-সৈন্যে অবিলম্বে তাঁহার দল ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছি। আমি যদিও তাঁহার অধীনে ছিলাম, কিন্তু তিনি কখনও আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। শিকারা আমাকে সে সুযোগ দিবে কি না সন্দেহ। ভুলেরাকে পাইলে অবশ্য আমি খুব খুশি হইব, কিন্তু আমার স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়।

আমি বলিলাম, ভুলেরাকে আপনি পাইবেন।

কী উপায়ে?

শিকারা বলিয়াছিল, ভুলেরাকে আমি যদি চাই ভুলেরা আমার হইবে। তখন আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। মনে হয় শিকারা তাহার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিবে না।

ঘুরঘুট খাঁ-র ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

আপনি যদি ভুলেরাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দিতে চাহেন কোনো শর্ত কি আরোপ করিবেন?

না, বিনা শর্তেই ভুলেরাকে আপনি পাইবেন। আপনার এ উপকার যদি করিতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। আপনি আমাদের সেনাবিভাগ গঠন করুন আর না-ই করুন, আপনার বন্ধুত্ব আমাদের সর্বদাই কাম্য।

ঘুরঘুট খাঁর চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি আগাইয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, বিনা শর্তেই আপনাদের সৈন্য গঠন আমি করিব। কিন্তু শিকারার সহিত যদি আপনারা বন্ধুত্ব করেন, দেখিবেন আমাকে যেন তাহার কবলে ফেলিয়া দিবেন না। আমার পরামর্শ, যতদিন আমরা নিজেদের সৈন্যদল গঠন না করিতে পারি, ততদিন আপনারা শিকারার সহিত একটা মৌখিক বন্ধুত্ব করুন। তারপর আমরা শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করিলে শিকারার অনুগ্রহের আমরা তোয়াক্কা রাখিব না।

বলিলাম, মৌখিক বন্ধুত্ব তো ভণ্ডামি। তাহার কবল হইতে আপনাকে আমরা মুক্ত রাখিবার চেষ্টা অবশ্যই করিব। আপনাকে আমাদের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলই আমরা দিব। সেখানে আপনি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। কিন্তু শিকারার সহিত ভণ্ডামি করিতে পারিব না, যদি বন্ধুত্ব করি আন্তরিক বন্ধুত্বই করিব।

ঘুরঘুট খাঁ কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, সে বন্ধুত্ব কিন্তু বেশিদিন টিকিবে না। শিকারা মানবী হইলে হয়ত টিকিত, কিন্তু সে মানবী নয়, দানবী। তেমুজিনকে সে ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। তেমুজিন তাহার হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার বীরত্ব, তাহার পৌরুষ, কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। সে নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য সমর্থ পুরুষ সংগ্রহ করিয়া দিত। সে রাজা ছিল নামে, আসলে সে ছিল শিকারার ক্রীতদাস। খেখুন সম্প্রদায়ের রাজাকেও বশীভূত করিয়াছে নিজের যৌবন দিয়া। শিকারা অমিত শক্তিশালিনী, কিন্তু সে মানবী নয়, দানবী। সেই জন্য আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি। শিকারা এখন কোথায় গিয়াছে জানেন?

তিনি জুনজিরা পাহাড়ে গিয়াছেন, সেখানে নাকি সর্দার মালেকের গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে। সেই গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়াছেন তিনি।

ঘুরঘুট খাঁ-র চোখে মুখে একটা রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, আমিও ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু শিকারাকে হতাশ হইতে হইবে। সর্দার মালেকের বিপুল ধনসম্ভার জুনজুরিয় আর নাই।

কী হইল?

ডাকাতে লুণ্ঠন করিয়াছে।

ঘুরঘুট খাঁ-র মুখের হাসি আরও ব্যঞ্জনাময় হইল। ঠিক এই সময়ে দূরে বহু অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। আমরা চক্রবালরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলাম চক্রাকারে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী আমাদের দিকে দ্রুতবেগে আগাইয়া আসিতেছে।

তিরখন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার সে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বলিল, সম্ভবত শিকারা আসিতেছে। আমাদের আর এখানে থাকা ঠিক নয়।

আমরা এখন চলিলাম। পরে আবার কোনোদিন আসিব।

ঘুরঘুট বলিলেন, ঠিক কথা। আমাদের এখন এখানে থাকা উচিত নয়।

তাঁহারা দুইজনেই অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা গেলেন শিকারা যে দিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকেই। আমাদের জনপদে তাঁহারা যদি আত্মগোপন

করিতে চাহিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের বিরানি জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। শিকারা যে বিরাট প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আসিতেছিল, স্থলপথে সেই প্রান্তরই আমাদের জনপদ হইতে নির্গমনের পথ। সুতরাং সেই দিকেই তাঁহারা ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। আমরা সকলে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

দোহা বলিল, শিকারাকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন কর। উহাদের আহারের ব্যবস্থা এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভিংড়া সম্বন্ধে কী করিব তাহা তো এখনও ঠিক হইল না। তোমাদের সকলের মত কী তাহা তোমারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া ঠিক কর। তোমরা সব নদীর ধারে চলিয়া যাও। এখানে এখনই সদলবলে শিকারা আসিয়া পড়িবে। তাহার সম্মুখে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার আলোচনা না করাই ভাল।

সকলে নদীর তীরে চলিয়া গেলে দোহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কী ইচ্ছা, ভিংড়াকে আমরা মারিয়া ফেলি?

বলিলাম, না, আমার ভাই সে। তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেক আগেই তাহা করিতাম। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার আগেও ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু তাহাকে আমি ভয় করি। তাহার অলৌকিক শক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দিবার মত মনোবল আমার নাই। কিন্তু এটাও মনে হয়, উহার উপস্থিতি আমাদের জনপদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কী করা উচিত তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমরা সকলে মিলিয়া যাহা আমাকে বলিবে তাহাই আমি করিব---

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। দম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, ভিংড়া বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়াছে। দম বলিল, আমার মৃত পিতা মহোরির প্রেতাত্মা আসিয়া নাকি বন্দীশালার অর্গল খুলিয়া দিয়াছেৰ। বৃদ্ধা বাবলা সেখানে ছিল। সে আমার বাবার প্রেতাত্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বাবলা বাবার আমলের লোক। অনেকে বলে সে নাকি বাবার প্রণয়িনী ছিল। বাবলা যদিও এখন জরাগ্রস্তা তবু সে বাঁচিয়া আছে এখনও। লাঠি ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, আপনমনে বিড় বিড় করিয়া সর্বদা কী বলে। দম আরও বলিল, ভিংড়ার সহিত নামনা মেয়েটিও পলাইয়াছে। নামনার কথা হয়ত তোমাদের মনে আছে। নামনা মেয়েটি নিঃসন্তান ছিল। ভিংড়ার নিকট নির্যাতিত হইয়া সে একটি পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিল। সে-ও নাকি তাহার সহিত পালাইয়াছে। কোথা পালাইল? জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাকে। কোথায় তাহা কেহ জানে না। আমাদের অশ্বশালা হইতে দুইটি অশ্বও লইয়া গিয়াছে তাহারা। আমরা যখন এখানে সকলে জমায়েত হইয়া ঘুরঘুট খাঁকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম সেই সময়ই তাহারা পালাইয়াছে। আমি এখন হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম তাহার বন্দীশালার কপাটটা খোলা। তাই ছুটিয়া আপনাকে খবর দিতে আসিয়াছি। আমরা কি তাহার সন্ধানে বাহির হইব?

দোহা কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, যে সমস্যার আমরা সমাধান করিতে পারিতেছিলাম না, অদ্ভুত উপায়ে তাহার সমাধান হইয়া গেল। এখন আর কিছু করিবার দরকার নাই। শিকারা আসিতেছে, তাহারই অভ্যর্থনার আয়োজন করা যাক।

শিকারা আসিয়া আমাদের মধ্যে রহিয়া গেল কিছুদিন। আমাদের এলাকার অনেক বিস্তীর্ণ জমি খালি পড়িয়াছিল। শিকারা সেখানে নিজের অনেক তাঁবু খাটাইয়া সসৈন্যে বসবাস করিতে লাগিল। আমরা প্রথম প্রথম কয়েকদিন তাহাদের খাদ্য সরবরাহ করিয়াছিলাম, সেবা-শুশ্রূষারও

আয়োজন করিয়াছিলাম কিন্তু শিকারা বলিল, তাহারা এখানে যখন কিছুদিন বসবাস করিবে স্থির করিয়াছে তখন সে আমাদের ভার স্বরূপ থাকিতে চায় না, আমাদের প্রতিবেশীরূপে থাকিতে চায়। তাহারা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমরাই মাঝে মাঝে সেখানে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলাম। নতুন দেশের ক্রীতদাস-দাসীদের নতুন রকম নৃত্য-গীত নতুন রকম শূল্যপক্ক মাংস, নতুন রকম পিষ্টক আমাদের মুগ্ধ করিতে লাগিল। আমরা উহাদের ভদ্রতায় মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু উহাদের সৈন্যসামন্ত দেখিয়া আমাদের ভয় হইল। দোহাকে একদিন বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, আমাদের জনপদের এতখানি জায়গা দখল করিয়া শিকারার ওই অবস্থান আমার ভালো লাগিতেছে না। উহারা যদি স্বেচ্ছায় চলিয়া না যায় তাহা হইলে আমাদের কী কর্তব্য তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উহাদের সৈন্যসামন্ত আছে, আমাদের কিছুই নাই, এ অবস্থায় উহাদের সহিত কলহ করাও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। কিন্তু কী করিব আমরা? ঘুরঘুট খাঁ আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া দিবে এই আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে আর তাহার কোনো খবর পাইতেছি না। তিরখনও আর আসে না। আমার মনে হয় শিকারা এখানে আছে বলিয়াই সম্ভবত তাহারা গা-ঢাকা দিয়া আছে। কিন্তু উহারা কতদিন এখানে থাকিবে তাহার তো স্থিরতা নাই। এখন কী করা যায় বল তো?

দোহা নীরবে সব শুনিল। লক্ষ্য করিলাম তাহার মনে কী একটা বক্তব্য ফুটিয়াছে যাহা সে বলিতে পারিতেছে না। তাহার মুখে কেমন যেন একটা দ্বিধা ও লজ্জার ভাব।

প্রশ্ন করিলাম, ব্যাপার কী? কিছু বলিতেছ না কেন?

দোহা বলিল, ব্যাপার গুরুতর।

বলিয়াই আবার চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মাথা চুলকাইয়া বলিল, তোমাকে এখন কথাটা বলিব না ভাবিয়াছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত বলিতেই হইত, কারণ তুমি আমাদের দলপতি। এখনই শোন। শিকারা যেদিন এখানে আসে সেইদিন রাত্রেই সে বিরানি জঙ্গলে গিয়াছিল। কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে ঢুকিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল এ জঙ্গলে কোনো স্ত্রীলোক প্রবেশ করিবে না, ইহাই নিয়ম। পরদিন রাত্রে শিকারা মুখে গোঁফ-দাড়ি পরিয়া পুরুষের বেশে গিয়া হাজির হইল। প্রহরীকে বলিল, আমি এই বনের অধিপতি দোহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। জরুরি দরকার। শীঘ্র খবর দাও। কিংবা আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল। প্রহরী তাহার গোঁফ-দাড়ি দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে লোকটি ছদ্মবেশে আসিয়াছে। বলিল, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আমাদের মালিককে খবর দিতেছি। আমি তখন ঘুমাইতেছিলাম। কিন্তু প্রহরীর ডাকাডাকিতে আমাকে উঠিতে হইল। খবর শুনিয়া শিকারার নিকট আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই শিকারা গোঁফ দাড়ি খুলিয়া ফেলিল এবং একমুখ হাসিয়া বলিল, কাল স্ত্রীলোকের বেশে আসিয়াছিলাম বলিয়া আপনার প্রহরীরা আমাকে আপনার কাছে যাইতে দেয় নাই। আজ তাই পুরুষ-বেশে আসিয়াছিলাম, আজও যাইতে দিল না। আমি অবশ্য জোর করিয়া প্রবেশ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি আপনাদের বন্ধু এবং অতিথি, তাই আপনাদের মনে দুঃখ হয় এমন কিছু করিতে চাই না। আপনাদের , বিশেষ করিয়া আপনার, প্রেমই আমি কামনা করি। চলুন, আপনার আস্তানাটা একবার দেখিয়া আসি।

আমি রাজি হইলাম না। বলিলাম, রাত্রে অন্ধকারে ওই জঙ্গলের ভিতর আপনি যাইতে পারিবেন না। আমার এই জঙ্গল যদি দেখিতে চান, দিনের বেলা আসিবেন, আমি আপনাকে সব দেখাইয়া দিব। একদিনে অবশ্য সব দেখা সম্ভব নয়, অন্তত দশ দিন লাগিবে। আপনার

যদি কৌতূহল থাকে, কাল সকালেই আসুন। আপনি এত রাত্রে আসিয়াছেন কেন? শিকারা বলিল, জরুরি দরকার আছে। বলিলাম, কী দরকার বলুন? শিকারা কিন্তু কিছু বলিল না, মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, গভীর রাত্রে কোনো একাকিনী নারী কোন্ জরুরি প্রয়োজনে একজন পুরুষের কাছে যায়, তাহা কি আপনি জানেন না? বলিলাম, আমি একটু হাঁদা গোছের লোক, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি সরল করিয়া বলুন। তখন সে বলিল, আমার মনের বেদনা যদি বুঝিতে চান আমার পূর্ব-ইতিহাস শুনিতে হইবে। আপনার কি সময় আছে? যদি থাকে তাহা হইলে চলুন ওই গাছটার নিচে আমরা বসি। সেখানে বসিয়া আপনাকে আমার জীবন কাহিনী শুনাইব। আমার জীবন কাহিনী শুনিলে আপনার হয়ত আমার উপরে অনুকম্পা হইবে। আমি একটু বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু শিকারার অনুরোধ প্রত্যাখান করিতে পারিলাম না। কাছেই প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষ ছিল, তাহারই তলায় গিয়া দুইজনে উপবেশন করিলাম। বেশ অন্ধকার জায়গাটা। শিকারা আমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। আমি কিন্তু সরিয়া বসিলাম। শিকারা তাহার জীবন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

বলিল, অমি পিরালার রানী, পিরালার রাজা তেমুজিন আমাকে বিবাহ করিয়াছিল। আমরা এখন যদিও আপনাদের মতো চাষ-বাস করি, কিন্তু পূর্বে আমরাও দস্যুবৃত্তি করিতাম। আমি হুন-কন্যা, আমার পিতা গোমন্দ খাঁ গোবি মরুভূমিতে প্রবল প্রতাপ হুন সর্দার ছিলেন। হুনরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করিত। একদল আর একদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত। শুনিয়াছি আমার মা নাজনিকে আমার বাবা এক হুন শিবির হইতে লুট করিয়া আনিয়াছিলেন। গোমন্দ খাঁ-র হারেমে অনেক বেগম ছিল, কিন্তু আমার মা ছিলেন গোমন্দ খাঁ-র প্রিয়তমা। হুনেদের জীবনে আর পশুর জীবনে বিশেষ কোনো তফাৎ নাই। ঘোড়া, গরু, ভেড়া আর খচ্চরই আমাদের সঙ্গী। তাহারাই আমাদের সম্পত্তি। আমরা তাহাদের মাংস খাই, তাহাদের দুধ দুহিয়া তাহাদেরই চর্ম হইতে প্রস্তুত থলিতে জমাইয়া রাখি, সে দুধ পচিয়া যখন কুমিস হয় তখন তাহা পান করি। তাহাদের চামড়া দিয়া আমাদের গাত্রাবরণও প্রস্তুত হয়। যুদ্ধের ঢাল, তরবারির খাপ সবই পশুচর্মের। আমিও বাল্যকাল হইতে শিকার করিতে ভালোবাসিতাম। তাই আমার বাবা আমার নামকরণ করিয়াছিলেন শিকারা। আমার আদরের ছোট্ট নাম ছিল, খুশ। এ নাম কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হারাইয়া গিয়াছে। বোহন খাঁ আর একটি হুন সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল। তাহার দলে ছিল তিন হাজার ঘোড়সওয়ার। সে আমার বাবাকে খবর দিল যে আমার বাবা যদি তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার দলে যোগ না দেন তাহা হইলে সে আমাদের আক্রমণ করিবে। বাবা রাজি হইলেন না। একদিন গভীর রাত্রে বোহন অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করিল। অনেকে মরিল, অনেকে পলাইয়া গেল। আমার বাবা-মা পালাইতে পারেন নাই। বোহন তাঁহাদের বন্দী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া আমাদেরই একজন সৈনিক মরুভূমির মধ্যে অন্ধকারে পালাইয়া গিয়াছিল। সে যে কে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অন্ধকারে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া সে টপ করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছিল, আমরা হারিয়া গিয়াছি, চল পালাই। ঘোড়ার পিঠে তাহার কোমর জড়াইয়া আমি বসিয়াছিলাম। অন্ধকারের ভিতর অনেকক্ষণ আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছিলাম। হঠাৎ আমার রক্ষক ঘোড়া হইতে নিচে পড়িয়া গেল। ঘোড়াটাও দাঁড়াইয়া পড়িল। আমিও ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি উঠিতেছেন না কেন?

আপনার কি খুব বেশি ব্যাথা লাগিয়াছে? কোনো উত্তর পাইলাম না। তিনি নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। যখন প্রভাত হইল তখনই বুঝিতে পারিলাম তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার উরুদেশ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখিলাম খড়্গাঘাতে তাঁহার চর্মের বর্ম ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পোশাক দেখিয়া বুঝিলাম লোকটি আমাদের দলের সৈনিক। এত বড় আঘাত সত্ত্বেও সে যে আমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া এতদূর আসিতে পারিয়াছে ইহাতে আমি অবাক হইয়া গেলাম। মৃতদেহের পাশেই বসিয়া রহিলাম অনেকক্ষণ। তাহার পর রোদ উঠিল, চারিদিকের হাওয়া তপ্ত হইয়া উঠিল, ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। দেখিলাম ঘোড়াটা অনেক দূরে চরিতেছে। বুঝিলাম ওখানে তাহা হইলে ঘাস আছে। ঘাস থাকিলে জলও আছে। দূরে একটি পাহাড়ও দেখিলাম। পাহাড় হইতে অনেক সময় ঝর্ণার ধারা নামিয়া আসিয়া মরুভূমির মধ্যেও মরুদ্যান সৃষ্টি করে। অনেক সময় সেখানে লোকজনও থাকে। আমি মৃত সৈনিকটির দেহ হইতে অস্ত্রগুলি খুলিয়া লইলাম। একটা তরবারি, বেশ বড় একটা ইস্পাহানি ছোরা, কোমরে বাঁধিয়া লওয়াই সঙ্গত মনে হইল। ভাবিলাম সঙ্গে অস্ত্র থাকিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। ঘোড়াটা যেখানে চরিতেছিল সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। কাছে গিয়া দেখিলাম তাহারও বাম উরুতে একটি প্রকাণ্ড ক্ষত, রক্ত পড়িতেছে না, রক্ত শুকাইয়া ক্ষতের মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তবু তাহাতে আরোহণ করিলাম এবং নদীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে একটি পাহাড়তলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নদীটি সেখানে বেশ চওড়া হইয়াছে, তাহার স্রোতও প্রবল। তাহার তীরে কয়েকটি পাথরের তৈরি বাড়িও দেখিতে পাইলাম। দূরে একটি মন্দিরের চূড়াও দেখা গেল। আমি যাইবামাত্র কয়েকজন বাহির হইয়া আসিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই চেহারা একরকম। সকলেরই মাথা কামানো এবং পরিধানে গলা হইতে পা পর্যন্ত হলুদ রঙের আলখাল্লা। তাহাদের ভাষা শুনিয়া মনে হইল তাহারা চীনা। চেহারাও অনেকটা সেই রকম। আমার বাবা মাঝে মাঝে চীন দেশের সীমান্তে লুটপাট করিতে যাইতেন। তখন দুই একটা চীনাকে দেখিয়াছিলাম। অশ্বপৃষ্ঠে আমার সশস্ত্র আবির্ভাব দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়াছে মনে হইল। আমি অনুভব করিলাম, এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইলে ইহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে। আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া আমার তরবারি এবং ছোরা খুলিয়া তাহাদের পায়ের কাছে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলাম। তাহার পর মুখে এবং পেটে হাত দিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। তখন তাহার মধ্যে একজন, পরে শুনিয়াছি তাহার নাম নামা লিং, আমাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। যদিও ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল তিনি অত্যন্ত গরিব তবু একটি মূল্যবান চীনার বাসনে তিনি আমাকে খাইতে দিলেন। যাহা খাইতে দিলেন তাহা অবশ্য নগণ্য, কিছু বাসি ভাত এবং কী একটা কন্দ-সিদ্ধ। তাহার সঙ্গে একটি লঙ্কার টুকরা। বাসনটি কিন্তু মহামূল্য। আমার খাওয়া শেষ হইলে তিনি সযত্নে বাসনটি ধুইয়া মুছিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া একটি কাচের বাক্সে সযত্নে রাখিয়া দিলেন। দরিদ্রের গৃহে এরূপ মহামূল্য বাসন কী করিয়া আসিল তাহা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। একবার সন্দেহ হইল ইহারা চোর না তো। দেখিলাম আমার তরবারি ও ছোরাটিকেও ইহারা সযত্নে তুলিয়া রাখিল। আমার খাওয়া শেষ হইলে নামা লিং ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং দুইটি লোক লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আমাকে ইঙ্গিতে জানাইল যে উহাদের সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। আমার ঘোড়াটি দাঁড়াইয়া ছিল। আমি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। আমার সঙ্গী দুইজনের মধ্যে একজন আমার পিছনে চড়িল এবং আর একজন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটিকে

পর্বতশ্রেণীর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। পর্বতশ্রেণী যত কাছে মনে হইতেছিল দেখা গেল তাহা তত কাছে নয়। মরুভূমিতে ধূলার ঝড় বহিতেছিল, কিছুদূর গিয়া আমরা আর যাইতে পারিলাম না। দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া সেই তপ্ত বালুর ওপরই শুইয়া পড়িলাম। আমি হুন-কন্যা, মরুভূমির তপ্ত হাওয়ার সহিত আমার বাল্যকাল হইতেই পরিচয়, তবু মনে হইতে লাগিল আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার ঘোড়াটি আগে হইতেই অসুস্থ হইয়াছিল, সে-ও এবার শুইয়া পড়িল এবং খানিকক্ষণ পরে মারা গেল। সমস্ত দিন বালুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আমরা শুইয়া রহিলাম। আমাদের উপর বালুর কয়েকটা আস্তরণ পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর ঝড়টা কমিলে আমরা পদব্রজে আবার যাত্রা করিলাম। যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন অনেক রাত্রি। ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্তিতে আমি প্রায় মর-মর। পর্বতের তলদেশে দেখিলাম অনেক লোকের বাস। পর্বতের পাশ দিয়া একটি নদীও বহিতেছে। আমার সঙ্গীরা ভিতরে ঢুকিয়া গেল। একটু পরেই আমার জন্য খাবার এবং চমৎকার একটি পানপাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল লইয়া একটি অপরিচিত লোক প্রবেশ করিল। সে আমাদের ভাষায় কথা বলিল, এখন যাইয়া বিশ্রাম কর। কাল সকালে তোমার সব বিবরণ শুনিব। বুঝিলাম এ লোকটি আমাদের ভাষা জানে বলিয়াই ইহার কাছে আমাকে আনা হইয়াছে; পরদিন সকালে অকপটে সব তাঁহাকে বলিলাম। তিনি খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, এ পাহাড়ের গুহায় গুহায় বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধের ছবি আছে। সহস্র বুদ্ধের মন্দির নামে ইহা খ্যাত। এখানে তোমাকে থাকিতে দেওয়া নিরাপদ নয়। তোমার সন্ধানে হুনরা হয়ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এখান হইতে কিছু দূরে একটি পথ আছে। সেই পথ দিয়া চীনদেশ হইতে বহু পণ্য পশ্চিম দেশে যায় উঠের পিঠে। সেখানেই লইয়া গিয়া কোনো উঠের পিঠে তোমাকে চড়াইয়া দিব আমরা। তাহারা তোমাকে লইয়া গিয়া কোনো বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবে। যে তোমাকে কিনিবে সে-ই তোমার আশ্রয়দাতা হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। কাল সকালে আমাদের একজন লোক তোমাকে সেই পথের ধারে উটের আড্ডায় লইয়া যাইবে। উটের আড্ডাটিও বেশ দূরে। উটের পিঠে চড়িয়া যাইতে হইবে। এই পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা উট যায় উটের আড্ডার দিকে। সেই উটেই আমরা যাইব। আমি বিদেশি হাটের পণ্য একথা শুনিলে উট-ওলা আর আপত্তি করিবে না। পরদিনই একজন উট-ওলা আসিল, আমাকে এবং আমার সঙ্গীকে উটের পিঠে তুলিয়া লইল। দেখিলাম উট-ওলার সহিত আমার সঙ্গীর পূর্ব পরিচয় আছে। মনে হইল কিছু ব্যবসার সম্পর্কও আছে। কারণ একটু পরেই সে থলি থেকে একটি মূল্যবান চীনের বাসন বাহির করিয়া বলিল, মরুভূমির মধ্যে এইটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। চীনদেশ হইতে একদল বণিক অনেক জিনিসপত্র লইয়া বিদেশের বাজারে যাইতেছিল। একদল হুন আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। কিছু জিনিস হুনেরা লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিছু জিনিস লইয়া বণিকেরা পালাইতে পারিয়াছে। পালাইবার সময় কিছু জিনিস এদিকে-ওদিকে ফেলিয়া গিয়াছে। আমি যখন আসিলাম, তখন দেখিলাম কিছু খালি পেটিকা ওদিকে ছড়ানো রহিয়াছে। তাহারই একটির মধ্যে এইটি পাইয়াছি। তুমি যদি লইতে চাও লও। যে মূল্য দিবে তাহাই লইব। আমার সঙ্গীটি তাহার হাত হইতে আংটিটি খুলিয়া দিল। বলিল , আমার পূর্বপুরুষরা এককালে চীনে ছিলেন। সে দেশকেই আমি স্বদেশ মনে করি। সে দেশের শিল্পীরা যে জিনিস প্রস্তুত করে তাহা আমার নিকট বহুমূল্য। আমার আংটিটি লইয়া ওটি আমাকে দিন। উটচালক আপত্তি করিল না।

উটের আড্ডায় গিয়া দেখিলাম সেখানে অনেক উট। তাহারা সকলেই দূরদেশের যাত্রী। কেহ

বোখারা যাইবে, কেহ তেহারানে, কেহ রোমে, কেহ সিডনে। আমাকে দেখিবামাত্র ক্রেতারা প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। অবশেষে পাঁচশত রৌপ্যমুদ্রা দিয়া একজন রোমীয় বণিক আমাকে খরিদ করিল। লোকটি বৃদ্ধ। তাহার আচরণে পিতৃসুলভ স্নেহের পরিচয় পাইলাম। দেখিলাম তিনিও আমার ভাষা জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে কোন্ হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবেন? তিনি বলিলেন, তুমি যদি ভালভাবে থাকো তোমাকে বিক্রয় করিব না। ব্যবসা করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি তাহা লইয়া আমি ভারতবর্ষে চলিয়া যাইব। রোমের রাজারা বড় অত্যাচারী, রোম সাম্রাজ্যে আর থাকিব না। আমার আত্মীয়স্বজন সব মারা গিয়াছে। তোমাকে লইয়া ভারতবর্ষে নতুন ঘর বাঁধিব। তুমি আমার মা হইবে, আর আমি হইব তোমার ছেলে। রাজি আছে তো? আমি বলিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে। সমস্ত রাত উটের পিঠে চড়িয়া অজানা ভবিষ্যতের নানা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছিলাম; এমন সময় একদল ডাকাত আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ মারা গেলেন। আমাকে বন্দী করিয়া ডাকাতের দল ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে ডাকাতরা আমাকে তাহাদের সর্দারের কাছে লইয়া গেল। সর্দার আমাকে টিপিয়া টুপিয়া দেখিলেন এবং শেষে কহিলেন মালটি ভালো, কিন্তু আমাদের এখানে স্থানাভাব। মেয়ের সংখ্যা আর বাড়ানো উচিত নয়। এটাকে কাল হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া দাও; বেশ মোটাসোটা আছে, ভালো দাম পাওয়া যাইবে। আমি এখন যে রাজ্যের রানী সেই পিরালা রাজ্যের নিকটই একটি বড় হাট বসে। সেই হাট হইতে তেমুজিন আমাকে কিনিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিল। আমিই তেমুজিনের প্রথমা পত্নী। বিবাহের পর আবিষ্কার করিলাম যে তেমুজিন যদিও পুরুষ কিন্তু তাহার পৌরুষ নাই। তেমুজিন কিন্তু লোক বড় ভালো। যদিও তাহার পূর্বপুরুষেরা এককালে যাযাবর হুন ছিল, কিন্তু তাহারা বহুদিন হইতে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের মতো চাষবাস করিয়া পিরালা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সকলেই তাহাকে ভালবাসে। হুন দস্যুরা মাঝে মাঝে তাহার রাজত্বে হানা দিয়া লুটপাট করিত। পিরালা রাজ্যের লোকেরা যতটা পারিত আত্মরক্ষা করিত। কিন্তু তাহাদের বহু ক্ষতি বহুলোকের প্রাণহানি দেখিয়া আমি তেমুজিনকে বলিলাম, বিষয়-আশয় থাকিলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র বাহিনী রাখিতে হইবে। আমি হুনের মেয়ে, আমি তোমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিব। পিরালা রাজ্যের পাশেই খেখুনরা থাকে। আমি তাহাদের দলপতিকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলাম। তাঁহার একটা সেনাবাহিনী ছিল। তিনি বলিলেন আরব দেশ হইতে, রোম হইতে তিনি শিক্ষক আনাইয়া এই সেনাবাহিনী করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই করিতে উপদেশ দিলেন। আমরা তাহাই করিলাম। প্রায় পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমরা একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইলাম। তোমাদের যেমন বিরানি জঙ্গল আছে আমাদের পিরালাতেও তেমনি আছে পোলং। পোলং জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া আমাদের শিক্ষকরা আমাদের যুদ্ধ শিখাইতেন। প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ শিখাইলে বিপদ আছে। শত্রুরা জানিতে পারিলে আক্রমণ করিবে এ ভয় ছিল। আমিও পোলং জঙ্গলে সৈন্যদের সহিত থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছি। তেমুজিনও শিখিয়াছিল, কিন্তু বড় দুর্বল ছিল সে। রাজা হিসাবে সে-ই প্রধান সেনাপতি হইয়াছিল। সেনাপতি হইবার পূর্ণ যোগ্যতা সে কিন্তু অর্জন করে নাই। আমি তাহার পাশে না থাকিলে বহুদিন পূর্বেই শত্রুরা আমাদের বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিত। খেখুনদের রাজা জিজিগম ভীষণ প্রকৃতির লোক, প্রত্যহ একটি করিয়া ভেড়া আহার করে। কাহারও সহিত হাসিয়া কথা কয় না। কিন্তু আমি তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম। এই বন্ধুত্ব আমাদের

পিরালাকে রক্ষা করিয়াছে। ওই হুন সর্দার মালেক, আমাদের যেভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, জিজিগম সসৈন্যে সাহায্য না করিলে আমরা মুশকিলে পড়িতাম। যাই হোক এখন পিরালা ও খেখুন রাজত্বকে একটি বিরাট রাজত্ব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ আমরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তেমুজিন মারা যাইবার পর জিজিগম আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু আমি রাজি হই নাই। কারণ তাহার অনেক পত্নী। দুই একজনকে ডাইনি বলিয়াও সন্দেহ হয়। তোমাদের ভিংড়ার মতো তাহারা এমন অনেক কিছু কাজ করে যাহা ভয়ানক। দিনের বেলা তাহারা অপরূপ রুপসী, কিন্তু রাত্রে তাহারা ভয়ঙ্করী। অনেকে বলে রাত্রে তাহারা ব্যঘ্রিনীর রূপ ধারণ করিয়া শত্রু নিপাত করে। আমি তাই জিজিগমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছি। সর্দার মালেকের গুপ্তধন জুনজিরা পর্বতে লুক্কায়িত ছিল। তাহা অধিকার করিতে পারিলে তাহার কিছু অংশ জিজিগমকে দিব। কিন্তু জুনজিরায় গিয়া কিছুই পাইলাম না। মনে হয় ঘুরঘুট তাহা সরাইয়া ফেলিয়াছে। তাই ভাবিতেছি ঘুরঘুটের পত্নী ভুলেরাকেই উপহার-স্বরূপ জিজিগমের নিকট পাঠাইয়া দিব। যুবতী নারী পাইলে জিজিগম খুব খুশি হয়। আপনি হন না?

এই বলিয়া শিকারা আমার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। আমি তাহার মতলবটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তো জান আমি তোমাদের মত নই। আমি মাছ-মাংস খাই না, নারীসঙ্গও কখনও করি নাই। করিবার প্রবৃত্তি যে হয় না, তাহা নয়। আমি কিন্তু সে প্রবৃত্তি দমন করি। দমন করিয়া একটা বিশেষ ধরনের সুখ পাই। শিকারাকে কী বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম। শিকারা আবার বলিল, আমার জীবন কাহিনী আপনাকে বলিলাম, তাহার কারণ আমি আপনাকে জীবনের সঙ্গী রূপে পাইতে চাই। আমি একাধিক পুরুষসঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত পুরুষের দেখা পাই নাই। আপনাকে দেখিয়াই আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, হ্যাঁ এই তো একটা পুরুষের মত পুরুষ! আপনার জন্যই আমি এখানে আসিযাছি, আপনাকে আমি চাই। যদি পাই তাহা হইলে আমার সৈন্যরা আপনার এলাকা রক্ষা করিবে, আমার সেনাপতিরা আপনাদের জন্য নতুন বাহিনী সৃষ্টি করিবে আমার সমস্ত সামর্থ্য, সমস্ত প্রতাপ, সমস্ত সম্পত্তি আপনি ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমার বেদনা আপনাকে দূর করিতে হইবে. আমার পিপাসা আপনাকে মিটাইতে হইবে।

আমি তবু চুপ করিয়াই রহিলাম।

শিকারা তখন প্রশ্ন করিল, চুপ করিয়া আছেন কেন, কিছু একটা বলুন।

তখন বলিলাম, আমি খুব স্বাভাবিক মানুষ নই। স্বাভাবিক মানুষ হইলে আপনার এ প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করিতাম। পুরুষ-পশু স্ত্রী-পশু দেখিলে যে সব আচরণ করে, তাহা আমি করিতে পারি না। মাঝে মাঝে আমার যে উত্তেজনা হয় না তাহা নহে, কিন্তু সে উত্তেজনা দমন করিয়া আমি আনন্দ পাই। সেজন্য মনে হইতেছে আপনার জীবনসঙ্গী হইবার যোগ্যতা বোধহয় আমার নাই, আশঙ্কাও নাই। কিন্তু আপনার মত শক্তিময়ী নারীর বন্ধুত্ব আমি কামনা করি। আমি বুঝিয়াছি আমাদের ভূসম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাহার আয়োজনও আমরা করিয়াছি কিন্তু ঠিক মতো নির্দেশ দিয়া আমাদের পরিচালনা করিবে এরূপ লোক আমরা পাই নাই। আপনি কি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন? আপনি আমাদের বন্ধু হইলে এ বিষয়ে আমাদের আর কোনো দুর্ভাবনা থাকিবে না।

আমার কথা শুনিয়া শিকারা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার মনে হইল যেন একটা হায়না ডাকিতেছে। হাসি থামাইয়া সে শেষে বলিল, স্বার্থের বন্ধন ছাড়া পৃথিবীতে কোনো বন্ধনই

টেকে না। আমি কোন্ স্বার্থে আপনার হিতৈষী হইব? আপনাকে জীবনসঙ্গী রূপে পাইলে আপনার সম্পত্তিকে আমার সম্পত্তি রূপে গণ্য করিতে পারি। কিন্তু আপনি যখন তাহাতে রাজি নন তখন আমি তাহা পারি না। আমার সেনাপতিরাই তাহাতে রাজি হইবে না। আপনি যদি আমাকে বিবাহ করিতেন তাহা হইলে আমার স্বামীরূপে তাহারা আপনাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইত। আপনার আদেশ অনুসারে চলিতে আপত্তি করিত না। আপনাকে দেখিয়া সত্যই আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, আপনার পরিচয় পাইলে তাহাদেরও ভাল লাগিত। আপনিই তখন আমার রাজত্বের অধিপতিও হইতেন। আপনি এবং আমি এক বিশাল রাজত্বের রাজা ও রানী হইতে পারিতাম। আপনাকে সঙ্গীরূপে পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। আমার জীবনের পিপাসা আপনিই মিটাইতে পারিবেন। আপনি ব্যাপারটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

আমি বলিলাম, ভাবিবার জন্য তাহা হইলে কয়েকদিন সময় চাই। তাছাড়া ইহার আর একটা দিকও আছে। আমাদের দলের দলপতিকে সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। তাহার সম্মতি না থাকিলে এককভাবে আমি কিছু করিতে পারি না। করা উচিতও হইবে না। সময়মত আমি টালাকে সব খুলিয়া বলিব। শিকারা এমন আকুলভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল যেন আমাকে গিলিয়া খাইবে। আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম, যত শীঘ্র সম্ভব আপনাকে খবর দিব। আপনি এখন আপনার তাঁবুতে ফিরিয়া যান। এই বলিয়া আমি বিরানির জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘটনাটা কয়েকদিন পূর্বেই ঘটিয়াছে, আমি তোমাকে এখন বলিব না ভাবিয়াছিলাম। নিজেই ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম কী করা উচিত। কিন্তু ভাবিয়া কোনো কূল কিনারা করিতে পারিলাম না। ভাবিতেছিলাম কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করিয়া এখান হইতে চলিয়া গেলে শিকারা হয়ত বুঝিবে তাহার প্রস্তাবে আমি রাজি নই। তখন তোমার সহিত আলাপ করিয়া সে যাহা হয় ঠিক করিবে। কিন্তু এটাও আমার খুব মনঃপুত হইতেছিল না, কী করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় তুমি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলে। সব তোমাকে খুলিয়া বলিলাম। এখন কী করা উচিত ভাবিয়া দেখ।

আমি বলিলাম, শিকারাকে বিবাহ করিয়া তুমি যদি আমাদের অধিপতি হও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তুমি আমাদের মাথার উপরে থাকিলে আমরা নিশ্চিত থাকিব। আমি যদিও আমাদের দলের দলপতি, আমার বাবাই আমাকে দলপতি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি মনে মনে বরাবরই জানি তুমিই আমাদের প্রকৃত দলপতি। তুমি যাহা ঠিক করিবে তাহাই হইবে। শিকারাকে বিবাহ করিয়া তাহার সৈন্যসামন্ত যদি আমরা পাই, আমাদের সেনাবাহিনী নির্মাণে সে যদি আমাদের সাহায্য করে, তাহা হইলে ভালই তো হয়। শিকারাকে বিবাহ করিতে তোমার সত্যই কি খুব আপত্তি আছে? সারাজীবন অবিবাহিত থাকিয়া তুমি এ রকম অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিবে কেন তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না।

ইহার উত্তরে দোহা যাহা বলিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। সেই আদিম যুগেও মানুষ যে এত মহৎ হইতে পারে ইহা শুনিয়া তোমরাও হয়ত বিস্মিত হইবে। কিন্তু একটা কথা তোমরা বিশ্বাস কর। মনুষ্যত্বের আস্বাদ সে যুগেও কোনো কোনো মানুষ পাইয়াছিল। কোনো কোনো মানুষ মাঝে মাঝে মহত্ত্বের মহিমা উপলব্ধি করিত। স্বার্থপর হওয়া অপেক্ষা নিঃস্বার্থপর হওয়া যে বেশি তৃপ্তিকর ইহা সে যুগের দুই একটি মানুষ বুঝিয়াছিল। তাহাদের সেই ধারাই মানব পশুর মধ্যে এখনও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাদের সমাজকে অলঙ্কৃত করে।

দোহা বলিল, আমি অবিবাহিত থাকিতে চাই তাহার একটা কারণ আমার বাবা কে ছিলেন আমি জানি না। কিন্তু তুমি যে ডঙ্কার বংশধর তাহা কাহারও অবিদিত নাই! ডঙ্কার বংশধরই এখানে বরাবর দলপতি থাকুক ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি যদি বিবাহ করি আমারও একটা বংশ হইবে এবং তাহার সহিত তোমার বংশধরদের মিল যে হইবেই, এমন কোনো কথা নাই। খুব সম্ভব হইবে না। আমি সেটা চাহি না, তাই আমি বিবাহ করিব না। তোমার বাবা তোমাকে দলপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তুমিও কালক্রমে তোমার বংশধরদের ভিতর হইতে দলপতি নির্বাচন করিবে ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার বংশধররা থাকিলে তাহাতে বিঘ্ন হইবে, সুতরাং আমি বিবাহ করিব না ঠিক করিয়াছি।

আমি বলিলাম, আমার বংশে হয়ত দলপতি হইবার উপযুক্ত ছেলে না-ও জন্মিতে পারে, কিন্তু তোমার বংশে হয়ত জন্মিতে পারিত।

আমরা যেখানে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম তাহার পাশেই একটা ঝোপ ছিল। সেই ঝোপের ভিতর হইতে কন্টকা বাহির হইয়া আসিল।

আমি দোহাকে প্রশ্ন করিলাম, কন্টকাকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিব?

দোহা আপত্তি করিল না।

সবিস্ময়ে দেখিলাম কন্টকা ফুলের সাজে সাজিয়া আসিয়াছে। কন্টকা একটু সাজসজ্জা-প্রিয়। আজ যেন সাজটা একটু বিশেষ ধরনেব মনে হইল। আমাদের দেখিয়া বলিল, তোমরা দুজনে এখানে বসিয়া কী আলাপ করিতেছ?

বলিলাম, পরামর্শ করিতেছি। শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে। কী করা উচিত তাহাই ভাবিতেছি।

কন্টকা কোনো মন্তব্য না করিয়া হাসিমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, শিকারা শিকার-প্রিয়, নিত্য নতুন শিকার করিতে চায়। আমি জানি সে তাহার প্রধান সেনাপতির শিবিরে রোজ রাত্রে যায়। প্রধান সেনাপতি জোখরু তাগড়া বলিষ্ঠ জোয়ান। তাহার সহিত শিকারা তাহা হইলে কি সম্বন্ধ ত্যাগ করিল? যদি করে তাহা হইলে জোখরু দোহার শত্রু হইবে, এ কথা কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি। আর জোখরু যদি শিকারাকে ত্যাগ করে তাহা হইলে শিকাবার সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিবে। সুতরাং শিকারাকে বিবাহ করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না এখন। তাছাড়া, দোহার আশায় আমাদের চম্বা চিরকুমারী হইয়া আছে, আমার ধারণা, দোহারও কিছু দুর্বলতা আছে তাহার সম্বন্ধে, এ ব্যাপারটার কোনো মূল্যই দিবে না তোমরা? শিকারা আসিয়া ছোঁ মারিয়া আমাদের দোহাকে লইয়া যাইবে?

দোহা বলিল, আমাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নয়। আমি বিবাহই করিব না ঠিক করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে শিকারার কবল হইতে কী করিয়া আমরা উদ্ধার পাই? সে সৈন্য-সামন্ত লইয়া আমাদের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, বলিতেছে আপনি আমার জীবনসঙ্গী হউন, আমরা উভয়েই এক বিরাট রাজ্যের রাজা-রানী হই, এ অবস্থায় কী করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমি যদি শিকারাকে সোজাসুজি প্রত্যাখান করি তাহা হইলে আমরা সকলেই বিপন্ন হইব, তাই ভাবিতেছি কোনো ছুতায় কাল-হরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাহাই করিতেছি। তুমি ফুলের সাজ পরিয়া কোথায় যাইতেছ?

কন্টকা হাসিয়া বলিল, ডিম্বা হইতে একটা নিমন্ত্রণ আসিয়াছে সেখানে যাইতেছি। কাল সেখানকার একজন লোক আসিয়া গোপনে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে আমি

যেন গোপনেই সেখানে যাই। কিন্তু আমি দলপতির কাছে অনুমতি লইতে আসিয়াছি। তাহাকে না জানাইয়া অতদূরে যাওয়াটা সঙ্গত হইবে না। আমি আমাদের একটা ঘোড়াও লইয়া যাইব। হাঁটিয়া গেলে ডিম্বায় পৌঁছিতে প্রায় কুড়ি দিন লাগিবে। ঘোড়ায় গেলে হয়তশীঘ্র পৌঁছিব। আমি একটা ঘোড়া পাইতে পারি কি?

আমি বলিলাম, ডিম্বা এখান হইতে অনেক দূর। সেখানে আমরা কেহ কখনও যাই নাই। শুনিয়াছি সেখানে ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজত্ব করে। যদিও আমাদের মতো চাষবাসই করে, কিন্তু তাহারা হিংস্র প্রকৃতির লোক। বাহিরের কাহাকেও ঢুকিতে দেয় না। তুমি সেখানে বন্ধু জোগাড় করিলে কিরূপে? তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে? বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার। সব খুলিয়া বল দেখি,

কন্টকা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। কোনো জবাব দিল না। তাহার পর বলিল, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি কোনো কথা প্রকাশ করিব না। শুধু একটা কথা বলিতে পারি, সেখানে গেলে আমাদের মঙ্গল হইবে, অমঙ্গল হইবে না। যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি আমাকে গোপনে একা যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তোমাব অনুমতি লওয়াটা আমি সঙ্গত মনে করিলাম। তাই তোমাকে বলিলাম। আমাকে আর এ বিষয়ে বেশি প্রশ্ন করিও না, উত্তর দিব না।

দোহা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, ফুলের সাজ পরিয়াছ কেন?

কন্টকা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, ইচ্ছা হইল, পরিলাম। আমি বলিলাম, তোমার খুশি অনুসারেই তুমি চল। আমরা বাধা দিব না। একটা ভালো ঘোড়া লইয়া যাও। আর আমার পরামর্শ যদি শোন, আর একটা ঘোড়ায় দমকে লইয়া যাও। সে দূরে দূরে তোমার পিছু পিছু যাক।

কন্টকা বলিল, না, আমি তাহাদের কথা দিয়াছি একাই যাইব। তবে সঙ্গে কিছু অস্ত্র লইব।

তাহার পর দোহার দিকে ফিরিয়া বলিল, শিকারাকে প্রশ্রয় দিও না। তাহার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। বিরাট বিরানি জঙ্গল তোমাকে রক্ষা করিবে। আমি যতদিন পর্যন্ত না ফিরি ততদিন সেখানে আত্মগোপন করিয়া থাকাই ভালো। আমি চলিলাম।

কন্টকা মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া ঝোপের মধ্যে অন্তর্ধান করিল।

দোহা বলিল, কন্টকার উপদেশই পালন করিব। সম্প্রতি বিরানির মধ্যে বিরাট একটা গুহা করিয়াছি। তাহার চারিদিকে নানারকম গাছ পুঁতিয়াছি। গুহার প্রবেশপথে দুইট গাছ আছে গাছকে ঢাকিয়া আছে দুইটি প্রকাণ্ড লতা। বাহির হইতে গুহার মুখ দেখা যায় না। গুহাটি মাটির নিচে অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেখানেই আমি থাকিব। শিকারা যদি আমার খোঁজ করে, বলিও আমি অন্যত্র গিয়াছি। পনের দিনের আগে ফিরিব না। তুমিও আমার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিও না। দেখা করিতে গেলেই ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইবে। আমি কেবল বিরানির একজন কর্মীকে বলিব আমি কোথায় আছি। সে যদি বোঝে কোনো কারণে আমাকে অবিলম্বে খবর দেওয়া উচিত, তাহা হইলেই আমাকে খবর দিবে। শিকারা যদি আসিয়া খোঁজ করে, বলিও আমি এখানে নাই।

পরদিনই শিকারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম দোহার জন্য সে বড়ই উতলা হইয়া উঠিয়াছে। দেখা হইবামাত্র বলিল, আমি বিরানি জঙ্গল হইতে আসিতেছি। সেখানে দোহাকে তো দেখিলাম না। দোহার খোঁজেই গিয়াছিলাম। সেখানকার একজন লোক বলিল দোহা

কোথায় গিয়াছে তাহা তাহারা জানে না। সে নাকি এখানে নাই। আপনি তাহার কোনো খবর জানেন কি?

বলিলাম, আমাকেও সে বলিয়াছিল সে বিদেশে যাইবে। ঠিক কোথায় যাইবে তাহা বলে নাই।

আমরা মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত ছিলাম না, তাই এই মিথ্যা কথাটা বলিয়া মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। আমার মনোভাব হয়ত আমার মুখে আভাসিত হইয়াছিল।

শিকারা বলিল, আমার নিকট সত্য গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা সত্য তাহা আমি জানি। দোহাকে আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মনে হয় দোহা আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়। তাই সে আমাকে এড়াইয়া চলিতেছে, তাই সে কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু কতদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিবে? তাহাকে একদিন না একদিন ফিরিতেই হইবে। তাহার জন্য আমি অপেক্ষা করিব। আপনি দলপতি, আপনাকেও কথাটা বুঝাইয়া বলি। আমি সত্যই আপনাদের হিতৈষী, আমি আপনাদের আপন লোক হইয়া থাকিতে চাই, আমি আপনাদের অবলম্বন করিয়া এ অঞ্চলে প্রকাণ্ড রাজত্ব স্থাপন করিতে চাই। কিন্তু সর্বাগ্রে চাই দোহাকে। আমি অনেক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছি, কিন্তু দোহার মতো বিরাট পুরুষ আগে কখনও দেখি নাই। আমাকে দেখিয়া অনেক পুরুষ মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দোহা আমার সম্বন্ধে এমন উদাসীন কেন বুঝিতে পারিতেছি না।

বলিলাম, দোহা আপনার সম্বন্ধে উদাসীন নয়। তাহার কথাবার্তায় বুঝিযাছি সে আপনাকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করে। আমাদের সহিত আপনি যে ব্যবহার করিতেছেন এ জন্য সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। কোনো নারীর সঙ্গই সে কামনা করে না। মাছ মাংস খায় না। তাহার স্বভাব সত্যই একটু অদ্ভুত। আমার মনে হয় সে কোনো গোপন কারণে এই খাপছাড়া জীবনযাপন করিতেছে। আমার মনে হয় না এ পথ হইতে কেহ তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে। দোহা বড একরোখা লোক। সম্ভবত কোনো ব্রতপালন করিতেছে সে। সে যদি আপনাকে বিবাহ করিত, অমি খুব খুশি হইতাম। নিশ্চিন্তও হইতাম। আপনার সেনাপতি জোখরু যদি আমাদেরও একটা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া দিত, বাহিরের শত্রু ভয় আমাদের আর থাকিত না। কিন্তু দোহা যদি আপনাকে বিবাহ না-ই করে, তাহা হইলে এ বন্ধুত্ব কি থাকিবে না?

শিকারা হাসিয়া উত্তর দিল, হয়ত মৌখিক বন্ধুত্ব থাকিবে। কিন্তু তাহা কি নির্ভরযোগ্য? আত্মীয়তার বন্ধনই বন্ধুত্বকে দৃঢ় করে দোহা এ কথা কেন বুঝিতেছে না? যাই হোক, আমি কালই এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমার পিত্রালয় একবার যাওয়া প্রয়োজন। ঘুরঘুট খাঁকে বিশ্বাস নাই। সে আবার হয়ত আমার রাজ্য আক্রমণ করিবে। আমার নিকট হইতে ভুলেরাকে সে হয়ত লইবার চেষ্টা করিবে। তাই ভাবিতেছি ভুলেরাকে আপনার কাছেই রাখিয়া যাইব। ঘুরঘুট সত্যই একজন বীরপুরুষ, সে যাহাতে আমার দলে যোগ দেয় এই প্রস্তাব করিয়া তাহার নিকট একজন লোক পাঠাইব মনে করিয়াছি। ভুলেরাকে সাবধানে রাখিবেন, সে যেন পালাইয়া না যায়। ভুলেরা-মূল্যেই আমি ঘুরঘুটকে কিনিব।

আমি বলিলাম, মাপ করিবেন, ভুলেরার দায়িত্ব আমি লইতে পারিব না। আমরা শান্তিপ্রিয় লোক। ভুলেরাকে আমরা আটকাইয়া রাখিয়াছি এ খবর পাইলে ঘুরঘুট খাঁ হয়ত আমাদেরই শত্রু হইয়া উঠিবে। সেটা আমি চাই না।

শিকারা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, শত্রুকে ভয় পান? পৃথিবীতে সবাই শত্রু। শত্রুর সহিত হয় যুদ্ধ করুন, না হয় কায়দা করিয়ে বন্ধুত্বের ভান করুন। আপনারা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু শান্তি চাইলেই কি পাওয়া যায়? অশান্তি কোন্ দিক দিয়া কখন আসিবে কে বলিতে পারে? সেদিক দিয়াই আসুক, অশান্তি আসিবেই। যাই হোক, এখন চলিলাম। কিছুদিন পরে আবার আসিব।

পরদিন শিকারা তাহার সৈন্যসামন্ত লইয়া চলিয়া গেল। ভুলেরাকেও লইয়া গেল সে। শিকারা চলিয়া যাইবার পরদিনই দোহা বিরানি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বলিল, শিকারা আবার ফিরিয়া আসিবে। সে আমাদের এই অঞ্চলটা অধিকার করিতে চায়। আমাকে বিবাহ করিবার যে প্রস্তাবটা সে করিয়াছে তাহা একটা অজুহাত মাত্র। আমাদের অঞ্চলটা সে দখল করিয়া ভোগ কবিতে চায়। তেমুজিনকে বিবাহ করিয়া সে তাহাকে পুতুলে পরিণত করিয়াছিল। আমাকেও তাহাই করিতে চায়। আমাদের বিরানি জঙ্গলে নানারকম ফলের গাছ আমাদের পূর্বপুরুষেরা রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন। সে সব দেখিয়া শিকারার চোখ-মুখে লোভের যে লালায়িত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি। তাহার পিরালা রাজ্য মরুভূমির ওপারে। সেখানে খেজুর ছাড়া অন্য গাছ জন্মায় না, কাছে-পিঠে কোনো নদী নাই। জমি সব শুষ্ক। ফসলও ভালো হয় না। মাংসই উহাদের প্রধান খাদ্য। কিছুদিন আগেই উহারা মরুচারী দস্যু ছিল। এখন গৃহস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই আমাদের এই জনপদটা দেখিয়া শিকারার পছন্দ হইয়াছে। মনে হয় সৈন্যসামন্ত লইয়া সে আবার আসিবে এবং জোর করিয়া আমাদের সব অধিকার করিবে। আমার তো এখন সৈন্যসামন্ত কিছু নাই। তাই আমার মনে হয় তুমি আমাদের রাজাব কাছে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা কর। তাঁহাকে আমরা প্রতি বছব শস্য পাঠাই, চামড়া পাঠাই, ফল পাঠাই। মনে হয় তিনি আমাদের সাহায্য করিবেন।

আমি বলিলাম, আমাদের রাজা আছে শুনিয়াছি। তাঁহাকে দেখি নাই। তিনি বহুদূরে থাকেন। অনেক নদী পার হইয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিতে হয়। আমরা তো কেহ কখনও সেখানে যাই নাই। আমাদের হাটের ব্যাপারী মর্দন আমাদের জিনিসগুলি লইয়া রাজার কর্মচারীর কাছে সেগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। সে কর্মচারীব সহিতও আমাদের পরিচয় নাই। তবে মর্দনকে খবর দিয়া দেখি, সে কী বলে।

দোহা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, তাহাকেই বরং সেই রাজকর্মচারীর কাছে পাঠাও। মোট কথা, আত্মরক্ষার জন্য অবিলম্বে আমাদের কিছু একটা করা দরকার। কন্টকা কী উদ্দেশ্যে যে কোথায় চলিয়া গেল তাহাও তো বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আর একটা কাজ কর, বিদেশের হাটে লোক পাঠাও। কিছু অস্ত্র কিনিয়া আনুক। আমাদের লোকবল আছে, তাহারা হয়ত যুদ্ধবিদায় শিক্ষিত নয়, কিন্তু তাহাদের হাতে অস্ত্র দিলে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। আর কাল টুকচুম্বার তলায় আমরা একটা সভা করিয়া সকলকে ব্যাপারটা জানাইয়া দিব। তাহার পর প্রার্থনা করিব। টুকচুম্বাই আমাদের দেবতা, তাহার নিকট আমাদের বিপদের কথা বলিব।

আমি বলিলাম, আমার এক সৎমা মন্মন গরু পূজা করে, আর একজন সৎমা টুলা ছগল পূজা করে, জিকটুর বিশ্বাস কাকেরা সন্তুষ্ট থাকিলে সমাজের মঙ্গল হয়। সে কাককে প্রায়ই খাবার দেয়। রম্ভা বিড়াল পূজা করে। ঝাঝা রোজ সূর্যপ্রণাম করে। আমি ইহাদের ডাকিয়াও আমাদের বিপদের কথা বলি। তাহারাও নিজের নিজের দেবতাকে ডাকুক।

দোহা বলিল, তা ডাকুক, কিন্তু কাল টুকচুম্বার তলায় সকলে যেন আসে। টুকচুম্বা আমাদের আদি দেবতা। আমাদের পূর্বপুরুষ ডঙ্কা স্বহস্তে ইঁহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার জন্ম ওই টুকচুম্বার তলায়। আমার মা-ও আমরণ ওই গাছের তলায় ছিলেন। টুকচুম্বাকেও কাল পূজা করিব। এখন আমি চলি। বিরানিতে অনেক ডুমুর পাকিয়াছে, হাটে পাঠাইব। ওগুলির বদলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাইলে তাহাই আনিতে বলিব। তুমিও গমের গোলা হইতে কিছু গম বাহির করিয়া বিদেশের হাটে পাঠাও। সেখান হইতেও কিছু ছোরা তলোয়ার বল্লম আসুক।

দোহা চলিয়া গেল। আমি মর্দনের নিকট একজন লোক পাঠাইলাম।

মর্দন খুব বেঁটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী সে। তাহার সমস্ত দেহটাই যেন একটা পেশীর প্রদর্শনী। হাত, পা, বুক গর্দান, সবই পেশীসমৃদ্ধ। কুচকুচে কালো রং। মাথার চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট দুটি বেশ পুরু। আমাদের যাবতীয় বৈষয়িক কাজকর্ম সে-ই করে। নৌকা বোঝাই করিয়া সেই আমাদের মাল বিদেশের হাটে লইয়া যায়। পরিবর্তে বিদেশ হইতে নানারূপ জিনিস আনিয়া দেয়। অনেকদিন আগে আমার বাবার আমলে সে আসিয়া বাবার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। বলিয়াছিল, তাহার আত্মীয়-স্বজনরা তাহাকে নাকি দেবতা বানাইয়া পূজা করিবে এবং পূজা হইয়া গেলে মাটিতে জীবন্ত পুঁতিয়া দিবে। সেই ভয়ে সে পালাইয়া আসিয়াছে। তখন তাহার বয়স অল্প ছিল। গোঁফ-দাড়ি হয় নাই। এখন তাহার প্রচুর গোঁফ দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। বাবা আগে নিজেই নৌকা লইয়া হাটে মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে থাকিত মর্দন। মর্দনের এ ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা। তাই বাবার মৃত্যুর পর মর্দনের ওপর সব ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। মর্দন খুব বিশ্বাসী লোক। অবিশ্বাসী হইবার কোনো কারণও নাই। কারণ আমরা তাহাকে তাহার নিজের বা নিজের পরিবারবর্গের জন্য বিদেশ হইতে যে-কোনো জিনিস সংগ্রহ করিবার অধিকার দিয়াছি। তাহার চারটি পরিবার এবং অনেক প্রণয়িনী। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সে বিদেশের হাট হইতে প্রচুর শৌখীন জিনিস কিনিয়া আনে। নানা রঙের পুঁতির মালা, নানা ধরনের গহনা কাপড় তাহাদের জন্য সরবরাহ করে মর্দন। সে নিজের জন্য একটা চকচকে পাথর বসানো তামার আংটিও কিনিয়াছে। আমরা তাহার এইসব শৌখিনতায় কোনো দিন বাধা দিই নাই। নানা দেশে ঘুরিয়াছে সে। বিদেশ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। আমাদের খাজনা সে-ই রাজকর্মচারীর কাছে প্রতি বৎসর লইয়া যায়।

সে যখন আমার কাছে আসিল তখন তাহাকে সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম। ইহাও জিজ্ঞাসা করিলাম, যে রাজাকে আমরা খাজনা দিই তিনি এ বিপদে আমাদের সাহায্য করিবেন কি না? কীভাবে তাঁহার নিকট আমরা আবেদন জানাইব? মর্দন মুখবিকৃত করিয়া মাথা চুলকাইল, তাহার পর বলিল, আমিও রাজাকে দেখি নাই। প্রতি বছর সুদ্‌মাকে আমরা খাজনা দিয়া আসি। গাংগাং নদী পার হইয়া দুইদিন পায়ে হাঁটিয়া তবে তাহার বাড়িতে পৌঁছানো যায়। আমর নিকট হইতে খবর পাইলে তিনি লোকজন পাঠাইয়া নৌকা হইতে জিনিসপত্র লইয়া যান। সুদ্‌মাকে দেখিলে বেশ বড়লোক মনে হয়। প্রকাণ্ড বাড়ি। লোকজনও অনেক। কিন্তু,

মর্দন আবার মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বলিলাম, থামিয়া গেলে কেন, কী বলিতে চাও বল। মর্দন বলিল, সুদ্‌মাও রাজাকে দেখে নাই। রাজার নামে হুমকি দিয়া সে আমাদের মতো ছোট ছোট জনপদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে। সে সব খাজনা সে নিজেই ভোগ করে, অন্য কোথাও পাঠায় না।

আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। সবিস্ময়ে বলিলাম, রাজার খাজনা নিজেই ভোগ করে? রাজা কিছু বলে না?

মর্দন বলিল, রাজা বোধ হয় জানেই না যে সুদ্মা বলিয়া কোনো লোক তাহার নাম করিয়া এইভাবে খাজনা আদায় করিতেছে। আমাদের খবরও বোধহয় রাজা জানে না। নাবিকদের মুখে শুনিয়াছি রাজা একটা নয়। অনেক রাজা। কেহ নীলনদের ধারে রাজত্ব করে। তাহাদের বড় বড় মন্দির, মন্দিরে নানারকম দেবতা। তাহারা বড় বড় পাথরের স্থান স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের চূড়া আকাশচুম্বী। তাহাদের ভিতর নাকি রাজাদের মৃতদেহ আছে। আরব দেশের মাথার উপরে ব্যাবলদের রাজত্ব। তাহারাও বড় বড় বাড়ি করিয়াছে। বাড়ির ওপর বাড়ি। চারতলা পাঁচতলা। বাড়িকে ঘিরিয়া অদ্ভুত ঢালু রাস্তা। সে রাস্তা দিয়া উপর তলায় চড়া যায়। পাথরের ওপর কিংবা মাটির ফলকের উপর ছবি আঁকিয়া ইহারা লেখে। ইহাদের লোকজন সৈন্যসামন্ত বিস্তর। উহারা মূর্তি প্রস্তুত করে। উহাদের নৌকাও খুব বড় বড়। আমার মনে হয় সুদ্মা ইহাদের চেনে না। ইহাদের নিজেদের মধ্যেও খুব ঝগড়া মারামারি। প্রত্যেকেই অপর লোকের জমি দখল করিতে চায়। সকলেই লোভী। আমার মনে হয় ইহাদের খবর দিলে আমরা নিজেরাই বিপদে পড়িব। ইহারা আসিয়া আমাদের রাজ্য দখল করিবে এবং আমাদের সকলকে ক্রীতদাস করিয়া ফেলিবে। পরের রাজ্য দখল করিবার জন্য ওই সব রাজারা সর্বদাই উৎসুক। আমার বিবেচনায় উহাদের খবর না দেওয়াই উচিত। সুদমাকে বার্ষিক কিছু খাজনা দিলে সুদমা শান্ত থাকিবে। সে-ও আর আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবে না। আমার আর একটা কথাও মনে হয়। ভিংড়াকে তাড়াইয়া দিয়া আমরা ঠিক কাজ করি নাই। এ সব ব্যাপারে দৈবীশক্তির সহায়তা প্রয়োজন। ভিংড়া থাকিলে আমাদের এ সময় উপকার হইত। সে একজন বড় গুণিন ছিল। সে হয়ত কোথাও গিয়া আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি বলিলাম, ভিংড়া হয়ত গুণিন। কিন্তু সে যতদিন এখানে ছিল আমাদের কোনো ইষ্ট করে নাই। অনেকের উপর অত্যাচার করিত। তাই দলপতি হিসাবে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া আমার দুঃখ হইয়াছে, ভয়ও হইয়াছে, কিন্তু তবু তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। সে কোথায় গিয়াছে জান?

মর্দন যাহা বলিল তাহা খুব আশ্চর্যজনক। বলিল, অমি স্বচক্ষে দেখি নাই। কিন্তু মেনকি দেখিয়াছে। সে তখন নদীতে স্নান করিতেছিল। সে দেখিল ভিংড়া একটা আঘাটায় আসিয় লাফ দিয়া নদী পার হইয়া গেল। তাহার পর কিন্তু আর মানুষ রহিল না সে। প্রকাণ্ড একটা শকুনে রূপান্তরিত হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। মেনকি ভয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমাকে ইহা বলিল। মেনকি মর্দনের কনিষ্ঠা পত্নী। মেয়েটি খুব মিথ্যাবাদিনী এবং কল্পনা-কুশল তাহা আমার জানা ছিল। কিছুদিন আগে সে আমাকেই বলিয়াছিল, একদিন মাঠে সে যখন ঘাস কাটিতেছিল তখন সারা আকাশের গায়ে ছোট ছোটা সাদা সাদা মেঘ। একটা মেঘ নিচে মাঠের উপর নামিয়া আসিল। মেঘের ভিতর হইতে বাহির হইল মেঘকন্যা। মেঘকন্যা তাহাকে বলিল, তোমাদের দলপতির গলায় একটি লাল পাথরের মালা আছে, সেটি আমার চাই। সেটি আমাকে আনিয়া দাও, আমি পরিব। আমি কথাটা শুনিয়া অবিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু মেনকিকে সে কথা বলি নাই। ভাবিয়াছিলাম সে মর্দনের স্ত্রী, তাহাকে চটাইয়া লাভ নাই। আমার মালাটা তাহাকে দিয়াছিলাম। কয়েকদিন পরে দেখিলাম মেনকিই সেটি পরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে বলিল, মেঘকন্যা বলিল, তুই আমার বোন, তুই মালাটা পর, তাহা

হইলেই আমার পরা হইবে। তাই আমি পরিয়া বেড়াইতেছি। সুতরাং মেনকি মর্দনকে ভিংড়ার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা যে সর্বৈব বানানো তাহা বুঝিলাম, কিন্তু মর্দনকে বলিলাম না। মর্দনের মনে দুঃখ দিয়া লাভ কী। শুধু বলিলাম, ভিংড়া যখন উড়িয়া গিয়াছে তখন তাহাকে তো আর নাগালের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। এখন এ অবস্থায় কী করা যায় তাহাই বল? মর্দন বলিল, রাজাদের কাছে যাইব না। তবে বলেন তো হাতি বাবার কাছে যাইতে পারি। তাঁহার হাতি যদি দয়া করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে দেয় আর হাতি-বাবা যদি দয়া করেন, তাহা হইলে আমাদের অনেক লাভ হইয়বার সম্ভাবনা। তিনি একজন মস্ত গুণিন। আমি হাতি বাবার নাম শুনি নাই। হাতিও দেখি নাই। কারণ আমাদের এ অঞ্চলে হাতি নাই। তবে হাতি নামে যে বিরাটকায় একটা জন্তু আছে তাহা শুনিয়াছিলাম। মর্দনের কথা শুনিয়া আমার ঔৎসুক্য হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, হাতি বাবা কোথায় থাকেন? মর্দন বলিল, গাংগাং নদীর ওপারে গম্ভীরা জঙ্গলে। সেখানে পৌঁছিতে প্রায় কুড়ি দিন লাগিবে। জমানি নদীতে নৌকা ভাসাইয়া টুম্বার ঘাটে পৌঁছিতে হইবে। সেখান হইতে হাঁটাপথে দিন সাতেক গেলে গম্ভীরা জঙ্গলে পৌঁছানো যাইবে। গম্ভীরা বিশাল জঙ্গল। আর সে জঙ্গলের অধিপতি হাতি বাবা। সে জঙ্গলে অনেক হাতি আছে।

হাতি বাবা হাতি, না মানুষ?

মানুষ। একটি প্রকাণ্ড হাতি তাঁহার সঙ্গী। তিনি হাতির সেবা করেন, হাতিও তাঁহার সেবা করে। হাতি বাবার একটি কুড়াল এবং কাটারি আছে। তাহা দিয়া তিনি সমস্ত দিন হাতির জন্য খাবার সংগ্রহ করেন। গাছের উপর উঠিয়া হাতির জন্য কচি কচি ডাল-পাতা কাটিয়া নিচে ফেলেন, হাতি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সেগুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া খায়। হাতির পীঠে চড়িয়া তিনি ঘুড়িয়া বেড়ান। তাঁহার ঘর বাড়ি নাই। যখন বৃষ্টি হয় তখন হাতির পেটের তলায় তিনি দাঁড়ান। যখন মাটিতে শুইয়া ঘুমান তখন হাতিটি তাঁহার কাছে বসিয়া থাকে। পারতপক্ষে তাঁহার কাছে কাহাকেও যাইতে দেয় না। হাতিটির বিশাল দাঁত, বিশাল কান, বিশাল শুঁড়। দেখিলেই ভয় করে। সেই জন্য কেহ হাতি বাবার নিকটে যাইতে পারে না। তবে লোকে বলে হাতিটি খাদ্যরসিক। ভাল ভাল খাবার দিলে সে প্রসন্ন হয়। গম, জই, কলা তাহার প্রিয় খাদ্য। খাবার দিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিয়া অনেকে হাতি বাবার নিকটে যাইতে পারিয়াছে। অনেককে অনেক বিপদ হইতে হাতি বাবা রক্ষা করিয়াছেন। ক্ষমতাবান লোক উনি। বলেন তো তাঁহার নিকট গিয়া চেষ্টা করি। তবে সঙ্গে কিছু ভাল খাবার লইতে হইবে হাতিটির জন্য।

বলিলাম, বেশ, নৌকা বোঝাই করিয়া খাবার লইয়া যাও। কিছু লোকজনও লও। আমারই তোমার সহিত যাইতে ইচ্ছা কবিতেছে। কিন্তু শিকারা কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার তো ঠিক নাই। দোহাকে জিজ্ঞাসা করি, দেখি সে কী বলে। শিকারার ভয়টা যদি না থাকিত আমি যাইতাম। চল দোহার কাছে যাই।

হাতির কথা শুনিয়া দোহা খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মর্দনকে বলিল, চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব। টালা এখানে থাকুক। শিকারা যদি আসে, সে-ই তাহাকে সামলাইবে।

তাহার পর দিনই বহুরকম খাবার কয়েকটি নৌকায় বোঝাই করিয়া মর্দনের সহিত দোহা চলিয়া গেল। হাতিই তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। সে-ও কখনও হাতি দেখে নাই। আর একটা কারণেও বোধহয় সে স্থান ত্যাগ করিল। সে-কারণটা, শিকারা। শিকারা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে সে যে কী করিবে তাহা স্থির কবিতে পারে নাই।

আমি একা পড়িয়া গেলাম। ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের জনপদের চৌহদ্দিটা আমি পরিদর্শন করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। আমাদের জনপদ সুবিস্তৃত। আমাদের ভাণ্ডারে যে সব অস্ত্র ছিল, বর্শা, তরবারি, খড়্গ, কুঠার, বড় ছোরা, সেগুলি সমর্থ লোকেদের নিকট বিতরণ করিয়া তাহাদের বলিলাম, তোমরা আমাদের জনপদের সীমান্ত রক্ষা কর। আমার আশঙ্কা, বাহির হইতে কোনো শত্রু আসিয়া হয়ত হানা দিবে। তাহারা আমাদের যেন অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করিতে না পারে। আমরাও আরও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিদেশে লোক পাঠাইয়াছি। সেগুলি আসিলে তাহাও তোমাদের দিব। তোমরা সতর্ক থাক। বাহিরের কোনো লোককে আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে দিও না। দেখিলাম আমাদের জনপদের লোকেরা খুবই উৎসাহী। তাহারা নিজেদের মধ্যেই দল করিয়া আমাদের সীমান্ত রক্ষা করিতে লাগিয়া পড়িল। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও। অনেক যুবতী এমনকি কিশোরীও অস্ত্র আস্ফালন করিয়া বলিল, তাহারা প্রাণ থাকিতে শত্রুকে প্রবেশ করিতে দিবে না।

কন্টকা ছিল না, তাই আমি আমার অন্য পত্নীদের খবর লইতে লাগিলাম। কেহ খুশি হইল, কেহ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করিতে লাগিল। কেহ বা অভিমানে মুখ ফিরাইয়া রহিল। লক্ষ্য করিলাম আমার একটি পত্নী, বাহুলা নামক একটি যুবকের সহিত একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে। বাহুলাকে সে রাঁধিয়া খাওয়ায়, মাঝে মাঝে তাহার সহিত রাত্রিবাসও করে নাকি। এ ঘটনা আমি উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিলাম। দেখিয়াও যেন দেখিলাম না, এই ভাব।

এমনি ভাবে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া দিন কাটিতেছিল এমন সময় একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল। আমাদের পশ্চিম সীমান্তের প্রহরীরা একটি লোককে আমার নিকট ধরিয়া আনিল। বেশ বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় লোক। তাহার মাথায় প্রকাণ্ড জালা। সে নাকি বলিয়াছে আমি জালাটি তোমাদের দলপতিকে দিয়া যাইব। যদি আমাকে না যাইতে দাও আমি ফিরিয়া যাইতেছি। কিন্তু জানিও ইহাতে তোমাদেরই ক্ষতি হইবে। লোকগুলি তাই জালাসুদ্ধ লোকটাকে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে। লোকটি বলিল, আপনার অনুচরদের বলুন জালাটা আস্তে আস্তে আমার মাথা হইতে নামাইয়া দিক। সকলে মিলিয়া জালাটা নামাইয়া দিল। দেখিলাম জালাটা প্রকাণ্ড। তাহার মুখে কিছু খড় এবং সবুজ পাতা গোঁজা রহিয়াছে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম জালার মধ্যে কী আছে? সে বলিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার অধিকার আমার নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি আপনার কাছে লোকজন থাকিলে জালার রহস্য আপনি জানিতে পারিবেন না। আপনি যখন একা থাকিবেন তখন জালার রহস্য আপনার নিকট প্রকাশিত হইবে। আমি চলিলাম, লোকটি এই বলিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। আমিও আমার অনুচরদের চলিয়া যাইতে বলিলাম। তাহারা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই জালার ভিতর হইতে শব্দ হইল, আমি তিরখন, গোপনে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার অনুচরেরা কি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে? কাহারও সামনে আমি আত্মপ্রকাশ করিতে চাহি না। আমি তখন কন্টকার শূন্যগৃহে ছিলাম। বলিলাম, না, এখানে কেহ নাই। তিরখন তখন আশ্চর্য কৌশলে জালার ভিতর হইতে বাহির হইল। দেখিলাম সে রোগা হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, এ কী ব্যাপার। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সে বলিল, আমি আসিতেছি ঘুরঘুট খাঁ-র নিকট হইতে।

ঘুরঘুট খাঁ এখন কোথায়?

সে মারো পাহাড়ে আছে। ভুলেবা কোথায় জান?

ভুলেরা শিকারার কাছে আছে। শিকারা কিছুদিন এখানেই ছিল। তখন ভুলেরা তাহার সঙ্গেই ছিল। যাইবার সময় সে তাহাকে লইয়া গিয়াছে। হয়তআবার কোনোদিন আসিয়া হাজির হইবে, তাই আমরা ভয়ে ভয়ে আছি।

তাহার পর তিরখনকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। সে উঠিয়া গিয়া জালার ভিতর হইতে তাহার একতারাটি বাহির করিল এবং একতারা বাজাইয়া গান শুরু করিয়া দিল। সুরটি বড় অদ্ভুত। মাঝে মাঝে যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থামিয়া যায়, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে নাচিতে থাকে। কখনও মিনতি করে কখনও ধিক্কার দেয়। গানটির ভাষা অবশ্য হুনদের ভাষা। তিরখন আমাদের ভাষায় সেটিকে অনুবাদ করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম এই :

ওগো হাওয়া, ওগো হাওয়া
বিচিত্র তোমার আসা যাওয়া
কখনও তুমি ঝিরঝিরে
দোল দাও ছোট ফুলের পাপড়িকে।
কখনও মৃদু মৃদু
উড়িয়ে দাও প্রিয়ার ওড়নাখানি।
কখনও তুমি ঝড়
গাছপালা ভাঙো মড় মড়
সমুদ্রের ছোট্ট ঢেউকে
করে দাও মস্ত, আকাশচুম্বী।
এক দেশের ধুলোকে
নিয়ে যাও অন্য দেশে
ডুবিয়ে দাও নৌকো
ভেঙে ফেল ঘর-বাড়ি।
আবার যখন রামধনু ওঠে
হয়ে যাও ভারি মিষ্টি।
ওগো হাওয়া
আমার একটি মিনতি
আমার ছোট্ট নৌকোর
ছোট্ট পালে
বন্ধুর মতো এসো একবার
পার করে দাও সেই নদীটি
যে নদীর ওপারে সে আছে।

গানের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া তিরখন বলিল, তোমাদের ছোট নৌকার ছোট পালে ওই হাওয়াটি বন্ধুর মতো আসিবে। ঘুরঘুট খাঁ-ই সেই হাওয়া। মারো পাহাড়ে সে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। সে বলিয়া পাঠাইয়াছে তোমরা তাহার সহিত যদি যোগ দাও তাহা হইলে সে শিকারাকে আক্রমণ করিবে। ভুলেরা যদি বাঁচিয়া থাকে সে ভুলেরাকে কাড়িয়া আনিবে। ভুলেরাকে উহারা যদি হত্যা করিয়া থাকে সে হত্যার ভীষণ প্রতিশোধও লইবে ঘুরঘুট খাঁ।

শিকারাকে বন্দী করিয়া সর্বসমক্ষে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। জুনজিরা পাহাড় হইতে সে সর্দার মালেকের বিপুল ধনসম্ভার লইয়া আসিয়াছে। সেই ধনসম্ভার লইয়া বিদেশ হইতে অনেক সৈন্য কিনিয়া আনিয়াছে সে। তাহার ইচ্ছা, তোমরাও তাহার সহিত যোগ দাও।

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু অমি তিরখনকে সে কথা বলিতে পারিলাম না। একটু ঘুরাইয়া বলিলাম, আমার নৌকা ছোট, নৌকার পালও ছোট, কিন্তু ঘুরঘুট যে ঝড়। সে ঝড়ের দাপট কি আমার নৌকা সহিতে পারিবে?

তিরখন বলিল, তোমাকে এখনই যে গানটি শুনাইলাম তাহার মর্ম তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই দেখিতেছি। ঘুরঘুট ঝড়, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে মৃদু সমীরণও হইতে পারে। তোমার ছোট নৌকাকে সে ডুবাইবে না, পারে ভিড়াইয়া দিবে। দেখিতেছি তোমার অপেক্ষা তোমার পত্নী কন্টকা বেশি বুদ্ধিমতী। তুমি যখন সর্দার মালেকের পাল্লায় পড়িয়াছিলে তখন তাহার কৌশলই তোমাকে সর্দারের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। সর্দার মালেক যখন মারা গেল তখন কন্টকাই শিকারার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহাকে তোমাদের দেশে লইয়া আসে। এখন কন্টকা বুঝিয়াছে যে শিকারা তোমাদের জনপদকে গ্রাস করিতে চায়, দোহাকে বিবাহ করিয়া এ অঞ্চলেব সর্বেশ্বরী হইতে চায় সে। তাই সে গোপনে ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান করিতেছিল। তোমাদের জনপদে যে সব মাঝি বিদেশ হইতে আসে, কন্টকা তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া সচেষ্ট থাকিত যদি কেহ ঘুরঘুট খাঁ-র সন্ধান দিতে পারে। একজন মাঝির নিকট সে ঘুরঘুট খাঁর সন্ধান পায়। কোনো পথে গেলে মারো পাহাড়ে যাওয়া যায় তাহার নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এখন মারো পাহাড়ে গিয়া সে হাজির হইয়াছে। তাহার মোহিনী শক্তি দিয়া ঘুরঘুটকে বশও কয়িাছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো সে এখানে নাই। কোথায় গিয়াছে তাহা জানিতে কি?

স্বীকার করিতেই হইল, জানিতাম না।

তিরখন বলিল, সে এখন ঘুরঘুটের কাছে আছে। ঘুরঘুট তোমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে তোমার সম্মতির জন্য কন্টকাই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছে। এখন বল কী করিবে?

আমি একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। সম্মতি দিলে ঘুরঘুট খাঁ সসৈন্যে এখানে আসিয়া পড়িবে। আমাদের লোকজনকে লইয়া এখান হইতে হয়ত সে শিকারাকে আক্রমণ করিবে। আমাদের জনপদের লোকেরা যুদ্ধের কৌশল জানে না। তাহারা দলে দলে মারা পড়িবে। অথচ, কন্টকা ঘুরঘুটের নিকট গিয়া বসিয়া আছে। তাহাকেই বা উদ্ধার করি কী উপায়ে? দোহাও এখানে নাই, হাতি বাবার সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। সত্যই একটু মুশকিলে পড়িয়া গেলাম। অবশেষে তিরখনকে আমার মনোভাব খুলিয়া বলিলাম।

দেখ ভাই তিরখন, যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না। কেবল আত্মরক্ষার জন্য আমরা একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিতে চাই। সেই জন্যই ঘুরঘুট খাঁর সাহায্য চাহিয়াছিলাম। শিকারার কাছেও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। দোহা তাহাতে রাজি নয়। শিকারা এখন অবশ্য চলিয়া গিয়াছে, জানি না আবার আসিয়া হানা দিবে কি না। এখন আমার মনে হইতেছে কী কুক্ষণে সেদিন কন্টকা তোমাদের ছাগলটাকে মারিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া একটা সর্বনাশ যেন আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ আমি মোটেই পছন্দ করি না, এ বিপদ হইতে তুমিই আমাকে উদ্ধার কর।

তিরখন মাথায় একবার হাত বুলাইল। তাহার পরও দাড়িতে কয়েকবার। সহসা তাহার চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাহার পর বলিল দেখ টালা, যুদ্ধবিগ্রহ কেহই পছন্দ করে না। কিন্তু জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য। মরুভূমির তপ্ত বালুকে বা তপ্ত ঝড়কে কো ভালবাসে? কেহই না। কিন্তু তবু তাহাদের এড়াইবার উপায় নাই। তাহাদের সহিত লড়াই করিতে হয়। সে লড়াইয়ে কখনও আমরা জিতি, কখনও হারি। কষ্ট হয়, খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু এ কষ্টকে এড়াইবে কী করিয়া? দোহা যদি শিকারার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া এ অঞ্চলের মালিক হয় তাহা হইলেও সে নিস্তার পাইবে না, কারণ ঘুরঘুট খাঁ শিকারাকে স্বস্তি দিবে না। সে তাহাকে আক্রমণ করিবেই। ভুলেরাকে সে ভুলে নাই। ভুলেরা যদি বাঁচিয়া থাকে ভুলেরাকে সে উদ্ধার করিবেই। ভুলেরা যদি মরিয়া থাকে, সে মৃত্যুর প্রতিশোধ সে লইবেই। আর তোমরা যদি কোনো পক্ষকেই আমল না দাও, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিবে না। তোমাদের সম্পত্তিই লুণ্ঠনকারীদের আহ্বান করিয়া আনিবে। সুতরাং তোমাদের একজন সবল মিত্র থাকা প্রয়োজন। আমার মনে হয়, কামুকী শিকারা অপেক্ষা বীর ঘুরঘুট খাঁ বেশি নির্ভরযোগ্য। ঘুরঘুট অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। সে শিকারাকে বিধ্বস্ত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমরা যদি শিকারার সহিত যোগ দাও, তোমরাও বিধ্বস্ত হইবে। তোমার পত্নী কন্টকা বুদ্ধিমতী, তাই সে ঘুরঘুট খাঁর শরণাপন্ন হইয়াছে। আমার মনে হয়, যদি আপত্তি কর সে বলপ্রকাশ করিয়া তোমার সম্মতি আদায় করিবে। অর্থাৎ সে ঘুরঘুটকে লইয়া এ দেশে আসিয়া হাজির হইবে এবং এ দেশ অধিকার করিবে। শিকারার আধিপত্য সে কিছুতেই সহ্য করিবে না। তুমি সম্মত হও। সম্মত না হইলে তুমি রাজ্যও হারাইবে, পত্নীও হারাইবে।

আমি বলিলাম, দেখ তিরখন, আমার অনেক পত্নী। একজন যদি চলিয়া যায়, খুব বেশি অসুবিধায় পড়িব না। কিন্তু কন্টকাকে আমি ভালবাসি। আমার বিশ্বাস, কন্টকাও আমাকে ভালবাসে। আমার মনে কষ্ট দিয়া আমাদের সমস্ত জনপদকে বিপন্ন করিবে এ কথাও বিশ্বাস হইতেছে না। আমার মনে আর একটা কথাও জাগিতেছে। ভয় হইতেছে, খুলিয়া বলিলে তুমি হয়ত রাগ করিবে। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, তোমার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইতেছে না,

তিরখন বলিল, দেখ টালা, জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি। কষ্ট সহ্য করিবার অসীম ক্ষমতা আছে আমার। অনাহারে, অনিদ্রায়, মরুর তপ্ত বালুতে, শীতে, তুষারঝড়ে দিন কাটাইয়াছি আমি। অনেক প্রভুর কশাঘাতে জর্জরিত হইয়াছি। তুমি এমন কী বলিতে পার যাহা এ সবের চেয়েও কষ্টকর? যাহা বলিতে চাও, নির্ভয়ে বল। আমার কষ্ট যদি হয়ও সে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার আছে।

তখন বলিলাম, কন্টকার নামে তুমি যাহা বলিলে তাহা যে কন্টকারই উক্তি তাহার কিছু প্রমাণ আছে?

তিরখন উঠিয়া পুনরায় জালার নিকট গেল এবং তাহার ভিতর হইতে ছোট একটি পুঁটুলি বাহির করিল। পুঁটুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শুষ্ক ফুলের মালা এবং একটা পুঁতির হার বাহির করিল। এই হারটি আমিই কন্টকাকে উপহার দিয়াছিলাম, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তিরখন বলিল, কন্টকা এইগুলি তাহার কথার প্রমাণস্বরূপ পাঠাইয়াছে। চলিয়া যাইবার আগে সে নাকি এই ফুলের মালা ও পুঁতির হার পরিয়া তোমার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে। সে আর একটি অদ্ভুত কথাও তোমাকে বলিতে বলিয়াছে, এ কথার অর্থ আমি বুঝি না। সে বলিল, তুমি বুঝিবে।

কথাটি ছোট, চিক্-চিক্ম মনে হয় কোনো পাখির ডাক। কন্টকা বলিল এই কথাটি বলিলেই তুমি নাকি বুঝিবে আমি তাহার দূত।

চিক্‌-চিক্‌ শব্দটি শুনিয়াই বুঝিলাম কন্টকাই এ কথা বলিয়াছে তিরখনকে। কারণ ওই 'চিক্‌-চিক্‌' শব্দটি আমাদের দুইজনের মধ্যে একটি সাঙ্কেতিক শব্দ। উহার অর্থ: চল একটু নির্জনে যাই। আমাদের দুইজনের কথা ওটি, তৃতীয় লোক উহার অর্থ জানে না। ইহাও মনে পড়িল যেদিন কন্টকা চলিয়া যায় সেদিন সে বিশেষ করিয়া ফুলের সাজে সাজাইয়াছিল নিজেকে। গলায় পুঁতির হারটিও ছিল। সুতরাং বিশ্বাস করিতেই হইল তিরখনের সহিত কন্টকার দেখা হইয়াছিল। সহসা আর একটা সন্দেহও জাগিল মনে। কন্টকাকে হত্যা করিয়া তাহার গলার হার আনাও তো অসম্ভব নয়। কিন্তু 'চিক্‌-চিক্‌' কথাটা? সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হইল। তিরখন সত্যই তাহার বন্ধুলোক। প্রথম দিনের পরিচয় হইতেই সে তাহার হিতৈষী। বরাবর তাহার মঙ্গলের চেষ্টাই করিয়াছে। তাছাড়া আর একটা কথা আমার মনে হইল। ইহারা যদি আমার বন্ধুত্ব কামনা করে তাহা হইলে কন্টকাকে হত্যা করিলে কি তাহা সুলভ হইবে? আর একটা কথাও ভাবিলাম। ঘুরঘুট খাঁ আমার সম্মতি না লইয়া যদি সদলবলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বাধা দেবার শক্তি কি আমার আছে? শিকারা তো আসিয়াছিল, তাহাকে বাধা দিতে পারি নাই। ঘুরঘুটকেও বাধা দিতে পারিব না। তবু সে যে দূত পাঠাইয়া আমার সম্মতি চাহিতেছে ইহা তাহার ভদ্রতারই প্রমাণ। খুব সম্ভবত কন্টকার মোহে মুগ্ধ হইয়াছে লোকটা। এই মোহের সুযোগ লইয়া কন্টকা তাহার সহিত আমাদিগকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধিতে চায়। শিকারাকে প্রতিরোধ করাই তাহার উদ্দেশ্য।

তিরখন আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়াছিল। আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি এখন ঘুরঘুটের সঙ্গে ভাব কর। ঘুরঘুট একটু গোঁয়ার গোছের, কিন্তু লোক খারাপ নয়। তোমরা তো অসহায়, ঘুরঘুটের মতো শক্তিশালী লোকের বন্ধুত্বই এখন তোমাদের দরকার।

প্রশ্ন করিলাম, সত্যিই কি ঘুরঘুট আমাদের বন্ধু হইবে, না স্বার্থের খাতিরে আমাদের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে?

তিরখন হাসিয়া কহিল, আমার ধারণা স্বার্থের বন্ধন না থাকিলে কোনো বন্ধুত্বই টেঁকে না। আমরা যেটাকে প্রেম বলি সেটাও নিঃস্বার্থ নয়। তাহার মধ্যে মিলন-আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকে। ঘুরঘুটের স্বার্থকে তুমি যদি তোমার নিজের স্বার্থ করিতে পার, তাহা হইলে ঘুরঘুটও তোমার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ভাবিবে। এই নিয়ম। এ নিয়ম তুমি মানিতে পারিবে কি না জানি না, কিন্তু আপাতত কিছুদিনের জন্যও ঘুরঘুটের সহিত বন্ধুত্ব কর। তাহাতে তোমার লাভই হইবে।

আমি বলিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু একটা কথা আছে। কন্টকা আমার প্রিয়তমা পত্নী বলিয়া আমাদের জনপদে অনেকে তাহার উপর বিরূপ। মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই ঈর্ষাবশেই বিরূপ আর পুরুষরা বিরূপ কারণ কন্টকা অনেকের প্রণয় প্রত্যাখান করিয়াছে। কন্টকার চাল-চলন কথাবার্তাতেও একটা অহঙ্কারের টনৎকার আছে। তাই তাহার শত্রু অনেক। এখন একথা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে যে আমি কন্টকারই পরামর্শে ঘুরঘুটকে এ অঞ্চলে বন্ধুরূপে আমন্ত্রণ করিয়াছি তাহা হইলে অনেকেই চটিয়া যাইবে। কথাটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। তখন আমাকে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইবে। দোহা যদি এখানে থাকিত আর দোহই যদি বলিত আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ঘুরঘুটকে বন্ধুত্বে বরণ করিতেছি, তাহা হইলে আমার কোনো দায়িত্ব থাকিত না। আমি তাহার কথা সমর্থন করিয়া

খালাস পাইতাম। কিন্তু দোহা এখানে নাই, কবে ফিরিবে, তাহাও ঠিক নাই। তাই স্থির করিয়াছি টুকচুম্বার তলায় সকলকে সমবেত করিয়া সকলের নিকট কথাটা বলি। তাহারা যদি মত দেয় তাহা হইলে ঘুরঘুটের প্রস্তাবে রাজি হইব।

তিরখন বলিল, আর যদি মত না দেয়?

যদি মত না দেয় তাহা হইলে তাহাদের বলিতে হইবে তোমরা এবার ঘুরঘুটের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। শিকারাও সসৈন্যে আক্রমণ করিতে পারে এ সম্ভাবনার কথাও ভুলিও না। তাহার পর আমাদের এই সুন্দর জনপদ হুনদের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিবে আর আমরা তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকিব যদি তাহারা আমাদের একেবারে নিঃশেষে মারিয়া না ফেলে। আমার বিশ্বাস এসব কথা শুনিলে জনপদের অধিকাংশ লোকেরাই ঘুরঘুটের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। আমার মনে হয় আঁটঘাট বাঁধিয়া কাজ করাই ভাল।

বেশ তাই কর। আমি কিন্তু সভায় যাইব না। আমি এইখানেই আত্মগোপন করিয়া থাকি।

এই বলিয়া তিরখন পুনরায় জালার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমি উঠিয়া গিয়া দামামায় ঘা দিলাম।

দলে দলে নর-নারী আসিয়া টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইতে লাগিল। সেই বিরাট সমাবেশে আমি যখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম তখন সকলেই মন দিয়া তাহা শুনিল। তাহার পর যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি কি তাহা হইলে ঘুরঘুট খাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করিব? তোমাদের কাহারও যদি আপত্তি থাকে বল।

অনেকক্ষণ কেহ কিছু বলিল না।

তাহার পর আমাদের কৃষি বিভাগের প্রধান কর্মী ঘানড়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সে বলিল, দলপতির আদেশ আমাদের সর্বদাই শিরোধার্য। কিন্তু আমরা জানিতে চাই, কন্টকা কোথায়? এ ব্যাপারে তাহার সহিত ঘুরঘুট খাঁর কোনো সম্পর্ক আছে কি?

কী উত্তর দিব প্রথমটা ভাবিয়া পাইলাম না। শেষে মনে হইল সত্য কথাই বলা সমীচীন।

বলিলাম, কয়েকদিন পূর্বে কন্টকা অন্তর্ধান করিয়াছে। সে কোথায় গিয়াছে আমাকে বলিয়া যায় নাই। ঘুরঘুটের নিকট হইতে যে লোকটি এখানে আসিয়াছে তাহার মুখে শুনিলাম কন্টকা শিকারার ভয়ে ভীত হইয়া ঘুরঘুটের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। কন্টকার ভয়, শিকারা কিছুদিনের মধ্যেই এখানে সসৈন্যে চলিয়া আসিবে এবং আমাদের জনপদ অধিকার করিয়া বসিবে।

আমার এক বৈমাত্রেয় ভাই ভালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, শিকারা এতদিন আমাদের হিতৈষিণী ছিল। হঠাৎ সে শত্রু হইয়া গেল? সে স্পর্ধাভরে আমার দিকে চাহিয়া গোঁফ-দাড়ি চুমরাইতে লাগিল।

তখনও সত্য কথা বলিলাম।

বলিলাম, শিকারা দোহাকে বিবাহ করিতে চায়। দোহা কিন্তু তাহাতে সম্মত নয়। শিকারার ইচ্ছা দোহাকে বিবাহ করিয়া অবশেষে আমাদের উপর আধিপত্য করিবে। দোহা এ ফাঁদে পা দিতে রাজি হয় নাই তাই শিকারা এখন আমাদের শত্রু। সে আক্রমণ করিবেই। তাই ঘুরঘুট খাঁর মতো একজন শক্তিশালী বন্ধু আমাদের প্রয়োজন।

আমার বৈমাত্রেয় ভাই ভালা আবার গোঁফ-দাড়ি চুমড়াইয়া বলিল, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে কন্টকা-মূল্যে আমরা ঘুরঘুট খাঁর বন্ধুত্ব কিনিতেছি?

বলিলাম, তুমি যাহা বলিলে তাহার জন্য এখনি তোমাকে আমাদের জনপদ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি। দলপতি হিসাবে সে অধিকার আমার আছে। কিন্তু আমি তাহা করিব না। তোমার অকপট উক্তিতে আমি খুশি হইয়াছি। উত্তরে বলিতেছি, আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য যদি কন্টকা-মূল্যেই ঘুরঘুটের বন্ধুত্ব ক্রয় করি, তাহাতে ক্ষতি কী? কন্টকা আমার সম্পত্তি, তোমার তো নয়। তুমি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছ কেন?

ভালা গোঁফ-দাড়ি চুমরাইতে লাগিল। কোনো জবাব দিল না।

আমি বলিলাম, আমরা এখন বিপন্ন। আমাদের সৈন্য নাই। যুদ্ধের কায়দা-কানুন আমরা জানি না। ঘুরঘুট খাঁর সহায়তায় আমরা শক্তিশালী হইব এই ভরসায় তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহিতেছি। তোমরা মনস্থির করিয়া আমাকে জানাও তোমাদের সম্মতি আছে কি না।

সমবেত জনতা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

হাত তুলিয়া কেহই আমার প্রস্তাব সমর্থন করিল না।

আমি কী করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, এমন সময় একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে একজন অশ্বারোহী চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমবেত জনতার সম্মুখে আসিয়া হাত তুলিয়া বলিল, সাবধান হও, সাত দিনের মধ্যেই শিকারা সসৈন্যে আসিয়া তোমাদের আক্রমণ করিবে। ঘুরঘুট খাঁ তোমাদের সাহায্য করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। তাহার কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও।

অশ্বারোহীর মাথায় শিরস্ত্রাণ, অঙ্গে বহুমূল্য পোশাক, কোমরবন্ধে শাণিত ছুরিকা। মুখে চাপ চাপ দাড়ি। সে যেমন দ্রুতবেগে আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগেই চলিয়া গেল।

আমরা সকলে হতভম্ব হইয়া গেলাম।

আমি আবার বলিলাম, এই অশ্বারোহী কে তাহা আমি জানি না। কিন্তু যে-ই হোক, লোকটি আমাদের হিতৈষী। এখন তোমাদের মনোভাব কী জানাও। আমি আর একটি শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। ওই দেখ টুকচুম্বার শাখায় একটি ফুল ফুটিয়াছে। কাল আরও অনেক ফুল ফুটিবে, গাঁটে গাঁটে অনেক কুঁড়ি দেখিতে পাইতেছি।

সহসা সহস্র বাহু একযোগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইল। বুঝিলাম জনপদের সমর্থন মিলিয়াছে। আমার মনে কিন্তু স্বস্তি ছিল না। আমার বার বার মনে হইতেছিল এইবার আমাদের সুখশান্তি অন্তর্হিত হইল।

বাড়ি ফিরিয়া দেখি আমার বাসায় তন্বী চম্বা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে সুন্দর একটি ছিট। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের জনপদে চম্বাই ছিল শিল্পী। আমাকে দেখিয়া চম্বা বলিল, দলপতি, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। কিছুদিনের মধ্যেই এ স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার স্থান নাই। আমি শান্তি ভালবাসি, শান্তির পরিবেশেই আমি আমার কাজ করিতে পারি। মারামারি হানাহানিতে আমার কল্পনা মরিয়া যাইবে। দোহাও এখানে নাই। তাই ঠিক করিয়াছি আমিও এখানে থাকিব না। তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি। এই ছিটটি আমি প্রস্তুত করিয়াছি। আমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তুমি এটিকে রাখিয়া দাও।

চম্বা ছিটটি আমার পায়ের নিকট রাখিয়া দিল। প্রশ্ন করিলাম, তুমি কোথায় যাইবে?

তা জানি না। অপাতত দুচক্ষু যেখানে যায় সেইখানেই যাইব। তাহার পর যেখানে শান্তি পাইব সেখানেই থাকিব।

দলপতি হিসাবে আমি তাহাকে বাধা দিতে পারিতাম। কিন্তু দিলাম না। চম্বা, শিল্পী চম্বা, চলিয়া গেল।

তিরখন এতক্ষণ জালার ভিতর বসিয়া ছিল। আমার সাড়া পাইয়া জালা হইতে বাহির হইয়া আসিল। সব শুনিয়া বলিল, অশ্বারোহীটিকে চিনিতে পারিলে?

' না।

ও তোমার পত্নী কন্টকা। কথা ছিল, আমি এখানে পৌঁছিয়াছি এ সংবাদ পাওয়ার পর ও এখানে ছদ্মবেশে আসিবে। কণ্ঠস্বরও বোধ হয় বিকৃত করিয়াছিল তাই চিনিতে পার নাই।

আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

তিরখনও কোনো কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিরখন, এইবার কী হইবে বল তো—

তিরখন হাসিল। তাহার পর জালার ভিতর হইয়া তাহার একতারাটি বাহির করিয়া গান ধরিল:

এখন তো আকাশ পরিষ্কার
শিশিরও পড়ছে
গাছেও ধরেছে সহস্র কুঁড়ি
ফুল হয়ত ফুটবে।
কিন্তু আগামী কাল যে ঝড় হয়ে
সব তছনছ করে দেবে না
এর জিম্মাদারী
কে হবে, কে হবে, কে হবে!
তাকে তুমিও চেন না
আমিও না,

কয়েকদিন পরেই ঘুরঘুট আসিয়া পড়িল। মহাসমারোহে আসিল। বহু অশ্বারোহী, বহু পদাতিক, বহু রকম অস্ত্রশস্ত্র, বহু কাড়া-নাকাড়া-দামামা লইয়া এমন একটা জাঁকজমক করিয়া সে হাজির হইল যে আমরা একটু ভয় পাইয়া গেলাম। শুধু সৈন্যসামন্ত ও ঘোড়া নয়। তাঁবুও আসিল প্রচুর। বিরানি জঙ্গলের পাশ দিয়া যে জমানি নদীটি বহিয়া গিয়াছে তাহারই তীরে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের জনপদের ভিতর অতবড় বাহিনীর স্থান সঙ্কুলান হইত না। তাহাদের সঙ্গে মেয়েও আসিয়াছিল। নানা চেহারার অনেক মেয়ে। তাহারা অসিয়াছিল 'ইউর্ত' নামক এক প্রকার শকটে চড়িয়া। এক একটি শকট আয়তনে বেশ বড়। তাহার ভিতর একটি পুরা গৃহস্থালীর সমস্ত আয়োজন বিদ্যমান, এমন কি উনুন পর্যন্ত। প্রত্যেক 'ইউর্ত' গম্বুজাকৃতি তাঁবু দিয়া ঢাকা, গম্বুজের উপরে ধূম-নির্গমনের পথ। দশ-বারোটি প্রকাণ্ড বলদ এক একটি 'ইউর্ত' টানিয়া লইয়া যায়। এইরূপ বহু ইউর্ততে চড়িয়া বহু নারীর-সমাগম হইল। এতগুলি নরনারীর এতগুলি ঘোড়া-গরুর খাওয়ার ব্যবস্থা কী করিয়া করিব ভাবিয়া আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুরঘুট খাঁ আমাকে নিশ্চিত করিল। সে প্রথমেই ঘোড়া হইতে নামিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল। তাহার পর বলিল, আমি আপনার তাঁবেদার। যাহা হুকুম করিবেন তাহাই করিব। আমাদের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমরা হুন, আমরা স্বাবলম্বী, আমাদের খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গেই থাকে। আমাদের সমস্ত রসদ

বাহির হইতে প্রত্যহ আসিবে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। খচ্চর বাহিত হইয়া, নৌকায় করিয়া, শকটে বোঝাই হইয়া আমাদের খাবার বাহির হইতে প্রত্যহ আসিবে। আপনাদের নিকট হইতে আমরা কোনো খাদ্যদ্রব্য লইব না। আপনারা কেবল প্রশস্ত স্থান দিন একটা যেখানে আমরা আড্ডা গাড়িতে পারি।

জমানি নদীর তীরে সুবিস্তৃত ফাঁকা মাঠ দেখিয়া ঘুরঘুট খুশি হইল। তাহার পর বলিল, আপনাদের জনপদের যে সব যুবকদের লইয়া আপনারা সৈন্যদল গঠন করিবেন তাহাদেরও এইবার আমার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমি অবিলম্বে তাহাদের শিক্ষা দিতে শুরু করিব। হুন যোদ্ধার তিনটে গুণ প্রয়োজন। তাহাকে ক্ষিপ্র অশ্বরোহী, দুর্দান্ত সাহসী ও বিশ্রামহীন পরিশ্রমী হইতে হইবে। সিংহের বিক্রমের সহিত শ্যেনপক্ষীর ক্ষিপ্রতা ও খচ্চরের সতর্ক সহিষ্ণুতা আয়ত্ত না করিলে হুনযোদ্ধা হওয়া যায় না। এজন্য অন্তত এক বৎসর সময় লাগিবে, তাই আর কালবিলম্ব করিতে চাই না। আর একটা কথা, আমি এখান হইতেই শিকারার রাজ্য আক্রমণ করিতে পারি। আমার স্ত্রী ভুলেরাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। আপনার স্ত্রী কন্টকা শিকারার সহেলি। তাহাকে শিকারার নিকট পাঠাইয়াছি। যদি সে ভুলেরাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে। না, ভয় পাইবেন না। একশত অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া আমার দূতরূপে সে শিকারার নিকট গিয়াছে। শিকারা তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। শিকারা যদি বুদ্ধিমতী হয়, ভুলেরাকে কন্টকার সহিত ফিরাইয়া দিবে। যদি না দেয় তাহা হইলে শিকারাকে আমি ধ্বংস করিব। মারো পর্বতের নিকটবর্তী সমস্ত স্থান আমি অধিকার করিয়াছি। আমি সেখানেও একটা বিরাট সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছি। আমার বন্ধু জারিলা তাহাদের সেনাপতি। বিপুল শক্তিশালী লোক সে। কোনো যুদ্ধে কখনও হারে নাই। ভুলেরাকে লইয়া কন্টকা যদি না ফেরে তাহা হইলে শিকারার সহিত তুমুল যুদ্ধ অনিবার্য। সে যুদ্ধে আপনাদেরও যোগ দিতে হইবে। হাতে-কলমে না শিখিলে কোনো কাজই শেখা যায় না। আপনার জনপদের যুবকেরা কালই আমার সহিত দেখা করুক। ঘুরঘুট খাঁ এক নিশ্বাসে একটানা এতগুলি কথা বলিয়া গেল। মনে হইল যেন মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে। আমাকে কিছু বলিবারই অবসর দিল না সে। অবশেষে সে থামিল এবং আমার হাত দুইটি ধরিয়া সোচ্ছ্বাসে করমর্দন করিল।

বলিলাম, আপনারা বন্ধুরূপে আসিয়াছেন বন্ধুরূপেই আমাদের মধ্যে থাকুন। আপনাদের সংবর্ধনায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবে, ক্ষমা করিয়া লইবেন। কন্টকার জন্য সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। সে কবে ফিরিবে? কতদিন তাহার জন্য আমি অপেক্ষা করিব?

ঘুরঘুট বলিল, আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই তাহার ফিরিবার কথা। পূর্ণিমা পর্যন্ত তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিব। যদি কোনো খবর না আসে, শিকারার পিরালা রাজ্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব। কন্টকার সহিত একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য গিয়াছে। তাহারা সকলেই আমার বিশ্বস্ত অনুচর। প্রাণ থাকিতে তাহারা কন্টকার অনিষ্ট হইতে দিবে না। আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই। আপনি ধৈর্য ধরুন।

পূর্ণিমা আসিল এবং চলিয়া গেল কিন্তু কন্টকা ফিরিল না। মারো পর্বত হইতে ঘুরঘুটের সেনাপতি জারিলা বহু সেনা-সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের জনপদের অনেক যুবক পিরালায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহাদের মনের খবর জানি না, বাহিরে দেখিলাম তাহারা খুব উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। ঘুরঘুটের বড় বড় ঘোড়ায় চড়িয়া তরোয়াল উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের ছুটাছুটির ধূম পড়িয়া গেল। যুদ্ধ যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তাহা তখনও

তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। প্রকৃত যুদ্ধে যে কী বিভীষিকা তাহা আমারও অজানা ছিল। মুখে ঘুরঘুটের বীরত্ব আস্ফালনে সায় দিতেছিলাম বটে কিন্তু মনে মনে আমিও শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলাম। কন্টকার জন্যও খুব চিন্তা হইতেছিল। মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতেছিল, সে বাঁচিয়া আছে তো। ঘুরঘুট চতুর্দিকে গুপ্তচর পাঠাইয়াছিল। তাহারাও কেহ ফিরিয়া আসে নাই। আমার দুশ্চিন্তা উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। এমন সময় একজন গুপ্তচর ফিরিল। সে আসিয়া খবর দিল জিগাসা নদীর তীরে ধনুর্বাণধারী কিছু লোক আড্ডা গাড়িয়াছে। তাহাদের দলপতির নাম ভিংড়া। আর তাহার সহকারীরূপে যে লোকটি সেখানে রহিয়াছে তাহার নাম ভালা। টেংরু, দাম্‌ভা, জেইজেই নামে আরও তিনজন আছে। গুপ্তচরের সন্দেহ, তাহারা এই জনপদেরই লোক। বুঝিলাম আমার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা আমার বিরুদ্ধে একটা দল পাকাইতেছে। বিতাড়িত ভিংড়াকে তাহারা দলপতি করিয়াছে। ঘুরঘুট জিগাসা করিল উহাদের কী ও অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিব? উহারা যদি শত্রু হয় তাহা হইলে উহাদের অবিলম্বে বিনাশ করাই কর্তব্য। আমি মানা করিলাম। বলিলাম, এখন উহাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। উহারা আমার আত্মীয়। হয়ত শেষে উহারা আমাদের দলেই যোগ দিবে। দিন তিনেক পরে দ্বিতীয় গুপ্তচরটি ফিরিল। সে শিকারার পিরালা রাজ্যের দিকে গিয়াছিল। সে বলিল পিরালা রাজ্যে ভীষণ উত্তেজনা। কন্টকা ভুলেরাকে হরণ করিয়া পালাইয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। যে একশত অশ্বারোহী সৈন্য কন্টকার সহিত গিয়াছিল শিকারা তাহাদের সকলকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শিকারার সৈন্যবাহিনীতে একটা সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। শিকারার সেনাপতি জোখরু খেখুন সম্প্রদায়ের বহু লোককে সৈন্যদলে ভর্তি করিতেছেন। পোলং জঙ্গল হইতে মশাল প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক গাছ কাটা হইতেছে। গুজব, শিকারা শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করিবে। এইসব শুনিয়া আমার মনের অবস্থা যাহা হইল তাহা অবর্ণনীয়। দোহা থাকিলে তাহার বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতাম। কিন্তু সে যে কবে ফিরিবে তাহা তো অনিশ্চিত। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম টুকচুম্বায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। টুকচুম্বা যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘুরঘুট খাঁকে বলিলাম, টুকচুম্বায় ফুল ফুটিলে আমরা তাহাকে পূজা করি। তাহার তলায় দুধ ঢালি। অনেক সময় পশুও বলি দিই। তাহার পর তাহাকে ঘিরিয়া নাচ-গান করি।

ঘুরঘুট বলিল, আমার আপত্তি নাই। আপনাদের বৃক্ষদেবতাকে পূজা আপনারা করুন। কিন্তু বেশি উন্মত্ত হইয়া উঠিবেন না। যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে, এ সময় বেশি উন্মাদনা মারাত্মক। যুদ্ধের সময় যে-কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা পরাজয়ের কারণ হইতে পারে।

ঘরঘুট খাঁর কথা যুক্তিযুক্ত, তবু তাহার কথায় মনে আঘাত লাগিল। মনে হইল, তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটা প্রভু-সুলভ সুর শুনিতে পাইলাম। কষ্ট হইল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

দামামায় ঘা দিলাম। দলপতি-রূপে আদেশ দিলাম টুকচুম্বায় পূজা হইবে।

পরদিন যথারীতি সবই হইল। প্রচুর দুধ ঢালা হইল, একটি মেষ বলি দিয়া তাহার রক্তে টুকচুম্বার কাণ্ড রঞ্জিত করিলাম। নাচ-গান-বাজনাও হইল প্রচুর। ঘুরঘুটের দলের অনেকে আসিয়া যোগ দিল। কিন্তু আমার মনে হইল পূজার সুরটি যেন ঠিক বাজিতেছে না। কোথায় কিসের যেন একটা অভাব রহিয়া যাইতেছে। হয়ত অভাবটা আমার মনের মধ্যেই ছিল। অবশ্যম্ভাবী বিপদের করাল ছায়া আমার মনের দীপ্তিকে ঢাকিয়া দিয়াছিল।

পরদিনই শিকারা আসিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ করিল আমাদের। কৃপাণ ও বর্শা হস্তে বীরবিক্রমে বহু অশ্বারোহী আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমিও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া একটা ঘোড়ার উপর চড়িয়াছিলাম। ঘুরঘুট আমার বুকে পিঠে উরুদেশে বাহুতে লৌহবর্ম পরাইয়া দিয়াছিল। আমার হাতেও একটা বর্শা ছিল। সহসা দেখিলাম একটা অশ্বারোহী উন্মুক্ত কৃপাণ লইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার বর্শাটা তাহার স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। বর্শার ফলক স্কন্ধকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া দিল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল। তখন আমি আমার কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া সবেগে সৈন্যব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার অসির আঘাতে একজনের হস্ত ছিন্ন হইল, একজনের গলদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। আমার চারিদিকে রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। দেখিলাম আমার প্রিয় ভৃত্য দম আমার ঠিক পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছে। অপর পার্শ্বে রহিয়াছে ক্রীতদাসী বোরিলা। তাহারও অঙ্গে যোদ্ধৃবেশ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ। দম এবং বোরিলা আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পার্শ্বরক্ষীরূপে আসিয়াছিল। দেখিলাম তাহারা প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুনিধন করিতেছে। ঘুরঘুট খাঁ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে একদল করিয়া বর্শাধারী অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া বিপক্ষের সৈন্য আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বিশেষ সফল হইতেছিল না। চারিদিকে তুমুল চীৎকার, আর্তনাদ, চারিপাশে অশ্ব, অশ্বারোহী, রক্ত, আর ছিন্নভিন্ন শব-স্তূপ। আমি মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল আমরা মানুষ নই, আমরাও পশুর অধম, আমরা নরঘাতী রাক্ষস। নিজের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা মনের মধ্যে আবর্তিত হইতেছিল। হঠাৎ একটা গগনভেদী আর্তনাদ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের কৃষি বিভাগের বিরাটকায় বলিষ্ঠ ঘানডার দক্ষিণ বাহুটি ছিন্ন হইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল। দক্ষিণ স্কন্ধমূল হইতে ফোয়ারা দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঘানডা মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতে করিতে আমার চোখের সম্মুখেই মরিয়া গেল। তাহার মৃতদেহের উপর দিয়া একের পর এক অশ্ব ছুটিয়া গেল। ঘানডা আমাদের জনপদের প্রাণস্বরূপ ছিল, সে প্রাণ সহসা নিবিয়া গেল, ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ঘুরঘুটের অনেক সৈন্যের হাতে কুঠার ছিল। দেখিলাম সেই কুঠার দিয়া তাহারা শিকারার সৈন্যদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেছে। সহসা আমার সামনের সৈন্য-প্রকার ভেদ করিয়া একটা প্রকাণ্ড জোয়ান খড়্গ আস্ফালন করিতে করিতে আমার খুব নিকটে আসিয়া পড়িল। হয়ত সে খড়্গ আমার উপরই পড়িত কিন্তু কোথা হইতে একটা তীক্ষ্ণ তীর আসিয়া তাহার গলদেশে বিঁধিল। সে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিকারার আর একদল খড়্গধারী সৈন্য আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিতে লাগিল, আমার পিছন হইতে আমার রক্ষী সৈন্যরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমিও আমার অসি তুলিয়াছিলাম কিন্তু সহসা পিছন দিক হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া উঠিল, পালাও, পালাও, পিছু হটিয়া এস। ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া দেখিলাম ঘুরঘুট খাঁ রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া আদেশ দিতেছে। ঘুরঘুটের সব সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতেছে। ঘুরঘুটের কাছে যাইতেই সে বলিল, আমাদের অনেক সৈন্য এবং অনেক অশ্ব মারা গিয়েছে। শিকারার নতুন সৈন্যদল আসিতেছে। আমিও মারো পাহাড়ে আরও সৈন্য আনিতে পাঠাইয়াছি, তাহারা যতক্ষণ না আসে আমরা বিরানি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করিয়া থাকিব। আপনি ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। আপনার ভাই ভিংড়া ও ভালা ধনুর্বাণধারী একদল সৈন্য লইয়া আমাদের সৈন্যদেরই

মারিতেছে। আপনাকে লক্ষ্য করিয়াও তাহারা একটা তীর ছুঁড়িয়াছিল কিন্তু তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আপনার আততায়ীর কণ্ঠে গিয়া বিঁধে। আমার সৈন্যদল যতক্ষণ না আসিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত থাক। আসুন আমরা বিরানি জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়ি।

আমি বলিলাম, তাহা হইলে তো শিকারা এখনই আমাদের জনপদ দখল করিয়া লইবে। ঘরে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে। অবশেষে বিরানিতেও প্রবেশ করিবে। আসুন, না পালাইয়া আমরা উহাদের বাধা দিই। আমাদের জনপদের লোকসংখ্যা কম নয়। তাহাদের কাছে কিছু কিছু অস্ত্রও আমি দিয়াছিলাম। আমরা পালাইব না, যতক্ষণ প্রাণ থাকে প্রতিরোধ করিব। আপনিও আপনার সৈন্যরা যদি পিছু হটিতে চান, আমি বাধা দিব না। কিন্তু আমরা পালাইব না, আমরা যুদ্ধ করিব। আমাদের দেবতা মহাবৃক্ষ ওই টুকচুম্বা সহস্র সহস্র ফুল ফুটাইয়া আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব। আপনি যদি পশ্চাদপসরণ করিতে চান করুন। আমি ঘোড়ার মুখ ফিরাইলাম।

আমি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার সম্মুখ দিকে আগাইয়া গেলাম। ঘুরঘুটের সৈন্যরা ঘুরঘুটের আদেশে সকলেই পলাইতেছে। শিকারার সৈন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ঘুরঘুটের সেনাদল সকলেই বিরানির দিকে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দেখিলাম সম্মুখে কয়েকটা অশ্বারোহীহীন অশ্ব পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। তাহাদের আশেপাশে কাটা হাত, ছিন্ন মুণ্ড আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শব। সহসা একটা বল্লম আসিয়া আমার বুকে লাগিয়া প্রতিহত হইল। ঘুরঘুট আমাকে বর্মাবৃত করিয়াছিল, বল্লম আমার গায়ে বিঁধিল না। আমি অসি নিষ্কাষিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে সজোরে আঘাত করিলাম। তাহার নীচের চোয়ালটা খসিয়া গেল। অদ্ভুত ভয়ঙ্কর মূর্তি লোকটা তবু কিছুদূর আগাইয়া আসিল, তাহার পর পড়িয়া গেল। হঠাৎ পিছনে একটা রে রে রে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছাড়াইয়া গেল। জনপদের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই একযোগে বিরাট সমুদ্র-তরঙ্গের মত ছুটিয়া আসিতেছে। কাহারো হাতে লাঙ্গল, কাহারো হাতে খন্তা, কাহারও হাতে কোদাল, কাহারও হাতে কুঠার। দেখিলাম বৃদ্ধা ঝাঝা, মম্মন, টুলা, ভর্না, বাবলা ও প্রত্যেকেই বড় বড় কাটারি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। অনেক মেয়েদের হাতে বঁটি। আমাদের জনপদের আহত আত্মসম্মান জাগিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণে যে কী আনন্দ হইল তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। আশা হইল আমাদের মধ্যে অনেকে মরিবে কিন্তু পরাজয় স্বীকার করিবে না। শিকারার সৈন্যরা সবাই অশ্বারোহী, তাহাদের হাতে খড়্গ, অসি, বল্লম, কুঠার। এ যুদ্ধ অসম যুদ্ধ। তবু যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া অসি চালাইতে লাগিলাম। আমাদের নিজেদের কিছু অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তাহারাও মরীয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর বুঝিলাম আমাদের অনেক লোক মরিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা বাধা দিয়াছে। শিকারার বাহিনীও অবাধে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আমার জনপদবাসীরা তাহাদের গতিরোধ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, কোদাল, লাঙল, বঁটি, কাটারি প্রভৃতির বিষম প্রহারে ঘোড়াগুলির মুখ চোখ নাক মুখ জখম হইতেছিল, তাহার পিছু হটিয়া পালাইবার উপক্রম করিতেছিল। আমার মনে হইল, আহা, এ সময়ে আমাদের যদি আরও কিছু অশ্বারোহী সেনা থাকিত তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণরূপে শিকারার গতিরোধ করিতে পারিতাম। সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের বিরুদ্ধে পদাতিকরা কতক্ষণ যুঝিতে পারে। এ সময় আকুল চিত্তে কিছু অশ্বারোহী সৈন্যের অভাব বোধ করিতে লাগিলাম। ঘুরঘুট খাঁকে খবর পাঠাইলাম সে আবার

আসিয়া আক্রমণ করুক। কিন্তু সে আসিল না। বলিয়া পাঠাইল মারো হইতে তাহার নতুন অশ্বারোহী সৈন্যেরা না আসা পর্যন্ত বিরানি জঙ্গলেই তাহারা বিশ্রাম করিবে। শিকারার সৈন্যরা আমাদের অসহায় প্রায়-নিরস্ত্র জনপদবাসীদের নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড বল্লমের আঘাতে অনেকে ভূশায়ী হইল। ঘোড়ার পায়ের তলাতেও নিষ্পিষ্ট হইল অনেকে। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় সহসা একটা তূর্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর ঘন ঘন তূর্যধ্বনি হইতে লাগিল। দেখিলাম আমাদের মাঠের দিক হইতে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে। কাহার সৈন্য? ঘুরঘুটের নতুন সেনাদল কি আসিয়া পড়িল? কিন্তু ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তো অন্যপ্রকার, চেহারাও অন্য রূপ। ঘুরঘুটের সৈন্যদলের পোশাক কৃষ্ণবর্ণ, ঘুরঘুটের সৈন্যদলের অধিকাংশ লোকও কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু ইহাদের পোশাক সবুজ, ইহাদের বর্ণ গৌর। ইহাদের চোখ টানা টানা, চোখের মণি কুচকুচে কালো। সৈন্যদলের পুরোভাগে প্রকাণ্ড ঘোড়ার উপর চড়িয়া যে আমার দিকে দ্রুতবেগে আগাই-- আসিল। দেখিলাম সে অশ্বারোহী নয়, অশ্বারোহিনী। চীৎকার করিয়া সে বলিল, আমাকে চিনতে পার টালা? আমি সুলমা। সেই যে অনেকদিন পূর্বে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া পলাইয়াছিলাম। কিন্তু এসব কী?

বলিলাম, আমরা আক্রান্ত হইয়াছি। পিরালা রাজ্যের শিকারা আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী নাই, কী হইবে জানি না।

সুলমা বলিল, ভয় কী। আমি তোমাদের জন্যই সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। আমাদের সেনাপতি আখেব খুব বড় যোদ্ধা। তোমার কপাল হইতে রক্ত পড়িতেছে। তুমি চল, আখেবের কাছে, সে যুদ্ধের সব ভার লইবে। তুমি চলিয়া এস।

যুদ্ধের কোলাহল হইতে সুলমা আমাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল। তাহার সেনাপতি আখেব বিরাটকায় লোক। ধপধপে ফরসা রং, মুখে বাদামি রঙের চাপ দাড়ি ও গোঁফ। মাথার শিরস্ত্রাণ হইতে স্বর্ণজ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সুলমা যে ভাষায় তাঁহার সহিত কথা কহিল সে ভাষা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা বুঝিলাম সুলমাই এ বাহিনীর প্রকৃত নেত্রী, আখেব তাহার ভৃত্য মাত্র।

সুলমার কথা শুনিয়া আখেব চীৎকার করিয়া উঠিল: জাম্বারিন্ কা হাফ্‌তা কা কাফ্‌তা। সঙ্গে সঙ্গে সুলমার সৈন্যবাহিনী সবেগে শিকারার সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কা হাফ্‌তা কথার মানে বোধহয় অবিলম্বে আক্রমণ কর। যুদ্ধ আবার তুমুল হইয়া উঠিল।

সুলমা বলিল, চল আমরা একটু দূরে নির্জনে যাই, তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে। কাছে পিঠে কোনো নির্জন জায়গা ছিল না। ভিংড়া যে পাহাড়টায় থাকিত সেই দিকেই আমরা অশ্বচালনা করিলাম।

আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু সেই পাহাড়ের সানুদেশে অবতরণ করিয়া আমি হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম সুলমা কাঁদিতেছে। তাহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুর প্রস্রবণ নামিতেছে।

এ কী সুলমা, তুমি কাঁদিতেছ কেন?

দুঃখে নয়, আনন্দে কাঁদিতেছি। আনন্দ তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি বলিয়া। আনন্দ তোমার বিপদের সময় অশ্বারোহী সেনা দিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে পারিয়াছি বলিয়া। এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর আমার জীবনের একটি মাত্রই লক্ষ্য ছিল তোমাদের জন্য একটি অশ্বারোহী

সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিব। ইহার জন্য যাহা যাহা করিয়াছি তাহার বিবরণ আর একদিন বলিব। দীর্ঘ সে কাহিনী। আমার একটি প্রশ্ন: আমাকে এখনও তুমি ভালবাস তো?

বলিলাম, বাসি। তুমি যেদিন ঘোড়ায় চড়িয়া গেলে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মনে মনে প্রত্যাশা করিয়া আছি তুমি ফিরিয়া আসিবে। আজ সে প্রত্যাশা সফল হইয়াছে। আজ সত্যই বড় আনন্দের দিন। সুলমা তুমি কাঁদিও না।

সুলমা কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, কিন্তু একটা কথা না বলিলে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হইবে না। সুদীর্ঘকাল তোমার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি। এই সময়ে আমি একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছি। আমার একটি ছেলে হইয়াছে। তাহাকে দেশে রাখিয়া আসিয়াছি। কে তাহার বাবা সঠিক আমি জানি না। তুমি এ-সব কথা শুনিয়াও কি আমাকে আর ভালবাসিতে পারিবে? আমরা পুত্রকে তোমার নিজের পুত্রের মতো গ্রহণ করিবে?

আমি ইহা শুনিয়া খুব বিস্মিত হইলাম না। সে যুগে যৌন-ব্যাপারে স্বাধীনতা এমন সীমাবদ্ধ ছিল না। বিস্মিত হইলাম না, কিন্তু মনে মনে ব্যথিত হইলাম। একটু ঈর্ষাও হইল।

বলিলাম, তোমার ছেলেটি কত বড়?

আগামী শুক্লপক্ষে সে সাত মাসে পড়িবে। তাহাকে ধাত্রীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, এইখানেই তাহাকে লইয়া আসিব।

আমি মাথা হেঁট করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম আমিও জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। এই কারণে সুলমাকে ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই।

বলিলাম, যুদ্ধটা শেষ হোক। তখনও আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি তোমার ছেলেকে এখানে আনাইবার ব্যবস্থা করিব। তাহাকে আমার পুত্রের মর্যাদাই দিব। তুমি কিন্তু আমাকে আর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। তোমাকে আর কাছ-ছাড়া করিব না।

সুলমা আমাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, বিশ্বাস কর একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের ভালবাসি নাই। ভালবাসি শুধু তোমাকে। না বাসিলে ফিরিতাম না। বিশ্বাস কর, তোমার সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্যই অনেক পুরুষকে প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে। তোমার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করাই আমার জীবনের ব্রত ছিল। সে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আমার মনে আজ যে কী আনন্দ, কী গর্ব, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না,

সহসা একটা তীক্ষ্ণ শব্দে সচকিত হইয়া আকাশের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম একটা বাদামি রঙের বাজ চক্রাকারে উড়িয়া উড়িয়া শব্দ করিতেছে , কেক্ কেক্ কেক্, কী-ই-ই। এ পাখি আগে দুইবার আমাদের জনপদে আসিয়াছিল। প্রথমবার, যেদিন দোহা ভালুক মারিয়া আনে। ভালুকের মাংস খাইবার অনুমতি এই পাখিটিই দিয়াছিল। ভিংড়া ইহার দিকে তীর ছুঁড়িয়া ছিল কিন্তু মারিতে পারে নাই। দ্বিতীয়বার, দোহা ইহাকে তাহার 'ফানডি'তে রাখিয়াছিল। সবুজ রং মাখাইয়াছিল।

কেক্, কেক্, কেক্, কী-ই-ই,

চক্রাকারে উড়িয়া পাখিটা কয়েকবার ডাকিল, তাহার পর টুকচুম্বার দিকে উড়িয়া চলিয়া গেল।

কী কথা বলিয়া গেল পাখিটা? মনটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। ও কী সংবাদ আনিয়াছে? সুলমা প্রশ্ন করিল, কী দেখিতেছ?

ওই পাখিটা। উচ্চকণ্ঠে ও কী বলিয়া গেল? কর্করা পাখিরা যখন ডাকিতে ডাকিতে আকাশ জুড়িয়া আসিত তখন আমরা ভীত হইতাম। তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের গমের ক্ষেতে নামিয়া ফসল নষ্ট করিত। এ পাখি কী সঙ্কেত বহন করিয়া আনিল?

সুলমা বলিল, আমাদের দেশে ও পাখির নাম রাজাবাজ। ও সাপ ধরিয়া খায়। আমরা উহাকে খুব সম্ভ্রম করি, কারণ ও পাপীকে শাস্তি দেয়। তুমি ভয় পাইও না, রাজাবাজ মঙ্গলের বার্তাবহ।

এমন সময় একজন অশ্বারোহী আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। যুদ্ধের কোলাহল দূর হইতে অস্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। অশ্বারোহী আসিয়া বলিল, ঘুরঘুট খাঁর নতুন সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারাও যুদ্ধে নামিয়াছে। ওদিকে শিকারার সৈন্যদলেও খেখুন সম্প্রদায়ের সৈন্যরা আসিয়া যোগ দিয়াছে। আখেবের সৈন্যদলও প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতেছে।

ঘুরঘুট খাঁ খবর দিলেন আপনি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন না। সেখানে হত্যার তাণ্ডব চলিতেছে। তিনি বলিলেন, আপনি যুদ্ধ হইতে দূরে থাকুন। তিনি আমাকে আপনার শরীর-রক্ষী হিসাবে পাঠাইয়াছেন।

ভিংড়ার পরিত্যক্ত ঘরটাতেই আমরা থাকা স্থির করিলাম।

অশ্বারোহীকে বলিলাম, আমাদের দুইজনের খাইবার এবং থাকিবার ব্যবস্থা পাহাড়ের ওই পাথর-ঘেরা গুহাটায় আপাতত কর। ঘুরঘুট খাঁকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বল যে অন্তত দশজন সশস্ত্র প্রহরী যেন এই পাহাড়তলিকে পাহারা দেয়। আমার ভৃত্যদ্বয়কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।

অশ্বারোহী বলিল, দম মারা গিয়াছে। শিকারার এক সেনা কুঠার দিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।

তুমি কি দমকে চিনিতে?

দমের চারিটি পত্নী শোকে হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। তাহাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়াই শুনিলাম যে দম আপনার প্রিয় সহচর ছিল, সে মারা গিয়াছে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

অশ্বারোহীটি বলিল, শীঘ্রই আপনার জন্য একটি ভৃত্যের ব্যবস্থা করিতেছি।

অশ্বারোহীটি দ্রুতবেগে পুনরায় চলিয়া গেল।

সুলমা বলিল, আমি তো আছি। অন্য ভৃত্যের প্রয়োজন কী।

তাহাকে চুম্বন করিলাম।

উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্য, প্রচুর অশ্ব, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, প্রচুর উত্তেজনা। দশ দিন কাটিয়া গেল তবু যুদ্ধ থামিবার লক্ষণ নাই। আকাশে বহু শকুনি গৃধিনী কাক উড়িতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া তাহারা পচা মড়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। তাড়াইয়া দিলে খানিকটা সরিয়া যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার আসিয়া বসে। শকুনি-গৃধিনীরা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। বিকট দুর্গন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। হাহাকার, আস্ফালনে, অশ্বের হ্রেষায় চীৎকারে দশদিক কম্পিত। তা সত্ত্বেও যুদ্ধ চলিতেছে এবং মনে হইতেছে আরও বেশ কিছুদিন চলিবে। যতক্ষণ না উভয় পক্ষের সব নিঃশেষ হইতেছে ততদিন চলিবে।

আমি ভিংড়ার গুহায় একাই ছিলাম, আমার খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট ছিল না, কিন্তু আমার মনে তুষানল জ্বলিতেছিল, আমি যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম।

কন্টকা বা ভুলেরার কোনো খবর আসে না। সুলমা রোজ সকালে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলিয়া যাইত এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া যুদ্ধের সব খবর আমাকে শুনাইত।

সে একদিন অসিয়া বলিল, শিকারাকে ঘুরঘুট বন্দী করিয়াছে। তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া একটি ঘরের ভিতর রাখা হইয়াছে। ঘরটি ঘিরিয়া বহু সশস্ত্র সৈন্য দিবারাত্রি পাহারা দিতেছে। কিন্তু তবু যুদ্ধ এখনও থামিবার কোনো লক্ষণ নাই। কারণ শিকারার সেনাপতি জোখরু এবং খেখুনদের রাজা জিজিগম আরও অনেক অশ্বারোহী সৈন্য আমদানি করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যদের এখন বিরানি জঙ্গলে পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহারা সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করুম। সকলে একসঙ্গে জটাপটি করিয়া লাভ নাই। এখন ঘুরঘুট খাঁর সৈন্যরা লড়িতেছে। প্রয়োজন হইলে আমার সৈন্যরা তাহাদের সহিত যোগ দিবে। মড়াগুলি পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য একদল লোক লাগাইয়াছি। তাহারা মাঠে কবর খুঁড়িতেছে...।

সুলমা একটুও বিচলিত হয় নাই। অনায়াস নিপুণতা সহকারে সে সমস্ত ব্যাপারটার হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিসীমানায় যাইতে দেয় না।

একদিন হঠাৎ বলিল, আমি কন্টকার খোঁজে দশজন অশ্বারোহী পাঠাইয়াছি।

কন্টকার খোঁজে? কেন?

আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি মনে মনে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছ।

আমি একথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমার চরিত্রের এ দিকটা তো আগে দেখি নাই।

সুলমা মুখ টিপিয়া হাসিল কেবল। তাহার হাসিটি সত্যই অপূর্ব।

যুদ্ধ শেষ হইবার কোনো লক্ষণ নাই। দুই পক্ষেই নতুন অশ্বারোহী দল আসিয়া যোগ দিতেছে। শেষ হইবার কোনো আশা দেখিতেছি না। দুই পক্ষই নানা স্থান হইতে রসদও সরবরাহ করিতেছে। আমাদের জনপদ শ্মশান হইয়া গেল। একদিন শুনিলাম তিরখনও মারা গিয়াছে। তাহার একটা কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, আমরা হুনেরা কখনও সঞ্চয় করি না। আমাদের যাহা প্রয়োজন লুটপাট করিয়া সংগ্রহ করি। আমাদের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি করিবার বাসনা যখন জাগিবে, তখনই আমাদের ধ্বংসের বীজ আমরা বপন করিব। তোমরা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিষয়-সম্মত্তি করিয়া সেই বীজ বপন করিয়াছ। বিষয় করিলেই সে বিষয় হরণ করিবার জন্য চোর ডাকাত আসিবে, বিষয়ের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ হইবে। বিষয় তোমার শান্তি অপহরণ করিবে, তোমার বিষয় যত বিস্তীর্ণ হইবে তোমার অন্তর্দাহও তত বাড়িবে। বিষয় বিষ, বিষয় গরল। তিরখনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। আমরা মানব সভ্যতার যে স্তরে উপনীত হইয়াছিলাম সেই স্তরে আমরাই প্রথমে জমি দখল করিয়া জনপদের পত্তন করি। আমরাই প্রথম গরল পান করিয়াছি। দেখিতেছি সে গরলের ক্রিয়াও শুরু হইয়া গিয়াছে। আমার চোখের সম্মুখেই আমাদের জনপদ শ্মশান হইয়া যাইতেছে। হয়ত মানব সমাজে এই কাহিনীই নানারূপে বারংবার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, বহু সভ্যতার উত্থান ও পতন হইবে, বহু জনপদ শ্মশান হইবে, বহু নারী স্বামী-হারা সন্তান-হারা হইবে, বহু পুরুষ স্ত্রী-হারা সন্তান-হারা হইয়া হাহাকারে আর্তনাদে দিঙমণ্ডল পরিপূর্ণ করিবে, তবু মানুষ এই হলাহল পান করিতে ছাড়িবে না। হয়ত চিরকাল এই নিদারুণ মহানাটকের অভিনয় চলিতেই থাকিবে।

যুদ্ধ চলিতেছিল।

কিন্তু এমন একটা অভিনব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল যে যুদ্ধ হঠাৎ থামিয়া গেল। যে যেদিকে পারিল দুদ্দাড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। বিশাল এক হস্তীবাহিনী লইয়া দোহা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। তাহার সঙ্গে হাতি বাবা। দোহা ও হাতি বাবা যে হাতিটির উপর চড়িয়া ছিল সেটি পর্বতাকার, বিশাল তাহার দাঁত, প্রকাণ্ড মাথা, প্রকাণ্ড কান। শুঁড় দোলাইতে দোলাইতে সেই মহামাতঙ্গ সদলবলে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল তখন সমস্ত ঘোড়ারা ভড়কাইয়া যে যেদিকে পারিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হাতির দল রণক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল। ঘুরঘুট দোহাকে চিনিত, সে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। ঘোড়াটা সবেগে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে রণক্ষেত্র অশ্বারোহী-শূন্য হইয়া গেল। চারিদিকে কেবল বিরাটকায় হাতির দল। সহসা লক্ষ্য করিলাম একটি হাতির পিঠে চম্বা বসিয়া আছে।

হাতি দেখিয়া আমিও ভয় পাইয়াছিলাম। কাছে যাইতে সাহস হইতেছিল না। দোহা হাতি হইতে নামে নাই। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল।

কাছে এস, ভয় নাই।

তাহার পর হাতি বাবার কানে কানে কী বলিল। বোধহয় আমার পরিচয় দিল। আমি সভয়ে হাতির কাছে গেলাম। হাতি বাবা হাতির ভাষায় কী বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম হাতিটা হাঁটু গাড়িয়া শুঁড় তুলিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। প্রত্যেক হাতির পিঠেই একজন মাহুত ছিল। তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া আমাকে সংবর্ধনা করিল।

যুদ্ধ থামিয়া গেল।

ঘুরঘুট আসিয়া আমাকে বলিল, বন্দিনী শিকারার কী ব্যবস্থা করিবেন? আমার ইচ্ছা রাক্ষসীটাকে হত্যা করিয়া ফেলি।

আমি বলিলাম, আমরা তো অনেক হত্যা করিলাম, আবার কেন? শিকারাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কী আমাদের বন্ধু হইবে?

ঘুরঘুট একটু বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শিকারা বলিতেছে দোহাকে আমি ভালবাসি। দোহাই আমার বিচার করুক সে যে দণ্ড দিবে তাহাই আমি মাথা পাতিয়া লইব।

দোহা বলিল, আমি বিচার করিতে অক্ষম। হাতি বাবাই করুন।

হাতি-বাবা বলিলেন, আমার হাতিই বিচারক হোক। সে আমার চেয়ে বেশি বিজ্ঞ। উহার বুদ্ধি আমার অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম।

বন্দিনী শিকারাকে হাতির সম্মুখে দাঁড় করানো হইল। হাতি-বাবা হাতির ভাষায় তাহাকে কী বলিলেন, বুঝিলাম না। সম্ভবত বিচার করিতেই বলিলেন।

হাতি হঠাৎ আগাইয়া গিয়া শিকারাকে শুঁড়ে জাপ্টাইয়া উপরে তুলিল, তাহার পর সজোরে মাটিতে আছাড় মারিল এবং রোষভরে পা দিয়া তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিকারা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া গেল।

পরদিন হাতি-বাবা হাতির দল লইয়া চলিয়া গেলেন। যে হাতিটিতে চম্বা চড়িয়া আসিয়াছিল সে হাতিটি তিনি দোহাকে উপহার দিয়া গেলেন।

টুকচুম্বা লাল ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতোছিল আমাদের জনপদের রক্তাক্ত বেদনা যেন টুকচুম্বার সর্বাঙ্গে মূর্ত হইয়াছে। আমরা যাহারা বাঁচিয়া ছিলাম তাহার সকলে একদিন টুকচুম্বার তলায় সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিলাম। দোহা হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে

লাগিল। ঘুরঘুটও সে প্রার্থনা সভায় ছিল। সে-ও দেখিলাম খুব বিচলিত হইয়াছে, তাহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সে আশা করিতেছিল, তাহারা হয়ত মারো পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। সে-ও যাইবে-যাইবে করিতেছিল। এমন সময়ে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত কিংখাবে মোড়া একটি সুদৃশ্য পালকি একদিন আমাদের নদীর পূর্ব তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পালকির সহিত পালকির বেহারা ছাড়া দুইজন অশ্বারোহী ছিল। একজন অশ্বারোহী আমাদের ভাষায় বলিল, কন্টকা ও ভুলেরা উর নামক রাজ্যে আছে। এ দেশে যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া তাহারা উর রাজ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। এই পালকি তাহারা ঘুরঘুট খাঁর জন্য পাঠাইয়াছে। ঘুরঘুট খাঁ এই পালকি চড়িয়া যেন চলিয়া আসেন। উর রাজ্যে বিদেশি অশ্বারোহীদের প্রবেশ নিষেধ। তাই পালকি পাঠানো হইল। ভুলেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কন্টকাও ভালো আছে। যুদ্ধ থামিয়াছে খবর পাইলেই সে ফিরিয়া আসিবে। ঘুরঘুট পরদিনই পালকি করিয়া চলিয়া গেল।

নাটকটা বেশ মিলনান্তক হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়োগের সুর বাজিল। একদিন সহসা কয়েকটা তীর আসিয়া আমার গলায়, পিঠে ও মুখে বিঁধিল। দেখিলাম দূরে ভিংড়া ও ভালা ছুটিয়া পলাইতেছে। তীরগুলি বিষাক্ত ছিল, আমার মৃত্যু হইল।